শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেন

বলেছি বলছি বলব

সচরাচর নেতার ভূমিকা নির্ণয়ে সর্বাগ্রে ভাষণদানরত ব্যক্তিত্বের ছবিই চোখে ভাসে। দেশের রাজনীতিতে তেমন সংযোগ সত্ত্বেও ১৯৬৬-তে শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেনের একটি আত্মগত জিজ্ঞাসাই অক্ষরের মাত্রায় বিন্যাস পায়। অতীতে দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে মুসলিম-অধ্যুষিত পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা হলেও পূর্বাংশের অধিবাসী ছিল শোষিত। আর প্রতিরোধে আগে আগে যে ভাষাটা চাই! ওদিকে বাঙালির বুলি থামাতে স্বৈরশাসক হত্যাযজ্ঞই চালায়। পরিণতিতে '৫২-র ভাষা আন্দোলন পাই। তাতে 'স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে'র নিভৃত তাগাদায় সেদিনের নবম শ্রেণীর ছাত্র শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেন ছিলেন সোচ্চার। ওই দ্রোহ অপরাধে তাঁকে প্রথম যেতে হল জেলে।

এরই ধারাবাহিকতায় তিনি পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক এবং পরে তিন তিন বার সভাপতি নির্বাচিত হন। রাজনৈতিক বঞ্চনার রাহুগ্রাসে নিপতিত বাঙালির বহু গণতান্ত্রিক আন্দোলনে শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেন তখন অগ্রনায়ক হয়ে উঠেছিলেন। তারই ক্রিয়ায় ভীত শাসকচক্র নেতাকে বারেবারেই জেলে পাঠায়। সময়ের ঢেউ ভাঙার ওই নির্দয় প্রহরে ষড়যন্ত্রের অতল পেতে যন্ত্রণাক্ত লেখক কলমে কলমে অন্য এক তপস্যাই ফলান। সেলের নির্জনতায় সেই উপলব্ধজাত বিষয় পরবর্তীতে তাঁর 'নিত্য কারাগার' গ্রন্থটিতে অপূর্ব সারিবদ্ধ রূপ পায়। গুরুত্ব বিবেচনায় রচনাটির মূল্য এবং প্রাসঙ্গিকতা আজও ধার্য আছে।

স্যাঁৎ-বভের কথা উদ্ধৃত করছি: "যতই আমরা জীবনের পথে এগোই, সমাজ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান বাড়ে, ততই আমরা বুঝতে পারি তিনি কতখানি নির্ভুল।" পরিধির ওই প্রাকৃত-চারণে ১৯৭১-এ ওঠে মুক্তিযুদ্ধের ধ্বনি। শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেন তখন ছিলেন মুজিবনগরের অন্যতম সংগঠক। ফের ভারতীয় পার্লামেন্টের যৌথ অধিবেশনে স্বাধীন বাংলার ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত আর অবশ্যম্ভাবিতার ব্যাখ্যাই তুলে ধরেন। মননশীল চিন্তা এবং যুক্তিরধারে মথিত নেতার সেই বক্তৃতামালা স্বাধীনতার ইতিহাসে অমূল্য সম্পদ।

অবশেষে লাখো শহীদি স্মরণের আর্তিতে বাংলাদেশের অভ্যুদয়। উত্তর পর্বে পৌঁছে দেশ পুর্নগঠনে নেতার রাজনীতি মানুষের ঘাটে ঘাটেই নিবেদিত হয়েছে। অথচ শাসনের কূটচালে স্বভূমেও তিনি হলেন কারাবাসী। ক্রমে ক্রমে নিকটজনের কাছেও তাঁর 'জেলবার্ড' আখ্যা জোটে। শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেনের এই কালাকাল প্রায় অর্ধ শতাব্দীরই অধিষ্ঠান। শুধু সময়ের পরিমাপেই নয়, আমাদের রাজনীতিতে নেতার প্রত্যক্ষ-গোচরও বহুতর। ওদিকে জীবনের পথে চলতে গিয়ে নীল বিষও খানিক সঞ্চিত হল। আর সবের উপলব্ধই 'বলেছি বলছি বলব'র সারোদ্ধার। পাশে পাশে লেখকসুলভ বৃত্তিতে এই রূপায়ণে '৪৭-উত্তর বাঙালির তাবৎ মানস-প্রবণতাটিও তিনি ধরতে পারেন নিরাবেগ স্বচ্ছতায়।

ওই গুণের সন্নিবেশে 'বলেছি বলছি বলব' শুধু আজকের পাঠক নয়, বাঙালির সত্যছাপ পেতে গ্রন্থটির পাতা ভবিষ্যতেও ওল্টাতে হবে।

বলেছি
বলছি
বলব

বলেছি
বলছি
বলব

শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেন

উৎসর্গ

জীবনভর রাজনীতির কন্টকাকীর্ণ পথে চলতে গিয়ে যেসব সহকর্মী, শুভানুধ্যায়ী এবং সহযাত্রীর অকুণ্ঠ সহযোগিতা, সমর্থন এবং ভালোবাসা লাভে ধন্য হয়েছি তাদের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত হল আমার এই বিনীত প্রয়াস।

অর্ধযুগ পরে আবার আমার পুরনো আস্তানায় ফিরে এলাম। ঢাকা সেন্ট্রাল জেলের ২৬ সেলে অবস্থান আমাদের—ওবায়েদ, মঞ্জুর এবং আমার। মঞ্জুর '৬২-র পর আর কারাভ্যন্তরে আসেনি। আমাদের দু'জনকে বেশ কয়েকবারই আসতে হয়েছে। আমাকেই আসতে হয়েছে সবচাইতে বেশি। সেই '৫২ সালে ক্লাস নাইনে ছাত্রাবস্থায় হাফপ্যান্ট পরে ভাষা আন্দোলনে যার জেলযাত্রা শুরু, আজ ষাটোর্ধ্ব বয়সে দেশের উপ-প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরেও আবার সেখানেই তাকে আসতে হল।

একবার একটা সিনেমায় দেখেছিলাম, বম্বের কৌতুক অভিনেতা ইয়াকুব ট্রাফিক বক্সের উপর দাঁড়িয়ে বলেছিল, "হায়রে ভাগ্য! জন্মের সময় এক জ্যোতিষী হাত গুনে বলেছিল, এ ছেলের আগে-পিছে গাড়ি-ঘোড়া দৌড়াবে। সেকথা শুনে আত্মীয়স্বজন খুব খুশি হয়েছিল। ধন্য জ্যোতিষী! ঠিকই বলেছিল। আমার আগে-পিছে অহরহ গাড়ি আর গাড়ি—আমি যে ট্রাফিক পুলিশ!"

আমার বেলায় এরকম কিছু হয়েছিল কিনা জানি না। তবে জেলখানা যেন আমাকে পেয়ে বসল। সেই ১৯৫২ সাল থেকে প্রায় প্রতি বছরই একবার বা একাধিকবার আসতে হত। কিছু করলেও ধরবে—না করলেও ধরবে। দাগি আসামির মতো চুরি না করলেও ধরা পড়তে হবে।

লোকে বলে, জীবিত রাজনীতিকদের মধ্যে জেলখাটার ব্যাপারে কেউ আমাকে ডিঙোতে পারেনি। পনেরো-ষোলো বারে প্রায় বছর পনেরো আমার এই জেলখানার ভিতরেই কেটেছে।

রাজনীতি করি, প্রয়োজনে জেলে যেতে হবে জানা কথা। পাকিস্তান আমলে জেলযাত্রা আনন্দময়ই হত। মনে হত, দেশের জন্য একটা কিছু করছি। দেশের জন্য জেল খাটছি। তারপর দেশ যখন বানালাম—আমরাই বানালাম। সেই স্বাধীন দেশে জেল খাটতে গৌরববোধ করিনি। হীনম্মন্যতায় ভুগেছি। তবুও ভেবেছি, বিরোধী দলে যখন আছি, নির্যাতন-নিপীড়নের ছিটেফোঁটা গায়ে এসে লাগা স্বাভাবিক। স্বাধীনতার পর আমাদের সরকার, বঙ্গবন্ধুর আওয়ামী লীগের সরকার—জেলখাটার প্রশ্নই আসে না। বরং কাউকে কাউকে জেল হয়ত খাটিয়েছি। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে হয়ত হাত ছিল। আমি তখন চিফ হুইপ।

বাংলাদেশে প্রথম জেলে এলাম '৭৫-এর ৪ঠা নভেম্বর—ক্যাবিনেট মিটিং থেকে তুলে নিয়ে এল কারাভ্যন্তরে। খালেদ মোশাররফের স্বল্পকালীন রাজত্বের অবসানে সিপাহি-জনতা ৭ই নভেম্বর আমাকে জেল থেকে বের করে নিয়ে আসে। এরপর জিয়াউর রহমানের কালে দু'বার জেলখানায় মেহমান হলাম। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রীও মহাজন-পন্থা অবলম্বন করে বার দুই জেলে ঢুকিয়েছিলেন। প্রতিবারই হাইকোর্টে রিট করে বের হয়ে আসি। সেসব কাহিনী আসবে ক্রমে ক্রমে।

কিন্তু এবার জেলে আসায় যে নিদারুণ অপমান ও লজ্জা পেয়েছি, তার কোন তুলনা হয় না। নিষ্ফল আক্রোশে কেবল জ্বলেছি। নেতা বঙ্গবন্ধুর মেয়ে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য এতটা হিংসাপরায়ণ হতে পারে, এতটা মিথ্যাচারের আশ্রয় নিতে পারে—ভাবতেও পারিনি। পৃথিবীর কোথাও এমন নজির নেই। মনের অগোচরে কোন পাপ নেই। সকলেই জানে, প্রায় দুই যুগ পূর্বের এক হৃদয়বিদারক ঘটনায় আমাদের চার জন শ্রদ্ধেয় নেতাকে একদল সেনাবাহিনীর লোক জেলখানার অভ্যন্তরে কাপুরুষোচিতভাবে হত্যা করেছে। হত্যার খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গেই আমরা সব মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রীরা একযোগে পদত্যাগ করি। সারা দুনিয়া এ ঘটনা জানে।

আমরা আমাদের প্রায় সব সংশ্লিষ্ট সভা-সমাবেশেই এই বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা করেছি এবং উচ্চকণ্ঠে এই নারকীয় হত্যাকাণ্ডের বিচার চেয়ে এসেছি। ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস—সেই মামলায়ই এতদিন পর কেবলমাত্র ব্যক্তিগত ও দলগত ক্রোধ চরিতার্থ করার জন্য হঠাৎ করে এই হত্যাকাণ্ডের ষড়যন্ত্রের সাথে আমাদের সম্পর্ক আবিষ্কার করে রাতারাতি আমাদের তিন জনকে গ্রেপ্তার করা হল।

জেল অনেক খেটেছি। কিন্তু এবারের মতো মানসিক যাতনা কোনদিন পাইনি। মানুষ যে এত নিচে নামতে পারে, তা ভাবতেও পারিনি। ঘুণাক্ষরে যা জানি না, যে সম্বন্ধে কল্পনায়ও কোন চিন্তা আসেনি। তাঁদের হত্যার ষড়যন্ত্রের কথা পূর্বাহ্ণে জানতে পারলে আমরা নিজেদের জীবনের বিনিময়েও তাঁদেরকে বাঁচাতে চেষ্টা করতাম।

সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে অচিন্তনীয়, জঘন্যতম, মিথ্যা ও বানোয়াট অভিযোগ এনে আমাদেরকে গ্রেপ্তার করা হল। কারণ, আমরা কেন তাদের দল করি না। আমরা কেন অন্য দল করি। প্রধানমন্ত্রী তার বক্তৃতায় সেই কথারই প্রতিধ্বনি করেছে। নগ্ন প্রতিহিংসাপরায়ণতা আর নিতান্ত ক্ষমতার দম্ভ মানুষকে কতটা নিচে নামাতে পারে—আমাদের বিরুদ্ধে এই মামলাটি তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। জানতাম, অনেকদিন থেকেই হাসিনার একটা ব্যক্তিগত ক্রোধ রয়েছে আমার উপর, সেসবের উল্লেখ অপ্রয়োজনীয়। আমাদের তিন জনের উপর রাগের বড় কারণ—আমরা তার দল করি না এবং তার ও তার দলের বিরোধিতা

করি। একসময় আমরা তিন জনেই ছিলাম সেদিনের আওয়ামী লীগের বিশিষ্ট নেতা। আমি ছিলাম সরকারের চিফ হুইপ, ওবায়দুর রহমান এবং নুরুল ইসলাম মঞ্জুর ছিল প্রতিমন্ত্রী।

আজ অনেক কথা স্মৃতিতে জেগে ওঠে। অনেক কিছুই কলমের ডগায় ভিড় করে আসে। কিন্তু কী লিখি, কী বাদ দিই! চিরদিন সত্য বলার চেষ্টা করেছি। সে কারণে ভুগেছিও অনেক। আজ জীবন-সায়াহ্নে যা বলার বলে যাব। কারো ভ্রূকুটিতে আর কিছু যায়-আসে না। সেদিন পাড় করে এসেছি। বলেছি, বলছি এবং বলব। নির্ভয়ে বলব।

কিছুদিন ধরে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে দূরে আছি। এরশাদ সাহেবের সঙ্গে মতপার্থক্য হওয়ার কারণে কাজী জাফর এবং আমি পাল্টা জাতীয় পার্টি গঠন করার পর থেকেই মানসিক এবং শারীরিক কারণে নীরব থাকতে বাধ্য হই। নানা জটিল ব্যাধি এতদিন পরে আমাকে কাবু করতে সমর্থ হয়। ১৯৫২ সাল থেকে যে নিরলস কর্মময় জীবনের শুরু, সেখানে বিশ্রাম ছিল না—ছিল না কোন বিরতি। সেই সুদীর্ঘ এবং ঘটনাবহুল জীবন থেকে প্রায় একটি বছর নিশ্চুপ কেটেছিল। বাসার সামনে গোয়েন্দাদের আনাগোনা দেখি—জিজ্ঞেস করি, এখন তো আমি চুপচাপ, তা হলে তোমরা কী নজর রাখছ?

ওরা সবিনয়ে জানায়, পূর্ব থেকেই নির্দেশ রয়েছে, তা তুলে না নিলে আমাদেরকে নজর রাখার কাজ অব্যাহত রাখতেই হবে। আমরা হুকুমের দাস।

এ নিয়ে ভাবি না। গতিবিধির উপর নজর রাখতে চায় সরকার। রাখুক। হাসিও পায়, যখন সরকারে থাকি সিপাইসান্ত্রি ঘিরে রাখে, যখন সরকারের বাইরে থাকি তখনও সাদা পোশাকে তারা অহরহ ঘিরে থাকে।

ওবায়েদ মোটামুটি সক্রিয় ছিল। অবশ্য ওরও হার্ট ও বহুমূত্রের সমস্যা। মঞ্জুর বহুদিন ধরে রাজনীতি থেকে দূরে। একজন সফল ব্যবসায়ী এবং শিল্পপতি হিসাবে নিজেকে ব্যস্ত রেখেছে। তার শারীরিক অবস্থা সবচেয়ে উদ্বেগজনক। নানাবিধ রোগের মধ্যে হার্টে ব্লকেড ধরা পড়েছে। ডাক্তার, ক্লিনিক আর হাসপাতাল—এ নিয়েই এখন বেশি সময় কাটছে। এরই মধ্যে ঘটল বিস্ফোরণ—বিনা মেঘে বজ্রপাত।

২৮শে সেপ্টেম্বর দিবাগত রাত। বাসায় ভাগ্নে আবির, রুহুল আমীন মৌলভী এবং কাজের লোকজন ছাড়া আর কেউ নেই। দিনা গিয়েছে ওর বর অপুর সঙ্গে সাভার ক্যান্টনমেন্টের ওদের নতুন কোয়ার্টার গুছোতে। আমি আর সালেহা দু'জনই রয়েছি দোতলায়। রাত প্রায় দুটোর দিকে আমরা ঘুমন্ত—অত্যধিক গরমের কারণে এয়ারকুলার চালু রয়েছে, বাইরের কোন শব্দ সহজে শোনা যায় না। বাড়ির বাইরে তখন পুলিশের তাণ্ডব শুরু হয়ে গিয়েছে। ক্রমাগত বেল টিপে যাচ্ছে এবং চিৎকার করে গেট খোলার হুকুম দিচ্ছে।

দারোয়ান ও কাজের লোকজন জেগে উঠে ভিতর থেকে জানায় গেটের

চাবি উপরে এবং এত রাতে গেট খোলার জন্য চাবি পাওয়া যাবে না। পুলিশ ক্ষিপ্তের মতো চিৎকার করতেই থাকে এবং ক্রমাগত বেল বাজাতেই থাকে। দারোয়ান ও কাজের লোকেরা তখন বাধ্য হয়ে আমাদেরকে ডাকতে থাকে।

সালেহার ঘুম ভাঙে প্রথম। ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে ও আমাকে ডেকে তোলে এবং কান্নাজড়িত কণ্ঠে বারবার বলতে থাকে, রানার আব্বা, কী হবে? রানার আব্বা, কী হবে?

তার ধারণা বাড়িতে ডাকাত পড়েছে। মাত্র বন্যার পানি বাড়ি থেকে নেমেছে। লেকের প্রায় কাছেই বাসা। এ ধরনের চিন্তা অমূলক নয়। আমি বিছানা ছেড়ে উঠে দোতলা থেকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা কারা? কী চান?

ওরা জানতে চাইল আমি কে।

আমি আমার নাম বললাম।

ওরা বলল, স্যার, আমরা পুলিশের লোক। আপনার সাথে কথা আছে। গেট খুলতে বলেন।

জবাব দিলাম, পুলিশের লোক হলে এবং কোন প্রয়োজন থাকলে বাড়ি ঘেরাও করে রাখুন, এত রাতে আমি গেট খুলব না। সকালে কথা হবে।

আরও বললাম, আপনারা তো জানেন, পুলিশের পোশাক পরে, তাদের পরিচয় দিয়েও আজকাল নানা ঘটনা ঘটাচ্ছে।

তারা বলল, স্যার, সবই ঠিক বলেছেন। কিন্তু আপনি আমাদের চিনতে পারবেন, দয়া করে গেট খুলুন।

আমার স্ত্রী জীবনে এত ঝড়-ঝাপটার মধ্যদিয়ে এসেছে, তবুও অল্পতেই ভীষণ নার্ভাস হয়ে যায়। সে ক্রমাগত চোখের পানি ফেলছে আর উৎকণ্ঠায় চিৎকার করছে, রানার আব্বা, এখন কী হবে?

তার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিনি, মনের কোণে অন্য কোন দুশ্চিন্তা ছিল না। মনে হয়েছিল হয়তবা দুর্বৃত্তদের আক্রমণ। কিন্তু কী করব! আমার বন্দুক, রিভলবার ইতিপূর্বে সরকার সীজ করে নিয়ে গিয়েছে। ভাবলাম, দেখি কারা এবং কী চায়!

নিচে নেমে এলাম এবং দারোয়ানকে গেট খুলতে বললাম। গেট খোলার সাথে সাথে ওরা দ্রুত বাড়ির ভিতর ঢুকে গেল। সাদা পোশাক এবং পুলিশি পোশাকের ছড়াছড়ি। অফিসার কয়েকজনকে চেনা চেনা মনে হল, সালেহাকে আশ্বস্ত করলাম, ওরা পুলিশেরই লোক, দুর্বৃত্ত নয়।

জিজ্ঞেস করলাম, কী ব্যাপার? এত রাতে আমার কাছে কেন?

তারা বলল, স্যার, আপনাকে আমাদের সাথে যেতে হবে।

কারণ?

তারা এক টুকরো কাগজ বের করল, তাতে দেখলাম লালবাগ থানার এক মামলায় আমাকে রিকুইজিশন দেওয়া হয়েছে।

জিজ্ঞেস করলাম, কী মামলা?

তারা বলল, জেল হত্যা মামলা।

স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। মনে হল আকাশটা মাথার উপর ভেঙে পড়ল।

আর কিছু নয়, জেল হত্যা মামলা? হাসিনা, এই ছিল তোর মনে!

সালেহাকে বললাম, যেতে হবে। তুমি তো জানো আমি নির্দোষ। আল্লাহ্ জানেন আমি নিরপরাধ। ভেব না, বেঁচে থাকলে আবার দেখা হবে।

সালেহা অঝোরে কাঁদতে থাকল। এরই মধ্যে আমাকে সান্ত্বনাও দিতে থাকল, আল্লাহ্ তো আছেন। তোমার কিছুই হবে না। তুমি ঘাবড়িয়ো না।

আমার চাইতে অনেক বেশি ঘাবড়িয়েছে সে নিজেই। ফোন করে ডেকে আনলাম হাকিম, আউয়াল, আনোয়ার আর সমিজকে। এত রাতে নিয়ে যাবে, কাউকে জানানো প্রয়োজন।

কাপড় পরে সকলের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে পুলিশের গাড়িতে উঠে বসলাম।

শুরু হল এক নতুন অধ্যায়।

সিআইডি অফিসের চার তলার নিশ্ছিদ্র পাহারায় আমাদের রাখা হল। পরনের কাপড় ছাড়া কিছুই সঙ্গে আনিনি। ওখানে পৌঁছে দেখলাম, ইতিমধ্যেই ওবায়েদকে এবং কিছুক্ষণের মধ্যে মঞ্জুরকে নিয়ে এল। তাঁদের দুই বাসায়ও প্রায় একই নাটক অভিনীত হয়েছে। ওরা মঞ্জুরের বেডরুমে ঢুকে পড়েছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই মামলার তদন্ত কর্মকর্তা কাহার আখন্দের সঙ্গে দেখা হল। জিজ্ঞেস করলাম, কী হল কাহার সাহেব? কী অপরাধ করলাম?

কাহার জবাব দেয়, স্যার, কাল কথা বলব। এখন বিশ্রাম করুন। আমিও অত্যন্ত শ্রান্ত।

সকালে দেখলাম সিআইডি অফিসের প্যারেড গ্রাউন্ডে সমিজ আর জাহাঙ্গীর চার তলার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে—যদি একটু দেখতে পায়। আমি জানালায় দাঁড়াতে ওরা হাত নাড়তে থাকল। ইশারায় ওদের চলে যেতে বললাম। এসব জায়গা ভালো নয়। এই কিছুদিন আগে রুবেল নামের একটি ছেলেকে ডিবি'র লোকেরা পিটিয়ে মেরে ফেলেছে। ওরা পারে না এমন কাজ নেই।

সারাদিন কাটল উৎকণ্ঠার মধ্যে, পরস্পর আলাপও করতে পারি না।

একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম, নিচের দিকের কর্মকর্তারা সকলেই অত্যন্ত সহানুভূতিসম্পন্ন। তারা বলছিল, এমন অন্যায়ভাবে নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তার ন্যক্কারজনক। এই মামলায় আমাদের যে কোনই সম্পৃক্ততা নেই, সে সম্বন্ধে ওরা সবাই সচেতন। কেবল উপরের পর্যায়ের কর্মকর্তা, যারা বর্তমান সরকারের অধিকতর আস্থাভাজন, তাদেরই দেখি তৎপর এবং অতিউৎসাহী।

বিকেলে আমাদের নিয়ে রওয়ানা হল কোর্টে। আলোকচিত্রগ্রাহক এবং সাংবাদিকদের ব্যূহ ভেদ করে আমাদের গাড়িতে ওঠানো এক দুরূহ ব্যাপার। আমাদের গাড়ির অগ্র-পশ্চাতে বিপুল পুলিশবাহিনী। আমাদের অনেক কর্মীও রয়েছে মোটর সাইকেল ও বেবিট্যাক্সিতে।

কোর্টে পৌঁছার পর দেখলাম লোকে লোকারণ্য। কর্মীরা চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে মুহুর্মুহু স্লোগান দিচ্ছে। কোর্টপ্রাঙ্গণে তিল ধারণের স্থান নেই। সকলের মুখেই এক কথা, এত বড় রাজনৈতিক প্রতিহিংসা কেউ কখনও দেখেনি। সরকারের অবশ্যম্ভাবী পতন আসন্ন। তা না হলে এ ধরনের নির্যাতনের পথ কেউ বেছে নিতে পারে না।

শত শত আইনজীবী আমাদের পক্ষে দাঁড়ালেন। খন্দকার মাহাবুবউদ্দীন, বিচারপতি হাবিবুল ইসলাম ভুঁইয়া, ব্যারিস্টার রফিকুল ইসলাম মিয়া, সাইদুল আলম সাঈদ, সিরাজুল ইসলাম প্রমুখ। অনেক অকাট্য যুক্তি দেখালেন—কিন্তু কাকস্য-পরিবেদনা—জামিন হল না, বরং চার দিনের রিমান্ডের আদেশ হল।

ফিরে এলাম সিআইডি'র চার তলায়। দিবা-রাত্রি সময় নেই, অসময় নেই ঘুম থেকে উঠিয়ে তারা শুরু করল জিজ্ঞাসাবাদ। কিন্তু কী হবে এসব আবোল-তাবোল প্রশ্নে! আমরা তো ঘটনার বিন্দুবিসর্গও জানি না! কী জবাব দেব ওদেরকে? বললাম, মি. কাহার, দই বানাতে দুধ লাগবে—ভেজাল হলেও কিছুটা দুধ অবশ্যই লাগবে। শুধু পানি দিয়ে দই বানানো যাবে না।

শুনে সে নাখোশ। প্রশ্ন করে, '৭৫-এর নভেম্বরের ২রা তারিখ রাতে বঙ্গবভনে গিয়েছিলেন?

মোটেই না। দেশে তো পহেলা তারিখ থেকেই ওলট-পালট অবস্থা। খালেদ মোশাররফ গং ক্ষমতা দখল করেছে। দেশে সরকার কে চালাচ্ছে জানা নেই। তাছাড়া ক্যাবিনেট মিটিংয়ের নোটিশ না পেলে, বা ডেকে না পাঠালে বঙ্গভবনে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

তাহেরউদ্দীন ঠাকুরের বাসায় ক'বার গেছেন?

জবাব দিলাম, জীবনেও না, একবারও না। তাঁর বাসা কোথায় তা-ই জানতাম না।

মোশতাকের সঙ্গে দল করলেন কেন?

বললাম, সেটা আমার ব্যক্তিগত অভিরুচির বিষয়। মোশতাকের সঙ্গে দল করা অপরাধ হলে সেই মামলা আনেন, জবাব দেব।

মোশতাকের ক্যাবিনেটে গেলেন কেন?

আওয়ামী লীগের প্রায় সকলেই গেছে। যাদেরকে নেয়নি, তারাই বাদ পড়েছে। বঙ্গবন্ধুর মতো মানুষকে ওরা তখন হত্যা করেছে—আমাদের নিয়ে গিয়ে শপথ করিয়েছে। অন্যথা করব—কার ঘাড়ে কয়টা মাথা?

আরও বললাম, বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলায় আপনি বলেছেন, আমি নাকি পট-পরিবর্তনে একজন বেনিফিশিয়ারি। বাস্তবতা হচ্ছে, আমার হল পদাবনতি। ছিলাম চিফ হুইপ। বঙ্গবন্ধু আমার প্রোটকল ঠিক করে দিয়েছিলেন, ক্যাবিনেট মন্ত্রীদের পরে প্রতিমন্ত্রীদের উপরে। আর মোশতাকের ক্যাবিনেটে আমাকে করা হল একজন প্রতিমন্ত্রী। কিন্তু তখন মুখ খোলার কোন উপায় ছিল না। মেরে ফেললেও কিছু করতে পারতাম না।

কিন্তু কে শোনে কার কথা! কাহার আখন্দ, তার উপরওয়ালা হান্নান সাহেব এবং আরও অনেকে অনেক ধস্তাধস্তি করলেন, কিন্তু মিথ্যাটাকে দাঁড় করাতে পারলেন না। অখুশি হলেন। বুঝলাম, নেত্রীকে খুশি করতে আমাদের রেহাই দেবেন না।

কাহারের ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয় সে আকাশে উড়ছে।

মনে মনে বললাম, মি. কাহার, এই দিন দিন নয়—আরও দিন আছে। সেই দিনকে নিয়ে যাব এই দিনের কাছে। অন্যায় করবেন না। সীমা লংঘনকারীকে আল্লাহ্ পছন্দ করেন না।

ভাবলাম, আল্লাহ্ তা'আলার নিরানব্বইটি নামের মধ্যে সবক'টিই করুণা ও রহমত মিশ্রিত। কেবল 'ইয়া কাহারু' ছাড়া। এর এক অর্থ—'হে শাস্তিদাতা।' কাহারের নাম সার্থক হচ্ছে। কিন্তু অপাত্রে কোন জিনিসই ধোপে টেকে না। শুধু এইটুকু যদি সে খেয়াল রাখে! অনেক চেষ্টা করেও কিছু না পেয়ে এবং আমাদের কাছ থেকে চোখা জবাব পেয়ে ওরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল। চার দিনের রিমান্ডে এনেও তিন দিনের দিন কোর্টে উপস্থিত করে রিমান্ডের যবনিকা টানল। আর ঘাঁটাঘাঁটি করতে সাহস পেল না। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তারা বলল, আমরা তাদেরকে কী প্রশ্ন করব—তারাই আমাদেরকে উল্টা প্রশ্ন করে!

আবার কোর্টে নেওয়া হল। আগের চেয়ে লোকজন এবার আরও বেশি। জামিন না-মঞ্জুর হল, ডিভিশনের আদেশ হল। আমাদেরকে জেলখানায় পাঠিয়ে দেওয়া হল। ছাত্রলীগের সভাপতি হওয়ার পর থেকে যতবার জেলখানায় এসেছি, সরাসরি প্রথম শ্রেণীর ডিভিশন দেওয়া হয়েছে। এবার দেখলাম সম্পূর্ণ ভিন্ন চিত্র। লিখিত আদেশ এসে পৌঁছয়নি বলে আমাদের সাধারণ কয়েদিদের মতো রাখা হল। কোর্ট-প্রত্যাগত পুলিশ কর্মকর্তাও জানাল, স্যারদের ডিভিশন মঞ্জুর হয়েছে। আদেশ এসে যাবে।

কিন্তু ওখানে আগে থেকেই দুটি নিরাপত্তা বিভাগের কর্মকর্তা বসে আছে, যাতে আমাদেরকে সবচাইতে কষ্টকর জায়গায় রাখা হয়। উপরের নাকি তেমনই

নির্দেশ। আমরা তিন জনই সমস্বরে নিবেদন করলাম, যেখানেই রাখুন, আমাদেরকে বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার আসামিদের সঙ্গে রাখবেন না।

তারা আমাদের সাত সেলে পাঠাল। আগে এখানে একরারী অর্থাৎ অপরাধ স্বীকার করা আসামিদের রাখা হত। জেলখানার সবচাইতে বিচ্ছিন্ন এবং ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধার স্থান হল এটি। এই সেলকে সকলেই অচ্ছুৎ মনে করে। এসে দেখি রুবেল হত্যা মামলার তিন আসামি পুলিশের ডিবি'র লোককে একটি সেলে সবসময় তালাবদ্ধ করে রাখা হচ্ছে। তিন কম্বল সম্বল করে ভূমিশয্যা গ্রহণ করলাম। সেলের ভিতরই রাতের পায়খানা-পেশাবের ব্যবস্থা। আমরা তিন জনই বয়স্ক এবং নানাবিধ জটিল রোগাক্রান্ত। খাবার ব্যবস্থা সাধারণ কয়েদিদের মাপকাঠিতে। ডাক্তার এসে সব দেখে হাসপাতাল থেকে কিছু খাবারের ব্যবস্থা করলেন। তার মানও একই রকম। যতই দিন যাচ্ছে, জেলখানার জীবনযাত্রার মান ততই নিম্নে যাচ্ছে।

পরের সন্ধ্যায় জাগপা'র সভাপতি শফিউল আলম প্রধান তার তিন সহযোগীসহ এসে উপস্থিত। প্রধান গেট থেকেই চিৎকার করে বলতে থাকল, ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি মোয়াজ্জেম ভাই, ওবায়েদ ভাইকে মিথ্যা মামলা দিয়ে ধরে আনবে আর আমরা চুপ করে থাকব? তা হয় না। প্রতিবাদ করেছি—তাই ওরা আমাদেরকেও ধরে এনেছে।

আমরা তাদেরকে অভিনন্দন জানালাম। খাবার ব্যবস্থা ছিল না। আমাদের খাবার দিয়ে কোনরকমে রাত কাটাবার ব্যবস্থা করে দিলাম। একসময়ের ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক শফিউল আলম প্রধান স্পষ্টবাদিতা এবং সাহসী-কর্মী হিসাবে গণতান্ত্রিক মহলে সমাদৃত। বিএনপি ও জাতীয় পার্টির পর তার দলই প্রথম আমাদের মুক্তির দাবিতে রাজপথে নেমে আসে।

৬ই অক্টোবর আমাদের কোর্টে নেওয়ার তারিখ নির্ধারিত হয়। সকালের দিকে আমার ইন্টারভিউ এসে উপস্থিত। জেলখানায় সকলেই 'দেখা' আসার জন্য অস্থির হয়ে থাকে। আমার কিন্তু এখন আর ভালো লাগে না। আপনজনদের দেখে আমার মন আরও বিষাদগ্রস্ত হয়। ওরা নিদারুণ মনঃকষ্ট নিয়ে বিদায় নেয়। মেয়েরা আসে, অনেকেই ওদের মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। দেখে অস্বস্তি বোধ করি। ওদেরকে বলি, তোমরা এসো না।

কে শোনে কার কথা! ওরা আসবেই। সালেহার কান্না থামতেই চায় না। সমিজ, আনোয়ার, কফিল, হারুন, দুলাল ওরা সবাই এসেছে। সাক্ষাৎকার ক্ষণস্থায়ী হল। কেননা, আমাদেরকে কোর্টে নিয়ে যেতে হবে। ওদের বিদায় দিয়ে সেলে এসে তৈরি হয়ে কোর্টে রওয়ানা হলাম। সেখানে একই দৃশ্য। কোর্টপ্রাঙ্গণে প্রচণ্ড বিক্ষোভ, অভ্যন্তরে আইনজীবীদের সুতীব্র লড়াই। আইনজীবীরা সবাই একবাক্যে বললেন, দীর্ঘ দুই যুগ পরে জেল হত্যার ঘটনাকে কেন্দ্র করে এজাহার বহির্ভূত সম্মানিত নেতৃবৃন্দকে রাজনৈতিক

প্রতিহিংসার কারণে অহেতুক গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁরা নিবেদন করলেন, অভিযুক্তরা ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের মহানায়ক—সাবেক উপ-প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, রাজনৈতিক দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এবং সমাজের সর্বজনশ্রদ্ধেয়। তাঁরা বয়স্ক এবং নানা রোগাক্রান্ত। এই কোর্টে এর চেয়ে জামিনযোগ্য মামলা আর আসেনি।

কিন্তু সবই নিষ্ফল হল। সরকার থেকে বলল, মামলার তদন্ত চলছে, এরা ছাড়া পেলে দেশত্যাগ করবে।

আর সহ্য হল না। হাকিমের অনুমতি নিয়ে কোর্টে বক্তব্য রাখলাম। কণ্ঠ আবেগাপ্লুত হয়ে এসেছিল। তবুও বললাম এদেশের জন্য আমার এবং আমাদের কী অবদান ছিল। প্রধানমন্ত্রীর দল করি না বলে আজ আমাদের উপর অত্যাচারের স্টীম রোলার চালানো হচ্ছে। সাধারণ কয়েদিদের মতো এই প্রচণ্ড গরমে ফ্যান ছাড়া, বিছানা-বালিশ ছাড়া আমাদেরকে ফ্লোরে থাকতে হচ্ছে। দেশ ও জাতির জন্য সারাজীবনের অবদানের আজ এই প্রতিদান!

পিনপতন নীরবতায় সবাই শুনল, কেউ কেউ তখন নীরবে অশ্রু বিসর্জন করছিল। ওবায়েদ তার স্বভাবসুলভ ভাষায় কোর্টের কাছে নিবেদন করল, সে একজন এমপি, পৃথিবীর সমস্ত দেশ তার লাল ডিপ্লোম্যাটিক পাসপোর্টকে সম্মান করে; তাকে ভিআইপি ট্রিটমেন্ট দেয়। অথচ নিজ দেশে তার এই হেনস্তা।

নুরুল ইসলাম মঞ্জুরও কোর্টের অনুমতি নিয়ে এই মামলার অসারত্ব প্রমাণ করার প্রয়াস পেল। একদার আইনজীবী মঞ্জুর আইনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরল তার বক্তব্যের সপক্ষে।

কিন্তু সবই বৃথা। জামিন হল না।

প্রত্যাবর্তন করলাম জেলখানায়। ইতিমধ্যে কোর্টের আদেশ পৌঁছেছে কর্তৃপক্ষের হাতে। তারা আমাদের সরাসরি নিয়ে এল ২৬ সেলে। বহুবার এখানে থেকেছি। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে থেকেছি। আবুল মনসুর আহমেদ, তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া, মণি সিংয়ের মতো দিকপালদের সঙ্গে অনেক দিন কেটেছে এই সেলে। সামনের চত্বরে ভলিবল খেলা হত। মুজিব ভাই নেটে খেলতেন। আমি মধ্য-মাঠে ভালো খেলতাম বলে তিনি আমাকে তাঁর দলে নিতেন। বল এলেই বলতেন, মোয়াজ্জেম, একটা বল, একটা বল...।

আমি নেটে বল তুলে দিলে তিনি নিখুঁত চাপ মেরে বিপক্ষ দলকে পর্যুদস্ত করে বিমল আনন্দ লাভ করতেন। মনে হয়, আজও যেন তাঁর ঘিয়ে-ভাজা কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছি—মোয়াজ্জেম একটা বল, একটা বল...।

'৯২ সালে দ্বিতীয় বার যখন জেলে আসতে হল, সঙ্গে খাদ্য মন্ত্রণালয়েরই আমার সহকর্মী সাবেক প্রতিমন্ত্রী রাজশাহীর নূরন নবী চাঁদ। আমাদের ডিভিশন ছিল। তখন ২৬ সেলের ম্যানেজার ছিল আমারই অত্যন্ত স্নেহভাজন কর্মী মুন্সীগঞ্জের দিঘিরপাড়ের প্রখ্যাত চেয়ারম্যান বাচ্চু হালদার। আমাদের পেয়ে সে

কী খাওয়াবে, কী করবে ভেবে অস্থির হয়ে উঠল। দিন দশেক পরে জামিন হয়ে গেলে সুরসিক চাঁদ বলল, স্যার, বাইরে চাচার হোটেলে খাই। এত ভালো খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে যেতে মন চায় না।

সবাই হেসে উঠলাম। বাচ্চু হালদারের সেই আতিথেয়তার কথা ভোলার নয়। এই মহৎপ্রাণ যুবকটি অকালেই পৃথিবী থেকে ঝরে গেল। সেবার আমাদের মুক্তির কিছুদিনের মধ্যে তারও মুক্তির নির্দেশ এসে গেল। বাইরে বর্ধিষ্ণু সাজানো সংসারে ফিরে গিয়েই সে হার্টের অসুখে আক্রান্ত হল। চিকিৎসার জন্য আমেরিকা গেল। সেখানেও আমাদের এক সভায় সে উপস্থিত হয়েছিল। তার শরীরের খোঁজখবর নিলাম। শুনলাম হার্টের অবস্থা ভালো নয়, চিকিৎসা চলছে। বছরখানেক পর একদিন খবর পেলাম, আমার ভ্রাতৃপ্রতিম সিংহপুরুষ জি.এম. ইকবাল বাচ্চু হালদার ইহজগতে আর নেই। তার লাশ গ্রহণ করতে তেজগাঁও বিমানবন্দরে পৌঁছে ভাই হারানোর বেদনা অনুভব করেছিলাম। চোখের পানিতে সব ঝাপসা হয়ে গেল।

২৬ সেলে আবার ফিরে এসে তার কথা স্মরণে এসে যায়।

এখানকার পূর্বসৌন্দর্য আর নেই। চারদিকের ফুলের বাগান নষ্ট হয়ে গেছে। বারান্দায় দেওয়া হয়েছে লোহার গ্রিল। রাত-দিন ময়লার বিশ্রী দুর্গন্ধে পরিবেশ অসহনীয়। সেলের পেছন দিক দিয়ে মলমূত্র নিষ্কাশনের উন্মুক্ত নর্দমা। একদিকে অসহনীয় গরম, অন্যদিকে অসহ্য দুর্গন্ধ। সন্ধ্যার আধ ঘণ্টা আগেই সেলের লকআপ আমাদের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলল। মঞ্জুর গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ল। তার বোধহয় একটা মাইল্ড স্ট্রোক হয়ে গেল। আমাদের তিন জনেরই হিট স্ট্রোক হয়ে গেল। শরীরের চামড়ায় ঘা হয়ে গেল। আমাদের মতো লোকদের পাখা দেওয়ার দৃষ্টান্ত থাকলেও অনেক অনুরোধ করেও কোন ফল হল না।

পরম করুণাময়ের কাছে সবকিছু নিবেদন করে এক ভয়াবহ মানসিক ও শারীরিক দুরবস্থার মধ্য দিয়ে আমরা দিন কাটাতে লাগলাম।

এ সেল সবসময় গমগম করত, এখন এর দুরবস্থা চলছে। একেবারে কোণের দিকে রয়েছেন রায়হান সাহেব—ঢাকার অভিজাত এলাকায় যিনি নিজ হাতে গুলি করে তাঁর উপযুক্ত পুত্রকে হত্যা করেছিলেন। ভদ্রলোককে আগে থেকে জানতাম না। এখন মনে হচ্ছে একেবারে আত্মকেন্দ্রিক হয়ে আছেন। কারো সঙ্গে তেমন কথা বলেন না। নিজের ঘরে নিজের মধ্যেই সর্বক্ষণ আত্মমগ্ন হয়ে আছেন।

প্রথম সাক্ষাতে প্রথা অনুযায়ী সালাম দিলাম। একটু মাথা ঝুঁকিয়ে চলে গেলেন। অন্যরা বলছিল, তাঁকে না ঘাঁটানোই ভালো। পরদিন সকালে সামনের পথটুকুতে পায়চারি করছি—তিনি এসে আমার সঙ্গে নিজের থেকে যেচে আলাপ করলেন। বললেন, আমি আপনাদের এড়িয়ে চলব। কিছু মনে করবেন না। তবে আপনার ওপর আমি অত্যন্ত নাখোশ!

জিজ্ঞেস করলাম, কারণ?

তিনি বললেন, আপনার 'নিত্য কারাগারে' পড়ে আমি যারপরনাই মুগ্ধ হয়েছি। যাযাবরের 'দৃষ্টিপাতে'র পরে অন্য কোন বই আমার এত ভালো লাগেনি। আপনি এত বড় লেখক হয়ে আর লিখলেন না! এ অপরাধ ক্ষমা করা যায় না।

প্রশংসা শুনতে কার না ভালো লাগে! তবুও এতখানি সাধুবাদের যোগ্য আমি নই। সবিনয়ে বললাম, বইটি আপনার ভালো লেগেছে জেনে খুশি হলাম। দেখি আগামীতে যদি কিছু লিখতে পারি।

হঠাৎ রাগতস্বরে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা দেশ স্বাধীন করার পর মুক্তিযোদ্ধারা এত ভাগে বিভক্ত হল কেন?

জবাব দিলাম আমার দৃষ্টিকোণ থেকে যেভাবে বিষয়টি বুঝেছি সেভাবে। আরও বললাম, আমরা তো মুক্তিযোদ্ধা। ইসলামের ইতিহাস ঘেঁটে দেখুন, চার খলিফার তিন জনই মসজিদে নিহত হয়েছেন। প্রথম থেকে মত ও পথের কিছু দ্বন্দ্ব থেকে যায়। মহানবী (সাঃ)-এর আদর্শ ও নেতৃত্ব থাকার পরও ধর্ম কত ভাগে বিভক্ত। আর আমাদের মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হয় মূল নেতার অবর্তমানে, নিজেদের উদ্যোগ ও মতাদর্শকে সামনে রেখে। কাজ সমাধা হওয়ার পর সকলকেই একই মত ও পথে চলতে হবে—এমন কোন বিধি বা শর্ত নেই।

আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু শ্রোতার ধৈর্যের অভাব। কিছু প্রতিউত্তর না করে নিজের সেলে ঢুকে গেলেন।

ওবায়েদ বলল, তাকেও নাকি আমার বইয়ের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন এবং কেন আমি আর লিখি না, তার কৈফিয়ত তলব করেছেন।

মনে পড়ল বন্ধু আজিজের কথা। সত্যিকারের বন্ধু এবং সুহৃদ যদি কাউকে বলা যায়, সে ছিল আজিজ। বিক্রমপুরেরই এক ব্যবসায়ীর জ্যেষ্ঠপুত্র আজিজ জীবনে হতে চেয়েছিল স্কুল শিক্ষক। কিন্তু হয়ে গেল একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। সারা পৃথিবী জুড়ে তার ব্যবসা। অর্থ উপার্জন করেছে অজস্র। বিক্রমপুর, নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা, লন্ডন, আমেরিকায় রয়েছে তার বিশাল বিশাল অট্টালিকা।

আমার সাথে সম্পর্ক ছিল নিখাদ। ছাত্রলীগ করত এবং একসময় ঢাকা কলেজে সহ-সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিল। তার ব্যক্তিগত মতামত যা-ই থাকুক, রাজনৈতিক চিন্তা সে করত আমার ব্যারোমিটারে। দেশে স্কুল-কলেজসমূহে তার দান ছিল অপরিসীম। আমার বিপদ-আপদে সে ঝাঁপিয়ে পড়ত নিজের জীবনের মায়াকে তুচ্ছ করে। ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যার খবর যখন রেডিওতে পেলাম, তখন নিদারুণ ভয় ঢুকে গেল, ওরা আমাকেও মেরে ফেলবে। কেননা, আমি চিফ হুইপ হিসাবে বঙ্গবন্ধুর সব কাজ করেছি। চতুর্থ

সংশোধনী পাস করানো, বঙ্গভবনে নিজে গিয়ে তখনকার রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদউল্লাহর স্বাক্ষর নিয়ে এসে সেটা সংবিধানের অংশে রূপান্তরিত করে সঙ্গে সঙ্গে সংসদ ভবনের বারান্দায় রাষ্ট্রপতি হিসাবে বঙ্গবন্ধুর শপথ গ্রহণের ব্যবস্থা করা—সবই ছিল আমার কাজ। তা-ই মনে হল, যারা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেছে, তারা আমাকেও মেরে ফেলবে।

দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে আমার স্ত্রী আজিজকে টেলিফোন করল, আপনি এসে আপনার বন্ধুকে এই মুহূর্তে সরিয়ে নিয়ে যান।

আজিজ তার মার্সিডিজ নিয়ে ছুটে আসতে গিয়ে মহাখালীর কাছে ট্যাংক বহরের সামনে পড়ে ফিরে যেতে বাধ্য হল। টেলিফোনে জানাল, তার আসা সম্ভব নয়। আমি যেন ১ নম্বর মিন্টু রোডে আপাতত আশ্রয় নিই।

তা-ই করলাম। সেটা ছিল পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান, আমার মামা ড. বি. করিম সাহেবের বাসা। তিনি একজন অরাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব—তাঁর বাড়ি হয়ত নিরাপদ।

আমার সেই বন্ধু, সেই ভাই আজ আর ইহজগতে নেই। তাঁর সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বলার জন্য তোলা রইল। আজ শুধু এইটুকু মনে পড়ছে, রায়হান সাহেবের মতো সেও একদিন লন্ডন থেকে টেলিফোন করে আমাকে খুব গালাগালি দিল। প্রথম ধাক্কা কাটতে জিজ্ঞেস করলাম, এত গালাগালি কেন?

সে বলল, তুই কিছু লিখছিস না কেন? আল্লাহ্ তোকে একটা ক্ষমতা দিয়েছেন, কাজে লাগাস না কেন? তোর সারাজীবনই তো ঘটনাবহুল। এগুলো লিখলেও পরবর্তী প্রজন্ম অনেক কিছু জানতে পারবে।

তাকে আশ্বস্ত করেছিলাম, অচিরেই লেখা শুরু করব। কিন্তু তার জীবদ্দশায় তা হয়ে ওঠেনি। আজিজের বিদেহী-আত্মার কাছে অপরাধী রয়ে গেলাম।

কোথা থেকে কোথায় চলে এলাম! আগেই বলেছি, কত কথা ভিড় করে আসছে কলমের ডগায়, কাকে ধরি, কাকে ছাড়ি! রায়হান সাহেবের পরে রয়েছেন মেজর হালিম সাহেব। এখন আর চাকরিতে নেই। অভিযোগ, তিনি নাকি নিজহাতে স্ত্রীকে হত্যা করেছেন। দীর্ঘ সাজা হয়েছে। এমন ভদ্র, এমন নরম এবং খোদাভক্ত মানুষ পাওয়া দুষ্কর। ইসলামিক কায়দায় সবসময় মাথায় চাদর দিয়ে রাখেন—এখন সর্বক্ষণ একজন ধর্মগুরু হিসাবেই তাঁর পরিচয়। পবিত্র কোরআন এবং হাদিস সম্বন্ধে মানুষটার অগাধ জ্ঞান।

এহেন মানুষ কী করে নিজের সহধর্মিণীকে খুন করতে পারে বোধগম্য নয়। জিজ্ঞেস করায় বললেন, একটা ষড়যন্ত্রের শিকার। স্ত্রী দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করলেও সেটাকে হত্যা বলে প্রমাণ করা হয়েছে।

স্নেহপ্রবণ একজন পিতা। ছেলে-মেয়েদের জন্য ডিম ফেটে পুডিং বানাচ্ছেন। জেলখানায় তাঁর কাজ, জেলের বিদ্যালয় 'চেতনা'য় গিয়ে ছেলেদের ইসলামের জ্ঞান দেওয়া। সেলে কয়েকটি বিড়ালকে সন্তানজ্ঞানে পালন করা।

দু'বেলা যথাসময়ে তাদের খাদ্য পরিবেশন করা। একজন বিদেশী আছে—নাইজেরিয়ার রবার্ট। সে সদ্য ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নিয়েছে। তাকে তিনি ধীরে ধীরে পাকা মুসলমানে রূপান্তরিত করেছেন। আমরা এসে তাঁর কাজ বাড়িয়ে দিলাম। রায়হান সাহেবের কাছ থেকে ম্যানেজারি বদলে আমরা হালিম সাহেবের ঘাড়ে চাপালাম। আশা, ডিভিশনের খাদ্যমান বৃদ্ধি পাবে। তিনিও উৎসাহের সঙ্গে মেজরসুলভ কর্মদক্ষতায় নতুন দায়িত্বে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন।

আরেকজন মেজর আছে এখানে। ছাত্রাবস্থায় ফজলুল হক হলে সে আমাদের কর্মী ছিল। একবার তাকে আমরা নমিনেশনও দিয়েছিলাম হল ইউনিয়নের নির্বাচনে। অল্প ভোটের ব্যবধানে সে পরাজিত হয়। সেই ওয়াহেদ এখন এক প্রৌঢ় ব্যক্তি। পাকা দাড়ি রয়েছে মুখমণ্ডলে। আমাদের আরাম-আয়েসের দিকে সজাগ দৃষ্টি। সবসময়ই আল্লাহ্-রসুলের নাম তার মুখে। ধর্মীয় বই-পুস্তকে তার কক্ষ ভর্তি। তার এখানে আগমনের ইতিহাসে জানা গেল আমারই এলাকার অবসরপ্রাপ্ত মেজর জয়নুল আবেদীনের পাল্লায় পড়ে তার ইসলামিক উম্মাহ্ কর্পোরেশনের ঘাপলায় বৃদ্ধ বয়সে কারাগারে আটকে রয়েছে।

সর্ব পশ্চিম রুমে রয়েছে নাইজেরীয় অধিবাসী রবার্ট ব্লাকসন মাকাফো, বর্তমানে মুসলিম ধর্মে দীক্ষিত। আমেরিকান মহিলা এলিয়েদার সঙ্গে মাদক পাচারে সহায়তা করার অপরাধে তার ত্রিশ বছরের কারাদণ্ড হয়ে যায়। সহায়তাকারীর এত সুদীর্ঘ শাস্তি খুব কমই পরিলক্ষিত হয়। পেশায় একজন সঙ্গীতজ্ঞ, তরুণ বয়েসী এই যুবকটিকে দেখলে কষ্ট হয়। সে মাছ-মাংস খায় না। পূর্ণ নিরামিশাষী একজন যুবক কী করে এত সুন্দর স্বাস্থ্যের অধিকারী হতে পারে, রবার্টকে না দেখলে হৃদয়ঙ্গম হবে না। দিনের মধ্যে কয়েকবার সে ইসলামি কায়দায় আমাকে সালাম জানায়। যুবকটির জন্য কষ্ট হয়। তার মামলার মূল আসামি মিস এলিয়েদা মার্কিন সরকারের প্রচেষ্টায় ক্ষমা পেয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করল। আর অপেক্ষাকৃত গরিব এবং কালো দেশের অধিবাসী রবার্ট এখনও জেলখানার যাঁতাকলে ধুঁকছে!

এমনি অনেক মানুষ এখানে বছরের পর বছর জীবনপাত করে যাচ্ছে। ভিতরে যখন আসি, এদের কত না দরদ দেখাই। কিন্তু বন্দিত্ব ঘুচে গেলে দেয়ালের বাইরের জীবন এমনি করে আমাদের আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলে। অন্তরীণ হতভাগ্যদের কথা বিস্মৃত হতে সময় লাগে না।

'নিত্য কারাগারে'র শেষ বক্তব্য ছিল, এইসব বন্দিদের মুক্ত করার আন্দোলনে অধিকতর সক্রিয় অংশগ্রহণের শপথ উচ্চারণ করে বাইরের পৃথিবীতে পা রাখলাম। সময়টা ছিল পাকিস্তানের শেষ পর্যায়। শেখ সাহেব এবং আরও অনেক সহকর্মী তখন কারাগারে। বাইরে রাজনৈতিক আবহাওয়া তখন ক্রমান্বয়ে উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। পশ্চিম পাকিস্তানিরা মনে করেছিল ৬ দফা আন্দোলনকে জেল-জুলুমের মাধ্যমে দমন করা যাবে। কিন্তু বাস্তবে সমগ্র পূর্ব

পাকিস্তান ক্রমান্বয়ে অগ্নিকুণ্ড হয়ে উঠল। অনেক নেতৃবৃন্দের অন্তরীণ থাকার পরেও সেদিনের পূর্ব পাকিস্তানের মানুষদের মধ্যে আমরা এক দুর্বার আন্দোলনের ঢেউ ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হলাম।

জেল থেকে মুক্ত হবার পর একটি দিনও নষ্ট করিনি। জীবনের কাছে আমার পরিতাপের কিছু নেই। প্রতিটি মুহূর্ত দেশ ও জাতির কল্যাণে একের পর এক কর্মসূচি নিয়ে উল্কার মতো ছুটে বেড়িয়েছি পথে-প্রান্তরে। বাংলার এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে। তখন আইন-ব্যবসায় শুরু করেছি। ছাত্রদের সব মামলাই কোন না কোনভাবে ঘাড়ে এসে পড়ে—নিজেও ওদের সাথে কয়েকটিতে আসামি। শুধু আইনজীবী হয়ে ওদের জন্য কোর্টে ওকালতি করলেই হবে না, ওদের ছোটখাটো প্রয়োজনের দিকেও লক্ষ্য রাখতে হয়।

শেখ ফজলুল হক মণি ছিল ছাত্রলীগের আমার সময়কার সাধারণ সম্পাদক এবং আবদুর রাজ্জাক অন্যতম সহ-সাধারণ সম্পাদক। ওরা কোর্ট-হাজতে এসে দেখা করত। বলত, এতদিন নিজের অংশের পরিশ্রম করেছেন, এখন আমাদের কাজগুলোও আপনাকেই করতে হবে। আপনি যে আমাদের বড় ভাই।

স্মিত হেসে ওদের আশ্বস্ত করতাম। ওদের অবর্তমানে কাজ শ্লথ হবে না। বাংলার মানুষের মুক্তির সংগ্রামে প্রারম্ভিক কাজ শুরু হয়ে গেছে।

সে সময়ের ছাত্রসমাজ দারুণ কাজ করেছে। ছাত্রদের চার নেতা নূরে আলম সিদ্দিকী, শাহজাহান সিরাজ, আ. স. ম. আব্দুর রব ও আব্দুল কুদ্দুস মাখনের নেতৃত্বে গোটা ছাত্রসমাজ ধাপে ধাপে স্বাধীনতা সংগ্রামের দিকে এগিয়ে গেছে।

আমি ইতিহাস লিখতে বসিনি—সেটা লিখবেন ওঁরা, যাঁরা গবেষণা করবেন। আমি লিখতে এসেছি জীবন ও সংগ্রামকে এক গ্রন্থিতে আবদ্ধ করতে। এ সময় আমার জীবনে কয়েকটি ঘটনা ঘটে গেল যাকে কোন অবস্থায়ই উপেক্ষা করা যায় না।

আমার এক খালাত ভাই ছিল। ডাক নাম হীরা। সত্যিকারের একটি হীরা। যেমন রূপ, তেমন স্বাস্থ্য। খেলাধুলা, ব্যায়াম, সাঁতারে জেলার মধ্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। আমাদের দু'জনের ভাব ছিল ভাইয়ের মতো নয়, বন্ধুর মতো। সকলে আমাদের 'মানিকজোড়' বলে ডাকত। হীরা-মোয়াজ্জেম একত্রে উচ্চারিত হত আত্মীয়মহলে। সে বেশি লেখাপড়া করেনি—অল্প বয়সেই কর্মজীবনে প্রবেশ করেছিল। ঢাকার বিখ্যাত আসবাবপত্রের প্রতিষ্ঠান মডার্ন ফার্নিসার্সে

কাজ করত। আমি ওকালতি আরম্ভ করায় সে আমার চেম্বার সাজিয়ে দিল আসবাবপত্র দিয়ে। হীরার দেওয়া সেক্রেটারিয়েট টেবলটি আজও অক্ষত অবস্থায় আমার আবাসগৃহের অফিসঘরে ব্যবহৃত হচ্ছে। সবকিছুরই পরিবর্তন হয়েছে, কেবল সেই টেবিলটি ছাড়া। বাকি জীবনে ওটা পাল্টাবেও না, ওটা যে হীরার স্মৃতি।

আমি জেল থেকে বের হবার কিছুদিনের মধ্যে হবিগঞ্জে ওদের পৈতৃক বাড়িতে বসন্ত রোগে হীরা চিরদিনের জন্য হারিয়ে গেল, আমার জীবনে প্রথম উপলব্ধিতে সবচাইতে বড় শোক ছিল হীরার মৃত্যু।

ক'দিনের মধ্যে দ্বিতীয় বারের মতো আমিও আক্রান্ত হলাম ভয়াবহ বসন্ত রোগে। প্রথম বার হয়েছিল শৈশবকালে। সবাই ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। তবে কি মানিকজোড়ের একজন আর একজনকে ডেকে নিয়ে যাবে! আত্মীয়স্বজন চিন্তান্বিত হয়ে পড়ল। ছোটবেলায় মাকে হারিয়েছি, কলেজে পড়াকালীন পিতৃহীন হয়েছি, নানী পেলেছিলেন। তিনিও আমার কলেজ জীবনেই ইন্তেকাল করেন। ছোট মামা ও বড় দার অবিমিশ্র স্নেহ-মমতায় বড় হয়েছি। তাঁরা দু'জনই প্রায় পাগলের মতো হয়ে গেলেন। বড় দার এক বন্ধু ছিলেন মিয়া মফিজউদ্দীন, আমাকে বড় ভাইয়ের মতোই প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতেন। সব আবদার-উপদ্রপ হাসিমুখে সহ্য করতেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সাহসী পুরুষ— একজন সমাজ-কর্মী এবং নিজ এলাকার ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান। তিনি দায়িত্ব নিলেন আমার শুশ্রূষার। দিন-রাত চব্বিশ ঘণ্টা তিনি আমার শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্ট। মানুষ যেখানে ভয়ে বসন্তরোগীকে এড়িয়ে চলত, সেখানে তিনি সবসময় হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছেন আমার মুখের উপর। পরম যত্নে সবরকম পরিচর্যা করছেন নিরলস দক্ষতায়। বড় দা এমন কাণ্ড শুরু করলেন যে, চিকিৎসা-বিভ্রাট হওয়ার উপক্রম। হোমিও, অ্যালোপ্যাথি, কবিরাজি, হেকিমি, ঝাড়-ফুঁক কোন কিছুই বাদ গেল না। যে যা-ই বলে, ভয়ে রক্তশূন্য মুখে বড় দা দৌড়ন সেখানে যদি কোন নতুন অনুপান মেলে।

আল্লাহ্ তা'আলার অশেষ রহমতে সেই যাত্রা টিকে গেলাম। কিন্তু অতিরিক্ত ওষুধ সেবনে দু'বগলে বিরাট বিরাট অ্যাবসেস বা ফোঁড়া উঠল। মেডিকেল কলেজে নিয়ে অপারেশন করিয়ে কিছুটা সুস্থ হয়ে বাসায় ফেরার কয়েক দিনের মধ্যে আবার অ্যাবসেসগুলো বেরিয়ে এল। মনে হত দুনিয়ার যত ব্যথা আছে—তার অনেকখানি আমার দু'বগলে স্থান নিয়েছে। রাত-দিন আমার চিৎকারে আশেপাশের লোকজন অস্থির। আবার অপারেশনে যেতে চাই না— তার চাইতে কড়িকাঠে ঝুলে পড়া সহজ। সে অপরিসীম ব্যথার বর্ণনার ভাষা জানা নেই।

এমনি সময়ে কেউ একজন সূত্রাপুরের হোমিওপ্যাথ ডাক্তার নূরুল ইসলামের কথা বললেন। তিনি আমাকে জানতেন। বড় দা তৎক্ষণাৎ তাঁকে

নিয়ে এলেন। তিনি একটুখানি দেখেই দু'পুরিয়া ওষুধ দিয়ে বললেন, একটা পুরিয়া এখনি খাইয়ে দেন। প্রয়োজন হলে দ্বিতীয়টা দেবেন। তবে মনে হয় প্রয়োজন হবে না।

বিশ্বাস করতে মন চায় না, তবুও ওষুধ খেলাম। আমার অসুস্থতার পর থেকেই আমার সৎ-মা আমার বাসায় আছেন—প্রাণ দিয়ে পরিচর্যা করে যাচ্ছেন। রাতে আমার চিৎকারে তিনিও ঘুমোতে পারেন না। ওষুধ সেবনের পর কখন ঘুমিয়ে পড়েছি, কখন হাত দুটি সোজা হয়ে গেছে, চিৎকার বন্ধ হয়ে গেছে জানি না। আমাকে ঘুমোতে দেখে বাতি নিভিয়ে তিনি অনেকদিন পর আমার বিছানার পাশেই আঁচল বিছিয়ে শুয়ে পড়েছেন।

অনেক রাতে ঘুম ভেঙে গেলে অনুভব করি দু'বগল থেকে অনেক রক্ত-পুঁজ বের হয়ে বিছানা ভেসে গেছে।

সবাইকে ডাকলাম। বাতি জ্বালাতে দেখা গেল—অ্যাবসেসগুলো ফেটে সব গলিজ বের হয়ে গেছে। আমার আর ব্যথা নেই। সবকিছুর উপশম হয়েছে। এক পুরিয়া ওষুধেই বাজিমাত। সুস্থ হয়ে উঠলাম। সেই থেকে আমি হোমিওপ্যাথির একজন প্রথম শ্রেণীর ভক্ত।

অসুস্থতা সেরে ওঠার মুখে একদিন শুনলাম পাশের ঘরে পারিবারিক হাইকমান্ডের মন্ত্রণা-সভা বসেছে—আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে। এভাবে ছন্নছাড়ার জীবন আর কতদিন কাটবে? সারাটা জীবন একভাবে কাটল। মাঝে মাঝেই জেলে যাবে। অসুখ হলে কে দেখবে ঠিক নেই। এখন তো রোজগার মন্দ করছে না। তবে সংসারী হতে বাধা কোথায়? এ ধরনের শক্ত বক্তব্য শোনা যাচ্ছিল।

ছোট বোনের বর মানিক এসে রায় ঘোষণা করল, সকলের সম্মিলিত অভিমত, তোমাকে বিয়ে করতে হবে।

সে ছিল আমার খালাত ভাই এবং বয়সে বড়। আগে তুই-তোকারি করত। কিন্তু আমার ছোট বোনের সঙ্গে বিয়ে হওয়ার পর ফ্যাসাদ বাঁধল—কে মুরুব্বী? আমি, না সে? শেষ পর্যন্ত রফা হল, আমি আপনি থেকে নেমে তুমিতে আসব। সেও তুই-তোকারি থেকে তুমিতে উঠে আসবে। তবে ছোট বোনের অগ্রজ হিসাবে সালাম অগ্রে আমার প্রাপ্য। মানিকও আজ জীবিত নেই। বিরাট পালোয়ানি শরীর আর রাজপুত্রের মতো চেহারা ছিল তার। পঞ্চান্ন বছর বয়সে ডায়াবেটিস রোগে অকালেই ঝরে গেছে মানিক—আমাদের মানিক।

পারিবারিক সুপ্রিমকোর্টের সর্বসম্মত রায়কে আর উপেক্ষা করতে পারলাম না। বললাম, তোমরা যা ভালো মনে করো ব্যবস্থা করো। আমার আর অমত নেই।

অনেক দিনের চেষ্টার পর সম্মতি পেয়ে তাঁরা খুশি হলেন এবং ভাবীকে পাঠালেন আমার কোন পছন্দ আছে কিনা তা জানার জন্য। তাঁদের ভাবনা ছিল, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজের নেতৃত্ব দিতে গিয়ে অনেক মেয়ের সঙ্গে মিশেছি—কাউকে ভালো লাগতেও পারে।

ভাবীকে আশ্বস্ত করলাম, তেমন কেউ নেই। তোমরা যার গলায় আমাকে বেঁধে দেবে, তার গলাতেই আমি পরমানন্দে ঝুলতে থাকব। তবে গলাটা একটু শক্ত-সমর্থ হওয়া বাঞ্ছনীয়। আমার মতো একজন বাউণ্ডুলেকে ঘরমুখো করা যার-তার কর্ম নয়।

ওরা সবাই লেগে গেল কনে খুঁজতে। সবচাইতে বেশি উৎসাহ ছোট বোন ফনুর। কাউকেই তার মনে ধরে না। কেউ বেশি লম্বা, কেউ বেঁটে, কেউ চিকন, কেউ কালো আর কেউবা বেশি ফরসা—সবকিছু মিলিয়ে ওর আর পছন্দ হয় না। একটাই বোন—তার পছন্দ-অপছন্দের মূল্য আছে বৈকি!

এর মধ্যে আমার মামাত ভাই ছোটবেলার সহপাঠী এবং খেলার সাথী তারা দা একটি প্রস্তাব নিয়ে এল। তার পাশের বাসায় বিএ পরীক্ষা দিয়েছে একটি সুলক্ষণা—তার ভাষায় সর্বগুণান্বিতা মেয়ে রয়েছে—সেখানে দেখা যেতে পারে।

এর মধ্যে আমার কোন ভূমিকা নেই। সুস্থ হয়ে রাজনীতি আর ওকালতি দুটোই চালাচ্ছি। তারা দার বউ পছন্দ থেকে শুরু করে তার বিয়েতে খাটাখাটুনি আমিই করেছিলাম। তাই ভাবী আমাকে একটু বেশি খাতির করে। মাঝে মাঝে দু'জনে আমার ব্যাচেলার আস্তানায় হানা দেয়। প্রায়ই আমাকে তাদের ওখানে দাওয়াত করে। কিন্তু অসামাজিক জীব আমি নিমন্ত্রণ রক্ষা করে উঠতে পারি না। সেবার রোজা পড়তেই ভাবী ইফতারের দাওয়াত দিল এবং কবুল করিয়ে নিল।

গেলাম। ইফতারের একটু দেরি থাকায় তাদের খোলা ছাদে দাঁড়িয়েছি। দেখতে পেলাম পাশের বাসায় একটি অনিন্দ্যসুন্দর খুব ফরসা স্বাস্থ্যবতী মেয়ে নিচের পানির কলে একমনে অযু করছে। দৃশ্যটা চোখে লেগে রইল।

একটু পরে ইফতারের ডাক আসায় খাওয়ার ঘরে ঢুকে দেখি সেই মেয়েটি এবং তার আরও কয়েকজন ভাই-বোন আমন্ত্রিত। ভাবী পরিচয় করিয়ে দিতে সকলেই সালাম দিল। ভাবী বললেন, এটি আমার দেওর। স্বনামধন্য শাহ্ সাহেব, যার বক্তৃতা নিশ্চয়ই শুনেছিস এবং যার অন্যসব কথা আমার কাছে শুনেছিস। আর এ হল আমার বান্ধবী সালেহা। এবার বিএ দিয়েছে। এরা ওর ভাই-বোন।

ভাবীর বান্ধবী তাই ঠাট্টা করে জিজ্ঞেস করলাম, বাংলা বিয়ে, না ইংরেজি বিএ?

সকলেই হেসে উঠল। ভাবীও ছাড়বার পাত্রী নন। বলল, দুশ্চিন্তার কারণ নেই। বিএ পরীক্ষা দিয়েছে। ভালোভাবেই পাস করবে দেখে নিও।

সালেহার ভাই-বোনেরা হাসিমুখে বসেছিল। খাবার কেউ নিজ থেকে তুলে নিচ্ছিল না। তাদের বড় বোন বান্ধবীকে সাহায্য করার জন্য সকলের প্লেটে খাবার তুলে দিচ্ছিল। কেউ কোন সোরগোল না করে বড় বোনের সুশৃঙ্খল ব্যবস্থায় চুপচাপ ইফতার করে যাচ্ছিল।

সবচাইতে ছোট ও চোখে-মুখে হাজারো চঞ্চলতা নিয়ে যে ফুটফুটে মেয়েটি বড় বোনের গা ঘেঁষে বসে পিটপিট করে আমার দিকে তাকাচ্ছিল, তাকে ডেকে এনে কাছে বসলাম।

নাম কী তোমার?

আমার নাম ডেইজী।

বড় বোন সঙ্গে সঙ্গে মনে করিয়ে দিল, ভালো নাম বলো।

বলল, নাইয়ার সুলতানা।

বললাম, তুমি যত সুন্দর, তোমার নামও তত সুন্দর। তুমি যাবে আমার সঙ্গে?

বড় বোন বলে দিল, তুমি ওনাকে আমাদের বাসায় আসতে বলো। তারপর বাবা-মা বললে নিশ্চয়ই যাবে।

খুব ভালো লাগল একটি মার্জিত পরিবারের ছেলে-মেয়েদের ভদ্র ও নম্র ব্যবহার। ওরা বিদায় নিয়ে চলে গেলে শুনলাম একসময়ের মেদিনীপুরের এক প্রখ্যাত জমিদারের নাতি-নাতনি ওরা। ওদের দাদী নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর আত্মীয়।

শুনে ঔৎসুক্য আরও বৃদ্ধি পেল। ভাবী জিজ্ঞেস করল, কী, আমার বান্ধবীকে পছন্দ হল?

আমি কিছু বুঝতে না পেয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তার মানে? এমন মেয়েকে অপছন্দের কী আছে!

ভাবী তখন খুলে বলল, শীঘ্রই এই মেয়েকে সবাই আনুষ্ঠানিকভাবে তোমার জন্য দেখতে আসবে। আমার বান্ধবী তো! তাই আগেই ইফতারের দাওয়াত দিয়ে তোমাকে দেখিয়ে দিলাম। পরে আর আমাকে খোঁটা দিতে পারবে না।

সবই বুঝলাম। মনে মনে ভাবীকে ধন্যবাদ দিলাম। ভাবলাম এখানে হলে মন্দ হয় না।

দু'দিনের মধ্যেই ফনু দলবল নিয়ে উপস্থিত। আনন্দ আর ধরে না। এতদিনে সে সবদিক মিলিয়ে কাউকে পছন্দ করতে পেরেছে। এ মেয়েকে ভাবী ডাকতে তার কোন কুণ্ঠা হবে না।

ছোট দা, আপনি আর অমত করবেন না—আমরা তারিখ ঠিক করি।

বললাম, তথাস্তু।

বিয়ে হয়ে গেল '৬৮ সালের ৪ঠা অগাস্ট। শুরু হল আর এক নতুন জীবন।

একসময় ভাবতাম সংসারের যাঁতাকলে জড়াব না। কিন্তু মানুষ যা-ই ভাবুক না কেন, উপরে একজন আছেন যিনি অলক্ষ্যে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেন।

আমার দু'শ্যালিকা ডেইজী এবং শেলী কনের সঙ্গে এসেছিল বিয়ের রাতে।

গাড়িতে বসে ওদেরকে বললাম, বাজারে সওদা করতে গেলে ফাও পাওয়া যায়—তোমরা দু'জন আমার ফাও গিন্নি।

ওরা ঘোরতর আপত্তি জানাতে থাকল। ওরা বলল, কপালে হাত বুলান। যাকে পেয়েছেন, নিজের ভাগ্যকে সাধুবাদ দিন। আর ফাও তালাশ করতে হবে না।

এ দুটি মেয়েই পরবর্তী জীবনে অনেক প্রীতি-ভালোবাসায় আমাকে অনুক্ষণ আবদ্ধ করে রেখেছিল।

সালেহার কাছে শুনলাম ওদের পরিবার এ বিয়েতে বিশেষ আগ্রহী ছিল না। কেবল ওর একান্ত ইচ্ছাকেই তারা সম্মান দিয়েছে। আমার জীবনের বিভিন্ন কাহিনী বান্ধবীর কাছে শুনে শুনে সে আমার প্রতি একধরনের সহানুভূতি অনুভব করে। ভাবীও নিশ্চয়ই একটি উদ্দেশ্য নিয়েই বান্ধবীর কাছে তার দেবরের নানা কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করেছে। তার মনকে দ্রবীভূত করার মানসেই। অধিকন্তু সালেহা কয়েকবার বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় আমার বক্তৃতা শুনেছে। তখন নাকি আগুন-ঝরা বক্তৃতা করতাম। তাতে ও আরও আকৃষ্ট হয়েছে। বাড়িতে জানিয়েছে এখানেই বিয়ে ঠিক করতে।

তার অভিভাবকেরা অনেক বুঝিয়েছে, জেলখাটা ছেলে, রাজনীতি করে, তেমন চালচুলো নেই—পরে কিন্তু বিপদ হলে আমাদের কাছে এসে দাঁড়াতে পারবে না।

সালেহা অটল থেকেছে—তার সঙ্কল্প থেকে কেউ তাকে টলাতে পারেনি। অভিভাবকরা এমন সন্দেহ করেছে, মেয়ে কলেজে পড়ে, কী জানি গোপনে প্রেম-ট্রেম করে কিনা।

বস্তুত রাজনীতি ও জেলখাটার নাম-ডাক ছাড়া সালেহার মতো মেয়ের সাথে বিয়ে হওয়ার অন্য কোন যোগ্যতা আমার ছিল না। কেবল তার জেদের কাছেই সবাই বশীভূত হয়েছে।

সারাটা জীবন ও ভুগেছে অনেক। তবে হায় আফসোস নেই। আমরা যা চেয়েছি, তা-ই পেয়েছি। রানা-দিনা আমাদের জীবনে পূর্ণতা দিয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলার আশীর্বাদরূপে ওদের পেয়েছি। We had our ration with love and passion.

আমরা আমাদের প্রথম বিবাহ-বার্ষিকী পালন করলাম কোলে রানাকে নিয়ে। আমি বলতাম, ছেলে চাই। ছেলে না হলে তোমাকে পিত্রালয়ে ফেরত পাঠিয়ে দেব।

সালেহা সর্বান্তঃকরণে চাইত আমাদের মেয়ে হোক। আমিই জিতে গেলাম। প্রথম পুত্রসন্তানের জন্মে অপরিমেয় আনন্দ লাভ করলাম। সালেহা কয়েকদিন মন-ভার করে থাকলেও অচিরেই আমরা ছেলেকে নিয়ে অফুরন্ত আনন্দ-সাগরে ভাসতে থাকলাম।

এদিকে সেদিনের পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক আকাশ ক্রমান্বয়ে মেঘাচ্ছন্ন

হয়ে উঠছিল। সর্বত্র আন্দোলন আর আন্দোলন। ছাত্র, যুবক, কৃষক, শ্রমিক, সরকারি কর্মচারী, ব্যবসায়ী প্রায় সকল শ্রেণীর মানুষ সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল তাদের দাবির সমর্থনে। স্ব-স্ব গোষ্ঠীর দাবিকে ছাড়িয়ে চিরন্তন এবং সর্ববাদী দাবি পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন বা মুক্তির সপক্ষে দ্রুত জনমত গড়ে উঠছিল।

অনেকদিন আগে শ্রদ্ধেয় নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে যখন ঢাকা এসেছিলেন, সেদিন সমগ্র ছাত্রসমাজ বিমানবন্দরে তাঁকে এক ঐতিহাসিক সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেছিল। সেদিন তফাজ্জল হোসেন মানিক ভাইকে আমরা ক'জন ছাত্রনেতা একান্তে জিজ্ঞেস করেছিলাম এই স্বায়ত্তশাসনের দাবি আর কতদিন?

তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় জবাব দিয়েছিলেন, যা inevitable তা ঘটবেই। তার জন্য প্রস্তুতি নাও।

অনেক আগে থেকে শুধু প্রস্তুতিই নয়, কার্যক্রমও শুরু করেছিলাম। শেখ মুজিব নিজহাতে মুসাবিদা করে নিজে প্যাডেল চালিয়ে পূর্ব বাংলার স্বাধীনতার সপক্ষে যে লিফলেট ছেপে আনতেন তা গভীর রাতে দ্রুতগামী সাইকেলে চড়ে আমি, মণি, সিরাজুল আলম খান ও ফরিদপুরের আনিস সেগুলো বিলি করতাম। ধরা পড়লে নিশ্চিত মৃত্যুদণ্ড জেনেও ছাত্রাবস্থাতেই এ কাজ করেছি।

আজ যখন স্বাধীনতার অনেক অনেক ইতিহাস পড়ি—মনে মনে ভাবি, এরা অনেকেই ছিল অনেক দূরে। এদের গায়ে আগুনের কোন উত্তাপই স্পর্শ করেনি। কেউ কেউ সেদিন অস্ত্রহাতে যুদ্ধ করতে নেমে যেন বিশ্বজয় করে ফেলেছে। এ স্বাধীনতার লড়াই কেমন করে কোথা থেকে ক্রমান্বয়ে এগিয়ে যায় তার সঠিক মূল্যায়ন কখনও হবে না। কেননা, তার কোন দলিল নেই। যে যখন যা লিখবে—সে তার নিজের ধ্যান-ধারণা মতেই লিপিবদ্ধ করবে। তা-ই পূর্বাহ্নেই বলেছিলাম, ইতিহাস নয়, জীবন ও তার সংগ্রামকে যেভাবে দেখেছি লিখে যাব। কারো ভালো লাগল কি লাগল না তাতে কিছু আসে-যায় না। সত্য কথা, উচিত-বাক্য চিরকালই অন্যের মনোব্যথার কারণ। এটাই স্বাভাবিক।

অনেক নেতার ভিড়ে একটি সাহসী কণ্ঠস্বর তাঁর আপসহীন মনোভাব আর দেশ ও দেশের মানুষের জন্য অকৃত্রিম ভালোবাসা নিয়ে ত্যাগ-তিতিক্ষার পথে যখন যাত্রা শুরু করলেন তখন বিধাতাও তাঁর হাত উজাড় করে তাঁকে বরমাল্য দিলেন। যেখানে শেখ সাহেব ছিলেন আওয়ামী লীগের সভাপতি—একটি দলের নেতা, সেখানে শাসকগোষ্ঠি অচিরেই তাঁকে জাতীয় নেতায় রূপান্তরিত হতে সাহায্য করল। তিনি এক জেলায় সভা করতে গেলে তাঁকে গ্রেপ্তার করা শুরু হল—প্রচণ্ড জনসমর্থনের কারণে ম্যাজিস্ট্রেট তাঁকে জামিন দিতে বাধ্য হয়। পরের দিন অন্য জেলায় গেলে সেখানেও তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। আবার জামিন। আবার তাঁর জয়জয়কার। প্রায় সব জায়গাতেই একই নাটক অভিনীত

হতে থাকল আর বৃদ্ধি পেতে থাকল তাঁর জনপ্রিয়তা গাণিতিক হারে। রেলের কামরায় তাঁর হাতে হাতকড়া লাগানো ছবি পত্রিকায় ছাপা হল—দলমত নির্বিশেষে সকল মানুষের সবটুকু সহানুভূতি জমা হতে লাগল তাঁরই সপক্ষে। গণবিরোধী সরকার তাঁকে বারবার আটক করে শাস্তি দিতে চায়। আল্লাহ্‌র ইচ্ছা অন্যরকম। তিনি তাঁকে মানুষের আরও প্রিয়, আরও সমাদৃত করে দেন।

এর মাঝে দেশের অভ্যন্তরীণ অবস্থা আরও শোচনীয় আকার ধারণ করল। মানুষ হন্যে হয়ে উঠেছে একটা কিছুর জন্য। কী সেটা? একটা লড়াই চাই। চারদিকে আওয়াজ—লড়াই করে বাঁচতে চাই। সে লড়াইটি হবে সর্বাত্মক লড়াই। দুই শত বছর ইংরেজের পরাধীনতা। তারপর দুই যুগ পশ্চিম পাকিস্তানিদের গোলামির হাত থেকে বাংলার মানুষ এবার নিস্তার চায়—চিরতরে। ঘরে ঘরে তারই প্রস্তুতি।

এমনি ডামাডোলের মাঝখানে সরকার আর একটা মারাত্মক ভুল পদক্ষেপ গ্রহণ করল। শেখ মুজিবকে অন্য কোনভাবে পর্যুদস্ত করতে না পেরে ওরা ষড়যন্ত্র মামলা তৈরি করল। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা। কিছুসংখ্যক বাঙালি সেনা-সদস্যকে জড়িত করে দেশের বিরুদ্ধে একে বিরাট ষড়যন্ত্র বলে চালাবার প্রয়াস পেল। জনাব রুহুল কুদ্দুস, সার্জেন্ট জহিরুল হক, আহম্মেদ ফজলুর রহমান, কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন, ফ্লাইট সার্জেন্ট ফজলুল হক, স্টুয়ার্ড মুজিব প্রভৃতিকে সহআসামি করে বিরাট করে মামলা সাজাল ওরা। এই স্টুয়ার্ড মুজিবকে স্বাধীনতার পরবর্তীকালে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিল। আওয়ামী লীগের একজন প্রভাবশালী নেতাকে তখন সবাই সন্দেহের চোখে দেখত।

পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ ততদিনে মনস্থির করে ফেলেছে, তারা এসব গাল-ভরা বস্তাপচা বক্তব্যে আর ভুলছে না। দু'-চার জন ছাড়া প্রায় সকলেই এই মামলাকে সাজানো বলে স্থির সিদ্ধান্তে এল। গণমানসে নতুন স্লোগান এল, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা—মিথ্যা মামলা, মানি না, মানব না।

দেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত একই ধ্বনি, একই সঙ্কল্প মানুষের। এই মামলা দিয়ে শেখ মুজিবকে ওরা বঙ্গবন্ধুতে রূপান্তরিত করল। সেদিনের সেই মামলাটি না হলে ইতিহাস হয়ত অন্যরকম হতে পারত। যা অনিবার্য তা ঘটবেই—আল্লাহ্‌ তা'আলার বিধান বদলাতে পারে না।

ওদের সময় শেষ হয়ে এসেছিল বলেই সেদিন এমনি একটি ষড়যন্ত্র মামলা সাজিয়ে শেষরক্ষার চেষ্টা করল। কিন্তু অচিরেই ওদের দিবা-স্বপ্ন ভেঙে গেল।

বাংলার মানুষই তাদের প্রিয় নেতা মুজিবকে ছাড়িয়ে এনেছিল। প্রথমদিকে অনেক হৈচৈ হল। আইনজীবীদের সাজসাজ রব পড়ে গেল। কালো কোট হলেই একবার আগরতলা মামলায় উপস্থিতি না দিলে সম্ভ্রম থাকে না। কিছু কিছু অতিউৎসাহী ব্যক্তি ইংল্যান্ডের কুইন্স কাউন্সিলার প্রখ্যাত আইনজীবী মি. উইলসনকে আনার ব্যবস্থা করে ফেলল।

আমি বঙ্গবন্ধুকে একটা চিরকুট পাঠালাম, এত আইনজীবীদের ভিড়ে আমি আসতে চাই না। আপনার মুক্তি আন্দোলন চলছে, মুক্ত মানুষ হিসাবেই আপনার দেখা পাব—সেদিন দূরে নয়। দোয়া করবেন।

আমার চিরকুট পেয়ে তিনি খুশি হয়েছিলেন এবং বলে পাঠিয়েছিলেন, ওকে কোর্টে আসতে হবে না—ও যা করছে, তা-ই করুক।

মুজিব ভাই আমাকে স্নেহ করতেন অকৃত্রিম। বহু বার তার প্রমাণ পেয়েছি। গোপালগঞ্জের ছাত্রলীগ সম্মেলনে আমার বক্তৃতার বিষয় অবগত হবার পর তিনি ছাত্রলীগের সেদিনের সভাপতি আবদুল মমিন তালুকদারের মাধ্যমে আমাকে তাঁর সেগুনবাগিচার বাসায় ডেকে নেন। সকলের সামনে বুকে জড়িয়ে ধরে বলতে থাকেন, আমার তো বয়স হচ্ছে। আর বেশিদিন দীর্ঘ বক্তৃতা করব না। আজ যেমন নেতা শহীদ সোহরাওয়ার্দী বসে থেকে আমাকে দিয়ে বক্তৃতা করান, দু'দিন পরে আমিও এমনি বসে থেকে মোয়াজ্জেমকে দিয়ে বক্তৃতা করাব। ওর জ্বালাময়ী বক্তৃতার পর দু'-চার কথা বলব। কী রে, পারবি না?

আনন্দে আপ্লুত হয়ে বললাম, আপনি দোয়া করবেন।

গোপালগঞ্জের লোকেরা তাঁকে কি বলেছিল জানি না। সেদিন তিনি এত খুশি হয়েছিলেন যে, আমাকে অভাবিতভাবে অনেকগুলো টাকা পকেটে গুঁজে দিলেন। বললেন, খাওয়া-দাওয়ার দিকে খেয়াল রাখবি। আর আজ থেকে সরাসরি আমার কাছে চলে আসবি। তোকে আর কারো মাধ্যমে আসতে হবে না।

সেদিন থেকে তিনি হলেন নেতা, বড় ভাই এবং অভিভাবক। তাঁর শাহাদাতের দিন পর্যন্ত এ সম্পর্কই বজায় ছিল। প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে যতবার তাঁর কাছে গিয়েছি, কাছে ডেকে পিঠে হাত রেখে জিজ্ঞেস করতেন, কী রে, কী খবর?

যখন কাজে যেতাম, বলতাম। আবার অনেক সময় এমনিতেও যেতাম। তাঁর সান্নিধ্য ভালো লাগত। তাঁর ছিল অমোঘ-আকর্ষণীয় শক্তি— যা বারবার কাছে টানত। আমরা ছিলাম অনেকটা মন্ত্রমুগ্ধ। Personal charisma যাকে বলে, তা ছিল তুলনাহীন। আমরা ছিলাম অন্ধভক্ত—মুজিবঅন্ত প্রাণ। মানুষকে খুব সহজে আপন করে নিতে পারতেন তিনি। সবসময় ভাবতাম, তাঁর স্নেহ পেয়েছি। আর আমাকে পায় কে? রাজনীতিতে কেবল যোগ্যতাই কাজ করে তা নয়, প্রকৃত মুরুব্বীও দরকার। দরকার Friend, philosopher and guide. আমি তা পেয়েছি, আমার আর আনন্দ ধরে না।

খোদ মুজিব ভাইয়ের কাছে শুনেছি শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মতো নেতা না পেলে তিনি জীবনে এমনি করে উঠে আসতে পারতেন না। তিনি অকপটে বলেছেন, শহীদ সাহেবের সঙ্গে প্রথম পরিচয় তিনি যখন গোপালগঞ্জে জনসভা করতে আসেন। তখন হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রাধান্য। কংগ্রেসিরা তাঁর জনসভায় গোলমাল করবে। আমি তখন রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত নই। ডায়াসের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে সব দেখছি। হঠাৎ এক প্রান্ত থেকে নেতার বিরুদ্ধে স্লোগান

দিতে দিতে এক দল লোক সভাকে পণ্ড করার জন্য মঞ্চের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। এ কী অন্যায়, ওরা একজন মুসলমান নেতাকে সভা করতে দেবে না? কয়েকজন বন্ধু নিয়ে হাতের কাছে যা পেলাম তা-ই নিয়ে প্রতিরোধ করতে এগিয়ে গেলাম। পাল্টা ধাওয়া খেয়ে ওরা পালিয়ে যেতে বাধ্য হল। কাজ শেষ করে ডায়াসের সামনে দাঁড়িয়ে আছি—নেতা হাত-ইশারায় আমাকে মঞ্চে ডাকলেন। মঞ্চে যেতেই তিনি গায়ে সস্নেহ হাত রেখে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কী?

বললাম।

তিনি বললেন, তুমি মুসলিম লীগ করো?

বললাম, না স্যার। লীগ-ফীগ বুঝি না।

তবে তুমি ওদের ঠেকাতে গেলে কেন?

স্যার, ওরা হিন্দু। আপনি মুসলমান, আপনি বক্তৃতা করবেন—ওদের ভালো না লাগলে ওরা আসবে না। আপনার সভা ভাঙবে কেন? তাই ওদের ভাগিয়ে দিলাম।

শুনে শহীদ সাহেদ খুব প্রীত হলেন। তাঁর নোটবুক বের করে আমার নাম-ধাম লিখে রাখলেন।

তুমি কী পড়ছ?

এবার এনট্রান্স দেব।

তুমি পরীক্ষার পর কলকাতায় এই ঠিকানায় আমার সঙ্গে দেখা করবে।

পরীক্ষার পর দেখা করতে গেলাম। ভয় ছিল হয়ত চিনতেই পারবেন না। তিনি খুব ভালো করে চিনলেন, হৃদয়ে স্থান দিলেন, দলে টেনে নিলেন এবং আস্তে আস্তে যাদুমন্ত্রে সেদিনের ডানপিটে মুজিবরকে আজকের মুজিবে রূপান্তরিত করলেন। তিনি ছিলেন স্পর্শমণি। যা ছুঁতেন তা-ই সোনা হয়ে যেত। তাঁর হাতে না পড়লে গোপালগঞ্জে মস্তান-টস্তান হয়েই জীবন শেষ হত—তোরা এই মুজিব ভাইকে পেতি না।

কথাগুলো বলে আবেগে তিনি নেতার স্মরণে চোখ বন্ধ করে ফেললেন—আমরা চুপচাপ উঠে এলাম।

এমনি সঘন এবং মধুর সম্পর্ক যাঁর সাথে, তাঁর সঙ্গে কোথায় যেন তার কেটে গেল ছাত্রলীগের সভাপতির পদ থেকে বিদায় নেওয়ার পর। বিষয়টি আজও আমি বুঝতে অক্ষম। অবশ্য কিছু কিছু কথা শুনেছিলাম, কিন্তু বিশ্বাস করতে মন প্রস্তুত ছিল না। ছাত্রাবস্থায় তাঁর বাসায় গেলে ভাবীকে বলতেন, ওকে দু'পয়সা দামের চা দিও না। পাঁজিটা হয়ত সারাদিন ভাত না খেয়েই চরকির মতো ঘুরে বেড়াবে—ওকে ভাত খাইয়ে দাও।

কখনও ভাবী বলতেন, এখনও তরকারি নামেনি।

তিনি বলতেন, কিছুটা মাখন আর একটা ডিম ভেজে ওকে খাইয়ে দাও—ও কি সারা দিনে আর খাবে!

এত স্নেহ, এত ভালোবাসা কোথায় গেল! আমার কি কোন দোষ পরিলক্ষিত হয়েছিল! অগোচরেও কি করে ফেলেছি কোন অপরাধ! না, কোনটাই নয়! সবই ললাট-লিখন বা এমন ঘটনা যার জন্য অন্তত আমি দায়ী নই।

নেতাদের অনেক গুণের মধ্যে কিছু ক্রটিও যে না থাকে, তা নয়। মানুষ দোষ-গুণের ঊর্ধ্বে নয়। যারা একনায়ক, তাদের ভিতরে একনায়কসুলভ গুণ যেমন থাকে; তাদের কিছু কিছু মারাত্মক ক্রটিও পরিলক্ষিত হয়। কেউ কেউ অন্যকে নিজের হাঁটুর ওপর উঠতে দিতে চায় না। আমিও কি এমনি কোনকিছুর শিকার?

সেবার যখন নেতৃবৃন্দের সফরসূচি তৈরি হল মাদারে মিল্লাতের নির্বাচনী প্রচারণার জন্য; তিনি বললেন, গোপালগঞ্জ জেলায় আমি প্রত্যন্ত অঞ্চলে যাব পনেরো দিনের জন্য। আমার সঙ্গে কেবল মোয়াজ্জেম যাবে। আর কাউকে প্রয়োজন নেই।

দুটি বড় নৌকায় আমাদের সেবারে দু'সপ্তাহ কেটেছিল যারপরনাই আনন্দে। একটিতে তিনি এবং তাঁর পাশে আমার বিছানা। অন্যটিতে রানাবান্না, সাংবাদিক এবং কর্মীদের জায়গা। পনেরো দিনের নিবিড় সান্নিধ্যে তাঁকে আরও গভীরভাবে জানার সুযোগ হল। ভালোবাসলাম গভীরতর। গড়ে প্রতিদিন পাঁচ-সাতটা ছোটখাটো জনসভা। বিকেলে এক-একটা বিরাট জনসভা থাকত। তিনি আমাকে যতটা খুশি বক্তৃতা করতে বলতেন। অবশ্য মাঝে মাঝে যখন খুব জমে গেছে বক্তৃতা, তিনি হঠাৎ বলতেন, এবার শেষ কর।

আমি সঙ্গে সঙ্গে যবনিকা টানতাম। মানুষের চাহিদা থেকে যেত। লোকজন তাঁকে বলত, শাহ্ সাহেবকে দিয়ে আরও বলান।

তিনি বিচিত্র হাসি হাসতেন, নাকি অন্য কিছু? অনেক সফরেই তাঁর সঙ্গী হয়েছি। লঞ্চে-স্টিমারে তাঁর রুমেই জায়গা হয়েছে আমার। কেউ কেউ এজন্য ঈর্ষান্বিতও হতেন। কিন্তু ছাত্রজীবনের পরিসমাপ্তিতে যখন আওয়ামী লীগে যোগদান করলাম, পত্র-পত্রিকায় যখন আওয়ামী লীগের ভাবী-সাধারণ সম্পাদকরূপে আমার নাম আসতে থাকল, তখনই কিছুটা অন্যরকম দেখা গেল। আওয়ামী লীগের সম্মেলনে যখন তাজউদ্দীন সাহেবকে সম্পাদক করা হল, তখন তদানীন্তন 'দৈনিক পাকিস্তানে' খবর বেরিয়েছিল—"জনৈক তাজউদ্দীন সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন।" অনেকদিন পর 'ইত্তেফাক' পত্রিকার ফটোগ্রাফার মিজান ভাই আমাকে একদিন বললেন, তোমার ভাগ্যের শিকা ছিঁড়ে গেছে। তবে দোষ তোমার নয়, দোষ তোমার অনুরাগী ভক্তদের।

জিজ্ঞেস করলাম, কী রকম?

তিনি জানালেন, নয় নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীসহ দিনাজপুর যাচ্ছেন। দিনাজপুর রেলস্টেশনে যে বিশাল অভ্যর্থনার আয়োজন, তার পুরোভাগে ছিল ছাত্রসমাজ এবং তাদের প্রতিষ্ঠান ছাত্রলীগ। মাত্র কিছুদিন হল ছাত্রলীগ ছেড়ে এসেছি। শিক্ষা কমিশন বিরোধ-আন্দোলন এবং গণতান্ত্রিক

আন্দোলন—দুটি ব্যাপক ছাত্র-আন্দোলনে সফল নেতৃত্ব দিয়ে তখন আমি তাদের কাছে কিংবদন্তির নায়ক—ছাত্রসমাজে 'হট কেক'। ছাত্ররা জেনেছে নয় নেতার সঙ্গে ওদের নেতাও আসছে। রেলস্টেশন স্লোগানে স্লোগানে মুখরিত।

মুজিব ভাই, তাজউদ্দীন সাহেব প্রমুখ একটা কম্পার্টমেন্টে—মুজিব ভাই দাড়ি কামাচ্ছেন। স্লোগানের শব্দে জানতে চাইলেন কী কী স্লোগান হচ্ছে। সকলেই চায় তার নামে স্লোগান হোক। মুজিব ভাইয়ের নামে হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

কান পেতে স্লোগানগুলো শুনে তাজউদ্দীন সাহেব বললেন, দু'জন নেতা আছে, দু'জনের নামেই স্লোগান হচ্ছে।

মুজিব ভাই খুশি হলেন। জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ দুই নেতা?

কেন? নেতা তো দু'জনই—শহীদ সোহরাওয়ার্দী আর শাহ্ মোয়াজ্জেম!

মুজিব ভাই হঠাৎ দাড়ি কামানো বন্ধ করে গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন, আচ্ছা! তাই নাকি? দেখা যাবে!

মিজান ভাই বললেন, তোমার বারোটা বেজে গেল।

আমি দিনাজপুরেও যাইনি—ঘটনার বিন্দুবিসর্গও জানি না। দিনাজপুরের ছাত্রসমাজে তখন নেতা ছিল সিরাজুল ইসলাম—পরে কয়েকবার সংসদ সদস্য হয়েছে—এখন আর বেঁচে নেই। আমাকে দারুণ পছন্দ করত।

সিরাজের নেতৃত্বে ছাত্ররা তাদের নেতার নামেও স্লোগান দিচ্ছিল। ভালোবাসার সেই উচ্ছ্বাসে আর একজনের জীবনে সম্ভাবনার পথে বিপত্তি নেমে এল।

দ্বিতীয় ঘটনা, নয় নেতা যাবেন টাঙ্গাইলে জনসভা করতে। দু'দিন আগে তাঁদের অগ্রদূত হয়ে প্রাথমিক তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে গিয়েছেন ইকবাল আনসারী খান। তিনি করটিয়া কলেজে নেমে ছাত্রদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন যাতে করটিয়া দিয়ে যাওয়ার সময় নেতৃবৃন্দকে সেখানে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়।

ছাত্ররা জানতে চায় তাদের নেতা শাহ্ মোয়াজ্জেম আসবেন কিনা। ইকবাল আনসারী সাহেব বিষয়টি সহজভাবে নিয়ে জবাব দিয়েছেন, আসবে বৈকি। সকলেই আসবে।

জনসভার দিন নেতৃবৃন্দের মোটর শোভাযাত্রা করটিয়া কলেজের সামনে ছেলেরা থামিয়েছে। প্রচুর জিন্দাবাদের পর তারা তাদের মোয়াজ্জেম ভাইকে খুঁজেছে—তাঁকেও মালা দেবে। কিন্তু কোথায় সে!

ছাত্ররা মালা নিয়ে সব গাড়িতেই যখন উঁকিঝুঁকি মারছিল তখন আরোহীরা স্বভাবতই আশা করছিল তাদের কাউকেই ওরা বরণ করার জন্য খুঁজছে। যখন দেখা গেল সে আসেনি তখন ছাত্ররা জিজ্ঞেস করল, সে কোথায়?

নেতৃবৃন্দ বিরক্ত হয়ে জবাব দিলেন, সে কে? সে আসবে কেন?

আর যায় কোথায়! ছাত্ররা সবাই তরুণ—অল্পেই তারা ধৈর্য হারিয়ে ফেলে।

জবাব শুনে তাদের ক্রোধের মাত্রায় ঘৃতাহুতি পড়ল। তারা দু'-একজন নেতার সাথে হয়ত কিছুটা বচসা করে থাকবে। সম্বর্ধনা বিরূপতায় রূপ নিল।

মুজিব ভাই জানতে চাইলেন, কী হয়েছে?

তাঁকে আবার বলা হল, শাহ্ মোয়াজ্জেমকে নিয়ে আসেননি কেন? আয়োজন সব তারই জন্য।

আমার ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গেল। বিচার হয়ে সাজা হয়ে গেল— আসামি জানল না কি তার অপরাধ!

পরদিন সব শুনলাম আর নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিলাম।

ভালোবাসা কেবল আশীর্বাদই নয়। কোন কোন সময়ে তা অভিশাপও হয়ে দাঁড়ায়। ফল হল, মুজিব ভাই যেবার মওলানা তর্কবাগীশকে বিদায় দিয়ে নিজে দলের সভাপতি হলেন, সেবার সকলের প্রত্যাশা ধূলিসাৎ করে সম্পাদকমণ্ডলীতে আমার স্থান হল না। পরের বার তাঁর আটক থাকাকালীন ইডেন হোটেল প্রাঙ্গণে যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তাতে অনেক অনুরোধ করার পরও কোন বিভাগীয় সম্পাদকের পদ গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানালাম। ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য হিসাবে থাকতেই মনস্থির করলাম, পদে না থাকলেও যে কাজ করা যায় এবং একজন কর্মীর প্রাণের উদ্দীপনাকে কোন কিছুই স্তব্ধ করতে পারে না—এ সত্য সম্যক বুঝিয়ে দিতে হবে।

কাজও চলছিল একইভাবে। সমগ্র পূর্ব পাকিস্তান তখন উত্তপ্ত। এখানে হরতাল, ওখানে শ্লোগান, যত্রতত্র গোলাগুলি, চুয়াল্লিশ-ধারা ভঙ্গ, বিক্ষোভ, অফিস-আদালতে কর্মবিরতি, সভা-সমাবেশে সারাটা দেশ মেতে উঠেছে। জেল-জুলুম, হামলা, মামলা, গোলাগুলি কোনটাই সফল হল না। সমস্ত দেশ আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের অপেক্ষায়।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা গেল ভেস্তে। বিচারপতি পশ্চিম পাকিস্তানে পালিয়ে যেতে বাধ্য হল। সমস্ত অভিযুক্তদেরসহ মুজিব ভাই বীরোচিতভাবে বেরিয়ে এলেন ষড়যন্ত্র মামলার ষড়যন্ত্রকে ছিন্নভিন্ন করে। আইনের কূটচালে নয়—রাজপথে আন্দোলনের মাধ্যমেই তাঁকে সেদিন আমরা বের করে এনেছিলাম।

'৬৯ সালটি গেল উত্তাল গণআন্দোলনের বছর হিসাবে। আহত-নিহতের সংখ্যা অগণিত। সমস্ত জেলখানা রাজবন্দিতে ঠাসা। ওরা আর কতজনকে ধরবে! সারাটা দেশই যে জ্বলছে—একে নেভাবার শক্তি কারো নেই। ছাত্রসমাজের দুর্বার আন্দোলনের গতি সবকিছুকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যায়। '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান বলে চিহ্নিত হয় সময়টি—ছাত্রদের এক নেতা আসাদ নিহত হন রাজপথে। রাজধানীর আসাদ এভিনিউ তাঁরই স্মরণে নাম রাখা।

এমনি পরিবেশের মাঝখানে '৬৯-এর শেষ ভাগে দেশে নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হয়। দলের মনোনয়ন পেয়ে আমরা যখন এলাকাতে প্রচারণায় নেমেছি ঠিক সেই সময় পূর্ব পাকিস্তানের ইতিহাসের সবচাইতে ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়

দেশটাকে লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে গেল। ভয়াল জলোচ্ছ্বাসে এবং ঘূর্ণিঝড়ের মারাত্মক প্রকোপে অধিকাংশ জেলার ঘরবাড়ি ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল। ফসল নষ্ট হয়ে গেল। গৃহপালিত গবাদিপশুও প্রায় নিঃশেষ হয়ে গেল। মানুষ মারা গেল অসংখ্য। এত বড় ক্ষয়ক্ষতির নজির এদেশে কেউ দেখেনি; শোনেওনি। সারা পৃথিবীর মানুষ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল। কেবল পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার রইল নির্বিকার। ওদের মনে হল, ওটা পূর্ব পাকিস্তানের উপর দিয়ে বয়ে গেছে—ভালোই হয়েছে, ব্যাটারা শায়েস্তা হোক।

কেন্দ্রীয় সরকারের প্রায় কোন নেতাই দেখতে এল না। নামকা-ওয়াস্তে যে সাহায্য এল তা উপহাসের নামান্তর।

এই মহাপ্রলয় পূর্ব পাকিস্তানের মানুষকে আর একবার বুঝিয়ে দিল পশ্চিমারা ওদের কেউ না। নিজেদের পায়ে তাদের দাঁড়াতে হবে। স্বশাসনের অনিবার্যতা তারা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করল।

কয়েকটি জেলায় নির্বাচনের সময়সূচি পরিবর্তন করা হল। আমরা নির্বাচনী প্রচারণার পাশাপাশি দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের পাশেও গিয়ে দাঁড়ালাম যথাসাধ্য সাহায্যের হাত নিয়ে।

নমিনেশন নিয়ে কিছুটা ঝামেলা হল। আমি জানি, আমাকে জাতীয় পরিষদের জন্য মনোনয়ন দেওয়া হবে। কিন্তু দেখা গেল নির্বাচনের প্রাক্কালে কৃষক-শ্রমিক পার্টি থেকে সাবেক যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার সদস্য কফিলউদ্দীন চৌধুরী আওয়ামী লীগে যোগ দিয়ে জাতীয় পরিষদের মনোনয়ন চেয়েছেন। আমাকে অন্য কোন সিট থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা প্রস্তাব করা হল। আমি যুক্তি দেখালাম, তিনি প্রবীণ নেতা, মন্ত্রী ছিলেন, সারা জেলাতেই তাঁর পরিচিতি রয়েছে—তাঁকেই বরং অন্য সিট দেওয়া হোক।

জানতাম না নিজ আসনে মনোনয়নের প্রতিশ্রুতি নিয়েই তিনি দলে যোগ দিয়েছেন। ক্যাপ্টেন মনসুর আলী আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তাঁর শ্যালক আব্দুর রহমান বাবলু ও আমি একসঙ্গে ব্যাপটিস্ট মিশন হোস্টেলে থাকতাম। সে ছিল আমার বিশেষ বন্ধু। সেই সুবাদে রহস্য করে তিনি আমাকে 'শালাবাবু' বলে ডাকতেন। আমিও তাঁকে দুলাভাই ডাকতাম। তিনি আমাকে একান্তে ডেকে নিয়ে বললেন, প্রাদেশিক পরিষদেই দাঁড়াও। আমিও সেখানে দাঁড়াচ্ছি। কেন্দ্রে সরকার গঠন অত সহজ হবে না। পূর্ব পাকিস্তানে আমরা সহজেই সরকার গঠন করব। তখন আমি মুখ্যমন্ত্রী। তুমি আমার ক্যাবিনেটের মন্ত্রী।

বঙ্গবন্ধুও বললেন, প্রাদেশিক পরিষদের জন্য আমি কয়েকজনকে বেছে রেখেছি, তুই তাদের মধ্যে অন্যতম।

ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি একসঙ্গে দীর্ঘদিন জেলখাটা বন্ধু শামসুল হক সাহেব বোঝালেন, মন্ত্রী হওয়া ভালো, না জাতীয় পরিষদের সদস্য!

বুঝলাম, প্রাদেশিক পরিষদেই যেতে হবে। চৌধুরী সাহেব উড়ে এসে জুড়ে বসেছেন।

সমস্যা হল কোরবান আলী সাহেবকে নিয়ে। একসময় অনেক কাজ করেছেন। একদা সাংগঠনিক সম্পাদক ছিলেন দলের। সরকারের হুইপও হয়েছিলেন। কিন্তু নানা কারণে তিনি যেমন দলের নেতা-কর্মীদের নিকট, তেমনি এলাকার জনসাধারণের নিকট সমানভাবে অপ্রিয়। আজ তিনি নেই। তাঁর সম্বন্ধে পার্লামেন্টারি বোর্ডে নেতৃবৃন্দ যেসব মন্তব্য করেছিলেন, তা এখন বলা সমীচীন নয়। তাছাড়া দীর্ঘদিন রাজনীতি থেকে দূরে সরে থেকে, দীর্ঘ আন্দোলনের সময় নির্বিঘ্ন আড়ালে-আয়েশে থেকে নেতার মুক্তির পর নির্বাচন আসন্ন দেখে এগিয়ে এলে—অনেক প্রশ্ন আসবেই।

নেতা আমার মতামত চাইলেন। আমি তাঁর অনুকূলে বলতে পারলাম না। যা বললাম সেই বক্তব্যের প্রতিটি কথা নেতা গ্রহণ করলেন। বললেন, ও যা বলেছে, তার প্রতিটি কথা সত্যি। আমরা একটি সিটেও ঝুঁকি নিতে পারি না। ওকে এবার বাদ দিলাম।

এর বহু আগে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে বেরিয়ে এলে রেসকোর্সের ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) নেতাকে ছাত্রসমাজের পক্ষ থেকে এক বিশাল গণসম্বর্ধনা দেওয়া হয় এবং সেখানেই আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। সেদিনের পর থেকে আমরা তাঁর উপাধিতেই সম্বোধন করতাম। নাম কদাচিৎ নেওয়া হত।

জীবনের প্রথম নির্বাচনের সময় অনেক নতুন অভিজ্ঞতা হল। সবচাইতে মুগ্ধ হলাম জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন ও ভালোবাসা পেয়ে। সারাজীবন আন্দোলন করেছি, কারা-নির্যাতন ভোগ করেছি বছরের পর বছর। একথা বিক্রমপুরের লোকেরা জানত এবং তারা এ নিয়ে গর্ববোধ করত। কিন্তু অত্যধিক কাজের চাপে নিজের এলাকায় খুব কমই গিয়েছি। নাম শুনেছে সবাই, চোখে দেখেছে খুব কম। নির্বাচনের সময় যখন গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে হেঁটে পাড়ি দিতাম—মানুষজন বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে একপলক দেখত, হাত মেলাত, বুক মেলাত, বড়রা দোয়া করত। গভীর রাতেও যখন পায়ে হেঁটে যাচ্ছি অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখেছি। গ্রামের মেয়ে-বউরা, বৃদ্ধ দাদী-নানীরা হারিকেন-হাতে দাঁড়িয়ে থাকত আমাকে একটু দেখার জন্য। কারো হাতে

থাকত এক গ্লাস দুধ, দু'-একটা নাড়ু, একটু পায়েস, একটা পেঁপে বা একটা কচি ডাব।

গ্রামের মানুষের সেই প্রাণঢালা অকৃত্রিম ভালোবাসার কথা কোনদিন ভুলব না। পরবর্তীতে কতটুকুইবা করতে পেরেছি ওদের জন্য! ওদের সেই ভালোবাসার কি প্রতিদান দিয়েছি? সঠিক হৃদয়ঙ্গম করতে পারি না।

হলদিয়া বলে একটা বর্ধিষ্ণু জায়গা রয়েছে, সেখানে প্রতিদিন দেখা যেত খালের ধারে লোকজন-যাতায়াতের রাস্তার পাশে এক বৃদ্ধ আমার ছবি-সম্বলিত একটি পোস্টার সুন্দর করে বাঁধাই করে ধরে বসে আছে। সকালে বাড়ি থেকে খেয়ে আসে, আর সন্ধ্যায় পোস্টারটি তুলে নিয়ে ফিরে গিয়ে ভাত খায়। নির্বাচন শেষ না হওয়া পর্যন্ত সে প্রতিদিন এ কাজটি করেছে। যাতায়াতের পথে সবসময় একই দৃশ্য দেখে ভদ্রলোকের সম্বন্ধে কৌতূহল হল। জানা গেল বেশ ধনী ব্যক্তি তিনি। বয়স হয়েছে, অন্য কাজ করতে পারেন না বলে এভাবে তিনি দায়িত্ব পালন করছেন। কেউ তাঁকে এক কাপ চা-ও খাওয়াতে পারেনি।

নির্বাচনের দিনগুলো ছিল অপরিমেয় আনন্দময়। শুধু পোস্টার-লিফলেট ছাপিয়ে দিয়েছি। সঙ্গে মাইকের যা খরচ তাঁর সবকিছুই করেছে স্থানীয় শুভাকাঙ্ক্ষী আর কর্মীরা। বিরাট দলবল নিয়ে বরযাত্রীর মতো এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রাম, এক ইউনিয়ন থেকে অন্য ইউনিয়ন—মানুষজনের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যেত কে খাওয়াবে দুপুরে আর কে দেবে নৈশভোজ। আর কোথায় হবে সকালের নাস্তা। নির্বাচন তো নয়, মনে হচ্ছে যেন প্রতিদিন মেজবানি খাচ্ছি। ভোজনরসিক রঙ্গু বলত, এরকম হলে ইলেকশন সারাজীবন করা যায়।

বস্তুত '৭১ এবং '৭৩ দুটো নির্বাচনই হেসে-খেলে, খেয়ে-দেয়ে স্ফূর্তির মধ্যে সমাধা হয়েছে—জনসভার ব্যবস্থাপনা এবং আনুষঙ্গিক খরচপাতিও কেউ আমার কাছে চায়নি। নিজেরাই বহন করেছে। অনেকে বিদায়ের সময় পকেটে এনভেলপ গুঁজে দিয়েছে। নির্বাচন শেষ হলে দেখি খরচের চেয়ে উপার্জনই বেশি।

মানুষ ভোট দিয়েছিল প্রাণভরে। কত না তাদের আশা! সারা দেশের মধ্যে গড়ে আমি সর্বোচ্চ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হলাম। আমার বিরুদ্ধে অর্ধ-ডজন বিশিষ্ট ব্যক্তি দাঁড়িয়েছিলেন—তাঁদের প্রত্যেকের জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছিল।

নির্বাচনে আওয়ামী লীগ কেবল নিরঙ্কুশ বিজয়ই লাভ করল না—এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টি হল। মাত্র দুটি আসন ব্যতীত কেন্দ্রের সব আসন লাভ করে জাতীয় পরিষদেও আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। প্রাদেশিক পরিষদের তো কথাই নেই, হাতে গোনা কয়েকটি আসন ছাড়া সবই আমাদের। সপ্তাহব্যাপী বিজয়োৎসব হল। বাঙালিরা এক হয়েছে। বাঙালিরা এবার নতুন ইতিহাস রচনা করবে।

কিন্তু ওরাও বসে নেই। শকুনিরা চারদিকে ফেলিছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস। পশ্চিমাদের ষড়যন্ত্রের থলে নিঃশেষ হয়ে যায়নি। সংবিধানে সুনির্দিষ্ট বিধান

রয়েছে, রাজধানী পশ্চিম পাকিস্তানে থাকায় জাতীয় সংসদের অবস্থান থাকবে পূর্ব পাকিস্তানে। সেমতে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যবিদ লুই কানকে দিয়ে ডিজাইন করিয়ে অনবদ্য জাতীয় সংসদ ভবন তৈরি করা হয়েছে ঢাকার শেরে বাংলা নগরে। জাতীয় সংসদের অধিবেশনও ডাকা হল ঢাকাতে।

ষড়যন্ত্র শুরু হয়ে গেল। পশ্চিম পাকিস্তানের একক সংখ্যাগরিষ্ঠ পিপিপি দলের নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো ঘোষণা করলেন, ঢাকার কসাইখানার অধিবেশনে তারা যোগ দেবেন না।

সারা দুনিয়ার মানুষ স্তম্ভিত হয়ে গেল। অচিরেই জাতীয় সংসদের অধিবেশন মুলতবি হয়ে গেল।

পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ ক্ষোভে ফেটে পড়ল। গণভোটের রায়কে বানচাল করার হীনষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সমগ্র জাতি ঐক্যবদ্ধ বিক্ষোভ জানাতে থাকল। কর্মসূচি আর কর্মসূচি। মানুষ রাস্তায় নেমে এসেছে—একটা কিছু হেস্তনেস্ত হয়ে যাক। আমাদের নেতৃবৃন্দ ধৈর্য ধরে এগুতে লাগলেন।

সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের বিশাল সমাবেশে আমরা নির্বাচিত প্রতিনিধিরা একত্রে শপথ নিলাম। বঙ্গবন্ধু সেই শপথ পরিচালনা করলেন। সকলেরই এক পোশাক। বঙ্গবন্ধু যা পরতেন, সাদা পায়জামা-পাঞ্জাবি আর মুজিবকোট। ওটা অলিখিত জাতীয় পোশাকে পরিগণিত হয়ে গেল।

সদ্যনির্বাচিত আমরা। হৃদয়ভরা কত না স্বপ্ন! কিন্তু সব ভুণ্ডল হয়ে গেল। জনরায়কে তারা অস্ত্রের জোরে উল্টে দিতে চায়।

কিন্তু তা সম্ভব নয়। পৃথিবীর ইতিহাস বারবার সাক্ষ্য দিয়েছে— জলপ্রপাতের ধারাকে বিপরীতে প্রবাহিত করতে চাইলে উল্টা প্লাবনে সব ভেসে যায়। পৃথিবীর এই অঞ্চলেও সেই পুরনো ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হবে—এটাই স্বাভাবিক।

স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়া হোক—এ দাবি ক্রমান্বয়ে শক্তিশালী হতে থাকল। যারা তখনও পাকিস্তান টিকে থাক—এই আশা রাখত তাদের মধ্যেও দ্বিধা কাজ করতে লাগল। অপেক্ষাকৃত তরুণরা, ছাত্রসমাজ আর বিলম্ব করতে প্রস্তুত নয়। অবিলম্বে ঘোষণা দেওয়া হোক। বহুকাল আগে ভারতীয় মুসলিম লীগের সম্মেলনে ১৯৪০ সালে লাহোরে শের-এ-বাংলা এ. কে. ফজলুল হক যে ঐতিহাসিক প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করা হোক এবং যে প্রস্তাবে 'States' শব্দটির বহুবচনের 's' অক্ষরটি উঠিয়ে তার স্থলে একবচন করা হয়, মূল প্রস্তাবের রাষ্ট্রসমূহের পরিবর্তে কেবল রাষ্ট্র শব্দটি প্রতারণার মাধ্যমে সংযোজন হয়ে একটি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই প্রতারণা এতদিন পর শোধ করে দেবার সময় এল। দিনে দিনে ঋণ অনেক বেড়ে গেছে। আর বিলম্ব নয়।

শেখ সাহেব এবং নেতৃবৃন্দের উপর প্রবল চাপ সৃষ্টি হল। তাঁরা কোন্ কূল রাখবেন মনস্থির করতে সময় নিচ্ছিলেন।

ভাবী বাংলাদেশের পতাকা তৈরি হল ছাত্রদের উদ্যোগে। সবুজের উপরে লাল সূর্য, তার মাঝে বাংলাদেশের মানচিত্র। পরে অবশ্য মানচিত্র উঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ঘরে ঘরে এ পতাকা উত্তোলিত হয়ে গেল। স্বতঃস্ফূর্তভাবে জনগণই দেশের পতাকা পরিবর্তন করে দিল। ছাত্র-নেতৃবৃন্দ পল্টনের সমাবেশে আনুষ্ঠানিকভাবে পতাকা উত্তোলন করল। তারা বঙ্গবন্ধুর বাড়িতেও সেই পতাকা উড়িয়ে দিল। তাঁর গাড়িতেও শোভা পেতে থাকল বাংলাদেশের পতাকা। আমরাও যত্রতত্র সেই পতাকা উড়াতে লাগলাম।

সময়টি ছিল জটিল। আমরা সবাই এক ঘোরের মধ্যে ছিলাম। কিন্তু আজ যখন দীর্ঘকাল পরে ঠাণ্ডা মস্তিষ্কে চিন্তা করি, তখন একটি কথার সদুত্তর পাওয়া দুষ্কর হয়ে ওঠে। স্বাধীনতা ঘোষণার জন্য সেটাই ছিল প্রকৃষ্ট সময়। পশ্চিমারা তাদের মরণযুদ্ধ শুরু করার প্রস্তুতি তখনও সম্পন্ন করে উঠতে পারেনি। এ প্রান্তে সৈন্যসামন্তও অপ্রতুল এবং বাঙালিই বেশি। সেদিন স্বাধীনতার ঘোষণা এলে বাংলাদেশের মানুষকে হয়ত এত বড় মূল্য দিতে হত না।

'৭১-এর ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে যে বক্তৃতা দিলেন তা যেমনি ছিল ঐতিহাসিক, তেমনই তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বললেন বটে, "এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম—এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম..." কিন্তু ঘোষণা দিলেন না আনুষ্ঠানিকভাবে। শেষ করলেন, "জয় বাংলা, জয় পাকিস্তান" বলে।

পশ্চিমারা সময় পেয়ে গেল। ওরাও এটাই চাইছিল। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে গোলটেবিল বৈঠকে আলোচনার প্রস্তাব দিল পাকিস্তান সরকার। ঢাকার আজকের 'সুগন্ধা'য় অনুষ্ঠিত হল সে ডায়ালগ। পশ্চিম পাকিস্তানের বিজয়ী দল পিপিপি'র নেতা ভুট্টো সাহেবও এলেন সদলবলে, নিজস্ব নিরাপত্তা-বাহিনী নিয়ে। এখন আর ঢাকা কসাইখানা থাকল না। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান তাঁর উপদেষ্টামণ্ডলী নিয়ে জাঁকিয়ে বসলেন বৈঠকে। বঙ্গবন্ধুও দলের সিনিয়র নেতৃবৃন্দকে নিয়ে বৈঠকে যোগ দিলেন।

আমরা অপেক্ষাকৃত বয়ঃকনিষ্ঠ সদস্যরা এ আপস-ফর্মুলা নিরূপণের বৈঠকের পক্ষপাতী ছিলাম না। কিন্তু নেতৃবৃন্দের উপর ছিল আমাদের পূর্ণ আস্থা। তাঁরা কোন অবস্থাতেই দেশ ও মানুষের স্বার্থের প্রশ্নে আপস করবেন না আমরা তা জানতাম। দিনের পর দিন আলোচনা গড়াতে লাগল।

ইয়াহিয়া খান বললেন, আমরা যে কতটা ধৈর্যশীল তার প্রমাণ, শেখ সাহেব গাড়িতে একটি ভিন্ন পতাকা উড়িয়ে বৈঠকে আসছেন। তারপরও আমরা আলোচনার স্বার্থে কিছু বলছি না।

প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল একটি কূট-সামরিক চাল। আলোচনা কর, আরও আলোচনা কর। যতটা পারা যায় সময় কিনে নাও। সর্বাত্মক আঘাতের জন্য ইতিমধ্যে প্রস্তুতি সম্পন্ন কর।

হচ্ছিলও তা-ই। একদিকে যখন তথাকথিত আলোচনা চলছিল, সে সময়

অত্যন্ত দ্রুতগতিতে আকাশপথে এবং জলপথে সৈন্যসামন্ত অস্ত্রপাতি আর গোলাবারুদ সমানে পূর্ব পাকিস্তানে আসতে থাকল। চট্টগ্রামের শ্রমিকরা বুঝতে পেরে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত জাহাজসমূহের মাল খালাশ করতে অস্বীকৃতি জানাল। দেশের ভাই-বোনদের হত্যার জন্য আনা অস্ত্র ও বারুদ তারা নিজেদের হাতে জাহাজ থেকে নামাতে পারে না। শ্রমিকদের উপর গুলি চলল নির্বিচারে। অসংখ্য শ্রমিকের রক্তে আর একবার কর্ণফুলির ঘোলা পানি রক্তিম বর্ণ ধারণ করল। নেতা বলেছিলেন, "আর যদি একটা গুলি চলে...!"

কিন্তু গুলি ঠিকই চলেছিল নিরস্ত্র মানুষের উপর। চলেছিল নির্বিচারে।

সারা দেশে তখন বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে সরকারের সঙ্গে অসহযোগ চলছে। পাল্টা সরকার চলছে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে তাঁর ধানমণ্ডির বাসস্থান থেকে। যখন যে নির্দেশ যাচ্ছে বঙ্গবন্ধুর তরফ থেকে সেসব নির্দেশাবলি সরকারি প্রতিটি অফিস, আদালত, রেডিও, টিভি এবং সর্বস্তরের মানুষ বিনাপ্রশ্নে মেনে চলছে। বস্তুত দেশ তখনই বাস্তবে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। এখানে আওয়ামী লীগের শাসন শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু এয়ারপোর্ট বন্ধ নেই, বন্ধ নেই নৌবন্দর। সেদিক থেকে তারা বৃহত্তর মোকাবিলার জন্য আরও সমরসজ্জায় নিজেদেরকে সজ্জিত করছিল। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যে জেনারেল টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর নিয়োগ করে। তাকে শপথপ্রদানে অস্বীকৃতি জানান ঢাকা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি বি. এ. সিদ্দিকী। বস্তুত সমগ্র বেসামরিক কর্তৃত্ব তখন আমাদের নেতৃবৃন্দের হাতেই সমর্পিত।

প্রতিদিন সকালে যখন নেতৃবৃন্দ আলোচনার বৈঠকে যাওয়ার প্রস্তুতি নেন—আমরা বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে উপস্থিত হয়ে তাদেরকে বিদায় জানাই। আবার দিনশেষে তারা যখন ফিরে আসেন আমরা অধীর আগ্রহে হুমড়ি খেয়ে পড়ি কী হল, কী হচ্ছে জানার জন্য। সমগ্র জাতি এই আলোচনার অগ্রগতির দিকে আকুল আগ্রহে তাকিয়ে ছিল।

২৫শে মার্চ। নেতৃবৃন্দ আলোচনা বৈঠক থেকে উঠে এসে হঠাৎই ঘোষণা করলেন, আলোচনা ব্যর্থ হয়েছে। তোরা যে যেখানে পারিস চলে যা, প্রতিরোধ গড়ে তোল। আজ রাতেই সশস্ত্র বাহিনী সর্বাত্মক আঘাত হানবে বাঙালি জাতির উপর।

আমরা কিংকর্তব্যবিমূঢ়। একটা পরামর্শ হল না। ওয়ার্কিং কমিটির সভা হল না। কর্মীদের তৈরি করা হল না। ঢাল নেই, তরোয়াল নেই, আমরা সব নিধিরাম সর্দার। বলে দেওয়া হল, যে যেখানে পারিস প্রতিরোধ কর। কী দিয়ে প্রতিরোধ! খালি হাতে প্রতিরোধ করা হবে একটি আধুনিক কনভেনশনাল সেনাবাহিনীকে! ভাবতে অবাক লাগে এই প্রস্তুতি নিয়ে স্বাধীনতার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়লাম আমরা!

সৈয়দ নজরুল ইসলাম আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তিনি বললেন,

সৈন্যবাহিনী নামা কী জিনিস জানো না! বাসায় যাও—তোমার তরুণী স্ত্রী ও কোলের বাচ্চাকে নিরাপদে রাখার ব্যবস্থা কর।

বঙ্গবন্ধুর সাথে সুস্থিরমতো কথা বলতে পারলাম না। বাড়িভর্তি লোক। যাকেই পাচ্ছেন উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঠেলে বাইরে পাঠাচ্ছেন, জলদি কর, যেখানে পারিস রুখে দাঁড়া। পাকিস্তানি সৈন্য ঝাঁপিয়ে পড়ল বলে।

এই ছিল তাঁর সঙ্গে সেই বছরের মতো আমাদের শেষ কথা। পরদিন শুনলাম তাঁকে গ্রেপ্তার করে পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আমাদের যুদ্ধের পথে ঠেলে দিয়ে নেতার একী কাণ্ড! তিনি কেন বাসায় বসে ধরা দেবেন! তাঁকেই তো নিতে হবে এ যুদ্ধের সেনাধ্যক্ষের দায়িত্ব। বিষয়টি এরকম, সেনাপতি বললেন, তোমরা যুদ্ধ করতে থাকো। আমি একটু ধরা দিয়ে আসি।

তিনি ধরা দিতে না চাইলে তখন বাংলাদেশে এমন শক্তি ছিল না-তাঁকে গ্রেপ্তার করতে পারে। আমরা কোটি মানুষ পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে চলে গিয়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে; ট্রেনিং নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লাম আর নেতার ছবি দেখলাম কলকাতার একটি কাগজে—পাইপ-হাতে বিষণ্ন বঙ্গবন্ধু বসে আছেন পাক সৈন্যদের বন্দি হয়ে।

এ শুভঙ্করের ফাঁকি বুঝতে পারলাম না। পূর্বাহ্নে তিনি তো স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিয়ে যাননি। তাই তো পরবর্তীতে চট্টগ্রামের দলীয় কর্মীদের মাধ্যমে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করাতে হল কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে মেজর জিয়াউর রহমানকে দিয়ে। জিয়াউর রহমানের অনুসারীরা আজ তাঁকে স্বাধীনতার ঘোষক বলে দাবি করতে চায়। কিন্তু বিষয়টি কি তা-ই?

স্বাধীনতার ঘোষণা বঙ্গবন্ধুই দিতে পারেন। সময়ে তা দেননি। সেই অসম্পূর্ণতা পূরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে পরে তাঁর বাণী প্রচার করে। যে সেটা পাঠ করল সে পাঠক হতে পারে—ঘোষক হয় কী করে? ইতিহাসকেও কী দলীয়-দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে হবে? পরে অবশ্য তাজউদ্দীন আহমেদ ভারতে পৌঁছে নিজেকে প্রধানমন্ত্রী করে বাংলাদেশের সরকার স্থাপনের ঘোষণা দেন।

বাঙালি জাতির একটা বড় দোষ, আমরা বাকসর্বস্ব। কথায় পারি না হেন বস্তু নেই। 'ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ো, বাঁশের কেল্লা তৈরি করো, বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো'—কমান্ডোদের মোকাবিলায় আমরাও প্রস্তুত। আরও কত গালভরা উত্তপ্ত বচন। কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল এসব অসাড় আস্ফালন। গলাবাজ বিপ্লবীদের সে কী হুঙ্কার, 'ওরা যে গ্রেনেড ছুঁড়ে মারবে তা-ই ধরে নিয়ে ওদের দিকে ছুঁড়ে মারব।'

যদি কথা দিয়ে যুদ্ধ হত তা হলে বাঙালির সঙ্গে পাল্লা দেওয়া শক্ত হত।

তখন লক্ষ্মীবাজারে থাকি। ওখানে গিয়ে পাড়ার সমস্ত কর্মীদের নিয়ে বড় বড় গাছের গুঁড়ি, পাথরের স্ল্যাব আর পুরাতন কয়েকটি বাস রাস্তায় ফেলে ওদের আটকাবার ব্যর্থ প্রয়াস পেলাম। রাত-দুপুর পর্যন্ত বাইরে কাজ করে ঘরে

ফিরে দেখি সালেহা ভয়ে ঘুমন্ত রানাকে বুকে জড়িয়ে কাঁদছে। আমাকে দেখে কিছুটা আশ্বস্ত হল। তখনও তার কণ্ঠে একই জিজ্ঞাসা, রানার আব্বা, কি হবে?

ওর কথার জবাব দিতে পারিনি। জবাব দিয়েছে পাকিস্তানের বর্বর সৈন্যরা। মাঝরাতের আগেই ওরা ঝাঁপিয়ে পড়ে ঢাকা শহরের মানুষের উপর। চারদিকে আগুন জ্বলে ওঠে দাউদাউ করে। তারা প্রথমেই আক্রমণ করে ইপিআর ছাউনি, পুলিশ ছাউনি আর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসসমূহ। তারপর তাদের মরণযুদ্ধ শুরু হয় রাজধানী ঢাকাবাসীদের উপর। চারদিকে কামান, মর্টার আর স্বয়ংক্রিয় মেশিনগানের সাহায্যে গোলাবর্ষণ। অগ্নিসংযোগ এবং যাকে সামনে পাওয়া যায় তাকেই নির্বিচারে হত্যা চালিয়ে ওরা সেই রাতে নিরীহ-নিরস্ত্র ঢাকাবাসীর উপর ওদের দীর্ঘদিনের রোষের বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। ঢাকাকে এবং ক্রমান্বয়ে সমগ্র দেশটিকে পোড়ামাটির নীতি অনুসরণ করে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে শেষ করে দিতে চায়।

প্রথম রাতের ধ্বংসযজ্ঞে হাজার হাজার নারী-পুরুষ, ছাত্র-ছাত্রী, পুলিশ, ইপিআর সাধারণ মানুষ নিহত হল। হাজার হাজার বাড়িঘর ভস্মীভূত হয়ে গেল। চারদিকে কেবল মৃত্যু আর মৃত্যু। শবদেহ স্থানান্তরেরও লোক খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।

যে শহর গতকাল পর্যন্ত বাংলাদেশের পতাকায় পতাকায় আচ্ছন্ন ছিল, জয় বাংলা, বঙ্গবন্ধু আর আওয়ামী লীগ ছাড়া অন্য কিছু দৃষ্টিগোচর হত না; সেই শহরই দেখলাম রাতারাতি ভোল পাল্টে ফেলেছে। ঘরে ঘরে পাকিস্তানের পতাকা, জিন্নাহ্ সাহেবের ছবি কোথা থেকে এল আল্লাহ্ই জানেন। জীবনের মায়ায় মানুষ সব পারে। আমার চেম্বারেও দেখলাম একটি পাকিস্তানি পতাকা কেউ টানিয়ে রেখে গেছে। আমি সেটি নামিয়ে ফেললাম। পাড়ার সর্দার সাহেব এসে বলল, অ্যাড্ভোকেট সাহেব, আপনি আওয়ামী লীগের এমপি তা জানি। কিন্তু বিধবার এই বাড়িটি বাঁচাতেই পতাকাটি লাগান হয়েছে।

বললাম, আমার বাসায় আর কোনদিন পাকিস্তানের পতাকা উঠবে না। প্রয়োজন হলে বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র চলে যাব।

উনি আমাকে ভালোই চিনতেন। আর উচ্চবাচ্য করলেন না। আমার বাসাটি নবদ্বীপ বসাক লেনের ভিতর ছিল বলে ভয় কিছুটা কম ছিল। পাশের বাড়ি থেকে দেয়ালের সঙ্গে কাঠের সিঁড়ি লাগিয়ে দিল। বড় রাস্তার ছেলেরা পালা করে প্রহরায় রয়েছে। পাক সেনা দেখলে খবর দেবে আর আমরা পার হয়ে যাব।

আমার বাড়িতে বা পাড়ায় কোন আক্রমণ হয়নি। পুরনো ঢাকার ভিতরের দিক বলে বাঁচোয়া। কিন্তু সকালে কোথা থেকে আবুল এসে উপস্থিত। তার দিকে তাকান যায় না। দশাসই চেহারার আবুল কেমন উদ্‌ভ্রান্তের মতো হয়ে গেছে। সে আমাকে জড়িয়ে ধরেই কান্না। তার ধারণা হয়েছিল আমি বুঝি আর নেই।

আবুল আমার অনেক দিনের কর্মী এবং পরিবারের একজনের মতো দীর্ঘদিন ধরে সে আমার সঙ্গে আছে। আমার নিরাপত্তার ব্যবস্থা সে অন্য কাউকে দিয়ে সন্তুষ্ট হতে পারে না। সবসময় ছায়ার মতো আমার সাথে লেগে থাকে। সে বলল, দাদা সদরঘাট টার্মিনালে শত শত লাশ পড়ে আছে।

হঠাৎ খেয়াল হল, এখনও বেঁচে আছি, আমার কী কোনই কর্তব্য নেই? এই ধ্বংসযজ্ঞ থেকে আহতদের উদ্ধার করার এবং নিহতদের সৎকারের ব্যবস্থা করা দরকার!

ঘোরের মাথায় আবুলকে নিয়ে বের হয়ে পড়লাম। সালেহা পথ আটকে দাঁড়াল। তাঁকে বললাম, দিনের বেলায় ভয় নেই, তুমি আমাকে আটকে রেখ না। মানুষের এই দুঃসময়ে যদি ঘর থেকে বের না হই তবে আমি কীসের মানুষ?

সে এর মধ্যেই আমাকে অনেকটা চিনে ফেলেছে। আবুলের হাত ধরে তাকে অনুরোধ করল, তোমার দাদাকে মুহূর্তের জন্য চোখের আড়াল করো না। বাসায় ফিরিয়ে নিয়ে এসো।

সদরঘাট টার্মিনালে উপস্থিত হয়ে আমার মাথা খারাপ হওয়ার উপক্রম। রাতের বেলা অনেক যাত্রীই টার্মিনালে শুয়েছিল সকালে যার যার গন্তব্যে চলে যাবে সেই আশায়। তাদের সবাইকেই ওরা নির্বিচারে হত্যা করেছে। চারদিকে রক্ত আর রক্ত। শত শত মানুষের লাশ সে রক্তগঙ্গায় অসহায়ভাবে পড়ে আছে। সব দেখে-শুনে মাথা স্থির রাখা দুরূহ। হঠাৎ গুলির শব্দ শুনে বাইরে এসে দেখি লোকজন যে যেদিকে পারছে দৌড়ে পালাচ্ছে। কিছু না-বুঝেই আমিও দক্ষিণ দিকে দৌড় দিলাম। আবুল পেছন থেকে চিৎকার করছে, ওদিকে না দাদা, ওদিক থেকেই গুলি করতে করতে পাক সেনারা এগিয়ে আসছে।

বস্তুত দক্ষিণ দিকে রাইফেল ক্লাব, সেদিক থেকেই তারা আসছে। কিন্তু আমার তখন দিগ্বিদিক জ্ঞান নেই। সেদিকেই ছুটে যাচ্ছি। আর একটু হলেই গায়ে গুলি এসে লাগত। তার আগেই উপায়ান্তর না দেখে আবুল তার পা দিয়ে ল্যাং মেরে আমাকে ফেলে দিল। আমি হতবাক হয়ে ওর দিকে তাকাতেই সে আমাকে পিঠের উপর ফেলে উত্তর দিকে দৌড়তে থাকল।

আবুলের জন্য সেই যাত্রায় বেঁচে গেলাম। দ্বিপ্রহরে কয়েক ঘণ্টার জন্য কারফিউ প্রত্যাহার করেছিল আর্মির লোকেরা। মির্জা হাসান ভাই একটা গাড়ি নিয়ে এসে উপস্থিত। সম্পর্কে আমার ভাই হলেও সে বন্ধুর মতো। তাঁর সম্বন্ধে বেশ একটি মজার ব্যাপার ছিল। বিয়ে করে বউকে শ্বশুরবাড়িতে রেখে যাতায়াত করত। বড় অনুষ্ঠান করে বরযাত্রা নিয়ে বধূবরণ করতে হবে। হাসান ভাই অর্থবান মানুষ। সেটাই স্বাভাবিক। এদিকে ভাবীর বাচ্চা হওয়ার সময় হয়ে এল। মা-বাচ্চা এক সাথে বরণ করা ভালো দেখায় না। তাই তড়িঘড়ি করে বউ উঠিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করা হল। প্রচুর আয়োজন, প্রচুর খাওয়া-দাওয়া, বাজি-বাদ্য এলাহী ব্যাপার। বউ নিয়ে যখন আমরা ফিরছি, সারাদিনের উত্তেজনার

কারণেই বজরার মধ্যেই ভাবীর প্রসব-বেদনা শুরু হল। বজরা বাড়ির ঘাটে ভিড়ার পূর্বেই ভাগ্যবান হাসান ভাই পুত্রসন্তানের পিতা হয়ে গেলেন। বউ-বেটা দু'জনকেই হাসতে হাসতে ঘরে তুলে নিলেন সদা হাস্যময় হাসান ভাই। আজ তিনি নেই। যতদিন বেঁচে ছিলেন আমরা ঘুরে-ফিরে এই বিষয়টি আলোচনায় আনলে তিনি হাসিমুখে তাতে যোগ দিতে দ্বিধা করতেন না।

হাসান ভাই বললেন, তাড়াতাড়ি করুন। ভাবীকে তাঁর পিত্রালয়ে রেখে চলুন আপনাকে দেশের বাড়িতে নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে যাই।

সালেহাও সেই পরামর্শ দিল। তবে সালেহাদের বাসায় নয়—সে বাসা অনেকের পরিচিত। ঠিক করলাম আপাতত ওদেরকে বাংলাবাজারের কাছাকাছি ওর বড় মামার বাসায় রেখে আমি শহর থেকে বের হয়ে যাব। পরে ওদের ব্যবস্থা হবে। বাড়িঘর ভর্তি জিনিসপত্র। বছরখানেক আগে বিয়ের সময় সালেহা পিত্রালয় থেকে বহু কিছু সঙ্গে এনেছে। আমারও নতুন সংসারে কেনা হয়েছে কতকিছু। সব ফেলে ঘরগুলোতে তালা মেরে শুধু কাজের লোকটিকে রেখে বেরিয়ে এলাম। সালেহা ফুলের বাগান করেছিল—সেদিকে তাকিয়ে ও কেঁদে ফেলল। আর কোনদিন সে বাসায় ফেরা হয়নি।

ওর বড় মামার বাসায় সালেহাদের রেখে মির্জা ভাই ও আবুলকে নিয়ে প্রথমে ধানমন্ডি যেতে হল। হাসান ভাই তাঁর মানিব্যাগ ফেলে এসেছেন। খালি হাতে দেশে যাবেন কীভাবে! ফাঁকা রাস্তায় কিছু কিছু মিলিটারি রয়েছে। তখন কারফিউর বিরতি চলছে। ধানমন্ডি থেকে ফেরার পথে 'দৈনিক আজাদ' পত্রিকার সামনে মিলিটারি আমাদের গাড়ি দাঁড় করল। আমরা তিন জনই মৃত্যুভয়ে ভীত হয়ে উঠলাম। হাসান ভাই আমার হাত চেপে ধরে বললেন, ভাই আপনাকে বাঁচাতে পারলাম না। মাফ করে দেবেন।

বললাম, আল্লাহ্‌কে মনে মনে স্মরণ করুন। আর কথাবার্তা আমিই বলব। আপনারা চুপ করে বসে থাকবেন।

ভাবলাম, বোধহয় মৃত্যু আসন্ন। তা হলে আর কাপুরুষের মতো মৃত্যুবরণ করে লাভ কি? কথা বাংলায় বলব এবং মাথা নত করব না।

গাড়ি থামিয়ে তারা প্রথমে উঁকিঝুঁকি দিল। আমার পকেটে রিভলবার রয়েছে। অবশ্য লাইসেন্সসহ! উর্দুতে জিজ্ঞেস করল কোথা থেকে আসছি।

বাংলায় জবাব দিলাম, ধানমন্ডি থেকে।

কোথায় যাচ্ছ?

সোয়ারীঘাট।

তোমরা মুসলমান?

বললাম, অবশ্যই মুসলমান। আমরা সবাই মুসলমান।

কি মনে করে আর প্রশ্ন করল না। তারাও বোধহয় ক্লান্ত ছিল।

উদাস স্বরে বলল, জলদি চলে যাও।

ড্রাইভারকে বললাম, দুর্ঘটনা না ঘটিয়ে যত শীঘ্র পার সোয়ারীঘাট পৌঁছে দাও। রাস্তায় মিলিটারি দেখলে সাবধানে চালাবে।

নির্বিঘ্নেই সোয়ারীঘাট পৌঁছলাম। নৌকা করে ওপারে যাব। হাজার হাজার মানুষ পাগলের মতো ছুটছে। এক-একটা নৌকা ঘাটে ভিড়ছে—অমনি অসংখ্য যাত্রী লাফিয়ে ওঠার ফলে নৌকা ডুবে যাবার উপক্রম।

আমরা যখন নদীর ঘাটের দিকে যাচ্ছি, তখন মুসলিম লীগের এক স্থানীয় দালাল আমাকে চিনে ফেলল। কালবিলম্ব না করে সে অদূরে অবস্থানরত মিলিটারিকে খবর দিল। তারাও সঙ্গে সঙ্গে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে এগিয়ে এল। আমরা প্রাণপণ দৌড়ে নৌকায় উঠে তাড়াতাড়ি নৌকা ভাসিয়ে দিলাম। তারা নদীর মধ্যে নৌকাগুলো লক্ষ্য করে ক্রমাগত গুলি করতে থাকল। এটা যেন খুবই আনন্দের কাজ।

গুলিতে আমাদেরটিসহ কয়েকটি নৌকা ডুবে গেল। বেশ কিছু লোক হতাহত হল। নারী-পুরুষের চিৎকারে বুড়িগঙ্গা নদীও লজ্জা পাচ্ছিল। আহত আর নিহতদের রক্ত ধারায় তার পানিও রক্তিম বর্ণ ধারণ করল।

আমি অনেকটা বেহুঁশের মতো হয়ে পড়েছিলাম। শার্ট-প্যান্ট পরে জুতা পায়ে সাঁতার কাটাও সম্ভব ছিল না। কিন্তু কে যেন আমাকে হাত ধরে নদীর ওপারে নিয়ে এল জানি না। জীবনে অনেকবার এমনি আশাতীতভাবে আমি রক্ষা পেয়েছি। আল্লাহ্‌র অসীম রহমত ছাড়া আর কিছুই নয়। ক্লান্ত-শ্রান্ত আমরা তিন জন নদীর পশ্চিমপ্রান্তে বসে হাঁপাচ্ছি। হঠাৎ সেখানে প্রখ্যাত মুক্তিযোদ্ধা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়খ্যাত খসরু এসে উপস্থিত। সাথে জনাকয়েক যুবক। কয়েকজনের হাতে অজানা অস্ত্র। আমাদের মুখে সব বৃত্তান্ত শুনে খসরুরা তখনই ওপারে গিয়ে প্রতি-আক্রমণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করল।

অনেক কষ্টে তাদের থামালাম। বললাম, শত্রুদের কাছে অনেক অস্ত্র। আরও অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়ে যাবে। এখন সমঝে চলতে হবে। অবশ্যই একদিন প্রতিশোধ আমরা নেব।

খসরু আমাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করত। সে আমার কথা মেনে নিল। তার সঙ্গে কিছু পরামর্শ করে হাঁটাপথে শ্রীনগর যাওয়ার জন্য রাস্তায় নেমে এলাম।

হাজার হাজার নয়, লাখ লাখ নারী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ ঢাকা থেকে জীবন নিয়ে পালিয়ে এসেছে। এরা নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য গ্রামান্তরে যাচ্ছে। যে যেদিক পেরেছে, ঢাকা ছেড়ে এসেছে। ওখানে যে মৃত্যু ওৎ পেতে আছে! সঙ্গে অনেকের সামান্য কিছু রয়েছে, অনেকেই শূন্যহাতে কেবল জীবন নিয়ে বের হয়ে এসেছে। শিশু-কিশোরী, যুবতী, বৃদ্ধাসহ মেয়েদের সংখ্যাই মনে হয় বেশি। এরা অনেকেই জীবনে কখনও পায়ে হাঁটেনি। আজ উপায়ান্তর নেই। নেই কোন যানবাহন। ওদের কষ্ট চোখে দেখা যায় না। কিন্তু চলার বিরাম নেই। চোখে-মুখে নিদারুণ ভয়। মৃত্যু বুঝি পিছে ধাওয়া করছে। ওরা ছুটছে,

ছুটছে মৃত্যুকে পেছনে ফেলে, জীবনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে প্রাণের সবটুকু আকুতি নিয়ে।

সারাদিন অভুক্ত। ক্লান্তি-শ্রান্তির সঙ্গে মিশেছে অপরিসীম ক্ষুধা। কিন্তু খাওয়ার কিছু নেই। পথে যেসব ছোটখাটো দোকান ছিল সেগুলোর ভাণ্ডার বহু আগেই নিঃশেষ। রাস্তায় রাস্তায় মানুষ পথিকদের পানি পান করাচ্ছে। তাদের যা কিছু ছিল তা-ই দিয়ে শিশু, অসুস্থ এবং বৃদ্ধাদের কিছুটা মুখে তুলে দিয়েছে। কিন্তু অন্তহীন এই কাফেলার প্রয়োজন এতে কি আর মিটে? আমাকে কেউ কেউ চিনতে পারল। বিশ্রাম করার অনুরোধ জানাল। কিন্তু একবার যদি বসে যাই, আর হাঁটতে পারব না। তাই হাঁটা অব্যাহত রাখলাম। আবুল কোথা থেকে একটা বাঙ্গি যোগাড় করে আনল। গোগ্রাসে তা-ই খেয়ে তিন জনে কিছুটা ক্ষুধা নিবৃত্তি করলাম। বিকেলের দিকে সৈয়দপুর এসে দেখি ওখানকার ঘাটের ইজারাদার, এলাকার ডাকসাইটে দুষ্টপ্রকৃতির লোক সুযোগ বুঝে নদী পার করার ভাড়া দ্বিগুণ করে দিয়েছে। আমাকে কেউ কেউ অভিযোগ করলে তাকে গিয়ে বললাম, আজ থেকে কেউ পয়সা দিক আর না-দিক তোমাকে তাদের পার করতেই হবে। আর ভাড়া বাড়ানো যাবে না।

একটু গাঁইগুঁই করলেও তখনকার মতো মেনে নিল। শুনেছি পরবর্তীতে এই লোকই রাজাকার হয়ে এলাকায় অনেক অত্যাচার করেছে এবং একসময় মুক্তিবাহিনীর হাতে নিহত হয়েছে।

ভাগ্যক্রমে সৈয়দপুরে এসে একটি নৌযান-মালিকের দেখা পেলাম। সে আমাদের আলমপুর পর্যন্ত পৌঁছে দিল। আলমপুরে আমার বিশিষ্ট-কর্মী আলতাফ মেম্বারের বাড়ি উঠে দেখলাম সেও কাজে নেমে গেছে। বাড়িতে লঙ্গরখানা খুলে সে পথিকজনদের যতটুকু পারছে মুখে খাবার তুলে দিচ্ছে। '৭১ সালের এই নয়টি মাসে বাংলাদেশে এই একটি অনবদ্য জিনিস পরিলক্ষিত হয়েছিল—সকলেই অন্যের প্রয়োজনে এগিয়ে এসেছে।

"সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে"—এ অমিয়বাণীর সঠিক প্রতিফলন দেখেছি যুদ্ধকালীন বাংলাদেশে। অপরাধ প্রায় উঠেই গিয়েছিল। চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, নারী নির্যাতন দেশ থেকে উধাও। না হলে অভিজাত ঘরের মেয়ে-বউরা নির্বিঘ্নে গ্রামান্তরে গিয়ে মাসের পর মাস বাস করতে পারত না।

আলতাফ মেম্বার বহুবার তার বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণের অনুরোধ করেছে। সুযোগ হয়ে ওঠেনি। আজ স্বেচ্ছায় তার বাড়িতে আশ্রয় নেওয়ায় সেই বিপদের দিনেও সবাই যারপরনাই সন্তুষ্ট হল। তার বৃদ্ধ মা নিজ হাতে পোলাও-কোরমা রান্না করে পরিবেশন করলেন। সারাদিনের প্রায় অভুক্ত আমরা অত্যন্ত তৃপ্তির সাথে নৈশভোজ সম্পন্ন করে সেখানেই রাত্রি যাপন করলাম।

পরদিন সকালে পৌঁছলাম শ্রীনগর। আমার নির্বাচনী এলাকার কেন্দ্রবিন্দু।

সবাই ছুটে এসে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরল। তারা রেডিওতে শুনেছে মোয়াজ্জেমকে হত্যা করা হয়েছে। তারা মনে করেছে ওদের মোয়াজ্জেমকেই শেষ করে দিয়েছে। আমাকে সশরীরে দেখে তারা জয়ধ্বনি করে উঠল। আনন্দে উচ্ছ্বাসিত হয়ে উঠল এলাকার জনগণ। আগরতলা মামলার অন্যতম আসামি কমান্ডার মোয়াজ্জেম নিহত হয়েছিল পাক বাহিনীর হাতে। তারা মনে করেছে হয়ত আমিই সেই মোয়াজ্জেম।

পূর্বাপর ঘটনাবলি বর্ণনা করে, আসন্ন দীর্ঘমেয়াদী লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করার পরামর্শ শেষে নিজ গ্রাম দোগাছিতে গিয়ে রাত্রি যাপন করলাম। পরদিন থেকে শুরু হল বিক্রমপুরের বিভিন্ন থানা-হেডকোয়ার্টারে গিয়ে কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ করা এবং তাদের সংঘবদ্ধ করে আগামী সংগ্রামের প্রাথমিক প্রস্তুতি গ্রহণ করা। সারাদিন কেটে যায় পথে-প্রান্তরে। রাতে বাড়ি ফিরে শূন্যগৃহ আমাকে পীড়া দেয়। কোথায় সালেহা, কোথায় রানা?

থানার স্পীডবোটটি তখন আমি ব্যবহার করছি। শহীদ চালাত সেটি। সে একজন পাকিস্তান ফেরত আর্মির লোক। পরবর্তীতে মুক্তিযোদ্ধা এবং একসময় আমার নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল। সেদিন সন্ধ্যায় সৈয়দপুর লঞ্চঘাট হয়ে ফিরছি, মনের কোণে আশা যদি কোনক্রমে সালেহারা চলে আসত!

পেয়ে গেলাম খালাত বোন হুরন বুজী ও দানেশ দুলাভাইকে গোটা পরিবারসমেত। লঞ্চঘাটে বসে আছে—বাড়ি যাবার ব্যবস্থা নেই, সন্ধ্যা আসন্ন, আকাশে মেঘ। এমন অবস্থায় আমাকে দেখে হাতে আকাশ পেল যেন। সবাইকে বোটে উঠিয়ে রওয়ানা দিলাম। বৃষ্টি এল অঝোর ধারায়। সবাই ভিজতে লাগলাম। সাহানা আমার পাশে বসে আনন্দের আতিশয্যে আমাকে বলল, মামা, আড়িয়াল বিলের মাঝখানে অন্ধকার রাতে বৃষ্টির মধ্যে বসেও আমার কিন্তু ভালো লাগছে। কারণ আপনি সাথে আছেন। এখানে পাক বাহিনীর কোন হামলার সম্ভাবনা নেই।

ভীতসন্ত্রস্ত কিশোরী মেয়েটির হৃদয় থেকে উৎসারিত কথাগুলো আমাকে দারুণ স্পর্শ করল। গভীর রাতে ওদের নিয়ে বাড়িতে উপস্থিত হলাম।

সালেহা-রানার জন্য আমার উদ্বেগ-দুশ্চিন্তা আবুলের মনকেও নাড়া দিল। ঢাকার দিকে কেউ যাওয়ার প্রশ্নই আসে না। এর মধ্যেই একদিন সে ঢাকা যাওয়ার উদ্যোগ নিল। অনেকদিন ধরে সে দাড়ি কাটে না। বেশ বড় বড় চাপদাড়িতে তাকে ভালোই মানিয়েছে—একজন পাকা মুসল্লীর চেহারা বাগিয়েছে। উদ্দেশ্য সহজেই অনুমেয়।

কয়েকদিন পর লৌহজংয়ের আমার বন্ধু হামিদ ফকীর তাঁর পরিবারকে কী করে যেন এক বড় নৌকায় ঢাকা থেকে দেশে নিয়ে এল। সঙ্গে সালেহা, ওর বোন হাবীবা এবং রানা। আবুল ওদের সঙ্গে আছে। আমার অনেকখানি দুশ্চিন্তার অবসান হল।

শ্রীনগর থানার অধিকাংশ কর্মকর্তা চলে গিয়েছিল। কেবল বড় দারোগা ছিল। কোন কাজই তার করার ছিল না। সহকর্মীরা পরামর্শ দিল যদি পাক সৈন্য থানায় এসে যায় তা হলে সবগুলো অস্ত্র তাদের হাতে চলে যাবে। ঢাকা ছাড়া মফস্বলগুলোর প্রায় সবটাই তখন আমাদের নিয়ন্ত্রণে। কিন্তু শীঘ্রই তারা চারদিকে ছড়িয়ে যাবে। কাজেই অস্ত্রগুলো থানার অস্ত্রাগার থেকে বের করে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন এবং কিছু কিছু যুবককে ট্রেনিংও দেওয়া যেতে পারে।

তা-ই করলাম। সমস্ত বন্দুক, রাইফেল, গুলি এক নৌকায় বোঝাই করে আলমপুরের আলতাফ মেম্বারের বাড়ি নিয়ে রাখলাম। তার দ্বিতল টিনের ঘর দালানের মতোই নির্ভরযোগ্য। দু'দিন পর সে এসে আমাকে খুব করে ধরল সেগুলো ওখান থেকে স্থানান্তর করতে। তার অমতে ওগুলো তার বাড়িতে রাখা সমীচীন নয় বিধায় সেগুলো নিয়ে নিজ গ্রামেই ফিরলাম এবং আমাদের পাড়ায় একটি অব্যবহৃত ঘরের মধ্যে সেগুলো লুকিয়ে রাখলাম।

অনেক পরে শুনতে পেয়েছিলাম পাক বাহিনী এসে অনায়াসেই সেগুলো উদ্ধার করে নিয়ে যায়। এর মধ্যে একদিন সিরাজুল আলম খান, খসরু, শাহ্জাহান ওরা কয়েকজন দ্বিপ্রহরে আমার বাড়িতে এসে উপস্থিত। তাদের সাথে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করে ঠিক করে নিলাম। খাওয়া-দাওয়ার পর ওরা হাঁটা-পথে রওয়ানা হয়ে চলে গেল। তাদের পদ্মা নদী পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এলাম। মুন্সীগঞ্জের নিবেদিত-কর্মী হারুন-মকবুল জুটিও পরামর্শ করতে ছুটে এল। জেলাব্যাপী কর্মীদের যোগাযোগ সম্পন্ন করে এবার সীমান্তের ওপারে পাড়ি দেবার প্রস্তুতি নিতে হবে। বেশিদিন আর এভাবে চলাফেরা নিরাপদ নয়। কিছু কিছু দালাল শ্রেণী তৈরি হতে শুরু করেছে। কিন্তু তখনও ওরা অপ্রকাশ্যেই রয়েছে।

বাংলাদেশের ইতিহাসে ঐতিহ্যগতভাবেই এই এক সমস্যা। কেবল বাংলাদেশ বলব কেন, পৃথিবীর সর্বত্র এই নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করার মানুষের অভাব হয় না। দলদ্রোহিতা, সমাজবিরোধিতা অনেকেরই মজ্জাগত। গৃহশত্রুই বড় শত্রু। বিভীষণদের যন্ত্রণা চিরদিনই ছিল।

বাংলার ইতিহাসে সিরাজউদ্দৌলা, মীর মদন, মোহনলালরা যেমন আছেন—মীর জাফর, উমিচাঁদ, জগৎ শেঠরাও তেমনি সমানভাবে বিরাজিত।

সিদ্ধান্ত নিলাম, আমার চির-শুভাকাঙ্ক্ষী মিয়া মফিজউদ্দিনের বাড়িতেই সপরিবারে আপাতত আশ্রয় নিই। তার বাড়ি টঙ্গিবাড়ি থানায় এবং বেশ দূরে। মফি দা নিজে এসে আমাদেরকে নিয়ে গেলেন। রাতের অন্ধকারে সালেহা, হাবীবা ও রানাকে নিয়ে আমরা টঙ্গিবাড়ি থানার সেলিমপুর গ্রামের উদ্দেশে রওয়ানা হলাম। সালেহার যত দুশ্চিন্তা আমাকে নিয়ে। ও বারবার বলছে, আমাদেরকে যে কোন গ্রামে আত্মীয়দের সঙ্গে রেখে আমি যেন ভারতে চলে যাই।

ওর ধারণা, কোনভাবে খবর পেলে পাক বাহিনীর লোকেরা এসে আমাকে মেরে ফেলবে। ওর ধারণা অমূলক নয়। ছাত্রজীবনেও ওয়ারেন্ট ইস্যু হলে এই বাড়িতেই এসে লুকোতাম। বড় দা অন্য কোথাও পাঠিয়ে ভরসা পেতেন না। মাঝখানে মফি দাসহ দোগাছি রওয়ানা হয়ে মাঝপথ থেকে ফিরে এলাম। খবর পেলাম, আমার গ্রামে দুটি পাক সেনাদের হেলিকপ্টার নামে। পাঁচ-সাত গ্রামের মানুষ ভয় পেয়ে অন্যত্র পালিয়ে যায়। অনেকে পুকুরে নেমে কচুরিপানা মাথায় রেখে বাঁচার চেষ্টা করে। ওরা একটি বৃদ্ধ লোকের সাহায্যে আমার বাড়ি নির্দিষ্ট করে উড়ে চলে যায়। দোগাছি যাওয়া চলবে না। ওর ধারণা অমূলক নয়।

মফি দা পরামর্শ দিলেন, সালেহারা তার বাড়িতেই যতদিন প্রয়োজন থাকতে পারে। আমার অবিলম্বে চলে যাওয়া উচিত।

তিনি আমাকে এত ভালোবাসতেন যে, নিজেও আমার সঙ্গে যাবেন বলে স্থির করলেন এবং আমাকে ঠিক মতো পৌঁছে দিয়ে আল্লাহ্ যদি চাহেন ফিরে আসবেন।

মফি দা অনেক বয়সে, প্রায় মধ্যবয়সে বিয়ে করেছেন। তার নববিবাহিতা স্ত্রী তাকে ছাড়তে চায় না, সেটাই স্বাভাবিক। তিনি দৃঢ়তার সাথে বলেছিলেন, মোয়াজ্জেমকে নিরাপদে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব আমার। আমাকে বাধা দিয়ে লাভ নেই।

ইতিমধ্যে আমার পাশের এলাকায় এমপি এ. জামাল চৌধুরীর সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে। সেও আমাদের সহযাত্রী হচ্ছে। আমার বিশিষ্ট-কর্মী সুলতান, ঢালী মোয়াজ্জেম, খোকন, মঞ্জু, রানা তারাও মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে আমার সঙ্গে রওয়ানা হবে। মুন্সীগঞ্জ গিয়ে একটা বড় নৌকা ভাড়া করে এলাম—মাঝির বেশে গাওয়াল করতে যাব এই হবে আমাদের ছদ্ম আবরণ।

যথাসময়ে সবার কাছ থেকে বিদায় নিলাম। সালেহা, হাবীবা চোখের জলে বিড়বিড় করে আয়াত পাঠ করছে। কিন্তু এতটুকু রানাকে যখন বুকে নিলাম সে কিছুতেই আর নামবে না। ছোটশিশু হয়ত বুঝতে পেরেছিল বাবা তাকে ছেড়ে অনির্দিষ্টের পথে রওয়ানা দিচ্ছে। আবার কোনদিন দেখা হবে কি হবে না-আল্লাহ্ই জানেন। মফি দাদের বৃহৎ পরিবার। তার মা বেঁচে আছেন। আছে কয়েকজন ভাই, তাদের স্ত্রীরা আর ছোট বোন গোলাপ। আছে বাড়িভর্তি বাচ্চা-কাচ্চা। সালেহাদের কোন কষ্ট হবারই কথা নয়। কিন্তু ওদেরকে ছেড়ে আসতে মনে হচ্ছিল হৃদয়ের তন্ত্রীগুলো কেউ টেনে-হিঁচড়ে ছিঁড়ে ফেলছে।

রানাকে জোর করে নামিয়ে হাবীবার কোলে দিয়ে চোখ বন্ধ করে দৌড়ে ঘর থেকে বের হয়ে এলাম। আল্লাহ্, তুমি ওদের দেখো। ওদের দেখো...।

বিশাল একটা নৌকায় আমরা দু'জন জনপ্রতিনিধি আর পাঁচ-ছয় জন কর্মী মাঝি-মাল্লার পোশাক পরে মুন্সীগঞ্জের ঘাট থেকে রওয়ানা হলাম। আমাদের গন্তব্য আগরতলার সীমান্ত। কুমিল্লার ওপার পর্যন্ত নৌকাযোগে যাওয়ার পথ রয়েছে। আমরা খুব সাবধানে এবং সাধারণভাবে চলছি। সবকিছু খবরদারি

করার দায়িত্ব মফি দার। পরদিন দুপুরের পরে নৌকা যখন অনেকখানি নদীপথ অতিক্রম করেছে, হঠাৎ পেছন থেকে একটা সামরিক গানবোট আসতে দেখে আমরা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলাম। সন্দেহ হল আমাদের কথা কোনভাবে প্রকাশ হয়ে গেছে এবং পাক-গানবোট আমাদের গ্রেপ্তার বা হত্যা করতেই ছুটে আসছে। আমরা প্রাণভয়ে ভীত হয়ে পড়লাম।

আমার হঠাৎ কি হল বলতে পারব না। পরের সকালে নাস্তা করার জন্য দুপুরে মফি দা বেশ কয়েকটি মিষ্টি আলু সেদ্ধ করে রেখেছিল। আমার মনে হল শীঘ্রই তো আমাদেরকে শত্রুরা মেরে ফেলবে। তখন আলুগুলোর কী হবে? যেই ভাবা, সেই কাজ। সঙ্গে সঙ্গে আলুগুলো বের করে প্রত্যেককে একটি করে দিয়ে দিলাম। তাড়াতাড়ি খেয়ে নেওয়া যাক, সময় আর বেশি নেই। অন্য সবারও বোধহয় আমারই মতো মানসিক-বৈকল্য ঘটেছিল। সবাই আমরা কোন উচ্চবাচ্য না করে তাড়াতাড়ি আলুগুলো খেয়ে ফেললাম। একটা পবিত্র কর্তব্য সমাধা করতে পেরে আমরা নিশ্চিত এবং পরিতৃপ্ত।

পরে দেখা গেল গানবোটটি আমাদেরকে অনুসরণ করে ধাওয়া করেনি। তারা অন্য কোন কাজে যাচ্ছে। সেটি যখন নির্বিঘ্নে পাড় হয়ে গেল তখন সকলের স্বস্তি ফিরে এল। মফি দা বললেন, এটা কী হল? আলুগুলো খেয়ে ফেললে কেন?

তারপর আমাকে বললেন, তুই আলুগুলো এভাবে শেষ করে দিলি! কাল সকালে নাস্তা হবে কী দিয়ে?

আমি বললাম, আমি না হয় ওগুলো বিলিয়ে ভুল করেছি। কিন্তু আপনারা সবাই সেগুলো খেয়ে ফেললেন কি মনে করে?

সকলের সম্মিলিত হাসির শব্দ নদীর কলকলের সাথে মিশে গেল।

রাত্রি যাপনের জন্য আমরা বাঞ্ছারামপুর থানার একটি বাজারের কাছাকাছি নোঙর ফেললাম। আরও অনেক নৌকা খালে বাঁধা আছে। রাত কাটিয়ে সকালে আবার যাত্রা শুরু হবে। নৌকার প্রকৃত মাঝিদের বিশ্রাম প্রয়োজন। সময়টি এমনি ছিল যে, কোন কিছুকে সহজভাবে নেওয়া মানসিক দিক থেকে সম্ভব নয়। প্রায় সবখানেই এলাকার যুবকেরা রাত্রি জেগে পাহারা দিত যাতে কোন দুর্ঘটনা না ঘটে বা পাকিস্তানি দুশমনদের অতর্কিত হামলা এসে না পৌঁছে। তারা সবাই সতর্ক থাকত।

নৌকার ভিতরে আমরা নিজেদের মধ্যে গল্পগুজব করছিলাম। কখন নিজেদের নকল রূপ ভুলে গেছি খেয়াল নেই। কথাবার্তার কোন কোন পর্যায়ে আমরা ইংরেজি শব্দও ব্যবহার করছিলাম। নৌকার মাঝি-মাল্লারা ইংরেজি বলবে এটা স্বাভাবিক নয়। ডাল মে কুছ কালা হায়!

কেউ গিয়ে সদা প্রহরারত যুবকদের খবর দিল। তারা এসে আমাদের কথাবার্তা নিভৃতে শুনে আরও লোক ডেকে এনে আমাদের চ্যালেঞ্জ করল।

সঙ্গে নানা রকম অস্ত্রপাতিও নজরে এল। মহা মুশকিলে পড়া গেল। সত্য পরিচয় দেওয়াও বিপজ্জনক। আবার মিথ্যা বলেও পার পাওয়া যাবে না। এক দফা বাকযুদ্ধ হওয়ার পর বুঝলাম এভাবে চললে অসুবিধায় পড়ে যাব। বললাম, আপনাদের যিনি নেতৃস্থানীয় তিনি যদি নৌকায় উঠে আসেন তা হলে ভালো হয়।

পাড়ে শত শত লোক মারমুখী হয়ে রয়েছে। তাদেরকে কিছুটা শান্ত করে এক যুবক নৌকায় উঠে এল। তাকে একান্তে আমাদের পরিচয় দিতেই আমাকে জড়িয়ে ধরল। বলল, মোয়াজ্জেম ভাই, আমি আপনারই এক কর্মী ছিলাম। লেখাপড়া শেষ করে এখন স্থানীয় কলেজে অধ্যাপনা করছি।

এতদিনে তার নাম ভুলে গেছি। সে সকলকে বলল, সব ঠিক আছে। ইনারা পরিচিত।

আস্তে আস্তে ভিড় কমে গেলেও কয়েকজন রাতভর সতর্ক পাহারায় থাকল। তরুণ অধ্যাপক আমাদেরকে তার বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার জন্য অনেক ঝুলাঝুলি করল। আমরা সম্মত হলাম না, খুব ভোরে নৌকা ছেড়ে দেব। শেষ পর্যন্ত বাজারের রসগোল্লা সহযোগে আমাদের আপ্যায়ন করে সে বিদায় নিল।

সেই যাত্রায় আমরা প্রথম মুক্তিযুদ্ধ প্রত্যক্ষ করলাম। আমরা দেখতে পেলাম নদীর পশ্চিম প্রান্তে সৈন্যদের দুটি জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে। তাদের উদ্দেশ্য কি জানি না। আমরাও প্রায় নবীনগরের প্রান্তে এসে পৌঁছেছি। সন্ধ্যা আসন্ন। ঠিক করলাম, পূর্ব পারে নেমে হাঁটাপথে নবীনগর গিয়ে রাত্রি যাপন করে সকালে আবার যাত্রা শুরু করব।

নৌকা থেকে নামছি, দেখি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার প্রখ্যাত মুক্তিযোদ্ধা এককালীন বিশিষ্ট ছাত্রলীগ কর্মী লতিফ এবং আরও কয়েকজন কাঁধে বিচিত্র সব অস্ত্রপাতি নিয়ে নদীতে নামছে। আমাদেরকে দেখতে পেয়ে লতিফ বলে উঠল, মোয়াজ্জেম ভাই, ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ন। নবীনগর ডাকবাংলোয় চলে যান। আমরা এই জাহাজ দুটো আক্রমণ করব।

আমরা দৌড়তে শুরু করতেই মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি সেনাদের জাহাজ দুটিকে ঘায়েল করে দিল। বিকট শব্দ হতেই একটি জাহাজ প্রায় ডুবে গেল। বেশ হতাহত হল। তারা প্রথমদিকে হকচকিয়ে গেলেও পরক্ষণেই প্রতি আক্রমণ করতে থাকল। অক্ষত জাহাজটি থেকে ক্রমাগত গোলা নিক্ষেপ করতে থাকল। আমার জীবনের প্রথম অভিজ্ঞতা। চারদিকে তখন চিৎকার-চেঁচামেচি, আগুন এবং গুলির শব্দ। সন্ধ্যার প্রাক্কালে ঘরে ফেরার আয়োজনরত মানুষেরা, গৃহকর্মের সমাপ্তি টেনে বিশ্রামে যাবার উদ্যোগরত গৃহবধূ। হঠাৎ গোলার আঘাতে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে যে যেদিকে পারল দৌড়তে শুরু করল।

পাক সেনাদের ক্ষয়ক্ষতি কি পরিমাণ হয়েছিল জানি না। কিন্তু সেই অঞ্চলের মানুষরা জীবনে অকস্মাৎ কেয়ামত প্রত্যক্ষ করল। কিছুক্ষণের মধ্যে নিজস্ব রেডিওতে খবর পেয়ে দুটো বোমারু বিমান উড়ে এল এবং চারদিকে ক্রমাগত গোলাগুলি এবং বোমা ছুঁড়তে লাগল। সমগ্র এলাকাটি একটি একতরফা যুদ্ধবিধ্বস্ত এলাকায় রূপান্তরিত হয়ে গেল। বাড়িঘরে বোমার কারণে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। আর গুলিতে আহত-নিহত সংখ্যাতীত।

সন্ধ্যা নেমে এসেছে। কিছু দেখা যাচ্ছে না। যারা অক্ষত ছিল, বেঁচে ছিল, তারা ঘরদোর ফেলে প্রাণভয়ে যে যেদিকে পারল ছিটকে পড়ল। স্বামী একদিকে, স্ত্রী অন্যদিকে। সন্তানদের সংবাদ নেই। ভাই-বোন, বাবা-মা কে কোথায়! বেঁচে কি মরে, কেউ বলতে পারছে না। কিন্তু ছোটার কোন বিরাম নেই। সবকিছুকে ছাড়িয়ে নিজের জীবনকে রক্ষার সেই উদগ্রবাসনা লক্ষ্য করলাম সকলের মধ্যে। তখন অন্য কারো দিকে তাকাবার সময় নেই। নিজে বাঁচলে বাবার নাম।

আমরা উপায়ান্তর না দেখে একটা ডোবা-পুকুরে আশ্রয় নিলাম। শরীর পানিতে ডুবিয়ে কেবল শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়ার জন্য নাসিকা যন্ত্রটি উপরে তুলে রাখলাম। দল আমাদের ভেঙে গেছে। কয়েকজন কোথায় হারিয়ে গেছে জানি না। বেঁচে আছে কিনা জানি না। যদি বেঁচে থাকে, তারা শুনেছে নবীনগর ডাকবাংলোয় আমাদের যাওয়ার কথা। প্রায় আধ ঘণ্টা একযোগে জাহাজ এবং বিমান থেকে বিরামহীন গোলাবর্ষণের পর শত্রুরা সেই যাত্রা যুদ্ধ বিরতি করে। ইতিমধ্যে সারাটা এলাকায় যা ঘটার ঘটে গেছে। কয়েকটি গ্রাম প্রায় নিচিহ্ন-ভস্মীভূত।

মুক্তিযোদ্ধাদের এ ধরনের গেরিলা আক্রমণকে সমর্থন করব, না এর ভয়াবহ পরিণতি বিবেচনায় একে নিরুৎসাহিত করব বুঝে উঠতে পারলাম না। মাত্র কয়েকজন পাক সেনা এবং তাদের একটি যুদ্ধযান বিনষ্ট করার বিনিময়ে আমাদের যে ক্ষয়ক্ষতি হয়ে গেল তা পূরণ হবে কীভাবে। কালও যে কৃষকের গোলাভরা ধান আর মাঠভরা ফসল ছিল আজ সে নিঃস্ব—সব পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। কালও যে গৃহকোণ শান্তি ও কোলাহলে সমৃদ্ধ ছিল আজ তা আগুনের লেলিহান শিখার শিকার।

একটি দেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে এ মূল্য হয়ত যথেষ্ট নয়। কিন্তু যাদের জন্য স্বাধীনতা, তাদেরকেই যদি সব হারাতে হয়, তা হলে তাদের প্রাপ্যের ভাগে যে শূন্য পড়ে।

গোলাগুলি থামতে পুকুর থেকে উঠে সহযাত্রীদের নিষ্ফল খোঁজা শেষ করে হাঁটা ধরলাম নবীনগর শহরের দিকে। হাজারো মানুষের কাফেলা চলছে না দৌড়চ্ছে! এক বৃদ্ধা মহিলা একটা মোরগ বুকে নিয়ে দৌড়চ্ছে আর বারবার চিৎকার করছে, বাবা হান্নান, বাবা হান্নান তুই কোথায়?

তার হান্নানের খবর নেই। কে দেবে জবাব? এক যুবককে দেখলাম কাঁধে তার বৃদ্ধা মা। ছেলের ঘাড়ে এলিয়ে আছে। ছেলে দৌড়চ্ছে চলচ্ছক্তিরহিত বৃদ্ধা জননীকে কাঁধে নিয়ে। মা এক সন্তান কোলে নিয়ে দৌড়চ্ছে বাকি সন্তানদের জন্য আহাজারি করতে করতে। কিন্তু বিরাম নেই চলার—পেছনে যে আজরাইলের পদধ্বনি শোনা যায়।

অনেক কষ্টে ডাকবাংলোয় পৌঁছে পিয়ন খুঁজে পাই না। তালা ভেঙে ঘরে ঢুকে গোসল করলাম। পরে কয়েকজন লোক এলে দলীয় নেতা-কর্মীদের তত্ত্বতালাশ নিলাম। বর্ডার এলাকা বিধায় অনেকেই ওপারে চলে গিয়েছে জানলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের হারানো সহযাত্রীরা এসে উপস্থিত। পুনর্মিলন আনন্দঘন হল। লোকজন পরামর্শ দিল রাতের মধ্যেই যতটা সম্ভব এগিয়ে যাওয়া শ্রেয়। দিনের বেলা নানা ঝামেলার সম্ভাবনা। একটু বিশ্রাম করে আবার রওয়ানা হলাম। জামাল চৌধুরী একসময় ছিল ফ্লাইট লেফটেনেন্ট। বেশি হাঁটতে পারে না। আমাকে বারবার বলছিল কোথাও আশ্রয় নিয়ে একটু ঘুমোবার আয়োজন করতে। অনেক রাতে এক বাড়িতে ঢুকে আশ্রয় চাইলাম। বাড়ির মালিক লোক ভালোই। বলল, বাড়ি ভর্তি লোক, আশ্রয় দেবার ইচ্ছা আছে। কিন্তু স্থান নেই।

পরে কি মনে করে বলল, গোয়ালঘরে অনেক লোক ঢুকে পড়ছে। আপনারাও ইচ্ছা করলে সেখানে রাত কাটাতে পারেন।

তাকে ধন্যবাদ দিয়ে গোয়ালঘরে ঢুকেই যে যেখানে জায়গা পেলাম মাটিতেই শুয়ে পড়লাম। কখন ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছি, হঠাৎ মুখে গরম কিছু একটা লাগতে উঠে দেখি ভোর হতে আর দেরি নেই। একটি ছাগল আমার মুখটিকে টয়লেট মনে করে তার প্রাতঃকৃত্য সারছে। লেজুড় নড়ে খেজুর পড়ে।

সকলকে উঠিয়ে আবার হাঁটা শুরু করা গেল। প্রায় সারাদিন হাঁটার পর ঢাকা কোর্টের এক পরিচিত উকিলের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সে পাশের গ্রামের একজনের নাম দিল যার কাজ হচ্ছে পয়সার বিনিময়ে ওপারে লোক পাচার করা। এখন তার ব্যবসা জমজমাট। প্রতিদিন শ'য়ে শ'য়ে লোক ওপারে পাঠাচ্ছে। এখানে একটি নদী আছে যা পার হয়ে মাইলখানেক চড়াই করলেই আগরতলা রাজ্যের সীমানা।

উকিল সাহেবের পরিচয় দিয়ে পাচারকারী দলিলউদ্দীনের বাড়িতে উপস্থিত হলাম। তার বাড়িতে অনেকগুলো ঘর। সব গিজ্‌গিজ্‌ করছে লোকজনে। পাচারের অপেক্ষায়। দিনক্ষণ দেখে সব ব্যবস্থা পাকা করে দলিলউদ্দীন লোক পাঠায়—কাঁচা কাজ সে করে না।

আমরা বর্ডারের প্রায় কাছেই এসে পড়েছি। মনে কিছুটা সাহস ফিরে আসতে শুরু করেছে। জামাল চৌধুরী ও আমার রিভলবার দেখে দলিলউদ্দীন

একটু ঘাবড়ে গেল। জিজ্ঞেস করল, স্যার, আপনারা কি মুক্তির লোক? মুক্তির লোক হলে আমি পয়সা নিয়ে পার করি না।

বললাম, বিনা পয়সায়ই করো। কিন্তু পার করো ভাই দলিলউদ্দীন।

অশিক্ষিত এই গ্রাম্য দালাল শ্রেণীর লোকটি বলে উঠল, আমাকে ভাই ডাকলেন? ঠিক আছে, ভাইয়ের মতো কাজ করব। আমার এখানে চারটা ডাল-ভাত খান, বিশ্রাম নেন। ঠিক সময়ে আমি লোক দিয়ে পাঠিয়ে দেব, চিন্তার কারণ নেই।

আমরা ক্ষুৎপিপাসায় কাতর। সহজেই তার আতিথ্য গ্রহণ করলাম। অত্যন্ত ঝাল দিয়ে রান্না শোল মাছের ঝোলে নাকের পানি, চোখের পানি মিশিয়ে পেটভরে ভাত খেলাম। দলিলউদ্দীনের ছয়-সাত বছরের মেয়েটি তদারকি করল।

বিদায়ের সময় মেয়েটির হাতে দশটি টাকা গুঁজে দিতেই দলিলউদ্দীন বলল, স্যার, ওটা করবেন না। আপনাদের থেকে পয়সা নিতে পারব না।

তাকে আশ্বস্ত করে বললাম, পয়সা নিলে তো অনেক টাকাই নিতে পারতে। চাচা হিসাবে তোমার মেয়েকে মিষ্টি খেতে দিলাম।

দ্বিপ্রহরের পর দলিলউদ্দীন আমাদের তার বিশ্বস্ত দু'জন লোকের উপর হাওলা করে দিল। তারা আমাদেরকে কিছুটা হাঁটিয়ে এক স্থানে নিয়ে এক দ্রুতগামী কোষা-নৌকায় তুলল। ঘণ্টাখানেক কোষা চালিয়ে তারা আমাদের এক জায়গায় নামিয়ে দিল, সোজা উত্তরে মাইলখানেক গেলেই লালমাটি দেখতে পাবেন—কিছুটা চড়াই আছে মাটির পাহাড়, ওটা পার হলেই বাংলাদেশ শেষ। শুরু হবে আগরতলা, ভারতবর্ষ।

নৌকা থেকে নেমে দ্রুত মাইলখানেক পার হলে প্রথমে লালমাটি এবং পরে একটি মাটির পাহাড় উৎরাই করে যখন নেমে এলাম তখন নিজ দেশ পেছনে ফেলে এসেছি। দেশেরই জন্য দেশছাড়া হয়ে ভিন্ন দেশে আশ্রয় নিতে এসে অন্তর ভেদ করে কান্না আসতে লাগল। অনেক কষ্ট সামলে নিয়ে এগিয়ে চললাম বর্ডারের ওপারে ভারতীয় স্বেচ্ছাসেবকদের ছাউনির দিকে।

ইতিপূর্বে কোনদিন ভারত আসার সুযোগ হয়নি। ভিন্নদেশে বেড়াতে গেলে একটা নতুন অনুভূতি হৃদয়কে স্পর্শ করে—আজ তা উপলব্ধি করছি না। বিষণ্ন মনে এগিয়ে গেলাম। ওরা অভ্যর্থনা কেন্দ্র খুলে বাংলাদেশী শরণার্থীদের বিলি-ব্যবস্থা করছে। আমাদের কর্মীরা কেউ আমাদের দু'জনার পরিচয় দিতেই ওরা ব্যস্ত হয়ে পড়ল। ভারতে পার্লামেন্ট সদস্যের প্রভূত মর্যাদা দেওয়া হয়। আমরাও ভিন্ন দেশের পার্লামেন্ট সদস্য। ওরা যথোপযুক্ত মর্যাদা সহকারে আমাদের বাসযোগে শহরে পাঠিয়ে দিল। সেখানে বাংলাদেশের অফিস খোলা হয়েছে। আমাদেরকে সেখানে যেতে হবে।

অফিসে পৌঁছে কয়েকজন পরিচিত লোক পেলাম। সেই অফিসে কি হচ্ছে

বুঝলাম না! একজন লোককে টাইপরাইটার নিয়ে খট্‌খট্‌ করতেও দেখা গেল। জানা গেল, আমাদের দু'জন এমপি'র জন্য থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা অফিসেই হবে। কিন্তু অন্যদের ব্যবস্থা অন্যত্র নিজেদেরকেই করতে হবে।

আগরতলা শহর আমাদের অজানা স্থান। পরিচিত কোন বাসিন্দাও নেই। কোন হোটেলেও বিন্দুমাত্র স্থান নেই। সব বাংলাদেশের লোকেরা নিয়ে নিয়েছে। সঙ্গের লোকজনদের নিয়ে মহাসঙ্কটে পড়লাম। কয়েকদিনের নির্ঘুম এবং দীর্ঘপথ হেঁটে পাড়ি দেওয়ার কারণে সকলেই যারপরনাই ক্লান্ত। ওদেরকে নিয়ে একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকলাম কিছু খেয়ে নেওয়ার জন্য। সেখানে সৌভাগ্যক্রমে আবুল বাসার মৃধাকে পেয়ে গেলাম। আমাদের সময়ের ছাত্রলীগের নেতৃস্থানীয় কয়েকজনের একজন। ওকে আমাদের ছাত্রদের তরফ থেকে বিডি মেম্বারও নির্বাচিত করেছিলাম। বাসার মৃধা আমার অত্যন্ত আপনজন। সে এখন বেঁচে নেই। অসময়েই এই পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে। কিন্তু যতদিন বেঁচে ছিল, আমার সঙ্গে তার ছিল প্রীতি ও বন্ধুত্বের অটুট সম্পর্ক। আমার সম্পর্কে কেউ তিক্ত মন্তব্য করলে নির্ঘাত বাসারের সঙ্গে তার বিবাদ বেঁধে যেত। বাসারের বউ ওকে ঠাট্টা করে বলত, তুমি সারাদিনে যতবার মোয়াজ্জেম ভাইয়ের নাম নাও, ততবার আল্লাহ্‌র নাম নিলে এতদিনে একজন ওলিআল্লাহ্‌ হয়ে যেতে।

বাসারকে পেয়ে আমি হাতে স্বর্গ পেলাম। তাকে সমস্যা জানালাম। রাতের মতো কর্মীদের একটা ব্যবস্থা করার অনুরোধ করলাম।

বাসার বলল, ভাই, আগরতলা একটা ছোট্ট শহর। লোক এসে গেছে অগণিত। কোথাও মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই।

আমাদের দুরবস্থা দেখে পরে বলল, আজকের রাতের মতো একটা কাজ করা যায়। আমি এখানকার এক হিন্দু পরিবারের বাইরের ঘরে একটা চৌকিতে রাত কাটাই। আজ রাতের জন্য আমার স্থানটি এদেরকে ছেড়ে দিচ্ছি। এরা কোন প্রকারে একটু বিশ্রাম নিক। আজ শোয়া বাতিল।

মফি দা সব দেখেশুনে বললেন, আমি কালই ফিরে যাব। তুই নিরাপদে পৌঁছে গেছিস। এ সংবাদ দেশে না পৌঁছানো পর্যন্ত শান্তি পাচ্ছি না।

তার আরও বিশ্রামের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু উপায় কী? অন্য কর্মীরা বলল, তারা পরদিন যেখানে হোক বা কোন উদ্বাস্তু ক্যাম্পেই হোক, জায়গা খুঁজে নেবে।

একটি চৌকি সম্বল করে তারা সে রাতের মতো আড়াআড়ি শুয়ে পড়ল। আমরা দু'জন বাংলাদেশের অফিস বাড়িতে এসে উঠলাম।

সুলতান জানিয়েছিল, ওর বাবা এখনও কলকাতায়ই বেশির ভাগ সময় বসবাস করেন। তার মা এবং ছোট বোন স্বামী-কন্যাদের নিয়ে সেখানে

থাকেন। তারা সকলেই ভারতীয় নাগরিক। কলকাতায় গিয়ে ওখানেই ওঠা যাবে এটা স্থির করা ছিল। সুলতানকে বাসারের হেফাজতে আরও দু'-একদিন রাখা সাব্যস্ত করলাম।

কলকাতা যেতে হবে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সেটাই অস্থায়ী হেড-কোয়ার্টার। আমাদের সব কেন্দ্রীয় দফতরই সেখানে চালু হয়েছে। আগরতলা এসেই জানতে পারলাম আনুষ্ঠানিকভাবে কুষ্টিয়ার মেহেরপুরের আম্রকানন তথা মুজিবনগরে বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠা হয়ে গিয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাষ্ট্রপতি, সৈয়দ নজরুল ইসলাম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি, তাজউদ্দীন আহমেদ প্রধানমন্ত্রী, ক্যাপ্টেন মনসুর আহমেদ, কামরুজ্জামান সাহেব এবং খন্দকার মোশতাক আহমেদ মন্ত্রীসভার সদস্য। বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে তাঁরা আমাদের সিনিয়র নেতা। জেনারেল ওসমানীকে মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়কের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

অবিলম্বে কলকাতা যাওয়া প্রয়োজন। ট্রেনে যাওয়া যাবে না। প্রায় তিন-চার দিন লেগে যায়। কাজেই প্লেনেই যেতে হবে। জামাল চৌধুরী আগেই চলে গেল। এমপি হিসাবে টিকিট পেতে খুব বেগ পেতে হল না। মুশকিল হল আমাকে একা গেলে চলবে না, সুলতানকে সাথে নিয়ে যেতে হবে। তার জন্য প্লেনের টিকিট পাচ্ছি না।

নিজে ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করে সব খুলে বলাতে কাজ হল। তিনি দুটি টিকিটের ব্যবস্থা করে দিলেন। ফকার ফ্রেন্ডশীপের ছোট প্লেন। আসামের গৌহাটিতে অবতরণ করে পুনরায় আকাশে ওড়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রবল ঝড়ে পতিত হল। বিমানে বিপদের সম্মুখীন হওয়ার সেটাই আমাদের প্রথম অভিজ্ঞতা। কী নিদারুণ সেই অভিজ্ঞতা! ঝড়ের প্রকোপে প্রবল বাতাসের সময় একটা উড়ন্ত ঘুড়ির যে অবস্থা হয়, ঠিক সেই রকম হল। এই একদিকে কাত হয়ে নিচে পড়ে যাচ্ছে, পর মুহূর্তে আবার ধাক্কা খেয়ে বহু উপরে উঠে যাচ্ছে। প্রকৃতি যেন উড়োজাহাজটিকে নিয়ে ছেলেখেলায় মেতেছে। একটি বাচ্চা ছেলে পানিভর্তি বালতির মধ্যে একটা খোলা ম্যাচ-বাক্স দিয়ে যেভাবে খেলা করে, তেমনিভাবে প্রচণ্ড ঝড় প্লেনটিকে ঝাঁকাতে থাকল। যাত্রীরা প্রায় সবাই বমি করে দিল। কারো কারো পরিধের কাপড় নষ্ট হয়ে গেল। নিদারুণ ঝাঁকুনির ফলে প্লেনের সেবিকা মেয়েটিও তখন ধুঁকছে। কে কাকে সাহায্য করে! দীর্ঘক্ষণ ধরে চলল এই তাণ্ডব লীলা।

সুলতান কয়েক দফা বমির পর অতি কষ্টে আমার হাত চেপে ধরে বলল, দাদা, আপনাকে নিয়ে কলকাতা যাবার কত সাধ ছিল! তা আর হল না। এত বিপদ-আপদ কাটিয়ে এসে এভাবে আমাদের জীবনাবসান হবে ভাবতে পারিনি!

আমার অবস্থাও প্রায় ওরই মতো। তবুও কে যেন আমার ভিতর থেকে বলে উঠল, না, এভাবে আমাদের মৃত্যু হবে না। আল্লাহ্‌র এরকম ইচ্ছা হতে পারে না। আরও অনেক কিছু করার বাকি। দেশ স্বাধীন না করে মরলে যে মরেও শান্তি পাব না।

আল্লাহ্ তা'আলা সে যাত্রায় প্লেনটি রক্ষা করলেন। আমরাও সন্ধ্যার পর ধুঁকতে ধুঁকতে কলকাতার দমদম বিমানবন্দরে অবতরণ করলাম। জব চার্ণকের প্রতিষ্ঠিত একসময় ইংরেজদের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর, পৃথিবীর অন্যতম ঘনবসতির মহানগর কলকাতার মাটিতে প্রথম পা রাখলাম '৭১-এর এপ্রিলের তৃতীয় সপ্তাহে।

ট্যাক্সি নিয়ে পুরনো কলকাতার বড় বাজারের সন্নিকটে রতু সরকার লেনে সুলতানদের বাসায় উপস্থিত হলাম। বহুতল বিরাট ইমারতের গোটা তিনেক রুম নিয়ে তারা থাকে। কত যে ঘর আর কত জাতের মানুষ যে সেখানে বসবাস করে মাবুদই জানেন। তবে অবাঙালি মুসলমানদের সংখ্যাই বেশি। গেটে দড়ির খাটিয়ায় কাত হয়ে পড়ে রয়েছে একটা ছোটখাটো হাতির সাইজের দারোয়ান। তার কোন কাজ করতে হয় না। তাকে দেখলেই অবাঞ্ছিত লোকজন আঁৎকে সট্‌কে পড়বে।

সুলতানের বাবা প্রথমে বুঝতে পারেনি পেছনের মানুষটি কে। সুলতান বলল, বাড়িতে যাকে একবার মালা দিয়ে বরণ করেছিলেন, তিনিই এসেছেন।

এতক্ষণে আমাকে চিনতে পারলেন এবং ব্যস্ত হয়ে পড়লেন কোথায় রাখবেন, কি খাওয়াবেন। তখনই লোক পাঠিয়ে কলকাতার বিখ্যাত রয়েলের চাপ আনালেন। বললাম, চাচা, ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? এক-দু'বেলার জন্য তো আসিনি। আল্লাহ্ জানেন কতদিন থাকতে হবে।

তিনি বললেন, তোমাকে বেশিদিন থাকতে না হোক, এই দোয়াই করি। তবে যতদিন প্রয়োজন নিজের ঘর মনে করে থাকবে। আমার কাছে সুলতানও যেমন তুমিও তেমন।

তাঁর স্ত্রীও এসে দেখা দিলেন এবং একই কথা বললেন। সুলতানের বোন পারুল আর একজন বড় ভাই পেয়ে আনন্দে আটখানা। ওর দুটি ছোট ছোট মেয়েও একজন বড় মামা পেয়ে গেল। বস্তুত আমাকে পেয়ে তারা সবাই আনন্দিত হল এবং সম্মানিত বোধ করল। সকলে মিলে যে যত্নআত্তি শুরু করল তাতে আমি লজ্জায় পড়ে গেলাম। একদিন পূর্ণ বিশ্রাম করে বের হলাম সহকর্মীদের খুঁজে বের করতে।

সুলতান অনেকদিন কলকাতাতে কাটিয়েছে। সে আমার গাইড। প্রথম গেলাম ৮ নম্বর থিয়েটার রোডে বাংলাদেশের অস্থায়ী সেক্রেটারিয়েটে। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রীত্রয় এবং জেনারেল ওসমানী বসেন এখানটায়। প্রথমদিকে তাঁরা সবাই রাত্রিও যাপন করতেন এখানে। অফিসের কাজকর্মও চলে এখান থেকে। সাধারণত বাইরের কাউকে ঢুকতে দেওয়া হয় না। কিন্তু দেশ থেকে বিতাড়িত বা চলে আসা রাজনৈতিক নেতা-কর্মীরা হন্যে হয়ে রয়েছে। তারা ঢুকবেই। এতে গার্ডদের সঙ্গে প্রায়ই গণ্ডগোল হচ্ছে।

এই বাড়িটির ইতিহাস আছে। ব্রিটিশ আমলে এখানেই ছিল টর্চার চেম্বার। সেদিনের স্বদেশীদের ধরে এনে এর চার দেয়ালের মধ্যেই শায়েস্তা করা হত।

আজ ইতিহাস পাল্টে গেছে। ইংরেজদের কূটকৌশলে এবং অবশ্যম্ভাবী কারণে অবিভক্ত ভারত দু'খণ্ড হয়ে দুটি দেশে রূপান্তরিত হয়েছিল। তাদের একটি আজ ভেঙে আবার দুটি দেশে রূপান্তরিত হতে যাচ্ছে। এক অংশের স্বাধীনতার কাজটিও সমাধা হচ্ছে এই বাড়িটির মধ্যেই।

নেতৃবৃন্দের দেখা পেলাম। কথাবার্তা হল। তাঁরা বললেন, কাজে লেগে যাও।

আমি বললাম, সেই জন্যই তো আসা। কাজ দিন।

তাঁরা বললেন, অপেক্ষা কর, অনেক কাজ করতে হবে।

মনসুর ভাই পৃথকভাবে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় উঠেছ?

বললাম, এক কর্মীর সঙ্গে আপাতত আছি।

তিনি বললেন, তুমি এখানেই থেকে যাও।

একবার ভাবলাম তা-ই করি। কিন্তু অন্য নেতৃবৃন্দ আর কিছু না বলাতে ওখান থেকে সেদিনের মতো বের হয়ে এলাম।

অধ্যাপক ইউসুফ আলী ছিলেন অস্থায়ী সরকারের চিফ হুইপ। আমার বিশেষ আপনজন। বড় ভাই এবং বন্ধু। তাকে খুঁজতে কীড্ স্ট্রিটে পশ্চিম বঙ্গ বিধান সভার হোস্টেলে গেলাম। ইউসুফ ভাই, সোহরাব ভাই এবং আরও অনেককে পেলাম। সবাই সানন্দে আলিঙ্গনাবদ্ধ করল। যারপরনাই খুশি হলেন ইউসুফ ভাই। তিনি সেখানেই আস্তানা গেড়েছেন। আমার পরিবারের খোঁজ-খবর নিলেন। নিজের পরিবার বর্ডারের এপারে পশ্চিম দিনাজপুরে রেখেছেন জানালেন।

আরও বললেন, এবার স্ত্রী ও ছেলেকে আনাবার ব্যবস্থা করুন। এ যুদ্ধ কতদিন চলবে বলা দুষ্কর। ভারত এত করছে, তারপরও তারা এখনও স্বীকৃতি দেয়নি।

সারাদিন কাটল তাঁর সঙ্গে। কাল আবার সকালে আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সুলতানকে নিয়ে ওদের বাসায় ফিরে এলাম। বাসে, ট্রেনে আমাদের পয়সা লাগে না। 'জয় বাংলা' বললেই তারা বুঝতে পারে। প্রায় সকলেই আমাদেরকে সাহায্য করতে দু'হাত বাড়িয়ে রয়েছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হোক, তার চাইতেও বড় কথা তাদের চিরবৈরী পাকিস্তান ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাক—এটা

প্রতিটি ভারতীয় হিন্দু নাগরিকের মনোবাঞ্ছা। সেজন্য তারা যে কোন ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত।

স্বাধীনতার সপক্ষে আদর্শবাদীতার কারণে অনেকে এসে দাঁড়িয়েছে। আন্তর্জাতিক কারণেও রুশপন্থী অনেক ভারতীয় বাংলাদেশের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি রাখে। তবে সবকিছু ছাড়িয়ে ভাষার কারণে, সংস্কৃতির টানে ওপারের বাংলা ভাষাভাষীরা এপারের ভাই-বোনদের জন্য হৃদয়ের টান অনুভব করে। পূর্ববাংলা থেকে পাকিস্তান সৃষ্টিতে যারা চলে এসেছিল তারাও তাদের পৈতৃক-ভিটার স্বাধীনতা সংগ্রামে অবদান রাখতে চায়। সর্বত্র জয় বাংলার ধ্বনি উচ্চারিত হয়। কত সভা সমাবেশ, কত শোভাযাত্রা আর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান—তার ইয়ত্তা নেই। সবই বাংলার মানুষের সহায়তার জন্য। পশ্চিম বঙ্গের প্রতিটি হিন্দু পুরুষ-মহিলার মধ্যে আমাদের জন্য এক গভীর মমত্ববোধ লক্ষ্য করে মুগ্ধ হয়েছি। যে ভালোবাসা ও দরদ দিয়ে তারা সেদিন আমাদের গ্রহণ করেছিল, রাজনৈতিক কারণ বিশ্লেষণ না করেও তার তুলনা পাওয়া দুষ্কর। মানুষ যেন 'জয় বাংলা' বলতে পাগল।

একদিন ভাষার জন্য রক্ত দিয়ে আমরা বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠা করে ওদের কাছে চিরদিনের জন্য বীরের সম্মান ভোগ করছি। আজ আবার স্বাধীনতার লড়াইয়ে নেমে বাঙালির ইতিহাসে আর এক বিস্ময় সৃষ্টি করতে চলেছি। কেবল প্রীতি আর সমমর্মিতাই নয়, ওদের হৃদয়ে আমাদের সাহসী ভূমিকার জন্য রয়েছে গভীর শ্রদ্ধাবোধ। সর্বত্র তার প্রাণঢালা প্রমাণ পেয়েছি। সকল দলমত মিলে তারা তৈরি করছে বাংলাদেশ সহায়ক কমিটি। বিরাট অফিস খুলে তারা দিবা-রাত্রি কাজ করে যাচ্ছে বাংলাদেশের মানুষ এবং তাদের সংগ্রামকে সাহায্য করার জন্য। ভারতীয় মুসলমানদের সম্বন্ধে সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া আমার অভিজ্ঞতা তিক্ত। তাদের ধারণা, ওদের শেষ ভরসাস্থল পাকিস্তানকে আমরা ভেঙে দিলাম। আমরা গাদ্দার। ভারতীয় হয়েও ওরা পাকিস্তানি। 'ভাত খায় ভাতারের—গীত গায় নাগরের' মতো অবস্থা।

হিন্দু ভাই-বোনেরা যেমনি করে হৃদয়ের দ্বার খুলে দিয়েছে, তাদের যা কিছু ছিল সবকিছু দিয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে, তার বিপরীতে দেখেছি, ভারতের পার্লামেন্টে ভাষণের পর কলকাতার ট্রাম ডিপোতে অবাঙালি মুসলমান আমাকে মারার জন্য ছুরিকাঘাত করেছে। অল্পের দরুন বেঁচে যাই। যার জন্য শেষ পর্যন্ত পশ্চিম বঙ্গ পুলিশ সাদা পোশাকে আমাকে সার্বক্ষণিক প্রটেকশন দিয়েছে।

কলকাতা মহানগর—তার নিজস্ব মোহ আছে। চারদিকে ছড়ানো কত আনন্দের হাতছানি। নিত্য নতুন উন্মাদনা। সর্বত্র জীবনের স্পন্দন। আমাদের যুবকদের কেউ কেউ নতুন এসে কিঞ্চিত বেসামাল হয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়।

কেউ কলকাতা এলে সহজে যেতে চায় না। টাকা-পয়সা থাকলে নাটক, সিনেমা আর কত না আনন্দের আয়োজন।

বাংলাদেশ থেকে যারা এসেছে, এদের মধ্যে দুটো প্রবণতা দেখলাম। একদল লোক, বড় বড় নেতাও আছে, আরাম-আয়েশে দিল্লী-কলকাতার জীবন ভোগ করতে চায়। এদের মধ্যে অনেকে দেশ থেকে ট্রেজারি-ব্যাংক লুট করে টাকা নিয়ে এসেছে কিন্তু সরকারে জমা দেয়নি। দিয়ে থাকলে সামান্য দিয়েছে। তাদের দেখলে অবাক লাগত। আমরা না দেশের জন্য এসেছি! আমরা না স্বাধীনতার লড়াই করতে চলেছি! আমরা না সব আপনজনদের সীমান্তের ওপারে আগুনের মধ্যে রেখে এসেছি!

কাকস্য পরিবেদনা। কে শোনে কার কথা! রাস্তায় দেখা হলে ধরে হোটেলে নিয়ে যেতে চায়। সন্ধ্যার নিবিড় আনন্দের আমন্ত্রণ জানায়। যখন বলি, এসব কী হচ্ছে, এ জন্যই দেশ ছেড়ে এসেছি আমরা?

তারা হেসে জবাব দেয়, এত কাজ দেখাচ্ছেন কেন? সবাই কাজ করতে চাইলে এত কাজ পাওয়া যাবে কোথায়? তার চাইতে জীবনকে প্রাণভরে ভোগ করে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ নয় কী?

মুখ ফিরিয়ে চলে গেছি। যারা মুখ ফিরিয়ে চলে গেছে তাদেরকে ওরা বোকা-চন্দর ভেবেছে। হাসি-ঠাট্টা করেছে তাদের নীতি ও কর্তব্যজ্ঞান নিয়ে। কিন্তু এ দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকই ছিল সংখ্যায় বেশি। এরাই করেছে সমস্ত কাজ। দিন ছিল না, রাত ছিল না—একটি মাত্র চিন্তা, কী করলে দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচন ত্বরান্বিত হবে। এইসব কাজ-পাগলরাই যুগে যুগে ইতিহাস সৃষ্টি করে। ভোগ অবশ্য কাজে ফাঁকিবাজ ভোগবাদীরাই করে থাকে বেশি।

প্রতিদিন নিয়ম করে থিয়েটার রোডে যাই। পাশে আর একটা বিল্ডিং নিয়ে নতুন কার্যালয় খোলা হল। সেখানেও যাতায়াত করি, কিন্তু তখনও বিশেষ কোন দায়িত্ব বর্তায়নি। বিভিন্ন স্থানে স্থানীয় নাগরিকদের সভা-সমিতিতে যেতে হয়। অনেকটা ফ্রীলেন্স বক্তার মতো। মন্ত্রীরা তো প্রকাশ্যে চলাফেরা করতে পারেন না। কাগজে-কলমে তাঁরা মুজিবনগরে অস্থায়ী রাজধানী স্থাপন করেছেন। দুনিয়ার সকলেই অবশ্য জানে আমাদের কাজকর্ম কোথা থেকে হচ্ছে। ক্রমান্বয়ে বাংলাদেশের প্রায় সকল জনপ্রতিনিধিই কলকাতা এসে পৌঁছলেন। কয়েকজনকে তারা অবশ্য দেশের অভ্যন্তরেই হত্যা করেছে। যশোরের প্রখ্যাত নেতা মসিউর রহমান সাহেব তাদের মধ্যে অন্যতম। নির্মমভাবে পাক বাহিনী তাঁকে হত্যা করে তাঁর দেহ ফেলে রেখে ছিল।

বালু-হক্কক লেনে জয় বাংলা বেতার কেন্দ্র স্থাপন করা হল। টাঙ্গাইলের আব্দুল মান্নান সাহেব সেখানে নিয়মিত বসতেন। একটা খবরের কাগজও প্রকাশ হতে লাগল। একদল রেডিও, টিভি এবং সংবাদপত্রজগতের প্রতিভাবান

যুবক এগুলোর দায়িত্ব নিলেন। এম. আর. আখতার মুকুলের বজ্রকণ্ঠ, আজমল হুদা মিঠু অভিনীত জল্লাদের দরবার, জব্বার, রথীন, আপেল মাহমুদ প্রমুখের কণ্ঠনিঃসৃত দেশের গান প্রভৃতি এপার-ওপার সকল মানুষের কাছে সমভাবে সমাদৃত হল।

বাংলাদেশ থেকে আগত যুবকদের সংগঠিত করে ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা না করলে যুবশক্তির কেবল অপচয়ই হবে তা-ই নয়; আমাদের যুদ্ধের জন্য জনশক্তি অপ্রতুল হয়ে দাঁড়াবে। অচিরেই সরকার সিদ্ধান্ত নিল সীমান্ত এলাকার নিকটবর্তী স্থানসমূহে ট্রেনিং ক্যাম্প খোলা হবে এবং সকল সক্ষম যুবককে সেখানে ভর্তি করা হবে।

ক্যাম্প খোলা হল হাজারো সমস্যার মধ্যে। অতি নিম্নমানের খাদ্য, ওষুধ নেই, পর্যাপ্ত পরিধেয় নেই, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ। এক একটা মশার সাইজ দেখলে আশ্চর্য হতে হয়। মশারি নেই। এর মধ্যে দুর্দমনীয় বাংলা মায়ের দামাল ছেলেরা প্রাথমিক ট্রেনিং গ্রহণ করতে লাগল। প্রাথমিক ট্রেনিংয়ের পর উচ্চতর ট্রেনিংয়েরও ব্যবস্থা আছে। মিজানুর রহমান চৌধুরী, আবদুল মালেক উকিল, সোহরাব হোসেন, অধ্যাপক ইউসুফ আলী এবং আমি প্রায়ই কোন না কোন ক্যাম্পে যেতাম যৎসামান্য রসদ নিয়ে। তাদেরকে উজ্জীবিত করার জন্য বক্তৃতা করতাম। ধন্য মায়ের ধন্য সন্তান তারা। কোন অভিযোগ নেই, নেই কোন চাহিদা, কেবল জানতে চাইত কবে তাদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে তাদেরকে দেশের ভিতরে পাঠান হবে সশস্ত্র যুদ্ধের জন্য। তাদের বুকে প্রতিশোধের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। কখন ওরা পাকিস্তানি হানাদারদের উপর ব্যাঘ্রের মতো ঝাঁপিয়ে পড়তে পারবে। ওদের তেজোদীপ্ত হুঙ্কার শুনে মনে হল, এসব সোনার ছেলেদের যে দেশ জন্ম দিয়েছে, তাকে কেউ দীর্ঘদিন পরাধীন রাখতে সক্ষম হবে না।

কলকাতা থেকে গাড়ি নিয়ে ক্যাম্পগুলো পরিদর্শনে যাওয়া হত। অনেকেরই পরিবার-পরিজন তখনও এসে পৌছেনি। সেই উন্মাদ করা বিষণ্নতার মধ্যেও মাঝে মাঝে হাস্যরসের অবতারণা হত। বিশেষ করে আবদুল মালেক উকিল সাহেব সঙ্গে থাকলে তো কথাই নেই। সেদিন সকলে আমাকে নিয়ে লাগল। সবাই আমাকে খেপাবার জন্য বলাবলি শুরু করল, আমাদের আর বিশেষ কী চিন্তা! আমাদের বউরা সব বুড়ি হয়ে গিয়েছে, সমস্যা হল মোয়াজ্জেমের। ওর যুবতী স্ত্রী যদি পাকিস্তানিদের হাতে ধরা পড়ে তা হলে তার কী অবস্থা হবে ভেবে দেখ!

মালেক ভাই বলে উঠলেন, ক্যান, হ্যাতেগো বুড়া কনস্টবল নাই কা?

সকলের সম্মিলিত হাসিতে ড্রাইভারও হকচকিয়ে গেল।

মালেক ভাই একবার পুরানা পল্টন দলীয় কার্যালয়ে বেগম বদরুন্নেছা আহমেদকে Responsive co-operation বুঝাচ্ছেন, বুঝলেননি বেগম সাব,

Responsive co-operation হইল লগে কাতলা মাছের মতো হুতি থাকলে চইল ত ন' নড়ন চড়ন লাগব।

ভদ্রমহিলাকে তিনি অনায়াসে এইভাবে রাজনৈতিক বিষয়টি বুঝিয়ে দিলেন। তার এতটুকু ভাবান্তর নেই। যাকে বললেন তিনি এবং আমরা সবাই হেসে উঠলাম।

মধ্য কলকাতার ওয়েলিংটন স্কয়ারের নিকটে ৪৫ নম্বর প্রিন্সেস স্ট্রিটের বাড়িটি পশ্চিম বঙ্গের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী চিকিৎসাশাস্ত্রের কিংবদন্তির নায়ক ডা. বিধান চন্দ্র রায়ের। বাড়িটি বিরাট। তার তৃতীয় এবং চতুর্থ তলা দেওয়া হল আমাদের ব্যবহারের জন্য। এখানে কেন্দ্রীয় ত্রাণ ও পুনর্বাসন দফতর, রেডক্রসের দফতর প্রভৃতি খোলা হল। বাস্তবে ওটি হয়ে দাঁড়াল কলকাতার মুক্তিযোদ্ধাদের রিক্রুটিং সেন্টার। এখানে মালেক সাহেব বসতেন, বসতেন ইউসুফ ভাই এবং সোহরাব সাহেব, ব্যারিস্টার বাদলও এখানে নিয়মিত বসতেন। মন্ত্রী কামরুজ্জামান সাহেবের জন্য একটি নির্দিষ্ট রুম ছিল টেলিফোন ইত্যাদিসহ। সেখানে তিনি কদাচিৎ আসতেন। অধ্যাপক ইউসুফ আলীই বেশি বসতেন। পরে তিনি বেশিরভাগ সময় থিয়েটার রোডে বসতেন বলে আমাকেই দায়িত্ব দিলেন ওখানে সবসময় বসার জন্য। সর্ব কনিষ্ঠ হয়েও বড় চেয়ারটিতে বসতে পেরে আমি প্রায় সেই অফিসের অঘোষিত কর্তাব্যক্তিতে পরিণত হলাম। মুক্তিযোদ্ধাদের রিক্রুট করে সামান্য হাত-খরচ দিয়ে তাদেরকে ক্যাম্পে পাঠানো, কাম্পগুলোর তদারকি ছাড়াও হাজারো মানুষের হাজারো কাজ এসে পড়ত। বিশেষ করে যাদের আত্মীয়স্বজন, ছেলে-মেয়ের সন্ধান ছিল না, তারা রাত-দিন এসে কান্নাকাটি করত একটুকু খবরের জন্য। সান্ত্বনা ব্যতিরেকে আর কীই-বা ছিল তাদেরকে দেবার।

এরই মধ্যে একদিন মিজান চৌধুরী সাহেবের উদ্যোগে উত্তর কলকাতার শ্যাম বাজারের শ্যাম বাবুর বাড়ির ছাদে কলকাতায় উপস্থিত সমস্ত এমপিদের একটি সভা হয়ে গেল। শ্যাম বাবুর আদি বাড়ি নারায়ণগঞ্জে। মিজান ভাই, খুলনার মহসিন সাহেব প্রভৃতি ওখানেই আশ্রয় নিয়েছিলেন। এই ভদ্রলোক এবং তাঁর পরিবার বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে যে অবদান রেখেছেন তার কোন তুলনা হতে পারে না। বস্তুত একজন মানুষ নিজস্ব ব্যবসা-বাণিজ্য সব পরিত্যাগ করে দীর্ঘ নয়টি মাস যেভাবে একাগ্র নিষ্ঠার সাথে বাংলাদেশের সংগ্রামের স্বপক্ষে

কাজ করেছেন, আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাসে তার সবিশেষ উল্লেখ বাঞ্ছনীয়। স্বাধীনতার পর তিনি বাংলাদেশের নাগরিকত্ব চেয়ে যে দরখাস্ত করেছেন—সেটিও একটি দ্রষ্টব্যে পরিণত হয়েছিল। কে যে সেখানে সুপারিশ করেনি বলা দুষ্কর। আমি লিখেছিলাম, শ্যাম বাবুকে নাগরিকত্ব দিয়ে আমরা কৃতজ্ঞতার ঋণ কিঞ্চিত শোধ করতে পারি।

সেই সভায় কামরুজ্জামান সাহেব নেতৃবৃন্দের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন। সভার প্রারম্ভে মিজান সাহেব গৃহকর্তাকে বললেন, মণখানেক পান এনে রাখুন।

প্রচুর পান খাওয়ার অভ্যাস কামরুজ্জামান সাহেবের। সারাক্ষণই জাবর কেটে যাচ্ছেন। শ্যাম বাবুও এতগুলো পান এনে সভাস্থলে রাখলেন যে, তার পরিমাণ দেখে সবাই হাসতে লাগল। সেই সভায় তিনি সরকারের নীতি এবং অন্য কর্মসূচির একটা সংক্ষিপ্ত ধারণা দিলেন। কর্মীদের মনোবল সঠিক রাখার জন্য আমাদের আত্মনিয়োগ করতে বললেন। সভায় অনেকের মতো আমিও বক্তব্য রাখলাম। বাড়ির অন্যান্য সদস্যরাও তা শুনছিল। সিদ্ধান্ত হল, দলের জন্য একটি স্থান প্রয়োজন। অনেকটা অস্থায়ী কার্যালয়ের মতো। কার্নানী ম্যানসন বা কোকাকোলা ভবন বলে অধিকতর পরিচিত বাড়ির একটি এপার্টমেন্ট নেওয়া হল এবং ওবায়দুর রহমানকে সেখানে সর্বদা বসার জন্য দায়িত্ব দেওয়া হল। অন্য কাজে অধিকতর ব্যস্ত মিজান সাহেব অবশ্য বিষয়টি ভালোভাবে নিলেন না। বাংলাদেশ সহায়ক সমিতির সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষার জন্য আমাকে বলা হল। পরে অবশ্য কামরুজ্জামান সাহেব বললেন, এখন পুনর্বাসন কার্যালয়ের যে অফিসে বসে তুই কাজ করছিস, তা-ই করে যা। মুক্তিযোদ্ধাদের রিক্রুটিং অতীব জরুরি।

সহায়ক সমিতিতে মিজান সাহেব নিজেই যোগাযোগ রক্ষা করতেন।

সারাদিন কাজকর্মের মধ্যে থাকি, সুলতান প্রায় সর্বক্ষণই আমাকে সঙ্গ দেয়। অনেক রাতে যখন ঘরে ফিরে আসি মন হাহাকার করে ওঠে। কোথায় সালেহা, কোথায় আমার রানা, ওরা কেমন আছে, কোথায় আছে! মন অস্থির হয়ে পাখির মতো উড়ে যেতে চায়। কিন্তু তা তো সম্ভব নয়! নিষ্ফল বিষণ্নতায় ডুবে থাকি। কিছু ভালো লাগে না।

ইতিমধ্যে দেশ থেকে অনেক কর্মী এসে আমার সঙ্গে যোগ দিয়েছে। মোস্তফা কামাল, ছিদ্দিক, শামসুল হক, সেন্টু, নূর মোহাম্মদ, ঢালী মোয়াজ্জেম, মালেক, আউয়াল, জামাল, খালেক আরও অনেকে এসেছে। বাসার, কুতুব, সামাদ, শহীদ, হারুন সবাই চলে এসেছে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে। বয়স্ক কেউ কেউ এই সুযোগে ভারতবর্ষ ঘুরে গেল। তাদের অনেক দিনের ইচ্ছা আজমীর শরীফে গিয়ে সুলতানুল হিন্দ গরীবে নেওয়াজ হযরত খাজা মাঈনুদ্দীন চিশতি (রঃ)-এর পবিত্র মাযার জিয়ারত করার। দুপুরে লাঞ্চ করতে যাই, সঙ্গে তিন-চার জন। সম্বল আমার লাঞ্চের জন্য রক্ষিত এক টাকা। খুঁজে খুঁজে সস্তা

দোকান বের করলাম। এক আনা দামের নান রুটি আর দু'আনার গরুর মাংস। ওরা আমাদের অবস্থা বুঝে একটু বেশি ঝোল দিত। চার আনায় খাওয়া সম্পন্ন। পয়সা বাঁচলে মাটির ভারের এক আনা মূল্যের চা।

মোস্তফা কামাল আমার দীর্ঘদিনের বিশ্বস্ত কর্মী। পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশে হকার্স আন্দোলনের সে-ই ছিল পথিকৃত। হকার্স লীগের সে ছিল সভাপতি। আমার মনের অবস্থা সে বেশ বুঝতে পারল। প্রস্তাব করল, সে একবার দেশে প্রত্যাবর্তন করতে চায়। ভাবী ও রানাকে আনার চেষ্টা করে দেখতে চায়।

বললাম, বিষয়টি খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। জীবনের ভয় আছে। তোর যাওয়া কী ঠিক হবে?

সে বলল, আল্লাহ্ চাহে তো ঠিকই ওদের নিয়ে আসব। আপনি আমাকে যেতে দিন।

মন খুব খারাপ ছিল। খবর পেয়েছি, সেলিমপুরে মফি দাদের বাড়িতে ওরা আর নেই। সেখানে এক কাণ্ড ঘটেছে। সেলিমপুরের পাশেই একটা গ্রাম ছিল যার বাসিন্দারা প্রায় সবাই ছিল পেশাদার চোর। এটা ছিল তাদের বংশানুক্রমিক পেশা। এলাকায় তারা কুখ্যাতি অর্জন করেছিল। স্বাধীনতা যুদ্ধের উন্মাদনায় কয়েক গ্রামের লোক একত্র হয়ে একদিন সেই গ্রামটি আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে ভস্মীভূত করে দিল। অনেকগুলো দাগী চোরকে তারা জীবনে শেষ করে দিল। খবর ছড়িয়ে পড়তেই পাকিস্তানি সেনারা সেখানে উপস্থিত হবে বলে গুজব রটে যেতে আশপাশের সমস্ত মানুষ বাড়িঘর ছেড়ে যে যেদিকে পারল পালিয়ে গেল। সালেহারা উপায়ান্তর না দেখে প্রথমে গেল লৌহজং আমার এক বন্ধুর বাড়ি। তারপর রামপালে আমার মামাত বোনের বাড়িতে এবং আরও অনেক জায়গায়।

প্রথম দু'-একদিন সকলেই উষ্ণ সম্বর্ধনা দেয়। আমার স্ত্রী-পুত্র জেনে তাদের জন্য প্রয়োজনে প্রাণ বিসর্জনের শপথ করে। কিন্তু আস্তে আস্তে তাদের হৃদয়ঙ্গম হতে থাকে, এদের কারণে না তাদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়। প্রাণ সংহারের সম্ভাবনা আছে। সালেহা বুঝতে পেরে অন্যত্র চলে যায়। ওরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।

সালেহা এবং রানাও আমার এলাকায় কিছুটা পরিচিত। আমার প্রথম নির্বাচনে শ্রীনগরের বৃহত্তম জনসভায় সালেহা তার স্বামীর জন্য দু'কথা বলেছিল। ছেলেরা রানাকে কোলে করে পরিচয় করিয়ে দিল। এক বছর বয়েসী এ ফুটফুটে ছেলেকে দেখে জনতা দাবি করল, আমি যেন রানাকে কোলে নিয়ে দাঁড়াই। ছেলেও মাশাল্লাহ্ বাপকা বেটা—সে আমার কোলে এসেই দু'হাত দিয়ে জনতার দিকে হাততালি দিতে থাকল। তার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র জনতা হাসিমুখে হাততালি দিতে থাকল। সে এক চমৎকার দৃশ্য! আমি সবাইকে একসাথে হাততালি দেওয়াতে পারিনি। রানা পারল। ছেলেই সেদিন আমার

সবচাইতে বড় প্রচারণার কাজ করল। সেই কথা স্মরণ করে সালেহা রানাকে মেয়েদের ফ্রক পরিয়ে মেয়ে সাজিয়ে রাখত।

তারপর আর বিক্রমপুরে থাকা চলে না। সে ঢাকায় নিজেদের বাসায় গিয়ে উপস্থিত হল। সেখান থেকে ওদের এক ভাই ইব্রাহীম সাহেবের বাসায় আশ্রয় নিল। তারা স্বামী-স্ত্রী দু'জনই বিশুদ্ধ উর্দু বলতে পারতেন এবং আশপাশের মানুষজন তাদেরকে অবাঙালি বলে জানত। শেষ পর্যন্ত ওরা ওখানেই নিরাপদ ও স্নেহসিক্ত আশ্রয় পায়। আমি এসব পরে জেনেছি।

মোস্তফাকে একবার চেষ্টা করার জন্য দেশে পাঠাবার ব্যবস্থা করলাম। দেখা যাক আল্লাহ্ তা'আলার কি ইচ্ছা। মানসিক অবস্থা যখন এ পর্যায়ে সেই সময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলাদেশের কয়েকটি দলের প্রতিনিধিদের আহ্বান জানাল মুক্তিযুদ্ধের উপর আলোকপাত করতে। ন্যাপ থেকে অধ্যাপক মোজাফফর সাহেব বললেন। আমাকে বলা হয়েছিল, আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বলার জন্য। আরও অনেকে ছিলেন। তত্ত্ব-কথার ধার দিয়েও গেলাম না—ওসব জানিও না। সহজ সরল ভাষায় বললাম, দেড় হাজার মাইল দূরত্বের দুটি দেশকে একদেশ বানাবার ভিত্তিতেই গলদ ছিল। পশ্চিম পাকিস্তান আর পূর্ব পাকিস্তান ভৌগোলিক দিক থেকেও এক অঞ্চলে অবস্থান করে না। পশ্চিম পাকিস্তান মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে আর পূর্ব পাকিস্তান হল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অংশ। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞায় যে শর্তগুলো রয়েছে একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য; সেখানে দুই অঞ্চলের মধ্যে কোনটিই পূরণ হয় না। Geographical contiguity বা অবস্থানগত একাত্মতা মোটেই নেই। ভাষা ভিন্ন, সংস্কৃতি ভিন্ন, আচার-আচরণ, খাদ্য, পোশাক, আকৃতি, এমনকি সভ্যতা পর্যন্ত ভিন্ন। তারপরও এক দেশ হয়ে গেল!

'কান মে বিড়ি মুমে পান, লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান' কায়েম হয়ে গেল। কারণ অবশ্যই ছিল, কিন্তু সমূহ কারণ ঠেকাতে পরিণামের চিন্তা প্রশ্রয় পেল না। দুই অংশের মাত্র একটি মিল ছিল—অধিকাংশ জনগোষ্ঠীর ধর্ম ইসলাম। যদি ধর্মই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার একমাত্র শর্ত হয় তা হলে পৃথিবীর যেখানে যেখানে মুসলিম অধ্যুষিত দেশসমূহ রয়েছে তাদের সকলকে একত্রিত করে একটি বৃহৎ ইসলামী রাষ্ট্রের পত্তন করা হোক। তা কী কেউ করবে? রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিচারে দুটি অংশ এক থাকতে পারে না। এ ছিল গায়ের জোরে, আজ তার অবসান হবে—তাও গায়ের জোরেই করতে হবে। এই গায়ের জোরকেই অন্য অর্থে যুদ্ধ বলা যায়।

বিদগ্ধ শ্রোতৃমণ্ডলী কথাগুলোকে গ্রহণ করল বলেই মনে হল।

বৃহত্তর কলকাতা ব্যবসায়ী সমিতি একদিন নেতৃবৃন্দকে আমন্ত্রণ জানাল মত বিনিময়ের জন্য। আমাদের মধ্য থেকে সোহরাব ভাই, মালেক উকিল সাহেব, মিজান সাহেব, ইউসুফ আলী সাহেব আরও কে কে আমন্ত্রণ রক্ষা করলেন। এ ধরনের অনুষ্ঠানে তাঁরা আমাকেও নিয়ে যান। তাঁরা অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ, কথা

বলেন বয়সোচিত-জ্ঞানলব্ধ অভিজ্ঞতার আলোকে। আমার সেসব বালাই নেই। তাছাড়া এঁরা সকলেই একসময় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার লগ্নে কিছু না কিছু অবদান রেখেছেন। তাই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আদি যৌক্তিকতা এক কথায় খণ্ডন করতে দ্বিধা বোধ করেন। কিন্তু আমি? আমি তো পাকিস্তানের জন্মলগ্নের কেউ নই। আমার কাছে এটি একটি বিস্ময়! কী করে এমনি একটি অবাস্তব দেশ তৈরি হতে পারে বোধগম্য হত না। আমরা হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িকতার নোংরামি দেখিনি। ইংরেজ কী করে সেই নোংরামিকে রাজনীতির মোড়কে পুরে Devide and Rule তত্ত্বের আলোকে দীর্ঘদিন এত বড় একটি দেশ শাসন করে গেল এবং বিদায়ের সময় তাকে দ্বিধা-বিভক্ত করে দিয়ে গেল, এটা উপলব্ধিতে এলেও সেদিনের সমাজপতিদের দূরদৃষ্টির উপর আস্থা রাখা দুরূহ হয়ে পড়ে।

বলেই ফেললাম, পাকিস্তান বানাতে অবদান থাকায় ওটা ভাঙতে এদের কিছুটা কষ্ট হলেও আমরা কিন্তু এটা ভেঙে আর একটা নতুন গড়ার বিমলানন্দ অনুভব করছি।

তাঁরা খুশি হয়ে ওঠাতে বলতে বাধ্য হলাম, পাকিস্তান সৃষ্টিতে সেদিনের হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদ এবং ধর্মীয় গোঁড়ামিজাত অবিবেচনাপ্রসূত সামাজিক ও রাজনৈতিক ন্যায়হীনতা অনেকাংশে দায়ী। **কেবল মুসলমানরাই পাকিস্তান গড়েনি—হিন্দুরা তাদের গড়াতে গড়াতে ওখানে ঠেলে দিয়েছিল।**

ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ ভদ্রতার খাতিরেই হোক বা যুক্তির প্রাবল্যেই হোক স্মিত হাস্যে কথাগুলো মেনে নিলেন। বাইরে এসে মালেক ভাই বললেন, এই জন্যই এই ঠোঁটকাটাটাকে সঙ্গে নিয়ে চলি।

তাঁর কণ্ঠে স্নেহ ঝরে পড়ছিল।

পূর্বাঞ্চলের জনপ্রতিনিধিদের একটি অধিবেশন ডাকা হল আগরতলায়। আগরতলায় আবার আসতে হল প্লেনে সমস্ত সীমান্ত ঘুরে। পূর্বাঞ্চলের মুক্তিযুদ্ধের সর্বশেষ অবস্থা, তার গতিধারা, ক্যাম্পসমূহের ব্যবস্থাপনাসহ প্রায় সকল জাতীয় বিষয় আলোচিত হল এবং সরকারের নিকট সুপারিশ প্রেরণ করা হল। সারা রাত বিতণ্ডা হলেও সদস্যরা তাদের মূল টার্গেট দেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে কোন দৌর্বল্য প্রদর্শন করেনি।

সাত বছর পর আবার জেলখানায় এসে যে অখণ্ড অবসর পেলাম—তাতেই স্মৃতি থেকে হাতড়ে হাতড়ে কিছু লিখে চলেছি। আমার প্রথম রচনা 'নিত্য

কারাগারে'। সেটিও জেলখানার নিরবচ্ছিন্ন সময়ের সদ্ব্যবহারের ফলশ্রুতি। সামনের বাঁধানো সিঁড়িতে বসে আছি—পা ফুলে গেছে। ডাক্তার বলেছেন হাঁটাহাঁটি করতে। কিন্তু পেরে উঠি না। মনে হয় পায়ের সাথে কেউ পাথর বেঁধে দিয়েছে। এটা জেল খাটার বয়স নয়। তারও একটা বয়স লাগে। "এখন যৌবন যার, যুদ্ধে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়।" একথা জেলখাটার বেলায়ও সত্য। এর মধ্যেই দেখতে পেলাম তল্পিতল্পা নিয়ে এক নতুন অতিথি এসে উপস্থিত। মুখে দাড়ি থাকায় চিনতে অসুবিধা হল। নিজেই কাছে এসে বলল, স্যার, আমি আকরাম।

বুঝলাম রুবেল মার্ডার কেসের এক নম্বর আসামি ঝানু পুলিশ কর্মকর্তা এসি আকরাম। আসামি ধরাই ছিল যার কাজ। দোর্দণ্ড প্রতাপে যে পুলিশ কর্মকর্তা ঢাকা শহরে তোলপাড় সৃষ্টি করে তুলত। এক দক্ষ অফিসার হিসাবে যার সুনাম-দুর্নাম দুটোই ছিল আলোচনার বিষয়বস্তু। আল্লাহ্‌র এক ইশারায় আজ সে বহু নিন্দিত মেধাবী ছাত্র রুবেল হত্যা মামলার আসামি। বিষয়টি সমগ্র জাতিকে ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছে, বহুল আলোচিত হয়েছে পত্র-পত্রিকায়। মুখে দাড়ি হাতে তসবিহ আকরাম সাহেব বললেন, সে কিছুই জানে না—সবই নাকি তার চাকরি ক্ষেত্রের ঈর্ষাপ্রসূত।

হতেও পারে। আল্লাহ্ সব জানেন। আমাদের মতো মানুষকেই তেইশ বছর পর কেবলমাত্র রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে সম্পূর্ণ অজানা, অকল্পনীয় বিষয়ে বানোয়াট যোগসাজশ দেখিয়ে গ্রেপ্তার করতে পারলে পুলিশ সবই পারে। আমার এতদিন ধারণা ছিল, দুধ ছাড়া দই বানান যায় না। ভেজাল হলেও কিছু দুধ লাগবে। শুধু পানিতে দই বানানো যায় না। কিন্তু দেখলাম, যায়—বানানো যায়। তদন্তকর্তা কাহার সাহেব, তার উপরওয়ালা হান্নান সাহেব আরও উপরওয়ালীকে খুশি করতে শুধু পানি দিয়েই দই বানিয়ে দিল। সাবাস পুলিশ ভাইয়েরা। আকরাম সাহেব, আপনারই স্বগোত্রীয় ওরা।

পুনরায় কলকাতার ঘটনায় মনোনিবেশ করি। মনে পড়ে সেই সময় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে দেখা করতে মাঝে মাঝে শ্যাম বাবুর বাড়ি যেতাম। তাঁর স্ত্রী এবং মেয়েরা আমাকে পেলে আনন্দিত হত। আমার বক্তৃতা-বিবৃতির তারা নাকি সমঝদার। এ সূত্রেই তাদের এক কলেজে পড়া আত্মীয়া সুলতার সঙ্গে পরিচয় হল। ক্রমে পরিচয় সুলতার দিক থেকে অন্যদিকে মোড় নেওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিল। আমার এক বন্ধু বিষয়টিকে আরও জটিল করে দিল। সে জানাল, আমি অবিবাহিত এবং শীঘ্র বিলাত চলে যাচ্ছি—বাংলাদেশের স্বাধীনতার সপক্ষে কাজ করার জন্য।

সুলতা একসময় আমাকে একা পেয়ে বলল, আমাকে বিলেতে সঙ্গে নেবেন?

আমি তার কথার অর্থ অনুধাবন করতে পারলাম। মনে হল, ক্ষতি যা হবার হয়েই গেছে! তবুও একে আর বাড়তে দেওয়া যায় না।

ওকে বুঝিয়ে বললাম, আমি ’৬৮ সাল থেকে বিবাহিত এবং আমার একটি শিশুপুত্র সন্তান রয়েছে। যদিও তারা কাছে নেই কিন্তু আমি তাদের ভালোবাসি।

সুলতা অনেকটা সময় মাটির দিকে তাকিয়ে রইল। ভালো করে লক্ষ্য করে দেখি ওর ডাগর চোখ দুটিতে পানির সূক্ষ্ম রেখা দেখা যাচ্ছে। কিছু বলতে যাচ্ছিলাম, ও দ্রুতপদে অন্যত্র চলে গেল।

একি ঝামেলা তৈরি হল! আর একদিন সেই বাড়িতে সুলতার সঙ্গে পুনরায় দেখা হল। ও আমাকে সকলের অগোচরে ছাদে ডেকে নিয়ে গেল। সেখানেই একটি ঘরে বাড়ির গৃহদেবতা প্রতিষ্ঠিত। কোন কথা না বলে ও আমাকে তাদের ঠাকুরঘরে নিয়ে গেল। বলল, শুনেছি আপনার স্ত্রী ও ছেলেকে খুঁজতে লোক পাঠিয়েছেন। ঠাকুরের সামনে বলছি, আমি কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, তাদেরকে যেন সসম্মানে পাওয়া যায়।

একটু দম নিয়ে বলল, ভগবান না করুন, যদি তাদের না পাওয়া যায়, এমন তো বাংলাদেশে অহরহ হচ্ছে, আমি কী অপেক্ষা করে থাকব?

মনটা হঠাৎ খুবই খারাপ হয়ে গেল। পাগল নাকি? বলে কি? আমার সালেহা, আমার রানাকে যদি না পাওয়া যায়!

রূঢ় কণ্ঠে বললাম, ঠাকুরঘরে নিয়ে এলে কী মনে করে? তোমাদের ঠাকুর আমরা মানি না। এ ধরনের কথা আর কোনদিন বলো না। বলার সুযোগও তুমি আর পাবে না। এ বাড়িতে আজই আমার শেষ।

তা-ই করলাম। সুলতা অবশ্য একবার ওর এক বান্ধবীসহ আমাদের অফিসে এসেছিল। আমি সাধারণ সৌজন্যবোধের চাইতেও শীতল ব্যবহার করলাম। আমার বন্ধু যে জট পাকিয়েছে তা ছিন্ন করে দিতে হবে। একটি সরল মেয়ের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলার বয়স আমার পার হয়েছে। আমরা এসেছি একটি কঠিন কর্তব্য সমাধার উদ্দেশে। এখানে হৃদয়ঘটিত কোন দৌর্বল্যের সুযোগ নেই। সুলতার অধ্যায় সেখানেই ইতি টানা গেল।

অনুরূপ একটি ঘটনা রাজস্থানের জয়পুরে ঘটেছিল।

এর মধ্যে আমাদের জনপ্রতিনিধিদের একটি অধিবেশন ডাকা হল। ভারতের পূর্বাঞ্চলের ভারতীয় সেনাঘাঁটি বাগডোগরায় দার্জিলিংয়ের সন্নিকটে পাহাড়ী এলাকা। এয়ারফোর্স এবং আর্মির শক্তিশালী বেস রয়েছে এখানে। তাদের অডিটরিয়ামে তিন দিন ধরে অধিবেশন চলল। সদস্যদের মনে যেসব দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছিল, তা নিরসনে নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন বক্তব্য দিলেন। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমেদ যেভাবে সমগ্র ব্যাপারটি সামাল দিলেন, তাঁকে সাধুবাদ দিতে হয়। তাঁর সম্বন্ধে কারো কারো মনোভাব অনুকূল ছিল না। কিন্তু তাঁর কাজ, তাঁর বক্তব্য এবং সুনিপুণ কর্মদক্ষতা সকলকে আকৃষ্ট করল। কথা উঠল, ভারত আমাদের জন্য এত করছে, প্রায় এক কোটি মানুষকে আশ্রয় দিয়েছে, দিয়েছে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সমুদয় সহায়তা। কিন্তু রাষ্ট্র হিসাবে

আমাদের তারাও স্বীকৃতি দেয়নি। আমরা মাটি ছাড়া মানুষ হয়ে বেঁচে থাকতে চাই না।

তাজউদ্দীন সাহেব এবং অন্যরা বুঝালেন বিষয়টি কেবল ভারত সরকারে সীমাবদ্ধ নয়—বিশ্বময় তাদের মিত্ররা রয়েছে। তাদের সমর্থন ব্যতিরেকে এবং সারা দুনিয়ার মতামতের তোয়াক্কা না করে এককভাবে ভারত সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধা করতে পারে। আমাদেরকেও পৃথিবীর দুয়ারে দুয়ারে ধর্ণা দিতে হবে; বিশ্ববিবেককে জাগ্রত করতে হবে। বাংলাদেশে হানাদার বাহিনী ইয়াহিয়া চক্র যে নগ্ন হামলা চালিয়ে নিরস্ত্র অসহায় কোটি মানুষকে দেশত্যাগে বাধ্য করেছে, ত্রিশ লক্ষ মানব সন্তানকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে, সোনার বাংলাকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে শ্মশান করেছে, হানাদার সৈন্যরা যে অগণিত মা-বোনদের সম্ভ্রম নষ্ট করেছে, এই তত্ত্ব পৃথিবীময় তুলে ধরতে হবে। সর্বাগ্রে ভারতের ব্যাপক জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি পরিষদ পার্লামেন্টে দরবার করতে হবে। বাচ্চা না কাঁদলে মাও দুধ দেয় না। আমাদেরকে কাঁদার মতো কাঁদতে হবে।

আমরা সবাই নেতৃবৃন্দের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করলাম। শত কথা হবে, দ্বিমত থাকবে। রাজনীতিতে মতপার্থক্য থাকবে। কিন্তু এই মুহূর্তে সব ভুলে ইস্পাত-কঠিন একতায় দেশমাতৃকার মুক্তির চিন্তা ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণীয় নয়।

কথা উঠল, বঙ্গবন্ধু কেন ধরা দিলেন? পাকিস্তান কর্তৃক তাঁর ছবি ছাপা হল কাগজে। কিন্তু বাংলাদেশ সরকার ঘোষণা দিয়েছিল, বঙ্গবন্ধু আমাদের সঙ্গে থেকে যুদ্ধ পরিচালনা করছেন। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে যদি তারা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করত তা হলে তার দায়-দায়িত্ব সরকারের ঘাড়ে নিপতিত হত। কেননা, সরকারের অসত্য ঘোষণায় তাঁকে যুদ্ধরত বলা হয়েছে। যুদ্ধে মানুষ মরবেই, ওরা ইচ্ছা করলে তাঁকে শেষ করতে পারত, সেই সুবিধা এদিক থেকেই করে দেওয়া হয়েছিল।

তারা এত মানুষ মারল, কিন্তু নাটের গুরুকে হাতে পেয়েও কেন হত্যা করল না, তা দুর্বোধ্য। অনেকে অনেক ব্যাখ্যা দেন। কোনটাই ধোপে টিকতে চায় না। তা হলে কি ধরে নিতে হবে চুক্তি করেই তিনি ধরা দিয়েছিলেন এবং ওরাও তাদের চুক্তি রক্ষা করেছে!

আমাদের সরকার এ প্রশ্নে সুস্পষ্ট বক্তব্য দিল না। পাশ কাটিয়ে গেল। ঘোষণাটি অনভিপ্রেত এবং ভুল বোঝাবুঝি-প্রসূত। ইচ্ছাকৃত নয় বলে দাবি করলেন। তবে আল্লাহ্‌র অশেষ শুকরিয়া, বঙ্গবন্ধু বেঁচে আছেন।

অধিবেশনে সকল বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হলে অনেকদিন পর প্রভূত আনন্দ হল। নোয়াখালীর শহিদউদ্দীন ইসকান্দার কচি ভাই, সাখাওয়াত ভাই, কুমিল্লার মীরু অর্থাৎ মীর হোসেন চৌধুরী, কুষ্টিয়ার রউফ চৌধুরী সবাই মিলে দলবলে পাশের পাহাড়ি ঝরনার পানিতে গোছল করলাম। বেশ ঠাণ্ডা পানিতে গোছল করে কারো কিছু হল না—মাঝখান থেকে আমার প্রবল জ্বর ও নিউমোনিয়া

হয়ে গেল। নেতৃবৃন্দ আমার অবস্থা দেখে আমাকে অবিলম্বে এয়ারফোর্স হাসপাতালে ভর্তি করে দিলেন। পাহাড়ি ঝরনার ঠাণ্ডা পানিতে দীর্ঘসময় গোছল করলে অনভ্যস্তজনের নিউমোনিয়া হওয়ার সমধিক সম্ভাবনা থাকে এবং অনেক ক্ষেত্রেই রোগীকে বাঁচানো দুরূহ হয়ে পড়ে।

নেতৃবৃন্দ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে বিশেষ অনুরোধ জানালেন, যাতে আমার সুচিকিৎসার কোন ত্রুটি না হয়। তাঁরা বললেন, রোগী কেবল একজন এমপিই নন, তিনি স্বাধীনতা যুদ্ধের অন্যতম পুরোধা। তাদের কথায় কাজ হয়েছিল। ডাক্তার-নার্স মিলে প্রায় দু'সপ্তাহ ধস্তাধস্তি করে আমাকে যমের হাত থেকে সেই যাত্রা রক্ষা করলেও দীর্ঘদিন বুকের মধ্যে কফ জমে ছিল।

অধিবেশন শেষ হওয়ায় সকলে যার যার কর্মস্থলে ফিরে গেছে। বাগডোগরার হাসপাতালে বন্ধু-বান্ধব বর্জিত রোগ-শয্যায় একা পড়ে রইলাম। মনে হচ্ছিল, আর বুঝি কারো সাথে দেখা হবে না। এখানেই নীরবে নিভৃতে নিভে যাবে আমার জীবন-প্রদীপ। দেশের স্বাধীনতা বুঝি আর দেখা হল না।

আল্লাহ্ অনেক মেহেরবান। আবার উঠে দাঁড়ালাম। একা একা প্লেনে কলকাতায় নেমে সুলতানদের বাসায় যখন পৌঁছলাম বোন পারু আমাকে দেখে চিৎকার করে উঠল, একী চেহারা হয়েছে আপনার?

বুঝিয়ে বললাম, বেঁচে যে ফিরে এসেছি, তা-ই ভাগ্য মনে কর।

সুলতানের বাবা আর একদফা আমাকে বিশেষজ্ঞ দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে নতুন করে চিকিৎসা করিয়ে পূর্ণ সুস্থ করে তুললেন। অনেকদিনের ব্যবধানে আবার অফিস করা শুরু করলাম।

বাংলাদেশ সরকার সিদ্ধান্ত নিলেন দিল্লীতে একটি শক্তিশালী পার্লামেন্টারি টিম পাঠাবেন। তাদের কাজ হবে দিল্লী পার্লামেন্টের সদস্য-সদস্যাদের সঙ্গে লবি করা, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ সম্বন্ধে সম্যক ধারণা প্রদান করা এবং তাদেরকে ভারত কর্তৃক বাংলাদেশের স্বীকৃতির প্রশ্নে উদ্বুদ্ধ করা। ফণীভূষণ মজুমদার, বেগম নূরজাহান মুর্শেদ এবং আমাকে মনোনীত করা হল। ফণীভূষণ মজুমদার একসময় নেতাজী সুভাসচন্দ্র বসুর একান্ত সচিবের কাজ করেছেন। অকৃতদার ফণী দা একজন সহজ-সরল চমৎকার মানুষ। দিল্লীর প্রবীণ রাজনীতিকদের অনেকের কাছে শ্রদ্ধার পাত্র। বেগম নূরজাহান মুর্শেদ এক উচ্চশিক্ষিত মহিলা। অনেকদিন রাজনীতিতে আছেন। থিয়েটার রোডে আমাদের তিন জনকে একত্রে ডেকে চার নেতা আমাদের ব্রিফ করলেন। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বললেন, একজন প্রবীণ, একজন মহিলা ও একজন ইংরেজি-বাংলা দুই ভাষাতেই তুখোর বক্তাকে এ টিমে অন্তর্ভুক্ত করেছি। অনেক চিন্তা-ভাবনা করেই টিম গঠন করা হয়েছে। আমরা আশা করব, বাংলাদেশের প্রথম পার্লামেন্টারি ডেলিগেশন তার ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করবে।

সকলেই আমাদেরকে নানা পরামর্শ দিলেন। দিল্লীতে আমরা কোথায় উঠব

প্রভৃতি আনুষঙ্গিক প্রশ্ন উঠতে নেতৃবৃন্দ বললেন, প্রয়োজনে দিল্লীর পার্লামেন্টের বারান্দায় তোমরা শুয়ে থাকবে।

বুঝলাম, আমাদের কাজ কঠিন হবে এবং আমাদেরকেই তা গুছিয়ে নিতে হবে। ফণী দার কাছে আমাদের কিছু রাহা-খরচ দেওয়া হল।

জীবনে প্রথম দিল্লী যাব, একটা আনন্দজনক উৎসাহে মন ভরে উঠল। উপমহাদেশের ইতিহাসে দিল্লী এক অবিস্মরণীয় ভূমিকা পালন করেছে। কি মোঘল আমলে, কি ইংরেজ আমলে এবং সর্বশেষ স্বাধীন ভারতের রাজধানী হিসাবে দিল্লীর ভূমিকা অপরিসীম। এর ধূলিকণার মধ্যেও ইতিহাসের সন্ধান মেলে। দিল্লী মানেই ইতিহাস। এই অঞ্চলের ইতিহাস দিল্লীকে বাদ দিয়ে লেখা যায়নি।

বন্ধুরা জিজ্ঞেস করেন, কবে যাচ্ছ দিল্লী?

বলতাম, 'দিল্লীকা লাড্ডু যো খায়া ও পস্তায়া, যো নেহি খায়া ওভি পস্তায়া'। এই দিল্লীতেই সম্রাট গিয়াসউদ্দীনের আসার আশঙ্কায় যখন ভক্তরা তাপস চূড়ামণি নিজামউদ্দীন আউলিয়াকে সরে যেতে বলল, তিনি বলেছিলেন, 'দিল্লী দূরস্ত'।

আরও পরে যখন সম্রাট আরও এগিয়ে এসেছেন, তখন ভক্তরা করজোড়ে নিবেদন করল, 'হুজুর এবারে চলে যান'।

তিনি জবাব দিলেন, 'দিল্লী হনুজ দুরস্ত'।

তা-ই হল। সম্বর্ধনা স্থানে দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করল গিয়াসউদ্দীন মোহাম্মদ ঘোরী। তাপসের মুখনিঃসৃত বক্তব্যই সঠিক হল। দিল্লী এখনও দূরে। আর কোনদিন তাঁর দিল্লী আসা হয়ে উঠল না।

সেই ঐতিহাসিক নগরীতে প্রথমবারের মতো যাব আমাদের দেশের প্রতিনিধিত্ব করতে—আত্মশ্লাঘা অনুভব করলাম। এ দায়িত্ব গৌরব ও সম্মান বহন করে। প্লেনে চড়ে বেশ রাতে দিল্লীর পালাম বিমানবন্দরে অবতরণ করলাম। পরে কি ঘটবে অজানা! কিছুটা দুশ্চিন্তা নিয়ে এগিয়ে যেতেই একজন কেতাদুরস্ত লোক আমাদেরকে ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করল—আপনারা কি বাংলাদেশ পার্লামেন্টারি টিমের সদস্য?

বললাম।

তিনি পরিচয় দিলেন, আমার নাম রঙ্গনাথন। আমি বৈদেশিক মন্ত্রণালয়ে কাজ করি। যদি আপনাদের কোন কাজে লাগতে পারি সেজন্য এখানে আসা।

সঙ্গে তার একজন তরুণ সহকর্মীও রয়েছে। তার নাম মি. অশোক। বুঝতে পারলাম, ভারত সরকার দায়িত্ব ঠিকই পালন করছে, তবে অগোচরে।

তারা বললেন, আপনাদের ওঠার কোন স্থান নির্দিষ্ট করা আছে কী?

জানালাম, কোন হোটেলে ওঠা যেতে পারে।

রঙ্গনাথন সাহেব অনেকটা প্রস্তাবাকারে বললেন, আচ্ছা, এক কাজ করলে

কেমন হয়! সব রাজ্যের একটি করে 'হাউস' আছে দিল্লীতে—সেখানে রাজ্যের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, বিধান সভার সদস্যবর্গ এবং রাজ্যের মন্ত্রীরাও দিল্লী এলে ওঠেন। আপনাদের সেখানেই নিয়ে যাই না কেন?

বললাম, আমাদের আপত্তির প্রশ্নই আসে না। আমরা বরং হাতে স্বর্গ পাব। কিন্তু সেখানে স্থান সঙ্কুলান হবে কী? তাদের কোন অসুবিধায় ফেলতে চাই না। আমরা কারো বোঝা হতে দিল্লী আসিনি।

তিনি অমায়িক হেসে বললেন, স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করছেন, আপনারা আমাদের সম্মানিত অতিথি, বোঝা হতে যাবেন কেন?

তার নিজস্ব গাড়িতে তিনি আমাদের পশ্চিম বঙ্গ হাউসে নিয়ে তুললেন। অনেকটা প্রথম শ্রেণীর ডাকবাংলো বা সার্কিট হাউসের মতো। সমস্ত ব্যবস্থাপনাই বেশ মানসম্পন্ন। তাদের কেয়ারটেকার বোধহয় প্রস্তুত হয়েই অফিসে অপেক্ষা করছিল। আমাদেরকে সমাদরে গ্রহণ করল এবং দ্বিতলে তিন জনকে তিনটি ভিআইপি রুম বরাদ্দ করে দিল। রাতের খাবার আমরা প্লেনেই সেরে এসেছি বলে কফি পান করে সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে সে রাতের মতো আমরা নিশ্চিন্তে আরামে ঘুমোতে গেলাম।

দিল্লীর গরমের খ্যাতি রয়েছে। তাই প্রায় বাসস্থানই শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। আমাদের কক্ষগুলোও তা-ই। দিল্লীর প্রথম রাত ভালোই অতিবাহিত হল।

সকালে প্রাতরাশের সময়ই অনেকে এসে দেখা করলেন। দিল্লীর কয়েকটি মহলে এর মধ্যেই প্রচারিত হয়ে গেছে বাংলাদেশের তিন জন পার্লামেন্ট মেম্বার এসেছেন সে দেশের স্বীকৃতি নিয়ে দেন-দরবার করার জন্য। পশ্চিম বঙ্গের কয়েকজন এমপি সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দিলেন। এরই মধ্যে খবর পেয়ে চলে এলেন পশ্চিম বঙ্গের সোশালিস্ট পার্টির বিশিষ্ট নেতা এমপি সমর গুহ। তিনি এসেই আমাদের কর্মসূচি ঠিক করতে বসে গেলেন। বাংলাদেশের প্রশ্নে সমর গুহের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত প্রশংসনীয়। একসময় পূর্ববাংলার মানুষ ছিলেন তাঁর পূর্বপুরুষরা। এক নাড়ির টান অনুভব করেন এদেশের জন্য। যুদ্ধটা যেন তাঁর নিজের। এক মিনিট সময় নষ্ট করা যাবে না। দিল্লীতে আলোড়ন সৃষ্টি করতে হবে। আমাদের এখানে পাঠানো যে কতটা বিজ্ঞজনোচিত ও সময়োচিত হয়েছে তার প্রশংসা করার ভাষা নেই।

তিনি আমার দাদা হয়ে গেলেন মুহূর্তের মধ্যে। অগ্রজের মতোই তিনি

আমাকে দিল্লীর বর্তমান রাজনীতির প্রেক্ষাপট এবং বিভিন্ন স্রোতধারা সম্বন্ধে জ্ঞান দিলেন। সেদিন পার্লামেন্টের অধিবেশন ছিল। তিনি আমাদের নিয়ে চললেন সেখানে। ইতিমধ্যে আমাদের জন্য একটি গাড়িও যোগাড় হয়েছে। পার্লামেন্টের প্রবেশপথে আলোকচিত্র শিল্পীরা অনেকের ছবি তুলছিলেন। সমর দা তাদেরকে বললেন, ভারতের এমপি-মন্ত্রীদের ছবি তো সর্বদাই তুলছেন। এঁরা বাংলাদেশ থেকে এসেছেন—পার্লামেন্টারি ডেলিগেশন। এঁদের ছবি তুলুন।

আর যায় কোথা, ফটফট ছবি তোলা হতে থাকল। ছবি তোলা আর শেষ হয় না। সকলকে অনেক সুযোগ দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেলাম।

সমর দা বেশ করিৎকর্মা মানুষ। যেতে যেতেই বহু সদস্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় সমাধা করলেন। হাউসে তাঁর উত্থাপনীয় একটি বিষয় ছিল। তাই অধিবেশন শুরু হতে তিনি আমাদের ভিআইপি গ্যালারিতে বসিয়ে অল্পক্ষণের জন্য ভিতরে প্রবেশ করলেন। সেখানেও বাংলাদেশের পক্ষেই সংক্ষিপ্ত বক্তব্য পেশ করে পুনরায় আমাদের নিয়ে বের হলেন। প্রতিটি দল এবং উপদলের নেতা-কর্মকর্তাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। কোন ব্যতিক্রম ছাড়া প্রতিটি সম্মানিত সদস্য-সদস্যা আমাদের আন্তরিকভাবে গ্রহণ করলেন। সকলেই তাদের সঙ্গে কফি পানের আমন্ত্রণ জানালেন।

কিন্তু আমাদের অভিভাবক সমর দার তাতে আপাতত সম্মতি নেই। বলেন, কফি পানে সময় নষ্ট না করে আপনারা অধিকতর সংযোগ স্থাপন করুন এমপিদের সঙ্গে।

তিনি আমাদেরকে ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন মন্ত্রীদের কক্ষেও নিয়ে গেলেন। তারাও একইভাবে আমাদেরকে প্রাণের উষ্ণতায় গ্রহণ করলেন।

একবেলায় প্রচুর কাজ করা গেছে। প্রায় এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের সঙ্গে আমরা কথা বলেছি, পরিচিত হয়েছি। একদিনে এটা কম কথা নয়। সম্ভব হয়েছে সমর দার জন্য। তিনি আমাকে হাসতে হাসতে বললেন, আমার নামের অর্থ জানো তো? যুদ্ধ, কাজেই সর্বত্র যুদ্ধ করেই এগিয়ে যেতে হবে।

অধিবেশন একবেলাই ছিল। দ্বিপ্রহরে পশ্চিম বঙ্গ হাউসে লাঞ্চ, বিশ্রাম সেরে আমরা আগত সাংবাদিক, লেখক এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে ওখানেই সৌজন্য সাক্ষাৎকার দিলাম। প্রখ্যাত লেখক যাযাবরের সঙ্গে দেখা হল। তাঁর লেখার সঙ্গে পূর্বেই পরিচয় ছিল। আমি তাঁর লেখার একজন ভক্ত পাঠক শুনে বিনয়ে বিগলিত হলেন। এমন নিরীহ ভদ্রজন সহজে দেখা যায় না।

পরদিন প্রত্যুষে দিল্লীর সমস্ত দৈনিক পত্রিকায় আমাদের ছবিসহ খবর প্রকাশিত হওয়ায় সর্বত্র মানুষের মধ্যে প্রচুর উৎসাহ-উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হল। আমরা 'পশ্চিম বঙ্গ হাউসে' অবস্থান করছি জেনে বিভিন্ন সংগঠন এবং

প্রতিষ্ঠান আমাদেরকে তাদের সমূহ অনুষ্ঠানে সাদর আমন্ত্রণ জানাল। অনেক ব্যক্তি তাদের গৃহে নিমন্ত্রণ রাখার আবদার জানাল। আমরা এত আদর-আপ্যায়ন প্রত্যক্ষ করে উৎসাহিত বোধ করলাম। কঠিন নয়, কাজ আমাদের সহজই হবে।

এদিনও পার্লামেন্ট অভিযান দিয়েই কাজ শুরু হল। সদস্য-সদস্যাদের সঙ্গে পৃথক পৃথকভাবে আমরা মত বিনিময় করে চলেছি। পরিচয় পর্ব শেষ হতেই আমরা তিন জন পৃথকভাবে অন্য সদস্যের সঙ্গে আলোচনায় রত হই। এটাই আমাদের ধ্যান-জ্ঞান। কত তাড়াতাড়ি এবং কত অধিক সংখ্যক সদস্যকে আমাদের দাবির যৌক্তিকতা বুঝাতে পারব।

একসময়ে স্বয়ং ইন্দিরা গান্ধীকে নির্বাচনে পরাজিত করেছিলেন প্রবীণ রাজনীতিবিদ রাজনারায়ণ। তিনিও এসে আমাদের সঙ্গে সার্বক্ষণিকভাবে জুটলেন। বাংলাদেশের সপক্ষে তিনি খুবই সক্রিয়। রাজনারায়ণের স্পষ্টবাদিতা ও উচিত বক্তব্যে ভয় পায় না এমন লোক দেখা গেল না। সহজে কেউ তাঁকে ঘাঁটাতে চায় না। ভদ্রলোককে আপাতদৃষ্টিতে একটু একগুঁয়ে মনে হলেও তিনি খুবই প্রাণবন্ত। আমার খুব পছন্দ হল তাঁকে। বিভিন্ন মন্ত্রীদের ঘরে তিনিও আমাদের সঙ্গে যাবেন এবং যথারীতি দু-একটি ব্যঙ্গোক্তি করে পরিবেশ পাল্টে দেবেন। মন্ত্রী মি. ওয়াই বি. চ্যাবন যখন বললেন, এই মুহূর্তে বাংলাদেশের সমস্যা ভারতের কাছে শরণার্থী সমস্যা; একে কি করে সামাল দেওয়া যায় তা-ই নিয়ে আমরা হিমসিম খাচ্ছি। রাজনৈতিক স্বীকৃতির কথা ভাবার সময় এখনও আসেনি।

মি. রাজনারায়ণ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। তিনি বললেন, এটা তোমার ব্যক্তিগত মত হতে পারে—ভারতীয় জনগণের হৃদয়ের মর্মবাণী নয়। মন্ত্রী হয়ে তোমার মাথা মোটা হয়ে গেছে, সব কিছু ঢুকছে না।

তিনি তাঁর নিজস্ব হিন্দিতে বললেন, তবুও আমরা তা বুঝতে সক্ষম হলাম। চ্যাবন সাহেব অবশ্য হাসিমুখেই বললেন, তুমি যদি আর একটু দূরত্ব বজায় রাখ, তা হলেই বাংলাদেশের অধিকতর উপকার হবে।

দু'জনে লেগে গেল—অবশ্য বন্ধুত্ব বজায় রেখেই। কফি পান করতে করতে আমরা তা উপভোগ করলাম।

ভারতীয় রাজনীতির অঙ্গনে অতি সামান্য স্থান থেকে উঠে আসা হরিজন নেতা শ্রী জগজীবন রামের প্রকোষ্ঠে আমাদের নিয়ে যাওয়া হল। সমর দা, রাজনারায়ণ বাবু প্রমুখ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। তিনি তখন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী। আমাদেরকে মুচকি হেসে বললেন, আপাতত আমি রয়েছি দৃশ্যপটের আড়ালে। সময়ে সবই দৃষ্টিগোচর হবে।

তিনি কথা বলেন খুব নিম্নস্বরে এবং ধীরে ধীরে। তিনি আমাদের পরামর্শ

দিলেন, অন্যত্র লবি পরে করলেও চলবে। আপনারা আমাদের লীডারের সাথে কথা বলুন।

তিনি প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর কথাই বলছিলেন। আমরাও একমত হলাম। তিনি বললেন, আগামীকাল আপনাদের কেউ যেন তাঁর পার্লামেন্টের দফতরে যোগাযোগ করে দেখা করার সময় জেনে নেয়—আমি কথা বলে রাখব।

জগজীবন রামের ঘর থেকে বেরিয়ে আমাদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল পশ্চিম বঙ্গ থেকে নির্বাচিতা এমপি মিসেস পূরবী মুখার্জীর সঙ্গে। বিপুল আয়তনের দেহের মধ্যে একটি স্নেহপরায়ণা মনের অধিকারিণী মিসেস পূরবী মুখার্জী আমাদেরকে বিশেষ সমাদরে গ্রহণ করলেন। তিনি সমর দাকে বললেন, আপনি-আমি দু'জনেই চাইব বাংলাদেশের বিষয়টি অগ্রাধিকার পাক। তাই আমাদেরকে একযোগে কাজ করতে হবে।

সমর দা তখন সরকারি দল কংগ্রেসের সদস্যা মিসেস মুখার্জীকে বললেন, আমি বিরোধী দলের। কাজের সুবিধার্থেই এখন কয়েকদিন একটু আড়ালে থাকতে চাই। আপনি এঁদের সার্বক্ষণিক দায়িত্ব নিন।

তাঁরা দু'জন একমত হয়ে সে ব্যবস্থাই করলেন। মিসেস পূরবী মুখার্জী তাঁর বিপুল দেহ নিয়ে ধীর গতিতে চলেন। আমি টিপ্পনী কাটলাম, দিদি, আপনার অন্তর্ভুক্তির পর বাংলাদেশের আন্দোলনের গতি মন্থর হয়ে যাবে না তো?

তিনি হেসে উঠে বললেন, ও রে দুষ্ট ছেলে, এর মধ্যেই সকলের মতো আমার পেছনে লাগতে শুরু করেছ? এই পোড়া দিল্লীতে আমি বলে মাছের ঝোল খেতে না পেয়ে আধখানা হয়ে গেলাম!

বললাম, দিদি, এই যদি আধখানা হয়, তা হলে পুরোটি কী হবে বুঝতেই পারছি! বাংলাদেশের আন্দোলন স্তব্ধ হয়ে বসে পড়বে।

সকলেই হেসে উঠলেন। মিসেস মুখার্জী নিজেই আমাকে ছোট ভাই বানিয়েছেন। বয়সে আমার বড় বোনের মতোই হবেন বলে প্রথম থেকে আমাকে স্নেহের সঙ্গে নাম ধরে শাহ্ বলে ডাকেন। এমপিদের জন্য নির্দিষ্ট দক্ষিণ প্লাজার স্যুট নিয়ে থাকেন। যখন তখন কিছু খাওয়াবার জন্য আমাকে তাঁর স্যুটে নিয়ে যান। আমি সানন্দে তাঁর ঘরে ছোট ভাইয়ের দাবি খাটিয়ে উপদ্রব করি। জামাই বাবু তাঁর স্ত্রীর জন্য টিনভর্তি রসগোল্লা আর আমের আচার পাঠিয়েছেন কলকাতা থেকে। তার অর্ধেকটাই আমি সাবাড় করে দিলাম। তিনি হাসিমুখে আমার আবদার উপদ্রব সহ্য করেন।

আমরা ঠিক করলাম, ছোট ছোট গ্রুপে বিভিন্ন সংসদীয় দলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করব। পূরবী দিদি সরকারি দলের হয়েও সকলের নিকট গ্রহণীয়। সকলের সঙ্গেই তাঁর সুসম্পর্ক। কারো সঙ্গে কোনদিন কোন কটুবাক্য উচ্চারণ করেননি।

ওটা তিনি জানেনই না। এমনি একজন সর্ববাদী সরকারি সদস্যার হেফাজতে আমাদের কাজ ভালোই অগ্রগতি পাচ্ছিল।

সবগুলো গ্রুপের সঙ্গে পৃথক পৃথক বৈঠকের পর সব দল এবং গ্রুপের নেতা-উপনেতারা আমাদেরকে নিয়ে বৈঠকে বসলেন। নানা প্রশ্নোত্তরের মধ্যদিয়ে আমাদের বক্তব্যকে পরিষ্কার জেনে নিলেন। কারো কারো সামান্য ভিন্নমত থাকলেও আমাদের আন্তরিক প্রতিবেদনে তারা সন্তুষ্ট হলেন।

এগিয়ে এলেন পশ্চিম বাংলা থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধি যুবক সদস্য প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী, পশ্চিম বাংলায় তাঁর প্রভূত জনপ্রিয়তা। তিনি এসে সরাসরি শুধালেন, ভারত সরকার আজ পর্যন্ত যা যা করেছে তাতে কী আপনারা সন্তুষ্ট নন? আপনাদের কী অভিযোগ আছে?

বললাম, হাজার বার স্বীকার করছি আপনাদের সরকার যা করেছে তা তুলনাহীন। অভিযোগ থাকার প্রশ্নই আসে না—আছে দাবি, আছে আরও আবদার। বিশ্বের সবচাইতে বড় গণতন্ত্রের সূতিকাগারে আমরা একটি নতুন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের স্বীকৃতি কামনা করি।

তিনি বললেন, আমরাও চাই। তবে সেই মাহেন্দ্রক্ষণটি কখন আসবে তা স্থির করবেন আমাদের নেত্রী, ভারত-নেত্রী, প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী।

পূরবী দিদি দাসমুন্সীরও দিদি। তিনি এসে বললেন, আমার দুটি দুষ্টু ভাই একত্রে কি মতলব আঁটছে?

প্রিয় বললেন, বলাবলি করছিলাম, দিদি তাঁর ভাইদের এড়িয়ে একা একাই খানাপিনা বাড়িয়ে শীঘ্রই মৈনাক পর্বতে না পরিণত হন!

পূরবী দি হেসে প্রিয়কে তাড়া করলেন। গুরুগম্ভীর সংলাপ অচিরেই স্নেহশীলা পূরবী দিদির উপস্থিতিতে নতুন হাস্যরসে পরিণত হল। সেই থেকে দাসমুন্সীর সঙ্গে আমার সখ্যতা। জাতীয় পার্টির সরকারের আমলে যখন আমি উপ-প্রধানমন্ত্রী তখন তিনি ঢাকায় এসে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সেবারের অনুষ্ঠিতব্য ভারতীয় কংগ্রেস সম্মেলনে যোগ দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।

পূরবী দিদি বললেন, তোমরা দিল্লীর কি কি দেখেছ? লাল কেল্লা, জামে মসজিদ, হুমায়ুন টুম্ব, কুতুব মিনার এসব দেখেছ?

বললাম, দেখেছি। সমর গুহ, রাজনারায়ণ, জগজীবন রাম এবং শ্রীমতি পূরবী মুখার্জীদের দেখেই আমাদের চিত্ত ভরে আছে।

বুঝলেন এবং বললেন, দিল্লীতে অজস্র দর্শনীয় বস্তু আছে। এখানে কেউ দু'বেলা কাজ করে না। এক বেলা কাজ, বিকালে-সন্ধ্যায় দিল্লী-ভ্রমণ। কাল থেকে সেই ব্যবস্থা করব।

খুশি হয়ে বললাম, দিদি দীর্ঘজীবী হোন। আর ওজন কিঞ্চিত হ্রাস পাক।

সকালবেলা প্রাতকালীন আশীর্বাদের মতো উপস্থিত হলেন সরকারি

কর্মকর্তাদের মধ্যে বাংলাদেশের পক্ষে পাকিস্তান সরকারের চাকরি পরিত্যাগকারী প্রথম ব্যক্তি জনাব শাহাবুদ্দীন আহমেদ। দিল্লীর পাকিস্তান দূতাবাসের প্রথম সেক্রেটারি ছিলেন। তিনি, তাঁর সঙ্গে প্রেস কাউন্সিলার সাহেবও চাকরি পরিত্যাগ করে পাকিস্তান দূতাবাস থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। তাঁরা দু'জনই ছিলেন সারা বিশ্বে পরিত্যাগকারীদের পথিকৃৎ।

উষ্ণ আলিঙ্গনে তাঁদেরকে আবদ্ধ করলাম। সেই মুহূর্ত থেকে কূটনীতিক শাহাবুদ্দীন সাহেব হয়ে গেলেন আমার ব্যক্তিগত সুহৃদ। আজও সে সম্পর্ক অটুট আছে। মনে পড়ে সেদিন শাহাবুদ্দীনের দুটি ছোট্ট মেয়ে, পরীর বাচ্চাদের মতো দেখতে, তাপদগ্ধ দিল্লীর প্রচণ্ড রৌদ্রকে উপেক্ষা করে বাংলাদেশের প্ল্যাকার্ড হাতে পাকিস্তানি দূতাবাসের সামনে বিক্ষোভ দেখাত প্রতিদিন। প্রখর রৌদ্রতাপে বাচ্চা দুটির সোনার বর্ণ লাল হয়ে ঘাম ঝরে পড়ত, কিন্তু ওরা দাঁড়িয়েই থাকত। বিভিন্ন দেশের বহু মানুষ সেই দৃশ্য দেখার জন্য ছুটে যেত।

শাহাবুদ্দীন সাহেব অনেক কাগজপত্র সঙ্গে এনেছিলেন, সব দেখালেন এবং বললেন, আপনাদের প্রজেকশন খুব সন্তোষজনক হয়েছে। দিল্লীতেই ভারতীয় রাজনীতির চাবিকাঠি—তাছাড়া নয়াদিল্লীতে রয়েছে পৃথিবীর সব দেশের দূতাবাস। এখানে যে কাজ করবেন তার গুরুত্ব অসীম।

তাঁর কথায় আমরা উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলাম। তিনিও ভিন্ন আঙ্গিকে বিভিন্ন দূতাবাসের মাধ্যমে কাজ করে যাচ্ছেন।

শাহাবুদ্দীন আহমেদের মতো দেশপ্রেমিক কর্মকর্তা সহজে দৃষ্টিগোচর হয় না। এ ধরনের মানুষ যতবেশি দেশে জন্মাবে দেশ ততবেশি অগ্রগতির দিকে ধাবমান হবে।

পরদিন এগারোটায় পার্লামেন্ট ভবনে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী, মহামতি মতিলাল নেহেরুর দৌহিত্রী, পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর কন্যা, ভারত-নেত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী। সামনাসামনি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ এই প্রথম। এর আগে দূর থেকে তাঁকে দেখেছি, প্রত্যক্ষ কথোপকথনের সুযোগ এবারই পেলাম। পূরবী দিদি প্রথমে ঘরে ঢুকে আমাদেরকে ডেকে নিয়ে গেলেন। শ্রীমতি গান্ধী উঠে এসে দরজায় দাঁড়িয়ে একে একে আমাদের পরিচয় নিলেন, করমর্দন করলেন এবং তাঁর অফিসে স্বাগত জানালেন।

অত্যন্ত সাদাসিধা বস্ত্র পরিহিতা প্রধানমন্ত্রী হাসিমুখে তাঁর আসন গ্রহণ করলেন এবং আমাদেরকে তাঁর টেবিলের সামনে তিনটি আসনে বসতে অনুরোধ জানালেন। পূরবী দিদি একপাশে আসন নিলেন। শ্রীমতি গান্ধী তাঁর শত ব্যস্ততার মধ্যেও আমাদেরকে সময় দেওয়ায় আমাদের পক্ষ থেকে ফণী দা তাঁকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানালেন।

স্মিত হেসে শ্রীমতি গান্ধী আমাদের সমস্ত খোঁজখবর নিলেন। জানতে চাইলেন যেখানে উঠেছি কোন অসুবিধা হচ্ছে কিনা। পূরবী দিদিকে বললেন আমাদের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে।

তিনি বললেন, আপনাদের আসার সংবাদ জানি এবং আসার পরে আপনাদের কার্যপ্রবাহ সম্বন্ধেও জ্ঞাত আছি।

সবিনয়ে বললাম, আমরা কোন ভুল পদক্ষেপ নিইনি তো?

তিনি সঙ্গে সঙ্গে হেসে বললেন, না, না। আপনারা ঠিকই আছেন। নিজেদের কাজ করে যান। হয়ত এতে আমার সুবিধাই হবে।

আমরা তাঁর আশাবাদী কথায় উজ্জীবিত হলাম। কথাবার্তা সব ইংরেজিতেই হচ্ছে। একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম, একটি ছোট্ট নোট বইতে তিনি আমাদের কথাগুলো লিপিবদ্ধ করে রাখছেন। কথা বলা এবং নোট নেওয়া একসঙ্গেই চলতে লাগল। আমরা পাঁচ জন ব্যতীত ঘরে অন্য কোন সাহায্যকারী স্টাফ বা কর্মকর্তা নেই। তিনি যে কী প্রতিভাময়ী মহিলা তা আমরা আগে থেকেই জানতাম। তাঁর অফিসের আসবাবপত্র রুচিসম্মত কিন্তু দুর্মূল্যের নয়। সাধারণ ও স্বাভাবিকভাবে তাঁর অফিস সাজান। এত বড় দেশের প্রধানমন্ত্রীর বড়ত্ব তাঁর অন্তরে, সাজসজ্জায় নয়।

আমাদের বক্তব্য গভীর মনোযোগসহকারে শুনলেন। যদিও তিনি সবই অবগত, তবুও বাংলাদেশের অভ্যন্তরের সামগ্রিক ঘটনাবলি জানতে চাইলেন। উদ্বাস্তু ক্যাম্প, ট্রেনিং ক্যাম্প, উচ্চতর ট্রেনিং সব বিষয়েই আমাদের অভিমত গ্রহণ করলেন এবং সবকিছুই নোট করে নিলেন।

স্বীকৃতির প্রশ্নে আমরা যখন জোর দাবি জানালাম তিনি তখন স্মিত মুখে সব মন দিয়ে শুনলেন, কোন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন না। একবার কেবল জানতে চাইলেন আমরা কী মনে করি এই মুহূর্তে বাংলাদেশকে তারা স্বীকৃতি দিলে বাংলাদেশ অধিকতর লাভবান হবে?

আমরা তিন জনই সমস্বরে বললাম, অবশ্যই বাংলাদেশ লাভবান হবে এবং তার স্বাধীনতা সংগ্রাম নব-দিগন্ত লাভ করবে।

পূরবী দিদি এতক্ষণ চুপচাপ বসে ছিলেন, এবার তিনিও আমাদের সঙ্গে স্বর মিলালেন।

প্রধানমন্ত্রী তাঁর দিকে তাকিয়ে হেসে বলে উঠলেন, আমি জানতাম এরা তিন জন এসেছে বাংলাদেশ থেকে। এখন দেখছি চার জন হয়ে গেছে।

আমি রহস্য করার সুযোগ নষ্ট করলাম না। বললাম, ম্যাডাম, এটা বাংলাদেশের পক্ষে হেভীওয়েট সাপোর্ট।

সবাই হেসে উঠলেন।

আলোচনা শেষে তিনি নিজহাতে আমাদেরকে কয়েক প্রকারের আচার পরিবেশন করলেন। আমরা তাঁর আতিথেয়তায় চমৎকৃত হলাম। কোন চাপরাশি

বা পিয়ন ডাকলেন না। পূরবী দিদি সাহায্য করতে চাইলে তিনিও টিপ্পনী কাটলেন, তোমার ভারি শরীর নিয়ে নড়াচড়া করা ঠিক হবে না।

আবার হাসির ফোয়ারা ফুটল। দিদি লজ্জায় টমেটো হয়ে গেলেন। আমাদের জন্য অর্ধ ঘণ্টা নির্ধারিত থাকলেও আমাদের সঙ্গে প্রায় দেড় ঘণ্টা সময় কাটালেন। ইন্টারকমে মাঝখানে কেউ যোগাযোগ করলে বললেন, আমি এখন ব্যস্ত রয়েছি। পরে সময় এড্জাস্ট করে দিও।

ওঠার আগে তিনি আমাদেরকে অভয় বাণী শোনালেন, আপনারা আপনাদের কাজ করুন। আমরা আমাদেরটা করি। একসময় সব মিলে যাবে।

ভাঙা ভাঙা বাংলায় বললেন, কবিগুরু বলেছিলেন, "এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে...।"

বিনয়ের সঙ্গে নিবেদন করলাম, ম্যাডাম, ভারতের সাগর তীর ছাড়িয়ে তা বাংলাদেশের মানবহৃদয় তীরে মিলতে হবে।

তিনি বললেন, অবশ্যই, অবশ্যই।

বিদায় দেওয়ার সময় তিনি আবার আমাদের সঙ্গে করমর্দন করলেন এবং দরজায় দাঁড়িয়ে বিদায় জানালেন। আমরা চলে আসার উপক্রম করতেই তিনি আবার একবার আমাদের চার জনকে ডাকলেন। বললেন, একবার সমস্ত এমপিদেরকে একত্রিত করে আপনারা আপনাদের বক্তব্য পেশ করুন না কেন? পূরবী, আমি বলে দেব, তোমরা সব ব্যবস্থা কর।

তাঁর অকৃত্রিম সহযোগিতার জন্য আর একবার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে আমরা প্রফুল্ল চিত্তে বিদায় নিয়ে এলাম। দিনটি আমাদের জন্য স্মরণীয় হয়ে রইল।

গাড়িতে উঠেই দিদিকে পাকড়াও করলাম। প্রধানমন্ত্রী বলে দিয়েছেন আমাদের দিকে লক্ষ্য রাখতে। আমরা এখন প্রায় রাষ্ট্রীয় অতিথি। খাতির-যত্ন করুন।

দিদি বললেন, কি রে হতভাগা, খাতির-যত্ন করি না?

বললাম, ওতে হবে না—আজই দিল্লী সফরে নিয়ে যেতে হবে—দিল্লী কা লাড্ডু খাওয়াতে হবে।

বিকেলেই তিনি আমাদের নিয়ে দিল্লী সফরে বের হলেন। লালকেল্লা, জামে মসজিদ, সফদর জং, বাদশা হুমায়ুনের কবর, কুতুব মিনার দেখিয়ে আনলেন। লাল কেল্লার 'লাইট এন্ড সাউন্ড' শো খুব উপভোগ্য হল। আলো এবং শব্দের সংযোজনে মোঘল সাম্রাজ্যের সময়কার ঘটানাবলি মনোরমভাবে পরিবেশন করা হল। আমরা কুতুব মিনারের সর্বোচ্চ চূড়ায় চড়লেও দিদিকে কিছুতেই এক ধাপও নেওয়া গেল না। সম্ভবও ছিল না। পরদিন নিয়ে গেলেন মহাত্মা গান্ধীর সমাধিস্থল রাজঘাটে। জওহরলাল নেহেরুর সমাধিস্থলেও গেলাম। তাঁর বাসস্থান ত্রিমূর্তি ভবন দেখলাম। তাপসকুল চূড়ামণি হযরত নিজামুদ্দীন আউলিয়া (রঃ)-এর পবিত্র মাযার জিয়ারত করলাম। সম্রাট শাহজাহান দুহিতা শাহজাদী

জাহানারার সমাধিও দেখলাম সেখানে। তাঁর শ্বেতশুভ্র সমাধিতে শাহজাদীর কবিতার ছত্র রয়েছে। খোদাই করা কথাগুলো বাংলা তরজমা করলে অর্থ হয়—"গরীব গোরে ফুল দিও না কেউ।"

ইতিমধ্যে সময় এবং তারিখ ঠিক হয়ে গেল। ভারতীয় পার্লামেন্টের দুই বাহু—লোকসভা এবং রাজ্যসভার এক যৌথ অধিবেশন হবে। সেখানে বাংলাদেশ থেকে আগত তিন জন পার্লামেন্ট সদস্য তাঁদের বক্তব্য রাখবেন। সকলের মধ্যেই বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার সঞ্চার হল। পার্লামেন্টের সদস্যগণ ছাড়াও অনেকে বিশেষ আমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে গ্যালারিতে আসন নিলেন। সাংবাদিক আর আলোকচিত্র শিল্পীদের স্থান সংকুলান হওয়া দায় হয়ে পড়ল।

নির্দিষ্ট সময়ের এক ঘণ্টা আগে আমাদেরকে লোকসভার স্পিকার মি. জি. এস. ধীলনের সুবিশাল কক্ষে নিয়ে যাওয়া হল। তিনি আমাদের আন্তরিক স্বাগত জানালেন। এই ধীলন সাহেবের সঙ্গে পরে ইটালির রোমে ইন্টার পার্লামেন্টারি ইউনিয়নে আমার দেখা হয়েছিল। তিনি ছিলেন ভারতীয় দলের নেতা আর আমি বাংলাদেশ দলের নেতা। সেখানে আমরা একত্রে অনেক কাজ করেছিলাম। তাঁর সূচনাও তৈরি হল এই বৈঠকেরই মাধ্যমে।

সৌজন্য আলাপ-আলোচনার মধ্যেই কফি পান করতে করতে অধিবেশনের সময় হয়ে এল। তিনি আমাদের তিন জনকে নিয়ে হলে ঢুকলেন। সবাই তাঁর সম্মানে উঠে দাঁড়ালেন এবং আমাদেরকে চিরাচরিত প্রথায় টেবিল চাপড়িয়ে হাততালি দিয়ে সম্বর্ধনা দিলেন। মঞ্চে স্পিকার সাহেবের পাশে আমাদের জন্য আসন দেওয়া হয়েছিল।

প্রারম্ভেই স্পিকার সাহেব সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় আমাদেরকে স্বাগত জানালেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করলেন। বললেন, বাংলাদেশের মানুষের রক্তে যখন সেখানকার মাটি ভিজে ওঠে, আমাদের ভারতীয়দের তখন হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হয়। ভাইয়ের সামনে ভাইকে হত্যা করলে তার যে অনুভূতি হয়, সে সুতীব্র বেদনা আমরা ভারতীয়রা অহরহ অনুভব করছি।

মি. ধীলন ছিলেন সর্বজন শ্রদ্ধেয়। কেবল স্পিকার হিসাবেই নন—মানুষ হিসাবেও তাঁকে সকলে সমীহ করত তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, তাঁর পাণ্ডিত্য এবং স্বভাবের মধুরতার জন্য। তিনি খুব কম কথা বলতেন এবং তাও অনুচ্চ কণ্ঠে। তাঁর প্রতিটি কথা সবাই উৎকর্ণ হয়ে শুনত।

বক্তৃতা শেষে তিনি আমাদেরকে একে-একে পরিচয় করিয়ে দিলেন এবং আমাদের তিন জনের সংক্ষিপ্ত জীবন-বৃত্তান্ত পড়ে শোনালেন। সাধারণ নিয়মানুযায়ী সর্ব কনিষ্ঠকে সর্বাগ্রে বলতে দেওয়া হয়। কিন্তু ফণী দা সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন, শাহ্ সাহেব সকলের পরই বলুক। কেননা, তাঁর বক্তৃতার পর আমাদেরটা আর না-ও জমতে পারে।

বেগম সাহেবাও একমত হলেন। সেভাবেই নামের তালিকা তৈরি করে স্পিকার সাহেবের নিকট দেওয়া ছিল। বিস্তর আলাপ-আলোচনা ও মুসাবিদা করে ইংরেজিতে টাইপ করে একটা বক্তৃতা ফণী দা তৈরি করেছিলেন। নূরজাহান মুর্শেদও তা-ই করেছিলেন। আমি ঠিক করেছিলাম Extempore বলব—ওটাই আমার ভালো আসে। তবে কতকগুলো পয়েন্ট লিখে একটি কাগজ সঙ্গে রেখেছিলাম। সারাজীবন বক্তৃতা করেছি, কিন্তু পার্লামেন্টে কোনদিন নয়। একটু ভয় লাগছিল, যদি এতগুলো বিদগ্ধ শ্রোতাকে সন্তুষ্ট করতে না পারি! আল্লাহ্ তুমি সাহায্য কর।

স্পিকার ধীলন সাহেব সর্বাগ্রে শ্রী ফণীভূষণ মজুমদারকে আহ্বান জানালেন। তিনি একসময় নেতাজী সুভাস চন্দ্র বসুর একান্ত সচিব ছিলেন—প্রচুর হাততালি পড়ল। টেবিল চাপড়ে উৎসাহ দেওয়া হল। ফণী দার বয়স হয়েছে। তিনি উঠে তাঁর লিখিত বক্তব্য ধীরে ধীরে সুন্দর করে পাঠ করলেন। শেষ হতে প্রথামত সাধুবাদ হল। তারপর উঠে এলেন নূরজাহান মুর্শেদ। তিনিও একটি লিখিত বক্তৃতা দিলেন। শ্রোতারা যা চাচ্ছিল তা পাচ্ছিল না—একটু উসখুস চলতে লাগল। বক্তব্য শেষ হলে ভদ্রতায় হাততালি ঠিকই পড়ল। কিন্তু অনুভব করছিলাম সভা জমে উঠছে না। কি যেন অভাব রয়েছে। যুদ্ধরত ঘা খাওয়া ব্যাঘ্রের মতো বাংলাদেশের পার্লামেন্টারিয়ানদের কাছ থেকে তাঁরা আগুনঝরা উন্মাদনা সৃষ্টি করার মতো কিছু চায়—কিন্তু লিখিত বক্তৃতা দুটি খুবই ভালো হলেও তাতে সেই উপাদান ছিল না। শ্রোতৃমণ্ডলী হতাশ হচ্ছিলেন, অধিবেশনে একটা ঝিমুনির ভাব এসে গেল।

ডাক পড়ল আমার। কাগজটি হাতে নিয়ে মাইকের সম্মুখে গিয়ে দাঁড়ালাম। আমার হাতেও একটি কাগজ দেখে ওরা ভাবল আর একটি লিখিত বক্তৃতা শুনতে হবে। শুনতে পেলাম কেউ কেউ বলা শুরু করেছেন, এরা যখন লিখিত বক্তব্যই দেবে, তা হলে আর একটা দিন নষ্ট করে অধিবেশন ডাকা কেন—বক্তৃতাগুলো ছেপে আমাদের বিতরণ করলেই পড়ে নিতে পারতাম!

সারাজীবন বক্তৃতা করে কত মঞ্চ, কত সভা মাত করেছি। তাদের কথায় আমার আঁতে ঘা লাগল। সকলকে দেখিয়ে হাতের কাগজটি ফেলে দিলাম। সকলেই বুঝলেন তাদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছি—মুখেই বলব। লিখিত বক্তৃতা নয়। সবাই একযোগে আনন্দ প্রকাশ করলেন এবং আমাকে উৎসাহিত করার

মানসে প্রচুর হাততালি দিলেন এবং প্রচুরতর টেবিল চাপড়ালেন। 'একে তো নাচুনে বুড়ি আরও যদি পায় ঢোলের বাড়ি'—আমার অবস্থা হল তা-ই।

শুরু করলাম বক্তৃতা। ইংরেজিতে বক্তৃতায় আমার অভ্যাস ছিল। সেন্ট গ্রেগরীজ, ব্যাপটিস্ট মিশনের ছাত্র আমি। তাছাড়া কোর্টে এখনও ইংরেজিতেই যুক্তি-তর্ক পেশ করতে হয়। কোন অসুবিধা বোধ করলাম না।

প্রারম্ভে ভারতীয় জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে সেই দেশের কোটি কোটি মানুষকে অন্তর নিঃসৃত কৃতজ্ঞতা এবং বিপদের দিনে বাংলাদেশীদের পাশে এসে দাঁড়াবার জন্য অজস্র ধন্যবাদ দিয়ে বললাম, একাজ ভারতকেই মানায়। মহাত্মা গান্ধী, নেতাজী সুভাস বোস, জওহরলাল নেহেরুর ভারত পৃথিবীর সর্ব বৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশ। তারা কী করে দেখবে তাদেরই পাশে একটি নব-উত্থিত গণতন্ত্রকে গলা টিপে হত্যা করা হচ্ছে! তারা নীরব দর্শক হতে পারে না। সেদিন ইংরেজকে তাড়াবার জন্য যে জেহাদী মন নিয়ে ভারতের স্বাধীনতাকামী জনগণ আত্মাহুতি দিয়েছিল, আজ আর একটি জাতির স্বাধীনতার রক্ত-ঝরা সংগ্রামে তারা নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করতে পারে না। তারা তা করেনি—তাই আজ দশ কোটি বাংলাদেশীর পক্ষ থেকে ভারতের জনগণকে আমরা সালাম জানাই।

হাততালি পড়তে থাকল—আর থামে না। স্বর ছিল আমার উচ্চখাদে বাঁধা। অন্তরে ছিল আবেগের উন্মাদনা। জলদগম্ভীর কণ্ঠে বলতে থাকলাম, আমার পূর্বসূরি বাংলাদেশের দু'জন সম্মানিত সদস্য পূর্বেও পার্লামেন্টে ছিলেন। তাঁরা অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ, তাঁদের বক্তব্যে আপনারা অনেক তত্ত্ব এবং তথ্য পেয়েছেন। কিন্তু আমার কোন অভিজ্ঞতা নেই—আমি নবীন। জীবনে এই প্রথম কোন পার্লামেন্টে বক্তৃতা করতে দাঁড়িয়েছি। ভুল-ভ্রান্তি আমার হবে। হে বিদগ্ধ প্রবীণ পার্লামেন্টারিয়ানগণ, হে বৃহত্তম গণতন্ত্রের প্রতিনিধিগণ, আপনারা আমার ক্ষত-বিক্ষত হৃদয়কে অবলোকন করুন। সেই হৃদয় থেকে রক্ত ঝরছে। আপনারা আমার নিয়ম-কানুনের জ্ঞানের সীমা নিয়ে প্রশ্ন করবেন না—আমার ত্রুটি, বিচ্যুতি আজ ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। আমি যে আজ প্রথমবারের মতো পার্লামেন্টে দাঁড়িয়েছি, তাও নিজ দেশের পার্লামেন্টে নয়, সেখানে আমার জন্য মৃত্যুদণ্ড অপেক্ষা করছে—দাঁড়িয়েছি আপনাদের দরবারে মানবতার দাবি নিয়ে। নবীনের এই প্রথম অভিষেককে সহানুভূতি দিয়ে গ্রহণ করুন।

বলতে বলতে আমার গলা ধরে এসেছিল, কান্নায় বুক ভরে উঠেছিল। তাকিয়ে দেখি সমস্ত শ্রোতৃমণ্ডলীকে আমি আমার আবেগ দ্বারা মথিত করতে সমর্থ হয়েছি। তাঁদেরও চোখে পানি। মুহূর্তে তাঁরা সারা হল কাঁপিয়ে দিলেন মুহুর্মুহু হাততালি আর টেবিল চাপড়িয়ে। বুঝলাম, শ্রোতারা এখন আমার করায়ত্ত, এখন যা পরিবেশন করব ওরা সেটাই অতি আগ্রহে গ্রহণ করবে।

তারপর কী বলেছিলাম? প্রায় আড়াই ঘণ্টার সে বক্তৃতা ছিল আমার

জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ বক্তৃতা। আমি অনুভব করেছিলাম, আমি নয়, আমার ভিতর থেকে অন্য কেউ কথা বলে যাচ্ছে। তথ্যের কোন অভাব হচ্ছে না, ভাষার কোন কমতি নেই—কে যেন একের পর এক সব কিছু যোগান দিয়ে যাচ্ছে।

আজ যদি জিজ্ঞাসিত হই, কী ছিল সে বক্তৃতায়? সঠিক বলতে পারব না। ভাসা ভাসা মনে আছে, ছিল প্রচণ্ড অভিমান, ছিল দুই শত বছরের ইংরেজের পরাধীনতার অভিশাপের বিবরণ। ছিল তার পরে বাদামি চামড়া পাঞ্জাবিদের দুই যুগের বঞ্চনার ইতিহাস। ছিল নিরস্ত্র, অসহায় বাংলা মায়ের সন্তানদের হৃদয় নিংড়ানো করুণ আহাজারি। ছিল বাংলাদেশের উপর পশ্চিমাদের পাহাড় প্রমাণ বৈষম্যের ফলে সৃষ্ট সামাজিক ও অর্থনৈতিক অচলায়তনের বর্ণনা। আর ছিল এসবের ফলশ্রুতিতে জেগে ওঠা এক নতুন প্রজন্মের জীবনপণ শপথ। পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচন করে দেশমাতৃকাকে স্বাধীন করার চির-আকাঙ্ক্ষার বহিঃপ্রকাশ। আরও ছিল নেতাকে পাকিস্তানি কারাগারে বাঁচিয়ে রাখা এবং তাঁকে মুক্ত মানুষ হিসাবে তাঁর জনগণের মাঝে প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা করার মানসে বিশ্ব-বিবেক জাগ্রত করার আন্তরিক আহ্বান।

বলেছিলাম আমার স্ত্রী-পুত্রের সংবাদ নেই—তারা বেঁচে আছে কিনা জানি না, কিন্তু আমি বেঁচে আছি আপনাদের দেশে। আপনাদের সরকার এবং সাধারণ মানুষের অকৃত্রিম সহযোগিতায় নতুন করে জীবন লাভ করেছি। শুনেছি আমার স্ত্রী নাবালক সন্তানকে নিয়ে একটু আশ্রয়ের জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কে দেবে তাদের জীবনের নিরাপত্তার আশ্বাস, কে দেবে তাকে সম্ভ্রম রক্ষার গ্যারান্টি?

আমি ভারতের এই মহান পার্লামেন্ট থেকে বিশ্ব-মানবতার কাছে, বিশ্ব-বিবেকের কাছে আকুতি জানাতে চাই—তারা কি দেবে না এতটুকু ভরসা? চাঁদে যাওয়ার স্বপ্নে বিভোর পরাশক্তি মানবাধিকারের বার্তা শোনায় প্রতি নিঃশ্বাসে—বিশ্ব মানচিত্রের এই অঞ্চলে মানবিকতা যে কেবল ধূলায় লুণ্ঠিত তা-ই নয়, নারকীয় কর্মকাণ্ড যদি কোথাও সংঘটিত হয়ে থাকে, তা হচ্ছে নরপিচাশ ওই বর্বর পাকিস্তানি হানাদারদের হাতে বাংলাদেশে।

তারা চোখ বুজে আছে কেন? সমাজতন্ত্রের ধ্বজাধারী শত কোটি মানুষের দেশটির ভূমিকা আর অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের সূতিকাগার বলে খ্যাত উভয় বৃহৎ দেশের ভূমিকাই আজ বাংলাদেশের প্রশ্নে ন্যক্কারজনক। Every two bullets fired on the people of Bangladesh, one made in U.S.A & the other is made in China. এর কী কোন প্রতিকার নেই? ভারত কী এই পরিস্থিতি মেনে নেবে? আমি তাদেরকে আসামি করে আপনাদের আদালতে বিচার দিয়ে গেলাম। জাতিসংঘ আছে—আজ পৃথিবী বিচ্ছিন্ন নয়।

অস্ত্র আমরা হাতে নিয়েছি। শায়েস্তা ওদের করবই। হানাদারদেরকে বিতাড়িত করে দেশ একদিন স্বাধীন আমরা করবই। দেখতে চাই, সে মহাযজ্ঞে

আপনারা এবং আপনাদের মাধ্যমে পৃথিবীর শান্তি, গণতন্ত্র ও স্বাধীনতাকামী মানুষেরা কতটু অবদান রাখে। ভারতীয় জনগণের কর্তব্য শেষ হয়নি, হতে পারে না।

অনেক আবেগ দিয়ে বললাম, সবকিছু দিয়ে আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন—এবার আমাদেরকেই গ্রহণ করুন, রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির মাধ্যমে বাংলাদেশ একদিন পৃথিবীর মানচিত্রে ঠাঁই করে নেবেই। তার প্রথম স্বীকৃতি সবচাইতে বড় বন্ধু ভারতের কাছ থেকেই আশা করি। শুধু আশা নয়, দাবি করি। আমি জানি আমার দাবি বিফলে যাবে না।

প্রায় আড়াই ঘণ্টা সময় নিয়েছি। জীবনে অনেক বক্তৃতা করেছি। আরও হয়ত করব। কিন্তু সেদিনের মতো বক্তব্য আর কোনদিন হবে না। আমার নিজেরই মন কানায় কানায় ভরে উঠল। যেজন্য নেতৃবৃন্দ আমাকে পাঠিয়েছিলেন, আমি তাঁদের আশা পূরণ করতে পেরেছি। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষেও আমার পরিধেয় পাজামা-পাঞ্জাবি সম্পূর্ণ ভিজে গিয়েছিল।

তারপর কী হল?

সেটাও এক অনির্বচনীয় দৃশ্য। বক্তৃতা যখন চলছিল তখনও দেখেছি অনেকে চোখ মুছছেন। কেউ আবেগে শব্দ করে কেঁদে ফেলেছেন। আবার যখন হাততালি শুনেছি মনে হচ্ছে ছাদ বুঝি ফেটে যাবে। টেবিল চাপড়েছেন ওরা যারপরনাই আতিশয্যে।

বক্তৃতা শেষ হতেই স্পিকার সাহেব, যিনি একজন রাশভারি মানুষ, তিনি এসে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে প্রথমে আমার কপালে চুম্বন এঁকে দিলেন। আমার সহকর্মী দু'জন আনন্দে আমার দু'হাত আঁকড়ে ধরলেন। প্রথম সারির সামনে বসেছিলেন প্রবীণ জননেতা উড়িষ্যার সাবেক মুখ্যমন্ত্রী বিজু পাটনায়েক। তিনি এই বয়সে এক লম্ফে ডায়াসে উঠে এসে আমাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করলেন। আবেগে বলে উঠলেন, বেটা, তুম নে কামাল কর দিয়া।

তাঁর খেয়াল নেই, তিনি আমাকে বেটা বলে সম্বোধন করছেন এবং তুমি বলছেন। প্রায় সারাক্ষণই ক্যামেরা চলছিল—এখন আরও বেশি ছবি উঠতে থাকল। ডায়াসে সবাই আসতে পারে না। সমর দা আমাকে হলের মাঝে এনে দাঁড় করালেন। শুরু হল আলিঙ্গন, করমর্দন, পিঠ চাপড়ানো, আর চুম্বনের পালা। পূরবী দিদি কোথায় বসেছিলেন নজরে পড়েনি। তিনি এসেই আমাকে প্রায় কোলে তুলে নিলেন, আর আমার সমস্ত মুখমণ্ডলে অজস্র চুম্বন বর্ষণ করতে লাগলেন। আনন্দে তাঁর চোখে পানি। বললেন, তুই বাঙালিদের মান রেখেছিস।

প্রায় প্রতিটি সদস্য অজস্র অভিনন্দন জানালেন। বুকে জড়িয়ে ধরলেন। পিঠ চাপড়ে বাহবা দিলেন। দাদী-নানী, মা-বোনের বয়েসী মহিলা সদস্যরা কোন দ্বিধা না করে আমাকে ছোট ছেলের মতো চুমু খেলেন। আমি সব দেখেশুনে হকচকিয়ে গেলাম।

সত্যিই কী আমি এতটা করতে পেরেছি? না তাঁরা আমার প্রথম পার্লামেন্ট বক্তৃতা বলে উৎসাহের আতিশয্যে এতসব করছেন? কিন্তু সকলের চোখে-মুখে যে তৃপ্তি দেখলাম, তার মূল্য মিলিয়ন ডলার। মনে হল আমার প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছে। বিনম্র চিত্তে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌কে শুকরিয়া জানালাম। সকল প্রশংসা তাঁরই প্রাপ্য। মানুষ কেবল নিমিত্তের ভাগীমাত্র।

পরদিন কাগজে কাগজে হৈচৈ পড়ে গেল। দিল্লী থেকে প্রকাশিত প্রায় প্রতিটি পত্রিকা প্রথম পৃষ্ঠায় বিরাট করে ছবিসহ সংবাদ পরিবেশন করল। আমাদের তিন জনের যৌথ ছবি ছেপেই তারা ক্ষান্ত হয়নি, প্রায় প্রতিটি পত্রিকায় আমার বক্তৃতা আলোকচিত্রসহ প্রকাশিত হল। দীর্ঘ বক্তব্যের অনেকটাই তারা রিপোর্ট করেছেন। কাগজে কাগজে সে কী প্রশংসা! অগ্নিগর্ভ বক্তৃতা, বাংলাদেশের এমপি কর্তৃক বিস্ফোরণ, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত ইত্যাদি আরও কত বিশ্লেষণে তারা আমার বক্তব্যকে সাধুবাদ দিল। পৃথক ফিচার লিখল আমাদেরকে নিয়ে।

রাজধানী দিল্লীর পত্রিকাগুলো এত প্রশংসা করল যে, রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে গেলাম। ফণী দা সেদিনই কলকাতায় দীর্ঘ টেলিগ্রাম ও পরে এয়ার লেটারের মাধ্যমে আমার বক্তব্যের ভূয়সী প্রশংসা করলেন সরকারের মন্ত্রিমণ্ডলীর বরাবরে। তাঁর হৃদয় ছিল বিশাল। অকাতরে তিনি লিখলেন, মোয়াজ্জেম এমন বক্তৃতা করেছে, যা আমিও জীবনে কোনদিন শুনিনি, শুনবও না। সে আমাদের মুখ উজ্জ্বল করেছে। তাঁর কারণে আমরা বিখ্যাত হয়ে পড়েছি।

মন প্রশান্তিতে ভরে উঠল। শাহাবুদ্দীন সাহেব এসে কত না আনন্দ করলেন। সাধুবাদ দিলেন। তিনি একটু ঘুরিয়ে vini, viei, vidi-র অনুকরণে বললেন, আপনি এলেন, বললেন, জয় করে নিলেন।

সারাদিন অনেক রাজনীতিবিদ, এমপি এবং মন্ত্রী 'পশ্চিম বঙ্গ ভবনে' এসে ব্যক্তিগতভাবে আমাদের সঙ্গে দেখা করলেন, দ্বিতীয়বার অভিনন্দন জানালেন। একটা বক্তৃতা ঠিক সময়ে, ঠিক জায়গায়, ঠিকমতো পরিবেশিত হওয়ার কী দারুণ প্রতিক্রিয়া এর আগে আর উপলব্ধিতে আসেনি। Hit the iron when it is red কথাটির মর্মার্থ উপলব্ধি করলাম।

দিল্লীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি। তারা এসে আমন্ত্রণ জানালেন, তাদের কার্যালয়ে কফি পান করতে যেতে হবে।

গেলাম। দেখি, সহায়ক সমিতির অফিস নয়, রীতিমতো সুন্দরীদের ফ্যাসন প্যারেড। দিল্লীর অল্প বয়স্কা সুবেশী সুন্দরীরা যেন সহায়ক সমিতির অফিস দখল করে নিয়েছে। হেসে মন্তব্য করলাম, দিল্লীতে যে এত সুন্দরী মেয়েরা রয়েছে, জানা ছিল না।

একমাত্র বয়স্কা মহিলা কর্মকর্তা মিসেস যোশী বললেন, দিল্লীর আসল রূপের খানিকটা সহায়ক সমিতির অফিসে রেখেছি সমিতিকে অধিকতর আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য।

সকলেই হেসে উঠলেন। কফি পার্টির মাঝেই তারা তাদের কার্যক্রম এবং এ পর্যন্ত তাদের সেবা সম্বন্ধে আমাদেরকে একটা ধারণা দিলেন। তাদের কাজ দেখে আমরা খুশি হলাম। প্রশংসা করলাম। ধন্যবাদ জানালাম।

মিসেস যোশীকে বললাম, আল্লাহ্ চাহে তো একদিন বাংলাদেশ স্বাধীন হবে—সেদিন ওইসব সুন্দরীদের নিয়ে ঢাকা ঘুরে এলে আনন্দ পাব।

তিনি বললেন, ভগবান করুন!

দিল্লীতে অগণিত প্রতিষ্ঠান রয়েছে। সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক আরও বহুবিধ। সকলেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে কিছু না কিছু অবদান রাখতে চায়। প্রত্যক্ষভাবে অপারগ হলে নিদেনপক্ষে একটা আলোচনা অনুষ্ঠান বা সেমিনার করতে চায়। এদের সকলের প্রধান আকর্ষণ হলাম এখন আমরা—বাংলাদেশের জনগণের তিন প্রতিনিধি। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও আমন্ত্রণ এল, বক্তৃতা করতে যেতে হবে। অনেক ছাত্র-ছাত্রী আর পণ্ডিত, শিক্ষকমণ্ডলীর মাঝে আমাদের কথা বলা হয়ত মানায় না। কিন্তু ওরা যে আমাদের মুখেই শুনতে চায়। পার্লামেন্টের ঐতিহাসিক বক্তব্যের পরে বক্তৃতা বিশারদরূপে পরিগণিত হচ্ছিলাম।

কোন অসুবিধা হচ্ছিল না। জ্ঞান যতই সীমিত হোক না কেন, মনে ছিল অফুরন্ত বল। শ্রোতাদের মনে করতাম ক্লাসের ছাত্র, আমি যেন শিক্ষক। পরম করুণাময়ই সাহায্য করছিলেন। যা-ই বলতাম, মানুষজন সাদরে সেটাই গ্রহণ করার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকত। প্রায় প্রতিদিন একাধিক সভা-সমাবেশে বক্তব্য রাখতে হত—আমি জীবনের আনন্দ উপভোগ করছিলাম।

দিল্লী রাজধানী এবং প্রতিটি ক্ষেত্রের দিকপালদের অবস্থানের কমতি নেই এখানে। তবে একটি বিষয় এখানে লক্ষ্য করলাম, কলকাতার কিছু কিছু ব্যক্তি ও গোষ্ঠির মতো আমাদেরকে জ্ঞানদানের প্রবণতা এখানে কম পরিলক্ষিত হল। বলতে গেলে একেবারেই নেই। কলকাতায় এ জিনিসের অপ্রতুলতা দেখিনি। অনেক স্থানেই আমাদের দেখলেই নব নব থিউরি, নতুন নতুন পন্থা আমাদেরকে বাতলে দেওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করেছি। আমরা যেন রাজনৈতিক শিশু, সমাজ-সচেতনতার কিন্ডারগার্ডেনের ছাত্র। সে কী তাত্ত্বিক কচকচানি! আর বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শ ধার দেওয়ার কত না আগ্রহ। তারা জানে না এমন

কোন বিষয় নেই, পারে না এমন কাজ নেই। চিরদিনই আমি মুখপোড়া। একদিন হাসির ছলে বলেই ফেললাম, দাদারা, কিছু মনে করবেন না। আমাদের জন্য অনেক করেছেন, এখন নিজেদের চড়কায় একটু তেল দিলে ভালো হয় না! এ দেশের লোকেরাই বলতে শুরু করেছে Calcutta is dying. সেদিকে নজর দিন। নকশাল নকশাল করে অবস্থাটি কি দাঁড়িয়েছে দেখেছেন! ব্যবসা-বাণিজ্য সর্বক্ষেত্রেই স্থানীয়দের দেউলিয়াত্ব দেখা যায়। সর্বত্রই অবাঙালিদের প্রাধান্য। এমনকি বাংলা ভাষাও অবলুপ্তির পথে। পথে-ঘাটে হিন্দির ছড়াছড়ি। পুরাতন কলকাতার আরও পুরাতন প্রেক্ষাগৃহসমূহে ছারপোকার কামড় খেতে খেতে বাংলা সিনেমা আর উত্তর-কলকাতার বাংলা নাটক ব্যতীত সর্বত্রই তো বাঙালি আর বাংলা ভাষার উপেক্ষাই চোখে পড়ে। আমরা বাংলাদেশের লোকেরা কম বুঝলেও ঠিকই বুঝি। ভাষার জন্য প্রাণ দিয়েছি। তাকে প্রতিষ্ঠা করেছি। স্বাধীনতাও একই পথে আসবে। আইডিয়া বিতরণের এখন সময় নয়—এখন সাহায্য করার সময়। সেই সাহায্য হবে শর্তহীন, তবেই না সার্থকতায় পর্যবসিত হবে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যও বলেছিলেন, আর যা কিছুই ওদের দাও, তোমাদের রাজনৈতিক মতাদর্শটি ধার দিও না।

দিল্লীতে এ মনোভাবের কোনই লক্ষণ নেই। আমরা অনায়াসে আমাদের বক্তব্য যত্রতত্র উচ্চকণ্ঠে বলে যেতে পারতাম। বিচার-বিশ্লেষণের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছিল না।

ফণী দার কল্যাণে অনেক নিমন্ত্রণ খেতে হল। তাঁর প্রায়ই বোন বের হতে লাগল। সে মাদারীপুরের হোক বা রাজনীতিরই হোক। তাঁর বোনদের হাতের রান্না খেতেই হত। বেগম নূরজাহান মুর্শেদ এই সুযোগে কিছু দিল্লীর শাড়ি সংগ্রহ করার দিকে মন দিলেন। পূরবী দিদি ঠাট্টা করে বললেন, ভালোই মিলেছে আপনাদের, একজনের বোনের বাড়ির নিমন্ত্রণ হলে আর কথা নেই, অন্যজনের আকর্ষণ নতুন নতুন ডিজাইনের শাড়ি। আর একজন আছে গলাবাজি নিয়ে।

সমর দা এর মধ্যে আমাদেরকে একদিন আগ্রা নিয়ে গেলেন তাজমহল দেখাতে। সঙ্গে তাঁর স্ত্রী, কন্যা এবং কলেজে পড়ুয়া ভাইঝি। সেকেন্দ্রা, ফতেহপুর সিক্রী, আকবর টুম্ব সব ঘুরে ঘুরে দেখা হল। তাজমহলের কোন তুলনা হয় না। সম্রাট কবি পত্নী-প্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে স্মৃতির যে মর্মর-গাঁথা গড়েছেন, পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের তা অন্যতম। নব-পরিণীতা ইংরেজ মহিলা তাঁর স্বামীকে যে কথা বলেছিলেন, সেটাই সবচাইতে হৃদয়গ্রাহী মন্তব্য। 'তুমি যদি আমার জন্য এমনি সমাধি গড়ে দিতে পার তা হলে এই মুহূর্তে আমি মরতে প্রস্তুত।'

তাজমহল অবলোকন করে কেবল মনে হয়, এটি মানুষের তৈরি নয়, অলৌকিক কোন স্থাপত্য।

দিল্লী থেকে ঠিকানা জানিয়ে কলকাতায় সুলতানকে লিখেছিলাম। মোস্তফার কোন সংবাদ থাকলে বা সালেহারা এলে আমাকে যেন জানান হয়। কোন সংবাদ নেই।

দিল্লীর সাংবাদিকরা আমাদের একদিন সংবাদ-সম্মেলন করার অনুরোধ জানালেন। তারাই সব ব্যবস্থা করবেন। সম্মেলনের পরে সাধারণত যারা সম্মেলন করেন তারাই সাংবাদিকদের আপ্যায়ন করে থাকেন। এখানে উল্টোটা হল। তারাই সাংবাদিক-সম্মেলন এবং আপ্যায়নের ব্যবস্থা করলেন; আমরা কেবল আমাদের বক্তব্য রাখব।

সম্মেলনের দিন প্রত্যুষে কলকাতা থেকে আমিরুল ইসলাম সাহেব এসে উপস্থিত। অন্য কোন কার্য উপলক্ষ্যে এসে সংবাদ সম্মেলনের কথা শুনে তিনি সম্মেলনে উপস্থিত হলেন। অবশ্য ছদ্মনাম নিয়ে। তখন তাঁর নাম রহমতউল্লাহ। এদের মনস্তত্ত্ব বুঝি না। দেশের জন্য লড়তে এসে নিজের নামটিই প্রথম পাল্টে নিয়েছেন—কেন? কোন ঝুঁকি যেন না থাকে। দেশে তিনি এক নামে পরিচিত। এখানে অন্য নাম, ভবিষ্যতের জন্য ফাঁক রেখে দিলেন। একইভাবে নামের শেষে আজাদ সংযোগ করে নিজেকে আড়াল করতে চেয়েছিলেন আর এক নেতা। ন্যাপ, গণতন্ত্রী দল প্রভৃতি বামপন্থী পার্টিতে থাকার পর এখন তিনি আওয়ামী লীগের পররাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনিও তখন আবদুস সামাদ থেকে আবদুস সামাদ আজাদ হয়ে গেলেন। আজাদীর পূর্বেই তিনি আজাদ।

আমাদের পক্ষ থেকে ফণী দা লিখিত মূল বক্তব্য পেশ করার পর প্রশ্ন-উত্তরের পালা এল। আমরা সব প্রশ্নের যথারীতি উত্তর দিলাম। রহমতউল্লাহ্ সাহেবও অংশগ্রহণ করলেন। সাংবাদিকগণ ছিলেন আমাদের সংগ্রামের সঙ্গে সম্পূর্ণ একাত্ম। তাই বিব্রতকর কোন প্রশ্নই হল না। তাদের প্রশ্নের মধ্যেই উত্তর লুক্কায়িত ছিল। তবুও বহু দেশী এবং আন্তর্জাতিক বিষয়ে আমাদের বক্তব্য দীর্ঘক্ষণ ধরে যাচাই করে নিলেন। তাদের মতে সেদিনের সম্মেলনও যথোপযুক্ত সাফল্য লাভ করেছিল।

খাওয়া-দাওয়ার পর আমরা পশ্চিম বঙ্গ ভবনে ফিরে এলাম। সেদিনের মতো ব্যস্ততা শেষ হল। ইতিমধ্যে আমাদের তিন জনের জন্য আরও অনেক কর্মসূচি তৈরি হয়ে গিয়েছে। কেন্দ্রীয় সহায়ক সমিতি থেকে আমাদের প্রোগ্রাম করা হয়েছে। দিল্লীর পর আমরা যাব উত্তর প্রদেশের রাজধানী লোখনৌ। তারপর এলাহাবাদ, মাদ্রাজ এবং বোম্বে। সব জায়গা থেকে আমাদের চাহিদা জানিয়ে তারবার্তা আসছে। মাসের পর মাস বিশাল ভারতের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করলেও আমাদের চাহিদা হ্রাস পাবে না। কমিটি আপাতত আমাদেরকে এই কয়েকটি সফরসূচি চূড়ান্ত করেছে। তারাই সমস্ত খরচ বহন করবে। আমাদের কলকাতাতে অনেক কাজ থাকলেও; সেখান থেকে নির্দেশ এল ভারতীয় জনমতকে সুসংগঠিত করতে আরও প্রয়োজনীয় কাজ করার জন্য।

দিল্লী থেকে এবারের মতো বিদায় নেওয়ার পালা। পশ্চিম বঙ্গ ভবনের বিল কারা শোধ করল বুঝতেই দিল না। একবার বললাম, বেয়ারা-বাবুর্চিদের আমরা যৎকিঞ্চিৎ বখশিস দিতে চাই।

উত্তর এল, That has also been taken care of. সেটাও দেওয়া হয়ে গেছে।

ভারতের ট্রেন ভ্রমণ ভালো। প্রথম শ্রেণীতে তিনটি সংরক্ষিত আসনে উঠে বসলাম। প্রথম রাতে বিমানবন্দরে আমাদের যারা স্বাগত জানিয়েছিলেন সেই মি. রঙ্গনাথন ও মি. অশোক এসে উপস্থিত। হাসিমুখে বললেন, মাল রিসিভ করেছিলাম। ডেলিভারি করতে এলাম।

বললাম, আমরা মাল?

বললেন, অমূল্য-মাল।

মি. আশোকের বয়স কম। আমার সঙ্গে ভালোই জমে গেল। ট্রেন ছাড়ার বিলম্ব ছিল। অনেক গল্প হল, দু'জনের মধ্যে, সখ্যতা গড়ে উঠল। সে সখ্যতা অনেকদিন পর্যন্ত সক্রিয় ছিল। কিন্তু আমার আলস্যের কারণে পরবর্তীতে তা নিষ্প্রভ হয়ে যায়। অশোক সাহেব একটা মাটির কুজা ও গ্লাস কিনে শীতল পানি সঙ্গে দিয়ে দিলেন। বললেন, এদিকের আবহাওয়া খুব শুষ্ক। প্রচুর জল পান না-করলে মানুষ অসুস্থ হয়ে যায়।

ট্রেন ছাড়তেই আমরা অশোক বাবুর দেওয়া পানি ঘনঘন পান করতে থাকলাম।

উত্তর প্রদেশের রাজধানী লোখ্‌নৌ পৌছলে রেলস্টেশনে আমাদেরকে যে সম্বর্ধনা দেওয়া হল, তা কেবল যুদ্ধ জয়ের পর রাজা-বাদশাহ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলে পেয়ে থাকেন। এখন তো রাজাও নেই। রাজ্য জয়েরও সুযোগ নেই কিন্তু প্রাদেশিক কংগ্রেস সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় সমস্ত রাজনৈতিক দল মিলে আমাদেরকে যে বীরোচিত সম্বর্ধনা দেওয়া হল; তা আমাদের তিন ব্যক্তির উদ্দেশে নয়, তা ছিল সেখানকার জনগণের বাংলাদেশের মানুষ ও তার সংগ্রামের প্রতি তাদের হৃদয়নিঃসৃত অকুণ্ঠ সহমর্মিতার বহিঃপ্রকাশ।

আমাদেরকে শোভাযাত্রা সহকারে সার্কিট হাউসে নিয়ে যাওয়া হল। সম্বর্ধনার নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন স্থানীয় কংগ্রেসের জনৈক মুসলমান নেতা। ইতিপূর্বে

এ ধরনের কোন মুসলমান নেতাকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে দেখিনি। একান্তে একজনকে বিষয়টি জিজ্ঞেস করতে তিনি বললেন, ওঁর নিকট ধর্মের চাইতে মানবতা বড়। মানুষ হিসাবে তিনি একজন আদর্শ ব্যক্তিত্ব। তাঁর মতো মানবতাবাদী সাধু মানুষ কি হিন্দু, কি মুসলমান—সর্বত্রই বিরল।

দেখলাম তিনি প্রায় সর্বদলীয় নেতা। তাঁর কথা উপেক্ষা করার লোক লোখ্‌নৌতে বিরল।

সার্কিট হাউস উপচে পড়েছে জনারণ্যে। ঘোষণা দেওয়া হল, সন্ধ্যায় আমরা জনসভায় ভাষণ দেব। তারা যেন সেখানে উপস্থিত হন। মেহমানদের বিশ্রামের প্রয়োজন।

আমরা কিন্তু সবটাই খুব উপভোগ করছিলাম। প্রাথমিক জলযোগের পর নেতৃবৃন্দ বিদায় নিলেন। আমাদেরকে স্ব স্ব কক্ষে বিশ্রামের জন্য নেওয়া হল। যে কক্ষটি আমার জন্য বরাদ্দ হল সেখানে একদা পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু রাত কাটিয়েছিলেন। বুঝলাম, বিশেষভাবে সম্মানিত করার জন্যই তারা তাঁর ব্যবহৃত কক্ষ আমাকে বরাদ্দ করেছেন। আমি অত্যন্ত রোমাঞ্চিত বোধ করলাম। শুনলাম পণ্ডিতজীর ব্যবহৃত প্রতিটি বস্তু সেভাবেই রক্ষিত আছে এবং সাধারণত কাউকে এ ঘর বরাদ্দ করা হয় না।

রাত্রি কেটেছিল অনিদ্রায়। লোখ্‌নৌয়ী আদব-কায়দা সম্বন্ধে অনেক শুনেছি। খাস লোখ্‌নৌবাসীদের ভব্যতা, আচরণ এবং ভাষা প্রয়োগ অপরূপ। কথায় আছে, 'আপ পহেলে, আপ পহেলে' করতে করতে বাস চলে যায়। এত ভদ্রতা এবং শালীন ব্যবহার অন্যত্র পাওয়া দুষ্কর। দীর্ঘদিনের নবাবী আমলের ফলশ্রুতিতে এক খানদানী রেওয়াজ-রীতি প্রচলিত রয়েছে হিন্দু-মুসলমান উভয় সমাজে। নৃত্য-গীত এবং সাংস্কৃতি কর্মকাণ্ডে লোখ্‌নৌ কেবল ভারতবর্ষে নয়, এর নাম-ডাক ভারতের গণ্ডি ছাড়িয়ে অন্যত্রও বিঘোষিত।

আমরাও টের পেলাম আসতে-যেতে প্রতিটি মানুষ যেভাবে ঝুঁকে ঝুঁকে বারবার কুর্ণিশের মতো করে সালাম জানায় তা দেখার মতো। অগত্যা আমরাও সেভাবেই প্রতি উত্তর করার চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকলাম।

সন্ধ্যায় জনসভা। আমাদের দেশে সাধারণত বিকেলেই সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এখানে দু'কারণে সন্ধ্যার পর সভা করার রীতি। প্রথমত, সন্ধ্যার পর দিনের প্রখর তাপমাত্রা হ্রাস পেতে থাকে। দ্বিতীয়ত, দিনের সব কাজকর্ম সেরে শ্রোতারাও প্রায় সপরিবারে গড়গড়া হুঁক্কাসহ সভা-সমাবেশে জাঁকিয়ে বসে। দীর্ঘ সময় সভার কাজ চললেও দর্শকের স্বল্পতা পরিলক্ষিত হয় না। অনুষ্ঠান অপছন্দ হলে সমাবেশস্থলেই খানিকটা গড়িয়ে নেওয়া যায়।

প্রদেশের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী অত্যন্ত সুবক্তা শ্রীযুক্ত কমলাপতি ত্রিপাঠি সভায় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করলেন। তিনি যেমনি সুবিশাল দেহের অধিকারী, তেমনি ফরসা তাঁর গাত্রবর্ণ। কপালে রক্ত চন্দনচর্চিত শ্রী ত্রিপাঠি যখন আসন

গ্রহণ করলেন তখন মনে হয়েছিল; এমন ব্যক্তিকে মনে করেই বোধহয় আসন অলঙ্কৃত করার কথা প্রচলিত হয়েছে। তাঁর উপস্থিতিতে সভামঞ্চ ঝলমলিয়ে উঠল। বাংলাদেশকে নিয়ে, আমাদেরকে নিয়ে বন্দনা-সঙ্গীত শেষ হতে সভার কাজ শুরু হল। অনেক বক্তা এবং প্রায় সকলেই আমাদের মুক্তিসংগ্রামের উপর বললেন, অকুণ্ঠ সমর্থন জানালেন এবং বললেন, এ যুদ্ধে তারাও অংশীদার। সশরীরে না হলেও পরোক্ষভাবে তারা জড়িয়ে থাকবেন।

আমাদের পূর্বেই মাননীয় সভাপতি তাঁর সময়োচিত এবং সুললিত কণ্ঠে নাতিদীর্ঘ ভাষণ দিয়ে আমাদেরকে মুহুর্মুহু করতালি ও জয়ধ্বনির মধ্যে পরিচয় করিয়ে দিলেন। আমরা আমাদের বক্তব্যে তাদেরকে কেবল কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদই দিলাম না, এ কথাও নিবেদন করলাম, দেশ একদিন স্বাধীন হবেই এবং যখন বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস লেখা হবে তখন এই বিশাল জনগোষ্ঠীর অকৃত্রিম সহযোগিতা ও সমর্থনের কথাও স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ হবে।

ভারতের মানুষ আমাদেরকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করে রাখলেন। এ কৃতজ্ঞতার ঋণ শোধ হবে কিসে জানি না—শোধ করতেও চাই না। ঋণী হয়েই থাকতে চাই।

নৈশভোজ হল অনেকটা রাষ্ট্রীয় ভোজের পর্যায়ে। শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা তাতে যোগ দিলেন। লোখ্নৌর সেসব সুখাদ্যের কথা স্মরণে এলে আজও জিভে পানি সঞ্চার হয়।

দ্বিতীয় দিন সকাল থেকে আমাদেরকে লোখ্নৌ শহর প্রদক্ষিণ করান হল। একসময় মুসলিম নবাবদের রাজধানী ছিল এই শহর। মুসলিম-অমুসলিম উভয় স্থাপত্য শিল্পের অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে বিভিন্ন ইমারতে। নবাবদের প্রাসাদসমূহ, বাগানবাড়ি, বড় ইমামবাড়া, ছোট ইমামবাড়া প্রভৃতি ঐতিহাসিক স্থানসমূহ পর্যটকদের অবশ্য দর্শনীয়। আমরা পুরাতন নবাবী আমলের এবং বর্তমান লোখ্নৌ ঘুরে ঘুরে দেখলাম, তার সমৃদ্ধ ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত হলাম।

সন্ধ্যায় স্থানীয় প্রেসক্লাবে আমাদের সম্বর্ধনা দেওয়া হল। বাস্তবক্ষেত্রে সেটি পর্যবসিত হল একটি সংবাদ সম্মেলনে। সম্মেলন খুব সফলতা লাভ করল। আমরা তিন জনই প্রাণ খুলে কথাবার্তা বললাম। ওরা বারংবার জানতে চাচ্ছে, কবে ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবে এবং কবে নাগাদ আমরা স্বাধীন হতে পারব! অনেকটা পরম করুণাময়ের অশেষ রহমতের উপর নির্ভর করেই বলেছিলাম, খুব শীঘ্রই ভারতীয় স্বীকৃতি আসবে এবং আল্লাহ্ চাহে তো এ বছরের মধ্যেই আমরা স্বাধীন দেশে প্রত্যাবর্তন করব।

তারা সন্তুষ্ট হল এবং পরের দিনের লোখ্নৌর পত্রিকাসমূহ সেই বক্তব্য যথেষ্ট গুরুত্বসহকারে প্রচার করল। রাতে লোখ্নৌর নাট্যশিল্পীরা বাংলাদেশের উপর রচিত একটি নাটিকা মঞ্চস্থ করল। নাটক খুব হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল। প্রতিটি শিল্পীর অভিনয় উচ্চস্তরের। অভিনয় শেষ হতে যখন আমাদের অভিমত

চাওয়া হল, তখন বললাম, সম্পূর্ণ নাটকটিই ত্রুটিহীন। কেবল একটি বিষয়, বাংলাদেশের মন-মানস ও বঙ্গবন্ধুর চরিত্রের সঙ্গে সামান্য সামঞ্জস্যহীন। তা হল বাংলাদেশে লোখ্নৌর মতো ঝুঁকে কুর্ণিশের রেওয়াজ নেই। বঙ্গবন্ধুকে এ স্থলে আপনারা নিজেদের মনের মাধুরী মিশিয়ে লোখ্নৌয়ী কায়দায় সালাম করতে দেখিয়েছেন—লোখ্নৌর বঙ্গবন্ধু বানিয়ে ফেলেছেন। কিন্তু তিনি বাংলাদেশের বঙ্গবন্ধু।

তারা সহাস্যমুখে সংশোধন করে নিলেন এবং হাসতে হাসতে বললেন, তিনি লোখ্নৌ বন্ধু হলে আমরা গর্ববোধ করতাম।

লোখ্নৌ থেকে বিদায়ের ক্ষণ এসে গেল। তিন দিনেই অনেকের সঙ্গে মধুর সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। তারা আমাদের তিন জনের জন্য তিন সেট লোখ্নৌর পোশাক উপহার দিলেন। পোশাক একদিন ছিন্ন হয়ে গেছে, কিন্তু লোখ্নৌবাসীর উষ্ণ হৃদয়ের ছোঁয়া আর আতিথেয়তার স্মৃতি আজও অম্লান রয়েছে।

সেই যাত্রায় আমরা অনেক আলোচনান্তে এলাহাবাদের প্রোগ্রাম আপাতত স্থগিত রাখলাম। পরবর্তী কোন সময়ে এলাহাবাদ সফর করা যাবে। আমরা উপস্থিত হলাম মাদ্রাজ শহরে। অভ্যর্থনার রূপ প্রায় সর্বত্রই এক। আমরা যেন দিগ্বিজয় করে এসেছি। অবশ্য নিশ্চিত জানি, এ বরমাল্য, এই জয়ধ্বনি আর অগণিত মানুষের অন্তর নিংড়ানো ভালোবাসার উপলক্ষ আমরা হলেও এর উৎস বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ আর সেখানকার বীর জনগণ, যারা সর্বস্ব বিসর্জন দিয়েও রক্তের আখরে স্বাধীনতার জয়গাথা লিখে যাচ্ছে।

মাদ্রাজ শহর বেশ বড়। এখানে অনেক বাংলা ভাষাভাষীর বাস। আমাদের সব প্রোগ্রামে তাদের আগ্রহ অপরিসীম। এবার কোন বাংলো বা সার্কিট হাউসে নয়, আমাদেরকে আতিথ্য দিলেন মাদ্রাজ-প্রবাসী পশ্চিম বঙ্গের অধিবাসী শ্রী অমল ঘোষ তাঁর বাসস্থানে। গাড়ি-বাড়ি নিয়ে বেশ স্বাচ্ছন্দ্যেই বাস করেন শ্রী ঘোষ। তাঁর আধুনিকা ও নৃত্য-পটিয়সী স্ত্রী এবং এক ছেলে, এক মেয়ে নিয়ে বেশ আদর্শ ও সুখী পরিবার। ঘোষ বাবুরও বয়স অল্প এবং অত্যন্ত করিৎকর্মা লোক তিনি। বাংলাদেশের জন্য যে কমিটি গঠন করা হয়েছে তার অন্যতম কর্ণধার। তিনি প্রায় জোর করেই আমাদেরকে তাঁর বাড়িতে ওঠালেন। যুক্তি দেখালেন, এরা বাংলাদেশের লোক, বাঙালি খাবারে অভ্যস্ত। তাঁর বাড়িতে

সেসবের ব্যবস্থা রয়েছে। সুতরাং তাঁর ওখানে অবস্থান করাই অধিকতর যৌক্তিক।

অন্যরা সেটা মেনে নিয়েছেন। আমাদেরকে দুটি ঘর দেওয়া হল। অচিরেই আমরা ঘরের মানুষ বনে গেলাম। বাংলা বলেও সুখ পাচ্ছি। মিসেস ঘোষ হলেন আমার বৌদি আর বাচ্চাদের আমি হলাম কাকু। বিভিন্ন সভাসমাবেশ, সংবাদ সম্মেলনসহ অনেকগুলো কর্মসূচিতে যোগদান করলাম। বাঙালিদের একটি পৃথক সমাবেশে অনেকদিন পর বাংলায় বক্তৃতা করে তৃপ্তি পেলাম। লোকজনও যারপরনাই সন্তুষ্ট। তারা এ ধরনের বক্তব্য আশা করেনি। উৎসাহের আতিশয্যে তারা আমার বক্তৃতার পরিসমাপ্তি টানতে দিচ্ছিল না। ভেবেছিলাম, আধ ঘণ্টা বলব, শেষ পর্যন্ত ঘণ্টাখানেক বলতে হল। তবুও ওদের মনের ক্ষুধা মেটেনি।

সবাই খুব প্রশংসা করলেন। এক মহিলা উঠে এসে উত্তেজিতভাবে বলতে লাগলেন, আপনি সব কাজ ফেলে সারা ভারত ঘুরে মানুষকে কেবল কথা বলুন। আপনাদের সরকারকে বলুন, সমুদয় খরচ আমি দেব, আমার অনেক গহনা আছে। সম্পূর্ণ গহনা আমি বিক্রি করে সব অর্থ যোগান দেব।

তাঁর প্রস্তাবের আন্তরিকতায় মুগ্ধ হয়ে গেলাম। বললাম, আমাদের সরকার গরিব হলেও প্রয়োজন হলে এটুকু বহন করতে পারবে। আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ। আপনার আন্তরিকতার তুলনা হয় না।

সভা শেষে বাঙালি শিল্পীদের একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করলাম। আমাদের সম্মানে কেবলমাত্র প্রবাসী বাঙালি শিল্পীদের অনুষ্ঠান। বৌদিকে নৃত্য পরিবেশনের অনুরোধ করলে তিনি বললেন, যে হারে মুটিয়ে যাচ্ছি! নাচতে গেলে এদের মঞ্চই ভেঙে পড়বে!

ওটা ছিল বৌদির বাহানা। দু'বাচ্চার মা হয়েও সুন্দর দেহের অধিকারিণী ছিলেন তিনি। অমল বাবুর ছেলে আমার বক্তৃতা খুব পছন্দ করল। প্রায়ই বলে, কাকু, তোমার বক্তৃতাটা আর একবার শোনাবে?

বাচ্চারা আমাকে দুটি জরুরি বাক্য শেখাল, লেফট লে পো—অর্থাৎ বায়ে যাও। রাইট লে পো—অর্থাৎ ডানে যাও। যত্রতত্র বাক্য দুটি ব্যবহার করে আর কিছু না হোক বাচ্চা দুটির অমলিন হাসির খোরাক হলাম।

সমুদ্রের পাড়ে বেড়াতে গিয়ে বৌদি তাঁর এক বান্ধবীর বাড়িতে আমাদের নিয়ে গেলেন। বললেন, অদ্ভুত এদের সমাজের রীতি। আপন ভাগ্নী ছাড়া বিয়ে করা যাবে না। ভাগ্নীকেও মামার জন্য অপেক্ষা করতে হবে বিয়ের পিঁড়িতে বসতে হলে।

ভাগ্যক্রমে বৌদির বান্ধবীর একটি উপযুক্ত বয়সের মামা ছিল—তাই তারা সুখী দম্পতি। তাদের দুটি কন্যা সন্তান। এমনও নাকি হয়, অনেক বয়সের মামাকে শিশু-ভাগ্নী বিয়ে করতে হয়। এর বিপরীতটাও হয়ে থাকে। আমাদের

কাছে বিষয়টি অকল্পনীয়। তাই পরিবারটিকে দেখতে গেলাম। গৃহিণী আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতা। চমৎকার ইংরেজি বলছেন। আমাদেরকে সযত্নে সুগন্ধি সরবত করে খাওয়ালেন। গৃহকর্তা বাড়ি ছিলেন না। জিজ্ঞেস করলাম, আপনার মামা কোথায়?

তিনি হেসে উত্তর দিলেন, এখন আর মামা নন, এখন আমার স্বামী। তিনি কাজ উপলক্ষে বাইরে রয়েছেন।

মামার ঘর করতে কেমন লাগে?

আমরা তো এতে অভ্যস্ত! মন্দ লাগবে কেন! তবে আমার মতো ভাগ্যবতী খুব কমই হয়। কেননা, মামা, মানে আমার বর আমার চাইতে মাত্র তিন বছরের বড়। আমরা ছিলাম ভাগ্যবান জুটি।

মামা-ভাগ্নীর সংসার থেকে বিদায় নিয়ে এসে বৌদিকে জিজ্ঞেস করলাম, এরা কোন ধর্মাবলম্বী?

বৌদি বললেন, ধর্মের বালাই এদের খুব একটা নেই। তবে এরাও হিন্দু ধর্মেরই অংশ।

ইতিপূর্বে কখনও এরকম দেখিনি। আমাদের বিস্ময়ের অন্ত ছিল না। প্রদেশের নাম তামিলনাড়ু—রাজধানী মাদ্রাজ। এখন নাম হয়েছে চেন্নাই। মাদ্রাজিরা অঙ্কশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন। ভারতের অধিকাংশ একাউনন্টেন্টই নাকি মাদ্রাজ যুগিয়ে থাকে। ধীরস্থির মানুষগুলোকে দেখলেই মনে হয় হিসাব মিলাতে ব্যস্ত।

দেখলাম সিনেমার নায়কদের বিরাট বিরাট বীরোচিত তৈলচিত্র শোভা পাচ্ছে রাস্তার বিভিন্ন মোড়ে। নায়ক-নায়িকাদের এরা প্রায় দেব-দেবীর স্থানে পূজা করে। অনেক নায়ক-নায়িকা পরবর্তী জীবনে রাজনীতিতে প্রবেশ করে আকাশচুম্বী জনপ্রিয়তা নিয়ে রাজ্যের সর্বোচ্চ পদ মুখ্যমন্ত্রীর আসনেও অধিষ্ঠিত হয়েছেন। রামা রাও এবং জয়ললিতার ঘটনা তো অধুনা।

সাধারণ মানুষজন একটু কালোর দিক ঘেঁষে। কিন্তু তার মাঝখান থেকেই অপরূপা সুন্দরীরাও বেরিয়ে আসে। মাদ্রাজ বোম্বের চলচ্চিত্র জগতে এরা অচিরেই ঠাঁই করে নেয়। বৌদি এমনি একজন নায়িকাকে চায়ে নিমন্ত্রণ করে এনে আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। দেহে রূপ যেন ধরে না। সৃষ্টিকর্তা সমস্ত মাধুরী মিশিয়ে তাঁর দেহটি তৈরি করেছেন। যেখানে যেমনটি হলে মানায়, তেমনিই রয়েছে তার সুগঠিত অবয়বে। সর্বশরীর দিয়ে যেন রূপ-সুধা ঝরে পড়ছে।

বৌদি হেসে জিজ্ঞেস করলেন, কী, কেমন দেখছ?

বৌদির সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা চলে। বললাম, বাইরের যেটুকু দেখা গেল তাতেই ভিরমী খাচ্ছি। এর বেশি তো আর সুযোগ দেবেন না!

তিনিও কম যান না। বললেন, তোমাদের তো চারটি পর্যন্ত চলে, দেখব নাকি প্রস্তাব করে?

বৌদিকে বললাম, মাফ করবেন। এমন বউ ঘরে এলে বউ পাহারা দিতেই জীবন শেষ হবে—কাজকর্ম শিকায় উঠবে।

বাংলাভাষীরা সব হেসে উঠল। ক'টা দিন খুব আনন্দে কাটল। আমাদের ফরমাশ ছিল প্রতি বেলায়ই যেন বাঙালি খাবার দেওয়া হয়। বৌদি একদিন বৈচিত্র্য আনার জন্য নিজ হাতে মাদ্রাজি-ইটলি ও দোসা প্রস্তুত করে খাওয়ালেন। ভালোই লাগল। তবে বোধগম্য হল না, এ জিনিস প্রতিদিন, প্রতিবেলা চলে কি করে! ঘোষ দার সঙ্গে কথা হয়ে রইল, বাংলাদেশ স্বাধীন হলে তিনি সপরিবারে ঢাকা এসে আমাদেরকে তাঁর আতিথেয়তার প্রতিদানের সুযোগ দেবেন।

'৭৫ সালের মাঝামাঝি তাঁর চিঠি পেলাম—আমার সরকারি বাসায়। শীঘ্রই সপরিবারে তিনি আমার আতিথ্য গ্রহণ করতে আসছেন। খুব আনন্দ নিয়ে অপেক্ষা করছি। এর মধ্যে ঘটে গেল ১৫ই অগাস্টের সপরিবারে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ড। এ ঘটনার পর তিনি আর যোগাযোগ করেননি। মাদ্রাজ আর যাওয়া হয়নি। তাঁরা এখন কোথায়, কেমন আছেন জানি না। বাচ্চা দুটো হয়ত নিজেরাই ছেলে-মেয়ের বাবা-মা হয়ে গেছে।

প্লেনযোগে অবতরণ করলাম বোম্বাই শহরে। বর্তমান নাম মুম্বাই। প্রাচ্যের হলিউড এবং ভারতীয় বাইরুত হিসাবে খ্যাত। স্থানীয় সহায়ক সমিতি এবং মহারাষ্ট্র কংগ্রেস সরকারের যৌথ উদ্যোগে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যে আমাদেরকে বিমানবন্দর থেকে নিয়ে যাওয়া হল। বিমানবন্দরে নেমে পেয়ে গেলাম আমার দীর্ঘদিনের সহকর্মী অনুজপ্রতিম কে. এম. ওবায়দুর রহমানকে। বোম্বে সফরে সে আমাদের সঙ্গী হবে। অত্যন্ত আনন্দ হল তাকে পেয়ে। ছাত্রলীগে ওবায়েদ ছিল আমাদের সাংগঠনিক সম্পাদক। ছাত্রলীগ থেকে বিদায় নেওয়ার সময় ওবায়েদকেই সভাপতি করি আমি।

বোম্বাইয়ের বিশিষ্ট সমাজসেবিকা মিসেস সুলক্ষণা পাণ্ডের প্রাসাদোপম বাড়িতে আমাদের রাখা হল। তাঁর স্বামী এবং পুত্র উভয়েই সিনেমা ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। ছেলে তরুণ পরিচালক। মেয়েটি তখনও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। অঢেল অর্থের মালিক এই পরিবারের গৃহিণীর কোন কাজ নেই। ডজনখানেক বয়-বাবুর্চি মিলে সংসার চালায়। মিসেস থাকেন তাঁর সমাজসেবা নিয়ে।

বাড়িতেই ড্রিঙ্ক করার ব্যবস্থা আছে। দ্বিতলের ড্রয়িংরুম সংলগ্ন আধুনিক সেলার। আমরা বিমানবন্দর থেকে তাঁর বাড়িতে পৌঁছতে বেয়ারা এসে জানতে চাইল, কী পান করবেন?

মেমসাহেব আদেশ করলেন, এদেরকে তোমার স্পেশাল ড্রিঙ্কস তৈরি করে খাওয়াও।

আমি নিবেদন করলাম, আমার কোন হার্ড ড্রিঙ্ক চলে না।

জিজ্ঞেস করলেন, ধর্মীয় অনুশাসন?

বললাম, সে তো আছেই। তাছাড়া আমরা অভ্যস্ত নই।

তিনি হতাশ হলেন। তবে তাঁকে একেবারে হতাশ হতে হল না। 'তিতাস একটি নদীর নামে'র স্বনামধন্য পরিচালক শ্রী ঋত্বিক ঘটক আমাদের সঙ্গে বিমানবন্দর থেকে এসেছেন। এ বিষয়ে তিনি একাই এক শ'। বললেন, আমাকে দিন, আমিই এখানে একমাত্র ক্রিমিনাল।

মিসেস পাণ্ডে বললেন, আমি আপনাকে সঙ্গ দেব।

তাঁরা হার্ড ড্রিঙ্ক নিলেন। আমাদের জন্য এল কোমল-পানীয়। গৃহকর্তা এবং ছেলে-মেয়ে বাড়িতেই ছিলেন। আমাদের সঙ্গে আলোচনা করতে এলেন। নিজেদের মধ্যে ওরা ইংরেজিতেই কথাবার্তা বলেন। মনে হচ্ছে ইউরোপ-আমেরিকার কোন পরিবারে ঢুকে পড়েছি।

মিসেস বাংলাদেশের কথা বলতে সেখানকার নারী-নির্যাতন, পাক সেনা কর্তৃক ধর্ষণ, হত্যা সম্বন্ধে উত্তেজিত মন্তব্য করেছিলেন। তাঁর স্বামী স্বভাবসুলভ গাম্ভীর্যের সঙ্গে বললেন, যুদ্ধ চলছে, যুদ্ধের সময় সৈন্যরা এসব আনুষঙ্গিক কাজগুলো করেই থাকে, এ নিয়ে উত্তেজনার কি আছে?

আর যায় কোথায়, স্ত্রীর তীব্র আক্রমণের মুখে স্বামীপ্রবর বারংবার, 'ডার্লিং, আমি দুঃখিত, আমি খুবই দুঃখিত' বলে ক্ষমা চাইতে লাগলেন। তাঁর ছেলে-মেয়ে বিষয়টি বেশ উপভোগ করছে মনে হল।

চুপিচুপি তরুণ পরিচালক বললেন, আসলে আমাদের বাসায় প্রতিদিন যে বাকযুদ্ধ হয় তাতে কিন্তু নারীরই জয় হয়। পিতৃদেব দু'-একটি খোঁচা মেরেই চুপসে যান।

খাস বিলেতী কায়দার লাঞ্চ করে বিশ্রামান্তে আমাদের নিয়ে যাওয়া হল এক জনসভায়—একটি ক্রিকেট খেলার মাঠে। দর্শকের মধ্যে নর-নারী প্রায় অর্ধেক অর্ধেক। নারীদের মধ্যে সমাজের মধ্যবিত্ত এবং উচ্চবিত্তদের সমাবেশ অধিকতর। বুঝতে কষ্ট হল না মিসেস সুলক্ষণা পাণ্ডে এবং তাঁর সংগঠন আয়োজন ভালোই করেছে। সিনেমাজগতের অনেক কলাকুশলীও সভায় যোগ দিয়েছেন। বক্তৃতার এক পর্যায়ে আমাদের স্বনামধন্য পরিচালক শ্রী ঋত্বিক ঘটক ঘোষণা করলেন, বাংলাদেশের জন্য রক্ত দেওয়ার প্রয়োজন। আমি সর্বাগ্রে সেই রক্ত দিতে চাই।

এই বলে তিনি শার্টের আস্তিন গুটিয়ে মাইক ছেড়ে এগিয়ে এলেন। চলছে জনসভা, এর মধ্যে কে নেবে রক্ত, কি তার আয়োজন, এই মুহূর্তে কি তার প্রয়োজন—কোন কিছুতে মনোনিবেশ না করে তিনি হঠাৎ রক্ত দেওয়ার জন্য ক্ষেপে উঠলেন! দুপুর থেকে অপর্যাপ্ত পানীয়ের প্রভাবে কিঞ্চিত বেসামাল ছিলেন। তবে শুনলাম, অত্যন্ত প্রতিভাধর এই স্বনামধন্য পরিচালককে সিনেমা জগতের লোকেরা তাঁর প্রচুর পানাসক্তি থাকার পরও অত্যধিক শ্রদ্ধার চোখে দেখে। নিজের বিষয়ে তাঁর গুণে কোন ঘাটতি নেই।

যথারীতি সভার কাজ শেষ করে আমাদেরকে নিয়ে যাওয়া হল মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী মি. প্যাটেলের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য তাঁর সরকারি বাসভবনে। তিনি আমাদের সঙ্গে অত্যন্ত হৃদ্যতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করলেন। বললেন, হাইকমান্ডের সঙ্গে তাঁদের বৈঠক হয়েছে—শীঘ্রই বাংলাদেশের সমস্যা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী বিশ্ব সফরে বের হবেন। সেখান থেকে প্রত্যাবর্তনের পর বিশ্ব-বিবেকের সাড়া যদি অর্জন করতে পারেন এবং পারবেন বলেই তিনি আশাবাদী, তা হলে বাংলাদেশের প্রশ্নে তাঁর সুস্পষ্ট নীতির ঘোষণা দেবেন। সেই ঘোষণা হবে পজেটিভ।

তিনি আরও বললেন, পাকিস্তান হওয়ার পর যেমন একবার আমরা বাস্তুহারা সমস্যায় পড়েছিলাম—এবার আবার তেমনি সমস্যায় নিপতিত হয়েছি।

বলতে বাধ্য হলাম, পাকিস্তান হওয়ার পর আমাদেরকেও এদিকের বাস্তুহারাদের নিয়ে একই ধরনের সমস্যা মোকাবিলা করতে হয়েছে।

আরও বললাম, সেদিনের উদ্বাস্তুরা ছিল দেশ-বিভাজনের প্রত্যক্ষ ফল। কিন্তু আজ হানাদারদের দ্বারা আক্রান্ত-বিতাড়িত স্বাধীনতাকামী জনগোষ্ঠীর একাংশের বাধ্যতামূলক দেশত্যাগ এবং আপনাদের আশ্রয় গ্রহণ। চিরদিনের মতো এরা থাকতে আসেনি। তাদের পরিচয় পরিবর্তনের বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এরা জন্মভূমিতে প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষায় দিন গুনছে।

মুখ্যমন্ত্রী আমাদের বক্তব্য প্রণিধান করলেন। জিজ্ঞেস করলেন, আপনাদের কী মনে হয়, সেদিনের জন্য দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে হবে?

বললাম, সেটা নির্ভর করছে সময়ের ওপর। তবে বিংশ শতাব্দীর এই লগ্নে একটা হানাদার বাহিনীর বেশিদিন টিকে থাকার কথা নয়। বিশ্বের মানুষ তাদের ধিক্কার দিচ্ছে—নিন্দায় নিন্দায় সারা দুনিয়া তোলপাড়। এমনি প্রতিকূল পরিস্থিতিতে বৃহৎ দু-একটি শক্তির যে পরোক্ষ মদদ রয়েছে তা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেতে থাকবে। ওরা পর্যুদস্ত হল বলে।

অনেক ছবি তোলা হল। দিল্লী থেকেই দেখছি মুভি ক্যামেরাও সক্রিয়

রয়েছে প্রতিটি অনুষ্ঠানে। পরদিন বাংলাদেশের উপর একটি সেমিনারে আমাদের নিয়ে যাওয়া হল। বোম্বের বিদগ্ধজনেরা সেই অনুষ্ঠানে সমাগত। অনুষ্ঠানটি হচ্ছে শহরের অভিজাত অঞ্চলের একটি বিশিষ্ট সমাজকেন্দ্রে। উপস্থিত সজ্জনরা আমাদের কাছে নানা তথ্য জানতে চাইলেন। বাংলাদেশের যুদ্ধ কতটা বাস্তবসম্মত, নাকি একতরফা প্রচার যন্ত্রের ঢাক পেটানো হচ্ছে, তারা তা জানতে চাইলেন। আমরা প্রকৃত তথ্য এবং সততার নিরিখে আমাদের যুদ্ধাবস্থার বর্ণনা দিলাম। কিছু বিষয় রয়েছে যুদ্ধের স্বার্থে জনসমক্ষে প্রকাশ ক্ষতিকর। সেসব বাদ দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের কার্যকারণ এবং সফলতার কাহিনী শুনে শ্রোতৃমণ্ডলী উজ্জীবিত হয়ে উঠলেন।

অপরাহ্ণে আমাদেরকে এক চা-চক্রের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে হল। ভারতের কেন্দ্রীয় তথ্যমন্ত্রী শ্রীমতি নন্দিনী শতপথির পক্ষ থেকে এই চা-চক্র। তিনি তখন বোম্বে সফর করছেন। বোম্বের সুবিখ্যাত জুহু বিচের বাসস্থানে তাঁর এই চা-চক্র। যেখানে চা-চক্রের টেবিল সাজান হয়েছে, সেই বাগানে সমুদ্রের ঢেউয়ের ছিটা-ফোঁটা গায়ে এসে লাগে। সে এক অপূর্ব অনুভূতি।

শ্রীমতি নন্দিনী শতপথি কেবল একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীই নন, তিনি শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর খুব ঘনিষ্ঠজন। তাঁর নির্বাচনী প্রচারণায় গিয়ে শ্রীমতি গান্ধী বলেছিলেন, 'নন্দিনী মেরে মিত্র, আউর মেরে সাথী।'

তথ্য মন্ত্রণালয়ের মধ্যে ফিল্ম ডিভিশন রয়েছে—তাই তাঁর চা-চক্রে সিনেমা জগতের অনেক দিক্‌পালও উপস্থিত ছিলেন। মন্ত্রী মহোদয়ার সঙ্গে সৌজন্য আলাপ সেরে একটি টেবিলে স্থান পেলাম। পাশে বসেছেন টিকলো নাক, একজন দীর্ঘাঙ্গীনী, স্বাস্থ্যবতী, সুন্দরী মহিলা। খুব পরিচিতা মনে হচ্ছিল। কিন্তু কিছুতেই সঠিক চিনতে পারছিলাম না।

পরিচয়ের সময় তিনি হাত মেলালেন এবং বললেন, আমি মিসেস ডাট।

কিছুই হৃদয়ঙ্গম হল না। তিনি আমার পাশের চেয়ারে উপবিষ্ট। আমার সঙ্গে টুকটাক কথাও বলছেন। আমি গভীরভাবে ভাবতে লাগলাম, কে এই মহিলা? এত পরিচিত মনে হচ্ছে কেন! তাঁর হাসিটি যেন বহুদিনের চেনা। আমি অলক্ষ্যে মিসেস পাণ্ডেকে জিজ্ঞেস করতে তিনিও বললেন, চিনতে পারছেন না, মিসেস ডাট।

যেই তিমিরে সেই তিমিরেই রয়ে গেলাম। ভাবলাম, ভব্যতা যা-ই বলুক, এবার সরাসরি ভদ্রমহিলাকে তাঁর বিস্তারিত পরিচয় জিজ্ঞেস করব। বললাম, আপনাকে এত চেনা লাগছে, অথচ চিনতে পারছি না কেন?

তিনি ঘুরে আমার দিকে সরাসরি বসে বললেন, এখন দেখুন তো চিনতে পারছেন কিনা?

বললাম, খুবই চেনা চেনা লাগছে, কিন্তু এখনও বুঝে উঠতে পারছি না!

তিনি একটু হেসে বললেন, হিন্দি সিনেমা দেখার অভ্যাস আছে?

বললাম, সিনেমা দেখার একটি পোকা বলতে পারেন আমাকে।

তখন বললেন, দেখুন তো সিনেমার নার্গিসের সঙ্গে কোন সাদৃশ্য খুঁজে পান কিনা?

আড়াল খসে গেল। আরে, তা-ই তো! এতক্ষণ যিনি আমার পাশে বসে আছেন মিসেস ডাট অর্থাৎ মিসেস সুনীল ডাট বা দত্তের পরিচয়ে তিনিই তো একসময়ের এই উপমহাদেশের সবচাইতে খ্যাতিসম্পন্না, কিংবদন্তীর নায়িকা। কত যুবকের বিনিদ্র-রজনীর হা-হুতাস আর স্বপ্নের রাজকুমারী—'বরসাতে'র সেই নার্গিস। যাঁর সম্বন্ধে একজন বিদেশী রাষ্ট্রপ্রধান মেহমান মন্তব্য করেছিলেন, আমি যদি আলেকজান্ডার হতাম, তা হলে আর একবার ভারত আক্রমণ করতাম এবং নার্গিসকে লুট করে নিয়ে যেতাম। এ ধরনের মন্তব্য আজ পর্যন্ত কোন নায়িকার অদৃষ্টে জোটেনি। বস্তুত নার্গিসের অভিনয় কুশলতা, তাঁর অনিন্দ্য সুন্দর দেহবল্লরী, তাঁর বিশ্ব জয়-করা হাসি এবং ছিপছিপে গড়ন তাঁকে দিয়েছিল অনবদ্য রূপ। রূপ এবং গুণের এমন সমন্বয় কেবল দুষ্প্রাপ্যই নয়, অচিন্তনীয়।

সেই নার্গিস, আমার কত রাতের ঘুম হারাম করা নার্গিস; আমার পাশে বসে আমার সঙ্গে আলাপ করছেন হেসে হেসে, আর আমি চিনতে পারিনি। সিনেমাজগত ছেড়ে সুনীল দত্তের সংসারে মনোনিবেশ করার পর তিনি অনেক মুটিয়ে গেছেন সত্যিই। তা সত্ত্বেও তাঁকে চিনতে না পারার অপরাধে নিজেকে ক্ষমার অযোগ্য মনে হল। তাঁর পুত্র সঞ্জয়কে দেখলেও তার মুখচ্ছবির প্রতিফলন দৃষ্টিগোচর হয়। তাই তো সঞ্জয়কে এত ভালো লাগে। অনেক ক্ষমা প্রার্থনা করলাম চিনতে না-পারার জন্য। আমাদের হৃদয়ে তার কী স্থান অকপটে বললাম। তিনি মধুর হেসে তা উপলব্ধি করলেন।

দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগে তিনি যখন মৃত্যুবরণ করেন, তখন এককালের নায়িকার জন্য নয়, একজন আপন মানুষের মৃত্যুশোক পেয়েছিলাম।

চা-চক্র শেষ হতে তিনি আরও কয়েকজন নায়ক-নায়িকার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। কিন্তু আমি তখন নার্গিস-জ্বরে আক্রান্ত। অন্যদের বিস্মৃত হতে সময় লাগল না।

রাতে ছিল রাজ্যপালের দেওয়া নৈশভোজ। তা সেরে মিসেস পাণ্ডে আমাদেরকে বোম্বের সমুদ্র সৈকতে 'কুইনস নেকলেস' বা রানীর গলার হার দেখালেন। সাগরের ক্রোড়ে বোম্বে শহর বিদ্যমান। মেরিন ড্রাইভে সমুদ্র অর্ধ গোলাকৃতি একটি বিশাল বেষ্টনী তৈরি করেছে। এই বেষ্টনীর সর্বত্র রাস্তা এবং পাশে উচ্চ দালানসমূহ থেকে রাত্রিবেলা প্রচুর আলো ছড়িয়ে পড়ায় এলাকাটিকে নেকলেসের মতো ঝলমল করতে দেখা যায়। তা-ই এর নাম হয়েছে কুইনস নেকলেস।

খুব উপভোগ করলাম নৈশকালীন সমুদ্র সৈকতের অপরূপ সৌন্দর্য। সঙ্গে সমুদ্রের নিরবচ্ছিন্ন তর্জন-গর্জন। গভীর রাতে মিসেস পাণ্ডের প্রাসাদে ফিরে এসে সুনিদ্রা উপভোগ করলাম।

পরদিন এক সংবাদ সম্মেলনে জনৈক বেয়ারা সাংবাদিকের সঙ্গে খানিকটা হয়ে গেল। সবই ভালো চলছিল জনাকীর্ণ সম্মেলনে। কোন একসময় আমরা বলছিলাম, হিটলার, চেঙ্গিস খাঁ আর আচেলার অত্যাচারকে হার মানাবে পাকিস্তানি বর্বর হানাদার বাহিনীর নৃশংস কর্মকাণ্ড।

সাংবাদিকটি হাত তুলে প্রশ্ন করলেন, হিটলার, চেঙ্গিস খাঁ আর আচেলার অত্যাচার হার মানিয়েছে, কিন্তু পাকিস্তানিরা কি সুরাবর্দ্দীর অত্যাচারের কাহিনীকে ম্লান করতে পেরেছে?

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে বাংলাদেশের প্রায় সমস্ত মানুষ গভীরভাবে শ্রদ্ধা করে। শুধু তাঁকে শ্রেষ্ঠ নেতা নয়, নেতাদের নেতা বলে মান্য করে এবং হৃদয়ের অত্যন্ত কাছের মানুষ হিসাবে ভালোবাসে। তাঁর সম্বন্ধে এমনি বিরূপ মন্তব্য! তাঁর নাম নিয়ে এমনি বিকৃতি! অসহ্য! অসহ্য! বসে বসে প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলাম। দাঁড়িয়ে গেলাম—ভুলে গেলাম এখানে আমরা মেহমান, আমাদেরকে শালীনতার মধ্যেই সবকিছু সহ্য করে যেতে হবে!

বললাম, আপনি অনুগ্রহ করে নিজেকে সংশোধন করুন। যে মহান নেতার নাম নিয়েছেন, তিনি সর্বজন শ্রদ্ধেয় জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। সুরাবর্দ্দী নন। সাংবাদিক হিসাবে এটুকু অন্তত আপনার অজ্ঞাত নয়। আর তাঁর অত্যাচারের কল্প-কাহিনীর ইঙ্গিত করেছেন, আমরা তা দৃঢ়তার সাথে প্রত্যাখ্যান করছি। তিনি ছিলেন মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার চিরসংগ্রামী, শ্রমজীবী মানুষের একান্ত বন্ধু। শান্তি ও সমৃদ্ধির অগ্র-সৈনিক এবং সর্বোপরি গণতন্ত্রের মানসপুত্র শহীদ সোহরাওয়ার্দীর তুলনা কেবল তিনি নিজেই। আপনি কী জানেন না, মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে মিলে এই মহান নেতাই দাঙ্গা-বিধ্বস্ত এলাকাসমূহ সফর করে শান্তি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন?

আমাদের দৃঢ় বক্তব্যের কারণে এবং সাংবাদিকটির অশোভন এবং অবান্তর প্রশ্নে অন্যান্য সাংবাদিকরাও বিরক্ত হচ্ছিল। সংশ্লিষ্ট সাংবাদিক আবার দাঁড়ালে কঠিন স্বরে বললাম, আপনার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে।

যথাযথ লিখবেন। আপনার আর কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে আমাদের বিবেক চাইছে না।

চারদিকে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হতে থাকল। আমাদের গৃহকর্ত্রী দারুণ খুশি। কি কারণে যেন তিনি সাংবাদিকদের উপর খুবই চটা। টেবিল চাপড়ে তিনি এমন কথা বললেন যে, অন্য সময় হলে গণ্ডগোল বেঁধে যেতে পারত। তিনি বললেন, বেয়াদব লোকটিকে কেউ বের করে দাও।

কেউ কেউ ওকথা শুনেছে, অনেকে হট্টগোলে শুনতে পায়নি। তাই বাঁচোয়া। তবুও বাদ-প্রতিবাদ উঠল। আমরা কণ্ঠস্বর বাড়িয়ে সেসব নিবৃত্ত করে সম্মেলনের কাজ সমাধা করলাম। চা সেবনের সময় অন্য সাংবাদিকরা সেই ভদ্রলোককে নিয়ে এল।

সে ক্ষমা চাইল। বলল, ভেবেছিলাম খোঁচা দিয়ে কিছু বের করব। হয়ে গেল বিবাদ।

বললাম, বাংলাদেশের লোক আমরা যুদ্ধরত। তাই আমাদেরও সহ্য শক্তি হ্রাস পাচ্ছে।

সাংবাদিকটি বলল, আমার আঘাতের চেয়ে আপনার প্রত্যাঘাত বেশি হয়নি কী?

বললাম, বাংলাদেশে একটা কথা আছে, 'আগে পানির ছিটা, পরে চইরার গুঁতা।' প্রথম আঘাত যে করে তাকে বৃহত্তর প্রত্যাঘাতের জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়।

হাত মিলিয়ে হাসিমুখে তারা বিদায় নিল। বাড়িতে এসে মিসেস পাণ্ডে পারেন তো আমাকে কোলে তুলে নাচেন। বললেন, উপযুক্ত কাজ করেছেন। শঠে শাঠ্যাং। এই না হলে হয়?

তারপর তিনি বললেন, আজ আমার নিজহাতের তৈরি করা ড্রিঙ্কস আপনাকে খেতেই হবে।

বললাম, আপনার সব কথা মানি। কিন্তু ও-রসে বঞ্চিত আমি। এ নিয়ে আর অনুরোধ করবেন না।

অগত্যা তিনি নিজেই একটি পানীয় প্রস্তুত করে পান করতে থাকলেন। তাঁর চোখে-মুখে একটি অনির্বচনীয় উল্লাস পরিলক্ষিত হচ্ছিল।

বোম্বাইয়ের কর্মসূচি আমাদের সমাপ্ত হল। সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা কলকাতার প্লেনে চেপে বসলাম। আমাদের এই সফরসূচিকে নিয়ে ভারতের কেন্দ্রীয় ফিল্ম ডিভিশন Spokesman from freedom নাম দিয়ে একটি ডকুমেন্টারি ফিল্ম তৈরি করেছিল। ভারতের সমস্ত প্রেক্ষাগৃহসমূহে মূল ছবি শুরুর প্রারম্ভে সেটি সে সময় প্রদর্শিত হত। পর্দায়

নিজেকে বক্তৃতারত বা অন্যভাবে অবলোকন করে সিনেমার অভিনেতার অনুভূতি পেতাম।

কলকাতা ফিরে সহকর্মীদের কাছে আমাদের মর্যাদা বেড়ে গেল। সকলেই এক নতুন দৃষ্টিতে আমাদের দেখতে লাগল। মন্ত্রীরা আমাকে ডেকে অনেক অভিনন্দন জানালেন। তাঁরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট। এতটা সফলতা যে অর্জন করতে পারব তারা অনুধাবন করতে পারেননি। তাঁরাই বললেন, অনেক চিঠি এবং টেলিগ্রাম পেয়েছি বিভিন্ন জায়গা থেকে। প্রায় সব জায়গা থেকেই তোমাকে চেয়েছে—এমনকি সমস্ত খরচ বহনের প্রস্তাব করেছে। ভালোই। ভারতে তুমি বাংলাদেশের চলমান রাষ্ট্রদূত।

রতু সরকার লেনে দেশ থেকে কোনই খবর নেই। সালেহার বোন সুলতানা স্বামীর কর্মস্থল লন্ডনে বসবাস করে। তাকে চিঠি লিখি রানাদের সংবাদের জন্য। সে দেশ থেকে খবরাদি সংগ্রহ করে আমাকে প্রদান করে। এক-একটা খবর পেতে দেড়-দু'মাস লেগে যায়। এর মধ্যে আসাম ঘুরে মফি দা কলকাতায় এসে উপস্থিত। তার কাছে দুঃসংবাদ পেলাম। আমার দিল্লী পার্লামেন্টের বক্তৃতা আকাশবাণী এবং বাংলাদেশের বেতার থেকে প্রচারিত হওয়ার পর পাকিস্তানি সৈন্যরা পুনরায় আমার গ্রামের বাড়িতে যায় এবং বাড়িটিকে সম্পূর্ণ ভস্মীভূত করে দিয়ে আসে।

বাড়ি আমার তৈরি করা নয়। পৈতৃক ভিটা আমার কারণে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। মন খারাপ হলেও অন্য সকলের দুঃখ-বেদনার সাথে তুলনা করে সান্ত্বনা পেতে চেষ্টা করলাম। বাড়ির সবাই কোথায় আছে! সালেহা-রানা কোথায় কেমন আছে মফি দা বলতে পারলেন না। মুন্সীগঞ্জ জেলার নেতৃবৃন্দের মধ্যে আমার বাড়িটাই ছিল সবচাইতে গরিবী পর্যায়ের। কফিলউদ্দীন চৌধুরী বিরাট বড়লোক। বিশাল তার বাড়ি। করিম বেপারি, জামাল চৌধুরী, শামসুল হুদা প্রমুখ জন-প্রতিনিধিদের কারো বাড়িই সেদিন পোড়া যায়নি, এই হতভাগ্যের বাড়িটি ছাড়া। নব্য আওয়ামী লীগাররা তা জানে না।

এই দুঃখের মধ্যে একটি সুখকর ঘটনা ঘটল—যার গুরুত্ব অপরিসীম এবং সে ঘটনা আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধকে এক ধাপ এগিয়ে দিল। পাকিস্তানের কলকাতা দূতাবাস একজন ডেপুটি হাই-কমিশনারের কর্তৃত্বে পরিচালিত হত। হোসেন আলী ছিলেন তখন ডেপুটি-হাই কমিশনার। একদিন প্রত্যুষে শুভলগ্নে

জনাব হোসেন আলী হাই কমিশনের সমস্ত কর্মচারী-কর্মকর্তাসহ বাংলাদেশের পক্ষে চলে এলেন। হাই কমিশনের সার্কাস এভিনিউর বিশাল অফিসগৃহে বাংলাদেশের পতাকা উড্ডীন করে দেওয়া হল।

হোসেন আলী সাহেবের এই কাজ কেবল খাঁটি দেশপ্রেম সমৃদ্ধই নয়। তিনি প্রমাণ করলেন, অফিসার হয়েও বিরাট ঝুঁকি নিয়ে দেশমাতৃকার সপক্ষে দাঁড়ান যায়। পৃথিবী জুড়ে এর প্রতিক্রিয়া বাংলাদেশের পক্ষে এল। সারা কলকাতায় আনন্দের বন্যা বয়ে গেল। বাংলাদেশের এবং পশ্চিম বঙ্গের জনগণের কাছে সার্কাস এভিনিউর ওই বাড়িটি একটি তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হল। হোসেন আলী সাহেবকে এবং তাঁর সমস্ত সহকর্মীদেরকে সকলে মিলে প্রায় দেবতার আসনে বসিয়ে দিল। দিনভর এবং গভীর রাত পর্যন্ত বিভিন্ন শিল্পীগোষ্ঠী বাড়িটির গেটের সম্মুখে বন্দনা সঙ্গীত, দেশাত্মবোধক গান, কবিতা, নাটিকা পরিবেশন করতে থাকল। এত মিষ্টি আর ফল এল হোসেন আলী সাহেবদের জন্য যে, তা জনগণের মধ্যে বিতরণ করতে হত। কলকাতার অধিকাংশ অনুষ্ঠানে এখন প্রধান অতিথি জনাব হোসেন আলী। আমরা হোসেন আলী সাহেব এবং তার সহকর্মীদের অভিনন্দন জানাতে গেলে তিনি উল্টো আমাকে অভিনন্দন জানালেন। বললেন, দিল্লী পার্লামেন্টে আপনি যা করেছেন তার জন্য আমরা সবাই গর্বিত।

সেদিন থেকে তাঁর সঙ্গে আমার অন্তরের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। কলকাতায় থাকলে প্রায়ই তাঁর অফিসে যেতাম। বাংলাদেশের পক্ষে যোগদানের পর সে অফিস প্রায় পররাষ্ট্র দফতরে পরিণত হল।

পাকিস্তান সরকার একটি বিরাট চপেটাঘাত খেল। কিন্তু যেহেতু পাকিস্তানের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক বিদ্যমান সেহেতু তারা একজন নতুন ডেপুটি হাইকমিশনার নিয়োগ করে কলকাতায় পাঠাল। সরকারের তরফ থেকে তাকে গ্রহণ করে কলকাতার গ্রান্ড হোটেলে ঘর দেওয়া হল। কিন্তু পাকিস্তানের প্রতি ঘৃণা এবং বাংলাদেশের প্রতি টান এতই প্রবল যে, গ্রান্ড হোটেলের সকল কর্মচারী, মায় বয়-বেয়ারা পর্যন্ত নতুন পাকিস্তানি ডেপুটি-হাই কমিশনারকে কোন হোটেল সেবা দিতে অস্বীকৃতি জানাল। সকলেই তার সঙ্গে অসহযোগিতা করল। হোটেলে খাবার পায় না। বাইরে খেতে গেলেও পরিচয় পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্রান্ড হোটেলের স্টাফদের মতো সর্বত্রই পূর্ণ অসহযোগিতা। দিন দু'য়েক এ অবস্থায় কাটিয়ে সে কলকাতা ত্যাগ করে পাকিস্তানে চলে যেতে বাধ্য হল। পাকিস্তানিদের গালে দ্বিতীয় চপেটাঘাতটি পড়ল।

থিয়েটার রোডে পুনরায় ডাক পড়ল। আবার বেরিয়ে পড়, তোমাকে যে সবাই চায়। এবার একাই যাও, কারণ চাহিদা কেবল একজনের।

আমি বেঁকে বসলাম। একা মানে বোকা। অন্তত একজন সঙ্গী না হলে শোভনীয়ও হয় না। নেতৃবৃন্দ সম্মত হলেন এবং আমার সঙ্গী হিসাবে তাঁরা

মনোনীত করলেন আমার অত্যন্ত প্রিয়ভাজন, কেবল আমার কেন, সকলের প্রিয়ভাজন, পাবনা জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সোনার মানুষ আবদুর রব সাহেবকে। তিনি বগা হিসাবেই সমধিক পরিচিত। একজন সত্যিকারের ভালো মানুষ নির্বিরোধী বগা ভাইকে অজাতশত্রু বলা হত। দেশ এবং দলের জন্য চির উৎসর্গীকৃত বগা ভাইয়ের মতো একজন সরল প্রাণের, সৎ মানুষ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। তিনি আমার বড় ভাইয়ের মতো হয়েও আমাকে নেতা মানতেন। বক্তৃতার বিশেষ ধার ধারতেন না। মনোনীত হয়ে সন্তুষ্টচিত্তে বললেন, মোয়াজ্জেম সঙ্গে থাকলে আর আমার কথা বলার প্রয়োজন হবে না—এই সুযোগে আজমীর শরীফ ঘুরে আসতে পারব।

মনসুর ভাই ছিলেন বগা ভাইয়ের অভিভাবক। আমাকে ডেকে বললেন, বগাকে তো চেন, তুমি সব সামলে চলো।

বললাম, আপনি কোন চিন্তা করবেন না, বগা ভাইয়ের মতো মানুষ সঙ্গে থাকলে সব কিছুই সুন্দরভাবে সমাধা হয়।

পুনরায় দিল্লী। সেখানে কয়েকটি প্রোগ্রাম করে চলে গেলাম আজমীর শরীফ। সেখানে প্রথম কাজ সুলতানুল হিন্দ গরীবে নেওয়াজ খাজা মঈনউদ্দীন চিশতি (রহঃ)-এর মাযার জিয়ারত করা এবং আজমীর সরকারি কলেজে ছাত্রদের উদ্দেশে বক্তৃতা করা। আজমীরের ছাত্রদের মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা তুচ্ছ করার মতো নয়—এরা নাকি বিভিন্ন স্থান থেকে মাযার জিয়ারত করতে আসা ধর্মপ্রাণ মানুষদের বাংলাদেশের সংগ্রামের বিপক্ষে এবং পাকিস্তানের পক্ষে ওকালতি করে। রাজস্থান সরকার তাই চাচ্ছে, আমরা যেন আমাদের বক্তব্য তাদের নিকট তুলে ধরি—তাতে হয়ত কাজ হতে পারে।

আজমীরে পাহাড়ের উপর একটি সুন্দর সার্কিট হাউস রয়েছে— সেখানেই আমাদের রাখা হল। আমাদের প্রথম কাজ—খাজা সাহেবের পবিত্র মাযার জিয়ারত করলাম। সুলতানুল হিন্দের দরবারে দাঁড়িয়ে পরম করুণাময়ের নিকট বাংলাদেশের স্বাধীনতা ভিক্ষা চাইলাম। আমার পরিবারের জন্যও দোয়া চাইলাম। দোয়া করলাম সব সহকর্মী এবং নেতৃবৃন্দের জন্য। আমাদের জিয়ারত উপলক্ষে মাযার প্রাঙ্গণে অনেক পুলিশ মোতায়েন করায় খাদেমগণের কেউ কেউ অসন্তুষ্ট হচ্ছিল।

কর্তব্যরত অফিসারকে পুলিশ উঠিয়ে নিতে অনুরোধ করায় সে জানাল, আপনাদের নিরাপত্তার জন্যই সরকার এ ব্যবস্থা করেছে।

বললাম, এই মাযার প্রাঙ্গণে আমাদের নিরাপত্তা বিধান করবেন যাঁর মাযার তিনি স্বয়ং। এখানে আপনাদের ব্যবস্থার আবশ্যকতা নেই। খাজার ভক্ত সবাই—কি হিন্দু, কি মুসলমান।

ওরা কথা না বাড়িয়ে পোশাক পরিহিত পুলিশ দলকে মাযারের প্রাঙ্গণের বাইরে অপেক্ষা করতে নির্দেশ দিল। আমরা সকলের সঙ্গে মিলে আমাদের

মনের সব আকুতি ঢেলে দিলাম আল্লাহ্ তা'আলার মকবুল বান্দা এই উপমহাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ ওলি হযরত খাজা মঈনউদ্দীন চিশতি (রহঃ)-এর পবিত্র মাযারে দাঁড়িয়ে।

খাজা বাবার দরবার থেকে আল্লাহ্ কাউকে শূন্য হাতে বিদায় করেন না— আমরাও শূন্য হাতে ফিরে যাব না। ইনশাআল্লাহ্ বাংলার মানুষ তাদের কষ্টলব্ধ স্বাধীনতা অর্জন করবেই। খুব বেশি দূরে নয় সেই দিন।

তাকিয়ে দেখি বগা ভাইয়ের দু'গণ্ডদেশ বেয়ে অঝোরে পানি গড়িয়ে পড়ছে। স্বল্পবাক বগা ভাই কেঁদে কেঁদে অনেক দোয়াই করলেন, তখন আর তাকে স্বল্পভাষী মনে হল না।

বগা ভাই আজ নেই। দেশ স্বাধীন হওয়ার স্বল্প পরেই এই মহৎপ্রাণ মানুষটিকে দুনিয়ার দেনা-পাওনা সাঙ্গ করে চিরদিনের তরে চলে যেতে হয়।

সন্ধ্যায় আমাদের আজমীর গভর্নমেন্ট কলেজে নিয়ে যাওয়া হল। জেলার শাসনকর্তা এবং পুলিশের বড় বড় কর্তাব্যক্তিদের উপস্থিতি প্রমাণ করে, এ অনুষ্ঠান নিয়ে তারা চিন্তিত। স্বাগত ভাষণের পর আমাদের পালা এলে বগা ভাইকে অনেক বুঝিয়ে দু'-কথা বলার জন্য দাঁড় করালাম। তিনি সুন্দর করে নিবেদন করলেন, আমার কিছু বলার নেই। যেখানে আমার ভাই, আমার নেতা উপস্থিত সেখানে আমার বলা নিষ্প্রয়োজন। তিনি আমাদের উভয়ের পক্ষেই কথা বলবেন।

একজন অভিজ্ঞ বক্তা উপস্থিত শ্রোতা-দর্শকমণ্ডলীর সামান্য প্রতিক্রিয়া থেকেই বুঝতে পারে তার বক্তব্য তারা গ্রহণ করবে কিনা। অমনোযোগী-অসহযোগী শ্রোতাদের নিকট অধিকাংশ বক্তৃতাই অরণ্যে রোদনের শামিল হয়। বুঝলাম শ্রোতারা স্পষ্টত দু'ভাগে বিভক্ত। একদল গভীর আগ্রহ নিয়ে কথা শুনতে চায়। অন্যরা সভা ব্যর্থ হলেই তৃপ্তি পাবে। কিছু বিরূপ মন্তব্য, বিড়ালের ডাক এবং কিছু হাততালির মধ্যে কথা বলতে দাঁড়ালাম। আমি জানি, যদি প্রথম থেকে আমি ওদেরকে স্তব্ধ করতে সক্ষম না হই তা হলে একসময় আমাকেই ওরা নিস্তব্ধ করে দেবে।

স্বর যতটা সম্ভব উচ্চগ্রামে রেখে নিবেদন করলাম, একটু আগে আমি খাজা বাবার পবিত্র মাযার জিয়ারত করে একটি সুন্দর মন নিয়ে আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছি। চিরদিন শুনে এসেছি খাজার দরবার থেকে আল্লাহ্ কাউকে শূন্য হাতে বিদায় করেন না—আমার অনুভূতিও বলছে, আমরাও শূন্য হাতে ফিরব না। আমাদের অন্তর মথিত আকুতি, বাংলা মায়ের মুক্তি শীঘ্রই আসন্ন। স্বাধীনতার জন্য লক্ষ লক্ষ মানুষের আত্মদান, মা-বোনের সম্ভ্রমহানীর আহাজারি, হানাদার পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনীর নারকীয় বর্বরতা আল্লাহ্র আরশ কাঁপিয়ে দিয়েছে। প্রতিকার আসন্ন। খাজার পবিত্র মাযার থেকে বের হয়ে আমার এ আশাবাদ আরও দৃঢ় হয়েছে।

খাজা বাবার নাম নিয়ে আরম্ভ হয়েছে বক্তব্য—ওদের ভালো না লাগলেও চুপ করে থাকা ছাড়া গত্যন্তর নেই। এ প্রশ্নে সকলেই একমত। ওদের মানসিকতার উপর প্রাথমিক চাপ সৃষ্টি করতে সক্ষম হলাম।

বললাম, আমার সম্পূর্ণ বক্তব্য আপনারা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করুন, প্রয়োজনে নোট করুন এবং বক্তব্য শেষ হলে আমাকে যে কোন প্রশ্ন করুন, আমি জবাব দিতে প্রস্তুত থাকব। কেবল একটাই শর্ত, আমার পূর্ণ বক্তব্য আপনারা মনোযোগ দিয়ে শুনবেন।

চারদিক থেকে আওয়াজ উঠল, অতি উত্তম প্রস্তাব।

যাদের গোলমাল করার ইচ্ছা ছিল তারাও চুপ করে থাকতে বাধ্য হল। মনের ঝাল মিটিয়ে পাকিস্তানের দু'যুগের অপশাসন, সীমাহীন বৈষম্য আর শোষণ ও নির্যাতনের তথ্যভিত্তিক বক্তব্য উপস্থাপিত করলাম। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে, শিল্প-কলকারখানা স্থাপনের ক্ষেত্রে, শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে, সরকারি চাকরি, সৈন্যবাহিনীতে চাকরির ক্ষেত্রে এবং সর্বোপরি সার্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে পাকিস্তানের দু'অংশের মধ্যে যে পর্বতপ্রমাণ বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে, তার পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব পেশ করলাম। বাংলাদেশের মানুষ শতকরা ছাপ্পান্ন ভাগ হয়েও পশ্চিমের চুয়াল্লিশ ভাগ মানুষের জন্য প্যারিটি অর্থাৎ সমান ভাগের হিসাব মেনে নিয়েছিল পাকিস্তান এক রাখারই স্বার্থে। সেই প্যারিটি নির্লজ্জভাবে লঙ্ঘিত হল পশ্চিমাদের দ্বারা—পূর্বাংশে কোন কোন ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় রাজস্ব ব্যয়ের এক-দশমাংশ ভাগ্যে জুটেছে। প্রতিটি প্রতিবাদ এবং দাবি না মিটিয়ে ওরা অত্যাচার-নির্যাতন, জেল-জুলুমের পথ বেছে নিয়েছে। ক্লাস নাইনের ছাত্রাবস্থায় আমার গ্রেপ্তারের কাহিনী ও পরবর্তীতে বারংবার তা পুনরাবৃত্তি এবং ভাষা আন্দোলনের রক্তঝরা ইতিহাসও তুলে ধরলাম। আবেগ-আপ্লুত কণ্ঠে জানতে চাইলাম এমনি পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে আমার সম্মুখে আসন গ্রহণ করা শ্রোতৃমণ্ডলী, আপনারা কী করতেন? নিজেদের অধিকার আদায়ের সংগ্রাম থেকে বিরত থেকে জাতি হিসাবে কী নিজেদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চাইতেন? লক্ষ মানুষের রক্তধারায় অবগাহন করে কী স্বাধীনতার জয়গান গাইতেন না?

মনে হল, উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর প্রতিক্রিয়া ইতিবাচক। একাংশ অত্যন্ত সন্তুষ্ট। তারা বারংবার সাধুবাদ দিলেন। অডিটরিয়াম কিছুটা শান্ত হয়ে এলে মাঝখান থেকে একটি আওয়াজ উঠল, 'লেকিন আপ লোগ পাকিস্তান কো দু'টুকরা কর দিয়া।'

প্রতিউত্তরে বললাম, Pakistan is long dead, we want to give her a decent burial.

পাকিস্তানকে ওরা বহু পূর্বেই শেষ করে দিয়েছে—আমরা তাকে সুন্দরভাবে সমাহিত করতে চাই।

আরও বললাম এবং কিছুটা ব্যঙ্গোক্তির স্বরেই বললাম, পাকিস্তান ছিল

আমাদের দেশ। তাকে ভাঙি বা গড়ি—সেটাও আমাদেরই বিষয়বস্তু হওয়া উচিত নয় কী? এক দেশের নাগরিক হয়ে ভিন্ন দেশের জন্য মায়াকান্না শোভন নয়। মা'র থেকে যার দরদ বেশি হয়, তাকে ডাইনী বলা যায়। ঘর করবেন একজনের, গান গাইবেন অন্যের—এটা সুচরিত্রের লক্ষণ নয়।

প্রশ্ন আহ্বান করলাম, কেউ দাঁড়াল না। তাদের মনস্তত্ত্বের উপর প্রচণ্ড আঘাত হানা হয়েছে। সভা শেষে তারা নীরবে হল ত্যাগ করলেন। আমাদের অনেক আনন্দ-উচ্ছ্বাসের মধ্যে সার্কিট হাউসে নিয়ে যাওয়া হল।

মহান ওলির দরবারে সেবারের মতো শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করে বিদায়ী জিয়ারত সেরে আমরা রাজস্থানের রাজধানী জয়পুর শহরে এসে উপস্থিত হলাম।

জয়পুর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত শহর। রাজা মান সিংহ থেকে শুরু করে অনেক রাজ-রাজাদের প্রাসাদ আর সুরক্ষিত দুর্গসমূহের অবস্থান সেখানে। দর্শনীয় বস্তুরও অভাব নেই। পীত-রঙ দ্বারা রঞ্জিত শহরের একটি অংশকে 'পিঙ্ক সিটি' বলা হয়। মান সিংহের বাসভবন, হাওয়া মহল, জল মহল, তন্তর-মন্তর প্রভৃতি জয়পুরের আকর্ষণ বৃদ্ধি করেছে।

আমাদের রাজা করণ সিংহের প্রাসাদে রাখা হল। সেখানে শুধুই অবস্থান এবং প্রাতরাশ। আর সবকিছুই কর্মসূচির আওতায়। আমাদেরকে স্থানীয় সহায়ক সমিতির এক প্রতিনিধি সম্মেলনে অতিথি করে নিয়ে যাওয়া হল। সম্মেলনে আমরা বক্তব্য রাখলাম। সম্মেলন স্থলেই সকলের জন্য দ্বিপ্রাহরিক ভোজের ব্যবস্থা ছিল। আমরা সেই ভোজে অংশ নিয়ে বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়লাম। হলঘরের বাঁধান মেঝেতেই কলাপাতা বিছিয়ে খাদ্য পরিবেশন করা হল। সবই ঠিক চলছিল, কিন্তু যখন গ্রাস তুলতে যাচ্ছি, তখন নখের আঘাত লেগে কলাপাতা বিদীর্ণ হয়ে ডাল-ঝোল সব মেঝেতে গড়াতে লাগল। বগা ভাই ভালোই ম্যানেজ করছেন। আমি যতবারই চেষ্টা করি, কলাপাতা ততবারই ছিঁড়ে যায়। আমার করুণ অবস্থা প্রত্যক্ষ করে সম্মেলনের অন্যতম কর্মী মিসেস যোশী আমাকে একটি চীনে মাটির প্লেটে খাবার পরিবেশন করলেন।

রাতে আমাদের একটি স্থানীয় হোটেলে নৈশভোজে আপ্যায়িত করা হল। রিজার্ভ করা হোটেলে পার্টি চলল গভীর রাত পর্যন্ত। চিমটায় ধরে যে রুমালী রুটি পরিবেশন করা হল—তা নাকি জয়পুরের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত।

রুটিটি সম্পূর্ণ খুলে ধরলে একটা টেবিল কভারের সমতুল্য হবে। রাতে প্রাসাদে নিদ্রা যাই। দিনভর ঘুরে ঘুরে বক্তৃতা দিই এবং বিভিন্ন স্থানে নিমন্ত্রণ রক্ষা করি।

যেহেতু আমাদেরকে একজন হিন্দু রাজার প্রাসাদে রাখা হয়েছে, স্থানীয় নওয়াব বাহাদুরের হাবেলীতে আমাদের নৈশভোজে যোগ দিতে হল। নওয়াব বাদশাদের খানা-পিনার গল্প শুনেছি। কখনও চেখে দেখিনি। এবার চেখে দেখার সুযোগ এল। 'চর্ব চোষ্য লেহ্য পেয়' বলতে কি বুঝায় হৃদয়ঙ্গম হল। এক ধরনের বিরিয়ানী পরিবেশন করা হল যার লম্বা লম্বা চালগুলো অর্ধেক সাদা, অর্ধেক রঞ্জিত। এ ধরনের খানা কোনদিন খাইনি। কিভাবে যে এগুলো প্রস্তুত করেছে বোধগম্য হল না। প্রতিটি খাদ্য এবং পানীয় এত সুস্বাদু যে নওয়াব সাহেবকে না বলে পারলাম না, এ খানার পর আর কিছু রুচবে না।

তিনি খুশি হলেন এবং আমাদের তত্ত্বাবধায়কদের বললেন, ইনারা যে ক'দিন জয়পুরে আছেন, যদি অনুগ্রহ করে আমার হাবেলীতে অবস্থান করেন এবং এখানেই খানা-পিনা করেন তা হলে অতীব আনন্দিত হব।

লজ্জা পেলাম। তিনি কি ভাবলেন, সুস্বাদু খাবারের লোভ আমাদের গ্রাস করেছে! কিন্তু কর্তাব্যক্তিরা বললেন, হুজুর, সেটা সম্ভব নয়। যেখানে আছেন, সেখান থেকে চলে এলে তাঁদের অসম্মান করা হবে। তাছাড়া সব বেলার খাবার প্রোগ্রাম করা আছে।

তিনি বুঝলেন।

নৈশভোজের পর রামলীলা ময়দানে জনসভা। সব কাজ সেরে রাতের মনোরম পরিবেশে সভা জমে ভালো। রামলীলা ময়দানে উপস্থিত হয়ে দেখি এলাহী কাণ্ড। বিশাল মাঠ জুড়ে মানুষ আর মানুষ। তারা বলল, বড় বড় অনুষ্ঠান এই মাঠেই হয়ে থাকে। কিন্তু এত জনসমাগম কোনদিন হয়নি।

জনসমুদ্রে দৃষ্টিপাত করেই বুঝলাম ইংরেজি বক্তৃতা শতকরা দশ জনের বেশি হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হবে না। হিন্দিতে দোভাষীর ব্যবস্থা আছে। কিন্তু দোভাষীর মাধ্যমে যে কথা বলা যায় তা মরমে সহজে পৌঁছে না।

মিসেস যোশী এবং অন্যান্য কর্মকর্তারা আমাকে পুন পুন অনুরোধ করতে লাগলেন আমি যেন হিন্দিতে বক্তৃতা করি। বলে কী! হিন্দিতে করব বক্তৃতা! কিন্তু এরা নাছোড়বান্দা। বারবার বলছেন, আপনি তো হিন্দি বলছেন, তবে বক্তৃতা করতে অসুবিধা কি? আমরা পাশে দাঁড়িয়ে থেকে সাহায্য করব।

বললাম, এভাবে উর্দু-হিন্দি মিলিয়ে ভুল-ভাল কথোপকথনকে বলছেন হিন্দি বলতে পারি! অসম্ভব, আমাকে দিয়ে হিন্দি বক্তৃতা হবে না!

অনেক ধস্তাধস্তির পর তারা আশা ত্যাগ করলেন। আমি ইংরেজিতেই বলার মনস্থির করলাম। সময় হলে যথারীতি দোভাষীও অন্য একটি মাইকের সম্মুখে দাঁড়ালেন। বক্তৃতা শুরু করতে যাচ্ছি। মায়ের বয়েসী মিসেস যোশী

আমার দুটি হাত চেপে ধরে বললেন, একটু চেষ্টা করে দেখুন, দেখুন না! কত হাজার হাজার মানুষ আপনার কথা শোনার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে— ইংরেজি তারা কিছুই বুঝবে না এবং দোভাষীর বক্তৃতা কোনদিন হৃদয় স্পর্শ করে না। প্লিজ!

তাঁর হাত থেকে নিষ্কৃতি নিয়ে মাইকে দাঁড়ালাম। এখনও সিদ্ধান্ত ইংরেজিতেই বলব। চারদিকে অজস্র নর-নারীর উৎসাহী মুখগুলো অবলোকন করে মুহূর্তে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে ফেললাম, যা থাকে ললাটে! এই মানুষদের ভাষা-ই একবার চেষ্টা করে দেখি!

ভাঙা ভাঙা হিন্দিতেই বলা শুরু করলাম, ভারতকী মেরে পেয়ারে ভাই আর বহেনো...।

সম্বোধন করতেই বিরাট মঞ্চের উপরে আসীন নেতৃবৃন্দ আনন্দে উল্লাস প্রকাশ করতে থাকলেন। কয়েকজন এসে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। সমস্ত মাঠ আনন্দে ফেটে পড়ল। তারা মাইকে জেনেছিল ইংরেজিতে বলব এবং দোভাষী তা তাদেরকে হিন্দিতে অনুবাদ করে দেবে।

ভাঙা হিন্দি। ততধিক ভাঙা উর্দু, কিছু বাংলা-ইংরেজি মিলিয়ে খিচুড়ি ভাষায় বলতে থাকলাম। মঞ্চের কয়েকজন পাশে দাঁড়িয়ে প্রয়োজনীয় শব্দের যোগান দিয়ে যেতে লাগলেন। হিন্দিতেই বললাম, আপনারা আমার মুখের ভুল ভাষা ক্ষমা করবেন। আমার ভাষাকে না দেখে আপনারা আমার অন্তরটি দেখুন। দেখবেন সেই অন্তর ক্ষত-বিক্ষত—সেখান থেকে টগবগ করে রক্ত ঝরছে। সে রক্তের বর্ণ লাল। কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি ভারতীয়, কি বাংলাদেশী—পৃথিবীর সব মানুষের রক্তের বর্ণই লাল। আমি আমার ভারতীয় ভাই-বোনদের সে রক্তক্ষরণ দেখাতে এসেছি। জয়পুরের মানুষেরা স্বাধীনতার জন্য একদিন মরণপণ লড়াই করেছিল—তারা সম্যক উপলব্ধি করতে পারবে রক্তক্ষয়ী লড়াই কাকে বলে—যা আজ আমার জন্মভূমি বাংলাদেশে আপনাদের মতোই নিরীহ-নিরস্ত্র কোটি কোটি মানুষ প্রাণ দিয়ে, সম্ভ্রম দিয়ে, আর ঘরবাড়ি, সহায়-সম্পত্তি সব কিছুর বিনিময়ে প্রাণপণ লড়ে যাচ্ছে। সেই লড়াইয়ের কাহিনী শোনাতে এসেছি আপনাদের দরবারে। কেননা, আপনারা আমাদেরকে দিয়েছেন বাঁচার মন্ত্র, স্বাধীনতার মন্ত্র, মানবতার মন্ত্র।

তারপর অনেক কিছুই বলছিলাম। এরা আমাকে সর্বক্ষণ সাহায্য করেছেন শব্দচয়নে। প্রায় এক ঘণ্টা বক্তৃতার পর যখন উপসংহার টানলাম তখন সমস্ত মাঠের মানুষ এবং মঞ্চের নেতৃবৃন্দ উঠে দাঁড়িয়েছেন। সকলেই উৎফুল্লচিত্তে হাততালি দিচ্ছেন। নেতৃবৃন্দ আমাকে জড়িয়ে ধরে প্রায় নৃত্য করতে থাকলেন। সবচাইতে খুশি বগা ভাই। তিনি বললেন, আপনি তো নতুন রেকর্ড করে ফেললেন! হিন্দিতে এক ঘণ্টা বক্তৃতা! সোজা কথা!

বললাম, এটাকে হিন্দি বলে? সবাই শোনার এত আগ্রহে ছিল যে, ভাষার কথা ভুলেই গেছে। মন ছুঁয়েছে মনকে, অন্তর মিশেছে অন্তরে। ভাষা এখানে গৌণ।

কলকাতার সুলতা প্রসঙ্গে যে ঘটনার কথা ইতিপূর্বে ইঙ্গিত করেছিলাম সেটি ঘটল জয়পুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। সুন্দর একটি সমাবেশের আয়োজন হয়েছে এদের অডিটরিয়ামে। শ্রোতারা ছিলেন শিক্ষিত এবং সমবেদনায় আপ্লুত। আমাদের বক্তব্য তাঁরা লুফে নিচ্ছিলেন নিজেদের হৃদয়ের মহত্ত্ব দিয়ে। আমার আবেগ সেদিন বাঁধ মানছিল না। বলতে বলতে একসময় দু'চোখ বেয়ে পানি নেমে এল। কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসছিল বারবার। সুধীবৃন্দের অনেকের চোখে পানি—এটা খানিকটা সংক্রামক। আমার কান্নাভরা কণ্ঠের ভাষা তাদেরকেও বিচলিত করেছিল। বলছিলাম, আমার নিজের কোন বাসস্থান ছিল না। ছিল একটি পৈতৃক ভিটা। সেটিকেও পাকিস্তানিরা ভস্মীভূত করে দিয়েছে। কোথায় রয়েছে আমার স্বজনেরা জানি না। মাত্র দু'বছর হল বিয়ে করেছি। আমার একটি শিশুপুত্র রয়েছে। জানি না তারা কেমন আছে। কোথায় আছে! আদৌ বেঁচে আছে কিনা!

বলতে বলতে আমি সেদিন কেন যেন সশব্দ কান্নায় ভেঙে পড়েছিলাম। আমার চোখের পানি সকলকেই আন্তরিক দুঃখিত করে তুলেছিল। আমি আরও বলেছিলাম, বিশ্ববিধাতার নিকট আমার একটিই সকরুণ প্রার্থনা— আমার স্ত্রী আর আমার আঁধার জীবনের আলোকবর্তিকা আমার সন্তান যেন হানাদার বাহিনীর হাতে ধরা না পড়ে। সে দৃশ্য আমি কল্পনা করলেও শিউরে উঠি। নর-পিশাচদের হাতে ধরা পড়ার আগেই যেন বিধাতা তাদেরকে পৃথিবী থেকে তুলে নেন। সারাটা বিশ্বের বিনিময়ে যে শিশুকে আমার বক্ষ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া সম্ভব নয়—তার সম্বন্ধে একথা উচ্চারণ করতে আজ দ্বিধা হচ্ছে না। বর্বর পাক-সৈন্যদের হাতে পড়ার ভয়াবহ পরিণামের চেয়ে এই শ্রেয়। পিতা হয়ে, স্বামী হয়ে ওদের জন্য এই আমার প্রার্থনা। পরিবারের সদস্যদের মাথা গুঁজবার ঠাঁই রক্ষায় অক্ষম, স্ত্রী-পুত্রের সম্ভ্রম আর নিরাপত্তা রক্ষায় অপারগ আমি দেশের স্বাধীনতার প্রয়োজনে তাদের ফেলে চলে এসেছি। নিজেকে ক্ষমার অযোগ্য মনে হয়।

অনেকেই নীরবে অশ্রু বিসর্জন করছিলেন। একটি মেয়েকে দেখলাম শব্দ

করে কাঁদতে। সভা শেষ হল ভারাক্রান্ত পরিবেশের মধ্যে। একটি কক্ষে আমাদের নিয়ে বসানো হয়েছে। সেই রোরুদ্যমান মেয়েটি এসে নিঃসঙ্কোচে আমাকে বলল, আপনার সঙ্গে কিছু কথা বলতে চাই একান্তে!

বগা ভাই বারান্দায় চলে গেলেন ধূমপানের অজুহাতে। অন্যরাও উঠে গেলেন। কেবল একটি বর্ষিয়সী মহিলাকে মেয়েটি থেকে যেতে বলল। তিনি বিস্মিত হয়ে অপেক্ষায় রইলেন। আমিও খানিকটা হতবাক।

মেয়েটি ভালো করে চোখের পানি মুছে বলল, আমার নাম দেবযানী চ্যাটার্জী। বাড়ি কলকাতায় হলেও অনেকদিন এই জয়পুরেই বসবাস। এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে এবারই এখানে শিক্ষকতার কাজ পেয়েছি।

কিছুক্ষণ থেমে ও আবার বলল, মিসেস রামেশ্বরকে থাকতে বললাম, আমার বক্তব্যের একজন সাক্ষী থাকা ভালো। আপনার করুণ কাহিনী কিভাবে আমার হৃদয় স্পর্শ করেছে বুঝাতে পারব না। আমি ভগবানের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করছি, প্রতিদিন করব, তিনি যেন আপনার পরম ভালোবাসার জন আপনার স্ত্রী ও পুত্রকে নিরাপদে-সসম্ভ্রমে আপনাকে ফিরিয়ে দেন। আমার এই প্রার্থনায় বিন্দুমাত্র কৃত্রিমতা নেই, ভগবানের দিব্যি করে বলছি।

কিছুক্ষণ থেমে মেয়েটি আবার কথা বলতে লাগল। আমরা দু'জন অবাক হয়ে তার কথা শুনছি। সে আবার বলল, তারপরও ভগবানের যদি দয়া না হয়, তিনি যদি আপনার জীবনকে ঘোর অমানিশায় নিমজ্জিত করেন, সেদিন আমাকে একটু স্মরণ করবেন। আমি আপনার অন্ধকার জীবনে আবার প্রদীপ জ্বেলে দেব। আমাকে ভুল বুঝবেন না, প্লিজ!

কথা শেষ করে মেয়েটি মিসেস রামেশ্বরকে হাত ধরে টেনে উঠিয়ে নিয়ে দ্রুতবেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আমি বাকরুদ্ধ, কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

আমাদের আরও কয়েকটি স্থানে প্রোগ্রাম ছিল। আমি কিছুটা অসুস্থ হয়ে পড়ায় কো-অর্ডিনেটরদের সঙ্গে পরামর্শক্রমে সেসব স্থগিত করা গেল। মন চাইছিল কলকাতায় ছুটে যেতে। সেখানে কী আছে জানি না। কিন্তু কলকাতার জন্য এক সুতীব্র আকর্ষণ অনুভব করছিলাম।

রতু সরকার লেনের বাড়িতে সিঁড়ি বেয়ে দ্বিতলে উঠছি—একটি তীব্র চিৎকারে সচকিত হয়ে দেখি খোলা বারান্দায় রানাকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে

রয়েছে হাবিবা। সালেহার পরের বোন হাবিবা সালেহাদের সঙ্গেই সমস্ত বিপদকালীন সময়টা কাটিয়েছে। ও সর্বাগ্রে আমাক দেখতে পেয়ে চিৎকার করে উঠেছে, দুলাভাই এসেছেন বুবু, দুলাভাই এসেছেন!

ঘর থেকে সালেহাসহ সকলেই দৌড়ে বের হয়ে এল। আনন্দে মানুষ অস্থির হয়ে যায়—আমার অবস্থা তথৈবচ। হাতের ব্যাগ ওখানেই ফেলে লাফিয়ে সিঁড়ি ডিঙিয়ে দোতলায় উঠে ছোঁ মেরে রানাকে বুকে টেনে নিলাম। সকলেই আনন্দাশ্রু বর্ষণ করতে লাগল। রানা আমার বক্ষলগ্ন হয়ে বারবার 'আব্বা, আব্বা' ডাকতে থাকল। দীর্ঘ বিরহের অবসানে কাঙ্ক্ষিত প্রিয়মিলন হল। আমার তৃষ্ণার্ত বুক শীতল হল।

একথা আর একবার সত্য প্রমাণিত হল, খাজা বাবার দরবার থেকে শূন্য হাতে আল্লাহ্ তা'আলা কাউকে ফিরিয়ে দেন না। আমাকে দু'হাত ভরে দিলেন। জীবনে বারবার আমি তাঁর অসীম রহমত প্রত্যক্ষ করছি। শত আঁধারের মাঝেও তিনি আমার জীবনে বারবার মঙ্গলপ্রদীপ জ্বেলে দিয়েছেন। প্রথম প্রথম মনে হয়েছে পর্বত-সমান সঙ্কট কাটিয়ে ওঠা যাবে না। কিন্তু একসময় পরম করুণাময়ের আশীর্বাদ অজস্র ধারায় ঝরে পড়ে সকল প্রতিবন্ধকতা ধুয়ে-মুছে দিয়েছে।

দোদুল্যমান জীবনের হারানো দিকচিহ্ন খুঁজে পেলাম।

দেবযানীকে আশীর্বাদ করছি তার জীবন যেন আনন্দময় হয়ে ওঠে। সমৃদ্ধ হৃদয়ের অধিকারিণী মেয়েটির জীবনে যেন চিরন্তন মঙ্গল শিখা প্রজ্বলিত থাকে। তাকে আর স্মরণের প্রয়োজন না হলেও বিস্মরণ কোনদিন হবে না।

দীর্ঘ সময় নিয়ে অনেক চোখের পানিতে সালেহা তাদের কাহিনী বর্ণনা করল। নৌকা করে তারা আগরতলার উদ্দেশে যাত্রা শুরু করলেও পথিমধ্যে নিরাপত্তার অভাবে তাদের যাত্রাবিরতি ঘটে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার এক অখ্যাত গ্রামের এক গৃহস্থের বাড়িতে দু'সপ্তাহ কাটিয়ে, কত বিপদসঙ্কুল পথ পাড়ি দিয়ে মোস্তফা কামাল আর আমার ছোট মামা আল্হাজ্জ আবুল বাসার হাওলাদার সাহেবসহ তারা আগরতলা পৌঁছয়। বেতার ও পত্রপত্রিকার কারণে সারা ভারতেই ইতিমধ্যে আমার কিছুটা পরিচিতি হয়েছে। সেই সুবাদে আগরতলায় তারা বিশিষ্ট কন্ট্রাক্টর সেন্টু গাঙ্গুলীর বনমালীস্থ বাড়িতে সযত্ন আশ্রয় লাভ করে। মামা একা মোস্তফা কামালের সঙ্গে একটি শিশুসহ দুটি নারীকে এত দীর্ঘ বিপদসঙ্কুল পথে না পাঠিয়ে নিজেও সঙ্গ নিলেন এবং আগরতলায় নিরাপদ আশ্রয়ে রেখে দেশে প্রত্যাবর্তন করলেন। শেষ পর্যন্ত পরম করুণাময়ের অশেষ দয়ায় আবার আমরা একত্রিত হলাম। বলতে বলতে ও চোখের পানি সামলাতে পারছিল না। তার চোখে পানি, মুখে এক অনির্বচনীয় তৃপ্তি। বলল, জানো, নৌকায় দুধ ফুরিয়ে যেতে প্রায় দেড় দিন

রানা শুধু পানি খেয়ে কাটিয়েছে। কিন্তু অবুঝ শিশুর কণ্ঠ থেকে কোন কান্না বেরোয়নি। তা হলে বিপদের সমূহ সম্ভাবনা।

ঘুমন্ত ছেলেকে আর একবার চোখের পানিতে বুকে টেনে নিলাম, চুম্বনে চুম্বনে ওর সারা মুখ ভরিয়ে দিলাম। জেগে উঠে বুঝি সেদিনের কান্না ছেলে আজ কাঁদতে থাকল—আমরা সমস্বরে হেসে উঠলাম।

মোস্তফা কামাল এলে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলাম—জীবনে তার ঋণ শোধরাবার নয়। সে হাসিমুখে শুধু এটুকু বলল, রানাকে, ভাবীকে নিরাপদে এনে আপনার কাছে পৌঁছে দিতে পেরেছি, এটাই আমার সবচে বড় পুরস্কার। এবার আমাকে যুদ্ধে পাঠাবার ব্যবস্থা করুন।

বেশিদিন ওদের কলকাতায় রাখা গেল না। কেননা, ছোট বাসায় স্থান সঙ্কুলান হচ্ছিল না। সালেহার বাবা-মা, ভাই-বোন সকলেই কুষ্টিয়ার বাড়িঘর ত্যাগ করে জীবনের মায়ায় মেদিনীপুরে আমার শ্বশুরের আদি-নিবাসে এসে আশ্রয় নিয়েছে। পাকিস্তান হওয়ার পর কুষ্টিয়ার মীরপুরের এক হিন্দু জমিদারের সঙ্গে নিজের জমিদারি বিনিময় করেছিলেন আমার দাদা-শ্বশুর। আজ তাঁর সন্তানকে সপরিবারে জন্মভূমিতে আর একবার প্রত্যাবর্তন করতে হল বেঁচে থাকার তাগিদে। স্থির হল, কয়েকদিনের জন্য সালেহারা মেদিনীপুরে গিয়ে থাকবে। আমি কলকাতায় বাসা ভাড়ার ব্যবস্থা করেই ওদেরকে নিয়ে আসব। সালেহার জন্মও হয়েছিল এই মেদিনীপুরে। ওদেরকে রেখে এলাম ভিন দেশে অস্থায়ী শ্বশুরবাড়িতে।

মেদিনীপুর জেলা শহর হলেও, রাজনৈতিক কারণে পশ্চিম বঙ্গ অতীব গুরুত্বপূর্ণ। নকশাল আন্দোলনের পীঠস্থান মেদিনীপুর বাম রাজনীতির অন্যতম শক্তিশালী ঘাঁটি। অধিকাংশ জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক অবস্থা মন্দ। শহর অপরিচ্ছন্ন। তার মধ্যেই নিজেদের একসময়ের পরিচিত শহরেই একটি বাড়ি ভাড়া নিয়েছেন আমার শ্বশুর মীর রাহাত আলী সাহেব। বোঝার ওপর শাকের আঁটির মতো আমার ছোট পরিবারও স্থান পেল তাঁর বৃহৎ পরিবারে। তাঁরা তাঁদের প্রথম পৌত্র রানাকে পেয়ে দুঃখের মধ্যেও আনন্দে মেতে উঠলেন।

মোস্তফা কামালকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলাম। শহর প্রদক্ষিণে বের হয়ে প্রয়াত প্রিয় নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর পারিবারিক বাসস্থান দেখলাম—সেখানে এখন একটি মাদ্রাসার করুণ দশা। সবার জন্য কিছু মাছ-মাংস ক্রয়ের উদ্দেশে বাজারে গেলাম। গোটা দুই ইলিশ মাছ একসঙ্গে ক্রয় করায় বাজারের লোকজন আমাদের দিকে ভিন্ন চোখে তাকাল। সে দৃষ্টিতে প্রশ্রয় বা শ্রদ্ধার লেশও ছিল না।

বাংলাদেশের লোক আমরা, ভাতে-মাছে মানুষ। দেখলাম, জেলেরা ইলিশ মাছের পাশাপাশি মাছের আঁশও বিক্রয় করছে। জানা গেল, বেশি দাম দিয়ে যারা মাছ ক্রয়ে অক্ষম, তারা আঁশ কিনে নিয়ে শাক-সবজির সঙ্গে মিশিয়ে

ইলিশের গন্ধে তা খেয়ে থাকে। শুনে খুব কষ্ট হল। অজস্র ইলিশ—পদ্মার ইলিশের দেশের মানুষদের সেকথা শুনে কষ্ট হয় বৈকি!

অন্যত্র বলেছিলাম, ভারতের মুসলমানদের নিকট থেকে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম কোন সহানুভূতি লাভ করতে সক্ষম হয়নি। জয় বাংলার মানুষকে তারা হেয় দৃষ্টিতে দেখত এবং সুযোগ পেলেই আমাদের যুদ্ধ নিয়ে নেতৃবৃন্দ সম্বন্ধে বা আমাদেরকে নিয়ে কটু কথা বলতে দ্বিধা করত না।

আমার শ্বশুরের বেশ কয়েক ঘর আত্মীয় থাকতেন মেদিনীপুর শহরে। এক আত্মীয় তাঁর বাসায় চায়ের নিমন্ত্রণ করলেন। সেখানেই একটি ঘটনা ঘটে গেল। বাংলাদেশের এক এমপি এবং সে তাদের সম্পর্কে জামাই শুনে কয়েকজন স্থানীয় মুসলমান ব্যক্তি দেখা করতে এলেন। সবই ঠিক চলছিল। হঠাৎ একজন মুরুব্বী বলে বসলেন, শুনি এত লোক মেরেছে পাকিস্তানিরা, তাদের একটা গুলি জুটল না শেখ মুজিবুরের জন্য!

আমার শ্বশুর এবং সালেহা বিচলিত হয়ে পড়ল—তারা আমার মানসিকতা জানে। গৃহকর্তাও শংকিত হয়ে উঠলেন।

আমি চায়ের টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। ক্ষিপ্তকণ্ঠে বললাম, আজ আমরা অসহায়, পরদেশে আশ্রিত, তা না হলে যে মুখ দিয়ে আমার নেতার সম্বন্ধে ওকথা বলেছে, সেই মুখের জিভ টেনে ছিঁড়ে ফেলতাম।

আমাকে অতি কষ্টে সংবরণ করিয়ে সালেহা বাইরে নিয়ে এল। শ্বশুর সাহেব এবং গৃহকর্তা লোকটিকে অনেক মন্দ কথা শোনালেন। বললেন, অবস্থা বুঝে কথা বলেন না কেন? ওরা জীবন দিয়ে যুদ্ধ করছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রাণ দিয়েছে। ঘরবাড়ি সব নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। গ্রামকে গ্রাম পুড়ে ছাই। ওদের মাথা এখন ঠিক থাকতে পারে? এ সময় এভাবে ওদের নেতাকে নিয়ে কটাক্ষ করা অত্যন্ত অন্যায় হয়েছে। জামাইর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত!

আমি সেই সুযোগ দিলাম না। সেখান থেকে উঠে চলে এলাম। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, ভারতীয় মুসলমানরা আমাদের আন্দোলনের বিরোধিতাই করেছে। আমার প্রাণনাশেরও প্রচেষ্টা হয়েছিল। অবশ্য কয়েকজন নেতৃস্থানীয় কংগ্রেসী মুসলমান ছিলেন প্রশংসনীয় ব্যতিক্রম।

কলকাতায় এসে হন্যে হয়ে বাসা খুঁজছি। ট্যাকে জোর কম। তাই ঘর মেলে না—যা মেলে বাসযোগ্য নয়। হঠাৎ আমাদের অফিসে এসে উপস্থিত হল

আমাদের ঢাকা হলের সে সময়ের কর্মী রংপুরের আনিসুর রহমান। আমার জানা মতে আইসিআইতে ভালো চাকরি করত। সেও উদ্বাস্তু হয়ে এদেশে এসে উপস্থিত এবং খুঁজে খুঁজে আমাকে বের করেছে। আনিস ছিল অত্যন্ত সুপুরুষ। সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র। স্থানীয় আইসিআই হেডঅফিসে গিয়ে তার দুরবস্থার কথা জানাতে আইসিআইর একজন মুসলিম কর্মকর্তা সৈয়দ আবদুল মান্নাফ সাহেব আনিসকে তাদের সার্কাস এভিনিউর বাড়িতে বসবাসের ব্যবস্থা করে দেন। রাতে আনিস এসে আমাকে মান্নান সাহেবের বাসায় নিয়ে গেল। পশ্চিম বঙ্গের অন্যতম বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত পরিবারের সদস্য সৈয়দ মান্নাফ সাহেব সার্কাস এভিনিউর যে প্রাসাদোপম বাড়ির নিচের একটি অংশে স্ত্রী, এক পুত্র ও দুই কন্যা নিয়ে বাস করেন সেটি তাঁর স্ত্রী পৈতৃকসূত্রে পেয়েছেন। মিসেস মান্নাফও এক উচ্চবংশীয় শিক্ষিত মহিলা।

এই পরিবারের সঙ্গে পরিচিত হয়ে অত্যন্ত ভালো লাগল। মান্নাফ ভাই, ভাবী, তাদের ছেলে খোকন, মেয়ে সুইটি এবং খুকু সকলেই আমাকে নিমেষে আপন করে নিল। পরিবারের প্রত্যেকটি সদস্য যে এত আন্তরিকতাপূর্ণ, শালীন এবং সমমর্মী তা এদের না জানলে অজানা থেকে যেত। মানুষ এত ভালো হয়! মান্নাফ ভাই এক দেবতুল্য ব্যক্তি। আনিস যেন সে পরিবারেরই সদস্য। মুসলমানদের মধ্যে যে সম্মানজনক ব্যতিক্রম দৃষ্টিগোচর হয়েছিল—মান্নাফ ভাই এবং তার পরিবারের প্রতিটি সদস্য সেই ব্যতিক্রম। আমার স্ত্রী-পুত্রের জন্য বাসার প্রয়োজন শুনে স্বামী-স্ত্রী দু'জনই উঠে-পড়ে লাগলেন একটা ব্যবস্থা করতে হবে। মান্নাফ ভাই এবং তাঁর পরিবারের সঙ্গে সেদিন থেকে আমার সম্পর্ক সহোদর ভ্রাতার মতো হয়ে গেল। আজও শ্রদ্ধা ও প্রীতিতে সেই সম্পর্ক তেমনি অটুট রয়েছে।

ভাবীর এক ভাই পাশের বাড়ির মুখার্জী সাহেবের মেয়ে নিনিকে বিয়ে করেছে ভালোবেসে। মুখার্জী সাহেবের বাড়িটি দ্বিতল এবং সাহেবী স্টাইলে প্রস্তুত। তাঁরা মুখার্জী সাহেবকে সম্মত করালেন তাঁর বিশাল দ্বিতলের একটি ঘর আমাকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য। ঘরটি বেশ বড় এবং সঙ্গে বাথরুম রয়েছে। আগে এ ঘরে তাঁর এক মেয়ে থাকত। এখন শূন্য পড়ে আছে। আমার ইতিহাস শুনে মুখার্জী সাহেব, যিনি একসময় বরিশালের লোক ছিলেন, সহানুভূতি দেখালেন এবং ঘরটি আমাকে বসবাসের জন্য ছেড়ে দিলেন। এর মাঝে সালেহার চিঠি পেয়েছি, এত দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে এসে দু'জন দু'জায়গায় থাকতে হচ্ছে, ওর চিঠিতে নৈরাশ্য আর দুঃখের স্পর্শ ছিল।

ছুটলাম মেদিনীপুর। নিয়ে এলাম ওদেরকে। সঙ্গে আনলাম সালেহার এক ছোট ভাই কামালকে। দিনভর আমি থাকব আমার কাজে, ওদের দেখবে কে? অবশ্য তার প্রয়োজন ছিল না। মান্নাফ ভাইয়ের পরিবারের কেউ না কেউ সর্বদা এদের সঙ্গ দিচ্ছে। তার চাইতেও বড় স্নেহ-মমতায় আমাদের গ্রহণ করলেন

মিসেস মুখার্জী যাকে মাসীমা সম্বোধন করতাম। মুখার্জী সাহেব এবং মাসীমা দু'জনই আমাদেরকে আপন করে নিলেন। তাদের বাবুর্চি একটা কিছু রান্না করলে, তার ভাগ আমরাও পেতাম।

দু'জনই রানাকে গ্রহণ করলেন পরম স্নেহে। ছোটবেলায় রানা ছিল খুবই ফুটফুটে এবং আদর-কাড়া। ছেলেকে নিয়ে তারা সর্বক্ষণ মেতে থাকেন। রানাকে আমাদের ঘরে দেখাই যায় না। মুখার্জী সাহেবের একটু পানের অভ্যাস ছিল। মাসীমা তাকে কেবলই বলতেন, ঘরে ছেলের বউ রয়েছে। সাবধান, কম খেও, ওরা যেন বুঝতে না পারে।

কিন্তু মাতালকে যদি তার মাতলামি সম্বন্ধে সজাগ করে দেওয়া হয়, তা হলে আর তাকে পায় কে! মাতলামি যায় বেড়ে। পাগলকে নিষেধ করতে নেই, পাগলা, সাঁকো নাড়া দিস না।

রানা ইতিপূর্বে কখনও মাছ স্পর্শ করেনি—এখানে মাছের দুষ্প্রাপ্যতার মাঝে দু'বেলা তার মাছ চাই। প্রতি গ্রাস ভাতের উপরে একটু মাছ থাকতে হবে, না হলে সে খাবে না। অসুবিধা হলেও প্রতিদিন কিছু মাছ আমাদের আনাতে হত ওর জন্য। একদিন বোধহয় মাছ ছিল না, রানা চিৎকার জুড়ে দিল। মুখার্জী সাহেবের পেটে ছিল খানিকটা তরল পদার্থ। তিনি হুঙ্কার দিয়ে এসে উপস্থিত। বললেন, আমার দাদু কাঁদছে কেন?

বারবার সেই একই প্রশ্ন চলল, আমার দাদু কাঁদছে কেন?

রানা এবং সালেহা দু'জনই তাঁর এই মূর্তি দেখতে অভ্যস্ত নয়। তারা ভয় পেয়ে গেল। মাসীমা এসে অনেক বুঝিয়ে তাঁকে নিয়ে গেলেন। সেই থেকে ওদিকে রানার যাতায়াত একটু কমল।

রাস্তার পশ্চিম পাশে ছিল বিহার প্রদেশের কিছু নিম্নবিত্তের মুসলমান। তারা বোধহয় আমাদের পরিচয় পেয়ে কিছু মন্তব্য করে থাকবে। মুখার্জী সাহেবের কানে গেলে তিনি বন্দুক নিয়ে বেরিয়ে এলেন। খাস বরিশাইল্যা ভাষায় গাল দিয়ে চৌদ্দগোষ্ঠি উদ্ধার করলেন এবং গুলি করে সব সাবাড় করে দেবেন হুঙ্কার ছাড়লেন। পরে অনেক লোকজন জুটে তাঁকে শান্ত করে ঘরে নিয়ে যায়। সেদিনও পেটে কিঞ্চিৎ তরল পদার্থ কাজ করছিল!

এই দম্পতির কাছে ঋণীই রয়ে গেলাম। মাসীমা বলেছিলেন, দেখ, আমার পুত্রসন্তান নেই, দুই মেয়ে। ভগবান তোকে পুত্র বানিয়ে আমাকে পাঠিয়েছেন।

শৈশবে মাতৃহারা আমি তাঁদের স্নেহে বিগলিত হয়ে বলেছিলাম, আমিও আবার মা ফিরে পেয়েছি।

স্বাধীনতার পরও যাতায়াত ছিল। কিন্তু কোন একটি দুঃখজনক ঘটনায় মান্নাফ ভাইদের পরিবারের সঙ্গে তাদের মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয়ে গেলে কীভাবে যেন তা আমাদেরকেও প্রভাবিত করল!

স্নেহপরায়ণ মাসীমা'র সঙ্গে ধীরে ধীরে সম্পর্ক শূন্যের কোঠায় মিলিয়ে

গেল। তাঁরা আজ পরপারে। তাঁদের বিদেহী-আত্মার কাছে অকৃতজ্ঞরূপেই চিহ্নিত হয়ে রইলাম।

মধ্য কলকাতায় আশু বাবুর বাড়িতে আমাদের মন্ত্রিসভার সদস্যরা সপরিবারে আস্তানা গেড়েছিলেন। তাজউদ্দীন সাহেবের পরিবার এখানে থাকলেও তিনি নিজে থিয়েটার রোডের অফিসেই বিশ্রাম ও শয়নের ব্যবস্থা করে নিয়েছিলেন। তাঁর হাতঘড়িটিও বাংলাদেশের সময়ই ঘোষণা করত। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন একজন সুদক্ষ সংগঠক এবং এক একনিষ্ঠ কর্মজীবী। নেতার অবর্তমানে তিনি যেভাবে মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছেন, তা ছিল অতীব প্রশংসনীয়। তবুও কিছু কিছু জনপ্রতিনিধি তাঁর উপর সন্তুষ্ট ছিলেন না। কেননা, তিনি অকর্মণ্য, ভোগবাদীদের কঠোরভাবে নিন্দা করতেন—তাদের সমালোচনার কোন মূল্য তাঁর কাছে ছিল না। অসন্তুষ্টির একটা গুঞ্জন, পরস্পর দোষারোপের একটা প্রবণতা পরিলক্ষিত হচ্ছিল। সৈয়দ সাহেব তাই ওয়ার্কিং কমিটি ও সংসদ সদস্যদের দুই দিনব্যাপী বৈঠক ডাকার পরামর্শ দিলেন দলের সাধারণ সম্পাদক প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমেদকে। বৈঠকে অনেক বাদানুবাদ হল। মুক্তিযুদ্ধের রীতিনীতি নিয়ে অহেতুক তর্ক উঠল। ভারত সরকারের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় মুক্তিবাহিনীর পাশাপাশি 'মুজিববাহিনী' গড়ে ওঠায় অনেকেই ভবিষ্যতে ভারতীয় পরিকল্পনা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করল। ঝড় অনেক উঠলেও চায়ের কাপ ভাঙল না। সকলেরই রয়েছে দেশে প্রত্যাবর্তনের উদগ্র বাসনা। কত শীঘ্র তা সম্ভব তা-ই ছিল মূল প্রতিপাদ্য। তাই অনেক গর্জনেও বর্ষণ হল না।

মন্ত্রিসভাকে তাদের আরব্ধ কাজ সমাধা করার জোর তাগিদ দিয়ে দলীয় ঐক্য সবকিছুর উর্ধ্বে স্থান দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে, গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হলে সভা পরিসমাপ্ত হল।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী বিশ্ব সফরে বের হবার পূর্বে পূর্বাঞ্চলের অবস্থা স্বচক্ষে আর একবার পরিদর্শন করলেন, বিশেষ করে শরণার্থী শিবিরসমূহ তিনি ঘুরে ঘুরে দেখলেন। শরণার্থীদের আশ্বাস দিলেন। ভরসার বাণী শোনালেন। তাঁর সঙ্গে দেশ-বিদেশের বহু সাংবাদিক ছিল। মিসেস গান্ধীকে দেখে, তাঁর স্নেহময় ব্যবহার ও আশ্বাস পেয়ে বাংলাদেশের শরণার্থীরা পরম আনন্দিত হল। তিনি কলকাতায় এক জনসভা করেও আশার বাণী শুনিয়েছিলেন—স্পষ্ট বলেছিলেন, ভারত অনেক সহ্য করেছে, আর হয়ত সম্ভব নয়।

তিনি বিশ্বের নেতৃস্থানীয় দেশসমূহে তাঁর সফর শুরু করলেন। এটি ছিল তাঁর প্রতিভা ও প্রজ্ঞাপ্রসূত সিদ্ধান্ত। তিনি ঠিকই বুঝেছিলেন, বাংলাদেশের সমস্যাকে দীর্ঘদিন ধরে জিইয়ে রাখার যে দুরভিসন্ধি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বিদ্যমান; তা যদি সময়ে মোকাবিলা করা না হয় এবং এই সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে ভারতের যে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া একান্ত প্রয়োজন, তা যদি মিত্রদের এবং বিশ্ব নেতৃবৃন্দকে সম্যক উপলব্ধি করান না যায়, তা হলে সেটা হবে ভারতের দুর্বলতার লক্ষণ এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে অক্ষমতার নামান্তর।

তিনি উল্কার মতো দেশ থেকে দেশান্তরে ঘুরে ঘুরে তাঁর বক্তব্য স্পষ্ট করে তুলে ধরলেন। বিশ্ব নেতৃবৃন্দকে তাঁর তরফ থেকে তাদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য সম্বন্ধে সজাগ করে দিলেন। কেবল রিলিফ অপারেশনে দান-দক্ষিণা করলেই কর্তব্য শেষ হতে পারে না। আর যাতে সাহায্য সামগ্রী প্রেরণ করতে না হয় তার ব্যবস্থায় ভারতের হাতকে শক্তিশালী করা প্রয়োজন। তাকে নৈতিক সমর্থন দেওয়া হোক।

শ্রীমতী গান্ধীর সে সফর ছিল ঐতিহাসিক এবং পরিপূর্ণ সফলতায় পর্যবসিতও হল। তিনি দেশে ফিরে এলেন মানসিক স্বস্তি নিয়ে। যা বলার ছিল, বলা হয়েছে। এখন যা করার, করতে হবে।

কলকাতায় তখন সভা-সমাবেশ প্রচুর চলছে। জনাব হোসেন আলীকে সাধারণত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রধান অতিথির সম্মান দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। রাজনৈতিক সভা-সমাবেশে আমাদের ডাক পড়ে। ময়দানে এমনি এক সমাবেশে পশ্চাৎ থেকে একটি কিশোরী আমাকে সানন্দে জড়িয়ে ধরল। প্রথমে চিনতে পারিনি। পরে চিনলাম আমার এক শ্যালিকা জেবীন, সালেহার চাচার মেয়ে। প্রিন্সেস স্ট্রিটের অফিসে গিয়ে শুনেছে ময়দানে সভায় এসেছি, তাই মামাকে নিয়ে এখানে এসে পাকড়াও করেছে। উচ্ছল এই বালিকাটিকে পছন্দ করতাম। বাসায় নিয়ে এলাম। বোনের সাথে ক'দিন থাকার পর ওর মামাদের অস্থায়ী ঠিকানা হাবড়াতে পৌঁছে দিয়ে এলাম। একটি স্বাভাবিক স্নেহ-প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল জেবীনের সঙ্গে। সে সম্পর্ক দীর্ঘদিন সচল ছিল। সরকারের বাইরে আসার পর ওর সঙ্গে আর যোগাযোগ রইল না। কিছুদিনের মধ্যেই বিয়ে হয়ে গিয়ে প্রকৃত অর্থেই হারিয়ে গেল।

শ্রীমতী গান্ধী বাপের বেটি। কথা রাখলেন। বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দিলেন সকল আয়োজন সাঙ্গ করে। সময় কেন নিচ্ছিলেন বোধগম্য হল। সারা

দেশ আনন্দে নেচে উঠল। বাংলাদেশের মানুষ আমরা আনন্দে আত্মহারা হলাম। দিনভর কোলাকুলি আর আনন্দ-উচ্ছ্বাস। মালা আর ফুল বিতরণ। আমরা আর উদ্বাস্তু নই, শরণার্থী নই আমরা। বাংলাদেশ আজ স্বাধীন হতে চলেছে। বিশ্বের সর্ব বৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশ ভারত আমাদের স্বাধীন রাষ্ট্রে হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। বন্দরের কাল হল শেষ। এবার নোঙ্গর তোল।

শ্বশুর সাহেব এ সময় ক'দিন আমাদের সঙ্গে কলকাতায় রয়েছেন। তাঁর শরীর সুস্থ থাকছিল না। জমিদারের ছেলে। সারাজীবন আরাম-আয়াসে দিন কাটিয়েছেন। জন্মভূমিতে শরণার্থী হয়ে এসে খুব স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করছিলেন না। প্রায়ই বলতেন, তাঁর পাকস্থলীতে একটা ব্যথা অনুভব করেন। আমার অবর্তমানে জ্যেষ্ঠ কন্যার সঙ্গে কত না পরামর্শ করেন। শীঘ্র দেশে ফিরতে হবে। ঘরবাড়ি পুনরায় বাসযোগ্য করতে হবে। মেয়েকে মনের আনন্দে প্রায়ই বলতেন, জামাই কত কাজ করছে, দেখে নিস দেশ স্বাধীন হবার পর একটা বড় পদ পাবে। মন্ত্রী হয়ে যেতে পারে।

তাঁর মনে অনেক স্বপ্ন, অনেক আশা। তিনি ঠিক করলেন, দেশে প্রত্যাবর্তনের আগে শরীরটাকে সারিয়ে তোলা প্রয়োজন। তাঁর এক ভাগ্নী ছিল নীলরতন হাসপাতালের ডাক্তার। সেও পরামর্শ দিল, চিকিৎসা করিয়ে যাওয়াই শ্রেয়।

দেশের অভ্যন্তরে তখন মুক্তিবাহিনীর আক্রমণ অধিকতর জোরদার হয়েছে। স্বল্প ট্রেনিংপ্রাপ্ত বাংলাদেশের যুবকরা যে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে, তার তুলনা করা যাবে না। যারা কোনদিন হাতে অস্ত্র স্পর্শ পর্যন্ত করেনি, তারাই সময়কালে দেশমাতৃকার উদ্ধারের এক-একজন বীরযোদ্ধায় পরিণত হল। তাদের অগণিত বীরত্বগাথা আর যুদ্ধ জয়ের কাহিনী আমাদের জাতীয় ইতিহাসের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় হয়ে রইল।

এর মধ্যেই দামামা বেজে উঠল। বাংলাদেশকে নিয়ে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। সে এক অসম যুদ্ধ। বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীর চোরা-গুপ্তা মারের চোটে পাক বাহিনীর অবস্থা তখন করুণ। পাকিস্তান থেকে জলে, স্থলে বা আকাশপথে সরবরাহ বন্ধ। ওদের নাভিশ্বাস উঠবার অবস্থা। এমতাবস্থায় ভারত তার পূর্বাঞ্চলীয় বাহিনীকে বাংলাদেশে প্রেরণ করল হানাদারদের বিতাড়িত করার জন্য। পূর্বাহ্ণে সদ্য স্বীকৃত সার্বভৌম বাংলাদেশের সরকারের সঙ্গে চুক্তি করেই সৈন্য প্রেরণ করা হল। মুক্তিবাহিনী আর ভারতীয় সামরিক বাহিনীর সাঁড়াশি আক্রমণে পাকিস্তানি বাহিনী সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত। একের পর এক এলাকা মুক্ত হতে থাকল।

যশোর মুক্ত হলে আমরা সকলে নেতৃবৃন্দসহ যশোর উপস্থিত হয়ে বিজয়োল্লাস করলাম। বর্ডার পার হয়ে আমাদের গাড়ি যখন মুক্ত বাংলাদেশে প্রবেশ করল, আমরা সবাই গাড়ি থেকে অবতরণ করে মহা আনন্দে মাটিতে

গড়াগড়ি দিলাম। "ও আমার দেশের মাটি তোমার কোলে ঠেকাই মাথা..." সর্বাঙ্গে মাটি মেখে সেদিন যে তৃপ্তি পেয়েছিলাম, তার মতো পরম তৃপ্তি আর কোনদিন পাওয়া যাবে না।

সোহরাব ভাই যশোরের সামগ্রিক প্রোগ্রাম তত্ত্বাবধান করছিলেন। বিজয়সভা শেষে ডাকবাংলোয় সামান্য আহার করে নেতৃবৃন্দসহ সবাই আবার মুজিবনগর অর্থাৎ কলকাতায় ফিরে এলাম। আনন্দে এত বিভোর ছিলাম যে, আমার খাবার কথা মনেই পড়েনি। মুক্তির কী আনন্দ, স্বাধীনতার কী স্বাদ এটা উপলব্ধি করতে হলে আমাদের মতো হাতে অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করে দেশকে দখলদার মুক্ত করলেই তা প্রকৃতপক্ষে হৃদয়ঙ্গম হবে। জন্মভূমির ক্রোড়ে মাথা ঠেকিয়ে আমরা ধন্য হলাম। মাকে শৃঙ্খল মোচন করতে পারবার আনন্দ সন্তানের আর ধরে না। এখন মৃত্যু এলেও তাকে সাদরে গ্রহণ করা যেতে পারে।

১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে দেশ আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীন হয়ে গেল। বাংলাদেশ এবং ভারতের যৌথ কমান্ডের প্রধান সেনাপতি জেনারেল মানেকশর নিকট পরাজিত পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর প্রধান জেনারেল নিয়াজী ঢাকায় আত্মসমর্পণ দলিলে স্বাক্ষর করল। সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র সমর্পণ করল। নব্বই হাজার পাকিস্তানি সৈন্যকে বন্দি করা হল।

আমাদের অবশ্য কিছুটা দুঃখ থেকে গেল। পাকিস্তানিদের আত্ম-সমর্পণের মুহূর্তে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল এম. এ. জি. ওসমানীর উপস্থিতি একান্ত বাঞ্ছনীয় ছিল। সবকিছু মনের মতো হয় না। স্বাধীনতার অনাবিল আনন্দে এই সাময়িক উপেক্ষাকে আমরাও উপেক্ষা দিয়ে ঢেকে রাখলাম। এটি ছিল নতুন দেশের কর্তাদের জন্য মনঃপীড়ার একটি বিষয়।

বিজয়ের মাহেন্দ্রক্ষণে আমরা মুজিবনগরেই পড়ে রইলাম। বিমানবন্দর তখনও বেসামরিক পরিবহনের উপযোগী ছিল না। ঢাকা বিমানবন্দর ছিল বিধ্বস্ত।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা-পাগল মানুষেরা তখন সর্বত্র যারপরনাই বিজয়-উল্লাসে মত্ত। নিজেদের স্বজন হারানোর ব্যথা, আহত-নিহতদের জন্য আহাজারি, ঘর-বাড়ি, বিষয়-সম্পত্তি বিনষ্টের কষ্ট সেই মুহূর্তে মানুষের মন থেকে মুছে গিয়েছে। স্বাধীন দেশের পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে অগণিত মানুষ ছুটে চলেছে শহরে, বন্দরে, গ্রামে পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনের দুর্বার উল্লাসে।

আমরা অস্থির হয়ে উঠেছি সেই মুহূর্তে ঢাকা প্রত্যাবর্তন করার জন্য। ঢাকা বিমানবন্দরকে কার্যকর করার প্রয়াস চলছিল ভারতীয় সেনাদের সহায়তায়। তবুও কয়েকদিন লেগে গেল।

এর মধ্যেই আমার শ্বশুর সাহেব হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন অপারেশনের জন্য। পরিবারের অন্য সকলেই তখন কষ্ট করে আমাদের বাসায় অবস্থান

করছে। মাসীমা অবশ্য তাদের ড্রয়িংরুম আমাদের জন্য ছেড়ে দিয়েছেন। সেখানে ঢালা বিছানায় করে ছেলেদের ঘুমোবার ব্যবস্থা।

স্বাধীনতার জন্য এত কাজ করেও আজ সেখানে উপস্থিত থাকতে পারছি না। মন দুঃখে ভারাক্রান্ত। শ্বশুর সাহেব অবশ্য বললেন, সবাই এখানে রয়েছে। হাসপাতালে আমার ভাগ্নী ডাক্তার রয়েছে। কোন অসুবিধা হবে না। তুমি দেশে চলে যাও।

সালেহাও একই কথা বলল। মন ইতস্তত করছিল। তবুও যাওয়াই ঠিক করলাম। ভারতের বিমান বাহিনীর সরবরাহ প্লেনে কিছু কিছু করে ঢাকায় লোক প্রেরণ শুরু হয়েছে। থিয়েটার রোডে উপস্থিত হয়ে আমার ও সুলতানের যাওয়ার ব্যবস্থা করতে বেগ পেতে হল না।

ডিসেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে দেশের মাটিতে অবতরণ করলাম। সবকিছু বিধ্বস্ত, সর্বত্র ধ্বংসের চিহ্ন বিদ্যমান। বিমানবন্দরের চারদিকে বাঙ্কার খোঁড়া। রাস্তাগুলো বিনষ্ট হয়ে গেছে—কোন কিছুই স্বাভাবিক নয়—কেবল প্রতিটি মানুষের মধ্যে দুঃস্বপ্ন থেকে জেগে ওঠার স্বস্তি। তাদের চোখে-মুখে ফুটে রয়েছে এক অসম্ভবকে সম্ভব করার তীব্র সুখের বহিঃপ্রকাশ।

কেউ জানে না, আমরা আসব। ওবায়েদুর রহমান পূর্বেই পৌছেছিল। নেতৃবৃন্দকে সে-ই লোকজন নিয়ে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে বঙ্গভবনে পৌছিয়েছে। আমাদেরকেও সে-ই স্বাগত জানাল। এক পরিচিত ব্যক্তির গাড়িতে পৌছলাম উয়ারীর ভজহরি সাহা স্ট্রিট বা ভূতের গলিতে। এখানেই ওর ফুপা ও ফুপুর সঙ্গে থেকে সালেহা ঢাকায় পড়াশুনা করত। এটাকেই শ্বশুরবাড়ি বলে জানতাম এবং সত্যিকারের স্নেহ-ভালোবাসা এবং সমাদর এখানেই পেয়েছি।

আমাকে সর্বাগ্রে দেখতে পেয়ে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল ডেইজী। সকলের ছোট বলে ওকে ছোট গিন্নী বলে ডাকতাম এবং খুবই স্নেহ করতাম। সেও তার হৃদয় উজাড় করা শ্রদ্ধা-ভালোবাসায় ভরিয়ে রাখত। সর্বদাই সেই সম্পর্ক বজায় ছিল। ফুপা-ফুপুসহ সবাই ছুটে এলেন। দীর্ঘদিন পর অনেক আনন্দ বর্ষিত হল। ডেইজী, রোখসানা, লুসি, শাকু, শওকত, মোজাফফর ওরা আমাকে না পেয়ে পেল। কি খাওয়াবে, কোথায় রাখবে ভেবে পায় না। অনেকদিন পর যেন হারানো মাণিক ফিরে পেয়েছে। রণজয়ী ক্লান্ত যোদ্ধাকে ওরা প্রাণের সমস্ত মাধুর্য মিশিয়ে সেবা-যত্নে অস্থির করে তুলল।

ছোট মামা খবর পেয়ে ছুটে এলেন সকলের আগে। তিনি গভীর মমতায় আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বারবার শুধু উচ্চারণ করলেন, আমার বাবা, আমার বাবা।

সকলেই আর একবার দু'চোখ মুছল। বড় দা এলেন ভাবী-বাচ্চাদের নিয়ে। ফনু ছুটে এল ছেলে-মেয়েদের নিয়ে। আরও শত আত্মীয়স্বজনে, বন্ধু-বান্ধবে বাড়ি উপচে পড়তে থাকল। সকলেই আনন্দে আত্মহারা। আবার যে দেখা পাওয়া যাবে, ন' মাস পরই যে আমরা মনজিলে পৌঁছতে সক্ষম হব—এতটা কেউ আশা করেনি। দীর্ঘমেয়াদী মুক্তিযুদ্ধের আশঙ্কা করতেন অনেকেই। আজ তাই হাজারো ব্যথার স্মৃতি অন্তরে গেঁথে সবাই অনাবিল আনন্দে মেতে উঠল। রানার কথা, সালেহার কথা, শ্বশুরের অসুস্থতার কথা, আর সকলের কথা বারবার বলেও রেহাই নেই। ওদের উৎসুক মনের চাহিদা কমতে চায় না। এ বাসার মানুষগুলো ক্লান্তিহীনভাবে হৃদয়ের অনাবিল প্রশান্তির সাথে প্রতিটি অতিথিকে চা-মিষ্টি দিয়ে আপ্যায়ন করল।

বিকেলে বঙ্গভবনে গিয়ে নেতৃবৃন্দের সঙ্গে দেখা হল। অধ্যাপক ইউসুফ আলীসহ কয়েকজনকে মন্ত্রী হিসাবে শপথ দেওয়া হয়েছে। কুষ্টিয়ার ডা. আসহাবুল হক, আমাদের হেবা ডাক্তার, রেডক্রসের চেয়ারম্যান হিসাবে বঙ্গভবনেই স্থান করে নিয়েছে। আমাকে আলঙ্গিনাবদ্ধ করে তাঁর কক্ষে নিয়ে গেল। তার গায়ে সুন্দর নতুন একটি বিদেশী শার্ট ছিল। প্রশংসা করতেই সেটি খুলে জোর করে আমাকে পরিয়ে দিল। বলল, তোর দেশে প্রত্যাবর্তনের সময়ে এটা আমার সামান্য উপহার।

হৃদয় হৃদয়কে ছুঁয়ে গেল। সকলের সঙ্গে দেখা করে শ্যালিকাদের যত্ন-মধুর হেফাজতে ফিরে এলাম। এভাবেই দিন কয়েক কাটলো। বাসায় লোক ধরে না। এরাও কাউকে আপ্যায়ন না করে ছাড়ছে না। বাসাটি মিলনকেন্দ্রে পরিণত হল। দেশ থেকে কর্মীরা এল কবে দেশে যাব সেই প্রোগ্রামের জন্য।

এরই মধ্যে কলকাতা থেকে সালেহার টেলিগ্রাম এল, আব্বার অবস্থা আশঙ্কাজনক, শীঘ্র এস।

সব ফেলে তড়িঘড়ি কলকাতা যাওয়ার আয়োজন করতে হল। বিমান চালু হয়নি। জনাব আবু হেনা তখন স্বরাষ্ট্র সচিবের দায়িত্বে। তিনি আমাকে গাড়ি নিয়ে যাওয়ার আনুষ্ঠানিক অনুমোদনপত্র দিয়ে দিলেন। ফুপার গাড়ি নিয়ে তিনি, শাকু এবং আমি ছুটলাম স্থলপথে। আরিচায় পৌঁছে দেখা গেল কোন ফেরি নেই। উপায়ান্তর না দেখে স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধারা আমাদের গাড়ি অনেক ঝামেলা করে একটা প্রকাণ্ড নৌকায় তুলে দিল। ছাউনি ছাড়া সে নৌকায় পদ্মার ঠাণ্ডা বাতাসে বয়স্ক মানুষ ফুপার প্রবল জ্বর উঠে গেল। বাধ্য হয়ে যশোরে জনৈক আত্মীয়ের বাড়িতে রাত্রি যাপন করে আমরা পরদিন কলকাতা পৌঁছলাম।

জ্বরে কাতর ফুপাকে নিয়েই সরাসরি হাসপাতালে গেলাম। শুনলাম,

অপারেশন সফল হয়েছিল, ডাক্তাররা বলেছেন আর কোন ভয় নেই, রোগী অচিরেই সুস্থ হয়ে উঠবেন। সকলেই যখন নিশ্চিন্ত তখন ঘটল চরম দুর্ঘটনা। শোনা গেল, তিনি নাকি নিজ থেকেই বিছানা থেকে নামার চেষ্টা করতে গিয়ে পড়ে যান। অপারেশনের সেলাই ছিঁড়ে গিয়ে প্রচুর রক্তপাত হয়। আরও জটিলতা সৃষ্টি হয়। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, ডাক্তার আর ভরসা দিতে পারছেন না। কিছু করার ছিল না। তবুও পরিচয় ভাঙিয়ে যেটুকু করা গেল করলাম। বড় ডাক্তার আনা হল, তারা যে পরামর্শ দিলেন তার ব্যবস্থা করলাম। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না।

বঙ্গবন্ধু যেদিন পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে লন্ডন হয়ে বাংলাদেশে পৌঁছলেন, সেদিন ১০ই জানুয়ারি, ১৯৭২ সাল—আমার শ্বশুরও পৃথিবীর মায়া-জগত থেকে মুক্তি পেয়ে এক অজানার উদ্দেশ্য যাত্রা করলেন। কতইবা ছিল তাঁর বয়স—পঞ্চান্ন বছর বয়সে তিনি পরলোক গমন করলেন। ফুপার সাথে ছিল তাঁর একান্ত হৃদয়ের সম্পর্ক। শেষ দেখার জন্য ঢাকা থেকে ছুটে এলেন। তাঁর সঙ্গেও শেষ কথা হল না। অসুস্থ ফুপার আহাজারিতে হাসপাতাল প্রাঙ্গণ বিষণ্নতায় ছেয়ে গেল। সালেহা এবং ওর ভাই-বোনেরা পিতৃশোকে আকুল হয়ে কাঁদছিল। কারোরই স্বাভাবিক অবস্থা ছিল না।

কিন্তু সেদিন দেখেছিলাম আমার শাশুড়ির অপূর্ব প্রাণশক্তি এবং দৃঢ় মনোবল। পরে সালেহার কাছে শুনেছি, রাতে সকলের অগোচরে তিনি নীরবে দীর্ঘদিনের জীবনসাথীর অকালপ্রয়াণে অঝোরে কাঁদতেন। কিন্তু পুত্র-কন্যারা পাছে ভেঙে পড়ে তাই তিনি ওদের সম্মুখে স্বাভাবিক থাকার প্রয়াস পেতেন।

তিনি আমাকে এসে সস্নেহে বললেন, বাবা, তুমি যদি ভেঙে পড় তা হলে তোমার শ্বশুরের শেষকৃত্যের ব্যবস্থা কীভাবে হবে! বিদেশ-বিভুঁইয়ে তুমিই তো একমাত্র অবলম্বন।

তিনি ঠিকই বলেছেন, এখন আমার শোকের সময় নয়। ওদিকে ঢাকায় তখন বঙ্গবন্ধু লক্ষ লোকের আবেগঘন সম্বর্ধনায় কাঁদতে কাঁদতে প্লেন থেকে নামছেন। আমি সেখানে উপস্থিত থাকতে পারলাম না। আমিও তখন কাঁদতে কাঁদতে ছুটলাম আমার শ্বশুরের দেহকে সমাহিত করার আয়োজনে।

অগতির গতি মান্নাফ ভাইয়ের শরণাপন্ন হলাম। তিনি যা করলেন তার তুলনা হয় না। অন্যের বোঝা এভাবে কাঁধে নিতে কাউকে সহজে দেখা যায় না। তিনি সব ব্যবস্থায় লেগে গেলেন। পার্ক সার্কাস কবরস্থানে কবর খোদাবার আয়োজন করলেন, শবদেহ বহনকারী গাড়ি যোগাড় করে আমার শ্বশুরের লাশ নিজের বাড়ির আঙ্গিনায় নিয়ে এলেন। আমার বাসস্থানের মালিক ছিলেন হিন্দু ধর্মাবলম্বী। তাই মান্নাফ ভাই তাঁর বাড়িতেই লাশের শেষ গোসল এবং জানাজার ব্যবস্থা করলেন। তাঁর আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধব ডেকে সবকিছু সুচারুভাবে সম্পন্ন করলেন। আমাকে কোন বেগই পেতে হল না।

পার্ক সার্কাস কবরস্থানে শ্বশুরের মরদেহ সমাধিস্থ করে যখন ফিরে এলাম তখন ঘরে ঘরে সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বলে উঠেছে। ভারতের মাটিতে যেন তার দাবি ছিল। এ দেশেই জন্ম। বড়ও হয়েছেন এখানে। অল্প বয়সে বিয়ে করেছেন এ দেশেই। আজ মহাপ্রয়াণে শেষ ঠিকানাও হল এ দেশেরই মাটিতে। মাঝখানের কয়েকটি বছর গেল সেদিনের পূর্ব পাকিস্তানে। তাঁর অনেক সাধের বাংলাদেশ আর দেখা হল না। ভারত থেকে একদিন পূর্ব পাকিস্তানে চলে যেতে হয়েছিল। আর একবার সেই পূর্ব পাকিস্তানই তাঁকে ফিরিয়ে দিল ভারতে। এখানেই জন্ম, এখানেই মৃত্যু। নিয়তির বিধান কেউ খণ্ডাতে পারে না।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শোকের তীব্রতা কমতে থাকে। একসময় যা অসহনীয় মনে হয়, সেটাও ক্রমে সহনীয় হয়ে ওঠে। সবাই এতটা মন-মরা যে রানাকেও তা প্রভাবিত করল। সে পূর্বের মতো খাওয়া নিয়ে ঝামেলা করে না। ক্রন্দনরতা মাকে নিজের ছোট্ট শার্টের অগ্রভাগ দিয়ে সযত্নে চোখ মুছিয়ে দেয়। খালারা ওকে যা খেতে দেয় তা-ই খায়। কোন উচ্চবাচ্য করে না।

ফুপা সেরে উঠেছেন। নিজেকে সামলে নিয়েছেন। তাঁর মতো পরোপকারী এবং নিঃস্বার্থ দরদী একজন মানুষ আমি কমই দেখেছি। ঢাকায় তাঁর বাড়িতে আমার কারণে এবং নানা আত্মীয় এবং অনাত্মীয়ের কারণে তিনি এবং ফুপু যে ঝামেলা পোহাতেন তার তুলনা হয় না। অনেকদিন কেউ বুঝতে পারেনি সালেহা সে বাড়ির জ্যেষ্ঠা-কন্যা নয়। ভাইয়ের মেয়ে এবং নিজের মেয়ের মধ্যে কোন তারতম্য তাঁদের ছিল না। কারো মেয়ের বিয়ে, কারো ছেলের বৌ-ভাত, কারো বাড়িতে অন্য কোন অনুষ্ঠান এসবে একবার ফুপাকে খবর দিলেই হল, সমস্ত দায়িত্ব ঘাড়ে তুলে নিয়ে সেসব সুন্দর করে সফল করে দেবেন। এমনি একজন ভালো মানুষ কেন যে দীর্ঘদিন পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে দীর্ঘকাল ভুগে ভুগে মৃত্যুবরণ করলেন—তা বিধাতা ছাড়া কেউ বলতে পারবেন না।

ফুপারও যৌবন কেটেছে এই কলকাতা শহরে। অনেকের সঙ্গে একসময় প্রগাঢ় পরিচয় ছিল। বললেন, একবার বড় বাজারে যাব, ওখানকার ঝুরা কাবাব অতি উপাদেয়।

আমি হাসলাম। জানি, খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে তিনি সবসময়ই সৌখিন। খেতে এবং খাওয়াতে ভালোবাসেন। নিয়ে গেলাম বড় বাজারে। অনেকেই চিনতে পারছেন না। যাদের নাম জানতেন, এতদিন পর তাদের হদিস পাওয়া ভার। এক বৃদ্ধ আতরওয়ালা কিন্তু তাঁকে চিনলেন। দু'জনের সেকি জড়াজড়ি। আমাকে 'দামাদ' হিসাবে পরিচয় করিয়ে দিতেই বৃদ্ধ আতরওয়ালা এক শিশি আতর আমাকে উপহার দিলেন। কিছুটা তখনই গায়ে লাগিয়ে দিলেন। সুগন্ধে চারদিক ভরে গেল। অনেক অনুরোধেও দাম নিতে সম্মত হলেন না।

ফুপাকে ঝুরা কাবাব, মালাই-কুলফি খাইয়ে আনলাম। আসার সময় বাসার সকলের জন্য তিনি অনেকটা কাবাব সঙ্গে করে আনলেন। নিরানন্দ পরিবেশকে তিনি সাময়িক হলেও চাঙ্গা করলেন।

কলকাতার বাসা গুটিয়ে এবার গৃহ-প্রত্যাবর্তনের পালা। পরিচিতজনদের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। সুলতানের বাবা-মা, পারু এবং ওর বাচ্চাদের কাছ থেকে বিদায় নেওয়া বেশ কষ্টসাধ্য হল। পারু দু'বাচ্চার মা হয়েও ভাবীকে জড়িয়ে সেকী কান্না! মাসীমা ও মুখার্জী সাহেবের কাছ থেকে রানাকে বের করে আনা কঠিন হল। কাঁদছেন আর বলছেন, আজ আনন্দের দিন, কান্না নয়। আজ দাদু তার বাড়ি যাচ্ছে। তার দেশে যাচ্ছে।

মান্নাফ ভাইয়ের বাসার সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরলাম। বললাম, আপনার কাছ থেকে ইহজীবনে বিদায় নেব না। অনুমতি দিন আপাতত নিজের দেশে যাই।

শীঘ্রই বাংলাদেশে এসে আমাদের সঙ্গে মিলিত হবেন এই আশ্বাস না পাওয়া পর্যন্ত তাঁর বুক থেকে বুক সরাইনি।

আমার কলেজ জীবনের বিশিষ্ট বন্ধু রেজাউল করিম মন্টু একটা গাড়ি যোগাড় করেছিল। দু'গাড়িতে অস্থায়ী সংসারের কিছু মালামাল আর লোকজন তুলে বেরিয়ে পড়লাম পার্ক সার্কাস থেকে—পেছনে পড়ে রইল অনেক সুখ-দুঃখের স্মৃতি বিজড়িত, অনেক হাসি-কান্না দিয়ে গড়া আমার যুদ্ধকালীন সাময়িক আস্তানা।

রাষ্ট্রীয় বিপ্লব অনেক ক্ষেত্রে নির্ধনকে করে ধনী, ধনীকে করে গরিব। ঘাট হয় আঘাটা, আর আঘাটা হয়ে পড়ে ঘাট। বাংলাদেশ তার ব্যতিক্রম নয়। যাদের ঘরবাড়ি পুড়ে গেছে, লুট হয়েছে অস্থাবর সম্পত্তি, তারা একদিন সচ্ছল ঘরের হলেও এখন শূন্যহস্ত। অন্যদিকে যাদের [illegible], [illegible]-সম্বলহীন পথের মানুষ, তাদের অনেককে দেখা যাচ্ছে গাড়ি হাঁকছে। বাড়ি, দোকান দখল করে আখের গুছিয়ে নিয়েছে। পশ্চিমারা স্যুটকেস ভর্তি করে টাকা-পয়সা, সোনা-দানা হয়ত নিয়ে গেছে— ঘরবাড়ি, গাড়ি, দোকান, কল-কারখানা এসব অস্থাবর সম্পত্তি স্যুটকেসে ভরে নেওয়া সম্ভব নয় বিধায় ফেলে চলে গেছে। প্রায় সবটাই বেদখল হয়েছে। পরিত্যক্ত সম্পত্তি ঘোষণা করে সরকার পরবর্তীতে কিছুটা উদ্ধার করলেও, সিংহভাগ রইল অবৈধ দখলদারদের হাতে।

এর মধ্যে একশ্রেণীর অসৎ কর্মকর্তাকে হাত করে নানা ফিকির বের করেছে, বিভিন্ন ভুয়া দলিল ও কাগজকে বৈধ বলে চালিয়ে দিয়েছে।

এই শ্রেণীই লাভবান হল বেশি। কিন্তু কি করা যাবে? কাকে দিয়ে করা যাবে? গলদ যে গোড়ায়! যে বেড়া দেওয়া যাবে ক্ষেত রক্ষার্থে, সেই বেড়াই ক্ষেত খেয়ে নেবে।

এই হল সমাজের অবস্থা। যুদ্ধবিধ্বস্ত একটা নতুন দেশ—সমস্যা থাকবেই। দেশ যারা স্বাধীন করেছে সেই যুবশ্রেণীর হাতে রয়েছে টাটকা অস্ত্র। সবাই আদর্শ ধুয়ে পানি পান করে না। অভাব ঘরের দোরে দাঁড়ালে অনেকের আদর্শই জানালা ভেঙে পালিয়ে যায়। অস্ত্রের অপব্যবহার রোধ করা সহজ নয়। দারোগা, পুলিশ বা বড় কর্তাব্যক্তিরা কেউ মুক্তিযোদ্ধাদের শাসন করার শক্তি রাখে না। অরাজকতা, ডাকাতি, ছিনতাই শুরু হয়ে গেল। নিরাপত্তাহীনতায় ভুগলো নারীসমাজ। মাত্র কৈশোর পার করেছে এসব বালিকারাও অস্ত্রধারীদের সহজ টার্গেট হয়ে পড়ল। চারদিকে দীর্ঘশ্বাস। অনেক আশা নিয়ে দেশ স্বাধীন করা হয়, তার জন্য মূল্য দিল সাধারণ জনগণ। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, বিশ টাকা মণে চাল খাওয়াব— কোথায় চাল! চালের দর হু হু করে বাড়তে লাগল। একটা ডিম এক আনায় পাওয়া যেত, তার দাম চার আনা, ছ' আনায় ঠেকল। প্রতিটি নিত্যব্যবহার্য জিনিসের মূল্য বল্গাহীনভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকল। যাদের লুটের পয়সা নেই, যারা গোনাগুনতি মাস মাইনের মানুষ, যাদের আয় নির্ধারিত, তাদের জীবনে স্বাধীনতা কেবল প্রেরণা হয়েই রইল। আলো প্রদর্শন করল না, ঘোর অমানিশার ইঙ্গিত বহন করল।

শিক্ষায়তনগুলো নতুন উদ্যমে ভাঙা ঘরেই কাজ শুরু করল। কিন্তু লেখাপড়ার চাইতে অন্য কাজে সহজতর উন্নতি। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অস্ত্রের মহড়া স্থল আর রাজনীতির দলাদলির আখড়ায় পরিণত হল।

কোথায় যাওয়া যাবে? সব দিকেই সংস্কারের প্রয়োজন। সর্বত্র কঠিন সিদ্ধান্ত এবং কঠিনতর বাস্তবায়ন প্রয়োজন। ভোগী নয়, ত্যাগী নেতৃত্বের প্রয়োজন। প্রয়োজন একজন নেতার যিনি আরও অধিক জনপ্রিয় হতে চাইবেন না—এখন থেকে হবেন অপ্রিয় ও কঠোর। কিন্তু কোথায় সেই নেতৃত্ব? আমরা রইলাম কে কত তাড়াতাড়ি আখের গুছাতে পারব, কে কত বেশি খাঁটি তেল জায়গা মতো মর্দন করে আরও উপরে উঠে যাব এই ধান্দায়। এই মনোভাব যে জাতির নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে বিরাজমান—সেই জাতিকে রক্ষা করবে কে? কে শোনাবে তাকে আশার বাণী? কে দেখাবে মুক্তির পথ? রাজনৈতিক মুক্তি সে তো এসেছে। চাই ক্ষুধা, দারিদ্র্য, অশিক্ষা, সংস্কারের বেড়াজাল থেকে মুক্তি আর নিরাপত্তা। চাই সামাজিক অপরাধ, সন্ত্রাস আর অবৈধ অস্ত্রের অভিশাপ থেকে মুক্তি।

কোথায় সেই মুক্তি? কে সেই মুক্তিদাতা? বঙ্গবন্ধু? নিশ্চয়ই তিনি। যদিও ন'

মাস তিনি ছিলেন অনুপস্থিত। ছিলেন পাকিস্তানের কারাগারে। কি অপ্রতিরোধ্য প্রয়োজন ছিল তাঁর বন্দিত্ব বেছে নেওয়ার? ইচ্ছা করলে তারা তো সেখানেই তাঁকে শেষ করে দিতে পারত। তিনি স্বচক্ষে দেখলেন না বাংলা মায়ের বস্ত্রহরণ। তিনি দেখতে পাননি রক্তের স্রোতধারায় বন্যা বয়ে গেছে তাঁর সাধের সোনার বাংলায়। ফিরে এসে দেখলেন পোড়ামাটি করে রেখে গেছে তাঁর জন্মভূমিকে।

লক্ষ লক্ষ মানুষের আপনজন কেউ না কেউ স্বাধীনতার বলি হয়েছে—ঘরবাড়ি নিঃশেষ হয়েছে অগণিত মানুষের। বঙ্গবন্ধুর পরিবারের কোন ক্ষতি হয়নি। তাদেরকে পাকিস্তান সরকারই সুরক্ষা দিয়েছে বলে জনশ্রুতি আছে। মাসিক ভাতা নির্ধারণ করে খোরপোষের ব্যবস্থা হয়েছে এমনও শোনা গেছে। এর অর্থ কী দাঁড়ায় বোধগম্য হওয়া কঠিন! কোন্ অদৃশ্য যাদু বলে এসব সম্ভব হল? সন্দেহ আর দ্বন্দ্ব বাড়ছেই। কী করে সামাল দেবেন দেশের এই পর্বত-প্রমাণ সমস্যা! সদ্যভূমিষ্ঠ বাংলাদেশে তিনি ছিলেন প্রসব যন্ত্রণার বাইরে। তবুও তাঁকেই হাল ধরতে হবে এ হতভাগ্য জাতির—এই নবীন রাষ্ট্রকাঠামোর।

ঢাকার মাটিতে পা রেখেই বঙ্গবন্ধু অবস্থার আঁচ পেলেন। তিনি অঝোরে সেদিন কাঁদছিলেন তাঁর প্রিয় মানুষের সীমাহীন ক্ষয়ক্ষতি আর আহত-নিহতদের অবিশ্বাস্য সংখ্যা অবগত হয়ে। জন্মভূমির করুণ অবস্থা দেখে যে দায়িত্ব আজ থেকে তাঁর স্কন্ধে নিপতিত হল তার অসীমত্ব উপলব্ধি করলেন। তা না হলে আর কার আশায় মানুষ বুক বাঁধবে! সকল দুরবস্থার মধ্যেও সান্ত্বনা ছিল তিনি আসছেন। তিনি এলে মানুষ পাবে অমৃতের সন্ধান—যার দ্বার স্বাধীনতা সদ্য উন্মুক্ত করে দিয়েছে। বঙ্গবন্ধুর ফিরে আসার আশায় দিন গুনছিল তার সুদীর্ঘদিনের ত্যাগী কর্মীরা। কিন্তু তাঁর পাশে যখন আরও একজনকে দেখা গেল—কর্মীদের মনে দ্বিধার উদয় হল। আমরা জানতাম, পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বাংলাদেশের মানুষের উপর যেদিন ক্র্যাকডাউন করল সেদিন তিনিও পাকিস্তানে চলে যান এবং বহাল তবিয়তে থাকেন। বাংলাদেশ তাঁর জন্মভূমি নয়—নাড়ির টান তাঁর থাকার প্রশ্নই আসে না। স্ত্রী ছিলেন সিন্ধু প্রদেশের লোক—তাঁর পক্ষে বেগতিক অবস্থায় পলায়ন খুবই স্বাভাবিক। সেই ড. কামাল হোসেনকে তিনি সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। কেউ কোন প্রশ্ন করার আগেই তিনি বললেন, কামালও অনেক কষ্ট করেছে।

ব্যস, সুপ্রিমকোর্টের রায় হয়ে গেল। যশস্বী আইনজীবী লন্ডনের ক্লারিজ হোটেলে বসে রায়ের মুসাবিদা তৈরি করেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর এক কথায় নিষ্কৃতি পেয়ে গেলেন। নয় তো বাংলার মাটিতে তাঁকে একবার কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে নিজের ওকালতি করতে হত বাংলাদেশের বিচ্ছুদের হাতে।

সপরিবারে দেশে ফিরে ভজহরি সাহা স্ট্রিট বা ভূতের গলিতেই উঠতে হল। আপনজনদের মাঝে ফিরে সালেহার পিতৃশোক উদ্বেল হয়ে উঠল। সকলে

মিলে অনেক কান্না কাঁদলেন। আমি তাদের সুযোগ দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। আমার প্রথম কাজ নেতার সঙ্গে তৎক্ষণাৎ সাক্ষাৎ করা। ধানমন্ডির একটি বাড়িতে তিনি সপরিবারে অবস্থান করছেন।

দু'হাতে অকৃত্রিম স্নেহের বন্ধনে নেতা আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। বুকে-পিঠে অনেক হাত বুলালেন। বারবার বললেন, তোর দিল্লী পার্লামেন্টের বক্তৃতার কথা এতবার শুনেছি যে, অবাক হতে হয়। কী বক্তৃতা করেছিলি তুই! মানুষজনকে পাগল করে দিয়েছিস! তোদের অবদান কেউ কোনদিন ভুলবে না!

আমি তাঁকে আমার শ্বশুরের মৃত্যুর কথা বললাম। তাঁর আগমন মুহূর্তে কেন উপস্থিত থাকতে পারিনি জানালাম। তিনি সব মন দিয়ে শুনলেন। আমার দাদা-শ্বশুরকে তিনি ভালোই চিনতেন। দাদা-শ্বশুরের ১৫ নম্বর পুরানা পল্টনের বাড়ির একাংশে তিনি আওয়ামী লীগের অফিস নিয়েছিলেন। ফুপাও ছিলেন তাঁর সুপরিচিত। খুব আফসোস করলেন, সময়োচিত সান্ত্বনা দিলেন এবং যখন শুনলেন কলকাতা থেকে সবেমাত্র এসে পৌঁছেছি; তিনি বললেন, অনেক পরিশ্রম করেছিস দীর্ঘদিন। কয়েকটা দিন বিশ্রাম কর। তারপর আবার কাজে লেগে যেতে হবে। আমাকে সাহায্য করবি না?

বললাম, নেতা, এই দিনটির অপেক্ষাতেই ছিলাম। যে আদেশ করবেন, মাথা পেতে নেব।

সেদিনের মতো বিদায় নিয়ে এলাম। বারান্দায় ভাবীর সঙ্গে দেখা হলে তিনি অকৃত্রিম স্নেহে জড়িয়ে ধরলেন এবং আর একবার অনেক প্রশস্তি করলেন।

বিক্রমপুর আর না গেলেই নয়, কর্মীরা অস্থির হয়ে রয়েছে। প্রথম গেলাম শ্রীনগর। সেখানে পথে পথে যে সম্বর্ধনা দেওয়া হল, তাতে মূল সম্বর্ধনায় পৌঁছতে অনেক দেরি হয়ে গেল। মানুষ একটু দেখতে চায়। একটু কাছে পেতে চায়। তাদেরকে নিরাশ করা ঠিক নয়। শ্রীনগরে পৌঁছে যে গণসম্বর্ধনা পেলাম তার তুলনা হয় না। মনে হয় বিশ্বজয় করে এসেছি। মাঠ কানায় কানায় পূর্ণ। সুউচ্চ ডায়াস ভরে উঠল ফুল আর মালায়। এত ভালোবাসা ওরা আমার জন্য রেখেছিল! বক্তৃতা করতে উঠে কেঁদে ফেললাম। মুক্তিযোদ্ধারা—যারা অনেকেই আমার হাতে রিক্রুট, লাইন বেঁধে পদধূলি নিল। অভিভূত হয়ে গেলাম। মামা এসে বললেন, তুমি একটু শীঘ্র আস, মান্নাফ মীর

আর তার ছেলেকে মুক্তিযোদ্ধারা বেঁধে রেখেছে। কিছুক্ষণের মধ্যে তাদের শেষ করে দেবে।

তারা ছিল শান্তি কমিটির মাতব্বর সদস্য। যুদ্ধের নয় মাস মুক্তিযোদ্ধাদের বহুধা বিরুদ্ধাচরণ করেছে। তারা স্বাধীনতার দুশমন। কিন্তু যা-ই হোক, আমার উপস্থিতিতে এ কাজ করতে দিতে পারি না। তাছাড়া এখন থেকে রক্তপাত বন্ধ করতে হবে—আইনকেও হাতে তুলে নেওয়া যাবে না। দৌড়ে গেলাম। যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনের সময় মুসলিম লীগের মনোনীত প্রার্থী মান্নাফ মীর এবং তার ছেলেকে চোখ বেঁধে রেখেছে। আমি বিদায় হলে কর্ম সমাধা করা হবে।

নিজহাতে তাদের চোখের বাঁধন খুলে দিলাম। বললাম, আপনাদেরকে মুক্তি দেওয়া হল। অতীতের কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা করে ভবিষ্যতে সৎ জীবন যাপন করুন।

অশ্রুজড়িত কণ্ঠে প্রবীণ মান্নাফ মীর বলল, আমাদের গায়ের চামড়া দিয়ে তোমার জুতা বানালেও ঋণ শোধ হবে না। আজ থেকে তুমি আমার বাবা, এই ছেলে তোমার নাতি। তাকে তোমার হাত তুলে দিলাম। চিরদিন তোমার খেদমত করবে।

চিরদিনই খেদমত করেছে বটে। বাপ-বেটা দু'জন মিলে জীবনপণ করে প্রতিটি নির্বাচনে আমার বিরুদ্ধাচরণ করেছে। শুনেছি, কুকুরের লেজ সারাদিন টেনে সোজা করে রাখলেও, ছেড়ে দিলেই তা আবার সঙ্গে সঙ্গে বাঁকা হয়ে যায়। আমি কখনও ওদের ক্ষতি করিনি। করার প্রয়াসও পাইনি। বরং মীর সাহেবের ঐ ছেলের এক ছেলেকে সার্টিফিকেট দিয়ে আমেরিকায় বসবাসের সুযোগ করে দিয়েছি।

আমার চিরসুহৃৎ শ্রীনগরের আমাদের সংগঠক এবং আমার সবক'টি নির্বাচনের প্রধান, বিশিষ্ট সমাজসেবক আব্দুল হাই সাহেবের সনির্বন্ধ অনুরোধে ওদের সাহায্য করেছিলাম। কৃতজ্ঞতাস্বরূপ প্রতিটি নির্বাচনে আরও দুর্বার হয়েছিল ওদের বিরোধিতা।

অনেক রাতে গ্রামে ফিরে মামাদের বাড়ি ঘুমালাম। নিজের বাড়ি নেই আমার। প্রত্যুষে ঢাক-ঢোল, কাঁসার ঘণ্টা আর উলুধ্বনিতে জেগে উঠে দেখি হুলস্থূল কাণ্ড। এলাকার সমস্ত হিন্দু নর-নারী আমাকে বরণ করে নিতে এসেছে। সে এক দেখার দৃশ্য। অগণিত নারী-পুরুষ ফুল, চন্দন, মালা, ফল, মিষ্টি নিয়ে উপস্থিত। জোর করে আমাকে আঙিনার একটি চৌকিতে বসিয়ে শুরু হল তাদের ভক্তি অপর্ণ আর শ্রদ্ধা নিবেদন। যেন প্রাণ ঢেলে দেবতার পূজা করছে। ভারতে আমার কর্ম-প্রবাহ এদেশের গণ্ড-গ্রামের মানুষকেও যে কতটা প্রভাবিত করেছিল তা বুঝতে পারলাম।

বিত্তশালী অনেক হিন্দু বাড়ির জিনিসপত্র লুট হয়েছিল সমাজবিরোধীদের হাতে। আমি তিন দিনের সময়সীমা বেঁধে দিলাম সবকিছু ফেরত দেওয়ার

জন্য। অন্যথায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করব বলে জানিয়ে দিলাম। ধমকে কাজ হল—তখন হত। বেঁধে দেওয়া সময়ের মধ্যেই প্রায় সব লুণ্ঠিত দ্রব্য ঘরে ঘরে ফেরত গেল। ক্ষতিগ্রস্তরা অনেক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করল। ষোলঘরের আবদুল্লাহ ভূইয়া, আমাদের অতি স্নেহভাজন, সে হারিয়ে গিয়েছিল যুদ্ধের প্রাঙ্গণে। সে ছিল আমার একনিষ্ঠ-কর্মী। তার শোকাতুরা মাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে নিজেই কান্নায় ভেঙে পড়ি। ফুলের মা আমাকে ছাড়লেন না। ফুলের পরিবর্তে আমাকে তিনি খাওয়াবেন। পুত্রহারা জননীর সনির্বন্ধ অনুরোধ ফেলতে পারলাম না।

দ্বিপ্রহরের আহার শেষ করে চলছি লৌহজং থানার পয়সা গ্রামে খ্যাতনামা আলেম মওলানা রফিউদ্দীন খান সাহেবের একান্ত ইচ্ছায় তাঁর ইসলামিক জনসভায় যোগ দিতে। আমার সুদীর্ঘকালের সহকর্মী অনুজপ্রতিম চেয়ারম্যান আবদুল কাদের এতদূর থেকে এসেছে আমাকে নিয়ে যেতে। পদব্রজ ছাড়া গতি নেই। পথে হরপারা গ্রামে মুক্তিযোদ্ধা শহীদের বৃদ্ধ মা দাঁড়িয়ে আছেন। বললেন, বাবা, তোমার জন্য একটু পায়েস করেছি। খেতে হবে।

স্নেহময়ী মায়ের আবদার উপেক্ষা করা কঠিন। বললাম, আমার সাথে তো একটা শোভাযাত্রা। এত লোককে আপ্যায়ন করবেন কীভাবে?

বললেন, আল্লাহ্ বরকত দেবেন। তুমি বাড়িতে উঠে এসো।

তা-ই করলাম। পায়েস খেয়ে, আয়েস করে আবার পথ চলার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। দীর্ঘ পথ হাঁটার জন্য বাজার থেকে কাপড়ের জুতা এনে ফিতা বাঁধছিলাম। ঠিক দরজার উপরেই আমার অবস্থান। নোয়াখালী জেলার এক মুক্তিযোদ্ধার সঙ্গে ছিল এসএলআর। তখনও অস্ত্র জমা দেওয়া হয়নি। এসএলআরটি প্রাঙ্গণে রেখে সে সেটিকে পরীক্ষা করছিল। কোথাও ম্যাগাজিনটি সেট করতে বোধহয় কোন ত্রুটি হয়ে থাকবে। এসএলআরটি দরজার দিকে মুখ করে খুট্ খুট্ করছিল। হঠাৎ কী হল—ম্যাগজিন থেকে সমানে গুলি বের হতে লাগল। আল্লাহ্র কি অসীম দয়া, আমার পায়ে সামান্য লাগল, যদিও আমারই ছিন্নভিন্ন হয়ে যাওয়ার কথা। ঘরভর্তি কর্মীরা প্রায় সকলেই আহত হল। কেউ কেউ গুরুতরভাবে। নিমিষে খবর ছড়িয়ে পড়ল। কেউ খবর পেল, মোয়াজ্জেম ভাইকে মেরে ফেলা হয়েছে। সেকী অবস্থা, হাজার হাজার নারী-পুরুষ দৌড়ে আসছে আর চিৎকার করছে! যেখানে যত ডাক্তার ছিল চলে এল। দায়িত্ব নিল মুক্তিযোদ্ধাদের একনিষ্ঠ চিকিৎসক ডা. আমানুর রহমান রতন। সে আমার খুবই স্নেহভাজন। সে শুনেছে আমি আর নেই। ডা. রতন কাঁদছে, হাতে ব্যাগ নিয়ে দৌড়চ্ছে আর আমার নাম নিয়ে আহাজারি করছে।

আমাকে জীবিত দেখে সে আশ্বস্ত হল, সকলের চিকিৎসার দায়িত্ব নিল। শহীদের বাড়ির প্রাঙ্গণ সাময়িক হাসপাতালে রূপান্তরিত হল। প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে গুরুতর ক'জনকে বিশেষ লঞ্চ করে ঢাকা প্রেরণ করলাম। অনেকে সুস্থ

হলেও মুক্তিযোদ্ধা গোলাম নবী আজও পঙ্গু হয়ে জীবন-যাপন করছে। সেই এসএলআরওয়ালাকে গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখে হয়ত মেরেই ফেলত। আমি হস্তক্ষেপ করলাম, ওর কোন দোষ নেই। ইচ্ছাকৃত কোন অপরাধ করেনি, তবে বোকামি করেছে যারপরনাই।

ওকে ছেড়ে দিলাম। পায়ে ধরে তার সেকী কান্না!

মনে হয়েছিল, পয়সায় যাওয়া হবে না। বেঁচে গিয়েছি, শুধু পায়ে একটু আঘাত। ডা. রতন ব্যান্ডেজ করে দিয়েছে—তবে এক সপ্তাহ হাঁটাহাঁটি বন্ধ। অগত্যা কাদের পালকি যোগাড় করে নিয়ে এল। এত বড় বিপদ থেকে আল্লাহ্ রক্ষা করেছেন তার জন্য শোকরিয়া আদায় করার মানসে পালকিতে করেই রওয়ানা হলাম পয়সা। অনর্থক কাপড়ের জুতা কেনা হল। পরের এক সপ্তাহ পালকি করেই সব অনুষ্ঠান সমাধা করলাম।

আমার আহত হবার খবর এবং পরে নিহত হয়েছি বলে পরস্পর-বিরোধী খবর ঢাকায় পৌঁছলে সকলে পাগলপ্রায় হয়ে উঠলেও আমার বড় দা শাহ্ আলম সাহেব দৃঢ়তার সাথে বলেছিলেন, এত বিপদ মাথায় নিয়ে ভারত থেকে সে ফিরে এসেছে, আমার মন বলছে, তার কিছু হবে না। আল্লাহ্ বারবার তাকে রক্ষা করেছেন, এবারও করবেন।

বড় দার মনোবলের কথা শুনে মুগ্ধ হই। তাঁর কথাই ঠিক হয়েছে। আল্লাহ তাঁর অসীম রহমত দিয়ে আর একবার রক্ষা করেছেন তাঁর এই অধম বান্দাকে।

বঙ্গবন্ধু ঢাকা এসেছিলেন স্বাধীন দেশের রাষ্ট্রপতি রূপে। অবশ্য দিন দু'য়েকের বেশি সে পদে থাকলেন না। শহীদ সোহরাওয়ার্দীর হাতে গড়া তিনি পার্লামেন্টারি পদ্ধতির সরকারে প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ তিনি অধিকতর বাঞ্ছনীয় মনে করলেন। প্রত্যাবর্তনের পরদিনই তিনি তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন সাহেবের বাসভবনে এক সভায় মিলিত হয়ে তাঁর পরিকল্পনার ইঙ্গিত করেন এবং পরের দিনই বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী লন্ডন থেকে দেশে ফিরে এলে তাঁকে রাষ্ট্রপতি বানিয়ে তিনি প্রধানমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত হন। আবু সাঈদ চৌধুরী সাহেব লণ্ডনে অবস্থান করে প্রবাসীদের সমন্বয়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে প্রভূত অবদান রাখেন। তাঁর নিয়োগে সর্বস্তরের মানুষ সন্তুষ্ট হল। তাজউদ্দীন সাহেবকে দেওয়া হল অর্থমন্ত্রীর দায়িত্বে।

বঙ্গবন্ধু দলীয় সরকারের প্রধান এবং দলেরও সভাপতি। সকল ক্ষমতার

কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হলেন তিনি। পার্লামেন্টারি পদ্ধতিই হোক আর দলীয় গণতান্ত্রিক সরকারই হোক, বাস্তব ক্ষেত্রে সবকিছু পরিচালিত হতে থাকল তাঁরই নির্দেশে এবং নেতৃত্বে। কার্যত একব্যক্তির শাসন-ব্যবস্থাই প্রবর্তিত হয়ে গেল। অবশ্য এতে কারো দ্বিমত ছিল না বা থাকারও কোন সুযোগ ছিল না। প্রিয় নেতা যা-ই করুন না কেন, সকলের মঙ্গল চিন্তা করেই করবেন। সবাই মিলে আমরা বড্ড বেশি ব্যক্তি-নির্ভর হয়ে পড়লাম!

বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগের সম্মেলন ডাকলেন নিউ বেইলী রোড কার্যালয় প্রাঙ্গণে। দেশে প্রত্যাবর্তনের পর সকল নেতা-কর্মীর সঙ্গে সেটাই তাঁর প্রথম সম্মেলন। লেখাপড়ার সঙ্গে সম্বন্ধ রাখি বলে অন্যদের সঙ্গে তিনি আমাকে ড্রাফট সাব-কমিটির সদস্য মনোনীত করলেন। মান্নান সাহেব, শামসুল হক সাহেব তাঁরাও রয়েছেন কমিটিতে। সম্মেলনের মূল প্রস্তাবসমূহ তৈরির জন্য সাব-কমিটির বৈঠক বসলে তাঁরা আমাকে দায়িত্ব দিলেন প্রাথমিকভাবে একটি খসড়া প্রস্তুত করার জন্য। সারারাত জেগে খসড়া প্রস্তুত করে সাব-কমিটির সভায় পেশ করলে একটি দাড়ি-কমাও পরিবর্তন না করে তাঁরা খসড়াটিকেই চূড়ান্ত বলে গ্রহণ করলেন। আমাকে অনেক ধন্যবাদ দিলেন তাঁদের পরিশ্রম লাঘব করার জন্য। নেতাকেও তারা কিছু বলে থাকবেন। তিনি আমাকেই প্রস্তাবসমূহ সম্মেলনে উত্থাপনের নির্দেশ দিলেন। তাঁর নির্দেশ পালিত হল। নেতার তরফ থেকে কর্মীদের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানিয়েও একটি ভিন্ন প্রস্তাব পেশ করা হল। তোফায়েল আহমেদ সেই প্রস্তাব উত্থাপন করে।

আমাদের জোহা ভাই, মানে বিক্রমপুরের মুক্তিযুদ্ধের সমন্বয়কারী জনাব শামসুজ্জোহা খান সম্মেলন থেকে বেরিয়ে আমাকে পাকড়াও করলেন। তিনি তাঁর স্বভাবসুলভ উচ্চহাস্য করে বললেন, তুমি শীঘ্রই কিছু একটা বনে যাবে।

বললাম, কী করে বুঝলেন?

তিনি প্রতিউত্তর করলেন, সবই বুঝা যায়। তোমাকে বঙ্গবন্ধু যেভাবে প্রজেক্ট করলেন, তাতেই সব বুঝতে পারছি।

তিনি খুব আনন্দ প্রকাশ করতে থাকলেন। খুবই মজার মানুষ জোহা ভাই। যেমন হাসতে পারেন, হাসাতে পারেন তারও বেশি। জোহা ভাইয়ের গাত্রবর্ণ কালো। তিনি বলেন, আমার গায়ের রঙ হচ্ছে খাঁটি ঘোর কৃষ্ণবর্ণ।

কালো মানুষও যে হৃদয়ের গুণে সুন্দর হয়ে ওঠে তা জোহা ভাইকে না জানলে বুঝা যাবে না। আমার জন্য তাঁর অন্তরে ছিল স্নেহের অফুরন্ত প্রস্রবণ।

জোহা ভাইকে নিয়ে সবচাইতে মজার ঘটনা হল, একবার ভাষা আন্দোলনের সময় প্রেস থেকে লিফলেট আনতে হবে। পুলিশের চোখ ফাঁকি দিয়ে রাত্রিবেলা তা সংগ্রহ করতে হবে। কেউ দায়িত্ব নিতে সম্মত হচ্ছিল না। জোহা ভাই এগিয়ে গেলেন এবং যথাসময়ে লিফলেটগুলো নিয়ে উপস্থিত হলেন। সকলেই জানতে চাইল, পুলিশের হাতে ধরা পড় নাই?

জোহা ভাই উত্তর করলেন, আমার গায়ের রঙটি দেখেছ? এর একটা সুবিধা আছে। আমি রিকশায় বসে থাকলেও দেখা যায় না। ওরা মনে করেছে খালি রিকশা এল আর গেল।

সকলের সম্মিলিত হাসির মধ্যে জোহা ভাইয়ের কণ্ঠস্বর প্রবল শোনা যাচ্ছিল। জোহা ভাইয়ের কথাই ঠিক হল। পরদিনই শেখ ফজলুল হক মণি এসে উপস্থিত। সে জানাল, বঙ্গবন্ধু আপনাকে যেতে বলছেন।

বললাম, তিনি টেলিফোনে ডাকলেই চলে যেতাম। তোকে আসতে হত না।

সে ছিল ছাত্রলীগের আমার সময়ের সাধারণ সম্পাদক। যতদিন বেঁচে ছিল আমাকে সবসময় জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতার মর্যাদা দিয়েছে আন্তরিকভাবে। সে সত্য কথাই প্রকাশ করল। বলল, মামা আমাকে উদ্দেশ্য নিয়েই পাঠিয়েছেন। তিনি চাচ্ছেন আপনাকে চিফ হুইপের দায়িত্ব দিতে। আপনাকে রাজি করাতেই আমার আগমন।

তাকে বললাম, মন্ত্রিসভায় নয় কেন? যাঁরা মন্ত্রিত্ব পেয়েছেন তাদের যোগ্যতা বা অবদান কী আমার চাইতে বেশি?

মণি বলল, আপনি নেতার সঙ্গে কথা বলুন।

বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করতেই তিনি উচ্চকণ্ঠে রসাত্মক স্বরে বলে উঠলেন, আসুন, আসুন চিফ হুইপ সাহেব।

তাঁকে বললাম, নেতা আমার কিন্তু দাবি ছিল বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রিপরিষদের সদস্য হওয়ার। যাঁরা এ পদ পেয়েছে তাঁদের চাইতে কোন অংশেই আমার অবদান বা যোগ্যতা কম নয়। দেশ আজ স্বাধীন হয়েছে। কিন্তু নিশ্চিত মৃত্যুভয় নিয়েও আপনার সঙ্গে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রাথমিক কর্মসূচিতে সেদিন আপনার এই কর্মীটিই ছিল। আজকের অনেকেই সেদিনের ঘটনা জানা দূরে থাক, কল্পনাও করতে পারত না।

তিনি চেয়ার থেকে উঠে এসে আমার কাঁধে সস্নেহে দুটি হাত রেখে হাসিমুখে বললেন, আমি কিছুই ভুলিনি। তোর সকল অবদানের কথাই আমার মনে আছে।

তারপর আমাকে বুঝাতে লাগলেন, দেখ, মন্ত্রী আমি ২৫/৩০ জনকে করতে পারি। কিন্তু একজন চিফ হুইপ করার লোক পাই না।

বললাম, যাকে দায়িত্ব দেবেন, সেই সুচারুরূপে এ কাজ করতে পারবে।

তিনি বললেন, না। তুই এমন একজনকে দেখা যে ইংরেজি-বাংলায় সমান দক্ষ, বলতে পারবে, লিখতে পারবে। দেশ-বিদেশে যেতে পারবে। দেশের প্রতিনিধিত্ব করতে পারবে।

মনে হল পরোক্ষ প্রশংসায় ভুলাচ্ছেন। আবার বললাম, লীডার, পদ মানুষকে তৈরি করে নেয়। আপনি যে কোন একজনকে দায়িত্ব দিলেই দেখবেন তার পক্ষেও সব সম্ভব।

তিনি গম্ভীর হলেন। বললেন, তুই না বলেছিলি আমার আদেশ মাথা পেতে নিবি?

বললাম, আজও তা বলি। কেবল নিবেদন করি আদেশ প্রদানের পূর্বে আর একবার পুনর্বিবেচনা করলে ভালো হয়!

তিনি বললেন, তুই চিফ হুইপের দায়িত্ব গ্রহণ কর। সবকিছু বিবেচনা করেই আমি এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি।

তাঁর আদেশ মাথা পেতে নিলাম। স্বাধীন দেশের প্রথম চিফ হুইপ হিসাবে আমার নিয়োগ চূড়ান্ত হয়ে গেল। পরদিনই বঙ্গবন্ধুর সই করা চিঠি চলে এল।

দু'জায়গায় অফিস ঠিক হল। সচিবালয়ে বঙ্গবন্ধু যেখানে বসেন তার সন্নিকটে এবং সংসদ ভবনে। গাড়ি, বাড়ি সব ব্যবস্থা হয়ে গেল। প্রধানমন্ত্রীর সচিব ছিলেন রফিকউল্লাহ চৌধুরী। ছাত্রজীবনে তিনি ছাত্রলীগের সভাপতি থাকার সময় আমি ছিলাম সাধারণ সম্পাদক। আমি চিফ হুইপ হওয়াতে তিনি মহাখুশি। তিনি আমাকে স্যার বলে সম্বোধন করা শুরু করলে আমিও পূর্ব সম্পর্ক ধরে তাঁকে ডাকতাম 'বস্' বলে। লোকজন না বুঝে অবাক হত। অত্যন্ত দক্ষ অফিসার ছিলেন তিনি। অল্প সময়ের মধ্যে আমার সব ব্যবস্থা সম্পন্ন হল। ২ নম্বর মিন্টো রোড বরাদ্দ হল আমার নামে।

দেশ স্বাধীন হয়েছে। নতুন পদে আসীন হয়েছি। মনভরা আশা আর উদ্দীপনা। অনেক কিছু করার আকাঙ্ক্ষা। মানুষের ভালোবাসার ঋণ শোধের বুঝি সময় এল। আনন্দে উৎফুল্ল মন নিয়ে মিন্টু রোডে গৃহপ্রবেশের আয়োজন করলাম। স্ত্রী-পুত্র, শালা-শালীসহ অনেক আত্মীয়স্বজন নিয়ে হাসিমুখে যখন গৃহে পা রাখতে যাচ্ছি, বড় দা এগিয়ে এলেন। তাঁকে কেবল শ্রদ্ধাই করি না, সারাজীবন তাঁকে ভালোবেসেছি অন্তর দিয়ে। আমি আজ যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, এর পেছনে দু'জন মানুষের অবদান খাটো করে দেখা যাবে না। বড় দা এবং ছোট মামা। এঁরাই আমাকে হাঁটি হাঁটি পা পা করে সম্মুখে এগিয়ে দিয়েছেন। মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াবার মন্ত্র এঁরাই শিখিয়েছেন। পাথেয় যোগাড় করেছেন আর সমস্ত জীবন আমার কারণে অনেক দুঃখ ভোগ করেছেন। বড় দা কেবল একজন দায়িত্ববান, স্নেহপরায়ণ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাই ছিলেন না, তাঁর সততা ছিল প্রশ্নাতীত। দারিদ্র্যকে স্বীকার করেছেন, কিন্তু সততা বিসর্জন দেননি। তিনি গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, গৃহে প্রবেশের পূর্বে আমার দুটি কথা শোন।

হাসিমুখে দাঁড়িয়ে জানালাম, বলুন।

তিনি বললেন, সরকারের বড় পদে আসীন হয়েছ, চিফ হুইপ হয়েছ। আমি যারপরনাই সন্তুষ্ট। কিন্তু কোন বদনাম যেন তোমাকে স্পর্শ না করে। এ বাড়িতে অসৎ পথে কোন উপার্জন যেন না ঢোকে। রানার মা, তুমি কি বলো?

সালেহা আরও এক হাত এগিয়ে। সে বলল, আমি এত বড় বাড়ি

চাইনি—আমাকে একটা টিনের ঘরে নিয়ে তুলুক সেও শ্রেয়, তবুও সৎ পথ থেকে যেন আপনার ভাই বিচ্যুত না হয়।

বড় দাকে বললাম, আপনার কথা কি জীবনে কোনদিন অমর্যাদা করেছি? আপনার দুশ্চিন্তার কারণ নেই।

তিনি বললেন, ভয় হয় আমাদের দেশে পূর্বে একজন হুইপ ছিল—লোকে এখন তাকে কোন্ চোখে দেখে তুমি জানো। আমাকে কেউ তোমার বড় ভাই বলে গালমন্দ করুক—এটা আমি চাই না। লোকের প্রশংসা শুনে অভ্যস্ত, নিন্দা শুনতে চাই না।

বললাম, আপনি দোয়া করুন। আপনার মুখ কালো করব না। আল্লাহ্ চাহে তো আপনার মুখ আরও উজ্জ্বল হবে আগামী দিনগুলোতে।

সবাই মিলে অনেক আনন্দের মাঝে মিন্টু রোডের গৃহে প্রবেশ করলাম। শুরু হল আর এক জীবন।

আরও তিন জন হুইপ নিযুক্ত করা হল। রিয়াজউদ্দীন আহমেদ ভোলা মিয়া, আবদুর রউফ এবং রাফিয়া আখতার ডলিকে হুইপ হিসাবে আমার সহকারীরূপে পেলাম। ভোলা ভাই বয়সে জ্যেষ্ঠ হলেও সেই থেকে আমাকে 'বস্' বলে ডাকেন, কোনদিন তার ব্যত্যয় হয়নি। বেশ কিছুদিন হুইপ হিসাবে দায়িত্ব পালনের পর তিনি আমাকে ধরলেন বঙ্গবন্ধুকে বুঝিয়ে তাঁকে প্রতিমন্ত্রী নিয়োগের জন্য। তাই করা হল। তিনি প্রতিমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিলে তাঁর স্থলে বর্তমানে ঢাকার মেয়র মোহাম্মদ হানিফকে হুইপ নিযুক্ত করা হয়। এসব অবশ্য বেশ পরের ঘটনা।

লক্ষ লক্ষ অস্ত্র ছড়িয়ে ছিল দেশব্যাপী। প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা বা ষোড়শ বাহিনী চেনা দুষ্কর। যুদ্ধ শেষ হয়েছে। এখন অস্ত্র জমা নেওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। সময় নির্ধারণ করে দেওয়া হল অস্ত্র জমা দেওয়ার জন্য। বিভিন্ন স্থানে আনুষ্ঠানিকভাবে অস্ত্রাদি প্রত্যর্পণ করা হল। বঙ্গবন্ধু স্বয়ং ঢাকা স্টেডিয়ামে অস্ত্র প্রত্যর্পণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের নিকট থেকে অস্ত্র ফেরত নিলেন। অনুরূপ একটি অনুষ্ঠানে টাঙ্গাইলের অমিততেজা মুক্তিযোদ্ধা কাদেরিয়া বাহিনীর অধিনায়ক কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বাধীন মুক্তিযোদ্ধাদের নিকট থেকে তিনি অস্ত্র গ্রহণ করলেন। সংগৃহীত অস্ত্রাদী অস্ত্রাগারে জমা পড়ল ঠিকই, কিন্তু দেশের অভ্যন্তরে জমা না দেওয়া অস্ত্রও রয়ে গেল প্রচুর। অস্ত্র তার ভাষায় কথা

বলবে এটাই স্বাভাবিক। অস্ত্রের অপব্যবহার বৃদ্ধি পেল। নৈতিকতাবিরোধী অপকর্মের সংখ্যা বাড়তে থাকল। একের পর এক দুর্ঘটনা ঘটতে থাকল। সমাজে তার বিরূপ প্রভাব পড়ল। শান্তি-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির হল ক্রম অবনতি। যে শান্তি শান্তি করে মানুষ অকাতরে প্রাণ বিসর্জন দিল, সেই শান্তিই সুদূর পরাহত হয়ে পড়ল।

এর ওপর এক নতুন সমস্যা অনুভূত হচ্ছিল। স্বাধীনতাযুদ্ধে ভারতীয় সেনাবাহিনীর অবদান ছিল অনস্বীকার্য। তাদের সময়োচিত অভিযানেই পাকিস্তানি বাহিনী সমূলে পর্যুদস্ত হয়। মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণ এবং খণ্ড খণ্ড সম্মুখ-সমরে ইতিমধ্যেই বিপর্যস্ত হানাদারদের উপর ভারতীয় নিয়মিত বাহিনীর সম্মিলিত আক্রমণ ছিল চূড়ান্ত। অচিরেই তারা পরাজয় মেনে আত্মসমর্পণ করে। ভারতের নীতি-নির্ধারক মহল এবং সৈন্যবাহিনীর নিকট বাংলাদেশের সরকার এবং জনগণ তাই কৃতজ্ঞতার ঋণে আবদ্ধ।

সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশে বাংলাদেশীরা কোনদিন কার্পণ্য করেনি। তার যেমন ভাষা আছে, সময় আছে, স্থান-কালও রয়েছে। সর্বক্ষণই কৃতজ্ঞতার কীর্তন চলবে এবং সেই সুবাদে নানা অবিমৃশ্যকারিতা নীরবে মেনে যেতে হবে এটাও একটি আত্মমর্যাদাশীল জাতির কাম্য হতে পারে না।

ভারতীয় বাহিনী তখন বাংলাদেশে অবস্থান করছে। স্বভাবতই জয়ের আনন্দে বিভোর বাংলাদেশীদের উচ্ছ্বাস এবং তার বহিঃপ্রকাশে বিভিন্ন ঘটনা ঘটা অসম্ভব নয়। স্থানীয় অবাঙালিদের যুদ্ধকালীন ভূমিকা ছিল ন্যক্কারজনক। এরাই ছিল তথাকথিত শান্তি বাহিনীর কর্তা। রাজাকার, আল-বদর বাহিনী সৃষ্টি করে অগণিত মানুষ নিধনের পর দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান বুদ্ধিজীবীদের হত্যার নীল নকশার প্রণেতাও ছিল এরা। হত্যা, নারী-নির্যাতন, অগ্নিসংযোগ, লুণ্ঠনে এরা ছিল অগ্রবর্তী। তাই সাবধানতা অবলম্বন করলেও প্রত্যাঘাতের ঘটনা কোথাও যে সংঘটিত হয়নি তা বলা যাবে না। কেউ আইন হাতে তুলে নিলে সরকার দেখবে—তার বিহিত হবে। এক্ষেত্রে তৃতীয় পক্ষের অনধিকার চর্চা সঠিক নয়।

প্রত্যক্ষ করা গেল, ভাষাগত কারণে অবাঙালিদের সঙ্গে ভারতীয় বাহিনীর যোগাযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিপদগ্রস্ত মানুষ বাঁচার জন্য যেমন খড়কুটা আঁকড়ে ধরে বিহারী হিসাবে চিহ্নিত অবাঙালিরা যোগাযোগকে ঘনিষ্ঠতা সম্প্রসারণে কার্পণ্য করল না। খানা-পিনা, উপঢৌকন এবং নানাবিধ আমোদ-প্রমোদের আয়োজন প্রতিনিয়তই চলছিল বলে শোনা যাচ্ছিল। সবই যে জনশ্রুতি তা নয়, কিছু কিছু ঘটনা প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছে শোনা গেল। সাধারণ সৈনিকরা জনগণের মানসিক প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে সচেতন ছিল না। তাদের কেউ কেউ নিজেদেরকে এ দেশের ত্রাতা হিসাবে গণ্য করত। প্রভূত ঘা-খাওয়া বাংলাদেশের মানুষ কিছুটা অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেও তখনই মুখ ফুটে প্রতিবাদ জানাতে ইতঃস্তত করছিল।

মিষ্টির দোকান মালিকগণের অধিকাংশই হিন্দু। অনেকের বাড়ি আমাদের বিক্রমপুরে। তারাও অভিযোগ করল—ওরা মিষ্টি খেয়ে যায়, নিয়ে যায়, মূল্য পরিশোধ করে না। প্রথম প্রথম ওরা সন্তুষ্ট চিত্তেই মিষ্টি-মুখ করাত। পরে এটা যেন কর্তব্যে পরিগণিত হল।

একদিন মিষ্টি ক্রয়ের জন্য ধানমন্ডির একটি বড় দোকানে ঢুকেছি। দোকান মালিক পরিচয় পেয়ে আগ্রহের সঙ্গে মিষ্টি পছন্দে আমাকে সহায়তা করতে এগিয়ে এল। কয়েকজন সশস্ত্র সৈনিক ঢুকল। বলাই বাহুল্য, তারা ভারতীয় বাহিনীর লোক। এসেই হুকুম করল, মিঠাই লাও, জলদি কর।

বেয়ারারা টেবিল গুছিয়ে প্রথমেই নিয়ম মাফিক পানি ভর্তি গ্লাস রাখল। তারা কেন যেন চড়া মেজাজে ছিল। হাত দিয়ে পানির গ্লাস উল্টে ফেলে দিয়ে হুঙ্কার ছাড়ল, পানি নেহি, মিঠাই মাংগতা।

কাঁচ ভাঙার আওয়াজে সকলেই সচকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করছিল। তারা আরও অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলে উঠল, কেয়া দেখতা, কভি সিপাহী নেহি দেখা কেয়া?

মালিক চুপিচুপি বলল, স্যার, এদের অত্যাচার প্রতিদিন আর সহ্য করা যায় না। একটা প্রতিবিধান করুন।

এতক্ষণে ভীত বেয়ারারা অনেক মিষ্টি টেবিলে পরিবেশন করেছে। ওরা সেগুলো উদরাগত করে যেভাবে এসেছিল, সেভাবে বেরিয়ে গেল। দাম দেওয়া দূরে থাকুক, কতকগুলো গ্লাস ভেঙে রেখে গেল। মনটা বিষণ্ন হয়ে গেল। মানুষের মন দ্রুত বদলায়। গুজব ছিল দেশ থেকে সোনা, রূপা, তামা, পীতল, মূল্যবান তৈজসপত্র, গাড়ি এবং বৈদ্যুতিক সরঞ্জাসমূহ বিপুলাকারে দ্রুত সীমান্তের ওপারে চলে যাচ্ছে। কোথাও কোন নিয়ন্ত্রণ নেই।

অপরাহ্নে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা হলে কথায় কথায় তাঁকে ঘটনাটি নিবেদন করলাম এবং জনশ্রুতিসমূহ শোনালাম। সব শুনে তাঁকে চিন্তাযুক্ত মনে হল। অনেকের নিকট থেকে বোধহয় তিনি অনুরূপ অভিযোগের সংবাদ পেয়েছেন।

উভয়সংকট। আমরা একটু বিচলিত ছিলাম। এত শীঘ্র ভারতীয় বাহিনীকে স্বদেশে ফেরত পাঠানো কোন সহজ কর্ম ছিল না। বাস্তবতা আছে, চক্ষুলজ্জাও আছে। সব কারণও সবসময় বিবৃত করা যায় না। কীভাবে এই কঠিন কাজটি তিনি সম্পন্ন করবেন বোধগম্য হচ্ছিল না।

কিন্তু তিনি কাজটি ঠিকই করে ফেললেন। একদিন সাড়ম্বরে ভারতীয় বাহিনী তাঁকে বিদায়ী সালাম জানিয়ে দেশে প্রত্যাবর্তন করল। এত শীঘ্র এ কাজটি সমাধা হবে আমরা আশা করিনি। হট লাইনের মাধ্যমে তিনি সরাসরি শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে কথা বলে ব্যবস্থাটি করেছেন, বুঝতে অসুবিধা হল না। শ্রীমতী গান্ধী বঙ্গবন্ধুর কোন অনুরোধ ফেলতে পারতেন না।

আমরা আনন্দিত হলাম। দেশের সাধারণ মানুষও স্বস্তি বোধ করল।

বিহারীরা যারপরনাই ক্ষুব্ধ হলেও তাদের করার কিছু ছিল না। তাদের অনেককে ততদিনে নিরাপদ জেনেভা ক্যাম্পে স্থানান্তর করা হয়েছে।

এমনি ঘটনা এর আগেও ঘটেছে এবং বঙ্গবন্ধু অতি সহজেই তা সমাধা করেছেন। অন্যের জন্য যা ছিল অনেক দুশ্চিন্তার বিষয়, তাঁর নিকট সেটি ছিল অনায়াসলব্ধ।

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে শ্রীমতী গান্ধী তাঁর ব্যক্তিগত সহকারি ঝানু কর্মকর্তা মি. ডি. পি. ধরকে বাংলাদেশে প্রেরণ করলেন সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশটির সরকারি কাঠামো গঠনে সহযোগিতা করার জন্য। তিনি এসেছেন কি করে গভর্নমেন্টের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা স্থাপন করা যায়; বিধি-বিধান কি প্রকার রচনা করলে ভালো হয়, কেন্দ্রীয় সরকার স্থাপনের বিভিন্ন পুঙ্খানুপুঙ্খ জটিলতা নিষ্পত্তিতে সহায়তা করার মানসে। বিষয়টি হয়ে দাঁড়াল স্পর্শকাতর। ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী যিনি এত কিছু করেছেন এবং যাঁর প্রত্যক্ষ সহায়তায় বাংলাদেশ আজ পৃথিবীর মানচিত্রে সগৌরবে বিদ্যমান; তিনি হয়ত সাহায্য করার মানসেই তাঁর দক্ষ রাজকর্মচারী মি. ধরকে প্রেরণ করেছেন। কিন্তু বাংলাদেশীদের মনোভাব কী হতে পারে? এটা কী অনাহুত এবং অহেতুক খবরদারি নয়? সাহায্য চেয়ে বার্তা প্রেরণ করা হয়নি! আমরা কী এতই অনভিজ্ঞ যে সরকারি শাসনযন্ত্র স্থাপনে সক্ষম নই! কেন্দ্রীয় সরকারের কার্যক্রমে অভিজ্ঞতা প্রচুর না থাকলেও একেবারেই অভিজ্ঞতাশূন্য তা বলা যাবে না। একদল সুশিক্ষিত দক্ষ কর্মচারীও রয়েছে—তারাও মি. ধরের আগমনকে বোধগম্য কারণেই সুদৃষ্টিতে দেখল না।

বিষয়টি নেতারও চিন্তায় প্রবেশ করল। আমরা কয়েকজন তাঁকে সমস্যাটি বললে তিনি সহজভাবে বললেন, তোরা ভাবছিস কেন, আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি।

ভাবলাম, কী করবেন তিনি, শ্রীমতী গান্ধীর প্রতিনিধিকে কী বলে তিনি ফেরত পাঠাবেন?

রফিকউল্লাহ চৌধুরীর নিকট শুনলাম, মি. ডি. পি. ধর বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত সমভিব্যাহারে আনুষ্ঠানিক সাক্ষাৎ করতে গেলে প্রথম রাতেই বিড়াল মারলেন। সৌজন্যমূলক আলাপ শেষ হতেই বঙ্গবন্ধু জিজ্ঞেস করে বসলেন, তারপর মি. ধর, কবে দিল্লী ফিরছেন? এসেছেন, কয়েকটা দিন আমাদের এখানে কাটান। বাংলাদেশ মাছের দেশ। এখানকার পদ্মার ইলিশ খুবই উপাদেয়। তার প্রিপারেশন কখনও উপভোগ করেছেন? কয়েকদিন থেকে মাছ-টাছ খান, তারপর যাবেন।

মি. ধর হতবাক, প্রথম দিনই তাঁকে যেতে বলা হচ্ছে, সরকারি কাজকর্মের কোন ইঙ্গিতও নেই। মাছ খাওয়ার পরামর্শ। তিনি সেদিনই কথা বললেন দিল্লীতে।

শ্রীমতী গান্ধী যা বুঝার বুঝলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে মি. ধরকে ঢাকা ত্যাগের

নির্দেশ দিলেন। বঙ্গবন্ধু ব্যতীত অন্য কারো পক্ষে এভাবে সরাসরি জবাব আর কেউ দিতে পারতেন বলে মনে হয় না।

স্বাধীনতার তেজ ছিল তাঁর মজ্জাগত। হ্যাঁ, প্রয়োজনে সাহায্য নিয়েছি। সে কথা কৃতজ্ঞচিত্তে সর্বদা স্বীকার করব। তাই বলে, তাঁর ভাষায়, 'আমরা কারো মাথা তামাক খাই না।' কেউ অহেতুক অভিভাবক হয়ে দাঁড়াবে এটা তাঁর বাঞ্ছনীয় নয়। সব কাজকর্মে দাদাদেরকে জিজ্ঞেস করতে হবে এটাও তাঁর মনঃপূত নয়।

তাঁর দেশ শাসন প্রণালী অনেকেই সুষ্ঠু মনে করেনি। গোষ্ঠী প্রধানের মতো হৃদয়-চালিত হয়ে তিনি দেশ শাসনের প্রয়াস পেয়েছিলেন। মস্তিষ্কের চাইতে হৃদয়ের প্রভাবই কাজ করেছে অধিকতর। কিন্তু একটি বিষয়ে মতান্তর ছিল না যে, তিনি একজন সত্যিকারের স্বাধীনতচেতা মানুষ ছিলেন এবং যত বড় বন্ধুই হোক ভিনদেশের অছিগিরি তাঁর অত্যন্ত অপছন্দনীয় ছিল।

বিষয়টি প্রকট হয়ে উঠল, যখন পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে মুসলিম দেশসমূহের সম্মেলনে আহুত হয়ে বঙ্গবন্ধুর সেখানে যোগদানের প্রশ্ন উঠল। তিনি অভিমত প্রকাশ করলেন, তাঁর যোগদান সমীচীন।

সরকারের একটি অংশ দ্বিমত পোষণ করল। তাজউদ্দীন সাহেব, সামাদ সাহেব, ড. কামাল হোসেন প্রমুখ ইসলামিক সম্মেলনে যোগদানকে সমর্থন করতে পারলেন না। এ সম্বন্ধে সিদ্ধান্তের জন্য সেদিন সন্ধ্যার পর তদানীন্তন গণভবনে নেতৃবৃন্দের বৈঠক বসল। ক্যাবিনেট সভায় আমার থাকার প্রশ্ন আসে না। সেটা আনুষ্ঠানিক মন্ত্রিসভার বৈঠক ছিল না। তবুও মন্ত্রিসভার প্রায় সকলেই উপস্থিত ছিলেন। দ্বিতলে আমি সিঁড়ির প্রান্তে দাঁড়িয়ে ছিলাম বঙ্গবন্ধুকে বলার জন্য, আপনার অবশ্যই যাওয়া উচিত।

তিনি আমার কথা শুনলেন এবং আমাকে হাত ধরে টেনে নিয়ে বৈঠকে উপস্থিত হলেন।

সভায় উভয় পক্ষ থেকে প্রচুর যুক্তি-তর্ক প্রদর্শন করা হল। এক পক্ষের মূল বক্তব্য ছিল আমরা ইসলামিক দেশ নই—আমরা ধর্মনিরপেক্ষ একটি দেশ। সুতরাং ইসলামিক দেশসমূহের সম্মেলনে যোগ দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। অন্যদিকে অধিকাংশের মত, নামে ইসলামিক দেশ না হলেও এ দেশের শতকরা নব্বই জন মুসলমান এবং পৃথিবীতে আমরা দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র। মুসলমানদের রাষ্ট্রসমূহের সম্মেলনে যোগদান না করা এ দেশের অধিকাংশ জনগোষ্ঠীর ধর্মানুভূতির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনেরই নামান্তর। এ কাজ করলে আমাদের অনেক খেসারত দিতে হতে পারে।

বঙ্গবন্ধু নিজেও এই অভিমত পোষণ করতেন। কাজেই একে সমর্থন করতে কোন দ্বিধা থাকার কথা নয়। অবশ্য অনেকেই আন্তরিকভাবেই চাচ্ছিলেন, দুনিয়ার সমস্ত মুসলিম দেশসমূহের সঙ্গে আমাদের সুসম্পর্ক স্থাপিত হোক।

অধিকাংশের অভিমত যখন গৃহীত হতে যাচ্ছে, তখন আপস ফর্মূলা হিসাবে একটি প্রস্তাব এল ওদের তরফ থেকে। ঠিক আছে, যেতে চান, যান, কিন্তু যাত্রাপথে দিল্লীতে নেমে ওদের সঙ্গে একটু কথা বলে গেলে সবদিক রক্ষা হয়।

বঙ্গবন্ধু টেবিল চাপড়িয়ে রীতিমতো ক্রুদ্ধ কণ্ঠে চিৎকার করে উঠলেন, আমি কারো মাথা তামাক খাই যে আমাকে মাঝপথে নেমে কারো মত নিতে হবে? তোমরা ভেবেছ কী? আমাদের স্বাধীন সার্বভৌম দেশ। কী করব, না করব আমরাই সাব্যস্ত করব। কাউকে ট্যাক্স দিয়ে চলার জন্য দেশ স্বাধীন হয়নি। পিন্ডির গুহা থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে আমরা দিল্লীর গর্তে ঢুকব—আমার জীবদ্দশায় তা হবে না। তোমরা যে যা মনে কর, আমি ইসলামাবাদ যাব এবং সরাসরি যাব—দিল্লী থামব না।

এ না হলে নেতা! কেউ আর উচ্চবাচ্য করতে সাহসী হল না। বঙ্গবন্ধুর অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতির মধ্যেও তাঁর তীব্র স্বকীয়তার জন্য এবং এ পরনির্ভরহীনতা আমাকে সবচাইতে আকৃষ্ট করত। দোষে-গুণেই মানুষ। কিন্তু এমন এক একটি গুণ থাকে যার জন্য শত দোষও খণ্ডিত হতে পারে।

ঘটনাগুলো ক্রমানুসারে উল্লেখ করা আজ সম্ভব নয়। পূর্বেই নিবেদন করেছি, ইতিহাস লেখার কোন মানসিকতা আমার নেই, তার যোগ্যতাও রাখি না। অত্যন্ত নিকট থেকে জীবনকে যেভাবে দেখেছি, মানুষের সংগ্রামের ধারা যেভাবে আমার দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে, সেভাবেই নিবদ্ধ করে যাচ্ছি। প্রতিটি বিষয়ে ভিন্নমত পোষণের অধিকার অন্যের যতখানি আছে, নিজস্ব মতকে স্বোচ্চারে প্রকাশ করার অধিকারও আমার ততখানি রয়েছে। ভালো-মন্দের বিচারের জন্য নয়, অহেতুক নিজের ঢাক পেটাবার জন্য নয়—যা ঘটেছে এবং যেভাবে ঘটেছে তা তুলে ধরা যে নৈতিক দায়িত্ব! আগামী প্রজন্মের একজনও যদি সঠিক চিত্রটিকে মূল্যায়ন করে, তা হলে আজকের কাজ সার্থক হবে—নয় তো সবই নিরর্থক, কেবলই পণ্ডশ্রম।

এর মাঝে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামি স্টুয়ার্ট মুজিবকে কে বা কারা হত্যা করল। সে ছিল আগামীদিনের সম্ভাবনাময় এক উজ্জ্বল তরুণ। আবদুর রাজ্জাকের এলাকায় ছিল তার নিবাস। লোকে তাঁর হত্যাকাণ্ড নিয়ে অনেক জল্পনা-কল্পনাই করল। তবে একথা অনাস্বীকার্য, অনেকেই মনে করত কারো রাজনৈতিক উচ্চাভিলাসের ফলেই সে নিহত হল।

অনেক সাধের এই স্বাধীন দেশ রূপায়ণে ত্যাগ-তিতিক্ষা ছিল অসাধারণ। মানুষের প্রত্যাশাও ছিল বৃহৎ। আমরাই বক্তৃতা-বিবৃতিতে অনেক অনেক আশার বাণী শুনিয়েছি। ওরা চমৎকৃত হয়েছে। স্বাধীনতার জুড়ি-গাড়ি চড়ে সুখ আসবে, শান্তি আসবে, আসবে মোটা ভাত আর কাপড়। পশ্চিমা বর্গীরা আর সব লুটে নেবে না। আমরা হব স্বনির্ভর। মানুষ আশান্বিত হয়ে উঠত। সেই স্বাধীনতার জন্য অকাতরে প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জনে তারা প্রস্তুত। বস্তুত হলও তা-ই। লাখো প্রাণের বিনিময়েই আজকের মানচিত্র আর পতাকাটির প্রাপ্তি ঘটল। কিন্তু শুধু পতাকা বদলের কথা ছিল না, ভাগ্য বদলের কথাও ছিল।

ক্ষিপ্ত কবি লিখলেন, "ভাত দে হারামজাদা, আমি কি মানচিত্র খাব?"

আমরা রাগান্বিত হলাম, তাঁকে শাস্তি দেবার প্রয়াস পেলাম। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই দেখা যাবে, মানুষের মনের মণিকোঠায় এই দাবিই স্বোচ্চার হয়ে উঠছে। ভাষার হেরফের হতে পারে। কিন্তু বক্তব্যে কোন প্রভেদ নেই।

নেতা বললেন, আমি তিন বছর কিছু দিতে পারব না।

ভালো কথা, সকলে মিলে যদি তিন বছর কিছু না নিতাম, তা হলে একথা বলা শোভা পেত। কিন্তু আমরা তো পেলাম এবং নিলাম। কেবল দিলাম না। এটা কী করে হয়? এক যাত্রায় দু'ফল মেনে নেওয়া কষ্টকর।

আমার এলাকায় ভাগ্যকুল একটা বর্ধিষ্ণু জায়গা, একসময় রাজা শ্রীনাথ রায়, রাজা যদুনাথ রায় প্রমুখ রাজা খেতাবধারী ধনকুবেরদের প্রাসাদোপম বাড়ি ছিল। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তাঁরা দেশ ত্যাগ করেন। তাঁদের পরিত্যক্ত একটি বাড়িতে আমরা এতিমখানা প্রতিষ্ঠা করেছিলাম। বিষয়টি উল্লেখ হল এই জন্য যে, অবস্থাটা বিবেচনীয়। একসময় যেখানে রাজপরিবারের সদস্য-সদস্যারা বসবাস করতেন, সেখানে এখন বসবাস করে পিতৃ-মাতৃহীন এতিমরা।

বৃটিশ রাজত্বের অবসান হল, রাজারা স্থায়ীভাবে চলে গেলেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হল—রাজপ্রাসাদের কড়িকাঠ নিয়ে মুসলমানরা কাড়াকাড়ি করল, ঝগড়া-ফ্যাসাদ করল। বাংলাদেশ হল—ভাঙা প্রাসাদে এতিমখানা হল।

সারাটা জনপদের দৃশ্যই কী এক নয়? ভাগ্যকুলের কথা বলছিলাম। সেখানে ওয়াপদার অফিস রয়েছে। রয়েছে তাদের সুসজ্জিত বাংলো। বরফের কল ছিল—পাকিস্তান আমলে সচল, এখন সম্পূর্ণ অচল। কীর্তিনাশা পদ্মার ভাঙনে প্রভূত ক্ষতিগ্রস্ত ভাগ্যকুলে বিরাট বাজার, ছেলে-মেয়েদের স্কুল, মাদ্রাসা, জনকল্যাণ অফিস, পোস্টঅফিস, স্বাস্থ্যকেন্দ্র সবই রয়েছে। এক কথায় গ্রাম হয়েও ভাগ্যকুল পিছিয়ে নেই।

সেই ভাগ্যকুলে আমাকে ছাত্রজীবন থেকেই অনেক অনুষ্ঠানে যেতে হত। পাকিস্তান আমলে সভাসমূহে মোটামুটি ভালো কাপড়-চোপড় পরেই জনগণকে দেখতে পেতাম। ওখানে নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু প্রচুর ছিল। জেলের সংখ্যা ছিল অধিকতর। অনেক ঘোষ পরিবারও ছিল। সকলের চেহারাতেই চাকচিক্য লক্ষ্য

করা যেত। তারা মাছ দিয়ে, দুধ দিয়ে পেট পুরে ভাত খেত। চুলে সরিষার তৈল মেখে মসৃণ করে বিন্যাস করত। আমি তখন বর্ষায় নৌকায় চড়ে আর খরার মৌসুমে পায়ে হেঁটে সেখানে যেতাম। যুদ্ধের প্রারম্ভে যখন যাই, তাদের চাকচিক্য কমে এসেছে। কষ্ট করে সংসার চালাচ্ছে। অনেকেরই শরীরের ঊর্ধ্বাংশ বস্ত্রহীন।

আমার কিন্তু তখন অনেক প্রতাপ। লোকগুলোর প্রতিনিধি আমি। আমার অবস্থা কেন মন্দ হবে? ওদের অবস্থার জন্য নিশ্চয়ই ওরা দায়ী। চিন্তার কারণ নেই, অবস্থার পরিবর্তন আসন্ন। স্বাধীনতা এল বলে। বুঝাই, স্বাধীনতার জন্য আরও ত্যাগের প্রয়োজন। ওদের শরীরের ঊর্ধ্বাংশে কিছু নেই। ত্যাগ করতে হলে যে, নিম্নাংশের বস্ত্রটুকই দিতে হয়। তা হলে সর্বত্যাগী দিগম্বর অবতার রূপে আবির্ভূত হতে হয়! নিজের অবস্থা আমার পূর্বের চাইতে অনেক ভালো। জোর গলায় ত্যাগের বক্তৃতা করে ওয়াপদার বাংলোয় গিয়ে বিশ্রাম করি, আহার সারি। কর্মী আমার অনেক। আরাম-আয়াসের ত্রুটি হয় না।

স্বাধীনতার পর ফিরে এলাম। তারা খালি গায়েই ফুলের মালা-চন্দন হাতে নিয়ে দৌড়ে এল। তাদের সোনামাণিক ফিরে এসেছে। সঙ্গে নিয়ে এসেছে স্বাধীনতা। আর চিন্তা নেই। সবকিছু পূর্ববৎ—না পূর্বের চাইতেও উৎকৃষ্ট হবে। সোনামাণিকের জয় হোক।

ওজস্বিনী ভাষায় তাদের স্বাধীনতার মর্ম বুঝালাম। তাদের ঘরবাড়ি জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়েছে। কুছ্ পরোয়া নেই। দেশকে স্বাধীন করতে হলে এসব সামান্য বিষয় নিয়ে আহাজারি করা ঠিক না। তাদের অনেক মানুষ নিহত হয়েছে—আহ্! তাতে কী হয়েছে। একটা দেশের আজাদীর জন্য কিছু মানুষকে প্রাণ দিতেই হবে। এখন দেশ গড়তে হবে—দেশের জন্য তোমাদের আরও পরিশ্রম করতে হবে। উৎপাদন বাড়াতে হবে। দেশমাতৃকার জন্য তোমাদের স্বার্থ ত্যাগ করতে হবে।

তাদের পেটে ভাত নেই। অন্তত দু'বেলার ভাত নেই। ঘরবাড়ি ভস্মীভূত, কর্মের সংস্থান নেই—তিন বছর তোমাদের কিছু দিতে পারব না। তোমরাই দাও। দেশের জন্য তোমাদের আরও দান চাই।

ভাগ্যকুল! ভাগ্যের এই কূলে বারবার গিয়েছি। চিফ হুইপ হওয়ার পর আর এক দফা সম্বর্ধনা। লোকেরা কত না আনন্দিত। মালা হাতে মেয়েরা নেচে-নেচে গান গাইল, 'মোদের প্রাণে আস হে অতিথি।'

তাদের ভোটে নির্বাচিত হয়ে এখন তাদেরই অতিথি, প্রধান অতিথি। মালায় মালায় গলা ভরে যায়। শূন্য করে ফের গলা বাড়িয়ে দিই—মালা যে আসছেই! কত না উপহার! রূপার নৌকা!

সামনে হাঁটু বের করে বসে আছে, ওরা কারা? আমার প্রিয় ভাগ্যকুলের হতভাগ্যরা। ওরা সাধারণ মানুষ। গায়ে এখন খড়ি উঠছে। পেট-পিঠ এক হয়ে

যাচ্ছে। খাদ্য নেই, বস্ত্র নেই, কর্ম নেই, শিক্ষা নেই। আবারও অগ্নিঝরা বক্তৃতা করলাম। নতুন দেশকে গড়তে হলে তোমাদের আরও ত্যাগ করতে হবে।

মলমূত্র ছাড়া আর কিছু ওদের ত্যাগের রয়েছে বলে মনে হল না। আমি কিন্তু আরও ভালো আছি। পোশাক আমার ধবধবে, সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি ও কালো মুজিব কোট। কাঁধে ঝুলছে মূল্যবান শুভ্র পশমি কাশ্মিরী শাল। সরকারি লঞ্চে রয়েছে প্রচুর খানা-পিনার ব্যবস্থা। বিশ্রামের জন্য আছে দুগ্ধফেননিভ শয্যা। আছে হুকুম-বরদার বেয়ারা-চাপরাশি। দুশ্চিন্তায় ঘন ঘন দামি বিদেশী সিগারেট টানছি। উৎকৃষ্ট কফি পান করছি। রাতে আমার কর্মীরা বিশাল ভোজের আয়োজন করল ওয়াপদা বাংলোয়। আজ সেটি সুন্দর করে সজ্জিত। ঢাকা থেকে কর্মকর্তা এসেছে তদারকি করতে; চিফ হুইপ সাহেবের যেন কোন কষ্ট না হয়।

খাওয়ার পর গান-বাজনার ব্যবস্থা, তারা ঢাকা থেকে নামী-দামী শিল্পী নিয়ে এসেছে। আজ যে তাদের আনন্দের দিন। তাদের সোনামাণিকের আগমন উপলক্ষে ভাগ্যকুল জেগে উঠেছে।

সবই ঠিক ছিল, কেবল সাধারণ মানুষগুলোর খড়ি ওঠা শীর্ণ দেহ এবং ছিন্ন বস্ত্রের বিদঘুটে দৃশ্যটা কেন যে বারবার চোখে ভেসে ওঠে! ছবিটাকে অদৃশ্য করে দেওয়া যায় না? বারবার নিজের অজান্তেই অন্তরে প্রশ্ন জাগছে। ভাগ্যকুলের ভাগ্য বা কূলের ভাগ্য ফেরাবার কী কোন পন্থা নেই! স্বাধীনতা, তুমি কী নিয়ে এলে ওদের জন্য! আমি তো পেয়েছি অনেক—কিন্তু ওরা? ওরা কী পেল? দুশ্চিন্তার তাড়নাতেই ঘুম এসে গেল। সুখে নিন্দা যাওয়া যাক। বাইরে সদা-জাগ্রত খাকি পোশাকের প্রহরী রয়েছে। ঘুমোও ভাগ্যের বরপুত্র। তুমি ঘুমোও।

ভাগ্যকুলের ভাগ্য নিয়ে কাব্য করতে চাইনি। দৃষ্টান্ত সর্বদাই বর্ণনার চাইতে শ্রেয়। সমগ্র দেশের অবস্থা প্রায় একই। সামান্য হেরফের হতে পারে—মূলত কোন পার্থক্য নেই।

স্বাধীনতার সুফল কেউ পেল না। তা সঠিক নয়। আমাদের সন্তানেরা পূর্বে বিদেশে যাবার সুযোগ পেত না। এখন তাদের জন্য সারা বিশ্বের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে গেল। ঘরকুনো বলে নিন্দিত বাংলার ছেলেরা নিজেদের বদনাম ঢেকে দিল। কেবল মধ্যপ্রাচ্যেই নয়, ইউরোপ, আমেরিকা, এ প্রান্তের জাপান, কোরিয়া, মালয়েশিয়ায় তারা কর্মসংস্থানে ছড়িয়ে পড়ল। অর্থ উপার্জন করে মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা প্রেরণ করল।

স্বাধীনতার কারণে চাকরিজীবীগণ প্রভূত উপকৃত হল। যার বড় দারোগা হওয়া ছিল দুরূহ, সে এসপি হয়ে গেল। প্রমোশন চাই, ডাবল প্রমোশন হলে আরও ভালো হয়। সর্বত্র একই ধ্বনি।

ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের এক অংশ ফুলে-ফেঁপে উঠল। যে ছিল ছোট্ট একটি

দোকানঘরের মালিক, সে বনে গেল মার্কেটের অধিপতি। অবাঙালিদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, ঘরবাড়ি, গাড়ি, মিল, কল-কারখানা দ্রুত হস্তান্তরিত হল। সুযোগ সন্ধানীদের আঙুল ফুলে কলাগাছ। স্বাধীনতা না এলে আমার মতো অনেকেই পুরনো ঢাকায় একটি পুরাতন বাড়ি ক্রয় করে বা ভাড়ায় থেকে জীবন কাটিয়ে দিত। আজ আমাদের নিজস্ব বাড়ি হয়েছে গুলশান, বনানী আর ধানমন্ডির অভিজাত এলাকায়। নিশ্চয়ই স্বাধীনতা আমাদের মতো ভাগ্যবানদের জন্য অনেক আশীর্বাদ বয়ে এনেছে। কিন্তু ভাগ্যকুলের সাধারণ মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন এল না। একই চিত্র সর্বত্র। তাদের সামাজিক এবং অর্থনেতিক মেরুদণ্ড যে ভেঙে পড়েছে!

একটি জাতির উন্নয়নের জন্য চাই দ্রুত শিক্ষা-প্রসার; যোগাযোগ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ এবং বিদ্যুতায়ন। Education, Communication and Electrification—এ তিনটি বিভাগে উৎকর্ষ সাধিত হলে, জনগণই নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তন করে নেয়।

শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ কোন উদ্যোগ পরিলক্ষিত হল না। কিছু নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়াস নেওয়া হল। সংসদ প্রশ্নোত্তর পর্বে জানা গেল সারা দেশে যতগুলো বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে, শিক্ষামন্ত্রীর নিজ জেলায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে প্রায় তার সমতুল্য। আন্দোলনের মুখে শিক্ষকদের বেতন-ভাতা বৃদ্ধি হল—কিন্তু কর্মক্ষেত্রে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করা গেল না। শিক্ষায়তনগুলোর দৈন্যদশায় সম্পূর্ণ ব্যবস্থাটি উপহাসেরই নামান্তর।

যানবাহন বাড়তে থাকল জ্যামিতিক হারে। কিন্তু কোন নতুন রাস্তা, কোন বাইপাস্, সেতু নির্মাণের তাগিদ অনুভূত হল না। পুরনো অপ্রশস্ত রাস্তাসমূহও মেরামতের উদ্যোগের অভাব পরিলক্ষিত হল। অবশ্য প্রভাবশালীদের প্রমোশন আর গাড়ি-বাড়ির দৈন্য রইল না।

শহরগুলোতে রাত্রিবেলা টিমটিম করে বিদ্যুতের বাতি জ্বললেও গোটা দেশ ছিল অন্ধকারে নিমজ্জিত। দ্রুত বিদ্যুতায়নের জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক উদ্যোগ ছিল সুদূরপরাহত। অন্ধকারই আমাদের কাম্য। আলো, আরও আলো এলে আমাদের সব কালো ধরা পড়ে যাবে।

নতুন জাতি হিসাবে যে উদ্যোগ এবং কর্মযজ্ঞ প্রত্যাশা করা গিয়েছিল তার কোন লক্ষণ নেই। গতানুগতিকার মাঝে মানুষের যা-ই হোক, আমরা আমাদের

ভাগ্যকে গড়ে নিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আমরা যুদ্ধ করেছি নতুন দেশ গড়ব বলে। আমরাই তো দেশ। অচিরেই জোর শ্লোগান বের করলাম, "এক নেতা, এক দেশ—বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ।"

একজন মানুষকে ক্ষতি করতে চাইলে তাকে অহরহ অসত্য খোসামোদ করতে হবে—তার ভুলভ্রান্তিকে অভ্রান্ত, অখণ্ডনীয় বলে প্রতীয়মান করতে হবে। তার কোন দুর্বলতা থেকে থাকলে সেটিকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে তুলতে হবে। স্বাধীনতার পূর্বের একটি ছোট ঘটনা। আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয় তখন সালেহার পিতামহের ১৫ নম্বর পুরানা পল্টনে ছিল। আমাদের তখনও বিয়ে হয়নি। একদিন সন্ধ্যার পর পার্টি অফিসে নানা বিষয়ে কথাবার্তা হচ্ছে। কি মনে করে আমি বঙ্গবন্ধুকে বললাম, 'মুজিব ভাই, শীঘ্রই এমন দিন আসবে যখন আপনাকে প্রতিনিয়ত দেশী-বিদেশী সাংবাদিক এবং বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে। আপনাকে ইংরেজি পত্রপত্রিকা, বিশেষ করে টাইমস, লাইফ এবং রিডার্স ডাইজেস্ট অধিকতর পড়তে হবে। তা হলে তথ্য এবং ভাষা দু'য়েই প্রভূত উপকৃত হবেন।

নেতাকে ভালো মনে করেই সৎ পরামর্শটি দেওয়ার প্রয়াস পেয়েছিলাম। তাজউদ্দীন সাহেব প্রতিবাদ করে উঠলেন, মাও-সে-তুঙ কী ইংরেজি বলে? মুজিব ভাইকেও ইংরেজিতে অধিকতর ব্যুৎপত্তি লাভ করতে হবে এমন কোন কথা নেই। মুজিব ভাই ইংরেজি ভালোই জানেন।

এক ঢিলে দুই পাখি মারা হল। নেতাকে বানানো হল মাও-সে-তুঙ। আর আমাকে দেওয়া হল নেতাকে অপ্রয়োজনীয় উপদেশ দানের এবং তাঁর ইংরেজি স্বল্পতার ইঙ্গিত করার ধৃষ্টতার সমুচিত জবাব।

অন্য কেউ হলে হয়ত আমার প্রস্তাবটি ভেবে দেখার আশ্বাস দিত বা তাৎক্ষণিকভাবে সহাস্যে মেনে নিত। অথবা জানাত, তিনি সেসব পত্রপত্রিকা পড়েন। আমার নির্দোষ পরামর্শটি কেবল মাঠেই মারা গেল তা-ই নয়, আমারও ধৃষ্টতার কারণে তথৈবচ অবস্থা। আর একজন আরও একধাপ এগিয়ে গেল বিশুদ্ধ তোয়াজ প্রয়োগের মাধ্যমে। আর্ট জানা থাকা চাই। কখন, কোথায়, কীভাবে তা প্রয়োগ করলে সমধিক ফল পাওয়া যায় বা যায় না, তা না জেনে যত্রতত্র পরামর্শ দিয়ে বেড়ালে তার ফল ভোগ করতে হবে বৈকি!

তিনি যা বলবেন তাকেই নির্বিচারে সমর্থন করা মজ্জাগত হয়ে দাঁড়াল। তিনি যদি বলেন, আজ সূর্য পশ্চিমে উদয় হয়েছে—সবাই একবাক্যে বলে ওঠবেন, আরে তাই তো! কী আশ্চর্য! আমরা কেউ খেয়াল করিনি! সত্যিই তো, সূর্য আজ পশ্চিম প্রান্তে উদিত হয়েছে। আহা! নেতা যদি সময় মতো সত্যটি উদ্‌ঘাটন না করে দিতেন তা হলে আমাদের কী হত?

আমিও ওদেরই একজন। আমাকেও চাকরির স্বার্থে সময়োচিত অবশ্য কর্তব্যটি করতে হয়। তবুও হয়ত ক্ষীণকণ্ঠে, ঠিক প্রতিবাদ নয়, সংশোধনের

মতো করে প্রচুর তৈল নিষিক্তে মোলায়েম বাক্যে বলার চেষ্টা করতাম, নেতা ভুল দেখতে পারেন না। তিনি ঠিকই দেখেছেন। তবে আমার মনে হয়, সূর্যটি তিনি হয়ত দ্বিপ্রহরে দেখছেন, তাই একটু বিভ্রান্তি হলেও হতে পারে। নেতা কী আর একবার স্মরণ করে দেখবেন এবং পুনর্বিবেচনা করে বলবেন যে, সূর্য প্রতিদিনের মতো আজও পূর্ব দিগন্তেই উদয় হয়েছে!

হিতাহিত জ্ঞান সকলের সমান হয় না। কাণ্ডজ্ঞানও জনে জনে ওঠা-নামা করে। না হলে আমার কেন মতিভ্রম হয়েছিল? দেশে প্রত্যাবর্তনের পর পরই বড় মন নিয়ে তাঁকে বলতে গিয়েছিলাম, নেতা, আপনি সরকারে না গেলেই ভালো হয়। মহাত্মা গান্ধীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে, ভুদান যজ্ঞের প্রবক্তা বিনোবা ভাবেজী'র আদর্শকে সম্মুখে রেখে আপনি যদি দেশ গড়ায় আত্মনিয়োগ করেন, তা হবে সর্বোত্তম কাজ। এখানে সেতু করতে হবে, আপনি কাজটি শুরু করলেন। ওখানে রাস্তা তৈরি করতে হবে, কোদাল হাতে নিয়ে সর্বাগ্রে নিজেই নেমে পড়লেন, দেখবেন সমগ্র জাতি আপনার পশ্চাতে দণ্ডায়মান। আপনি যেখানে যাবেন, জনস্রোত বইবে, যেন হ্যামিলনের বংশীবাদকের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। আপনার মনোনীতরা সরকার চালাবে, ওরা তো মুক্তিযুদ্ধ ভালোই চালিয়েছিল। সমস্ত দিনের পরে সরকারের কর্তাব্যক্তিরা আপনার পদতলে বসে আগামী দিনের কর্মের নির্দেশ নেবে। আপনি হবেন জাতির পিতা, জাতির বন্ধু এবং পথপ্রদর্শক। সরকার প্রধান নয়, আপনি হবেন সরকারের সরকার, নেতাদের নেতা।

কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করলেও তার অন্তর্নিহিত সুরটি হৃদয়ঙ্গম করলেন না, তাতে মনোনিবেশ করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলেন না।

নির্বাচন হয়েছিল পাকিস্তান আমলে। সেই প্রতিনিধিদের দ্বারাই বাংলাদেশেও কাজ চালাতে হল। এমএলএ এবং এমপিএ সকলেরই নতুন পদবী হল এমসিএ, Member of Constituent Assembly। সম্মিলিত সংখ্যা একটু বেশি বলে অনুভূত হল।

দলের নেতৃস্থানীয় সকলেই নির্বাচিত হয়েছিলেন। প্রবীণদের মধ্যে কোরবান আলী সাহেব বাদ পড়েছিলেন। গভর্নর মোনায়েম খান একটি দৈনিক সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পরিত্যক্ত সেই পত্রিকাটি পুনরায় প্রকাশের ব্যবস্থা নেওয়া হল। 'দৈনিক স্বদেশ'-এর প্রশাসক নিযুক্ত হলেন কোরবান সাহেব। সেখানেও অনেক কাহিনীর অবতারণা হল। তিনি আজ ইহলোকে নেই, সেসব উহ্য থাকাই শ্রেয়। বাকশাল প্রতিষ্ঠার পর তাঁকে মন্ত্রিসভায় নেওয়া হল। বিক্রমপুরের কাজী আবদুল খালেককে প্রশাসক নিযুক্ত করা হল। অ্যাডভোকেট কাজী খালেক মুজিবনগরে বাংলাদেশ আইনজীবী সমিতির আহ্বায়ক ছিলেন।

শেখ ফজলুল হক মণিও নির্বাচিত নয়। বঙ্গবন্ধুর ভাগ্নে মণির নির্বাচনী এলাকা বঙ্গবন্ধুরই এলাকা। মণি ছিল আমার সঙ্গে ছাত্রলীগের সাধারণ

সম্পাদক। সে ছিল অত্যন্ত কর্মনিষ্ঠ এবং কুশলী। যুদ্ধের সময় মুক্তিবাহিনীর পাশাপাশি ভারত সরকারের প্রত্যক্ষ সাহায্যে যে মুজিব বাহিনী গড়ে উঠেছিল, মণি ছিল তার অন্যতম সংগঠক। স্বাধীনতার পর তার প্রভাব এবং ক্ষমতা হয়ে উঠল প্রবল। বঙ্গবন্ধুর উপর মণির প্রভাব ছিল অপ্রতিরোধ্য। পশ্চিমাদের একটি পরিত্যক্ত সংবাদপত্রের প্রেস এবং বাড়ি নিয়ে সে 'বাংলার বাণী' নামে একটি দৈনিক সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠা করল। সেটি প্রায় সরকারের মুখপত্ররূপে গণ্য হতে লাগল।

তেজগাঁও শিল্প এলাকার শ্রমিক লীগের আঞ্চলিক কর্ণধাররূপে শিল্প-এলাকায় মণির প্রতিপত্তি ছিল আকাশচুম্বি। ন্যায়-অন্যায় বিচারের সুযোগ ছিল না তার। বঙ্গবন্ধুর ভাগ্নে শেখ মণি ছিল অলিখিত ক্ষমতার এক শক্ত কেন্দ্রবিন্দু।

একই সময় সে পত্তন দিল 'আওয়ামী যুবলীগের'। বঙ্গবন্ধু তাকে একাজে পূর্ণ সমর্থন দিলেন।

ছাত্রলীগ থেকে বিদায়ের পরপরই আমিও উদ্যোগ নিয়েছিলাম একটি যুবসংগঠন গড়ে তোলার। প্রারম্ভে বঙ্গবন্ধুর মত চাইলে তিনি ভাসা ভাসা বললেন, করতে পারিস! তবে তুই নিজে দায়িত্ব নিস না। তোর জন্য অন্য কাজ অপেক্ষা করছে।

তা-ই করেছিলাম—সাবেক ছাত্রনেতা নূরে আলম জিকু এবং বোরহানউদ্দীন আহম্মেদ গগনকে আহ্বায়ক করে একটি যুবসংগঠন প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছিলাম। গগন পরবর্তীতে কেরানীগঞ্জ এলাকা থেকে নির্বাচিত হয়েছিল। কিছুদিন যেতেই বঙ্গবন্ধু সেই সংগঠন গুটিয়ে ফেলার পরামর্শ দিলেন। তাঁর নির্দেশ বাস্তবায়িত হল। সংগঠনটির অঙ্কুরেই পরিসমাপ্তি ঘটল।

একদিকে বঙ্গবন্ধুর ভাগ্নে, অন্যদিকে আঞ্চলিক শ্রমিক নেতা এবং নব-উত্থিত যুবশক্তির কর্ণধার শেখ ফজলুল হক মণি হয়ে দাঁড়াল ক্ষমতার এক মহীরুহ। বাকশাল গঠিত হলে তার অন্যতম সেক্রেটারি মণির কোন কথাই, যা খাবার টেবিল এবং শয়নগৃহেই প্রধানত আলোচিত হত, জাতির পিতা এবং সরকার প্রধান বঙ্গবন্ধু ফেলতেন না। বঙ্গবন্ধুর স্নেহজনিত দুর্বলতার এটি ছিল অন্যতম অংশ।

বাংলাদেশের জন্য একটি নতুন সংবিধান রচনা করাই মূলত গণপরিষদের দায়িত্ব বলে বর্তাল। গণপরিষদ একই সঙ্গে জরুরি আইন প্রণয়ন এবং সরকারের জবাবদিহিতারও সর্বোচ্চ স্থান হিসাবে পরিগণিত হল। সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি প্রণয়নেও গণপরিষদ তৎপর হল। মোটামুটি ব্যস্ততার মধ্যেই দিন যাপন করছি। দিনের বেলায় সচিবালয় কার্যালয়ে বসি।

বঙ্গবন্ধুর নিকট সে সময় প্রতিদিন দাবি-দাওয়া নিয়ে অসংখ্য শোভাযাত্রা সচিবালয়ের গেটে এসে স্লোগান দিতে থাকে। ভিতরে প্রবেশের চেষ্টা চালায়। অনুরূপভাবে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের প্রতিনিধিরা এসে ভিড় করে।

সারাজীবন মিটিং-মিছিল করে তিনি আজ ক্ষমতায় আসীন—দেশের প্রধানমন্ত্রী, তাঁর কাছে তো এরা আসবেই—এসব তো তিনিই শিখিয়েছেন। কিন্তু এত মিছিল ঠেকালে আর লোকজনের সাক্ষাৎ দিলে সরকারি কাজ করবেন কখন! আমাকে ডেকে বললেন, এখন থেকে ওদের সঙ্গে আমার পক্ষে তুই কথা বলবি এবং যেখানে যা করা প্রয়োজন সেভাবে কাজ করবি।

বললাম, লীডার, যারা আপনার সঙ্গে দেখা করাটাকে মুখ্য মনে করে, আপনাকে দুটি কথা জানাতে পারাকেই দাবি-দাওয়া বহুলাংশে মানা হয়েছে বলে মনে করে, তাদের সঙ্গে আমি দেখা করে কী করব! তারা আমার কথা শুনবেই বা কেন?

তিনি বললেন, ঠিক আছে, যাদের তোর বিবেচনায় আমার কাছে নিয়ে আসা একান্ত প্রয়োজন মনে করিস; তাদেরকে নিয়ে আসবি। তুই বললে আমি শত কাজ ফেলেও দেখা করব।'

তা-ই করলাম। দিনভর মিছিল ঠেকাই। একদল কর্মকর্তা রাখা হল যারা নেতৃবৃন্দকে আমার কাছে নিয়ে আসত। তাদের বিভিন্নভাবে বুঝিয়ে, তাদের দাবি-দাওয়া সম্বলিত কাগজপত্র রেখে ভবিষ্যতে বিবেচনায় আনা হবে আশ্বাস দিয়ে, কখনও সংশ্লিষ্ট অফিসসমূহে প্রেরণ করে বোঝা হালকা করার চেষ্টা করতাম। একেবারে নাছোড়বান্দাদের অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করতে হত। দিনে দু'-চারটি সাক্ষাৎকার বঙ্গবন্ধুকে দিতেই হত।

আমার কাজে সন্তুষ্ট হয়ে তিনি আরও নির্দেশ দিলেন, যখন সংসদ অধিবেশন থাকবে না, তখন তুই আমার দর্শনার্থীদের সঙ্গে দেখা করবি গণভবনে। আমার পক্ষে তুই যে অভিমত দিবি, সেভাবে কাজ করতে আমি অফিসকে নির্দেশ দিয়ে দিচ্ছি।

বস্তুত তাঁর একার পক্ষে সরকার প্রধানের কাজ করার পর এই অগণিত মানুষের দাবি মিটানো ছিল প্রায় অসাধ্য। এত সময় তাঁর কোথায়! দলের কাজ, সরকারের কাজ ছাড়াও সভা-সমাবেশ, ক্যাবিনেট মিটিং, কমিটি, উপ-কমিটির বৈঠক, বিদেশী রাষ্ট্রদূত এবং বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার লেগেই ছিল। প্রায় সবকিছুই তাঁর কাছে না পৌঁছলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেওয়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু একজন মানুষের সময়ই বা কতটা! তাঁকে নির্ভর করতে হয় সহকারীদের সততা ও নিষ্ঠার উপর।

আমার কাজ নিয়ে তাঁকে অবশ্য কখনও বিব্রত হতে হয়নি। আমিই বরং সময়ে সময়ে তাঁকে বিব্রত করতাম। গণভবনে তাঁর হয়ে সাক্ষাৎকার নিতে গিয়ে কত বিচিত্র নর-নারীর দেখা পেলাম। আর তাদের দাবির বহর দেখে বিস্মিত হয়ে যেতাম। সুশ্রী চেহারার এক যুবক এসে দাঁড়ালো, তার হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে। যত জিজ্ঞেস করি বঙ্গবন্ধুর নিকট কি প্রয়োজন, আমাকে বলুন, তাঁর হয়ে আমি দেখব কী করা যায়!

কিছুতেই বলবে না। তখন বললাম, তা হলে বিদায় হোন।

সে বলল, একা আপনাকে বলব—অন্যদের সরিয়ে দিন।

তা-ই করলাম। সে এক বীভৎস ঘটনা বর্ণনা করল। বিকৃতরুচির সমকামী হানাদার বাহিনীর কিছু সেনা তাকে এতবার ব্যবহার করেছে যে তার মলদ্বার ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে। সে ভালো করে হাঁটতে পারে না। তাকে যথোচিত সাহায্য না করলে চিকিৎসা হবে না।

সত্য-মিথ্যা জানা সম্ভব নয়। বঙ্গবন্ধু সাহায্য করেন অকাতরে। স্লিপ লিখে দিলাম—সাহায্য দানের।

শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের পরিবার, আহত, পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধা, নির্যাতিতা নারী সকলেই আসত বঙ্গবন্ধুকে দর্শন করতে। তাঁর কাছে তাদের প্রাণের দুটি ফরিয়াদ জানাতে। মাঝে মাঝে তিনি এসে দেখা দিতেন। বলতেন, আমার হয়ে চিফ হুইপ সব কথা শুনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে।

আসত ক্ষতিগ্রস্ত সাধারণ নর-নারী। নিহত মানুষের আত্মীয়স্বজন। শুনতে শুনতে তখন পাগল হয়ে যাওয়ার উপক্রম। স্বাধীনতার মূল্য কত মানুষ যে কতভাবে দিয়েছে তার হিসাব-নিকাশ সম্ভব নয়।

পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপিত হল। নিহত মুক্তিযোদ্ধাদের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা ও পরিত্যক্ত বাড়ি বরাদ্দ করে সাহায্য করার প্রচেষ্টা নেওয়া হল। সেখানেও নানা জটিলতা তৈরি হল। হানাদার বাহিনীর দ্বারা নির্যাতিতা, ধর্ষিতা মহিলাদের সমাজে পুনর্বাসনের প্রয়াস নেওয়া হল। এদের যখন বীরাঙ্গনা বলে সম্বোধন করা হত তখন একটি বিশেষ দুর্ঘটনাই দৃশ্যপটে ভেসে উঠত। এই নামটি আমার পছন্দ ছিল না।

সরকারের তরফ থেকে যুদ্ধের সময় নিহত প্রত্যেকের জন্য তার পরিবারকে দুই হাজার করে টাকা প্রদান করা হল। আজকের আঙ্গিকে টাকাটা খুব কম মনে হলেও সে সময় এটা খুব নগণ্য ছিল না। অবশ্য একজন মানুষের জীবনের মূল্য সামান্য অর্থের মাপকাঠিতে বিচার করা যায় না। কিন্তু অনেক অসহায় পরিবার সে সামান্য সাহায্যটুকুও সাগ্রহে গ্রহণ করেছে। প্রয়োজন বড় বালাই।

বঙ্গবন্ধুর দেওয়া কাজগুলো বেশিদিন করা গেল না। অন্যত্র ছুটতে হত। এরই মধ্যে ইন্টার পার্লামেন্টারি ইউনিয়নের সম্মেলনের ডাক আসল ইটালির রোম থেকে। স্পিকার সাহেব আমাকে নেতা করে একটি শক্তিশালী টিম প্রেরণের

উদ্যোগ নিলেন। টিমে ছিলেন জনাব আবিদুর রেজা, ফজলুল হক বিএসসি, শ্রী সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত, অধ্যাপক নজরুল ইসলাম, মিসেস বদরুন্নেসা আহমেদ এবং মিসেস রাজিয়া ফয়েজ। আরও একজন ছিল, আজ আর তার নাম স্মরণে আসছে না। সম্ভবত জনাব আবেদ। স্বাধীনতার পর সেটিই ছিল প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলন। তাই সবরকম প্রস্তুতি নিয়ে রওয়ানা হলাম ইটালি। জীবনের প্রথম বিদেশ ভ্রমণ—তাও দেশের দলনেতা হয়ে। ইটালিতে তখন আমাদের দূতাবাস স্থাপিত হয়নি। জেনেভায় আমাদের মিশনের অন্যতম কর্মকর্তা ওয়ালিউর রহমান সাহেব সস্ত্রীক চলে এলেন আমাদের সহায়তা করার জন্য। তার সেক্রেটারি ছিল একজন শ্বেতাঙ্গিনী। সেই ভদ্রমহিলা অনেক কাজ করেছেন আমাদের জন্য।

বস্তুত সেদিন ওয়ালিউর রহমান সাহেবকে না পেলে ইটালিতে আমাদেরকে অসহায় অবস্থায় পড়তে হত। ফরেন সার্ভিসের দক্ষ কর্মকর্তা ওয়ালিউর রহমান ছিলেন মিষ্টি স্বভাবের, অত্যন্ত অমায়িক মানুষ। কোন কিছুতেই 'না' শব্দ উচ্চারণ করতে জানেন না। যত কঠিন কাজই হোক হাসিমুখে স্বীকার করতেন, নিশ্চয়ই হবে স্যার।

বিশ্বের সকল দেশের পার্লামেন্টের সদস্যদের সামনে দাঁড়িয়ে সেদিন দৃঢ়তার সাথে পাকিস্তানিদের সকল অপকর্মের ইতিবৃত্ত তুলে ধরে বলেছিলাম, তাদের অবশ্যই শাস্তি পেতে হবে।

উপসংহারে বলেছিলাম Crime is crime and the criminals are criminals. They must be punished. পাকিস্তানিদের মানবতাবিরোধী শত নোংরামীর সত্যিকার ছবি তুলে ধরায় বিভিন্ন দেশের দলনেতাগণ বাংলাদেশের প্রতিনিধিদের জায়গায় এসে অভিনন্দন জানালেন। সবচাইতে উৎফুল্ল হয়েছিলেন ভারতের দলনেতা, পার্লামেন্টের স্পিকার মি. জি. এস. ধীলন। তিনি দিল্লী পার্লামেন্টে আমার বক্তৃতার সময় সভাপতিত্ব করেছিলেন। আমাকে এসে জড়িয়ে ধরলেন। সকলকে জানালেন দিল্লীর কথা। বললেন, We are old friends.

যে ক'দিন ইটালিতে কেটেছে তাঁর সঙ্গে একাত্ম হয়ে কাজের সুযোগ পেয়েছিলাম। মি. ধীলন ছিলেন এক ঝানু পার্লামেন্টেরিয়ান। অনেক কিছু শেখার ছিল তাঁর নিকট। দেশ আমাদের নতুন, প্রতিনিধি দলও নতুন এবং দলনেতা হিসাবে আমি আরও নতুন। তবুও সেই নবীন দল বিশেষ স্বাক্ষর রাখতে পেরেছিল রোম সম্মেলনে।

বাংলাদেশ এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্যদিয়ে মাত্র স্বাধীনতা অর্জন করেছে। বিশ্বের প্রায় সব দেশই নৈতিকভাবে আমাদেরকে সমর্থন দিয়েছিল—তাই আমাদের বক্তব্য শুনতে তারা ছিলেন আগ্রহী। আর তা গ্রহণ করতে তারা ছিলেন উৎসাহী। জীবনের প্রথম বিদেশ সফর সফলতায় পর্যবসিত হল।

আমাদের আর্থিক অবস্থা যেরকমই থাক, ওয়ালিউর রহমান সাহেব প্রস্তাব করলেন, স্যার, আমাদের দেশ নতুন। আমাদের তরফ থেকে একটা সম্বর্ধনার আয়োজন করা প্রয়োজন। বৃহৎ দেশসমূহ প্রতিদিনই সম্বর্ধনার আয়োজন করছে বিরাট আকারে। ছোট আকারে হলেও আমাদের তা করা প্রয়োজন। সরকার একটা বিশেষ ফান্ড আমাকে দিয়ে রেখেছিল—যদি টিমের জরুরি কোন প্রয়োজন দেখা দেয়; খরচ না হলে ফেরত দিতে হবে।

রহমান সাহেবকে বললাম, ইয়া বিছ্‌মিল্লাহ্‌, রোমেই হয়ে যাক আমাদের আয়োজিত প্রথম রিসেপশন। শুধু নিমন্ত্রণ খেয়েই যাব, ভালো দেখায় না।

সম্বর্ধনার ব্যবস্থা করা হল একটি হোটেলের হলরুমে। কেবল দলনেতাদের নিমন্ত্রণ করেছিলাম। অনেক দেশের দলনেতারাই এসেছিলেন। কিন্তু বেশিক্ষণ থাকলেন না। সৌজন্য রক্ষা করে সামান্য কিছু মুখে দিয়ে তাঁরা বিদায় প্রার্থনা করলেন। কারণ আমাদের অনুষ্ঠানে মদ্যপানের ব্যবস্থা ছিল না। ওই জিনিস ছাড়া কোন সম্বর্ধনা তাঁরা ভাবতে পারেন না। বাংলাদেশের প্রতি অতি সহানুভূতির কারণেই আমাদের সম্বর্ধনা সভায় স্বল্প সময়ের জন্য হলেও এসেছিলেন। সম্বর্ধনা সভা সফলতায় পর্যবসিত হল। মিসেস ওয়ালিউর রহমান সার্বক্ষণিক পাশে দাঁড়িয়ে অতিথিদের সাদরে অভ্যর্থনা জানিয়েছেন এবং আদর-আপ্যায়ন করেছেন। রাষ্ট্রদূতের সহধর্মিণী হওয়ার সকল গুণ ভদ্রমহিলার বিদ্যমান।

ইটালির কাজ শেষ করে আমরা যার যার মতো ইউরোপের দু'-একটি দেশ ঘুরে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করব। আমার অনেকদিনের ইচ্ছা প্রথম সুযোগেই লন্ডন যাওয়ার। I sigh for distant albion's shore. অবশ্য সকলেই একত্রে লন্ডন আসলাম। পৌঁছবার সংবাদ পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুস সামাদ সাহেব পূর্বাহ্নেই জানিয়ে দিয়েছিলেন। হিথরো বিমানবন্দরে সাদর সম্ভাষণ জানালেন ব্রিটেনে আমাদের রাষ্ট্রদূত সৈয়দ আবদুস সুলতান সাহেব এবং অজস্র প্রবাসী বাংলাদেশী ভাই-বোনেরা। আমার শ্যালিকা সুলতানাও তার বর শফিককে নিয়ে উপস্থিত। সম্বর্ধনাকারীদের অধিকাংশই সিলেট জেলার লোক। জনাব আবদুর রকিব ছিলেন তাদের একজন নেতৃস্থানীয়। লন্ডনের নামকরা ইন্ডিয়া গ্রীল রেস্টুরেন্টের মালিক তিনি। অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁর সঙ্গে আমার অত্যন্ত হৃদ্যতা হয়ে গেল। পরবর্তীতে সে বন্ধুত্ব অটুট সম্পর্কে পরিণত হয়েছিল। মানুষকে শীঘ্র আপন করে নেওয়ার এক বিশেষ গুণ রয়েছে রকিব সাহেবের। দীর্ঘদিন লন্ডনের অধিবাসী রকিব সাহেব সকলের মতামত খণ্ডিয়ে নিজে উদ্যোগ নিয়ে তাঁর বাসস্থানের নিকটে 'গ্রেট ইস্টার্ন' হোটেলে আমাকে তুললেন। অন্য সদস্যরা যার যার আত্মীয়স্বজনের হেফাজতে অন্যত্র চলে গেল। আমার দল-নেতৃত্বের ইতি হল। রাষ্ট্রদূত সুলতান সাহেবের বাসায় এক আনুষ্ঠানিক

নৈশভোজে পুনরায় সকলে একত্রিত হয়েছিলাম। প্রথম লন্ডন ভ্রমণ সবদিক থেকেই উপভোগ্য হল। প্রবাসীদের উষ্ণ সম্বর্ধনা, দলীয় সদস্যদের পৃথক সভা ছাড়াও অনেকগুলো অনুষ্ঠানে যোগ দিতে হল। শ্যালিকা সুলতানা হোটেলে এসে পাকড়াও করল, তার বাসা থাকতে হোটেলে থাকা চলবে না। বুঝিয়ে বললাম, সর্বক্ষণ প্রবাসী বন্ধুরা এবং দলীয় লোকজন এত যাতায়াত করছে যে, কোন গৃহস্থের বাড়িতে তার সুবিধা হবে না।

ওদের বাড়িতে অবশ্য যেতে হল। এক বেলার জন্য গিয়ে সমস্ত দিন থাকতে হল। সুলতানা সেদিনের সমস্ত কর্মসূচি ভেস্তে দিল। সে যে কত পটু রাঁধুনি হয়েছে তা আমার উপর দিয়ে পরীক্ষা চালাতে হবে। লন্ডনে অবস্থানের সময়ে রকিব সাহেবই সার্বক্ষণিক সঙ্গী হিসাবে ছিলেন। আমার সংবাদ পেয়ে নিউ ক্যাসেল থেকে আমার ভাই ড. শামসুল হক এসে উপস্থিত হলেন। বয়সে বছর দু'য়েকের বড় আমার এই খালাত ভাইয়ের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল অনেকটা বন্ধুত্বের। তাঁকেও হোটেলে রেখে দিলাম। বিলেতে পড়াশুনা করেছেন তিনি, অনেক কিছুই পরিচিত। তাঁকে পেয়ে লণ্ডনের সময় অধিকতর আনন্দদায়ক হল।

প্যারিস ভ্রমণের খুব শখ ছিল। সেখানের দূতাবাসে রয়েছেন বন্ধুপ্রতিম শাহাবুদ্দীন সাহেব। তিনি ছিলেন দিল্লীতে প্রথম অফিসার যিনি বাংলাদেশের পক্ষে চলে এসেছিলেন। লন্ডন থেকে বিদায় নিয়ে প্যারিসে এসে পৌছনো গেল। বিমানবন্দরে রাষ্ট্রদূত আবুল ফাতেহ্ সাহেব, শাহাবুদ্দীন সাহেব এবং অন্যান্য কর্মকর্তারা স্বাগত জানালেন। ফাতেহ্ সাহেব অনুরোধ জানালেন, হোটেলে না উঠে রাষ্ট্রদূতের বাসস্থানে ওঠার জন্য।

আমি বললাম, যদি কারো বাড়িতেই থাকতে হয়, তা হলে শাহাবুদ্দীন সাহেবের ওখানেই উঠব।

তিনি তখন দূতাবাসের প্রথম সেক্রেটারি। নিয়মমাফিক রাষ্ট্রদূতের বাড়িতে ওঠাই বিধেয়। কিন্তু শাহাবুদ্দীন সাহেবের সঙ্গে আমার রীতিনীতির বর্হিভূত সম্পর্ক। শাহাবুদ্দীন সাহেব অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। অন্যরা আর কথা বাড়ালেন না।

শাহাবুদ্দীন সাহেবের স্ত্রী আমাকে পেয়ে যারপরনাই আনন্দিত হলেন। পরীর বাচ্চা দুটোও উৎফুল্ল হয়ে উঠল। অত্যন্ত আনন্দে কয়েকটা দিন সেখানে কাটালাম। দর্শনীয় সমস্ত স্থানে শাহাবুদ্দীন সাহেব এবং ভাবী আমাকে নিয়ে গেলেন। বেশির ভাগ স্থানেই ভাবী সঙ্গ দিলেন। কেননা, শাহাবুদ্দীন সাহেবের অনেক কাজ পড়ে যায়। ভাবীই আমাকে সপ্তম আশ্চর্যের অন্যতম আইফেল টাওয়ারের উচ্চতম শিখরে ওঠালেন। রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে নৈশভোজও করতে হল, তিনিও কয়েকটি স্থানে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে সঙ্গে গেলেন।

মিসেস শাহাবুদ্দীন বিদেশী কূটনীতিকদের ট্যাক্স-ফ্রি বিপণি থেকে

সালেহার জন্য যে ফ্রেঞ্চ শিফন শাড়ি ক্রয় করে দিয়েছিলেন, সালেহার মতে সেটি ছিল তার শ্রেষ্ঠ শাড়ি। তাদের প্রাণঢালা আদর-আপ্যায়নে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম সৌন্দর্য নগরীতে সপ্তাহকাল অবস্থানের পর সেবার স্বদেশ ফিরে গেলাম। নেতৃবৃন্দ আমাদের সাফল্যে আর একবার অভিনন্দন জানালেন।

সরকারি দফতরে কাজকর্মের পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকলেও একটা বিষয় উপলব্ধি করলাম, 'মাছি মারা কেরানি' বলে নিম্নস্থ কর্মচারীদের উপহাস করলেও, উপরন্ত কর্তাব্যক্তিরাও কম যায় না। মানুষের জন্য নিয়ম, না নিয়মের জন্য মানুষ জানতে চাইলে তারা জবাব দেবে, নিয়ম লঙ্ঘন কোনক্রমেই বিধেয় নয়। একটি প্রশ্ন বা সমস্যার সরাসরি সমাধানের পথে না গিয়ে যতভাবে তার অন্তরায় সৃষ্টি করা যায় এবং যত প্রকারে বিষয়টিকে অধিকতর জটিল করে তোলা যায় এ ধরনের নোট তৈরি করতে যে যত বেশি সিদ্ধহস্ত, তাদের মতে সে তত বেশি ব্যুৎপত্তিশীল অফিসার। গিঁঠ না খুলে প্যাঁচ কষাতে উৎসাহের অন্ত নেই।

তারা ঠিক করলেন, 'পাকিস্তান' শব্দগুলোর স্থানে 'বাংলাদেশ' বসিয়ে দিলেই কার্যোদ্ধার হবে। দাঁড়াল এই প্রকার, 'শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের এক নম্বরের দুশমন'—এখন পাকিস্তান শব্দের স্থলে বাংলাদেশ লিখে দিলে দাঁড়াল—'শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের এক নম্বরের দুশমন'। বলিহারি এদের প্রতিভা।

শুধু তা-ই নয়, সময়ের প্রয়োজনে নতুন সমাজের চাহিদা অনুযায়ী কিছু প্রস্তাব এলে ওরা প্রাণপণে তাকে বাঁধা দেবে, এ কিছুতেই হতে পারে না। মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে।

একটি ঘটনায় আমরা বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিলাম। ঢাকার জেলা জজ জনাব আবদুল হান্নান ছিলেন একজন প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা এবং বিচার বিভাগে কর্মরত সকল কর্মচারী-কর্মকর্তাদের মধ্যে তাঁর চাইতে অধিকতর অবদানসম্পন্ন কোন ব্যক্তি ছিলেন বলে আমাদের জানা ছিল না। আইন-পেশার সাথে সম্পৃক্ত আমাদের প্রতিটি নেতা-কর্মী জনাব হান্নানের সক্রিয় অবদানের কথা বঙ্গবন্ধুকে অবগত করেছিলেন। তিনি তাঁকে ডেকে অনেক প্রশংসা করলেন এবং ইঙ্গিত করলেন অচিরেই তাঁকে যথোচিত পুরস্কৃত করা হবে। আমরাও সন্তুষ্ট। বঙ্গবন্ধু তাঁকে হাইকোর্টের বিচারপতি হিসাবে নিয়োগ

দানের জন্য নির্দেশ দিলেন। আনন্দিতচিত্তে আমরা তাঁকে এ সুসংবাদ দিলাম। তিনি অনেক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন।

কিন্তু নিয়োগ আদেশটি আর জারি হয় না। আইনমন্ত্রীকে বিষয়টি জানালে তিনি বললেন, কিসব অসুবিধা আছে, শীঘ্রই প্রধানমন্ত্রীর বরাবরে নোট যাচ্ছে।

আমরা তো অবাক! স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী হুকুম দিয়েছেন সে সম্বন্ধে আবার কিসের নোট! চটেমটে আমরা বঙ্গবন্ধুকে বলতেই তিনিও রাগান্বিত হলেন। বললেন, দেখি কী নোট আসে! তোরা ব্যতিব্যস্ত হোস না।

নোট এল অনেক সুনিপুণ মুসাবিদায় যুক্তি-তর্কের বেড়াজালে, আইন-কানুনের চুলচেরা বিশ্লেষণে তারা দেখালেন, হান্নান সাহেবকে বিচারপতি করলে দুনিয়া রসাতলে চলে যাবে।

বঙ্গবন্ধু রাগত স্বরে তাঁর সেক্রেটারি রফিক ভাইকে বললেন, এত নোট-ফোটের প্রয়োজন দেখছি না—আমার নির্দেশ পালন করতে বলে দাও।

তা-ই হল, আবারও একদফা অধিকতর যুক্তি সম্বলিত নোট এল। একে একে চার বার বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ ফিরে এল, কার্যকর হল না। আইনমন্ত্রী সাহেবও তাঁর সচিবালয়ের নোটে প্রতিস্বাক্ষর করে কর্মকর্তাদের দ্বারা অহরহ বেষ্টিত এবং প্রভাবিত বলেই নিজেকে চিহ্নিত করলেন। আমরা হাল ছেড়ে দিলাম। এক কথা বঙ্গবন্ধুকে কতবার বলা যায়! কী করে বলা যায় যে তাঁর নির্দেশ বারবার সরকারি কর্মচারীরা অমান্য করে নোটের পর নোট পাঠানোর ধৃষ্টতা দেখাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত হান্নান সাহেবকে বিচারপতি নিয়োগে অপারগ হয়ে তাঁকে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্য নিয়োগ করা হল। অনুষ্ঠানাদিতে হান্নান সাহেবকে দেখলে আমরা লজ্জায় দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে যেতাম।

এমনি আরও একটি ঘটনা ঘটল শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে। আমার অফিসে বসে আছি। উপস্থিত রয়েছে রেডক্রসের চেয়ারম্যান গাজী গোলাম মোস্তফা। এর মধ্যে ডা. আস্হাবুল হক হেবার স্থলে বঙ্গবন্ধুর অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন অনুগত-কর্মী এবং ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি গাজী গোলাম মোস্তফাকে আন্তর্জাতিক রেডক্রসের বাংলাদেশ শাখার সভাপতির পদে অধিষ্ঠান করা হয়েছে।

শিক্ষামন্ত্রী ইউসুফ আলী সাহেব টেলিফোনে বললেন, খুব জরুরি কাজ করছেন কী!

বললাম, না, তেমন কোন জরুরি বিষয় নেই!

তিনি বললেন, তা হলে এক্ষুণি একবার চলে আসুন।

তিনি অন্য বিল্ডিংয়ে বসতেন। তার ওখানে যাচ্ছি শুনে গাজী মোস্তফাও সঙ্গ নিলেন। গিয়ে শুনলাম, তার সুস্পষ্ট নির্দেশ অমান্য করে এক উপ-সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তা কেবল নোটই পাঠিয়েছেন তা-ই নয়, এমন ইঙ্গিতও সেখানে রয়েছে যে, ইদানীং নিয়ম-নীতি এবং সরকারি আইন-কানুন সম্বন্ধে অনেকে যথেষ্ট ধারণা রাখেন না বলে প্রতীয়মান হচ্ছে।

কটাক্ষটি অনুধাবন করতে বেগ পেতে হয় না। ভাবলাম, একটু বিলম্ব হয়ে গেলেও, বিড়াল মারার সময় এখনও শেষ হয়ে যায়নি। জানা গেল, কর্মকর্তাটি পাকিস্তানের পক্ষে সদম্ভে কাজ করেও তার কোন অনুশোচনা নেই।

ভাবলাম, একটা কিছু করা দরকার। বঙ্গবন্ধু জানলে বিরক্ত হবেন। তবুও চুপ করে থাকা আর বাঞ্ছনীয় নয়। চোখের ইশারায় গাজী মোস্তফাকে উঠিয়ে নিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাটির ঘরের দিকে অগ্রসর হলাম। আমাদের দু'জনের সঙ্গে দু'জন স্টেনগানধারী প্রহরী ছাড়াও কয়েকজন কর্মী ছিল। ইউসুফ ভাই বুঝতে পারেননি আমরা কোথায় যাচ্ছি এবং কী উদ্দেশে!

ঘরে ঢুকে কর্মকর্তাটিকে হাত ধরে চেয়ার থেকে উঠিয়ে টেনে বাইরে নিয়ে এলাম। স্বাধীনতার স্বল্পকাল পরের ঘটনা—সকলেই তটস্থ। তাছাড়া ঘটনার নায়ক চিফ হুইপ এবং রেডক্রসের চেয়ারম্যান দু'জনই অপরিচিত নন। অন্যান্য কর্মচারীরা নিজেদের ঘরে ঢুকে নিরাপদ আশ্রয় নিল। তাকে টেনে ইউসুফ ভাইয়ের ঘরে ঢুকিয়ে বললাম, তোমাকে এখন এখানে হত্যা করা হবে। তোমার কোন জ্ঞানগর্ভ নোট কী তোমাকে বাঁচাতে পারবে?

ভয় দেখাবারই উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু ইউসুফ আলী সাহেব অতিশয় বিব্রত হয়ে পড়লেন। সুন্দর, মিষ্টি ব্যবহারের জন্য বন্ধুমহলে তিনি মিঠা বাবা বলে খ্যাত। তিনি ব্যাকুল হয়ে উঠলেন, শাহ্ সাহেব করছেন কী? করছেন কী?

তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, এ ধরনের রাজাকারদের প্রথমেই শেষ করা উচিত ছিল। বিলম্ব হলেও আজ সেটি সমাধা করব।

কর্মকর্তাটি এবার বুঝতে পারল তার সমূহ বিপদ। জীবন সংশয়। সে পাগলের মতো একবার শিক্ষামন্ত্রী ও একবার আমার পায়ে পড়তে লাগল। বারবার একই কথা বলল, স্যার, এবারের মতো ছেড়ে দেন। আমি আর কোনদিন আপনাদের কথার অবাধ্য হব না।

দেখলাম শিক্ষা বোধহয় ঠিকই হয়েছে। তাছাড়া ইউসুফ ভাই অস্থির হয়ে পড়লেন। ধীর-স্থির মানুষ তিনি, অল্পেই বিষম খান। বললাম, শিক্ষামন্ত্রীর পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে নাকে খত দিয়ে বিদায় হও। এবারের মতো এবং শেষ বারের মতো তোমাকে ক্ষমা করা গেল!

সে তাই করে কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে গেল। সচিবালয়ে কথাটি প্রকাশ হতে বিলম্ব হল না, সকলেই সাবধান হয়ে গেল। খুব উত্তম সময় কাটল তখন, যে আদেশই দিই অবিলম্বে পালিত হয়। কাউকে চাকরি দিতে বললে, চাকরিটি তাকে দিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা হাত কচলাতে কচলাতে দেখা করে বলতেন, স্যার, আপনার নির্দেশ মতো কাজ করেছি। একটু সুনজর রাখবেন।

সেদিন যা পেরেছি, দেশের উপ-প্রধানমন্ত্রী হয়েও পরবর্তীকালে তার চার ভাগের এক ভাগও পারিনি। Hit the iron when it is red. কথাটা সঠিক উপলব্ধিতে এল।

একদিন আর একটি ঘটনা ঘটেছিল সড়ক ও জনপথ দফতরের ঢাকা-মাওয়া রাস্তার দায়িত্বপ্রাপ্ত এক চিফ ইঞ্জিনিয়ারকে নিয়ে। ঢাকা-খুলনার প্রস্তাবিত সড়কের ঢাকা-মাওয়ার অংশটি নিয়ে আমরা বিক্রমপুরের অধিবাসীরা অত্যন্ত স্পর্শকাতর ছিলাম। বস্তুত বিক্রমপুর ঢাকার এত সন্নিকটে হয়েও কোন সড়ক যোগাযোগ ছিল না। আমাদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল একটি পাকা রাস্তার। ইংরেজের আমলে বিক্রমপুরের এতসব গুরুত্বপূর্ণ রাজকর্মচারী থাকা সত্ত্বেও চারদিকে নদী-বেষ্টিত আড়িয়াল বিল অধ্যুষিত অঞ্চলটিতে রাস্তা তৈরি কেউ পরিকল্পনা গ্রহণ করেননি। বর্ষাকালে অনেক পানি হওয়ার দরুন কাজটি ছিল দুরূহ। পাকিস্তান আমলে তখনকার সাবেক আইজি সামসুদ্দোহা সাহেব পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় পূর্তমন্ত্রী হওয়ার পর সেবার শ্রীনগর এসেছিলেন সভা করতে। তখন এই রাস্তার দাবিতে বিক্ষোভ করতে গিয়ে সেই বয়সেই একবার গ্রেপ্তার হয়েছিলাম।

আজ আমাদের সরকার প্রতিষ্ঠিত। দেশ পরাধীনতামুক্ত। এখনও যদি রাস্তাটি তৈরি করা না যায় তা হলে আমাদের জন্য চরম ব্যর্থতা। বঙ্গবন্ধুর সরকার বিষয়টি সম্যক উপলব্ধি করলেন। রাস্তাটি সময়ে খুলনা পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার চিন্তা-ভাবনাও ছিল। আপাতত জমি অধিগ্রহণ করে, ক্ষতিপূরণ প্রদান করে প্রাথমিক কাজগুলো সম্পন্ন হওয়া প্রয়োজন। ঢাকা-মাওয়া রোডের কৃতিত্ব তিন সরকারই কম-বেশি পেতে পারে। বঙ্গবন্ধুর আমলে জমি অধিগ্রহণ, ক্ষতিপূরণ প্রদান এবং রাস্তার এলাইনমেন্ট ঠিক করা হয়, জিয়াউর রহমানের আমলে মাটি কাটার কাজ শুরু হয় এবং সর্বোপরি এরশাদের আমলে সেটিকে পাকা করা হয়।

আমাদের স্বপ্নের সেই রাস্তার এলাইনমেন্ট কি হবে—অর্থাৎ কোন্ দিক দিয়ে রাস্তাটি যাবে তা সাব্যস্ত করার জন্য সচিবালয়ে আমার অফিসকক্ষে সংশ্লিষ্ট ইঞ্জিনিয়ার সাহেবকে ডাকলাম। ম্যাপ ইত্যাদি দেখে আমি একটি প্রস্তাব রাখলাম, এইখান দিয়ে রাস্তাটি তৈরি করুন।

ইঞ্জিনিয়ার বারবারই বিনয়ের সঙ্গে তা প্রত্যাখ্যান করতে চাচ্ছিল। তাঁর মতে, ভিন্ন দিক দিয়ে রাস্তাটির পরিকল্পনা হওয়া উচিত। কয়েকবার বলার পর বুঝলাম তিনি তার মতে অনড়। তখন অত্যন্ত বিরক্ত বোধ করলাম। ভিন্নমূর্তি ধরলাম। বললাম, বিক্রমপুরের প্রতিনিধি আপনি, না আমি?

সে বলল, স্যার আপনি।

জিজ্ঞেস করলাম, দেশের চিফ হুইপ কে? আপনি না আমি?

সে বলল, স্যার আপনি।

বললাম, তা-ই যদি হয়, আপনার এতবড় ধৃষ্টতা যে, বারবার বলার পরও আপনি কথা শুনছেন না। এখন আপনাকে কে বাঁচায় দেখব! আপনাকে আমি তেতলা থেকে ছুঁড়ে নিচে ফেলে দেব! মাহবুব, শহীদ,

আনোয়ার তোমরা সব ভিতরে আস। এ লোকটাকে ছুঁড়ে ফেলব নিচে, দেখি তাকে কে বাঁচায়!

তারা সব দৌড়ে ঘরে ঢুকতেই লোকটার অবস্থা শোচনীয়। ভয়ে তখন থরথর কম্পমান। আমার ইতিপূর্বের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ঘটনা যে না শুনেছে তা নয়।

কাজী মাহবুবুর রহমান ছিল আমার প্রাইভেট সেক্রেটারি। ছাত্রজীবনে ছাত্রলীগের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান শিল্প ও সাংস্কৃতিক সংঘের এককালীন সভাপতি, আমার একান্ত অনুগত-কর্মী। সে এসে আমার দুই হাত চেপে ধরল, স্যার, এবারের মতো ক্ষমা করুন। আমি দেখছি, যা চান তা-ই হবে। এবার ক্ষমা করে দেন।

মাহবুবের কথা ফেলতে পারলাম না। সে ইঞ্জিনিয়ারকে নিয়ে তার কক্ষে চলে গেল।

পরদিন খুব ভোরে লাল টেলিফোন বেজে উঠল। ধরে বললাম, হ্যালো, কে বলছেন!

জিজ্ঞেস করতেই বঙ্গবন্ধুর গমগমে কণ্ঠ ভেসে এল। তিনি বললেন, চিফ হুইপ সাহেব নাকি?

কণ্ঠস্বর চিনতে পেরে বললাম, স্লামালাইকুম লীডার, আমি চিফ হুইপ নই।

কী! আপনি চিফ হুইপ নন?

বঙ্গবন্ধু রাগান্বিত হলে বা রস করতে চাইলে আপনি বলে সম্বোধন করতেন। বললাম, না স্যার, আমি চিফ হুইপ নই।

তিনি এবার বললেন, তুই মোয়াজ্জেম কথা বলছিস্ না?

বললাম, জী লীডার, আপনার মোয়াজ্জেম কথা বলছি। অন্যের কাছে চিফ হুইপ হলেও আপনার কাছে চিরদিন মোয়াজ্জেম হয়েই থাকতে চাই।

তিনি স্পষ্টত খুশি হলেন বুঝা গেল। জানতে চাইলেন, নাস্তা খেয়েছিস?

জী না, আপনার টেলিফোনেই তো জাগলাম। নাস্তা কখন খাব?

তিনি বললেন, এখানে চলে আয়, আমার সঙ্গে নাস্তা করবি।

চলে গেলাম তাঁর ধানমন্ডি ৩২ নম্বরের বাড়িতে। তিনি মাত্র নাস্তার টেবিলে বসেছেন। মিটিমিটি হেসে আমাকে বললেন, চিফ ইঞ্জিনিয়ারকে তেতলা থেকে ফেলে দিলে কী কাজটা ভালো হত?

বুঝলাম, ইতিমধ্যে অভিযোগ চলে এসেছে। বেটা তো সেয়ানা কম নয়! সব কথা খুলে বললাম। তিনি হাসিমুখে বললেন, আমারই তো শিষ্য তুই, রাগ হবারই কথা। তবুও চিফ হুইপের পক্ষে কাজটা শোভনীয় হত না। তুই আমাকে বললি না কেন?

বললাম, লীডার, প্রতিটি ক্ষেত্রে আপনার কাছে এসে যদি আপনাকেই বিরক্ত করতে হয়, তা হলে আমাদের রেখেছেন কেন?

তিনি প্রশ্রয়মিশ্রিত সুরে বললেন, তুই এখন দেশের চিফ হুইপ। তোকে সব বুঝে কাজ করতে হবে।

বললাম, নেতা, আমার ব্যবহারের জন্য আমি দুঃখিত। কিন্তু আপনার কাছে নালিশ করল কে?

তিনি হেসে উঠলেন। বললেন, আমার কাছে সব খবর আসে। নাস্তা কর, চল নিচে যাই—ওখানে তোর আসামি বসে আছে।

নিচে নেমে দেখি সেই ইঞ্জিনিয়ার চুপ করে বসে আছে। বঙ্গবন্ধু অন্য কোন কথার অবতারণা না করে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, মোয়াজ্জেম না হয়ে আমি হলে আপনাকে সঙ্গে সঙ্গে নিচে ফেলে দিতাম। আপনি কোন্ সাহসে চিফ হুইপের কথা অমান্য করেন! যান, যেভাবে বলেছে, সেভাবে কাজ করুন।

আর একবার মনে হল, এ না হলে নেতা!

আমার জীবনে এবং আমার সংগ্রামে আর একটি মানুষের কথা না বললে অনেক কিছু বলা হল না। আমার ছোট মামার কথা। আলহাজ্ আবুল বাসার হাওলাদার। কারো কারো নিকট তিনি লোক সঠিক ছিলেন না। আবার কারো কাছে তিনি দেবতুল্য। দুটি বিপরীতধর্মী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁর। শৈশব থেকেই ডানপিটে। দুই মামার মধ্যে জ্যেষ্ঠ রূপে-গুণে সবদিকে এগিয়ে। কিন্তু ছোট ছেলে না রূপে, না গুণে জ্যেষ্ঠের কাছাকাছি যেতে পারে। তাঁকে নিয়ে সর্বদাই শঙ্কা, কোথায় কোন্ ফ্যাসাদ বাঁধিয়ে এল, কোথায় কার ঝগড়া নিজ কাঁধে তুলে নিয়ে তোলপাড় পাকালো— কিছু ঠিক নেই। কিন্তু সব কিছুর পরও আমার নানীজান, যিনি ছিলেন একজন অসাধারণ পরহেজগার মহিলা, তাঁর সবটুকু স্নেহ-ভালোবাসাই যেন ছোট মামার জন্য সংরক্ষিত ছিল।

মামার নামে নালিশের অন্ত ছিল না। কেউ বাড়ির সামনা দিয়ে ছাতি মাথায় দিয়ে গিয়েছে, অমনি মধ্যযুগীয় মর্যাদায় আঘাত লেগেছে! ছাতি তিনি কেড়ে নিয়ে ভেঙে ফেলেছেন। কেউ জুতা পরে যাচ্ছে, হাওলাদার সাহেবের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়েছে, তাকে জুতা খুলিয়ে দু'ঘা দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছেন। এমনি শতেক অভিযোগ। নানীজান মামাকে ডেকে এনে সম্মুখে যা পেতেন তা-ই দিয়ে সমানে প্রহার করতেন। প্রহারের চোটে লাঠিটিই হয়ত ভেঙে গেল। নানীজান ক্লান্ত হয়ে পড়তেন। মামা তখন আর একটি লাঠি এনে মায়ের হাতে দিয়ে তাঁকে কদমবুচি করে বলতেন, তোমার রাগ যদি না কমে থাকে, আরও প্রহার কর।

নানীজান লাঠি ফেলে দিয়ে চোখের জলে জায়নামাজ বিছিয়ে আল্লাহ্র কাছে চোখের পানিতে প্রার্থনা করতেন, আল্লাহ্, বাছেরের মঙ্গল কর।

তিনি ডাকতেন বাছের বলে। মামার হাজার দোষ থাকতে পারে, কিন্তু এতটা মাতৃভক্তি আমি অন্য কোথাও খুব কম দেখেছি। দুনিয়া একদিকে, মা একদিকে। যখন চাকরি করতেন, যা কিছু আসার সময় বাড়িতে আনতেন, সর্বাগ্রে মায়ের হাতে দিতেন। বেতনের সমস্ত টাকা মায়ের হাতে দিতেন। নানীজান মামীকে ডেকে সব বুঝিয়ে দিতেন।

প্রথম যৌবনে মামা মুসলিম লীগের ন্যাশনাল গার্ডের ক্যাডারভুক্ত ছিলেন। সিলেট রেফারেন্ডামে প্রচুর কাজ করেছেন। চাকরি ত্যাগের পর মেম্বার-চেয়ারম্যানের নির্বাচন আর কিছু ব্যবসা এবং পৈতৃক সম্পত্তি দেখা-শুনা করতেন। আমার নানা অনেক সম্পত্তি রেখে গিয়েছিলেন। আমি বড় হতে আমার রাজনীতিই তাঁর রাজনীতি হল। যা-ই করেন না কেন, তাতে আমার সুবিধা-অসুবিধাটাই বিবেচ্য বিষয় ছিল। তাই আওয়ামী লীগ, ডেমোক্রেটিক লীগ এবং জাতীয় পার্টিতে আমার সঙ্গে সঙ্গে তিনিও ছিলেন সক্রিয়। বঙ্গবন্ধু তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে চিনতেন। একদিন সচিবালয়ের সিঁড়ির গোড়ায় উভয়ের দেখা-দেখি। যখন শুনলেন তিনি আমার মামা, বঙ্গবন্ধু তাঁকে হাত ধরে আমার অফিসের দোরগোড়ায় নিয়ে এসে বললেন, তোর মামা হলেও আমারও কিন্তু আপন মানুষ। একটু খেয়াল রাখিস।

কী খেয়াল রাখব! মামা ব্যবসাপাতি ছেড়ে ন'টি মাস মুক্তিযোদ্ধাদের খাইয়েছেন। ওদের সর্বপ্রকার সহায়তা দিয়েছেন। গভীর রাতে তাঁর বাড়িতে দূর দূর থেকে ভাত খেতে আসত এলাকার মুক্তিযোদ্ধারা। তিনি যে সকলের মামা। হাতে নগদ যা ছিল, মামীর অলঙ্কার নামমাত্র মূল্যে বিক্রয় করে তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের প্রয়োজন মিটিয়েছেন। কারণ তিনি যে মোয়াজ্জেমের মামা।

দু'বার ভারতে গেছেন, একবার রানাদেরকে আগরতলায় রেখে এসেছেন। দ্বিতীয়বার আজমীর শরীফ যাওয়ার জন্য ভারতে গেলেন। আমার কাছে গেলেন, সব ব্যবস্থা করে দাও।

ফিরে এলে মামাকে জিজ্ঞেস করলাম, মামা, খাজা বাবার দরবারে দাঁড়িয়ে আল্লাহ্র নিকট কী চাইলেন?

তিনি বললেন, আমি টাকা চেয়েছি। প্রচুর টাকা। আল্লাহ্ আমাকে খরচের এত বড় হাত দিয়েছেন, রসদ দেবেন না কেন?

তাঁর সোজা উত্তর। বললাম, দেশের জন্য, আমার জন্য দোয়া করেননি?

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, একথা আবার জিজ্ঞেস করতে হয়! জানিস না তুই আমার কতটা!

বস্তুত তার আট সন্তানকে এক পাল্লায় রাখলে, অন্য পাল্লায় আমাকে রাখলে তাঁর কাছে আমার পাল্লাই ভারি।

স্বাধীনতার পর মামার শূন্য হস্ত। আমি সবে চিফ হুইপ হয়েছি। বেতনের টাকাই সম্বল। মামা শুকনো মুখে ঘুরে বেড়ান, দেখতে কষ্ট হয়। এমনি সময় একদিন হাইকোর্ট থেকে ঘুরে এসে উত্তেজিতভাবে বললেন, বিরাট জিনিস পেয়ে গিয়েছি।

কী মামা?

হাইকোর্টে এক কাজে গিয়ে দেখি দেশের সবচাইতে প্রখ্যাত স্টিল সামগ্রীর প্রতিষ্ঠান 'স্টিল কিং' এর শোরুম, কারখানা সবসহ নিলাম হচ্ছে। আমি তাতে অংশগ্রহণ করে সর্বোচ্চ ডাক দিয়ে নিলাম পেয়ে গিয়েছি।

জিজ্ঞেস করলাম, এত টাকার নিলাম, এখন টাকা জমা দেবেন কোথা থেকে?

মামা বললেন, সেই জন্যই তো তোমার কাছে আসা। কালকের মধ্যে এক-চতুর্থাংশ, প্রায় লাখ পাঁচেক টাকা জমা দিতে হবে। বাকিটা পরে দিলেও হবে।

মামা বলেন কী? যার পকেটে নাই পাঁচ টাকা, তিনি একদিনের মধ্যে দেবেন প্রায় পাঁচ লাখ টাকা! কী করে সম্ভব?

মামা আবার বললেন, সেই জন্যই তো তোমার কাছে এসেছি। একটা ব্যবস্থা কর। স্টিল কিং একটা সোনার খনি!

ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন মামা অনায়াসে দেখছেন। আমার কেবলই চিন্তা হচ্ছে কালকের মধ্যে পাঁচ লক্ষ টাকা চাই। হঠাৎ খেয়াল হল, আমার খালাত ভাই সোহরাব মিয়া নারায়ণগঞ্জে অত্যন্ত অবস্থাশালী। তিনি মামার চাচাত বোনের ছেলে। কন্ট্রাকটরি করে প্রচুর কামিয়েছেন, নারায়ণগঞ্জের অনেকগুলো বাড়ির মালিক। ভাবলাম তিনি যদি কিছু করতে পারেন। টেলিফোনে পেলাম। আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন। জিজ্ঞেস করলাম, গাড়ি আছে?

তিনি বললেন, আছে, কেন?

তা হলে এক্ষুণি গাড়িতে ওঠেন এবং দুর্ঘটনা না ঘটিয়ে যত তাড়াতাড়ি পারেন আমার বাসায় মিন্টু রোডে চলে আসেন।

গুরুত্ব উপলব্ধি করে তিনি সঙ্গে সঙ্গে চলে এলেন। তাকে সব বলা হল।

আমাকে বললেন, আমাকে কী করতে হবে বল?

বললাম, আপনারা দু'জনই আমার মুরুব্বী। তবুও আমি প্রস্তাব করতে চাই, টাকা আপনি যোগাড় করুন কালকের মধ্যে। মামা একটা সোনার খনি নিলামে ধরেছেন। দু'জনে সমান অংশীদারিত্ব নিয়ে 'স্টিল কিং' এর মালিক হয়ে ব্যবসা করুন। মামা নিলাম এনেছেন এবং পরিশ্রম দেবেন, বুদ্ধি দেবেন। আপনি দেবেন টাকা।

সোহরাব ভাই খাঁটি ব্যবসায়ী মানুষ। বুঝলেন, ভবিষ্যতে 'স্টিল কিং' সত্যিই সোনা ফলাবে। এককথায় সম্মত হয়ে গেলেন। বললেন, মামা যখন ডাক পেয়েছেন, তুমি বলছো—বিছ্‌মিল্লাহ, আমি রাজি।

শুরু হল 'স্টিল কিং' এর ব্যবসা। মামা প্রচুর কামালেন, গাড়ি হাঁকিয়ে সব জায়গায় ঘুরে বেড়ান। সত্যিই খাজা বাবার দরবারে দাঁড়িয়ে যেভাবে টাকা চেয়েছিলেন, আল্লাহ্ তাঁর দু'হাত ভরে দিয়েছেন টাকায়।

হলে কী হবে, মামার পকেটে দশ টাকা থাকলে তিনি বিশ টাকা খরচের পরিকল্পনা করেন। টাকা খরচেই তাঁর আনন্দ। নির্বাচনের সময় বাড়ি গিয়েছি, কোন প্রয়োজন নেই, প্রায় একতরফা নির্বাচন। তবুও বাড়িতে রাত-দিন খাওয়া-দাওয়া চলছে। কিছু বললে বকুনি লাগান, ইলেকশনে এসব লাগে, তুমি কী বুঝবে?

বিদায়ের সময় সকলের সম্মুখে জিজ্ঞেস করেন, সঙ্গে টাকা-পয়সা কিছু আছে, না খালি হাতে ঘুরে বেড়াচ্ছ?

বুঝলাম তিনি কিছু দিতে না পারলে শান্তি পাবেন না। মাথা চুলকাতে লাগলাম, মামার পকেট থেকে পয়সা নেওয়ার আনন্দই আলাদা। সেই ছোটবেলার অভ্যাস।

তিনি সবাইকে ডেকে হাসিমুখে বললেন, দেখেন, আপনার বাবা আমার ইলেকশন করছে। পকেট তার শূন্য।

তখন আমি মন্ত্রী, টাকা-পয়সার অসুবিধা নেই। তেমন প্রয়োজনও নেই। মামা তাঁর পকেট থেকে এক তোড়া নোটের বাণ্ডিল আমার পকেটে গুঁজে দিলেন। আমি হাসিমুখে তা নিলাম। মামাকে তৃপ্তি দিলাম। টাকাগুলো অচিরেই কর্মীদের দিয়ে বললাম, মামার উপহার, ইচ্ছামতো খরচ কর।

এমনি ছিলেন তিনি। অনেক পরে তাঁর ছেলে আউয়ালের বিয়ে দিতে হবে। আমাকে মেয়ে দেখতে বললেন। একটি সুন্দরী মেয়ে আমার পছন্দও হল। মামাকে বললাম, মামীকে নিয়ে মেয়ে দেখুন। আউয়ালকে দেখান।

তিনি আমার ব্যাপারে অন্ধ। বললেন, তুমি দেখে পছন্দ করেছ। আমাদের দেখার কি প্রয়োজন?

বললাম, সারাজীবন যে সংসার করবে সেই আউয়ালকে অন্তত দেখানো প্রয়োজন।

তিনি বললেন, কোন প্রয়োজন নেই। তুমি তারিখ ঠিক কর।

তবুও আউয়ালকে বলা হল। সে এসে তার ভাবী সালেহাকে বলল, অন্য একটি মেয়ে তার ইতিমধ্যেই পছন্দ করা আছে। কাজেই আর মেয়ে দেখার প্রয়োজন নেই।

ঠিক কথা। আমি হাসিমুখে মামাকে বললাম, তার যেখানে পছন্দ সেখানেই বিয়ের ব্যবস্থা করি।

তিনি ক্ষেপে গেলেন, তুমি পছন্দ করেছ—সেটা ছেড়ে সে নিজের পছন্দের মেয়ে বিয়ে করবে, আমি বেঁচে থাকতে কিছুতেই নয়।

মহাবিপদে পড়া গেল। বাসায় পরিবারের সকল সদস্যের সঙ্গে ঝগড়া করেছেন। মামী এবং আর সকলে এক পক্ষ, মামা একলাই এক পক্ষ। মামী টেলিফোনে বললেন, বাড়িতে যত দলিলপত্র ছিল সব নিয়ে ক'দিনের জন্য তিনি উধাও।

মামা বিভিন্ন সময় খুলনা, চট্টগ্রাম যান, তাই চিন্তা হল না। কিন্তু দলিল-দস্তাবেজ নিয়েছেন কেন?

দিন দু'য়েক পর আমার গুলশানের বাসায় এসে তিনি হাজির। সঙ্গে অনেক কাগজপত্র।

কি মামা?

তিনি বললেন, সম্পত্তি যা আছে সবকিছু তোমার নামে দানপত্র করে দিয়েছি। আমি কাউকে এক কড়ির সম্পত্তিও দেব না।

হাসলাম। তাঁকে জোর করে নাওয়া-খাওয়ার ব্যবস্থা করে বিশ্রামে পাঠিয়ে তাঁর ছেলেদের সব ডেকে আনলাম। বিকালে সবাইকে নিয়ে বৈঠকে বসলাম। আমি বললাম, মামা, আপনি সারাজীবন আমাকে যে স্নেহ-মমতা দিয়েছেন, সারা দুনিয়ার বিনিময়েও তা পাওয়া যাবে না। আপনার সম্পত্তিতে আমার লোভ নেই। আমাকে লিখে দিয়েছেন—আমি সব তাদের নামে দিয়ে দেব, তখন?

মামা বললেন, সে তুমি বুঝবে। মোটকথা, আমি এইসব অবাধ্য সন্তানদের কিছু দিয়ে যাব না।

কথায় কথায় সব বেরুল। আউয়ালের পাত্রী নির্বাচনই মূল গোলযোগের সূত্রপাত। সকলকে ধমকালাম, একজন উচ্চকণ্ঠে কথা বলাতে এক চড় লাগালাম। সকলকে দিয়ে তাঁর পা ধরিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করালে তিনি শান্ত হলেন। দানের দলিল তাঁর সম্মুখেই ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেললাম। এই আমার মামা!

তখন জাতীয় পার্টির সময়—মামা ধরলেন গ্রামে পূর্বে বাজার ছিল। এখন উঠে গিয়েছে। নতুন করে বাজার প্রতিষ্ঠা করবেন। করা হল। বাজারের নাম হল মামার বাজার। গ্রামে পূর্বে পোস্টঅফিস ছিল। অন্যত্র চলে গিয়েছে। নতুন পোস্টঅফিস দিতে হবে। খুবই কঠিন কাজ। তবুও তাঁর স্বপ্ন বাস্তবায়িত হল। রাস্তা চাই, মসজিদ চাই, হাসপাতাল চাই—সবই করে দেওয়া হল। সবকিছুর পশ্চাতে তাঁর এবং তাঁর ভাগ্নে সোহরাব মিয়ার অবদান সর্বাধিক। বস্তুত দোগাছি গ্রামের উন্নয়ন, এলাকার উন্নয়ন ছিল তাঁর ধ্যানজ্ঞান। গ্রামে আজ সব হয়েছে। প্রায় সবটাই মামার অবদান। দুঃখ করে বলতেন, এরশাদ তোমাকে মহাসচিব বানিয়ে এত খাটাচ্ছে, উপ-প্রধানমন্ত্রী করে না কেন?

উপ-প্রধানমন্ত্রী হলাম। কিন্তু মামা তা দেখে যেতে পারলেন না। তাঁর পূর্বেই তাঁর সাধের দেশ, সাধের গ্রাম আর অনেক স্নেহের আমাদের সবাইকে অভিভাবকহীন করে দুনিয়া থেকে চির বিদায় নিলেন।

মামার বাজার থেকে গাড়িতে ওঠার সময় পড়ে গিয়ে জ্ঞান হারালেন। তাঁর দুই পুত্র সেলিম এবং হালিম ডাক্তার হয়েছে। তাঁরা সকলে অনেক করল। সেই জ্ঞান আর ফিরে এল না। ঢাকায় এনে সম্ভাব্য সব চেষ্টাই করলাম, কিন্তু ধরে রাখা গেল না।

এরশাদের সবচাইতে বড় জনসভা রংপুরে—সেদিনই রংপুরের জনগণ প্রকৃতভাবে তাঁকে সর্বপ্রথম গ্রহণ করল তাদের সন্তান হিসাবে। সেই সভায় বক্তৃতা করছি, শেখ শহীদ উঠে এসে কানে কানে বলল, আপনাকে ঢাকা ফিরতে হবে এক্ষুণি। মামা আর নেই।

তিনি ছিলেন সকলের মামা। প্রেসিডেন্ট সাহেব আমাকে একটি হেলিকপ্টার নিয়ে তখনই ঢাকায় চলে আসতে বললেন। সঙ্গে এল শেখ শহীদ। মৃত মামার বুকের উপর আছরে পড়ে কেবলই মনে হচ্ছিল, আমার মা শৈশবে মরেননি, তিনি আজই ইহলোক ত্যাগ করলেন।

মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব থেকে তিনি প্রায়ই নাস্তার টেবিলে এসে আমাকে ধরতেন। বলতেন, তোমার সঙ্গে জরুরি কথা আছে।

বলতাম, মামা, পরে শুনব।

মামা কি টের পেয়েছিলেন, দিন তার শেষ! বলতেন, তুমি পরে শুনবে। কিন্তু পরে আমি যদি শোনাবার সময় না পাই! আমার তো চলে যাওয়ার সময় হয়ে এল!

আমি তাঁকে জোর করে থামিয়ে দিতাম। বলতাম, না, আপনি নেই, কোথাও নেই—একথা আমি ভাবতে পারি না।

করুণ হেসে তিনি বলতেন, কিন্তু একদিন তা ভাবতে হবে। একদিন দেখবে আমি নেই।

আমি আর কথা শুনতে চাইতাম না। উঠে যেতাম।

মামা বড় দার বাসায় গিয়ে তাঁকে বলতেন, মোয়াজ্জেমকে কোন কথাই শোনাতে পারছি না। কিন্তু আমার যে কথাগুলো বলা বড়ই প্রয়োজন।

বড়া দাও তাঁকে আমার মতোই ভালোবাসতেন। তিনিও রাগ করে বলতেন—কথা বলার সময় কি শেষ হয়ে গেল? ঢের সময় পাবেন, তখন বলবেন!

মামা আবারও করুণ হাসতেন।

সত্যিই তাঁর সময় শেষ হয়ে এসেছিল। কথা আর বলা হল না। তাঁর নির্দেশ মতো আমরা আজিমপুর গোরস্থানে তাঁকে চিরদিনের জন্য রেখে এলাম।

যদি আর একদিন সময় পেতাম, জেনে নিতাম তিনি কী বলতে চেয়েছিলেন আমাকে! সারাজীবন কেবল আমাকে দিয়ে দিয়েই ধন্য করেছেন, যাবার পূর্বে শেষ উপদেশটুকু দিয়ে যেতে পারেননি। আমিই নিতে পারিনি।

দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটছিল। নির্দিষ্ট আয়ের মানুষ সংসার চালাতে হিমশিম খাচ্ছিল। স্বল্পবিত্ত বা নিম্নবিত্তরা কায়-ক্লেশে জীবনযাপন করছিল। বিত্তহীন এবং নদী ভাঙনের ফলে বাস্তুহারাদের দল শহরমুখী হয়ে অবস্থার ক্রমাবনতি ঘটাচ্ছিল। উত্তরাঞ্চল অপেক্ষাকৃত দরিদ্র এলাকা। প্রায় দুর্ভিক্ষাবস্থা বিরাজ করছিল সেখানে। চালের মূল্য, প্রতিদিনের ব্যবহার্য জিনিসপত্রের মূল্য সাধারণ মানুষের ক্রয়-ক্ষমতা বহির্ভূত হয়ে গেল। লবণের মূল্য অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পেল। পাকিস্তান আমলে এই লবণের দাম ষোল টাকা হওয়াটা ছিল তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিনের পতনের অন্যতম কারণ। সে কথা মানুষ বারংবার স্মরণে আনল। সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে সরলপ্রাণ খাদ্রমন্ত্রী ফণীভূষণ মজুমদার বলে ফেললেন, চালের মণ এক শত টাকার উর্ধ্বে যাবে না।

তখনও এক শত টাকার অনেক নিচে চালের মূল্য, অবশ্য প্রতিদিনই তা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। বঙ্গবন্ধু খাদ্যমন্ত্রীর উক্তিতে রাগান্বিত হলেন। কিন্তু ফণী দা বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি। বঙ্গবন্ধুও তাঁকে দাদা বলেই সম্বোধন করতেন। স্পর্শকাতর খাদ্য মন্ত্রণালয় নিয়ে তিনি বেসামাল অবস্থায় পড়লেন।

দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে অনাহারে-অর্ধাহারে দিনযাপনের সংবাদ আসতে থাকল। চারদিকে একটা নৈরাজ্য এবং অস্থিরতার আবহাওয়া বিরাজ করছিল। রাজনৈতিক অবস্থার অধিকতর অবনতি লক্ষ্য করা গেল। তখন এক শ্রেণীর তথাকথিত আল্ট্রা বামপন্থীদের একটি অংশ চরম পন্থার প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হয়ে ওঠে। 'বন্দুকের নলই ক্ষমতার উৎস'—এই স্তোক বাক্য আদর্শবাদিতার পর্যায়ভুক্ত করে তারা খুন, গুম খুন, ব্যাংক লুট, থানা আক্রমণ, পোস্টঅফিস পুড়িয়ে দেওয়া প্রভৃতি নাশকতামূলক কর্মে লিপ্ত হল। বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে এদের ব্যাপকতা প্রতিদিন বৃদ্ধি পেতে থাকল। রাজধানী ঢাকার নাকের ডগায় অবস্থিত লৌহজংয়ে এরা কেবল থানা লুট করে সমস্ত অস্ত্রপাতি নিয়ে গেল তাই নয়, এরা রক্ষীবাহিনীর লঞ্চ আক্রমণ করার মতো দুঃসাহসিক কাজেও লিপ্ত হল।

বিভিন্ন স্থান থেকে রাজনৈতিক কর্মীদের হত্যার খবর আসতে থাকল। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরাও বাদ পড়লেন না। বরিশালের মঠবাড়িয়ার শওগাতুল আলম সাগীর, ফরিদপুরের নুরুল ইসলাম, কুষ্টিয়ার গোলাম কিবরিয়াসহ বেশ কয়েকজন নির্বাচিত প্রতিনিধি চরমপন্থীদের দ্বারা নিহত হলেন। শেষোক্ত জন ঈদের নামাজের জামাতে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হলেন। আমরা বক্তৃতা-বিবৃতির মাধ্যমে শোক প্রকাশ করতে লাগলাম। কাগজে দুষ্কৃতিকারীদের শাস্তি বিধানের দাবি জানালাম। বঙ্গবন্ধু শোকবাণী পাঠান। তাঁর সঙ্গে নিহতের পরিবারের জন্য প্রেরণ করেন নগদ আর্থিক সাহায্য।

ক্রমে সরকারের শাসন কাঠামোয় ভয়-ভীতি লক্ষিত হতে লাগল। এক অনীহা বা কর্মবিমুখতার আবহাওয়া সৃষ্টি হল। চরমপন্থীদের উপর সর্বগ্রাসী কোন সরকারি ব্যবস্থা গৃহীত না হওয়ায় দিন দিন তাদের শক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকল।

দেশের তরুণ সমাজ সেদিকে অধিকতর আকৃষ্ট হল। মেধাবী ছাত্রদেরকে দেখা যেত এইসব চরমপন্থী দলের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে। বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন নামে ও নেতার নামে গ্রুপের নাম দিয়ে এরা অপারেশন করত। সিরাজ শিকদার গ্রুপের কর্মপ্রবাহ বিস্তার লাভ করেছিল আমার জেলা মুন্সীগঞ্জে। বিশেষ করে লৌহজং এবং শ্রীনগর থানায় এদের প্রকোপ সমধিক বৃদ্ধি পেল। দিনের বেলায় সরকারের কার্যক্রম দৃষ্টিগোচর হলেও রাতের অন্ধকারে ছিল ওদের একচ্ছত্র আধিপত্য। অনেকটা প্যারালাল সরকার তারা প্রতিষ্ঠা করে ফেলল। তাদের জোন ভাগ করা ছিল। কর্মপদ্ধতি ছিল সুচিন্তিত। সিরাজ শিকদার ছিল তাদের নিকট কিংবদন্তির নায়ক। সিরাজ শিকদারের পিতা একসময় লৌহজং থানার সিও (রেভিনিউ) হিসাবে কর্মরত ছিল বিধায় সিরাজ শিকদার এই এলাকাটিকে ভালোই চিনত। প্রাথমিক কর্মক্ষেত্রও বেছে নিল এখানটায়। তার নারীঘটিত দুর্বলতা ছিল বলে শোনা যায়। লৌহজং এলাকায় হয়ত একটি বিয়েও করেছিল। শোনা যায়, সে ছিল একজন মেধাবী ইঞ্জিনিয়ার এবং দক্ষ সংগঠক।

নকশাল বলে সাধারণ্যে আলোচিত সিরাজ শিকদারের লোকজন হেন অপরাধমূলক কাজ নেই যা করত না। ডাকাতি, নারী ধর্ষণ, লুণ্ঠন, চাঁদাবাজি ছিল তাদের প্রাত্যহিক কর্মসূচি। কোন কোন দূরবর্তী বাজারে তারা দিনের বেলাতেও 'তোলা' বা 'রাজস্ব' আদায় করত। অপেক্ষাকৃত বর্ধিষ্ণুদেরকে প্রকাশ্যে চিঠি দিত নির্ধারিত অংকের চাঁদা পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে। পছন্দ হলে তেরো বছরের মেয়েটিকেও তারা রেহাই দিত না। অস্ত্রের মুখে জনসাধারণ যারপরনাই অসহায় হয়ে পড়ল। যাদের সঙ্গতি ছিল, বসবাস স্থানান্তরিত করল। সমগ্র এলাকাবাসী নিদারুণ ভয়-ভীতির মধ্যে দিনাতিপাত করতে লাগল।

দেশের স্বাধীনতা তাদের জন্য কী আনল? এ কী নতুন গজব আল্লাহ্ দিলেন তাদের অসহায় কাঁধের উপর! সরকার গতানুগতিক কাজ করে যেতে লাগল। ব্যাংক, পোস্টঅফিস বা থানা লুণ্ঠিত হলে উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা তদন্তে গিয়ে অধস্তনদের বকাঝকা করেই কর্তব্য সমাধা করতেন। মালামাল বা লুণ্ঠিত অস্ত্রাদি আর উদ্ধার হত না। ওদের অস্ত্র শক্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকল।

তাদের আক্রমণের মূল লক্ষ্য ছিল সরকারি দল আওয়ামী লীগের প্রতিবাদী নেতৃবৃন্দের উপর। ওরা প্রকাশ্য দিনের বেলায় শ্রীনগর রেজিস্ট্রারের অফিসে থানা আওয়ামী লীগের সম্পাদক আবদুর রশীদকে হত্যা করল। রশীদ ছিল আমার স্থানীয় দক্ষিণ হস্ত। খবর পেয়ে ছুটে গেলাম। লোকজন ভয়ে কাছে ঘেঁষতে চায় না। পাছে আমি ঢাকা চলে গেলে ওদের উপর আঘাত নেমে আসে। কে যে সিরাজ শিকদারের দলে রয়েছে, কে যে পরোক্ষভাবে তাদের সহায়তা করে বলা দুষ্কর। মলিন মুখে কিছু লোক এগিয়ে এল। তাদেরকে নিয়ে রশীদের মরদেহ তার গ্রামে কবরস্থ করে চোখের পানিতে ঢাকা ফিরে এসে কাঁদতে কাঁদতে বঙ্গবন্ধুকে করুণ কাহিনী বর্ণনা করলাম। তিনি আফসোস করলেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে টেলিফোনে জোর তাগিদ দিলেন দুষ্কৃতিকারীদের বিরুদ্ধে অনতিবিলম্বে ব্যবস্থা নিতে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ধমক দিলেন আইজিকে, তিনি ডিআইজিকে, ডিআইজি ধমকালেন এসপিকে, এসপি তাঁর গোস্বা উদগীরণ করলেন ওসির ওপরে। ওসি আর কী করবে! কনস্টেবল বেচারীদের ধমকাধমকি করে তার তাৎক্ষণিক কর্তব্য সমাপন করলেন। কনস্টেবল বাড়ি ফিরে স্ত্রীর সাথে দুর্ব্যবহার করল এবং পরিণতিতে স্ত্রীর হাতে গৃহকোণের বিড়ালটি অকারণে নির্দয়ভাবে প্রহৃত হল। বিড়ালটি দেওয়ালে ঘনঘন আঁচড় কেটে তার গোস্বা প্রকাশ করছিল কিনা বলা দুষ্কর।

রশীদের হত্যার সুরাহা তো হলই না। সিরাজদিখান আওয়ামী লীগের সম্পাদক অজাতশত্রু শান্তি বোস সরকারের মতো দেবতুল্য মানুষকে তারা নির্মমভাবে হত্যা করল। হত্যা করল মুন্সীগঞ্জ জেলা ছাত্রলীগের সদ্য বিবাহিত সভাপতি গোলজার হোসেনকে। নববধূর হাতের মেহেদির রঙ তখনও লাল। স্বামীর বুকের লাল রক্তের সঙ্গে মিলে মিশে গেল। তরুণী বিধবার সম্মুখে দাঁড়াবার মনোবল পাই না। লৌহজং আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি প্রতিবাদী কণ্ঠ মজিবর রহমানকেও তারা নির্দয়ভাবে হত্যা করল। হত্যা করল শ্রীনগর থানার কুকুটিয়ার একসময়ের সম্ভ্রান্ত জমিদার শ্রী হারানিধি চৌধুরীকে। চারদিকে এত আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল যে, সাধারণ মানুষ ওদের দেখলে যেমন ভয় পেত, আমার মনে হত, আমাদের দেখলেও ব্যর্থ, অপদার্থ এবং অকর্মণ্য মনে করে অন্তর থেকে হয়ত ঘৃণাই করত।

দুর্বিষহ এই অবস্থা চলতে দেওয়া যায় না। চিফ হুইপ হিসাবে না হোক, জেলার একজন জনপ্রতিনিধি হিসাবে আমার দায়িত্ব রয়েছে জনগণের জীবন ও

সম্পদের নিরাপত্তা বিধান করার। আমি শত সতর্কবাণীকেও ভয় করিনি। প্রতিটি ঘটনার পর ছুটে গিয়েছি অকুস্থলে, চেষ্টা করেছি মানুষের মনোবলের ধস ঠেকাতে, পুলিশ বাহিনীকে সক্রিয় করতে। কিন্তু সকলই নিষ্ফল। ঘটনা ঘটতেই থাকল। রোম ভস্মীভূত হলেও সেই নীরোর বংশী বাজতেই থাকল।

আমাকে মাঝে মাঝে চিঠি দিয়ে সতর্ক করা হত। সে চিঠিতে এক টুকরা কাফনের কাপড় এবং দশটি টাকাও থাকত। ইচ্ছামতো শেষ খাবার খাওয়ার পরামর্শ থাকত। আমি দারুল কাবাবে গিয়ে সেই টাকায় কাবাব খেয়ে আসতাম। কাউকে ভাগ দিতাম না। কারণ, সেটা যে আখেরি খাবার।

টেলিফোনে প্রায়ই ধমক দিয়ে ভয় দেখাবার চেষ্টা করত। সালেহাকে প্রায়ই বলত, সে কত শীঘ্র বিধবা হচ্ছে! তার ভিতর ভয় সংক্রামিত হল। এমনি একটি টেলিফোন একদিন ধরে অনুরোধ করলাম, টেলিফোন না রেখে আমার ক'টি কথা শোনার জন্য।

বলল, ঠিক আছে, বল কি বলতে চাস্!

তুই-তোকারি করল। বললাম, আমাকে হত্যা করতে চাও, তুমি তো একজন সাংঘাতিক ব্যক্তি, সাহসী এবং একজন বীর পুরুষ। আমার একটি ছোট্ট প্রস্তাব আছে, যদি গ্রহণ কর!

আবার বলল, ভণিতা না করে বল, কি বলবি?

বললাম, তুমি একটি স্থান ঠিক কর, তারিখ এবং সময় সাব্যস্ত কর এবং তোমার ইচ্ছামতো যে কোন অস্ত্র নিয়ে আমাকে হত্যা করার জন্য আস। তোমার সময়, স্থান এবং তারিখে তোমার নির্দিষ্ট করা জায়গাতেই আমি আমার ইচ্ছা মতো অস্ত্র নিয়ে আসব। আমরা দু'জনই সেখানে যাব। কিন্তু ফিরব কেবল একজন, হয় তুমি, নয় আমি! কী রাজি?

বীরপুঙ্গব একটা জঘন্য গালি দিয়ে টেলিফোন রেখে দিল। এরপর থেকে টেলিফোনে ধমকের মাত্রা সামান্য হ্রাস পেয়েছিল।

শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থায় একদিন আবার বঙ্গবন্ধুর নিকট গেলাম। সব তাঁকে খুলে বললাম, বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের খবর প্রায় একই প্রকার। তিনি অতিশয় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হলেন। ক্যাপ্টেন মনসুর আলীকে ডেকে আনলেন। সাব্যস্ত হল, মুন্সীগঞ্জের সমস্যা নিয়ে আমি, কোরবান সাহেব, এসপি মাহবুব এবং তদানীন্তন ডিআইজি রকিব খন্দকার আমার অফিসে বসব এবং সমস্যার মূল কীভাবে উৎপাটন করা যায় তার প্রস্তাবনা রাখব। তা-ই করা হল। তিনটি তালিকা প্রণীত হল। প্রথম তালিকাভুক্তদের ধরে এনে সংশোধনের চেষ্টা করা হবে। সংশোধিত হলে উপযুক্ত লোকের জামিনে তাদেরকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে সাহায্য করা হবে। পরের তালিকায় অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ ক্যাডারদের ধরে এনে দীর্ঘমেয়াদী কারাবাস এবং সম্ভাব্য ক্ষেত্রে বিচারের সোপর্দ করার প্রস্তাব করা হল।

তৃতীয় তালিকাভুক্তরা ছিল পুলিশের মতে মারাত্মক ধরনের খুনী। রক্ষীবাহিনী দিয়ে এদেরকে সমূলে পর্যুদস্ত করার পরিকল্পনা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হল। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী সে প্রস্তাবনাসমূহ অনুমোদন করলে পুলিশ ও রক্ষীবাহিনী একযোগে কার্যক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ল। মূলত এটা রক্ষীবাহিনীরই অপারেশন বলে চিহ্নিত হল।

স্থানীয়-কর্মী ব্যতীত ওদের বাড়িঘর, আস্তানার ঠিকানা পাওয়া দুষ্কর। সে সময় অসমসাহসী মুক্তিযোদ্ধা ইকবাল, গণি, সামাদ, খায়রুল, শাহ্‌জাহান এবং অন্যান্য কর্মীরা রক্ষীবাহিনীর সঙ্গে থেকে এলাকা সন্ত্রাসমুক্ত করার জন্য প্রচুর কাজ করেছে।

এসব কর্মীরা সবসময় ছায়ার মতো আমার সঙ্গে থাকত। একবার শ্রীনগর থেকে ছোট লঞ্চে চেপে খাল বেয়ে লৌহজং যাচ্ছি রাতের বেলা। গোহালিমান্দ্রা বলে একটা নামকরা হাট আছে। লঞ্চ সেখানে আসতেই বুঝা গেল দুষ্কৃতিকারীদের একটা দল সেখানে অবস্থান নিয়েছে, আমার লঞ্চ আক্রমণ করবে। ছয় জন পুলিশ ছিল আমার পাহারায়। অবশ্য আমার কর্মীরা ছিল অনেক। ইকবাল পুলিশদের বলল, গোলাগুলি হলে আপনারা ভালো মনে করলে সরে পড়বেন, কিন্তু রাইফেল আর গুলি রেখে যাবেন।

সকলেই ছিল ট্রেনিংপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা। সমূহ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলাম। তারা ছিল ওপরে। আর আমরা খালের মধ্যে নিচে। এসএস বাহিনীর লোকদের আলোচনা আমরা শুনতে পাচ্ছিলাম। অবস্থানটা বিবেচনীয়। একে রাত, তার ওপর আমরা লঞ্চে এবং নিচে অবস্থারত। তারা উপরে এবং সংখ্যায় কত জানা নেই। মনে সাহস নিয়ে প্রস্তুত থাকলাম। লঞ্চে যতটুকু হর্স পাওয়ার ছিল, গতিবৃদ্ধি করা গেল।

শুনলাম শিকদার বাহিনী স্পষ্টত দুই ভাগে বিভক্ত। তারা তর্ক করছে। একদল বলছে চিফ হুইপের সঙ্গে প্রচুর লোক এবং প্রচুর গোলা-বারুদ রয়েছে। এ্যাটাক করা ঠিক হবে না। অন্যরা এক্ষুণি আক্রমণের পক্ষে। এমন সুযোগ হাতছাড়া করা যায় না। তাদের তর্কাতর্কির মধ্যে লঞ্চ ঠিকই এগুচ্ছিল। ওরা খানিকটা পেছনে পড়ে গেল। সেদিনের মতো অব্যাহতি দিল। বলল, বেটা তো প্রায়ই আসে। আর একদিন তাকে ধরা যাবে।

দেশে যাওয়া কমাইনি, বরং বিপদের দিনে বেশি করে গিয়েছি। লঞ্চ নিয়ে একদিন মাওয়া অবতরণ করলাম। মুন্সীগঞ্জের এসডিও এবং এসডিপিও সঙ্গে আছে। পুলিশ আজ কয়েকজন বেশি। ঘটনাচক্রে আমার ছেলে রানাও সঙ্গে ছিল। মাওয়া থেকে বাড়ি পৌঁছে সেখানে রাত্রিযাপন করব। লঞ্চ ভিড়তেই দেখতে পেলাম চারদিকে অ্যামবুশ করে আছে সিরাজ শিকদার বাহিনী। যে কোন মুহূর্তে সংঘর্ষ আসন্ন। শুধু রানার জন্য দুশ্চিন্তায় মন ছেয়ে গেল। একটা ছেলে, সেও আজ সঙ্গে! শেষ পর্যন্ত কী কারণে তারা এ্যাটাক করল না। সে

যাত্রাও বাঁচলাম। বস্তুত বাঁচাবার মালিক আল্লাহ্। তিনি বারবার আমাকে এভাবে রক্ষা করেছেন যে তার ইয়ত্তা নেই।

খোরশেদুল আলম বলে সিরাজ শিকদারের বাহিনীর এক সদস্য একদিন সরাসরি আমার বাসায় এসে আত্মসমর্পণ করল এবং ওদেরকে দমনের প্রশ্নে সহায়তা করতে সম্মত হল। ওকে পুলিশ কর্মকর্তা ই. এ. চৌধুরীর কাছে পাঠালাম। খোরশেদ পরবর্তী সময়ে সত্যিই অপূর্ব কাজ করেছিল। তার সহায়তায় তাদের দলের আস্তানা থেকে অনেক ক্যাডারকে গ্রেপ্তার করার সুবিধা হয়েছিল। খোরশেদ পরে আমার সঙ্গে রাজনীতি করত শ্রমিক ফ্রন্টে। জাতীয় পার্টির সরকারের সময়ে ওকে একবার শ্রমিক প্রতিনিধি হিসাবে জেনেভাতে প্রেরণ করেছিলাম।

অনেক পরিশ্রম এবং দীর্ঘ সময়ের সমন্বিত প্রচেষ্টায় সিরাজ শিকদার গ্রুপের কর্মকাণ্ড মুন্সীগঞ্জ জেলায় স্তব্ধ করতে পেরেছিলাম। কেউ জেলে, কেউ পালিয়ে এবং কেউ নিহত। পরে অবস্থা কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে এলে এরা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে আশ্রয় নিয়ে দলগুলোকে অনেকাংশে অপরাধী এবং দুষ্কৃতিকারীদের আশ্রয় স্থলে পরিণত করল।

সিরাজ শিকদারকে গ্রেপ্তার করার জন্য দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত সবক'টি বাহিনী উঠে-পড়ে লাগল। কিন্তু কিছুতেই কোন সুবিধা হয় না। কিন্তু সে যে দেশের অভ্যন্তরেই রয়েছে এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে সর্বহারা দলের বিক্ষিপ্ত কর্মকাণ্ডের সংবাদ আসে। তার অস্তিত্বের প্রমাণ মিলে যখন দেখা যায় সহিংস কোন রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড বা অপরাধ সংগঠিত হচ্ছে তাদের নিজস্ব পদ্ধতিতে। অনেক স্থানে তারা চিরকুট রেখে যায়। কি কারণে এ শাস্তি প্রাপ্য তার কৈফিয়ত থাকে। সিরাজ শিকদার গ্রেপ্তার না হওয়া পর্যন্ত সরকার নির্বিঘ্ন হতে পারছে, না নিরাপদ বোধ করছে না।

নেতার সঙ্গে গণভবনে থাকা ছিল আমাদের অলিখিত কর্তব্য। বঙ্গবন্ধু এমন একজন আকর্ষণীয় মানুষ ছিলেন, যাঁর কাছে চুপ করে তাঁর মুখপানে চেয়ে বসে থাকলেও তৃপ্তি পাওয়া যেত। সৃষ্টিকর্তা তাঁকে এই বিশেষ গুণটি উজাড় করে দিয়ে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছিলেন। তাই তাঁর সান্নিধ্য সব সময়ই ছিল একান্ত কাম্য। তিনি ছিলেন এমন একজন মানুষ, যিনি তাঁর চারপাশে মানুষের আনাগোনা না দেখলে অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করতেন। আমরা নিজেদের মধ্যে বলতাম বিবি অর্থাৎ বঙ্গবন্ধু তাঁর ডানে-বামে, সম্মুখে ও পশ্চাতে চারদিকে লোক দেখতে না পেলে বোধহয় জনপ্রিয়তা নিয়ে সন্দেহপ্রবণ হয়ে ওঠেন। তাঁর ঘরে প্রবেশের জন্য আমাদের কয়েকজনের অনুমতির প্রয়োজন হত না—যদি না কোন বিদেশী মেহমান সেখানে থাকতেন।

একদিন বিকেলের দিকে তাঁর রুমে ঢুকে দেখি তিনি অপ্রসন্ন মুখে একাকী

বসে আছেন, হাতের পাইপটিও নিভন্ত। আমাকে দেখে খামোখা ধমকে উঠলেন, কোথায় থাকিস সারাদিন, কী করিস? আমাকে একাই সব দায়িত্ব সামলাতে হবে?

ভড়কে গেলাম। আমি তো এমনিই এসেছি! গণভবনে আমার কোন কাজ নেই। তা হলে এই বকুনি কেন?

বললাম, লীডার, এক মিনিট! এখুনি আসছি।

ভাবলেন, আমার হয়ত ছোট বাথরুম পেয়েছে। চুপ করে রইলেন। আমি রফিক ভাইকে জিজ্ঞেস করলাম, আবহাওয়ার পূর্বভাস কী? বিবি. এত ক্ষেপে রয়েছেন কেন?

রফিক ভাই হেসে জবাব দিলেন, এত দিনেও নেতাকে চিনে উঠতে পারলেন না? লোকজন খবর দিন। সভাসদরা এসে পড়লেই মেজাজ খোশ হয়ে যাবে!

তাই করলাম। ওখানে থেকেই লাল টেলিফোনে সৈয়দ নজরুল ইসলাম সাহেবকে ধরলাম, স্যার, কি করছেন?

কেন?

এক্ষুণি গণভবনে চলে আসুন। সাথে কোন মন্ত্রী বা সদস্য থাকলে তাকেও নিয়ে আসুন।

বঙ্গবন্ধু প্রটোকলের রীতিনীতি সবসময় মানতেন—এটা বলা যাবে না। প্রয়োজনে আমি তাঁর পক্ষে অনেককে অনেক বার্তা দিই। বৈঠকে আমন্ত্রণ জানাই। তাঁরা তা জানেন।

তবুও সৈয়দ সাহেব একটু চিন্তিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কেন, কি হয়েছে? এত জরুরি তলব করছ কেন?

বললাম, স্যার, চলে আসুন, কারণ ক্রমশ প্রকাশিতব্য।

টেলিফোন করলাম কামরুজ্জামান ভাই, মনসুর ভাই, মোশতাক ভাইকে। গাজী মোস্তফা, ইউসুফ ভাই, সোহরাব ভাই এদেরকেও। যাকে পেলাম, এসওএস দিলাম অবিলম্বে গণভবনে চলে আসুন। বিবি'.র আপনাদের প্রয়োজন।

সকলেই নিকটবর্তী এলাকাতেই থাকেন এবং ঢাকার যানজট তখন নেই বললেই চলে। স্বল্পতম সময়ে তাঁরা সব হন্তদন্ত হয়ে চলে এলেন। আমার হাসিমুখের অভ্যর্থনায় কিছুটা আঁচ করে বঙ্গবন্ধুর ঘরে গিয়ে একে একে আসন গ্রহণ করলেন। আবহাওয়া দ্রুত পাল্টে গেল। বঙ্গবন্ধুর মুখে হাসি ফুটল। তিনি ঘরভর্তি লোক পেয়ে তাঁর জনপ্রিয়তার বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে হাসি-গল্পে মশগুল হলেন। আমি গোবেচারার মতো ভিতরে ঢুকে বললাম, লীডার, এখন কি আমরা এক কাপ করে চা পেতে পারি?

হাসিমুখে তিনি গর্জন করে উঠলেন, খুব ভণিতা দেখান হচ্ছে! এতক্ষণ চায়ের কথা বলিসনি কেন?

গভীর আনন্দে তিনি সম্পূর্ণ মনোযোগ ঢেলে দিলেন তার পাইপটিতে অগ্নিসংযোগের কাজে। যেন এর চাইতে বড় কাজ ভূ-ভারতে আর কিছু থাকতে পারে না।

বকুনি খেয়ে হাসিমুখেই চা-সমুচার অর্ডার দিলাম। আসর জমজমাট হয়ে উঠল। এমনি একটি অহেতুক সাক্ষাতে একদিন বঙ্গবন্ধুর ঘরে আছি। জিল্লুর রহমান সাহেব এবং আরও কেউ কেউ আছে। সবে সব আসতে শুরু করেছে। হঠাৎ বলা নেই, কওয়া নেই ঘরে ঢুকে পড়ল পুলিশের বড় কর্মকর্তা ই. এ. চৌধুরী এবং সিনিয়র এসপি মাহবুব। বঙ্গবন্ধুর কাছে প্রটোকল খুব একটা মানা হত না। তার স্নেহ-সিক্ত কিছু অফিসারও আমাদের মতো বিনা এত্তেলায় তাঁর ঘরে চলে আসতে পারত।

তারা দু'জন বঙ্গবন্ধুর কানে কানে কিছু একটা বলতেই তিনি মহা উল্লাসে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন, ওদের দু'জনকে আনন্দে বুকে জড়িয়ে ধরে শিশুর মতো উল্লাস প্রকাশ করতে থাকলেন। আমরা অবাক বিস্ময়ে তা দেখছি। তাঁর আনন্দ আর ধরে না! মনে হল, তারা তাঁকে সাত রাজার ধন মাণিকের সন্ধান দিয়েছে।

হাত ইশারায় আমাদেরকে বাইরে যেতে বললেন এবং আর এক দফা তাদের নিয়ে জড়াজড়ি-কোলাকুলি করতে থাকলেন। তাঁকে এমন আনন্দ প্রকাশ করতে অনেকদিন দেখিনি।

সঙ্গীদের কেউ জিজ্ঞেস করল, কি ব্যাপার, নেতার আজ এ কী রূপ! এত উল্লাসের কারণ কী?

অনুমানের উপর ভিত্তি করে বললাম, একমাত্র সিরাজ শিকদার ধরা পড়লেই এই মুহূর্তে নেতা এতটা খুশিতে বাগ বাগ হতে পারেন। অন্য কোন কারণ দেখছি না।

আমার অনুমানই সত্যে পরিণত হল। আমরা গণভবনে থাকতেই মুখে মুখে রটে গেল সিরাজ শিকদার গ্রেপ্তার হয়েছে। পরদিন এবং কয়েকদিন ওটাই ছিল সবচাইতে বড় সংবাদ এবং আলোচ্য বিষয়। তার গ্রেপ্তারের চাঞ্চল্যকর কাহিনী এবং পুলিশের বীরত্বগাথা সবিস্তারে প্রকাশিত হল। দেশের মানুষ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

স্বস্তির নিঃশ্বাস নিঃশেষ হতে না হতেই আর একটা অস্বস্তিকর সংবাদ পরিবেশন করা হল। সিরাজ শিকদার নাকি পালাবার চেষ্টা করেছিল, কর্তব্যরত পুলিশের গুলিতে সে প্রাণ হারিয়েছে। এই বানানো গল্প একটি মানুষও বিশ্বাস করল না। পরিষ্কার প্রতীয়মান হল, বিচার কার্যের দীর্ঘসূত্রিতার ঝামেলায় না

গিয়ে সিরাজ শিকদারকে হত্যা করা হয়েছে। অগণিত হত্যা ও নারকীয় অপরাধের নায়ক সিরাজ শিকদারকে শতবার ফাঁসি দেওয়ার হুকুম হোক—সেটাই ছিল সকলের কাম্য। কিন্তু সরকারের হেফাজতে বন্দি, সর্বপ্রকার নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার মধ্য থেকে সিরাজ শিকদার পালাতে সুযোগ পাবে এবং তাঁকে পুনঃগ্রেপ্তার না করে গুলি করে মেরে ফেলতে হল—এ ধরনের ভাষ্য কারো নিকটই গ্রহণযোগ্য হল না। বিচারের দীর্ঘসূত্রিতা এড়াতে অসহিষ্ণু কর্তৃপক্ষই তাকে হত্যার নির্দেশ দেয়। কথাটি আরও দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে উঠল, যখন বঙ্গবন্ধু দম্ভ করে পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে বলে উঠলেন, "কোথায় আজ সিরাজ শিকদার?"

প্রকারান্তরে তিনি বলেই দিলেন, তাকে হত্যা করা হয়েছে। সব হত্যার বিচার চায় বঙ্গবন্ধু তনয়া প্রধানমন্ত্রী। তা হলে সরকারের নিরাপদ হেফাজত থেকে কী করে সিরাজ শিকদারকে হত্যা করা হল? কার আদেশে সে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হল? সব হত্যার বিচার করবেন। করুন, সিরাজ শিকদার যত বড় অপরাধীই হোক, তার বিচার হতে পারে—তাকে বিনা বিচারে হত্যা করলে সেটিও নির্ভেজাল হত্যাকাণ্ড। করুন এই হত্যাকাণ্ডের বিচার! তবে না বুঝি, বাপের বেটী!

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামি সম্ভাবনাময় তরুণ স্টুয়ার্ট মুজিবকে কে হত্যা করার পরিকল্পনা করল এবং কীভাবে দেশের একজন সুযোগ্য সন্তান সম্ভাব্য রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার আশঙ্কায় নিহত হল তাও তদন্ত করে বের করা প্রয়োজন। প্রয়োজন সে হত্যাকাণ্ডের বিচার।

জাসদের সভাপতি আ. স. ম. আবদুর রব বঙ্গবন্ধু তনয়ার মন্ত্রিসভার উল্লেখযোগ্য সদস্য। এই জাসদ বারবার দাবি করেছে আওয়ামী লীগ সরকার তথা বঙ্গবন্ধুর সরকার তাদের হাজার হাজার কর্মী-নেতাকে হত্যা করেছে। আজ তারা সেসব মারফত আলীদের হত্যাকাণ্ডের বিচার চায় না কেন? "মন্ত্রিত্ব! তুহু মম শ্যাম সম!"

দেশের এক দুঃসময়ে আমারই একসময়ের বিশ্বস্ত সহকর্মী, বাংলাদেশের রাজনীতিতে অত্যন্ত বিতর্কিত কিন্তু বহু তরুণের রাজনৈতিক নেতা, সিরাজুল আলম খানের প্রচেষ্টা, উদ্যম এবং অক্লান্ত পরিশ্রমে তাদের ভাষায় আওয়ামী লীগের দুঃশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং বিকল্প স্বরূপ 'জাতীয় সমাজতান্ত্রিক

দল—জাসদ' জন্ম নেয়। আমার সঙ্গে সিরাজুল আলম খানের সম্পর্ক ভ্রাতৃসম। জাসদ প্রতিষ্ঠার পূর্বে সে এসেছিল আমার মিন্টু রোডের বাসস্থানে। তার ভাবীর হাতে পেয়াজ-কাঁচা মরিচ আর ভাজা ডিম সহযোগে প্রচুর পান্তা ভাত সেবন করে সে সারারাত ধরে আমাকে বুঝাল পদত্যাগ করে আপনি নতুন রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে আসুন, ভবিষ্যত উজ্জ্বল।

বললাম, প্রথমত বঙ্গবন্ধুকে পরিত্যাগ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত, তোর রাজনীতিটা একবার খুলে বল, শুনি।

সে বলল, সমাজতন্ত্র এবং বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রই দেশের সমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ। সেই পথেই এগুতে হবে।

বললাম, আমি তোর শুভ-কামনা করি। ইতিপূর্বে তুই আর আমি একই গণতান্ত্রিক ও জাতীয় চেতনার রাজনীতির ধারক-বাহক ছিলাম। তোর এই নতুন বৈপ্লবিক নীতি আমার নয়। তোর নতুন দলে আমার থাকার প্রশ্নই ওঠে না।

অবশ্য তাকে বললাম, অবসরপ্রাপ্ত মেজর জলীল একজন প্রখ্যাত মুক্তিযোদ্ধা। রাজনীতি করতে ইচ্ছুক। তাকে নিতে পারিস। আরও অনেকে জুটে যাবে। বাংলাদেশ বিরোধী দলের রাজনীতির উর্বর ক্ষেত্র।

তা-ই হল। জন্ম নিল জাসদ। সিরাজুল আলম খানের স্বপ্নপ্রসূত রাজনৈতিক দল।

প্রথম প্রথম এরা ভালোই কাজ দেখাল। সারা বাংলাদেশের ক্ষুব্ধ মুক্তিযোদ্ধাদের একটি অংশ এ দলে যোগ দিল। অবশ্য অনেকের মতে, কিছু হঠকারী ক্রিয়াকাণ্ডের ফলে সম্ভাবনাময় দলটির সাফল্য খুব একটা দৃষ্টিগোচর হল না। একবার ওরা বিক্ষোভ জানাতে গিয়ে, নিজেদের শক্তি-সামর্থ্য সম্বন্ধে অতিমাত্রায় উৎসাহিত হয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মনসুর আলীর বাসভবন আক্রমণ করে বসল এবং ফলশ্রুতিতে গুলি চলল। বেশ কয়েকজন নেতা-নেত্রী আহত হল। নিহত হল অনেকজন। সেটি কী হত্যাকাণ্ডের পর্যায়ে পড়ে? জাসদ সভাপতি মন্ত্রী মহোদয়ের অভিমত কী জানা প্রয়োজন! হত্যাকাণ্ড বলেই এতদিন বলেছেন—তা হলে তারও বিচার কী দাবি করবেন? আপনাদের অভিযোগ মতে দেশব্যাপী নেতা-কর্মীদের হত্যাযজ্ঞের পুরোধাদের কী বিচার বাঞ্ছনীয় নয়? একটি মন্ত্রিত্বের পদই কি সব বিস্মৃত করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট?

ক্যাপ্টেন মনসুর আলীর বাসভবন আক্রান্ত হলে, তখনকার অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দীন সাহেব নাকি নিজে বন্দুক হাতে প্রতি-আক্রমণে এগিয়ে এসেছিলেন। এই নিয়ে বঙ্গবন্ধু কত না সন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন। বারবার বাহবা দিলেন তাজউদ্দীন সাহেবের সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বকে।

জাসদ পরে বিভক্ত হয়ে এক অংশ বাসদ হল—বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল। অধুনা তারা পুনরায় একত্রিত হয়েছে। জাসদ নাম নিয়েই ক্রিয়াকর্ম চালাচ্ছে। অবশ্য জাসদের এক অংশ শাহ্‌জাহান সিরাজের নেতৃত্বে অনেকদিন পৃথক কাটিয়ে বিএনপি'তে যোগ দিয়ে সিরাজ মন্ত্রিত্ব লাভ করে। "সত্যিই সেলুকাস বিচিত্র এই দেশ। এত বঙ্গ ভঙ্গ দেশ, তবু রঙ্গে ভরা!"

একসময় স্কুল ও কলেজ জীবনে খেলাধুলার সঙ্গে জড়িত ছিলাম। রাজনীতি করতে গিয়ে খেলার জগত থেকে দূরে সরে এসেছিলাম। এখন আবার সেখানে আনাগোনা শুরু হল। আমার বিশেষ ঘনিষ্ঠজন অধ্যাপক ইউসুফ আলী ছিলেন ক্রীড়ামন্ত্রী। সেই সূত্রে বাংলাদেশ ক্রীড়া সংস্থার সভাপতি। তিনি আমাকে করলেন সহ-সভাপতি। বিকেল হলেই ইউসুফ ভাইয়ের গাড়ির হর্ন বেজে ওঠে আমার বাসায়। থাকি অত্যন্ত সন্নিকটে। মাঠের নেশা পেয়ে গেল। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারাও সুযোগ ছাড়লেন না। 'আজাদ স্পোর্টিং ক্লাবে'র সভাপতি নির্বাচিত হলাম। 'বাংলাদেশ অলিম্পিক এসোসিয়েশনে'রও সভাপতি করা হল। 'রেফারী এণ্ড আম্পায়ার্স এসোসিয়েশন'ও ছাড়ল না। তাদের সভাপতির দায়িত্ব নিতে হল।

শত ব্যস্ততার মধ্যেও নিয়মিত স্টেডিয়ামে যেতে ভুলি না। কর্মকর্তা এবং খেলোয়াড়রা উৎসাহিত বোধ করছিল। খেলার মাঠে একবার ঢুকলে আর অন্য খেয়াল আসে না। একদিন যা ঘটল, মনে হলে এখনও গা শিউরে ওঠে। রানা তখন সামান্য কিছুটা বড় হয়েছে। একদিন জিদ করল আব্বার সঙ্গে খেলা দেখতে যাবেই। নিয়ে গেলাম। ছেলে একমনে খেলা দেখছে, খেলার পর হেঁটে হেঁটে আর একদিকে চলে গিয়েছে—সে তার মনে আছে। এদিকে আমার খেয়াল নেই রানা সঙ্গে এসেছিল, ওকে নিয়ে ফিরতে হবে। আমার সিকিউরিটি, ড্রাইভার তারা মনে করেছে রানাকে আমি অন্য কারো সঙ্গে পাঠিয়ে দিয়েছি। বাসায় ফিরলে সালেহা জিজ্ঞেস করল, রানা কোথায়?

তখন হুঁশ হল। পড়িমরি করে দিলাম ছুট। সালেহার অবস্থা সহজেই অনুমেয়। সবাই তাকে আশ্বাস দিচ্ছে, উনি গিয়েছেন, রানাকে নিয়ে ফিরবেন ইনশাল্লাহ্! সবুর কর। আল্লাহ্‌কে ডাকো।

স্টেডিয়ামে আবার আমাকে দেখে সবাই দৌড়ে এল। বললাম, আমার ছেলে কোথায়?

ওরা হাসিমুখে জানাল, অফিসে বসে চকোলেট খাচ্ছে। আমরা মনে করেছি আপনি ওকে এখানে রেখে অল্প সময়ের জন্য অন্য কোথাও গিয়েছেন।

ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। রানাকে কোলে তুলে নিলাম, সে পরমানন্দে আমাকে জিজ্ঞেস করছে, আব্বা, চকলেট খাবে?

টেলিফোনে বাসায় সংবাদ দিয়েই রানাকে নিয়ে ছুটলাম। যার বুকের ধন তার কাছে আগে পৌঁছাই।

রানা কিছুই না বুঝে মাকে ও জিজ্ঞেস করল, মা, চকোলেট খাবে?

রানার মা তখন তার সাত রাজার ধন মাণিককে নিয়ে বুকে চেপে ধরে বারবার চুমু খাচ্ছে।

এরপর থেকে অনেক আবদার করলেও সালেহা রানাকে আমার সঙ্গে দিত না। প্রয়োজন হলে নিজে সঙ্গে যেত। তার বক্তব্য, বাড়ি থেকে বের হলে যে লোকের ছেলের কথা খেয়াল থাকে না—তাকে বিশ্বাস নেই!

অপরাধ হয়ে গেছে, চুপ করে থাকাই মহাজনের পন্থা।

বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠ পুত্র শেখ কামাল খেলাধুলার ক্ষেত্রে উৎসাহ দেখাচ্ছিল। নিজেও ভালো ব্যাডমিন্টন খেলত। আমার বাসার কোর্টেও চমৎকার খেলে গেছে। 'আবাহনী ক্লাব' তারা প্রতিষ্ঠা করেছিল। শেখ কামাল ছিল তার সভাপতি। প্রায়ই স্টেডিয়ামে বসে একসঙ্গে খেলা দেখতাম। এই স্টেডিয়ামে অলিম্পিকের সময় কামাল বিশিষ্ট মহিলা ক্রীড়াবিদ সুলতানাকে দেখে পছন্দ এবং পরে বিয়ে করেছিল।

শেখ কামাল এমনিতে আমাদের সঙ্গে যথোচিত সম্মানের সঙ্গেই কথা বলত। কিন্তু ভিতরে ভিতরে যে বঙ্গবন্ধুর পুত্র হিসাবে নিজেকে আলাদা করে দেখতে শুরু করেছিল, তা জানতাম না। এক দুর্বিনীত অহংবোধ হয়ত কাজ করছিল। যেখানে তার কাছে প্রত্যাশা শালীন এবং অমায়িক ব্যবহার, সেখানে সে একটা কেউকেটার বেটার মতোই হয়ে গিয়েছিল।

তা না হলে সামান্য ঘটনা থেকে এত বড় দুর্ঘটনা স্টেডিয়ামে ঘটতে পারত না। 'আবাহনী'র সঙ্গে অন্য একটি টিমের খেলা চলছে। 'আবাহনী' জিতবে। এগিয়েও আছে। ইউসুফ ভাই, আমি এবং শেখ কামাল একসঙ্গে বসে বাদাম খাচ্ছি এবং খেলা দেখছি। মধ্যমাঠে 'আবাহনী'র এক প্লেয়ার ফাউল করল। রেফারি ননী বসাক, পাকিস্তানের খ্যাতনাম্নী নায়িকা শবনমের পিতা, খেলা পরিচালনা করছিলেন। সে আবাহনীর বিপক্ষে ফাউল দিল। কিক্‌ও হয়ে গেল। এই ফাউল ধরাটা ঠিক, না বেঠিক বলা যাবে না। কিন্তু খেলার তাতে কোন লাভ-ক্ষতি হল না। কামাল কিন্তু গর্জে উঠল, দেখলেন, বেটা কিভাবে অন্যায় ফাউল দিল?

বঙ্গবন্ধু পুত্রের অভিমত! আমরা চুপ করেই রইলাম। খেলা শেষ হল। আমরা বিদায় নেব নেব করছি। ননী বসাক আমাদের দেখে মাঠ থেকে এদিকে উঠে এল। ক্রীড়ামন্ত্রী রয়েছেন, তাদের সভাপতি আমি রয়েছি, শেখ কামাল রয়েছে। সে হাসিমুখে সবার সাথে হাত মিলাতে এগিয়ে এল।

কথা নেই, বার্তা নেই শেখ কামাল ননী বসাককে প্রচণ্ড এক ঘুসি মেরে ফেলে দিল। তাঁর মুখ থেকে রক্ত ঝরতে লাগল। শেখ কামাল রাগতস্বরে তখন চিৎকার করছে, বেটা সবসময় এমনি করে 'আবাহনী'র বিরুদ্ধে বাঁশী বাজায়। ওকে আজ উচিত শিক্ষা দিয়ে ছাড়ব।

তার রাগ তখনও কমেনি। আমরা দু'জন হতভম্ব। আমাদের সামনে কামাল এ কী করল! আমরা মুখ দেখাব কী করে? ননী বসাক বয়স্ক ব্যক্তি, সে তো কোন দোষ করেছে বলে জানি না। দোষ করলে আমাদেরকে বলা যেত। লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যেতে ইচ্ছে হল। হাজার লোক ঘটনা স্বচক্ষে দেখল। বঙ্গবন্ধুর পুত্রের কাছে এ ব্যবহার যে কল্পনাও করা যায় না!

কামালকে হাত ধরে টেনে অফিস ঘরে নিয়ে এসে বললাম, কামাল তুমি এ কী কাজ করলে? নিজ হাতে রেফারিকে প্রহার করা তোমার সাজে?

কামাল বলতে লাগল, আপনি জানেন না, ও বেটা সবসময় বদমায়েশী করে। ওকে আরও মারা উচিত।

অনেক কষ্টে তাকে নিবৃত্ত করলাম। পাশের ঘরে আহত ননী বসাককে কি বলে সান্ত্বনা দেব ভাষা খুঁজে পেলাম না। তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করে চলে এলাম। গাড়িতে গম্ভীর ইউসুফ ভাইকে বললাম, বিষয়টি বঙ্গবন্ধুকে জানানো প্রয়োজন।

তিনি বললেন, বঙ্গবন্ধু এ কথা শুনে আমাদের উপর সন্তুষ্ট হবেন না।

বললাম, এ ধরনের হঠকারিতায় বঙ্গবন্ধুর ভাবমূর্তিই নষ্ট হবে। আমরা তাঁর কর্মী, তাঁর মঙ্গল চাই। না বললে তিনি একসময় বলতেও পারেন, তোরা আমাকে জানাসনি কেন?

ইউসুফ ভাই বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করলেন এবং আমরা তখনই গণভবনে গিয়ে বঙ্গবন্ধুকে ঘটনা জানালাম।

বললাম, আপনার পুত্রের পক্ষে এ কাজ একান্তই অনভিপ্রেত।

তিনি গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, আমি সব শুনেছি, ননী বসাককে এভাবে মারা কামালের ঠিক হয়নি। তবে ননী বসাকও কাজ ভালো করেনি!

আমরা বুঝতে পারলাম, মাঠ থেকে সরাসরি এখানে এসেও আমরা সংবাদটি সর্বাগ্রে দিতে পারলাম না। তিনি পূর্বেই জেনে গেছেন। হয়ত পুত্রই টেলিফোনে পিতাকে বলেছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে সেদিন শেখ কামালের পিতা হিসাবেই সমধিক পরিলক্ষণ করা গেল।

এই শেখ কামাল এবং তার সঙ্গীরা এক গভীর রাতে মতিঝিল ব্যাংক পাড়ায় পুলিশের গুলি খেয়ে আহত হয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিল। কারণ জানি না। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর ছেলে গুলি খাবে কেন? এত রাতে কয়েকজন যুবকসহ মতিঝিলে তার কী কাজ? বঙ্গবন্ধুর পুত্রকে কে না চেনে? তাকে গুলি করা সামান্য কথা নয়! ভিতরে কী কথা, কী রহস্য লুকিয়ে আছে জানি না।

হাসপাতালে কামালকে দেখতে গিয়ে বঙ্গবন্ধু, তাঁর স্ত্রী এবং অনেককেই দেখলাম। ভাবী এবং অন্যরা পুলিশকে যাচ্ছেতাই গাল-মন্দ করলেও বঙ্গবন্ধুকে

দেখলাম বিষণ্নবদনে বসে আছেন। ঘটনার আকস্মিকতায়, না পুত্রের আহতাবস্থা দর্শনে পিতা আজ নীরব এবং বিষাদগ্রস্ত!

ইন্টার পার্লামেন্টারি ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের বৈঠক বসল আইভরি কোস্টের রাজধানী আবিদজান শহরে। বাংলাদেশ থেকে দু'জন প্রতিনিধি প্রেরণ করতে হবে। বঙ্গবন্ধু আমাকে এবং ডা. আস্‌হাবুল হক হেবাকে মনোনীত করলেন। ইতিমধ্যে চিফ হুইপ হিসাবে রাশিয়া সফরের একটি নিমন্ত্রণ প্রধানমন্ত্রীর দফতরে পৌঁছেছিল। তিনি ব্যবস্থা করলেন যাতে আবিদজানের সম্মেলন শেষে আমি রাশিয়া যেতে পারি এবং রাষ্ট্রদূতের মাধ্যমে আমার নিমন্ত্রণের সঙ্গে ডা. হেবাকে সংযুক্ত করার ব্যবস্থা করলেন।

আমরা ছিলাম ঘনিষ্ঠ বন্ধু। একসঙ্গে দীর্ঘ সফরে যাওয়ার সুযোগে আনন্দ আর ধরে না। সে সময় আবিদজান যাওয়া এত সহজ ছিল না। অনেক ঘুরে, একাধিক যাত্রা বিরতি করে শেষ পর্যন্ত সমুদ্রতীরের অপূর্ব সুন্দর শহর আবিদজানে পৌঁছা গেল। আফ্রিকা মহাদেশের এক প্রান্তে মহাসমুদ্রের তীরে অবস্থিত আবিদজান শহরটি একটি স্বাস্থ্য নিবাসও বটে। ইউরোপ, আমেরিকার অনেক পর্যটক পরিলক্ষিত হল। আইভরি কোস্টে আমাদের কোন দূতাবাস না থাকায় লন্ডন থেকে বৈদেশিক মিশনের দু'জন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এসে আমাদেরকে স্বাগত জানালেন এবং সম্মেলনের কাজে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করলেন। উদ্যোক্তারা আমাদের অবস্থানের জন্য রাজধানীর সবচাইতে বৃহৎ এবং একমাত্র পাঁচতারা হোটেলে কক্ষ বরাদ্দ করে রেখেছিলেন। আমাকে একটি স্যুট দেওয়া হল। আরাম-আয়েসের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু ইউরোপিয়ান খাবার ছাড়া অন্যকিছু দুষ্প্রাপ্য।

দু'দিন ধরে সম্মেলন চলল, বাংলাদেশের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখলাম। বিভিন্ন সাব-কমিটিতে অংশগ্রহণ করে সে সময়ের উদ্ভূত বিশ্ব-পরিস্থিতির উপর আমাদের অভিমত প্রদান করলাম। ভোটে অংশগ্রহণের পূর্বে অনেক কষ্ট করে ঢাকায় নেতার সঙ্গে আলোচনা করে নিলাম।

সম্মেলন শেষ হওয়ার পরও আমরা দু'দিন আবিদজানে ছিলাম। এক রাতে নৈশভোজ শেষ করে একটু পায়চারি করার জন্য হোটেলের বাইরে আসতেই এক শ্বেতাঙ্গিনী সুন্দরী যুবতী এগিয়ে এল এবং ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করল, Do you gentlemen, care for some flowers to night?

মেয়েটির হাতে কোন ফুল ছিল না। না বুঝে প্রতিউত্তর করলাম, কোথায় তোমার ফুল? তোমার হাত তো শূন্য!

সে খিলখিল করে হেসে উঠল। ডাক্তার হেবা আমাকে বললেন, বোকা চন্দর! ও নিজেই তো ফুল। আবার ফুল আনবে কেন?

বুঝলাম। কথা না বাড়িয়ে পাশ কাটিয়ে চলে গেলাম।

হোটেলের খাবারে বীতশ্রদ্ধ হয়ে লন্ডনের কর্মকর্তাদের বলতেই তারা বলল, স্যার, এখানে একটি স্থানীয় খাবার আছে। খুবই উপাদেয়, কিন্তু আপনাদের রুচিসম্মত হবে কিনা সেটাই প্রশ্ন। তাছাড়া রাস্তায় দাঁড়িয়ে বা বসে খেতে হবে।

বললাম, নিয়ে চলুন সেই খাবারের স্থানে। আমাদের রুচি কত বৈচিত্র্যময় হতে পারে দেখবেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় কি খেয়েছি তা তো দেখেননি!

তারা আমাদেরকে শহরের আদি অঞ্চলে নিয়ে গেল। গাড়ি বেশ দূরে রেখে আমরা পায়ে হেঁটে নির্দিষ্ট জায়গায় উপস্থিত হলাম। দেখলাম, স্থানীয় মেয়েরা পিঠে বাচ্চা বেঁধে সম্মুখে বিরাট চুল্লিতে ডুবা তেলে এক প্রকার সামুদ্রিক মাছ ভেজে পরিবেশন করছে। টিনের প্লেটে করে মাত্র এক প্রকারের মশলা সহযোগে লোকজন সেই মাছ পরমানন্দে খাচ্ছে।

আমরা পৌঁছলাম এক বিশাল বপু ছোটখাটো মৈনাক পর্বত-সাইজের এক মহিলার নিকট। তার পিঠেও যথারীতি একটি বাচ্চা কাপড়ের পুঁটলিতে বাঁধা। পর্বতের মূষিক প্রসব কি করে সম্ভব!

লন্ডনের কর্মকর্তা ভাঙা ভাঙা স্থানীয় ভাষায় কি বললেন। নিকষ কালো মহিলা তার ঝক্‌ঝকে শুভ্র-দন্ত বিকশিত করে হেসে উঠল এবং তার নিজস্ব ভাষায় কলকলিয়ে উঠল। মহিলা দিব্যি মাটিতে পা ছড়িয়ে বসেই তার ব্যবসা চালাচ্ছিল। অবশ্য ঐ দেহের ভার বহন করার মতো বসবার আসন যোগাড় করাও কষ্টসাধ্য।

আমাদেরকে অনেকগুলো পরিষ্কারভাবে ধুয়ে রাখা আস্ত মাছ দেখান হল। আমরা পছন্দ করে দিতেই সেগুলো ফুটন্ত কড়াইয়ে ছেড়ে দিল। মাছটি উত্তমরূপে ভাজার পর একটি টিনের প্লেটে এক থাবা মরিচ বাঁটা সহযোগে সেটি পরিবেশন করা হল। জীবনে অনেক উত্তম রান্না খেয়েছি, অনেক উৎকৃষ্ট খাদ্য-বস্তুতে রসনা নিবৃত্ত করেছি। কিন্তু সে রাতের সেই বিপুলকায়া রাঁধুনির ভাজা মাছের স্বাদ কোনদিন ভুলতে পারব না। কেবলমাত্র ঝাল মরিচ-বাঁটা সহযোগে কোন খাদ্য যে এত সুস্বাদু হতে পারে ধারণা ছিল না। মাছটি ছিল আমার প্রয়োজনের চাইতেও বড়। কিন্তু দেখা গেল কিছুই অবশিষ্ট নেই। ঝালে মুখ থেকে লালা ঝরছে, তবুও সবটুকু চেটেপুটে খেলাম।

জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ খানা খেলাম আবিদজানের নোংরা পরিবেশে দাঁড়িয়ে রাতের অন্ধকারে, ততধিক অমানিশার এক বিপুলকায়া আফ্রিকান মহিলার হোটেল 'ইটে-দ্য-বসে্'তে রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।

সেখান থেকে প্যারিস এবং পরে রাশিয়া সফর করব। প্যারিস যেতে নাইজেরিয়ার রাজধানী লাগোসে প্লেন পরিবর্তন করে যেতে হবে। লাগোসে নেমে দেখা গেল এয়ারপোর্ট তো নয়, যেন একটা জনাকীর্ণ বাজার। সবাই চিৎকার করছে নিজেদের ভাষায়। চেঁচামেচি, ঠেলাঠেলি আর অসহ্য গরমের মধ্যে সে এক প্রাণান্তকর অবস্থা। কে, কাকে দেখবে ঠিক নেই। আমরা অপেক্ষায় আছি। আমাদের দুটি স্যুটকেস নামবে এবং ঘণ্টা দু'য়েক পরে অন্য প্লেনে প্যারিসের পথে রওয়ানা হব। দেখা গেল আমাদের মালামাল নামেনি। অপেক্ষা করে আছি, কেউ সাহায্য করারও নেই। যথাসময়ে প্লেনের খবর নিতেই জানা গেল যে, প্লেন ইতিমধ্যেই এসে চলে গেছে। মালও নেই, প্লেনও চলে গেছে। আমরা অগাধ সলিলে।

আমার ছিল লাল পাসপোর্ট। সেটি দেখিয়ে একজন বিমানবন্দর কর্মকর্তাকে আমাদের সমূহ বিপদাপন্ন অবস্থার কথা খুলে বললাম। তিনি কাজ চালাবার মতো ইংরেজি জানেন, কিন্তু উচ্চারণ শুনে বোধগম্য করতে কসরতের প্রয়োজন। চিফ হুইপ কি সে বুঝতে পারছে না! তবে আমি যে একজন ভিআইপি তা অনুধাবন করল। ডা. হেবার ছিল সাধারণ পাসপোর্ট। বুঝালাম সেও একজন এমপি এবং ভিআইপি।

যুক্তি দেখাল, তবে পাসপোর্ট লাল নয় কেন? চিফ হুইপই বা কী?

হেবা বুঝাল, ইনি মন্ত্রী পর্যায়ের একজন। পদবি চিফ হুইপ।

সে কি বুঝল সে-ই জানে, তবে আমাদের উপকার করল। শহরের সন্নিকটে এয়ারপোর্ট হোটেলে আমাদের জন্য একটি রুম বুক করে দিল। ভাড়া এবং খাওয়া খরচা অবশ্য আমাদেরকেই গুনতে হবে। মালামালের বিবরণ গ্রহণ করে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করবে প্রতিশ্রুতি দিল। সবচাইতে দুঃসংবাদ দিল, আপনাদের টিকেটে অন্য লাইনে ভ্রমণ সম্ভব নয়। আপনাদেরকে সাত দিন অপেক্ষা করতে হবে। সে প্লেন সপ্তাহে একদিনই লাগোস অবতরণ করে।

ভাগ্যিস হাতব্যাগ সাথে ছিল। পয়সা-কড়ি যা ছিল সঙ্গেই রয়েছে। উপায়ান্তর না দেখে ট্যাক্সি নিয়ে এয়ারপোর্ট হোটেলেই উপস্থিত হলাম।

দীর্ঘ অবসর, শুয়ে-বসে থাকা ছাড়া কিছুই করার নেই। সেই আমলের লাগোস এয়ারপোর্ট হোটেলের অবস্থাও এয়ারপোর্টের মতো। কক্ষে ফ্যান রয়েছে। প্রচুর শব্দ এবং প্রচুরতর উষ্ণ বাতাস ছড়ায়। এয়ারকুলার ছিল, কাজ করছে না। কেউ সারাবার নেই। টেলিভিশন নেই। রেডিও আছে। কিন্তু ভাষা বুঝি না। একটি চ্যানেলে ইংরেজি আসে অস্পষ্ট। সারাদিন ধরে হেবা ডাক্তারের চেহারা দেখতে দেখতে আমি ক্লান্ত। বেটা, আর একটু দেখতে সুন্দর হলে কী ক্ষতি ছিল! হেবারও একই অনুভূতি, সেও মনে মনে বলছে, বেটা এত অসুন্দর কেন? দুনিয়াতে বোধহয় তার চাইতে বদসুরত লোক হয় না। মেনুর মূল্য

খুঁটিয়ে সস্তা খাবারের অর্ডার দেই। ব্লেড কিনে এনে পরস্পরকে সেভ করে দিয়ে পরামাণিকের কার্যে হস্তসিদ্ধ করি।

লাগোসে আমাদের কোন দূতাবাস ছিল না। কারো সঙ্গে যোগাযোগের কোন আদৌ সম্ভাবনা নেই। হোটেল ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বললাম, সে সব শুনে টেলিফোন ডাইরেকটরি ঘেঁটে ওদের বৈদেশিক মন্ত্রণালয়ের একটি নাম্বার প্রদান করল। বলল, যোগাযোগ করে দেখুন কিছু করা যায় কিনা।

টেলিফোন করলাম। অনেক কষ্টে একজন পিআরও জাতীয় অফিসার পাওয়া গেল। সে ইংরেজি ভালোই জানে। তাকে অনুরোধ করলাম, নব স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বাংলাদেশের দু'জন জনপ্রতিনিধি তোমাদের এয়ারপোর্ট হোটেলে আটকা পড়ে আছে, একবার আসবে কী?

ভদ্রলোক মুসলমান। বাংলাদেশ মুসলমানদের দেশ সে জানত। বলল, অফিসের কাজ সেরে আমি হোটেলে আসব। তোমরা থেকো।

আমরা আর যাব কোথায়! তীর্থের কাকের মতো বসে রইলাম। মি. বকর বিকেলে নিজেই গাড়ি চালিয়ে উপস্থিত হল। সমস্যা সব শুনল এবং কিছু একটা করবে বলে প্রতিশ্রুতি দিল। লোকটি বেশ মিশুক প্রকৃতির। তবে বিয়ারটা একটু বেশি টানে। নিজেই অর্ডার দিয়ে পরপর তিনটি বিয়ার পান করল। পয়সা আমাদের না দিতে হয় এই দুশ্চিন্তায় ছিলাম। কিন্তু বেয়ারাকে ডেকে সে মূল্য পরিশোধ করল। আমরা ভদ্রতা করে বিল মেটাবার প্রস্তাব করলেও শুনল না। বরং উল্টো আমাদের চায়ের বিলও সে দিল। বলল, তোমরা আমাদের দেশে এসেছ এবং অসুবিধায় পড়েছ। এখন তোমাদের আতিথেয়তা দেখাবার সময় নয়।

উপরন্তু সে আমাদেরকে তার গাড়িতে করে লাগোস শহর প্রদক্ষিণ করিয়ে আনল এবং আগামীকাল বিকালে আবার আসবে কথা দিল। এর মধ্যে কী করা যায় সে দেখবে। আমরা অনেকটা আশ্বস্ত হলাম।

সন্ধ্যায় হোটেলের প্রবেশদ্বারে দাঁড়িয়ে আছি। দু'জন সুবেশী যুবতী এগিয়ে এল। ভাঙা ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করল, তোমরা এই হোটেলে অবস্থান কর?

উত্তর করলাম, হ্যাঁ, কেন?

একজন বলল, কত ডলার দাও প্রতি রাতের জন্য?

আবার জিজ্ঞেস করলাম, যা-ই দেই, তোমাদের তাতে কী যায়-আসে!

বলল, আমাদের একটি ভালো প্রস্তাব আছে। এখানে যা দাও, তার অর্ধেক দিও। আমরা তোমাদের দু'জনকে দুটো ভালো ঘরে রাখব, ভাল খাবার দেব এবং সঙ্গে নিজেদেরকেও দেব। প্রস্তাবটা কী আকর্ষণীয় নয়?

আমরা দু'জনই অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলাম। জানি, নাইজেরিয়া বেশ গরিব দেশ এবং একটা অরাজক সামাজিক পরিস্থিতি সেখানে বিরাজ করছে। তবুও এয়ারপোর্ট হোটেলের গেস্টদের এভাবে গেটে এসে প্রলোভিত করা

অন্যত্র দৃষ্টিগোচর হয়নি। আমরা সাড়া না দেওয়ায় ওরা নিরাশ হয়ে অন্য মক্কেল পাকড়াবার প্রচেষ্টায় চলে গেল।

পরদিন মি. বকর একটি বিকল্প রুটের প্রস্তাব নিয়ে এলেন। তিনি বললেন, তোমাদের টিকিট এ্যারোফ্লটের। কাজেই আমরা তোমাদের অন্য প্লেনে আগামীকাল মস্কো পাঠাবার ব্যবস্থা করতে পারি। সেখান থেকে তোমরা প্যারিসে যেতে পার।

বললাম, মস্কোতে আমাদের পৌঁছবার দিন অনেক পূর্ব থেকেই নির্ধারিত রয়েছে।

সে নিবেদন করল, সে তারিখ ঠিকই থাকতে পারে। ইতিমধ্যে তোমরা মস্কো হয়ে প্যারিস যাও—সেখান থেকে সময় মতো মস্কো আসতে পারবে।

সে আরও সুসংবাদ দিল, আমাদের স্যুটকেস দুটোর হদিস করা গেছে। আজ রাতেই সে দুটো এসে পৌঁছবে।

তাকে অনেক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সে ব্যবস্থাই মেনে নিলাম। কেবল অনুরোধ করলাম; মস্কো দূতাবাসে যেন একটা বার্তা পাঠিয়ে দেয়। রাতে এয়ারপোর্টে গিয়ে মালামাল বহাল তবিয়তেই ফেরত পেলাম।

লাগোস থেকে বিদায় নিলাম। আর কোনদিন সেখানে যাওয়ার সুযোগ হয়নি। ছাব্বিশ সেলে রবার্টকে সে ঘটনা খুলে বললে সে জানাল, একসময় সেখানকার পরিস্থিতি এরকমই ছিল। আজকাল অবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে।

রাশিয়া ভ্রমণ করা এবং লৌহযবনিকার অন্তরালে সে সমাজতান্ত্রিক দেশটিতে কি হচ্ছে, স্বচক্ষে দেখার খুবই বাসনা ছিল।

প্রথম সুযোগেই স্বপ্ন ভঙ্গ হল। মস্কোতে ইমিগ্রেশন আমাদের আটকে দিল। পাসপোর্টে ভিসা দেওয়া থাকলেও, তাদের নিকট লিখিত কাগজ আছে আমরা কবে, কখন পৌঁছব। কোন যুক্তিই তারা শুনতে অনিচ্ছুক। নির্ধারিত সময়ের পূর্বে তোমরা আসতে পার না। তোমরা অবাঞ্ছিত।

আমরা রীতিমতো অপমানিত বোধ করলাম। ইমিগ্রেশনের বাইরে রাষ্ট্রদূত শামসুর রহমানকে দেখছি, আমাদের নিতে এসেছেন। তিনি অবস্থা উপলব্ধি করে এদিক-সেদিক ছোটাছুটি করতে লাগলেন আমাদের মুক্ত করার জন্য। কিন্তু কিছু করতে সমর্থ হলেন বলে মনে হল না। সাবেক প্রধানমন্ত্রী জননেতা

আতাউর রহমান খান সাহেবের তিনি কনিষ্ঠ ভ্রাতা। আমাকে যথেষ্ট স্নেহের চোখে দেখেন। একটা দেশের রাষ্ট্রদূত এবং যে দেশের সঙ্গে অত্যন্ত সুসম্পর্ক, তিনিও ব্যর্থ হলেন। লৌহযবনিকাই বটে!

তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ। রাষ্ট্রদূত বললেন, এদের বুঝিয়ে পারলাম না। কাল সকালে বৈদেশিক মন্ত্রণালয় খুললে চেষ্টা করব আমাদের দূতাবাসে নিয়ে যেতে।

আমি বললাম, আমরা এক মুহূর্তও এই দেশে থাকতে চাই না। আমাদেরকে যে কোন প্লেনে প্যারিসে পাঠিয়ে দিন। তিনি বললেন, আজ সেটাও সম্ভব নয়। কালকের দিনের জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

তিনি মনঃক্ষুণ্ন হয়ে বিদায় নিলেন। আমাদেরকে বিশেষ প্রহরাধীনে একটা বিশেষ নিরাপত্তা গাড়িতে করে একটি হোটেলে বা কয়েদখানা জাতীয় বহুতলবিশিষ্ট বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হল। আমরা গুনলাম পরপর সাতটা তালা খুলে আমাদের শেষ পর্যন্ত একটা ঘরে তালাবদ্ধ করে পুনরায় ক্রমান্বয়ে সাতটি তালা লাগান হল।

আমাদের মালপত্র রয়েছে বিমানবন্দরে। আমরা ওদের কয়েদখানায়, অতিথিশালা হতেই পারে না। প্রথমত, তালা মেরে রেখেছে শুধু ঘরে না, প্রতিটি ফ্লোরে। ঘরে দুটো সাধারণ বিছানা রয়েছে। একটা টাওয়েল নেই, সাবান নেই, মানুষের প্রয়োজনের কোন কিছুই নেই। ঘরের মধ্যে সবসময় একটা রেডিও রাশিয়ান ভাষায় ভ্যাজর-ভ্যাজর করছে। মনে হয় সমাজতন্ত্রের বুলি কপচাচ্ছে।

রাত ন'টার সময় ঘরের তালা এবং পরে ফ্লোরের অন্যান্য তালা খুলে আমাদেরকে খাওয়ার ঘরে নিয়ে গেল। ভাতের জাউ জাতীয় একটা জিনিস খেতে দিল। খেতে মন্দ নয়। তাছাড়া আমরা ছিলাম ক্ষুধার্ত। তা-ই দিয়েই ক্ষুণ্নিবৃত্তি করলাম। এক বাঙালি ভদ্রমহিলাকেও দেখলাম, খাবার ঘরে একটি ছোট বাচ্চাসহ। স্বামীর কাছে লণ্ডনে যাবে, এ্যারোফ্লটের টিকিট কনফার্ম হয়নি বলে তার এই দুর্দশা। বলতে বলতে সে কেঁদে ফেলল। আমাদের পরিচয় পেয়ে তার দুঃখ খানিকটা লাঘব হল। ভিআইপিদেরই এই অবস্থা।

সংলগ্ন বাথরুমে প্রাতঃক্রিয়া সমাপন করার পর হাত ধোয়ার জন্য এক টুকরো সাবান না পেয়ে ডাক্তার হেবা ক্ষেপে উঠল। দমাদম দরজায় আঘাত করতে লাগল। কোন লাভ হল না। ওরা তালা মেরে চলে গিয়েছে। নাস্তার সময় একবার তালা খুলে আমাদের নিতে আসবে। এইভাবে সকালে নাস্তা খেলাম। দুপুরে লাঞ্চ বা লাঞ্ছনা কপালে জুটল। বিকেলে ভাগ্য সুপ্রসন্ন হল। রাষ্ট্রদূত সাহেব, অনেক তদবির করে আমাদের রিলিজ অর্ডার নিয়ে এসেছেন, কয়েক ঘণ্টার জন্য। নৈশভোজের পর আবার আমাদেরকে তাদের তদারকিতে দিতে হবে। আগামীকাল আমাদের প্যারিসের প্লেনে তুলে দিয়ে তারা নিশ্চিন্ত

মনে ক'দিন পর জাঁকজমকের সঙ্গে আমাদের সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার রাজধানী মস্কো নগরীতে স্বাগত জানাবে।

আমাদের ওবায়েদ সমাজতন্ত্রের উপর হাড়েহাড়ে চটা। তার এ ধরনের অভিজ্ঞতা হয়েছিল কিনা জানি না। কিন্তু সমাজতন্ত্রকে সে বলে ফহিরতন্ত্র অর্থাৎ ফকিরতন্ত্র। ধনী-গরিবের প্রশ্ন এখানে অবান্তর। কিন্তু ওরা এ কিস্তিতে যে ব্যবহার আমাদের সঙ্গে করল, এটা কোন তন্ত্রে পড়ে কোনদিন বুঝে উঠতে পারিনি।

রাষ্ট্রদূতের বাসায় ভালো করে বৈকালিক চা ও খাবার খেলাম। আরও অনেকেই খবর পেয়ে উপস্থিত। রাষ্ট্রদূত সাহেব আমাদেরকে শহর প্রদক্ষিণে নিয়ে গেলেন। পেছনে একটি প্রকাণ্ড কালো গাড়ি আমাদের সর্বক্ষণ অনুসরণ করতে থাকল। ওরা নাকি কেজিবি। জাহান্নামে যাক ওরা, শহর দেখে ভালো লাগল, যদিও মন ছিল অত্যন্ত বিষণ্ন। একি ব্যবহার! কিছুতেই সাতটি তালা মারার কথা ভুলতে পারছিলাম না। রাতে রাষ্ট্রদূতের বাসায় চর্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় আহার করলাম। আমরা দু'দিনের আহার একসঙ্গে খেলাম।

তিনি বললেন, ওদের কথা দিয়েছি রাত দশটায় আপনাদের পৌঁছে দেব। চলুন, যাওয়া যাক। অগত্যা পুনঃ মূষিক ভব!

পরদিন প্যারিসের প্লেনে উঠে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। মাথায় থাক সমাজতন্ত্র, তাদের খুঁড়ে খুঁড়ে নমস্কার। আমি আর ওদিকে পদার্পণ করছি না।

প্যারিস এয়ারপোর্টে সকলেই উপস্থিত, এবার হেবা সঙ্গে থাকায় আর শাহাবুদ্দীন সাহেবের বাসায় উঠলাম না। কেবল এক বেলা নিমন্ত্রণ খেলাম। উঠতে হল রাষ্ট্রদূত আবুল ফাতেহ সাহেবের বাসায়। তিনি ও তার স্ত্রী যথেষ্ট সমাদর করলেন। আমি পূর্বে প্যারিসে এলেও হেবা ছিল নবাগত। তাকে নিয়ে ভার্সাই দেখাতে হল। রাতের আঁধার পরাভূত আলোর মহাসমুদ্রে দাঁড়িয়ে দেখলাম ক্লিউপেট্রার নিডল, 'হ্যাঞ্চ ব্যাক অব নটর ড্যাম' ছবিখ্যাত নটর ড্যাম গীর্জা, পাহাড়ের ওপর পৌরাণিক গীর্জা। সৃষ্টির আনন্দে আত্মমগ্ন শিল্পীদের আস্তানা সব ঘুরে ঘুরে আর একবার দেখা হল। আর্ক ডি ট্রুম্ব বা বিজয় তোরণ থেকে বিশ্ববিখ্যাত সাঁজে-লিজেতেও হাঁটা হল। লোকে বলে, এখানে না হাঁটলে নাকি জীবনই বৃথা! রাষ্ট্রদূত আমাদেরকে 'প্যারিস বাই নাইট' দেখালেন।

সকালে উঠে বঙ্গবন্ধুর টেলিফোন। ফতেহ সাহেবকে মস্কোর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে বলেছিলাম, দেশের সঙ্গে যোগাযোগ করে রাশিয়া সফর বাতিল করতে চাই।

তিনি অবশ্য একমত হলেন না। বললেন, যা দেখে এসেছেন, জেনে এসেছেন, সেটাই রাশিয়া নয়। অভিজ্ঞতার জন্য আপনাদের আর একবার যাওয়া খুবই প্রয়োজন।

আমার গোস্বা কমেনি। বললাম, আপনি অনুগ্রহ করে দেশের সাথে কথা বলে সফরসূচি না হয় আপাতত স্থগিত রাখার ব্যবস্থা করুন। প্রয়োজনে বলুন আমি পীড়িত।

তিনি কি কথা বলেছিলেন তিনিই জানেন। ফোনে বঙ্গবন্ধু বললেন, রাশিয়া যেতে চাচ্ছিস না কেন?

সব খুলে বললাম। আরও বললাম, লীডার, এবারকার মতো ওটা স্থগিত করলে হয় না?

তিনি খুব হাসলেন। বললেন, না হয় না। তোরা এবার যা। ফিরে এসে যদি সুনাম না করিস, তখন বলিস।

বললাম, লীডার, আবার যদি তালা মেরে রাখে?

তিনি পুনরায় উচ্চহাস্য করে উঠলেন। বললেন, এবার গিয়ে দেখ, আর ফিরে না আসতেও চাইতে পারিস!

নেতার নির্দেশ অবশ্যই পালন করতে হবে। রাশিয়ার সঙ্গে আমাদের যা সম্পর্ক এবং স্বাধীনতা যুদ্ধে মার্কিনীদের বিরুদ্ধে ভোটো প্রয়োগ ছাড়াও তারা প্রভূত সহায়তা করেছে এবং পরেও করে যাচ্ছে। অগত্যা দ্বিতীয়বার এবং সরকারিভাবে প্রথমবার যাওয়ার জন্য প্লেনে উঠে বসলাম।

মস্কোতে অবতরণের পর মাথা ঘুরে যাবার অবস্থা। অভ্যর্থনার ব্যাপক আয়োজন দেখে আমরা স্তম্ভিত। লাল গালিচা সম্বর্ধনা বোধহয় একেই বলে। সুপ্রিম সোভিয়েতের নেতৃবৃন্দ আমাদেরকে স্বাগত জানালেন। কার কত প্রতাপ প্রতীয়মান হওয়া দুষ্কর। একেকজন অন্যকে যেভাবে স্যালুট করছে, বুঝা কঠিন কে অধস্তন আর কে ঊর্ধ্বতন। বিমানবন্দরেও ছোটখাটো বক্তৃতা করতে হল ওদের স্বাগত ভাষণের জবাবে। কত টপ ব্রাসের সঙ্গে যে পরিচয় হল, মনে রাখা দুষ্কর।

আমাদের দু'জনকে সুপ্রিম সোভিয়েতের সদস্যদের জন্য বরাদ্দ দুটো বিশাল কালো রঙের গাড়িতে মস্কো হোটেলে নিয়ে উঠানো হল। অগ্র-পশ্চাতে গাড়ির বহর। একটা বিষয় লক্ষ্য করে বিস্মিত হলাম। গাড়িতে কে আছে জানার উপায় নেই। কেননা, কাচ সম্পূর্ণরূপে কালো। তবুও ওই বিশেষ গাড়ি সম্মুখ দিয়ে যাওয়ার সময় জনগণ হাত তুলে সালাম জানায়। শ্রদ্ধা বা ভীতিসঞ্চিত তা বলা দুঃসাধ্য। সে সালাম আরোহী গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা বোধ করে না। কেননা, বাইরে থেকে ভিতরে কিছু দেখা যায় না।

মনোরম পরিবেশে বিশালাকার হোটেল মস্কোবা একটা সাম্রাজ্য বিশেষ। বহুতলবিশিষ্ট এই বিলাসবহুল হোটেল দেখলে কে বলবে, সমাজতান্ত্রিক দেশের রাজধানীর একটি হোটেল সেটি! আমাদেরকে দশ তলায় স্থান দেওয়া হল। আমার জন্য নির্দিষ্ট স্যুটে শোবার ঘর, বসার ঘর, খাবার ঘর, এমনকি রান্নাঘরও রয়েছে। একটি পরিবার অনায়াসে সেখানে অবস্থান করতে পারবে। ঘরে ঢুকেই দেখি একটি প্রকাণ্ড ফুলের 'বুকে' এবং এক ঝুড়ি ফল। ঝুড়িটিও বিরাট। মস্কোতে এই একটি জিনিস লক্ষ্য করা গেল। ওদের সব কিছুই বিরাট—অবশ্য হৃদয়ের সংবাদ জানি না। গেল বারের তিক্ত অভিজ্ঞতায় সব কিছুই যাচাই করে নেওয়া শ্রেয়।

বৈদেশিক মন্ত্রণালয় থেকে দু'জন কর্মকর্তাকে সার্বক্ষণিকভাবে দায়িত্ব দেওয়া হল আমাদের সফরসূচির তত্ত্বাবধানের জন্য। এরা ইংরেজি ভাষায় সুদক্ষ। তবুও একজন দোভাষী নিয়োজিত হল—অন্যদের সঙ্গে আলোচনা বা সভা-সমাবেশের জন্য। বিশাল লম্বা-চওড়া ভদ্রমহিলার অনেক বয়স হলেও তিনি বেশ করিৎকর্মা এবং চলাফেরায় সাবলীল। তাঁর ডাক নাম নিনা। আমি তাঁর নাম কিঞ্চিৎ পাল্টিয়ে নানি বলে ডাকা শুরু করলাম। অর্থ বুঝে তিনিও বিষয়টি সহাস্যবদনেই গ্রহণ করলেন। কথাবার্তা আমাদেরকে ইংরেজিতেই বলতে হয়—আমার নানি তা রাশিয়ান ভাষায় তর্জমা করে দেন। নানিকে এমন ভাবে পটালাম যে, তিনি আমার অকথিত বক্তব্য নিজগুণে সুন্দর করে ওদের ভাষায় রূপান্তরিত করে দেন।

হেবাকে নিয়ে বিপদে পড়া গেল। তার জন্য নির্দিষ্ট দোভাষী একজন গাট্টা-গোট্টা রুশ ভদ্রলোক। তাঁর বড় বৈশিষ্ট্য সে হাসতে জানে না। সবসময় সিরিয়াস। ইয়েস স্যার, আর নো স্যার শুনতে শুনতে হেবার কান ঝালা-পালা। সে এসে আমার নানির সাথে হাসি-মস্করা করতে চেষ্টা করল। নানিও চালু কম নন, তিনি হেবাকে বলে দিলেন, Gentleman, I am already engaged. দ্ব্যর্থিক শব্দের ঝঙ্কারে ডাবল ডেকার ডাক্তার নিশ্চুপ। ওর দুই বউ ছিল বলে ওকে এই নামে বন্ধুরা ক্ষেপাত।

আমার হয়েছে মুছিবত। সব রাশিয়ানকেই আমার দু'ভাগে বিভক্ত বলে মনে হয়। কেউ স্থূল, কেউ ঈষৎ কম স্থূল। চেহারা আমার নিকট সকলেরই এক প্রকার মনে হয়। কাজেই কাকে কখন দেখলাম, কার সঙ্গে ইতিমধ্যেই সাক্ষাৎ হয়েছে, স্মরণ রাখা কষ্টকর। নানীকে তখন ভালোই মজিয়েছি। তিনি আমাকে পূর্ব থেকেই কানে কানে সব বলে দিতেন। নানির কল্যাণেই প্রাণ পানি পেল।

বিভিন্ন অফিসে, মন্ত্রী এবং সুপ্রিম সোভিয়েতের সদস্য, যারা বিভিন্ন বিভাগের দায়িত্বে আছেন, তাঁদের সঙ্গে প্রায় প্রতিদিনই সাক্ষাৎ এবং দ্বি-পাক্ষিক

আলোচনা চলল। ওরা মূলত আমাদেরকে সমাজতন্ত্রের অমিয়বাণী শুনিয়ে মুগ্ধ করার প্রয়াস পাচ্ছিল। আমরা এক নতুন দেশের অতিথি। আমাদেরকে সব শিখিয়ে-পড়িয়ে দিতে হবে। ব্রেন-ওয়াশ করার কথা শুনেছি। এখন মনে হল, এই নিরন্তর প্রচেষ্টার নামই বোধহয় বুদ্ধিকে শুদ্ধি করার নামান্তর। যেখানেই যাই, কেবল ওদের সাফল্যের ঢাক পিটানো। সমাজতন্ত্রের সর্ববাদী সফলতার সব কাহিনী শুনতে শুনতে ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। বললাম, সমাজতন্ত্রে বক্তৃতা নিয়ন্ত্রণ করার কোন বিধান সন্নিবেশ করা হয়নি?

ওরা বুঝেও না বুঝার ভান করে। আমাদেরকে জব্দ করার জন্যই যেন নব উদ্যমে নব নব বাণী কপচাতে থাকে। কয়েকটি বৈঠক হল ক্রেমলিন প্রাসাদে। জারকে তাড়ালেও তার প্রাসাদ ব্যবহারে ওদের কোন দ্বিধা নেই।

হেবার খুব সুবিধা। তাকে তো আর বক্তৃতার প্রতিউত্তরে বক্তৃতা করতে হচ্ছে না! সর্বদাই অতি উত্তম চকোলেটসমূহ টেবিলে সজ্জিত থাকে। আমি মরছি কথার জ্বালায়, বেটা একটার পর সুমিষ্ট, সুস্বাদু চকোলেট গলাধকরণ করে যাচ্ছে। আমি থামলেই আমার দিকে ইঙ্গিত করে, চলবে নাকি?

হাড় জ্বলে যায়। বেটা নিশ্চয়ই চকোলেট খেয়ে খেয়ে ইতিমধ্যে কয়েক পাউন্ড ওজন বৃদ্ধি করে ফেলেছে। দেশে ফিরে বউদের যাঁতাকলে যখন পড়বে ডাবল ডেকার তখন বুঝবে কতটা চকোলেটে কতটা ভুঁড়ি।

সমাজতান্ত্রিক দেশের খাওয়া-দাওয়া কিন্তু যে কোন ধনতান্ত্রিক দেশকে হার মানাবে। সব রাজকীয় আয়োজন। কৃষ্ণসাগর থেকে আহরিত ব্ল্যাক ক্যাভিয়ার পরিবেশন করা হল অকাতরে। এত মূল্যবান মৎস-ডিম্ব। কিন্তু আমি মুখে দিতে পারি না। একটা বিজাতীয় গন্ধে আমার খাদ্যস্পৃহা দূরীভূত হয়ে যায়। হেবা এখানেও বাজিমাত করল। প্রচুর ক্যাভিয়ার খেয়ে খেয়ে আমার মুখের উপর ঢেকুর উদ্‌গীরণ করে আমাকে রাগিয়ে বিমলানন্দ ভোগ করত। প্রতিটি বেলায় এত বেশি খাদ্যদ্রব্য পরিবেশিত হচ্ছিল যে, অবাক হতে হয়।

খাওয়ার ব্যাপারে আমার একটু পছন্দ-অপছন্দের বিষয় আছে। যা ভালো লাগবে, প্রচুর খেয়ে নেব, যেটা পছন্দ হবে না—সেটা স্পর্শও করি না। কিন্তু এত খাদ্যের সমারোহ এবং অপচয় দেখে অস্বস্তি লাগছিল। গরিবানা আমাদের মজ্জায় মিশে আছে। অনাহারে মৃত্যু আমাদের দেশে নিয়মিত ঘটনা। তাই খাদ্যের বিপুল সমাহার আমাকে এক প্রকার পীড়া দেয়। দিনে পাঁচ-ছয় বার আপ্যায়নের ব্যবস্থা। সার্কাস দেখতে গিয়েছি, ব্যালে দেখছি—তার বিরতির সময়ও বহু প্রকারের খাদ্যবস্তুর সমাহার। আমরা যেটুকুই খাই না কেন, আমাদের সাথী রাশিয়ান বন্ধুরা কিন্তু সেসব খুব উপভোগ করছে। পরে নানি চুপি চুপি বললেন, তোমাদের জন্য

আয়োজন। এসব খাবার অন্য সময় ভাগ্যে জোটে
সেগুলোর সদ্ব্যবহার মন্দ কি!

নানিকে বললাম, নানি, তুমিও চালিয়ে যাও। নানা (
বালাই কি।

নানি হাসিমুখে প্রতি-উত্তর করলেন, নাইয়ার এক নাও, f
নাও—কাজেই আমাকে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে।

নানিকে বললাম, তোমার নৌকা বাওয়ার সময় বহুদিন পূর্বেই বিগত হয়েছে।

নানি রসিক কম নন! বলেন, পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

আমি ফোড়ন কাটলাম, বিফলে মূল্য ফেরত।

সবাই উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠল।

বাংলাদেশের জন্য ওরা কি করেছে, যুদ্ধকালীন ওদের অবদান সম্বলিত পুস্তিকা-প্রচারপত্রসমূহে আমাদের ফলিও ভর্তি হয়ে গেল। মুক্তকণ্ঠে ওদের কৃতিত্বের কথা স্বীকার করতে কার্পণ্য করলাম না। বই বের করে আমাদের মতামত লিপিবদ্ধ করতে বললে আমি বাংলায় আমার অভিমত দিই। ওদের নিকট বাংলা ভাষায় দক্ষ দোভাষীও রয়েছে।

আমাদেরকে মস্কোর ঐতিহাসিক স্থানসমূহ, জারদের সময়ের থেকে রক্ষিত অনেক পুরাকীর্তিও দেখান হল। লেনিনের সমাধিতে গেলাম রেড স্কোয়ারে। মহামতি লেনিনের মরদেহ বিশেষ পদ্ধতিতে সংরক্ষিত রয়েছে। প্রাচীনকালের মিশরীয় মমির ইতিবৃত্ত পড়েছি। কিন্তু আধুনিককালে মানুষের অন্যতম এক আশ্চর্য সফলতা মৃতদেহকে অবিকল পূর্বাবস্থায় রেখে দেওয়া। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিভিন্ন কেমিক্যাল এবং আরও কিসব ব্যবহার করে মানুষ এমন পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে যাতে মৃতদেহ অবিকৃত থাকে। মানুষ পরলোকগমন করার স্বল্প সময়ের মধ্যেই রিগর মর্টিস ফর্ম করে অর্থাৎ শরীরে মৃত্যুর লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। চেহারার স্বাভাবিকতা ঝরে গিয়ে মৃত্যুর কাঠিন্য তাকে ছেয়ে ফেলে। কিন্তু মানুষ মৃতদেহে আত্মা ফিরিয়ে আনতে কখনও সক্ষম না হলেও, তার আদি জৌলুসটি রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছে।

বিরাট লাইন লেনিনের সমাধি ক্ষেত্রে। রাষ্ট্রীয় অতিথি আমরা সদলবলে সেখানে পৌঁছতেই, কর্মকর্তাগণ বলে উঠলেন, প্রশাওয়াস্ত, প্রশাওয়াস্ত।

অর্থাৎ বাছাধনরা সরে যাও, জায়গা দাও, দেখছ না কারা এসেছে! ভিতরে প্রবেশ করে ইতিহাসের মহান নায়ক, রুশ-বিপ্লবের কিংবদন্তির পুরুষ, পৃথিবীর সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংগ্রামী মানুষ লেনিনকে দেখলাম শান্তভাবে ঘুমিয়ে রয়েছেন। তাঁর সমাহিত মুখমণ্ডলে এতটুকু বৈকল্য নেই। তাঁর পোশাক সুন্দর, ভাঁজটি পর্যন্ত নিঁখুত। মনে হয়, সদ্য স্নানান্তে নতুন পোশাক পরিহিত মানুষটি ক্লান্তি কাটাতে একটু বিশ্রাম নিচ্ছেন। সার্বক্ষণিক প্রহরা রয়েছে তাঁর দেহ

...রী কাঁচের কফিনটির চারপাশে। নতমস্তকে মহামানবের স্মৃতির প্রতি ...য়ের গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বের হয়ে এলাম।

বইতে লিখলাম, তাঁর কীর্তি শুনেছি। সফলতার ফসল চারদিকে দেখছি। আজ তাঁর নশ্বর দেহ দেখে এলাম অবিনশ্বর রূপে। ধন্য মহামতি লেনিন, ধন্য তাঁর সার্থক উত্তরসুরিগণ।

নানি রিপোর্ট করলেন, আমার ছোট্ট অভিমত ওদের নাকি খুবই সন্তুষ্ট করেছে।

ভারতের প্রধান কূটনৈতিক শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণ যিনি বহুদিন মস্কোয় কার্যব্যপদেশ অবস্থান করেছেন; তিনি প্লেনে আমার এক পাশে ছিলেন। তিনি আমাকে 'টিপস্' দিলেন, 'পাসিভা' মানে ধন্যবাদ, আর 'প্রশাওয়াস্ত' মানে ক্ষমা করবেন, এই দুটো শব্দের সাহায্যে রাশিয়াতে অনেক কাজ পাওয়া যায়। যত্রতত্র তার অপব্যবহার করে নানির তিরস্কার খেলাম। তার তিরস্কারের লোভে শব্দ দুটির বহুল প্রয়োগ অব্যাহত রইল।

আমাদেরকে মস্কোর বাইরেও নিয়ে যাওয়া হল যথোচিত সমাদরে। স্টালিনগ্রাডে যুদ্ধের পরিত্যক্ত সামগ্রী, জাহাজ এবং মিউজিয়াম প্রদর্শিত হল। ইতিহাস এখানে কথা বলে।

একটি চমৎকার ব্যালে নৃত্যানুষ্ঠানও এখানে উপভোগ করলাম। রাশিয়ার ব্যালে নৃত্যজগতের সেরা। শৈশবে পড়েছি আনা পাভলোভার উপাখ্যান। বাস্তবে এদের নৃত্যানুষ্ঠান দেখে বিমোহিত হলাম। প্রচুর আলু আর মাখন খেয়ে রাশিয়ান মেয়েদের ধাঁচ অনেকটা আগাখানি সম্প্রদায়ের বিপুলা মহিলাদের মতো। সেখানে ব্যালের প্রত্যেকটি শিল্পীর অপূর্ব দেহ-বল্লবী দেখলে মুগ্ধ হতে হয়। কোথাও এতটুকু বাড়তি মেদ নেই। যেখানে যেটুকু স্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্য প্রয়োজন; সেখানে ততটুকুই সন্নিবেশিত রয়েছে। এক ঝাঁক শ্বেত কবুতর অপূর্ব নৃত্য-ছন্দে, প্রাণ উজাড় করা কলা-কৌশলে আর অবিস্মরণীয় পরিবেশনায় তিনটি ঘণ্টা দর্শকদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখল। অনুষ্ঠান শেষে গ্রীনরুমে গিয়ে ওদের সাথে হাত মেলাবার সুযোগ হল। হাস্যোজ্জ্বল তরুণীদের প্রাণোচ্ছলতায় সন্তুষ্টচিত্তে আর একবার ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিয়ে এলাম।

আমাদেরকে লেনিনগ্রাড নিয়ে যাওয়া হল আমাদের ইচ্ছায় ট্রেনে করে। রাশিয়ার ট্রেন-ভ্রমণ আনন্দদায়ক শুনেছি। বিস্তৃত দেশে সাধারণত সড়কপথ এবং ট্রেন ব্যবস্থা উন্নতমানের হয়। প্রচণ্ড শীত পড়ায় এবং ভ্রমণটি রাত্রিকালীন ছিল বলে খুব একটা উপভোগ্য হল না। তবে সর্বোত্তম শ্রেণীর কুপেতে উষ্ণ লেপের নিচে ট্রেনের ঝাঁকুনিতে সে রাতে ঘুম ভালোই হয়েছিল।

লেনিনগ্রাডের শীত কোনদিন ভুলব না। একটি লেকের ধারে নিয়ে গেল। লেকের পানি সব বরফ হয়ে গিয়েছে। সে বরফ ছিদ্র করে কেউ কেউ বড়শি দিয়ে মাছও ধরছে। আমরা গ্রীষ্মপ্রধান দেশের মানুষ। এত শীত আমাদের

সহ্যের বাইরে। এত কাপড়-চোপড় পরেছি যে, আমাদেরকে এক-একটা কাপড়ের বস্তা বলে অনুভূত হচ্ছে। তারপরও গাড়ি থেকে নেমে যখন কোন স্থানে ঢুকেছি, সেই স্বল্প সময়টুকুতে মনে হয়েছে সহস্র ছুরিকাঘাতে কেউ আমাদের জর্জরিত করছে। গাড়ি গরম, যেখানে প্রবেশ করি সে স্থানও গরম—কিন্তু ওঠা-নামার সামান্য সময়েই আমাদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ল। লেনিন যেখানে সংগ্রামের সময় লুকিয়ে ছিলেন, সেই স্থানটি ওরা সযত্নে রক্ষণাবেক্ষণ করছে। দ্রুত সেটি অবলোকন করে আমরা ঢুকলাম জীবন ও সংগ্রামকে কেন্দ্র করে প্রতিষ্ঠিত একটি মিউজিয়ামে। সেদিন কেবল শীতই বেশি নামেনি, টিপটিপ করে বৃষ্টিও হচ্ছিল। বৃষ্টির পানি মাটিতে পড়তে না পড়তেই বরফে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে। দ্রুত গাড়ি থেকে অবতরণ করে দৌড়ে মিউজিয়ামের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলাম। হলটি বিরাট এবং চমৎকার উষ্ণতা বিরাজ করছে। কয়েক শত নারী-পুরুষ এবং শিশু দর্শনার্থী রয়েছে সেখানে। ওরা হয়তবা বিষয়ের চাইতে এই নিদারুণ শীত ও বৃষ্টিতে হলের মনোরম উষ্ণতা ভোগ করছে।

আমরা ভিতরে প্রবেশ করতেই প্রহরীরা দর্শনার্থীদের কি বলল। তারা করুণ চোখে আমাদের দেখতে লাগল। এই কারুণ্যের সঙ্গে ঘৃণামিশ্রিত অভিব্যক্তি স্পষ্ট দেখতে পেলাম। ভিআইপি এসেছেন, তোমরা এখন ঘর ছেড়ে দাও। তীব্র শীত আর বৃষ্টির মধ্যে ওরা বাইরে যেতে চাচ্ছে না। প্রহরীরা পুনরায় কণ্ঠ উঁচু করে বলল, প্রশাওয়াস্ত, প্রশাওয়াস্ত। অর্থাৎ অনুগ্রহ করে গা তোল।

বৃষ্টি হচ্ছে বাইরে, তাতে কী! এখানে যে বিদেশী মেহমান ভিআইপি এসেছে। সাধারণ মানুষ, তাদের করার কিছু ছিল না। আমাদের দিকে আর একবার তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে শীতের মধ্যে, বৃষ্টির মধ্যে হলের বাইরে গিয়ে দাঁড়াল। ওদের দিকে বিশেষ করে বয়স্ক নারী-পুরুষ ও শিশুদের দিকে তাকান যায় না। জিজ্ঞেস করে জানলাম, আমাদের সুবিধার্থেই তাদেরকে বিরূপ আবহাওয়ার মধ্যেও বাইরে যেতে হয়েছে।

খুব অপরাধী মনে হল নিজেদেরকে। বললাম, ওদেরকে ভিতরে নিয়ে আসুন। না হলে আমাদের মিউজিয়াম দেখার প্রয়োজন নেই।

প্রথমে একটু কিন্তু কিন্তু করলেও শেষ পর্যন্ত আমাদের দৃঢ়তার কাছে ওরা নতি স্বীকার করল।

প্রচণ্ড শীতে বৃষ্টিভেজা মানুষগুলো উষ্ণতার মধ্যে ভিতরে প্রবেশ করতে পেরে তাদের চোখে-মুখে কৃতজ্ঞতার যে ছবি ফুটে উঠল তা দেখে তৃপ্তি লাভ করলাম।

মস্কো ফিরে এলে স্থানীয় একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের নিয়ে যাওয়া হল। এখানে বিদেশী ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা অধিকতর। বাংলাদেশের কিছু ছাত্রের

সঙ্গে দেখা হল। বিশ্ববিদ্যালয়ের মান এবং পরিবেশ বেশ উন্নত বলে প্রতীয়মান হল। সেখানেও সমাজতন্ত্রের অগ্রযাত্রার বাণী কোমলমতি তরুণ-তরুণীদের মধ্যে সংক্রমণের প্রচেষ্টার কোন অন্ত নেই।

ফিরোজ সাঁই গাইত, 'ইস্কুল খুইলাছে রে মাওলা, ইস্কুল খুইলাছে...।'

এখানেও সর্বত্র ইস্কুল খুইলাছে—সমাজতন্ত্র শিক্ষা দিতাছে।

আমরা মস্কো থাকতে থাকতেই শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক ইউসুফ আলী সাহেবও মস্কো এসে উপস্থিত। তাঁকে অন্য একটি হোটেলে রাখা হয়েছে। হেবা এবং আমি তাঁর হোটেলে গেলাম দেখা করতে। তিনি দেশ থেকে সদ্য এসেছেন—আমরা অনেকদিন বাইরে। তাঁর নিকট শুনলাম, দেশ একটা অবক্ষয়ের স্রোতে ভাসছে। সমাজজীবনে একটা দুঃসহ পরিবেশ দ্রুত বিস্তৃত হচ্ছে। খুব শক্ত হাতে হাল না ধরতে পারলে সমাজ মুখ থুবড়ে পড়তে পারে। মোটামুটি জানা থাকলেও মন দুশ্চিন্তায় ছেয়ে গেল। এখানে আমরা কত না আনন্দ প্রবাহে সময় অতিবাহিত করছি!

ইউসুফ ভাই আমাদেরকে চা খাওয়াতে চাচ্ছেন। তাঁর সেক্রেটারি কামাল সিদ্দিকী অনেক চেষ্টা করলেও চায়ের ব্যবস্থা হল না। এক বৃদ্ধা-সেবিকা ঘর দেখাশুনা করতে এলে কামাল সাহেব তাকে পাকড়াও করলেন, একটু চা খাওয়াতে পার?

সে এক গাল হেসে বলল, সায়ে!

সে দ্রুত বেরিয়ে গেল এবং অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই বৃহৎ এক পট চা এবং আনুষঙ্গিক সব নিয়ে এসে উপস্থিত। সায়ে মানে চা, এটা জানা ছিল না। চা পান শেষে ইউসুফ ভাইয়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে হোটেলে চলে এলাম।

আমাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় রাশিয়ার সবচাইতে কী তোমার ভালো লেগেছে, তা হলে সঙ্গে সঙ্গে বলব, ব্যালের মেয়েরা এবং সার্কাসের ছেলেরা।

এর মধ্যে ওরা আমাদেরকে এক বিখ্যাত সার্কাস দেখাতে নিয়ে গেল। রাশিয়ান সার্কাস বিশ্বে নামকরা। যে কলা-কৌশল, শারীরিক কসরত এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সহযোগে শৈল্পিক পরিবেশনের অপূর্ব সংমিশ্রণ তারা করেছে না দেখলে সম্যক হৃদয়ঙ্গম হবে না। সার্কাস নয় তো, যেন এক যাদু। ছেলে-মেয়ে মিলে ওরা যা দেখাল তার কোন তুলনা হয় না।

অনুষ্ঠানের সর্বশেষ বিষয় ছিল ট্রাপিজ। বিরাট তাঁবুর উপরের অংশে তারা ভরা আকাশ সৃষ্টি করে, ট্রাপিজের যুবক-যুবতীরা রিং-এ ভাসতে ভাসতে মহাশূন্য মিলিয়ে যায়। সহস্র দর্শক আত্মহারা আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠল। অবাক বিস্ময়ে নিঃশ্বাস নিতে ভুল হয়ে যাওয়ার অবস্থা। একে সার্কাস বললে কম বলা হবে, এটি একটি মহাশিল্প—যাকে রাশিয়ানরা এক অলৌকিক আখ্যানে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছে। দেখতে দেখতে ঠিকই ফিরে যেতে ইচ্ছা করছে না।

তবু ফিরতে হয়। আমাদের বিদায়ের সময় হয়ে এল। প্রচুর উপঢৌকন এবং প্রচুরতর সমাজতান্ত্রিক জ্ঞানের বাণী নিয়ে বাংলাদেশে এসে পৌঁছলাম।

নেতাকে সব রিপোর্ট করলে তিনি খুব হাসলেন। বললেন, এখন বুঝেছিস? ওখানে না গেলে কী এত অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারতি?

বুঝলাম না, এ অভিজ্ঞতায় দেশের কতটা লাভ হবে।

গণপরিষদে বক্তৃতা করতে দাঁড়িয়ে জনাব আতাউর রহমান খান একটা জুৎসই কথা বললেন, আপনারা সবাই কেবল দেশ গড়ছেন, কিন্তু দেশ যে গড়িয়ে যাচ্ছে সে খবর রাখেন?

অবস্থাটা ঠিক তা-ই, বক্তৃতা-বিবৃতিতে আমাদের সাথে কেউ পারবে না, এ তো জানা কথা! কিন্তু তাতে কী পেট ভরে? মানুষ ক্রমান্বয়ে অধৈর্য হয়ে পড়ছে। একদিকে আর্থিক সংকট, সরকারের ও জনগণের। এ তো সকলের জানা, সরকারের ব্যয়, জনগণের আয়। কিন্তু সরকারের বড় পরিকল্পনার অভাব। কল-কারখানা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেই। নতুন কোন পথ জনগণের নিকট উন্মুক্ত নয়। রিলিফ আসছে প্রচুর। কিন্তু শুধু রিলিফ দিয়ে কি জাতি চলতে পারে! বরং রিলিফ বিতরণে যেমন বিচ্যুতি হওয়া অস্বাভাবিক নয় তেমনি সমগ্র জনগোষ্ঠীকে রিলিফমুখী বা পরমুখাপেক্ষী ভিক্ষুকের জাতিতে পরিণত করাটাও অত্যন্ত অমর্যাদাকর।

বঙ্গবন্ধু এক সভায় বলেই বসলেন, সব চাটার দল, চেটে শেষ করে দিল।

দেশ চালাচ্ছেন তিনি তাঁর দলকে দিয়ে। তাদের সম্বন্ধে এমনি ঢালাও মন্তব্য যদি সুপ্রিম-লীডার থেকে আসে তা হলে আর গতি কী? বাবা যদি নাম রাখে দুইখ্যা, তার সুখ হবে কী করে? লোকে বললেই দোষ!

ঘরে ঘরে প্রচারিত বঙ্গবন্ধু নাকি গাজী মোস্তফাকে বলেছেন, মোস্তফা, সাত কোটি কম্বল এল, আমার কম্বলটি গেল কোথায়?

বিষয়টা নিশ্চয়ই কল্পকথা। কিন্তু এ ধরনের অনেক রসাত্মক গল্প-গুজবে দেশ ছেয়ে গেছে। পরোক্ষভাবে বঙ্গবন্ধুকে কেউ কেউ দোষারূপ করতে লাগল। স্নেহান্ধ পিতার দ্বারা এ জাতিকে শাসন করা যাবে না। প্রয়োজন একজন কঠোর শাসকের। দেয়ালে দেয়ালে স্লোগান লেখা হল, বঙ্গবন্ধু কঠোর হও।

ভাবী একদিন আমাদেরকে বললেন, বঙ্গবন্ধুর সম্মুখেই বললেন, ওনার পা

দুটো কেটে বাদ না দিলে দেশের কিছু হবে না। শত অপরাধ করেও তাঁর দু'পা চেপে ধরতে পারলে সাত খুন মাফ।

কথাটা হয়ত বেঠিক নয়। কিন্তু এ প্রক্রিয়ার সূতিকাগার তো তাঁরই বিশ্রামকক্ষ বা খাবারঘর। সেখানেই দেশ ও তার সমস্যা নিয়ে গাজী, মণি, তোফায়েল, রাজ্জাক প্রমুখেরা ভাবীর উপস্থিতিতেই বঙ্গবন্ধুকে তাদের সর্বরোগের মহৌষধের প্রেসক্রিপশন দিয়ে থাকে। ক্যাবিনেট যদি দেশ চালায়, ক্যাবিনেটকে চালায় বঙ্গবন্ধু। বঙ্গবন্ধুকে চালায় কে?

সত্য বললে মা মার খাবে, মিথ্যা বললে পিতা হারাম খাবে। কী করি, সত্যি বলব, না মিথ্যা?

নেতা নিজেই একদিন উত্তর দিলেন, আমি লাল ঘোড়া দাবড়ায়া দেব।

কী বলতে চেয়েছিলেন তাঁকে যারা চেনে তারা ঠিকই বুঝেছিল। লাল, নীল বাহিনীর অত্যাচারে, বেঁটে-মান্নানদের লম্ফ-ঝম্ফে তিনি বিরক্ত ছিলেন। অনেকদিনের কর্মী ওরা, ফেলাও যায় না, গিলাও যায় না।

এক বৈঠকে বললেন, আবার যদি একটা বিপ্লব আসে, আবার যদি দেশে ঝড় আসে—আমি তাতেও নেতৃত্ব দেব। কিন্তু তোদের কারো কল্লা থাকবে না।

অলক্ষ্যে বসে সৃষ্টিকর্তা তখন হাসছিলেন। এরা সবাই ঠিকই থাকবে, তুমিই থাকবে না। বিধির অমোঘ বিধান কেউ খণ্ডাতে পারে না।

বিভিন্ন স্থানে গুপ্ত খুন হচ্ছে এবং সেসব ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরাই অধিকাংশ স্থানে ঘাতকের বুলেটের আঘাতে প্রাণ দিচ্ছে। জন-প্রতিনিধিরাও কেউ কেউ প্রাণ দিলেন। মনে হচ্ছিল, কোথাও কোথাও দুর্নীতি বা নিপীড়নের মারাত্মক সব অভিযোগ রয়েছে। নেতা আমাকে নির্দেশ দিলেন এমপি এবং নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে যেসব গুরুতর অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে, সেসব তদন্ত করে আমার নিকট প্রতিবেদন পেশ কর। দুর্নীতিবাজদের বিদায় করে দেব।

আন্তরিকতার তাঁর অভাব হয়ত ছিল না। কিন্তু তিনি তো নিজস্ব লোকদের প্রভাব বলয়ের ঊর্ধ্বে সবসময় নিজেকে রাখতে পারতেন না। একদিনের ঘটনা—সকালেই তলব পেয়ে তাঁর বাসায় পৌঁছেছি। তিনি তখন পোশাক পরছিলেন। শেখ মণি হন্তদন্ত হয়ে প্রবেশ করল। বলল, মামা, কয়েকজন অফিসার বেশি বেড়ে গেছে। তাদের শায়েস্তা করা প্রয়োজন।

তিনি কোন প্রশ্ন না করে বা কিছু জানতে না চেয়ে নির্বিকার চিত্তে বললেন, নামগুলো আমার অফিসে পাঠিয়ে দিস।

কারা বেড়ে গেল, কি তাদের অপরাধ, মণির সঙ্গে তাদের সম্পৃক্ততা কি—কোন প্রশ্নই তিনি করলেন না! আমি বিষয়টি তেমন গুরুতর কিছু মনে করলাম না। পরদিন সকালে খবরের কাগজ খুলে দেখি কয়েকজনের চাকরি নেই। পিও নাইন-এর বলে তাদেরকে বরখাস্ত করা হয়েছে। শিল্প-উন্নয়ন

সংস্থার অর্থ পরিচালক, বিক্রমপুরের কাজী রোমান উদ্দীন সাহেব এসে কেঁদে পড়লেন—তারও চাকরি নেই। জানা গেল মণি কোন অন্যায় অনুরোধ করলে তিনি তা অস্বীকার করায় আরও কয়েকজনের সঙ্গে তাঁরও ভাগ্যে এই শাস্তি ঘনিয়ে এসেছে।

তদন্ত হল না। অপরাধের কার্যকরণ কিছুই বিশ্লেষণ করা হল না। অফিসারদের অতীতের রেকর্ড পরীক্ষা করা হল না—এমনকি তাদেরকে আত্মপক্ষ সমর্থন করার সুযোগ বা কারণ দর্শানোর সময়ও দেওয়া হল না। মণির দেওয়া তালিকা তিনি তুলে দিয়েছেন পিও নাইনের যাঁতাকলে।

এভাবে দেশ পরিচালিত হলে, সেখানে অস্থিরতা বৃদ্ধি পাবে, দুর্নীতিতে সমাজ ছেয়ে যাবে এবং ফলে শাসনের নিয়ম-নীতি ব্যক্তির খেয়ালে পর্যবসিত হয়ে আইনের শাসনকে অসহায় করে তুলবে।

আমার সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর যে সম্পর্ক ছিল তাতে আমার পক্ষেও তাঁর 'ইনার সার্কেলে' ঢুকে এ ধরনের ক্রিয়াকর্ম চালিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল। কিন্তু তা করিনি। চেষ্টা করেছি সঠিক কথাটি বলার, সত্য ঘটনা তুলে ধরার। কখনও সফল হয়েছি, কখনও সে কথায় কেউ কর্ণপাত করেনি।

একটি প্রাথমিক তদন্ত রিপোর্ট প্রস্তুত হল। জন-প্রতিনিধিদের মধ্যে কথাটা ছড়িয়ে পড়তে তারা এসে অনেক ধরাধরি করলেন। কেউ সঙ্গে নিয়ে এলেন ব্রীফকেস ভর্তি অর্থ। লোভ সংবরণ করলাম। পিতৃতুল্য বড় দাকে কথা দিয়েছি, আমি আমার তৈরি রিপোর্টে অটল রইলাম। গণভবনে এক সন্ধ্যায় বঙ্গবন্ধুর বিশ্রামের অবসরে ফাইলপত্র নিয়ে উপস্থিত হলাম। দেখলাম সোহরাব হোসেন সাহেব এবং ইউসুফ ভাই আলোচনা করছেন। তাঁদের সামনে ইতস্তত করছিলাম। তিনি বললেন, কী বলার বল, ওদের সামনে অসুবিধা নেই।

রিপোর্টের একটি প্রতিলিপি তাঁর হাতে তুলে দিলাম। তিনি অভিনিবেশ সহকারে সেটি পড়লেন এবং এক পর্যায়ে মন্তব্য করলেন, এ ধরনের অভিযোগ সকলের সম্বন্ধেই খুঁজলে পাওয়া যাবে।

খানিকটা আহত কণ্ঠে বললাম, নেতা, অনেক পরিশ্রম করে কেবল পুলিশের বিভিন্ন দফতর নয়, সরকারি অন্যান্য বিভাগেরও সহায়তা নিয়ে বারবার নিরীক্ষা চালিয়ে তারপর এই অভিযোগসমূহ তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। এগুলো গুরুতর।

তিনি বোধহয় আমাকে ক্ষেপিয়ে আনন্দ পাবার উদ্দেশ্যেই বলে উঠলেন, অন্য কাউকে দিয়ে তদন্ত করালে তোর সম্বন্ধেও এমনি অভিযোগ তৈরি হবে!

আমি আরও আহত হলাম এবং দৃঢ়তার স্বরে বললাম, না, তা হবে না। হতে পারে না। আমি এমনতর কাজ করিনি।

তিনি বললেন, একদিনে তোর বিরুদ্ধেও রিপোর্ট তৈরি করিয়ে আনাতে পারি!

হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে বলে উঠলাম, একদিন নয় এক মাস সময় দিলাম, যদি আমার বিরুদ্ধে অসততার অভিযোগ আনাতে পারেন তা হলে যে শাস্তি দেবেন মাথা পেতে নেব।

আমার স্বর বোধহয় প্রয়োজনের চাইতে উচ্চগ্রামে চলে গিয়েছিল। সোহরাব ভাই ও ইউসুফ ভাই প্রমাদ গুনলেন, তারা ইশারায় আমাকে চুপ করে যেতে বললেন। কিন্তু ততক্ষণে যা বলার বলে ফেলেছি। তাঁর সঙ্গে এভাবে কেউ কথা বলে না!

হঠাৎ তিনি হো হো করে ঘর ফাটিয়ে হেসে উঠলেন। বললেন, ওকে একটু রাগিয়ে দিয়ে পরীক্ষা করলাম। আরে, তোকে কী আমি চিনি না! এই জন্যই তো তোকে এত স্নেহ করি।

আমি দ্রুত উঠে গিয়ে তাঁকে পায়ে হাত দিয়ে সালাম করলাম। তাঁর ঔদার্যেই বিষয়টি স্নেহসিক্ততায় অবসান হল। বললেন, রিপোর্ট রেখে যা। আমি পরে দেখে ব্যবস্থা করব।

কয়েকজনের বিরুদ্ধে অবশ্যই ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। কিন্তু অনেক রাঘব-বোয়ালই ছাড়া পেয়ে গিয়েছিল।

রাশিয়া ঘুরে এসেছি। আমেরিকানদের কান খাড়া হয়ে উঠল। ওরা ভালো করেই জ্ঞাত রয়েছে ছাত্রজীবন থেকেই আমি গণতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদের পক্ষভুক্ত। তাদের ভাষায় ডানপন্থী, সমাজতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণার পৃষ্ঠপোষক বা বামপন্থী নই। আমেরিকান রাষ্ট্রদূত একদিন অফিসে দেখা করতে এলেন স্টেট ডিপার্টমেন্টের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা মি. রবার্টকে সঙ্গে নিয়ে। তারা এসে একটি আনুষ্ঠানিক দাওয়াতপত্র প্রদান করলেন যুক্তরাষ্ট্র সফরের জন্য।

তাদেরকে বললাম, রাশিয়ান কর্তৃপক্ষও আমাকে দাওয়াত করেছিল প্রধানমন্ত্রীর নিকট। আপনারাও অনুগ্রহ করে তা-ই করলে উত্তম হয়।

তারা আমার প্রস্তাব মেনে নিলেন এবং যথাসময়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আমার দাওয়াতপত্র আনুষ্ঠানিকভাবে দিয়ে আসলেন। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা হলেই তিনি হেসে বললেন, বিশ্ব-বাজারে আমার চিফ হুইপের

কদর বেড়ে গেছে! তৈরি হও তোমাকে এবার যুক্তরাষ্ট্র যেতে হবে! তুমিই হবে যুক্তরাষ্ট্রে সফরকারী বাংলাদেশের প্রথম উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা।

হাসিমুখে নীরব থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ মনে করলাম। বেশ কিছুদিন কেটে গেল। এ সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য নেই। যুক্তরাষ্ট্র স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় বিপক্ষ শক্তিতে অবস্থান নিয়েছিল, তাই আগ্রহ থাকলেও তা প্রদর্শন করি না। যুক্তরাষ্ট্রের ঢাকা মিশনে কাজ করত আমার অত্যন্ত স্নেহধন্য, আমাদের সময়ে ফজলুল হক হলের নির্বাচিত ভিপি শাহ্ আতিয়ার রহমান। তার নামের প্রথমে শাহ্ থাকায় অনেকেই ওকে আমার ভাই মনে করত। সে প্রায়ই বিভিন্ন কর্মকর্তা নিয়ে এসে প্রোগ্রাম করার জন্য আমাকে তাগিদ দেয়। তাকে বুঝিয়ে বলি, তাগিদটি যথাস্থানে না দিলে কার্য সমাধা হবে না।

তা-ই করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত পুনরায় বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করে আমার সফর আর বিলম্ব না করার অনুরোধ জ্ঞাপন করেন।

বঙ্গবন্ধু আমাকে ডেকে বললেন, এক মাসের জন্য যুক্তরাষ্ট্র ঘুরে আয়। ওরা দু'মাস চেয়েছিল। এতটা সম্ভব নয়। এখানে অনেক কাজ। দেশের ইজ্জত যাতে বৃদ্ধি পায় তার চেষ্টা করবি। আগামী সপ্তাহেই চলে যা।

যুক্তরাষ্ট্রের একটি প্রতিষ্ঠান রয়েছে স্টেট ডিপার্টমেন্ট নিয়ন্ত্রিত, গভর্নমেন্ট এফেয়ার্স ইনস্টিটিউট। তাদের পক্ষ থেকে ভ্রমণ সংক্রান্ত যাবতীয় খরচ এবং যুক্তরাষ্ট্রে তাদের মেহমান হওয়া সত্ত্বেও প্রতিদিনের হিসাবে একটি ভালো অঙ্কের ডলার হাত খরচের জন্য দেওয়ার ব্যবস্থা করল।

একদিন দ্বিপ্রহরে স্বপ্নের দেশ যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশে রওয়ানা হওয়া গেল। দিল্লীতে একদিনের যাত্রা বিরতির পরদিন রাতে প্যানএ্যামের বিশালাকায় জাম্বো জেটে চড়ে বসলাম। ফার্স্ট ক্লাসের বিলাস ভ্রমণের আনন্দই আলাদা। ওরা আরও জানে, আমি যাচ্ছি যুক্তরাষ্ট্র সরকারের আমন্ত্রণে। সমাদরের অন্ত নেই। ক্ষণে ক্ষণে কত প্রকারের পানীয় নিয়ে সাধাসাধি। জানালাম, সুধার রসে চির-বঞ্চিত আমি। ওরা অবাক হয়ে বলাবলি করছিল, এত ভালো, এত জীবনীশক্তি ভরপুর পানীয় কেন পান করছ না?

বলি, অভ্যাস নেই, ধর্মেও নিষিদ্ধ।

ওরা চুপ হয়ে যায়। নানা খাদ্য, নানা কোমল পানীয় এনে আপ্যায়ন করে। সে সময় জাম্বো জেটের দ্বিতলে প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের জন্য সব কিছুই ছিল অপর্যাপ্ত।

লন্ডনে যাতাবিরতি করলাম। রকিবকে নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সফরে প্রয়োজনীয় পোশাকাদি ক্রয় করে পরদিন আবার হিথরো বিমানবন্দরে আর এক জাম্বোতে আরোহণ করলাম। আটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দিয়ে ওয়াশিংটনে তাঁদের প্রয়াত পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিশ্ব রাজনীতির একসময়ের অন্যতম বহুল আলোচিত ব্যক্তিত্ব জন ফস্টার ডালাসের নামাঙ্কিত ডালাস এয়ারপোর্টে

অবতরণ করলাম। প্লেনে বসে দূর থেকে ডালাস এয়ারপোর্টকে একটি সাধারণ গৃহের মতো বলে ভ্রান্তি হচ্ছিল। অবতরণের পর দেখি পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ আধুনিক বিশালায়তন একটি বিমানবন্দর।

স্টেট ডিপার্টমেন্টের কর্মকর্তাবৃন্দ, পূর্ব পরিচিত মি. রবার্ট এবং আরও অনেকে স্বাগত জানালেন। সবচাইতে সন্তুষ্ট হলাম বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত জনাব হোসেন আলীকে দেখে। জড়াজড়ি-কোলাকুলি দেখে আমেরিকানরা একটু বিস্মিত। হোসেন আলী সাহেব বুঝিয়ে বললেন, পুরনো বন্ধু। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় একসঙ্গে কাজ করার বহু স্মৃতি রয়েছে দু'জনের মধ্যে।

একজন বিশালকায় ব্যক্তিকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল, অবসরপ্রাপ্ত লে. কর্নেল উইলিয়াম ব্রানন। সে এখন বৈদেশিক মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যুক্ত। একমাস সে হবে আমার সার্বক্ষণিক গাইড এবং সরকারের পক্ষ থেকে আমার সফরের সংযোগ রক্ষাকারী। হোসেন আলী সাহেব বাংলায় বললেন, ওর বিরাট বপু দেখে ভয় পাবেন না। এত ভালো মানুষ এবং নির্ভর করার মতো এমন মধুর মানুষ খুব কমই দেখা যায়।

ঠিক তা-ই। অল্প সময়ের মধ্যে হৃদয়ঙ্গম হল, বিরাট দেহের মধ্যে একটি শিশুসুলভ মন জীবন থেকে সর্বদা আনন্দ আহরণে সচেষ্ট। কারো কোন কাজ করে দিতে পারলে নিজেকে বাধিত মনে করে। পরে ব্রাননের বাসায় একবার গিয়েছিলাম। ওয়াশিংটন শহরের উপকণ্ঠেই সে বসবাস করে। তার স্ত্রীও মিশুক এবং মিষ্টভাষী এক মহিলা। এই দম্পতির কোন সন্তান নেই। সেই জন্য তাদের কোন দুঃখবোধও নেই। বউ বলল, আমাদের অর্থের তেমন কোন প্রয়োজন নেই। যা রয়েছে এবং ব্রাননের আর্মি পেনশনই যথেষ্ট। কিন্তু সে কাজ ভালোবাসে। ভ্রমণ করতে ভালোবাসে—তাই বর্তমান কাজটি বেছে নিয়েছে।

স্বামী বাইরে থাকলে মিসেস ব্রানন একাই থাকে। মার্কিন সমাজে কোন অসুবিধা হয় না।

ওয়াশিংটন ডিসির এক অভিজাত হোটেলে আমাকে স্যুট দেওয়া হল। সবকিছুর আয়োজন সেখানে রয়েছে। যথাবিধি ফলের একটি ঝুড়ি ও এক বাক্স ভর্তি বিভিন্ন প্রকার তরল পানীয়। সবটাই অবশ্য হার্ড ড্রিঙ্ক। বাক্সটি আমি পাশের ঘরে ব্রানন সাহেবকে পাঠিয়ে দিতে সে মহা উল্লসিত হয়ে উঠল। তরল পদার্থের প্রতি তার বেশ ভালোই দুর্বলতা আছে। একজন কৃষ্ণাঙ্গ ওয়েটার এসে আমাকে এক বিচিত্র ভাষায় সব বুঝিয়ে বলল। কখন নাস্তার সময়, কখন লাঞ্চ ও ডিনার এবং কোথায় তা পাওয়া যায়, কি করে ঘর তালাবদ্ধ করতে হয়, খুলতে হয়। কীবোর্ডের ব্যবহার, গ্যাস চুল্লির ব্যবহার সবই সে বুঝিয়ে বলল। আমি এক বর্ণও বুঝলাম না।

হোসেন আলী সাহেব হেসে বললেন, এসব নিয়ে আপনাকে চিন্তা করতে

হবে না। আপনি ঘুমুতে না যাওয়া পর্যন্ত ব্রানন সাহেব সর্বক্ষণ দেখাশুনা করবেন। প্রয়োজন হলেই টেলিফোনে তাকে আহ্বান করবেন। তাকে সংলগ্ন ঘর দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া দূতাবাসের কেউ একজন সবসময় আপনার সঙ্গী হিসাবে থাকবে।

শুনে আশ্বস্ত হলাম। কৃষ্ণাঙ্গ ওয়েটারের বক্তব্য অনুসারে আরও একটি বিষয় হোসেন আলী সাহেব বুঝিয়ে দিলেন। মূল্যবান সামগ্রী এবং টাকা-পয়সা সঙ্গে রাখলে এবং খোয়া গেলে হোটেল কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়। সবকিছু হোটেলের 'লকারে' রাখাই বাঞ্ছনীয়। তা-ই করা গেল।

রাত পর্যন্ত হোসেন আলী সাহেব রয়ে গেলেন। কেননা, বৈদেশিক মন্ত্রণালয়ে রাতে আমাকে স্বাগত জানানোর জন্য নৈশভোজের আয়োজন রয়েছে এবং সেখানে তিনিও আমন্ত্রিত। আনুষ্ঠানিক ভোজসভায় আমাকে স্বাগত জানিয়ে গালভরা বক্তৃতা হল। কর্মকর্তাদের সঙ্গে পরিচয় হল।

উত্তরে আমাকেও আনুষ্ঠানিকতা রক্ষায় বক্তৃতা করতে হল। তরল পানীয় পানের মধ্যদিয়ে দুই দেশের শুভ কামনায়—আমার গ্লাসে পানি দেখে তারা বিস্মিত হল।

হেসে বললাম, পানির দেশেরই মানুষ আমি। টোস্টও পানি দিয়েই করা ভালো।

ওরা বুঝল, আমি মদ্যপান করি না। একজন মন্তব্য করল, আপনি একজন সহজ অতিথি।

সে রাতের মতো বিদায় নিয়ে হোটেলে ফিরে হোসেন আলী সাহেব বললেন, কাল দুপুরে আমার বাসায় ডাল-ভাত খাবেন। দুপুরে কোন খাবার নিমন্ত্রণ নেই। আর আমার স্ত্রী বলে দিয়েছে যে ক'দিন ওয়াশিংটনে থাকবেন, প্রতি বেলায় প্রকৃত বাঙালি রান্না সে ফ্রিজে রেখে দেবে। আনুষ্ঠানিক ভোজে আপনার তৃপ্তি হবে না। ওখানে কিছু মুখে দিয়ে পরে আমাদের বাসায় এসে ঠিকমতো আহার করবেন।

স্নেহময়ী মিসেস আলী তা-ই করেছিলেন। দু'বারে প্রায় দেড় সপ্তাহ ওখানে ছিলাম। আমি খেতে যাই বা না যাই, প্রতি বেলা তিনি আমার জন্য বিশেষ বিশেষ বাংলা খাবার প্রস্তুত করে রাখতেন।

পরদিন প্রত্যুষেই সংবাদ পেয়ে জাহানারা এবং ওর স্বামী আজমত আলী সাহেব এসে হোটেলে উপস্থিত। জাহানারা ছিল ছাত্রলীগে আমার কমিটির অন্যতম সহ-সম্পাদিকা, ইডেন কলেজ ছাত্রসংসদের সাধারণ সম্পাদিকা। ও শুধু আমাদের সহকর্মীই ছিল তা-ই নয়, ব্যক্তিগতভাবেও সে ছিল আমার অত্যন্ত স্নেহের পাত্রী এবং সহোদরাসম।

জাহানারার আনন্দ ধরে না আমাকে ওয়াশিংটনে পেয়ে। রোজ একবার ওর বাসায় যেতে হবে, ও যে কী চমৎকার রান্না করে এবার তার পরীক্ষা দিয়ে

ছাড়বে। আজমত অবশ্য ভিন্নমত পোষণ করল। বলল, প্রতিদিন কেন, আমার নিজের ক্রয় করা বাড়িতে স্বচ্ছন্দে এসে থাকুন, আমরা গভীর আনন্দ পাব। কিন্তু ওর রান্নার বিষয়ে যা বলল, তার সঙ্গে একমত হতে পারছি না বলে দুঃখিত। কোন ভরসা দিতে পারছি না। নিজে সাহস করে তা খেতে যদি রিস্ক্ নেন, তা হলে ভিন্ন কথা।

জাহানারা প্রতিবাদ করে উঠল, ওই জিনিসই তো দু'বেলা সাঁটিয়ে ভুঁড়ি বাগাবার যোগাড় করেছ!

আজমত সাহেব চমৎকর স্বাস্থ্যের অধিকারী। ভুঁড়ির চিহ্নও নেই। জাহানারার যত বেশি কথা!

একটি ছেলে ও একটি মেয়ে নিয়ে সুখী দম্পতি। পেশায় ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ার আজমত সাহেব প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। শুনি বাঙালিদের মধ্যে তিনি একটি ধনকুবের বিশেষ। ব্যস্ততার এক ফাঁকে জাহানারার বাসায় গিয়েছিলাম। ওর ছিমছাম সংসার দেখে আনন্দ হল। কিন্তু খারাপ লাগল, যতক্ষণ থাকলাম ও কেবল রান্না করতেই ব্যস্ত রইল। শেষ পর্যন্ত রান্নাঘরে গিয়েই বসলাম। ও রান্না করছে, গল্প করছে, আজমত ওকে ক্ষেপাবার জন্য যা-ই বলুক—রান্না সে এর মধ্যে বেশ ভালোই শিখে গিয়েছে। খুব আনন্দ করে খেলাম। বললাম, মার্কিন মুল্লুকে এসে সুন্দর বাবুর্চি বনে গেছিস। দেশে তো কলসের পানিটুকু ঢেলে খেতি না!

ও বলল, ভাই, সবই অভ্যাস। গরজ বড় বালাই।

জাহানারা এবং আজমত সাহেবের সঙ্গে এখনও আমার সুসম্পর্ক বিদ্যমান। আজমত সাহেব এখন মিলিওনেয়ার। ওয়াশিংটনে যে বাড়ি করেছে, তা অনেকেরই ঈর্ষার বস্তু। এর মধ্যে একবার ওয়াশিংটনে গিয়ে জাহানারার আতিশয্যে ওদের বাড়িতেই উঠেছিলাম।

মার্কিনীদের কায়দা-কানুনই ভিন্ন। দাওয়াত করে আনা হয়েছে, ঠিক আছে। যেসব সরকারি বৈঠক, আলোচনা বা লাঞ্চ-ডিনার থাকবে তাতে যোগ দিয়ে বাকি যে সময় থাকবে সেটা সম্পূর্ণরূপে আমার। ওরা হোটেলের বিল থেকে শুরু করে হিসাব করে সব নগদ ডলারে দিয়ে দেবে। ইচ্ছামতো খরচ কর। যখন চাইবে সরকারি লিমোজিন এসে দাঁড়াবে। অন্য সময় সফরের কো-অর্ডিনেটর সফরসঙ্গী মি. ব্রানন গাড়ি ভাড়া করে প্রয়োজনে সমস্ত দিনও সঙ্গে

রাখতে পারে। তার সেই অথরিটি রয়েছে। ক্রেডিট কার্ড ভাঙিয়ে সে ইচ্ছামতো খরচ করে, পরে বিল করে টাকা নিয়ে নেয়। প্লেনের টিকিট কাটা থেকে শুরু করে সবকিছুই মি. ব্রাননের দায়িত্ব। সকালে হাসিমুখে পাশের রুম থেকে টেলিফোনে 'গুড মর্নিং' বলেই জানতে চাইবে, আজ সকালে আমার হাল-হকিকত কেমন? রাতে ঘুম হয়েছে?

বলি, সুপ্রভাত। ধন্যবাদ লে. কর্নেল সাহেব। তুমি কেমন আছ?

সৌজন্য আলাপের পর সে দিনের কর্মসূচি জানিয়ে আমার কিছু যোগ করার আছে কিনা জানতে চাইত। প্রোগ্রাম ঠিক করে দু'জন একত্রে প্রাতরাশ করতে যেতাম। মি. ব্রানন বলত, স্যার, হোটেলের খাবার গতানুগতিক। একটু প্রাতভ্রমণের সঙ্গে নতুন কোন রেস্টুরেন্টে খেলে হয় না?

বলতাম, তা-ই চলুন।

একদিন এমনি একটি ছিমছাম রেস্টুরেন্টে প্রাতরাশ করছি। দেখলাম রেস্টুরেন্টের প্রবেশদ্বারে দাঁড়িয়ে ষোল-সতেরো বছরের উদ্ভিন্ন-যৌবনা অপূর্ব সুন্দরী একটি আমেরিকান মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার পায়ে জুতা নেই। ময়লা জিনসের প্যান্টের উপরে ততধিক ময়লা একটা সুতির পাঞ্জাবি। তার নিটোল বক্ষসৌন্দর্য স্পষ্ট দৃশ্যমান। কোন কাঁচুলি নেই। তার শরীরের রঙ যদিও আর দশটি আমেরিকানের মতো দুধে-আলতায় মিশ্রিত কিন্তু গায়ে তার প্রচুর ময়লা লেগে রয়েছে। সেদিকে তার বিন্দুমাত্রও খেয়াল নেই। সে এসেছে প্রাতরাশ কিনতে। কিন্তু তাকে জুতা নেই বলে ভিতরে প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে না। সে ওখানে দাঁড়িয়ে খাবেও না। তার বয়ফ্রেন্ডকে নিয়ে খাবে বলে প্রাতরাশ কিনতে এসেছে—কিন্তু সুবিধা করতে পারছে না। সবাই ঘৃণার চোখে তাকাচ্ছে। আমি কিন্তু তার রূপ-যৌবনময় দেহ থেকে চোখ সরাতে পারছিলাম না। মানুষ এত সুন্দর হয়!

মি. ব্রানন বলল, হতচ্ছাড়ি হিপ্পি। হয়ত কোন বড়লোকের মেয়ে। ঐশ্বর্যের অভিশাপে বাড়ি থেকে বের হয়ে কোন ছোঁকরার সাথে পার্কে, মাঠে-ঘাটে অবাধ যৌন সম্পর্ক, নেশা আর দুনিয়ার সব নোংরামি করে বেড়াচ্ছে। এরা হচ্ছে সুসভ্য মার্কিন মুল্লুকের সভ্যতার কালো পিঠ।

দেখলাম মি. ব্রানন ওদের উপর হাড়ে হাড়ে চটা। বলল, আমাদের হোটেলের সন্নিকটেই ওদের একটা আস্তানা রয়েছে, ফেরার পথে আপনাকে দেখিয়ে নেব।

দেখলাম জোড়ায় জোড়ায় বা একসঙ্গে অনেকে ছেঁড়া বস্ত্রাদি পরে কেউ ঝিমুচ্ছে নেশার ঘোরে, কেউ আড্ডা দিচ্ছে অন্যের সঙ্গে, কেউ বেহালা বাজাচ্ছে, কেউবা সঙ্গিনীর সঙ্গে এমনভাবে মিলিত হয়ে আছে যে, সেদিকে তাকান যায় না। অনেকে কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমিয়ে রয়েছে। এরা নাকি সব বড়লোকদের সন্তান। জীবনকে জানার অদম্য কৌতূহল আর উদ্ভট সব

খেয়ালে সুখ ও শান্তিময় গৃহকোণ স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে। অর্থই সকল অনর্থের মূল—এদের কাণ্ড-কারখানায় তা-ই প্রমাণ হয়। হিপ্পিইজম নাকি একটি বিবেকপ্রসূত আন্দোলন। সারা পৃথিবীতেই তার নাকি প্রসার ঘটবে। একজন অপেক্ষাকৃত সুস্থ হিপ্পির সঙ্গে আলাপ করে উপরোক্ত তথ্য পাওয়া গেল।

মি. ব্রানন তাড়া দিল, স্যার, চলেন। বেটারা সারা পার্কটাকে নরক বানিয়ে ফেলেছে।

বললাম, সরকার কিছু করে না?

বলল, কি করবে? এটা স্বাধীন দেশ। অন্যের ক্ষতি না করে, আইন না ভেঙে এখানে সব করা যায়। বললাম, স্বাধীনতা খুবই উত্তম, কিন্তু মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে তা আর ভালো থাকে না—তোমাদের দেশের এইসব ছেলে-মেয়েদের বিপথ-গমন তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

মি. ব্রানন চুপ করে থাকতেই পছন্দ করল।

যুক্তরাষ্ট্রে সে যাত্রা ছিল আমার জীবনের বহুল অভিজ্ঞতার বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র। মার্কিন কর্তৃপক্ষ আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের সক্রিয় বিরোধিতা করেছে এবং পাকিস্তানি হানাদারদের সর্বপ্রকার সহায়তা দিয়েছে। সেদিক থেকে কিছুটা দোষী মনোভাব তাদের আলাপচারিতায় ফুটে উঠত। কর্মকর্তারা বলতে চাইলেন, আমরা চুক্তি এবং বন্ধুত্বের মর্যাদা দিই। পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের দ্বিপাক্ষিক চুক্তি ছিল, ছিল বন্ধুত্ব। আমরা তার মর্যাদা রেখেছি।

বলতাম, আপনাদের এসব খোঁড়া যুক্তি। আপনাদের দেওয়া সমরাস্ত্র আর সাহায্য একটা জাতিকে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার হীন কর্মে ব্যবহৃত হবে—মানবতাবাদী, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী আপনারা চোখ বন্ধ করে তা না দেখার ভান করবেন সেটা কি সঠিক? আপনি জেনে-শুনে আগুন ধার দেবেন, সে আগুনে আরেকজনের ঘর পুড়বে তা কী সভ্য সমাজে চলতে পারে? পৃথিবী নাকি এক সমাজভুক্ত!

ওরা আমতা আমতা করত, কথা ঘুরাতে বলত, দেখুন না, আপনারা স্বাধীন হবার পর কত শীঘ্র আমরা আপনাদের স্বীকৃতি দিয়েছি এবং এখন নতুন দেশ গড়ার কাজে সর্বাগ্রে সবচাইতে বেশি সাহায্য-সহযোগিতা দিচ্ছি।

হাসিমুখে বলতাম, সে জন্য ধন্যবাদ যেমন প্রাপ্য, অতীতের অপকর্মের জন্য ইতিহাসে নিন্দাও ততটাই পাবেন।

ওরা হেসে বলত, আপনারা তো সাংঘাতিক জাতি।

বললাম, সাংঘাতিকের দেখছেন কী? সবে তো শুরু!

আনুষ্ঠানিক কর্মসূচির প্রারম্ভেই আমার মনোবাঞ্ছা অনুযায়ী ওয়াশিংটন ডিসির মধ্যদিয়ে প্রবাহিত পটোম্যাক নদীর অপর প্রান্তে আরলিংটন জাতীয় সমাধিক্ষেত্রে আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট জন ফিট্‌জেরাল্ড কেনেডির

সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের ব্যবস্থা করা হল। সবুজ ঘাসে ঢাকা প্রেসিডেন্ট কেনেডির সমাধিতে অনির্বাণ দীপ-শিখা জ্বলছে। পাশেই তাঁর এক শিশুপুত্রের ছোট্ট সমাধি। কেনেডির হত্যাকাণ্ড পৃথিবীর মানুষকে ভীষণভাব নাড়া দিয়েছিল। আমরাও এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডকে এক হৃদয়-বিদারক ঘটনারূপে দেখেছি এবং আমাদের সমবেদনা দুনিয়ার অন্য সব মানুষের চাইতে কম ছিল না। কেনেডির প্রতিভাদীপ্ত রাজনৈতিক জীবন এবং তাঁর সল্পকালীন সফল শাসনব্যবস্থা আমাদেরকে উদ্দীপনা যোগাত।

একগুচ্ছ শ্বেতশুভ্র ফুল তাঁর সমাধিতে অর্পণ করে নীরবে হৃদয়ের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করলাম। আমেরিকার ইতিহাসের তিন দিকপাল জর্জ ওয়াশিংটন, থমাস জেফারসন এবং আব্রাহাম লিঙ্কনের স্মৃতিসৌধসমূহ রাজধানীর সৌন্দর্য বর্ধন করে একে অধিকতর আকর্ষণীয় করে তুলেছে। ক্যাপিটল হিলকে সম্মুখে রেখে এই তিন বিশ্ব-বিশ্রুত মহান নেতার সৌধসমূহ একটি সমান্তরাল রেখায় অবস্থিত। চারদিকে কেয়ারি করা মনোরম সবুজ ঘাস, নানা বর্ণের ফুলের সমারোহ আর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়ানো রয়েছে সুবৃহৎ সবুজ মাঠ, লেক এবং কৃত্রিম ফোয়ারা। ক্যাপিটাল হিলকে সম্মুখে রেখে গড়ে উঠেছে পৃথিবীর সবচাইতে শক্তিশালী ধনতান্ত্রিক দেশের সরকারের বিভিন্ন দফতরসমূহ। প্রত্যেকটিতে রয়েছে স্থাপত্যশিল্প ও সৌন্দর্যবোধের অনুপম সংমিশ্রণ। সুপ্রিমকোর্ট বিল্ডিং এবং ঐতিহাসিক মিউজিয়ামসমূহ দৃষ্টিধন্য।

শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ও দর্শনীয় স্থানসমূহ প্রদক্ষিণ শেষে আমাকে নিয়ে যাওয়া হল ক্যাপিটাল হিলের সিনেট ভবনে। একপ্রান্তে সিনেট হল এবং অপর প্রান্তে হাউস অব রিপ্রেজেনটেটিভ। ভিতরে সুরঙ্গ-পথে অটোগাড়িতে যাতায়াতের ব্যবস্থা রয়েছে। উভয় ভবনই পরিদর্শন করলাম। সেখানকার বিশালাকার লাইব্রেরি ঘুরে ঘুরে দেখলাম এবং সিনেটের কার্যপ্রবাহ অবলোকনের জন্য ভিআইপি গ্যালারিতে আসন গ্রহণ করলাম।

সিনেটের অধিবেশন তখন চলছিল। একজন সম্মানিত সিনেটর তাঁর বক্তব্য রাখছিলেন। প্রায় সব আসনই শূন্য। বলা হল, সিনেটরগণ যার যার অফিস কক্ষে বসে কার্যপ্রবাহ অনুসরণ করছেন। অধ্যক্ষ সাহেব সভাপতিত্ব করছেন, বক্তা বক্তৃতা করছেন, ক্লার্কগণ সে বক্তৃতার নোট নিচ্ছেন। দর্শকদের গ্যালারিগুলো কিন্তু পূর্ণ। সিনেটরদের মধ্যে কেউ স্বল্পক্ষণের জন্য ঢুকেই ব্যস্ত হয়ে বের হয়ে যাচ্ছেন। আমি বিষয়টি বেশ উপভোগ করছিলাম। সিনেটরবিহীন সিনেটে বক্তৃতার ঝড় বইছে। হোসেন আলী সাহেব আমাকে বুঝালেন, তারা অধিবেশন কক্ষে উপস্থিত না থাকলেও অধিবেশনের প্রতিটি কার্যক্রম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ওয়াকিফহাল।

আমাকে নিয়ে যাওয়া হল কেনেডি পরিবারের কনিষ্ঠ সদস্য সিনেটর টেড্ কেনেডির চেম্বারে। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় তাঁর মানবিক সমর্থন এবং শরণার্থী

কেন্দ্রসমূহ পরিদর্শন আমাদেরকে নৈতিক শক্তি যুগিয়েছিল। কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা বাঞ্ছনীয় বলে মনে করেছিলাম। তিনি সাদরে আমাকে গ্রহণ করলেন, হাত মিলালেন এবং আমাদের দেশীয় পদ্ধতিতে আলিঙ্গন করলেন। আলোকচিত্র শিল্পীদের অনুরোধে আমরা তাঁর অফিস ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালাম ছবি তোলার জন্য। পত্রিকাসমূহে পরে সে ছবি প্রকাশিত হয়েছিল। সে ছবি আজও আমার বাড়িতে রক্ষিত আছে।

দ্বিপ্রহরে রাষ্ট্রদূতের বাড়িতে তাঁর গৃহিণীর নিজহস্তে রান্না করা বাংলাদেশী খাবারে ভূরিভোজ হল। জাহানারাও সেখানে নিমন্ত্রিত ছিল। অনেক হাসি-গল্পের মধ্যে আমাদের মধ্যাহ্নভোজ সমাধা হল। রাতে বৈদেশিক মন্ত্রণালয়ের জনৈক কর্মকর্তার বাড়িতে নৈশভোজে যোগ দিতে হল। সেখানে এককালে সলিমউল্লাহ মুসলিম হলের সহ-সভাপতি আবুল মাল আবুল মুহিতের সঙ্গে অনেকদিন পর সাক্ষাৎ হল। তাঁর স্ত্রীও সঙ্গে ছিলেন। একবার আমরা ভাষা আন্দোলনে একসঙ্গে জেল খেটেছিলাম। তিনি সে সময় ওয়াশিংটনে কর্মরত ছিলেন। তিনি পরদিন রাতে তাঁর সঙ্গে চাইনিজ খাওয়ার আমন্ত্রণ জানালেন। সকাল থেকে আমার একের পর এক আনুষ্ঠানিক বৈঠক ছিল বিভিন্ন কর্মকর্তাদের সঙ্গে। সর্বত্রই বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থা ও আগামী দিনের সম্ভাবনার দিক তুলে ধরতে হত। যুদ্ধ-বিধ্বস্ত বাংলাদেশকে গড়ে তোলার ব্যাপক কর্মসূচিতে অধিকতর সহায়তা প্রদানের জন্য আমার আবেদন ছিল আন্তরিক। সকলেই সহানুভূতি নিয়ে তা শ্রবণ করতেন এবং তাদের করণীয় সম্বন্ধে আশ্বাস রাখতেন।

শোনা গেল, সিনেটের বৈদেশিক সাহায্য দান সংক্রান্ত কমিটির সভায় আজ বাংলাদেশের উপর শুনানি হচ্ছে। হোসেন আলী সাহেব বুঝিয়ে বললেন, বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ এক-একটি দেশে এক বছর, দু'বছর অবস্থান করে সকলের অলক্ষ্যে সে দেশ সম্বন্ধে তত্ত্ব ও তথ্য সম্বলিত প্রায় অভ্রান্ত প্রতিবেদন তৈরি করে এই কমিটির নিকট পেশ করে। তার উপর আমাদের দেশের আদালতের মতো শুনানি হয়। সওয়াল-জবাব হয় এবং তার উপর নির্ভর করে সে দেশে কি পরিমাণ সাহায্য প্রেরণ করা হবে তা নিরূপণ করা হয়। হোসেন আলী সাহেব বললেন, স্যার, বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের প্রোগ্রামও আজকের মতো তেমন নেই। চলুন আমরা এই অধিবেশন প্রত্যক্ষ করি।

বিষয়টি আগ্রহ সৃষ্টি করল। গিয়ে বসলাম শুনানির অধিবেশনে। আমাদের দেশের হাইকোর্টের বেঞ্চ যেভাবে শুনানি গ্রহণ করে, অবিকল সেই রকম একটি আদালত-সদৃশ অধিবেশন চলছিল। বাংলাদেশের উপর ডক্টরেট করা জনৈক অর্থনীতিবিদ এবং সমাজবিজ্ঞানী সাক্ষ্য দিচ্ছিলেন। রোস্ট্রামে পাঁচ জন সদস্য বসেছিলেন। ফরেন এইড কমিটির সভাপতি পৌরহিত্য

করছিলেন। বিশেষজ্ঞ সাহেব বাংলাদেশের উপর তাঁর যে রিপোর্ট দিলেন, তা শুনে চোখ ছানাবড়া হয়ে যাবার অবস্থা। অবশ্য তেমন মিথ্যাও তাতে নেই। কিন্তু সব সত্য কথা একত্রে গেঁথে পরিবেশন করলে; তাকে গ্রহণ করতে খুবই মনঃকষ্ট হয়ে যায়। তিনি বলেছেন, দেশের প্রায় নব্বই ভাগ মানুষ নিরক্ষর, সমাজে রয়েছে অশিক্ষা, কুশিক্ষা আর বিবিধ কুসংস্কার এবং ধর্মগোঁড়া এক শ্রেণীর অবুঝ মানুষ। স্বাস্থ্য তাদের নিদারুণ মন্দ। নানা প্রকার রোগ-ব্যাধিতে তারা আক্রান্ত। চিকিৎসার সুযোগ সীমিত এবং অপ-চিকিৎসাই অধিকতর। অভাব-অনটন নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। এ নিয়ে খুব একটা মাথাব্যথাও নেই। হাড়-জর্জর নিঃস্ব মানুষগুলো কিন্তু মানুষ তৈরির কারখানায় পূর্ণ উদ্যমে উৎপাদন বাড়িয়ে যাচ্ছে। বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থানের কোন ব্যবস্থা নেই, কিন্তু বাল্যবিবাহ এবং শিশু-জন্মকে সবাই স্বাগত জানাচ্ছে।

সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশের মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য একেবারে নিম্নতম পর্যায়ে। চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, শিশু অপহরণ, নারী নির্যাতন আর সামাজিক অবিচার ঘটছে প্রতি মুহূর্তে। অস্ত্রের মুখে নারীর শ্লীলতাহানির ঘটনা অহরহ ঘটছে।

দেশের শাসন কাঠামো প্রায় ভেঙে পড়েছে। যিনি দেশের সর্বময় কর্তা, তিনি জনগণের নিকট এখনও প্রিয়। কিন্তু এমতাবস্থা দীর্ঘদিন থাকবে না। সমস্যার সমাধানে তিনি সম্পূর্ণ অপারগ। তাঁর ধারণা, তিনি একজন সফল শাসক। কিন্তু ঘটনা সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁর চতুর্দিকে দুর্নীতিবাজদের অবস্থান। দেশটির ভবিষ্যত চিত্র ভয়াবহ। অচিরেই এর সম্বন্ধে বিশেষ দৃষ্টি না দিলে পরিস্থিতির অবনতি ঘটতে বাধ্য। ছোট্ট পরিসরের দেশে একগাদা মানুষ নামের কীট কিলবিল করছে।

শুনতে শুনতে আমার ওই ঠাণ্ডার মধ্যে ঘাম দিতে শুরু করেছিল। কথা হয়ত অনেকটাই সত্য। কিন্তু এভাবে একসঙ্গে উপস্থাপন করলে নিজেকে বড় ক্ষুদ্র, বড় অসহায় মনে হয়। হোসেন আলী সাহেবেরও অবস্থা প্রায় একই প্রকার।

সভাপতি সাহেব সোজা হয়ে বসে বক্তব্য শুনছিলেন। এক পর্যায়ে তিনি চেয়ারে হেলে বসে বলে উঠলেন, প্রকৃত সমস্যা তো তা হলে বাংলাদেশে! আমরা ভিয়েতনাম, ভিয়েতনাম করে মরছি কেন?

শুনে আরও লজ্জা পেলাম। হোসেন আলী সাহেব অধিবেশনের কীপার বা ক্লার্ককে এসেই কিছু জানিয়েছিলেন। তিনি বোধহয় সভাপতি সাহেবকে চিরকুট দিয়েছিলেন, বাংলাদেশের চিফ হুইপ শুনানি কক্ষে উপস্থিত আছেন। তিনি সেই স্লিপের অপর পৃষ্ঠায় লিখে দিলেন, মাননীয় চিফ হুইপ, বাংলাদেশ! ইউর এক্সেলেন্সি, আপনার যদি অন্যত্র জরুরি এ্যাপয়েন্টমেন্ট

না থাকে তা হলে অনুগ্রহ করে আপনি আপনাদের রাষ্ট্রদূতসহ আমার সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজ গ্রহণ করে বাধিত করবেন কি? কিছু কথা আলোচনার ছিল। আপনার সদয় উপস্থিতির সুযোগে হঠাৎ নিমন্ত্রণ করছি। কিছু মনে না করলে খুশি হব।

স্লিপটি পেয়ে হোসেন আলী সাহেব চুপিচুপি বললেন, স্যার, ইনি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। কথা বলতে চাচ্ছেন। আমাদের অনেক কাজ হবে—সব ফেলে চলুন যাই।

বললাম, যেমন ভালো মনে করেন।

লিখে দেওয়া হল আমরা আনন্দের সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজে শরিক হব।

যথাসময়ে তাঁর অফিস কক্ষে নিয়ে যাওয়া হল। আমি অনেক অফিসই জীবনে দেখেছি। কিন্তু এত সুসজ্জিত এবং এত বিলাসবহুল আয়োজন খুব কমই দেখেছি। ঘরের কার্পেট এত নরম ও আরামদায়ক যে, পা ডুবে যাচ্ছিল। তিনি আমাদেরকে স্বাগত জানালেন। খাদ্য-পানীয় পরিবেশিত হল। তিনি বারবার দুঃখ প্রকাশ করলেন হঠাৎ এই নিমন্ত্রণ করার সুযোগ নিয়েছি। আয়োজন আপনাদের উপযুক্ত করতে পারা যায়নি। মার্জনা করবেন।

ভদ্রতা একেই বলে। বললাম, আর লজ্জা দেবেন না। গরিব দেশের মানুষ আমরা, এখানে যা দেখছি এবং খাচ্ছি তার কোন তুলনা হয় না।

কফি পানের সময় বসবার কক্ষে তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, শুনানি শুনেছেন, বক্তব্য কী সঠিক?

কী জবাব দেব? কিন্তু জবাব তো দিতেই হবে! বললাম, কিছুটা সঠিক, কিছুটা বেঠিক। সবটুকু আমি গ্রহণ করতে পারছি না।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কোন্‌টুকু আপনি অস্বীকার করেন?

বললাম, স্বীকার-অস্বীকার কোন্‌টাই করি না। বাংলাদেশকে জানতে হলে সর্বাগ্রে তার প্রেক্ষাপট উপলব্ধি করতে হবে।

তিনি বললেন, যেমন?

বললাম, আপনার চিন্তা ও চেতনাকে দুই শত বছর পেছনে নিয়ে যেতে হবে। তখন দেশটি পরাধীন ছিল না। ভাত-কাপড়ের অভাববোধও ছিল না। মানুষ স্বল্প বিত্তেই সুখী বা সমৃদ্ধশালী ছিল। কোন খুন, ছিনতাই, নারীহরণ মানুষ জানতই না। অনাবিল শান্তি বিরাজ করছিল পৃথিবীর এই অঞ্চলটিতে। ক্ষেতে ওরা ফসল পেত। গরু তাদের দুধ জোগাত। পুকুর আর নদীতে ছিল অফুরন্ত মাছ। দুর্ভিক্ষ কাকে বলে ওরা জানত না। সে দেশের সোনালি আঁশ পাট, চা, চামড়া আর মৎসের চাহিদা ছিল অন্যত্র।

তারপর একদিন আপনাদের বিগ ব্রাদার বা প্রকৃতপক্ষে আপনাদেরই পূর্বপুরুষ ইংরেজরা দেশটিতে এসে উপস্থিত হল। লোভ হল সেখানকার

সম্পদের প্রাচুর্য দেখে। সঙ্গে ছিল অস্ত্রশস্ত্র ও সেনাবাহিনী। ছলে-বলে-কৌশলে এবং এক পর্যায়ে প্রকাশ্য যুদ্ধে শান্তিপ্রিয় নিরস্ত্র মানুষগুলোকে পরাস্ত করে তারা রাজদণ্ড হাতে নিল। কেবল শাসন আর শোষণই চলল তা নয়, এখানকার সম্পদ ক্রমান্বয়ে পাচার হয়ে গেল রাজাদের নিজস্ব দেশ বিলেতে। দুই শত বছর চলল এই প্রক্রিয়া। তারপর ইংরেজ বিদায় হল। নতুন আশায় বুক বাঁধল দেশের কালো চামড়ার মানুষগুলো। কিন্তু ভাগ্য তাদের বিরূপ, সাদা চামড়ার পরিবর্তে এক বাদামি চামড়ার আবির্ভাব হল। যে জিনিস চলে যেত লন্ডন, বার্মিংহাম ও মানচ্যাস্টারে, সে জিনিসই স্থান বদল হয়ে চলে গেল করাচি, লাহোর ও রাওয়ালপিণ্ডিতে। বাংলার মানুষ যেই তিমির সেই তিমিরেই পড়ে রইল। নব্য পরাধীনতার যাঁতাকলে তারা নিষ্পেষিত হল দুই যুগ।

ক্রমান্বয়ে তাদের উপলব্ধি জাগল। দেশকে পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচন করতে হবে। ইতিমধ্যে মানুষ বৃদ্ধি পেয়েছে জ্যামিতিক হারে। কোন কার্যকর পন্থা সে ক্ষেত্রেও প্রয়োগ হয়নি। গরিব মানুষ গরিবতর হল।

একদার সুজলা-সুফলা-শস্যশ্যামলা বাংলাদেশ, এশিয়ার রানী বলে যাকে চিহ্নিত করা হত—সে হয়ে গেল কুজলা-কুফলা-শস্যহীনা দুনিয়ার ভিখারিণী। আর প্রায় মরুভূমির দেশ পাকিস্তান ক্রমান্বয়ে মরু-উদ্যানে রূপান্তরিত হল বাংলাদেশের সম্পদ অকাতরে লুণ্ঠন করে।

তিনি বললেন, এতে আমেরিকানদের কী দোষ?

বললাম, কিছু মনে করবেন না। একদিন ইংল্যান্ডের সব অপরাধীদের 'মে ফ্লাওয়ার' জাহাজে ভরে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল—তারাই এসে আমেরিকায় পৌঁছে বসবাস শুরু করে। তাদের বংশধরই আজকের মার্কিনীরা। পূর্বপুরুষদের অপরাধ পরবর্তী বংশধরদের উপরে বর্তায় বৈকি!

আরও বললাম, তারপর যখন পাকিস্তানের হানাদার সৈন্যরা সাধারণ মানুষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, বাড়িঘর ভস্মীভূত করে দিল, অকাতরে লক্ষ লক্ষ মানুষ খুন করল, নারী নির্যাতন করল নির্বিচারে, মনুষ্যত্বকে জলাঞ্জলি দিয়ে আধুনিক বিশ্বের সভ্যতা, মানবতা আর শিক্ষা-দীক্ষাকে ধূলায় লুণ্ঠিত করে দিল, তখন মানব সভ্যতার প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শিত করে সুসভ্য, গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী মার্কিনীরাই সেই খুনীদের মদদ জোগাল মুক্তহস্তে। তারা দায়ী নয়?

বলতে বলতে আমার আবেগ এসে গিয়েছিল। আরও বললাম, আজ আমাদের মূল্যায়ন করছেন। অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত, নিরন্ন, অসহায় একটি জাতি যখন কোমরে গামছা বেঁধে আধুনিক সজ্জিত একটি সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হল এবং জয়লাভও করল, সে যুদ্ধলব্ধ অস্ত্রের খানিকটা আজও

গ্রামে-গঞ্জে রয়ে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। তার ফলশ্রুতিতে কিছু অঘটনও অসম্ভব নয়। তাই অপরাধের অনেক বিবরণ আজ শুনছেন। অবক্ষয়ের অনেক দৃষ্টান্ত আজ আপনাদের দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। এই সুসভ্য মার্কিন মুলুকেও শুনেছি বিদ্যুৎ চলে গেলে এক নিউইয়র্ক শহরে শত শত ধর্ষণের ঘটনা সংঘটিত হয়। সুসভ্য দেশে প্রবেশের মুখে শুনতে পাই জান-মাল যার যার হেফাজতে। এত কাণ্ডের পরও বাংলাদেশে বাতি নিভে গেলেই ধর্ষণের ঘটনা ঘটে না। জান-মালের দায়িত্ব এখনও সরকারই যতটা সাধ্য বহন করে।

আমার দীর্ঘ বক্তব্য তিনি অত্যন্ত মনোনিবেশ সহকারে শুনলেন। হোসেন আলী সাহেব খুবই সন্তুষ্ট। উপসংহারে বললাম, বাংলাদেশের লোকসংখ্যা অত্যধিক। সারা পৃথিবীর সমস্ত মানুষ যদি যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে আসা যায়, তা হলে মাইল প্রতি তার যা জনসংখ্যা হবে, বাংলাদেশে এখনই মাইল প্রতি জনসংখ্যা তার চাইতে বেশি রয়েছে। আপনাদের এত জায়গা, কিছু লোক নিন না কেন? এ দেশে তারা হবে নতুন ইমিগ্রান্ট। আপনারা পুরনো ইমিগ্রান্ট—পার্থক্য এটুকুই।

তিনি হেসে বললেন, তোমার সব বক্তব্য শুনলাম। যদি কিছু মনে না কর, একটা কথা বলব?

বললাম, বলুন।

আবার বললেন, কথা দিতে হবে কিছু মনে নিতে পারবে না।

বললাম, তা-ই হবে। কিছু মনে করব না।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আমার এ ঘরটি তোমার কেমন লেগেছে?

জবাবে বললাম, বলাই নিষ্প্রয়োজন, এ রকম সুন্দর ঘর আমি আগে আর দেখেছি কিনা সন্দেহ!

তিনি বললেন, এখন যদি কয়েকটি আরশোলা বা নোংরা পোকা এ ঘরে ঢুকে পড়ে তোমরা কী করতে বলবে?

বললাম, নিশ্চয়ই সেগুলোকে তাড়াবার ব্যবস্থা করতে বলব।

তিনি বললেন, আগেই কথা দিয়েছ, কিছু মনে করতে পারবে না। তোমাদেরকেও আমরা অনুরূপ পোকা-মাকড়ের মতোই মনে করি। তোমাদের বর্তমান অবস্থার কারণ যা-ই হোক, আমরা চাইব না আমাদের সাজানো বাগানে তোমরা ঢুকে পড়। বাগানটি তছনছ করে আমাদের ফুলগুলোকে বিনষ্ট করে দাও। এশিয়ানরা এসেই সর্বাগ্রে আমাদের ফুলের মতো মেয়েগুলোকে তাদের কোটের বাটন-হোলে গেঁথে ফেলে। আমরা তা চাইতে পারি না!

আর এক দফা কথা বলতে উদ্যত হতেই তিনি আমাকে সবিনয়ে বললেন, আমাদের বন্ধুত্ব স্থায়ী হোক। তোমাদের দেশের জন্য যতটুকু করা প্রয়োজন, আমি চেষ্টা করব তার চেয়ে বেশি করতে।

অত্যন্ত আনন্দিত চিত্তে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বিদায় নিলাম। হোসেন আলী সাহেব বাইরে এসে আর একবার আমাকে জড়িয়ে ধরলেন।

প্রথমবারের মতো ওয়াশিংটনের কর্মসূচি আপাতত সমাধা করে নিউইয়র্কে পৌঁছলাম। জাতিসংঘের হেড কোয়ার্টার নিউইয়র্ক। কেবল তা-ই নয়, এমন আশ্চর্য শহর কমই দৃষ্টিগোচর হয়। মূল শহর ম্যানহ্যাটান একটা দ্বীপ, চারদিকে সমুদ্র থেকে প্রবাহিত নদীবেষ্টিত। বৃহত্তর নিউইয়র্ক ম্যানহ্যাটানের তিন দিকে ছড়িয়ে আছে—চারদিকে সেতু এবং নদীর নিচে ভূগর্ভস্থ টানেল দ্বারা সংযোজিত। নিউইয়র্ক হল পৃথিবীর মধ্যে সেই শহর যেখানে সারা দুনিয়ার রান্নাঘর বিরাজমান। সব দেশের, এমনকি সব অঞ্চলের খাবার নিউইয়র্কে অহরহ পাওয়া যায়। বাংলাদেশেরও ঢাকার রান্না, সিলেটের রান্না, চট্টগ্রামের রান্না, এমনকি সন্দীপের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ খাবারও সেখানে কোন না কোন রেস্টুরেন্টে সহজলভ্য।

এত উচ্চতাবিশিষ্ট দালান অন্য কোথাও নেই। প্রায় সব দালানই সত্তর-আশি তলাবিশিষ্ট। উপরের দিকে তাকালে মাথার টুপি পড়ে যাবে। এত উচ্চ ইমারত থাকার পরও শহরের ভূগর্ভে রয়েছে কয়েক তলাবিশিষ্ট মেট্রো লাইন। নিউইয়র্কের রাস্তায় বেরুলে নিচ থেকে স্থানে স্থানে লোহার জাল ভেদ করে ধোঁয়া উঠতে দেখা যায়। New York is a great hollow city. আশ্চর্যান্বিত হতে হয় যখন দেখা যায় সেই শূন্যগর্ভ শহরেই পৃথিবীর সবচাইতে উচ্চতাসম্পন্ন ইমারতসমূহ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

প্রথম নিউইয়র্ক যাত্রায় সকলের মতো আমারও বিস্ময়ের ঘোর কাটতে চায় না। অ্যাম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং এই সেদিনও ছিল পৃথিবীর উচ্চতম ইমারত। তার শেষ মাথায় চড়ে নিউইয়র্কের চতুর্দিক দর্শন করা গেল। দেখা গেল আটলান্টিক মহাসাগরের তীরে কি অদ্ভুতভাবে গড়ে উঠেছে নিউইর্য়ক! ঘুরে ঘুরে সব দেখা হল। আনুষ্ঠানিক বৈঠক সম্পন্ন করা হল। জাতিসংঘ ভবনে নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক অবলোকন করলাম। ভূমধ্যসাগর নিয়ে বিতর্ক এবং ভোটাভুটি অবলোকন করলাম। আমাকে ব্রানন সাহেব উঠিয়েছিল ইউএন প্লাজা হোটেলে, যা জাতিসংঘ সদর দফতরের সন্নিকটে অবস্থিত।

বাংলাদেশের রেস্টুরেন্ট সংখ্যা তখন খুবই বিরল। যাও দু' চারটে রয়েছে, ভারতীয় খাবারের দোকান বলে পরিচিত। গোপালগঞ্জের এক যুবক

রেস্টুরেন্ট খুলেছে খুব জৌলুস করে। কি করে যে একটি রিকশা যোগাড় করেছে সে-ই জানে। খুব সুন্দরভাবে সজ্জিত করেছে সেটিকে। তার রেস্টুরেন্টে খেলে উপরি পাওনা হিসাবে একবার খানিকটা রিকশায় ঘুরিয়ে আনা হয়। আমেরিকানরা এমনিতেই হুজুগপ্রিয় এবং যে কোন নতুন বিষয়ে তারা প্রবল অনুসন্ধিৎসু। রিকশা চড়ে যুগলদের সে কি ফুর্তি! সেই রেস্টুরেন্টে খেতে হল। লন্ডন থেকে রকিব তার মুলকি ভাই শুকুর মামুদদের, মানে তার সিলেটি বন্ধুদেরকে টেলিফোনে যোগাযোগ করেছিল আমার বিষয়ে।

প্রবাসী বাঙালিরা যে সম্বর্ধনার আয়োজন করল তাতে বেশ কয়েকজন আমেরিকানও উপস্থিত হল। বাংলায় বক্তৃতা করে সুখ পেলাম। কিন্তু ইংরেজি অনুবাদে ততধিক দুঃখ পেলাম। এদের তো English নয় Anguish.

বড় হোটেলে রয়েছি, তাছাড়া নিউইয়র্ক বৈচিত্র্যময় খাদ্যসম্ভারের জন্য প্রসিদ্ধ। তবুও আমার এক ছোট বোন সালমা অনেক দূর থেকে প্রতিদিন ফুড কেরিয়ারে করে নিজের হাতে রান্না করা দেশি-খাবার নিয়ে হোটেলের লাউঞ্জে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতে থাকে। সে আমার দূর সম্পর্কিত বোন। তখনও তার সন্তানাদি হয়নি। স্বামী কর্মক্ষেত্রে চলে গেলে এ্যাপার্টমেন্টের একাকিত্ব ভালো লাগে না, তাই হাজার বললেও আমি যে ক'দিন ছিলাম, সে খাবার নিয়ে আসবেই। বাইরে থেকে খেয়ে এলেও, তার মুখের দিকে তাকিয়ে আর একবার বসতে হত। মি. ব্রানন অবশ্য নতুনত্বের কারণে সে খাবার পছন্দ করত। আর উঃ, আঃ করে বলত, স্যার, আপনাদের কারি এত 'হট' কেন?

সালমা তাকে 'হট' হওয়ার কারণ বুঝাতে গিয়ে হিমশিম খেত।

নিউইয়র্কের বিখ্যাত রেডিও সিটি সেন্টারে মিউজিক্যাল শো উপভোগ করলাম। সিনেমা, নাটকও দেখলাম। নাটকের প্রবেশ মূল্য অস্বাভাবিক। মি. ব্রানন আমার হাতখরচ বাড়িয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করল। কারণ জিজ্ঞেস করতে বলল, তুমি সিনেমা-নাটক-শো পছন্দ কর—এসবের বাড়তি খরচ আছে না?

নিউইয়র্ক থেকে ফ্লোরিডা। সেখান থেকে মহাশূন্যযান ক্ষেপণের ক্ষেত্র হিউস্টন গেলাম। আমাদের সব বুঝান হল। বুঝলাম কচু। তবে অবাক বিস্ময়ে দেখলাম সব। নিয়ে যাওয়া হল অরলোভোতে নিউ অলিন্‌সের বিখ্যাত ফ্রেঞ্চ কোয়ার্টারে। টপ্‌লেস যুবতীদের মদিরা পরিবেশন ও নৃত্যকলা প্রত্যক্ষ করলাম। সেসময় টপলেসই ছিল শেষ কথা। এখনকার ঘটনা না বলাই শ্রেয়।

উত্তম জাস সঙ্গীত এবং হরে কৃষ্ণ হরে রাম নাম সংকীর্তনও শোনা গেল আমেরিকান কৃষ্ণ-প্রেমীদের কণ্ঠে। শিকাগো শহরে গিয়ে হে মার্কেট আর খুঁজে পাই না। যেখানে শ্রমিকদের উপর গুলি চলার কারণে বিশ্বের সমস্ত শ্রমিক-শ্রেণী সে ঘটনার স্মরণে আজও পহেলা মে'কে মে-দিবস হিসাবে

পালন করে। শিকাগোর লোকজনও এ খবর বিশেষ রাখে না। সেখানে তাদের কাউন্টি কাউন্সিলে ভাষণ দিলাম। বাংলাদেশ কি এবং কোথায় তা দিয়েই শুরু করতে হয়েছিল। পরবর্তী সফর, লুসিয়ানা অঙ্গরাজ্যে। সেখানে গভর্নর মি. এডওয়ার্ড আমাকে সাদর সম্বর্ধনা দিলেন। তার ম্যানসনে এক মধ্যাহ্নভোজ সভায় তিনি আমাকে শ্রদ্ধা প্রদর্শনের নিদর্শনস্বরূপ সেনাবাহিনীর কর্নেলরূপে সম্মানী নিয়োগপত্র প্রদান করলেন। চাল উৎপাদনের দেশ হচ্ছে লুসিয়ানা। আমিও এক চালের দেশেরই মানুষ। বললাম, তোমাদের রাজ্যের সঙ্গে আমাদের দেশের মিল রয়েছে প্রচুর। আবহাওয়া প্রায় এক, আমরাও চাল উৎপাদন করি। কাজেই আমেরিকার এ রাজ্যেই আমি স্বগৃহের আমেজ অধিকতর অনুভব করি। তোমরা এখানে আমাকে সেনাবাহিনীতে সম্মানজনক নিয়োগপত্র দিয়ে আরও আপন করে নিলে।

মি. এডওয়ার্ড বয়সে তরুণ হলেও অত্যন্ত যোগ্য গভর্নর। রাজ্যের সকলেই তাঁর প্রশংসা করে। কেবল একটি ব্যাপারে তিনি কারো সমর্থন তেমন পান না। তিনি প্রেসিডেন্ট নিক্সনের একজন একনিষ্ঠ সমর্থক। তাঁর ইমপিচমেন্ট প্রস্তাবনার তিনি ঘোর বিরোধী।

মি. নিক্সনকে যখন ওয়াটার গেট কেলেঙ্কারির দায়ে অভিযুক্ত করা হল, পত্রপত্রিকা, রেডিও, টেলিভিশন এবং জনগণ যখন এর পক্ষে-বিপক্ষে তুঙ্গে অবস্থান করছে তখন আমি ওদের ওখানে ছিলাম বিধায় অত্যন্ত নিকট থেকে সব প্রত্যক্ষ করতে পেলাম। টিভিতে দেখলাম, মি. নিক্সন সাংবাদিকদের উপর বিরক্ত হয়ে বললেন, তাঁর চল্লিশ বছরের রাজনৈতিক জীবনের ঘটনাকে অহেতুক রঙ-চঙ দিয়ে ভিন্নখাতে বইয়ে দেওয়ার দৃষ্টান্ত তিনি পূর্বে আর কখনও দেখেননি।

মৌচাকে ঢিল পড়ল। ক্যামেরা প্রেসিডেন্টের উপর থেকে সরে যেতেই শুরু হল তাদের আক্রমণ, প্রেসিডেন্ট তাদেরকে অপমান করেছে। এমনতর ঘটনা চলতে দেওয়া যায় না। ফ্রী প্রেস, ফ্রী টেলিভিশন কাকে বলে দেখলাম। শেষ পর্যন্ত সর্বগ্রাসী সাঁড়াশি আক্রমণে প্রেসিডেন্টকে সরে যেতে হয়েছিল। সম্পূর্ণ নাটকটি আমার চোখের সম্মুখে ঘটল।

লুসিয়ানা থেকে চললাম লসএঞ্জেলেস শহরে। বিরাট বিস্তৃত শহর। এখানেও বেশ বাঙালি আছে। একজন আমেরিকান মহিলা আমাদের চার্জ-দ্য-এফেয়ার্স। তিনি এবং উদ্যোক্তারা ছাড়াও বাংলাদেশের মানুষ আমাকে স্বাগত জানাল। অফিসিয়াল কাজকর্ম শেষে আমাকে নিয়ে যাওয়া হল বিখ্যাত ইউনিভার্সাল স্টুডিওতে। হলিউডের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্টুডিও। পৃথিবীর অনেক শ্রেষ্ঠতম ছবির নির্মাতা। অনেকক্ষণ ঘুরে স্টুডিও দেখানো হল দক্ষ গাইডের তত্ত্বাবধানে। কয়েকজন নামী-দামী শিল্পীর সঙ্গে পরিচয় হল। বাংলাদেশ থেকে এসেছি শুনে এরা আনন্দিত। সন্ধ্যায় হলিউডে বেড়াতে গেলাম।

জগতবিখ্যাত শিল্পীদের হাতের ছাপ, পায়ের ছাপ এবং তাদের নাম অঙ্কিত রয়েছে রাস্তার পাথরে। পর্যটকরা দেখছে আর পর্যাপ্ত ছবি তুলছে তাদের ক্যামেরায়। এখানে দেখলাম দু'তরফেই যৌন পার্টনার ভাড়া পাওয়া যায়। নাইট ক্লাব এবং কিছু কিছু রাস্তায় বিশেষভাবে সজ্জিত মেয়েদের দেখলেই বুঝা যায় এরা কি কর্মের সন্ধানে রয়েছে। এক জায়গায় দেখলাম কয়েকজন স্বাস্থ্যবান যুবক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে। তারাও এক প্রকার বিশেষ সজ্জায় সজ্জিত। তাদের টাইট প্যান্টের আবরণ ভেদ করে বিশেষ অঙ্গের আভাস পাওয়া যায়। এদেরকে নাকি জিগালো বলা হয়ে থাকে। একজনের সঙ্গে আলাপ করার প্রলোভন সংবরণ করতে পারলাম না। জিজ্ঞেস করলাম, তুমি এখানে দাঁড়িয়ে আছ কেন?

সে গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর করল, I want to earn some money.

কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল একটি গাড়ি চালিয়ে একজন মধ্যবয়স্কা মহিলা ওখানে নেমে ছেলেটির সঙ্গে আলাপচারিতা করতে লাগল। ওর গায়ের বিভিন্ন স্থানে, বিশেষ করে নিম্নাঙ্গে হাত বুলিয়ে খুশি হয়ে ওকে গাড়িতে উঠিয়ে নিয়ে চলে গেল। ছেলেটি আজ ভালোই কামাবে।

হলিউডের সর্বাধুনিক সিনেমা হলটির মালিক জনৈক চীনা বংশোদ্ভূত আমেরিকান। চৈনিক শিল্পকলার নিদর্শনের সঙ্গে মিশেছে মার্কিনীদের নব্য স্থাপত্যশৈলী। এক আশ্চর্য রূপ নিয়েছে হলটি। সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতির সন্নিবেশ এবং নতুন পদ্ধতির সাউন্ড সিস্টেমের জন্য একটি স্বপ্নপুরীতে বসে কিছু উপভোগ করছি বলে প্রতীয়মান হল। হলের আঙ্গিনায় সে দেশের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের নাম ও স্বাক্ষর মেঝের পাথরে খোদাই করা আছে। হলিউডের প্রতিটি পর্যটক এই হলটিকে অবশ্য দর্শনীয় মনে করে। আমরা ব্যতিক্রম হই কী রূপে!

লস এঞ্জেলেসের খুব দূরে নয় বিশ্বখ্যাত ডিজনি ল্যান্ড। আমেরিকা সফরের পরিকল্পনাতেই এই ডিজনি ল্যান্ড দেখার প্রোগ্রাম করা ছিল। বস্তুত সেখান থেকে ঘুরে আসার পর আমার মনে হয়েছে; ডিজনি ল্যান্ড না দেখলে আমেরিকা দেখাই এক হিসাবে অর্থহীন।

অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে সমস্ত দিনের জন্য মি. ব্রানন এবং আমি ডিজনি ল্যান্ডে উপস্থিত হলাম। আমরা ঠিক করেছিলাম, সর্বাগ্রে আমরা ভিতরে প্রবেশ করব এবং সকলের শেষে বেরিয়ে আসব। করেছিলামও তা-ই। কিন্তু সমস্ত দিনে আমাদের মাত্র গোটা দশেক আইটেম দেখার সৌভাগ্য হল। সর্বত্রই বিরাট লাইন, প্রায় ঘণ্টাখানেক লাইনে না দাঁড়ালে কেন্দ্রবিন্দুতে পৌঁছনো যায় না।

ডিজনি ল্যান্ডের পরিকল্পনা, তার প্রদর্শিত প্রোগ্রামসমূহ এবং সমস্ত আয়োজনটি দেখে স্তম্ভিত হয়ে যেতে হয়। যা চিন্তা করেছিলাম, সে চিন্তাকে

ছাড়িয়ে গেছে শতগুণ। মি. ওয়াল্ট ডিজনি আর দশ জন মানুষের মতোই একজন রক্ত-মাংসে গড়া মানব-সন্তান ছিলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী। তাঁর মস্তিষ্কে এ ধরনের অত্যাশ্চার্য এবং অকল্পনীয় ধ্যান-ধারণার উদ্ভব হল কী করে বুঝা কঠিন! বলে বুঝানো যাবে না। নিজে গিয়ে সশরীরে দেখতে হবে। মানুষের কল্পনাশক্তি এবং উদ্ভাবন ক্ষমতা যে কতদূর যেতে পারে, দেখতে হলে ডিজনি ল্যান্ড যাওয়া প্রয়োজন। বিজ্ঞান যে নব নব আবিষ্কারে আনন্দময় ও চিত্তাকর্ষক, ঝুঁকিপূর্ণ ও উৎসাহব্যঞ্জক, উপভোগ্য কিন্তু ভীতিময় এবং সর্বোপরি অপার্থিব কল্পনারাজ্যে বিচরণের কত ধরনের বিচিত্র অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা এবং প্রযোজনা করেছে তা ডিজনি ল্যান্ড ভ্রমণ না করলে বোধগম্য হবে না।

বাচ্চাদের জন্য একটা আনন্দমেলার অনুষ্ঠান দেখলাম। অভ্যন্তরে প্রবেশের পর মনে হচ্ছিল, দুনিয়াতে যত খুশি আছে—সব একত্রে টেবলেট বানিয়ে ওখানে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সমস্ত অন্তর কেবল অফুরন্ত আনন্দে নেচে ওঠে। মনে হয়, এই পৃথিবীতে কোন দুঃখ নেই, কোন অশান্তি নেই। নেই কোন হানাহানি—সর্বত্র কেবল শান্তি আর পরম আনন্দের এক দ্যুতিময় সৌরভ ছড়িয়ে রয়েছে।

'এ্যারাবিয়ান নাইটসে'র জলদস্যুরা যেন জীবন্ত। যে কোন মুহূর্তে ওরা আক্রমণ করবে। সত্যিকারের জলদস্যু নয় জেনেও তাদের চিৎকার, হাসি, বিচিত্র সব নিপীড়নমূলক কর্মকাণ্ড দর্শকদের এক চরম ভয়-ভীতির মধ্যেও নিক্ষেপ করে। যে কোন সময় ওরা ঝাঁপিয়ে পড়ল বলে।

'সুইস ফ্যামিলি রবিনসন' ছবিখ্যাত সেই বৃক্ষের সংসার দেখে মুগ্ধ হতে হয়। গোস্ট হাউস, ওয়াটার রাইড, সাবমেরিনে সমুদ্র যাত্রা, অনন্ত আকাশে মহাশূন্য যাত্রা প্রভৃতি দেখে জাহাজ ও রেলপথে সমগ্র ডিজনি ল্যান্ডটি পরিভ্রমণ করে দিন শেষে ক্লান্তি ও শ্রান্তির মাঝেও ছিল অপরিমেয় তৃপ্তি। মি. ব্রানন বলল, স্যার, আমরা সব দেখিনি, তাতে এক সপ্তাহ লেগে যাবে। তবে যেটুকু দেখেছি, মন্দ নয়।

সেদিনই ভেবে রেখেছিলাম, প্রথম সুযোগেই স্ত্রী-পুত্রকে এটা দেখাব। সুন্দর কোন জিনিস প্রিয়জনদের বাদ দিয়ে দেখে পূর্ণতা পাওয়া যায় না। রানা প্রায় দশ বছর আমেরিকায়, সে নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে ডিজনি ল্যান্ডে গিয়ে থাকবে। সালেহা ও দিনাকে ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যের ডিজনি ল্যান্ড দেখাতে না পারলেও ফ্রান্সের নব প্রতিষ্ঠিত ইউরো ডিজনি এবং আমেরিকার ফ্লোরিডা রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত বিশালতম ডিজনি ওয়ার্ল্ড ওদের দেখিয়ে এনেছি। ডিজনি ল্যান্ড, ইউরো ডিজনি আর ডিজনি ওয়ার্ল্ডের মধ্যে অনুষ্ঠান ভিত্তিক মূলত তেমন পার্থক্য না থাকলেও আকার ও প্রকারে কিছুটা ভিন্নতা লক্ষণীয়।

আমার কলেজজীবনের বন্ধু সাদউদ্দিন ইউসিএলএ, মানে ইউনিভার্সিটি

অব ক্যালিফোর্নিয়া, লস এঞ্জেলেসে পড়ায়। বিয়ে করেছে ওখানকারই এক আমেরিকান মহিলাকে। তাদের আন্তরিক সাহায্যও লস এঞ্জেলেসে আমার আনন্দকে বর্ধিত করেছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকমণ্ডলীর আগ্রহে একদিন ওখানেও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কথা বললাম।

আমি ওখান থেকে সানফ্রানসিসকো শহরে গেলে সাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু রিচার্ড আমাকে সার্বক্ষণিক সঙ্গ দেয়। এখানকার চায়না টাউন দেখার বস্তু। একটি শব্দ ইংরেজি বলতে পারে না এমন চীনাও রয়েছে যে আমেরিকায় বসে দিব্যি ব্যবসা-বাণিজ্য চালিয়ে যাচ্ছে। চায়না টাউনে প্রবেশ করলে মনে হবে না, এটা চীন দেশ নয়, এটা আমেরিকা। চীন দেশের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত একটি ঘ্রাণ সেখানে চৈনিক বাতাবরণ সৃষ্টি করে রেখেছে। ক্রয়-বিক্রয় হচ্ছে প্রাচ্য দেশীয় প্রথায় প্রচুর দর-দাম করে। অন্যত্র সবেরই নির্ধারিত মূল্য। চায়না টাউনের চাইনিজ খাবার দামে অপেক্ষাকৃত সস্তা হলেও স্বাদে আদি চৈনিক খাবারের গুণ-সম্পন্ন। রিচার্ড আমাকে চায়না টাউনে নৈশভোজে আপ্যায়ন করল এবং 'হিজ-হুজ' পদ্ধতিতে 'সানফ্রানসিসকো বাই নাইট' অবলোকন করাল।

লসএঞ্জেলেস এবং সানফ্রানসিসকো দুটি শহরই প্রশান্ত মহাসাগরের তীরবর্তী। একদিকে মহাসাগরের অনন্ত নীল জলধারা, অন্যদিকে সুউচ্চ পাহাড়-বেষ্টিত এই শহর দুটি শিক্ষানুরাগীদের জন্য উত্তম স্থান বলে বিবেচিত হয়। সানফ্রানসিসকোতে রয়েছে নৌ-যুদ্ধযানের অপূর্ব সমারোহ। একটি নৌবাহিনী মিউজিয়ামও দেখার সুযোগ হল। পরবর্তী জীবনে বহুবার লস এঞ্জেলেসে গিয়েছি কিন্তু কেন যেন সানফ্রানসিসকোতে আর যাওয়া হয়ে ওঠেনি। একবারের স্মৃতিই নতুন হয়ে অম্লান রয়েছে। আমেরিকার সর্বত্রই সড়কপথ খুব উন্নত। বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যদিয়ে প্রসারিত রাস্তাসমূহ কেবল একক পথই নয়, এক-একটি একক পথে পাঁচ ছ'টি লাইনে গাড়ি চলতে পারে। সকল রাজ্যের চাইতে ক্যালিফোর্নিয়া রাস্তা-ঘাটের জন্য অধিকতর খ্যাত। কোন কোন স্থানে তিন তলা, চার তলা রাস্তাও দৃষ্টিগোচর হয়েছে। যখন প্লেনে ভ্রমণ ক্লান্তিকর মনে হত মি. ব্রানন এভিস্ বা হার্টজ কোম্পানি থেকে গাড়ি ভাড়া করে নিত। চালক সে নিজেই। অনেক স্থানে সরকারি লিমুজিনও আনিয়ে নিত। কিন্তু অত বিশাল এবং বিলাসবহুল গাড়ি ব্যবহারে অস্বস্তি বোধ করতাম।

গ্রামের দিকে নিয়ে যাওয়া হল। মাঠের পর মাঠ ফসল ভর্তি। কোথাও গম বা ধানের খড়গুলোকে সুন্দর প্যাকেট করে মাঠে রেখে দেওয়া হয়েছে। পরে গোখাদ্য এবং অন্য কাজে ব্যবহৃত হবে। মি. ব্রানন বলল, স্যার, এক কৃষক পরিবারে রাত-যাপনের ব্যবস্থা করব?

আনন্দিত চিত্তে সম্মতি জানালাম। আমেরিকার গ্রাম আর শহরের মধ্যে

সুযোগ-সুবিধার দিক থেকে কোন তারতম্য নেই। গ্যাস, ইলেকট্রিসিটি, ফোন, টিভি সবই রয়েছে। গ্রামে যে দু'-চারটি বাসস্থান বা খামারবাড়ি রয়েছে সেসবের সঙ্গে পাকা রাস্তার যোগাযোগ রয়েছে।

মাঠ-ভর্তি ফসল এবং গোচারণভূমিতে স্বাস্থ্যবান গবাদি পশু অবাধে বিচরণ করছে। খামার বাড়িসমূহে কত না কৃষি যন্ত্রপাতি। কিন্তু কাজ করার মানুষ দেখতে পাচ্ছি না। এরা কখন কাজ করে, আমার কাছে এক ধাঁধা হয়ে রইল।

একটি বড় খামারের মালিক এক বয়স্ক দম্পতির বাসগৃহে অতিথি হলাম। বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধা কী যে খুশি হল, ভাষায় প্রকাশ করা যায় না! কেবল বলে, একদিনে কী হবে? কয়েকদিন বিশ্রাম কর।

বললাম, অনেকদিন দেশ থেকে এসেছি। আরও প্রোগ্রাম রয়েছে তোমাদের দেশে।

তারা বলল, এত বড় দেশ দেখার জন্য এক মাস খুবই সংক্ষিপ্ত সময়।

বললাম, দেশ আমাদের ছোট্ট হলেও, কর্তব্যের আহ্বান সেখানেও রয়েছে।

মি. এবং মিসেস জানালেন, তাদের দুই কন্যা ও এক পুত্র এবং পাঁচটি পৌত্র-পৌত্রী। পুত্র-কন্যা কালেভদ্রে আসত। ইদানীং নিজেদের সংসারে ব্যস্ত। আসা হয়ে ওঠে না। তবে সকলের ছবি প্রেরণ করে ক্রিসমাসে। প্রেজেন্টও প্রেরণ করতে ভুল করে না। আমাদের সন্তানরা পিতা-মাতাকে খুব ভালোবাসে। তারা গর্বিত পিতা-মাতা এবং সুখী দম্পতি। চল্লিশ বছরের দাম্পত্য জীবনে একসঙ্গে রয়েছে—আমেরিকার সমাজে সহজ কথা নয়। জিজ্ঞেস করলাম, তোমরা দু'জনেই বয়স্ক, চাষাবাস কে সামলায়?

বৃদ্ধ বলল, নিজেরাই সামলাই। আমি ট্রাক্টর চালাই। অন্যান্য যন্ত্রপাতি চালনা করি, বউ আমাকে সাহায্য করে। দু'জনের বেশি মানুষের প্রয়োজন নেই। আমাদের হল অত্যন্ত উচ্চ যান্ত্রিক চাষাবাদের দেশ।

বললাম, ফসল কী কর?

ওরা জানাল, বেচে দেই। ফসল ব্যবসায়ীরা ক্রয় করে নিয়ে যায় গুদাম থেকে। সরকারও নেয়। কোন কোন বছর ফসল অত্যধিক উৎপন্ন হলে অর্থ খরচ করে তা নষ্ট করে ফেলতে হয়।

ভাবি, ফসলও বেশি উৎপাদনের কারণে নষ্ট করে ফেলতে হয়। কথায় আছে, আল্লাহ্ যাকে দেন ছাপ্পর ফেড়ে দেন। এদেরও তা-ই। জিজ্ঞেস করলাম, যদি কিছু মনে না কর, বলবে তোমরা কত টাকার মালিক?

দু'জন হেসে উঠল। বলল, অনেকদিন ব্যাংকের হিসাব খতিয়ে দেখিনি। তবে অর্থ বোধহয় অনেকই জমেছে। খরচের তো তেমন কোন পন্থা নেই।

এত টাকা উপার্জন করে যাচ্ছ কার জন্য? এত পরিশ্রমই বা করছ কেন?

উত্তর দিল, পরিশ্রম না করলে তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাব। আর টাকা? সে কারো না কারো ভোগে লাগবেই। আমাদের তা দেখার বিষয় নয়। টাকা আসছে, জমছে, আমাদের করণীয় কিছু নেই।

রাতে আমাদেরকে টার্কি রোস্টযোগে ডিনার দিল। বৃদ্ধা রাঁধে ভালো। পরদিন সে একটি লাঞ্চ পার্টির আয়োজন করবে সেই অঞ্চলের সমস্ত মহিলাদের জন্য। সে মহিলা সমিতির একজন কর্ত্রী। কাজেই এতদূর থেকে অতিথি এসেছি, তাঁর সঙ্গে অন্য সভ্যরা মিলিত না হলে তাঁর সম্মান হানি হয়। সম্মত হতে হল।

একটি কম্যুনিটি হলে কয়েক শত মহিলার লাঞ্চের ব্যবস্থাদি করে এত স্বল্প সময়ে সবকিছু সুচারুরূপে কীভাবে সম্পন্ন হল, কিছুতেই বুঝতে পারি না। ব্রানন সাহেব বুঝিয়ে বলল, মাত্র একটি টেলিফোন করলেই যথেষ্ট। কতজন গেস্ট, কী মেনু বলে কেটারারকে নির্দেশ দিলেই হয়ে যায়। এত সময়ের প্রয়োজন কী? নিমন্ত্রণ? সে তো সমিতির অফিস থেকে সবাইকে টেলিফোনে করে দেওয়া হয়েছে।

বেশির ভাগই বয়স্কা মহিলা। একজনের সঙ্গে ব্রাননের পূর্ব থেকে পরিচয় ছিল। তার সঙ্গে কি জড়াজড়ি আর চুম্বনের পালা! বললাম, মি. ব্রানন, তোমার গিন্নীকে বলে দেব।

সে হেসে প্রতিউত্তর করল, আমার বউয়ের সঙ্গে তার বন্ধুর দেখা হলে সে কী শোক প্রকাশ করবে?

মেয়েদের জলসায় আমরা দু'জন সবে ধন নীল মণি পুরুষ অতিথি। বক্তৃতা করতে হল। বাংলাদেশকে চিনাতে এবং তার সমস্যা বুঝাতে হল। সকলেই শিক্ষিতা। তারা আমার সঙ্গে সমমর্মিতা প্রকাশ করল। লাঞ্চ শেষে একটি পাত্রে অর্থ সংগ্রহ করা হচ্ছিল কাজের মেয়েদেরকে টিপস দেওয়ার জন্য। সকলেই ধনী। একজনই তা দিয়ে দিতে পারে, কিন্তু তা হবার নয়—সকলকে অংশ নিতে হবে।

আমার হোস্টেজ দিলেন একটি আধুলি, আমি একটি ডলার দিলে, তিনি সেটি তুলে নিয়ে আমাকে ফেরত দিলেন এবং চুপিচুপি বললেন, গেস্ট অব অনারকে বখশিসের জন্য পয়সা দেওয়ার নিয়ম নেই।

বললাম, তুমি মিলিওনেয়ার মানুষ, একটি আধুলি দিলে কেন?

হেসে বলল, আমি গরিবের মেয়ে, আমার মেয়ে হলে দশ-বিশ ডলার ফেলে দিত।

গল্প শুনেছিলাম, এক মিলেওনেয়ার শহরে এসে বরাবর এক হোটেলে ওঠে এবং প্রতিবারই ম্যানেজারকে বলে আমাকে একটি ছোটখাটো কক্ষ দাও। প্রতিবারই এক কথা। ম্যানেজার তাঁকে একটি সাধারণ কক্ষই দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু মিলিওনেয়ারের ছেলে যখন সেই হোটেলে কার্যোপলক্ষে আসে

সে বলে, আমাকে সবচাইতে উত্তম রুমটি দাও। প্রতিবারই তার শ্রেষ্ঠ রুমের চাহিদা।

দীর্ঘদিনের যাতায়াতে ম্যানেজারের সঙ্গে মিলিওনেয়ারের সখ্যতা গড়ে উঠেছে। সে একদিন জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা, তুমি তো প্রতিবার কম পয়সার রুম নাও, আর তোমার ছেলে নেয় সবচাইতে দামী রুম। বিষয়টি কী?

মিলিওনেয়ার হেসে বললেন, তোমার মাথায় ঘিলু কম, তাই হোটেলের ম্যানেজারীর বাইরে তোমার কিছু জুটল না। আমার ছেলে একজন মিলিওনেয়ারের সন্তান, আমি তা নই।

আরও শুনেছি, আমেরিকার বিখ্যাত ধনকুবের রকফেলারের ছেলে ট্যাক্সি-ড্রাইভারকে ভাড়া ছাড়াও এক শত টাকা বখ্‌শিস দিল একদিন। ড্রাইভার মহা খুশি। সে তক্কে তক্কে থাকে একবার স্বয়ং রকফেলার সাহেবকে গাড়িতে ওঠাতে পারলে সে মালামাল হয়ে যাবে। সত্যিই একদিন রকফেলার সাহেব তার গাড়িতে উঠেলর এবং নামার সময় ভাড়া ও একটি ডলার বকশিস দিলেন। ড্রাইভার হতবাক। সে বলল, স্যার, আপনার ছেলে বকশিস দিয়েছে এক শত ডলার আর আপনি মাত্র এক ডলার?

তিনি হেসে উত্তর করলেন, সে যে রকফেলারের ছেলে।

আমার গৃহকর্ত্রীর মনোভাবও অনেকটা তা-ই। লাঞ্চ সেরেই আমরা বেরিয়ে পড়লাম। কৃষক দম্পতির সঙ্গে যে সময়টা কাটল, সেটি ছিল অনুপম আন্তরিকতাপূর্ণ কয়েকটি মুহূর্ত।

সানফ্রানসিসকো থেকে কোস্ট টু কোস্ট নিউইয়র্ক এসে পৌঁছনো গেল। আমাদের প্রোগ্রামের মধ্যে ছিল কালো আমেরিকানদের সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করা। আমেরিকার ইতিহাস 'আঙ্কল টমস কেবিন'-এর মতো বহু ঘটনাবহুল উপখ্যানে সমৃদ্ধ। খোদ ওয়াশিংটনে নিগ্রোরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। অফিস চলাকালীন শহরতলী থেকে আগত জনগোষ্ঠীর কারণে সে সময় সাদাদের সংখ্যা অধিকতর মনে হলেও, বিকেল থেকেই তা হ্রাস পেতে থাকে। কালোর সংখ্যা তখন অধিক থাকে।

নিউইয়র্কের একটি এলাকা হারলেম বলে পরিচিত এবং মানুষ দিনের বেলায়ও সেখানে সহজে যেতে চায় না। সেখানে কালোদের প্রতিপত্তি এত বেশি যে, তাদের ইচ্ছার মর্যাদা না দিয়ে সেখানে উপায় নেই। কেউ

পারতপক্ষে হারলেম এলাকায় যাবে না—সন্ধ্যার পরে তো নয়ই। সুসভ্য আমেরিকান চরিত্রের কালো দিকটি এই কালো মানুষগুলোর কারণেই সমধিক ব্যাপকতা পেয়েছে। এরা লেখাপড়া শিখে শিক্ষিত হয়ে অফিস-আদালতের কাজ তেমন একটা করে না। অধিকাংশই শারীরিক পরিশ্রমমুখী নিম্ন পেশার কাজ করে থাকে। পোর্টার, ওয়েটার, প্রহরী, শহর পরিচ্ছন্নতায় নিয়োজিত বিভিন্ন পেশায় কালোদের অধিকতর বিস্তৃতি। অন্যান্য উন্নত পেশায় যে তারা একেবারেই নেই তা নয়। তবে সংখ্যার স্বল্পতা দৃষ্টিগোচর হয়।

অনেক নিগ্রো কাজ করতে চায় না। সরকারের দেওয়া স্যোশাল সিকিউরিটির অর্থেই চলতে চায়। এদের সম্বন্ধে বলা হয়, পায়ের চাইতে লম্বা জুতো, কয়েক বোতল বিয়ার আর একজন শয্যা সঙ্গিনী থাকলেই তারা সন্তুষ্ট। স্মাগলিং, ছিনতাই, পকেটমারা এসব ঘটনায় অনেকে রপ্ত। নিউইয়র্কে সাবধান করে দেওয়া হয়। অধিক অর্থ নিয়ে চলাফেরা নিষিদ্ধ, তবে একেবারে শূন্য পকেটেও চলা যাবে না। ওরা যদি পিস্তল বা চাকু বের করে, তখন অন্তত দশ বিশ ডলার দিয়ে বিদায় করার সঙ্গতি থাকতে হবে। অন্যথায় পিস্তল বা চাকুর সদ্ব্যবহার হতে পারে।

রাস্তায় বিশালদেহী কালো নিগ্রোকে যখন দ্রব্যগুণে ঈষৎ হেলে-দুলে দুলকি চালে এগুতে দেখি; আমার ভয়ই হয়। পাশ কেটে চলে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ মনে করি। এদের সম্বন্ধে এত শুনেছি এবং দেখেছি যে আরও জানার কৌতূহল সংবরণ করা দায়। রাস্তায় ডাস্টবিন ঘেঁটে খাবার তুলে খাওয়া, শূন্য বিয়ারের বোতলে রসের সন্ধান করা বা হাতে ছেঁড়া-টুপি নিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভিক্ষা করাও দেখেছি।

আমেরিকায় সুযোগের অভাব নেই। ডলার চারদিকে ছড়িয়ে। একটু পরিশ্রম করলেই আয়াসে জীবন যাপন করা যায়। সেখানে যাদের ডাস্টবিন ঘাঁটতে হয় বা ভিক্ষা করতে রাস্তায় নামতে হয়, তারা প্রকৃতই হতভাগ্য। এদের ভালো করার সাধ্য কারো হবে না।

মি. ব্রানন আমার হারলেম অভিযানের পক্ষে নয়। তবুও আমার ঐকান্তিকতায় সেখানে একটি মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন করল এক নিগ্রো পরিবারে। হারলেম এলাকা ঘুরে এসে কালো পরিবারটির বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করলাম। স্বভাবতই এরা কালোদের মধ্যে অভিজাত। এদের বাড়িঘর আর লোকজন সাদা আমেরিকানদেরই মতো। সুসজ্জিত ড্রয়িংরুমে বসে লাঞ্চ-পূর্ব পানীয় সেবন করা গেল। প্রতিটি সদস্য অত্যন্ত ভদ্র। গায়ের রঙ নিকষ কালো হলেও, দাঁত তাদের ঝকঝকে সাদা। পোশাক পরিচ্ছন্ন এবং স্বাস্থ্যও সকলের প্রশংসনীয়। মনে হল, বাইরের রঙটি ব্যতীত আর দশ জন সাদা আমেরিকানের সঙ্গে এদের কোন পার্থক্য নেই।

খাবারের প্রচুর আয়োজন। গ্রীন সালাদ খেলাম। ভাজা মুরগি বেশ বড় করে সাইজ করা। আমার পক্ষে এক টুকরোই যথেষ্ট। গৃহস্বামী বারবার অনুরোধ করতে লাগলেন, আর এক পিস নাও।

নিতে হল এবং ভদ্রতা রক্ষায় খেতেও হল। অনেক কথা হল। নিগ্রোদের সম্বন্ধে যা শোনা ছিল বলতেই এরা বলল, প্রায় সবটাই সঠিক। তবে দ্রুত অবস্থার উন্নতি হচ্ছে। অনেক নিগ্রোই এখন স্যোশাল হয়ে জীবন ধারণ করতে ঘৃণা করে।

আমরাও প্রায় কালো। তাই এই কালো মানুষদের জন্য আমাদের মমতার অভাব নেই। সব জড়তা আর অক্ষমতা কাটিয়ে ওরা স্বমহিমায় ভাস্বর হয়ে উঠুক এটাই কাম্য।

নিউইয়র্ক থেকে প্লেনে মাত্র আধ ঘণ্টার পথ ওয়াশিংটন। সড়কপথে গেলে জায়গা দেখা যায়, অনেক অভিজ্ঞতাও সঞ্চয় হয়। কিন্তু ঈদুল ফিত্‌র আসন্ন। হোসেন আলী সাহেব বারবার বলে দিয়েছেন ঈদ ওয়াশিংটনে পালন করতে হবে। তাই প্লেনেই যাওয়া স্থির করলাম। ওয়াশিংটনে নেমে হোসেন আলী সাহেব, জাহানারা এবং মিশনের অন্যান্য কর্মকর্তাদের জাতীয় বিমানবন্দরে পেলাম। মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী বলে একজন কর্মকর্তাকে পেলাম। নামে নামে কেবল যমেই টানে তা নয়—সখ্যতাও জমে। সেই সুবাদে তার বাসস্থানেও যেতে হয়েছিল।

কেনেডি কালচারাল সেন্টারে নিয়ে গেল রাষ্ট্রদূত সাহেব। সারা পৃথিবীর প্রতিটি দেশের পতাকার সঙ্গে বাংলাদেশের পতাকা উড্ডীন দেখে ভালো লাগল।

ঝামেলা বাঁধল ওয়াশিংটন ইসলামিক সেন্টারে ঈদের নামাজ আদায়ের পূর্বক্ষণে। প্রতিটি মুসলিম দেশের পতাকা শোভা পেলেও বাংলাদেশের পতাকা সেখানে নেই। হোসেন আলী সাহেব বিব্রত হয়ে পড়লেন। আমি বললাম, যে করেই হোক, পতাকা থাকা চাই। নামাজের তখনও আধ ঘণ্টা বিলম্ব আছে। সেন্টারের কর্মকর্তাদের চৈতন্য উদয় হল। তারা দূতাবাসকে দোষারূপ করে, দূতাবাস বলে তাদেরকে পতাকার কথা জানানো হয়নি। ততক্ষণে একজন দূতাবাসে চলে গিয়েছে পতাকা নিয়ে আসার জন্য। সেন্টারের কর্মকর্তারা আরও পনেরো মিনিট সময় বাড়িয়ে দিলেন নামাজ অনুষ্ঠানের জন্য। ঘোষণা দিলেন টেকনিক্যাল কারণ। পতাকা এল, যথাস্থানে স্বমহিমায় সেটি স্থাপিত হল। আমরা হৃষ্টচিত্তে নামাজ আদায় করলাম।

নামাজ মনে শান্তি এনে দেয়। সেদিন সে শান্তি বহুগুণ বেড়ে গিয়েছিল সব দেশের পতাকার সঙ্গে বাংলাদেশের পতাকাকে ওয়াশিংটনের ইসলামিক সেন্টারে প্রথমবারের মতো উড়তে দেখে।

রাষ্ট্রদূত হোসেন আলী সাহেবের বাসস্থান বাংলাদেশীদের জন্য ঈদের সারাদিন 'ওপেন হাউস' করা হল। সারাদিন ধরে পার্টি চলল। দেশের মাটিতে সর্বদা ঈদ পালন করেছি। এবার আমেরিকার রাজধানীতে ভিন্ন আমেজে দিনটি পালন করা গেল। ফোনে ঢাকায় ঈদ মোবারক করলাম। রানা চিৎকার করে বলছে, আব্বা, তুমি আসছ না কেন? কবে আসবে?

বুঝলাম এবার ফেরত যাত্রার আয়োজন করতে হয়। আমি অবশ্য ভ্রমণসূচি এভাবে করেছি যাতে হাওয়াইতে আমেরিকাকে বিদায় জানিয়ে জাপান হয়ে প্রশান্ত মহাসাগরের পথে পৃথিবীটাকে একটি পূর্ণ আবর্ত দিয়ে দেশে ফেরা যায়।

মি. ব্রাননের কাজ শেষ। আমেরিকান মেইন ল্যান্ড পর্যন্ত সে আমার সঙ্গী। এখন তাঁকে বিদায় দিতে হবে। হাওয়াইতে অন্য একজন কর্মকর্তা আমার দায়িত্ব নেবেন। কিন্তু ব্রাননের জন্য আমার মন কেমন করতে লাগল। তারও একই অবস্থা এই দীর্ঘ ভ্রমণে সে আমার অন্তরঙ্গ সুহৃদে পরিণত হয়েছে।

ব্রাননের ইচ্ছা হাওয়াই আসার। কিন্তু অনেকটা দূরত্ব বলে এখান থেকে কাউকে না পাঠিয়ে ওখানকার লোক দিয়েই কাজ চালানো হয়। ব্রানন একসময় হনুলুলুতে ছিল যুদ্ধকালীন সময়ে। তাই তার পূর্ব-কর্মস্থল আর পূর্ব-পরিচিতদের সঙ্গে নতুন করে সম্পর্ক ঝালাই করতে চায় সরকারের খরচায়। কাঁচুমাচু করে আমাকে বলল, স্যার, আপনার একটি কথায় আমার হাওয়াই যাওয়া সম্ভব হতে পারে!

কীভাবে?

আপনি যদি অনুগ্রহ করে জিএআই অফিসের বড় কর্তাকে একবার বলেন যে, ব্রানন আমার সঙ্গে হাওয়াই গেলে আমি ভালো বোধ করব, তা হলেই কাজ হবে। ওরা আপনাকে খুশি করতে চায়। আপনি হচ্ছেন বাংলাদেশের প্রথম উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তা যে আমেরিকায় এসেছেন।

বললাম, নিয়ে চল তোমার বড় সাহেবের নিকট।

বড় সাহেবকে সবটুকু বলতেও হল না। তিনি বললেন, It's easy to be nice to a nice man. তোমার বিদায়লগ্নের অনুরোধ আনন্দের সঙ্গে রক্ষা করা হবে। মি. ব্রানন তোমার সঙ্গে যাবে, যে ক'দিন তুমি ওখানে থাক, সে তোমার সঙ্গে থাকবে। তারপর দেশের পথে তোমাকে প্লেনে তুলে দিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আসবে।

ব্রানন মহাখুশি। আনন্দের আতিশয্যে সে আর্মি স্টোর থেকে তাদের জন্য নির্ধারিত মূল্যে আমার জন্য একটা বড় স্যামসনাইট স্যুটকেস কিনে নিয়ে এল। দাম নিতে চায় না। যখন বললাম তা হলে ওটা নেব না, তখন দাম নিল।

সেই ব্যাগ এখনও তাঁর স্মৃতি হয়ে আমার ঘরে রক্ষিত আছে। স্টেট ডিপার্টমেন্টের সকল কর্মকর্তা, হোসেন আলী সাহেব ও তাঁর পরিবার, জাহানারা ও তাঁর পরিবার এবং সকল নবলব্ধ বন্ধুদের নিকট থেকে বিদায় নিলাম। মি. রবার্ট আমার বিদায় উপলক্ষে ককটেল পার্টি থ্রো করলেন। নিম্বুরস পান করে সকলের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করলাম। ওরা বন ভয়েজ করল। ডালাস এয়ারপোর্ট থেকে কম্বিনেশন সেটে স্টেট ডিপার্টমেন্টের সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তাকে আর একবার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে জাম্বো জেটে চেপে বসলাম।

জাম্বো জেট প্রশান্ত মহাসাগরের অভ্যন্তরে অবস্থিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম অঙ্গরাজ্য হাওয়াই দ্বীপে আমাদেরকে পৌঁছে দিল। অপূর্ব নৈসর্গিক শোভায় ভরপুর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি হাওয়াই দ্বীপটি প্রশান্ত মহাসাগরের প্রায় মধ্যভাগে জেগে উঠেছে। চারদিকে সমুদ্রবেষ্টিত পাহাড় ও সবুজে ঘেরা দ্বীপের সৌন্দর্য অপরূপ। সারা পৃথিবী থেকে পর্যটকরা হাওয়াই দ্বীপের রাজধানী হনুলুলুতে এসে উপস্থিত হয়। এত বিস্তৃত সী-বিচ অন্য কোথাও নেই বলে শোনা যায়। দিনভর সমুদ্র স্নান, সৈকতে আনন্দ আর বিশ্রামের শতেক আয়োজন নানাবিধ উপকরণে সুসজ্জিত, পরিপূর্ণ নিরাপদ সেই সৈকতসমূহ। স্বল্পবস্ত্র পরিহিতা নর-নারীরা এক অপার্থিব রাজ্যে নব নব আনন্দধারায় দিগ্বিদিক বিচরণ করছে। সাহসী সাঁতারুরা সমুদ্রের ঢেউকে পাল্লা দিয়ে দুঃসাহসী রাইড নিচ্ছে। ঢেউ এসে প্রবল আঘাতে ওদেরকে পর্যুদস্ত করে দিলে পুনরায় প্রবলতর উৎসাহে ওরা স্রোতের মাথায় এসে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। নৌ-মোটর বাইকে যুবক-যুবতীরা যুগলে সমুদ্র বিহার করছে। সপরিবারে বা বান্ধবীসহ অনেকে নৌকায় পাল খাটিয়ে সমুদ্রের গভীরে চলে যাচ্ছে। চারদিকে অনন্ত আনন্দমেলা। হাসি, গান আর উল্লাসে উপহার কেনা-বেচার শত সম্ভার ছড়িয়ে আছে চতুর্দিকে। হনুলুলু এক আনন্দজগতের প্রেম-নিকেতন, নর-নারীর মনোরঞ্জনের বিচিত্র সমস্ত আয়োজনে ভরপুর।

প্লেন থেকে অবতরণ করতেই ফুলের সাজে সজ্জিতা এক সুবেশী স্থানীয় পলিনেশিয়ান যুবতী গলায় একটি ফুলের মালা পরিয়ে মধুর হেসে 'বাও' করল। হাওয়াই দ্বীপে আগমন আনন্দদায়ক হোক—এই কামনা জানাল। সে এবং আরও কয়েকজন কর্মকর্তা আমাদের দু'জনকে ভিআইপি লাউঞ্জে নিয়ে বসাল। সেখানে একই প্রকার ফুলের সাজে-সজ্জিতা আর এক অপরূপা সুন্দরী সুগন্ধি পেয়ারার সুশীতল সরবত পান করতে দিল। এদের ব্যবহার এত মধুর এবং কণ্ঠস্বর এত সঙ্গীতময় যে, তা হৃদয়কে অভূতপূর্ব সুখানুভূতিতে ভরিয়ে দেয়।

লিমুজিন এসে আমাদেরকে নিয়ে উঠালো সমুদ্রতীরের অতি সন্নিকটে অবস্থিত হাওয়াইয়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ একটি বিলাসবহুল পাঁচতারা হোটেলে। স্যুটে ঢুকেই দেখতে পেলাম তিনটি বিরাট বিরাট উপঢৌকন। হোটেল ম্যানেজার স্বাগত জানাচ্ছে মাননীয় অতিথিকে এই উপহার সামগ্রীর মাধ্যমে। এই হোটেলে আমার অবস্থান আনন্দদায়ক হোক এই কামনা করেছে নিজ হস্তে সই করা কার্ডে। একটা বিশালাকৃতির ফুলের বুকে, এক ঝুড়ি টাটকা ফল আর এক বাক্স বিভিন্ন আকৃতির প্রকৃতির পানীয়ের বোতল। ফুল আর ফল রেখে, মদ পাঠিয়ে দিলাম মি. ব্রাননকে। তার আনন্দ-উদ্ভাসিত মুখমণ্ডল হাসিতে আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

অনেক ধন্যবাদ স্যার। অনেক ধন্যবাদ। আপনার এই বদান্যতার জন্য অনেক ধন্যবাদ।

বললাম, বদান্যতা আমার নয় মি. ব্রানন, হোটেল ম্যানেজার আমাকে উপহার পাঠিয়েছে। সেটি নিখরচায় তোমাকে উপঢৌকন করতে পেরে আমি আনন্দিত এবং হাল্কা হলাম।

ব্রাননের খুবই সুবিধা। আমি সুরাসক্ত নই বলে যা আসে তার বরাতেই যায়। সে মহানন্দে মনোযোগের সঙ্গে সুরার বোতল খুলে বসল।

কলকাতার মান্নাফ ভাবীর এক বোন জলি হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করে। তাকে পূর্বে দেখেছি বলে মনে করতে পারলাম না। হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-শিক্ষকদের এক সমাবেশে আমার যোগ দিতে হয়েছিল বাংলাদেশের উপর বক্তব্য রাখার জন্য। সভা শেষ হতেই একটি যুবতী, ভারতীয় হলেও মার্কিনী পোশাক পরিহিতা, আমাকে এসে বলল, আমাকে চিনতে পেরেছেন? আমি আপনার কলকাতার ভাবীর ছোট বোন।

চিনতে অসুবিধা হলেও বললাম, ভাবীর বোন মানে তো বেয়ান। এই পাণ্ডববর্জিত দেশে একটি সুন্দরী বেয়ান জুটলে তাকে চিনব না!

ও হাসিমুখে সব খবরাখবর নিল এবং দিল। প্রস্তাব করল, আমি আপনাকে হোটেলে পৌঁছে দেব।

আনন্দের সঙ্গে রাজি হলাম। বিদেশ-বিভূঁইয়ে সুন্দরী বেয়ান আমার হোটেলে আসতে চায়, এ তো খুবই সুলক্ষণ!

কিন্তু হা হতোহস্মি! তার গাড়িতে উঠতে গিয়ে দেখি চালক একটি স্কটিশ যুবক। সে বিশ্ববিদ্যালয়েরই ছাত্র। আমার বেয়ানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সুসম্পর্ক রয়েছে বলে মনে হল। পরিচয় করিয়ে দিল, টমাস স্কটল্যান্ডের অধিবাসী, এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক বিভাগের কৃতি ছাত্র। আমার বন্ধু।

উত্তরে বললাম, আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে যারপরনাই অখুশি হলাম।

সে তো অবাক! তার মানে!

বুঝিয়ে বললাম, আপনার বান্ধবীটি আমার সম্পর্কে বেয়ান। সিস্টার-ইন-লর বোন, সিস্টার-ইন-ল-ই বলতে পারেন। নিরিবিলিতে হোটেলে নিয়ে গিয়ে একটু মধুগুঞ্জন করব তার উপায় রইল না। আপনি কোথা থেকে উদয় হয়ে এই হতভাগ্যের হৃদয়-বাসনা ছিন্নভিন্ন করে দিলেন। শ্রীমতি জলির হৃদয়ে ঠাঁই নাই, ছোট সে তরী। আপনার ভারেই তা ভরে আছে!

দু'জন একসঙ্গে অনাবিল আনন্দে হেসে উঠল। টমাস তার বান্ধবীকে মন্তব্য করল, তোমার ব্রাদার-ইন-ল বেশ রসিক আছেন!

পাশে বসা জলি তাকে মনে করিয়ে দিল, সামনে পুলিশ মামুরা রয়েছে, সাবধানে গাড়ি চালাও। কথা বললে তোমার মনোযোগ বিনষ্ট হবে।

টমাস বলল, জো হুকুম, ম্যাডাম!

আমি আর ব্রানন গোমড়া মুখে চুপ করে থাকাই বাঞ্ছনীয় মনে করলাম। অনেক পরে শুনেছি, ওরা বিয়ে করেছে।

আমেরিকার অঙ্গরাজ্য হলেও এখানকার সংস্কৃতি ভিন্নতর। এদের নিজস্ব ভাষাও বেশ সমৃদ্ধ। নাচ-গানে সাংস্কৃতিক অঙ্গন সর্বদাই মুখরিত। এক ধরনের নাচ রয়েছে—ফুলের পোশাক পরিহিতা যুবতীরা বিভিন্ন হোটেল ও বারে বাদ্যের তালে তালে নৃত্য পরিবেশন করে। হুলা হুলা নাচ বলে থাকে অনেকে। বাদক দলও ফুলের পোশাকেই সজ্জিত। মেয়েরা কিছুটা শ্যামলা। তবে স্বাস্থ্য এক-এক জনের ফেটে পড়ছে। ব্রানন বলল, এসব মেয়েদের কিছু ডলারের বিনিময়ে অনায়াসে আনন্দ-সঙ্গিনী হিসাবে পাওয়া যায়।

সরকারের এক বড় কর্তা মি. হেওয়ার্ড সমুদ্রতীরের একটি ভাসমান রেস্তোরাঁতে মধ্যাহ্নভোজ দিলেন। আমাদেরকে হোটেল থেকে তিনি নিজে গাড়িতে উঠিয়ে নিয়ে এলেন। তাঁর স্ত্রী অন্য এক অফিসে কাজ করেন, তিনিও লাঞ্চে এসে যোগ দেবেন। আমরা পানীয় নিয়ে মিসেস হেওয়ার্ডের জন্য অপেক্ষা করছি। হেওয়ার্ড সাহেব বয়স্ক লোক। কোন বয়স্কা মহিলা রেস্তোরাঁতে প্রবেশ করলেই আমি তটস্থ হয়ে উঠি, এই বুঝি মিসেস এসে গেলেন। বেশ কিছুক্ষণ পরে এক অপরূপা সুন্দরী যুবতী ঘরে ঢুকে মি হেওয়ার্ডকে 'ডার্লিং, হানি' ডেকে জড়িয়ে ধরে প্রগাঢ় চুম্বন করলেন। তার বয়স বিশের কোঠায়। কত নম্বর পক্ষ জিজ্ঞাসে ভদ্রতায় বাধে। মি. হেওয়ার্ড পরিচয় করিয়ে দিলেন, আমার মিসেস।

বলে কী! এই বুড়োর ভাগ্যে এমন সুপক্ক ফলটি! কাকের মুখে কমলা! কী আর করা! অবাক বিস্ময়ে মিসেস হেওয়ার্ডের সঙ্গে করমর্দন করলাম। অফিসে বিলম্ব হয়েছে বলে অনেক দুঃখ প্রকাশ করলেন। ঘুষ হিসাবে স্বামীকে আর একটি দীর্ঘস্থায়ী চুম্বন দিয়ে বললেন, তুমি রাগ করনি তো লক্ষ্মীটি?

আদিখ্যেতা আর কাকে বলে!

লাঞ্চ কী খাব, মিসেস হেওয়ার্ডের অপূর্ব রূপসুধা পান করেই সেদিন ক্ষুণ্ণিবৃত্তি করলাম!

লাঞ্চের পর প্রোগ্রাম ছিল সকলে মিলে আমরা প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের মার্কিন নৌ-ঘাঁটি পরিদর্শনে যাব। হেওয়ার্ড দম্পতি, ব্রানন এবং আমি এক গাড়িতে চলেছি। কিছুটা সময় হাতে ছিল। স্থানীয় গভর্নরের এককালীন বাসভবন গভর্নরের কেভ একটি দর্শনীয় স্থান। যুদ্ধের সময় শত্রুর আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য চারদিকে পরিখা খনন ও দেওয়াল তোলা হয়েছে। সেটি পরিদর্শন করে আমরা নৌ-বাহিনীর সদর দফতরে উপনীত হলাম।

নানারকম ব্যাজ বুকে শোভিত একজন নৌ-বাহিনীর অফিসার এগিয়ে এলেন, আমি মনে করলাম, অ্যাডমিরাল সাহেব! না, ইনি আমাদেরকে রিসেপশনে বসাতে নিয়ে যেতে এসেছেন। বসার পরই পানীয় এল। পরক্ষণেই কক্ষে ঢুকলেন এক লম্বা চওড়া অধিকতর স্মার্ট এবং সুসজ্জিত অফিসার। আমি ভাবলাম, এবার অ্যাডমিরাল সাহেবই এলেন! না, ইনি এসেছেন আমাদেরকে অ্যাডমিরাল সাহেবের অফিসে নিয়ে যেতে। সেখানে প্রবেশ করতেই যিনি স্যালুট করলেন সৌজন্যবোধে; তিনি অবশ্যই অ্যাডমিরাল হবেন। কেননা, তিনি এদের চাইতেও কেতাদুরস্ত। না, তিনিও নন। তিনি অ্যাডমিরাল সাহেবের এডিসি।

বারবার বিভ্রান্ত হয়ে ভাবলাম, আর ব্যস্ত হব না, দেখি অ্যাডমিরাল মানুষটি কে এবং কেমন?

অল্পক্ষণের মধ্যেই আমাদেরকে একটি পার্শ্ববর্তী বিশাল কক্ষে নিয়ে যাওয়া হল। দরজা খুলতেই লম্বা, অত্যন্ত সুগঠিত দেহের অধিকারী এবং পা থেকে মাথা পর্যন্ত সাদা পোশাক এবং নৌ-বাহিনীর টুপী পরিহিত হাসিমুখের মানুষটিই যে সেখানকার সর্বময় কর্তা মহাশক্তিধর অ্যাডমিরাল সাহেব। তা আর বুঝতে অসুবিধা হল না। করমর্দন করে আমাদেরকে ঘরের এক পাশে সজ্জিত সোফায় নিয়ে বসালেন। সঙ্গে সঙ্গে রূপার কাপ-ডিসে কফি এবং রোস্টেড স্যান্ডউইচ চলে এল। মিসেস হেওয়ার্ড এক খণ্ড স্যান্ডউইচ প্লেটে তুলে দিলে সুন্দরীর পরিবেশিত খাদ্যদ্রব্যটি গ্রহণ করতে দ্বিধা করলাম না। এমন যে অ্যাডমিরাল, তাঁকেও দেখলাম কিঞ্চিৎ বিচলিত। বারংবার মিসেসের রূপসুধা পান করছেন।

মিসেস হেওয়ার্ডের কারণে আমাদের সেদিনের নৌ-ভ্রমণ অধিকতর আকর্ষণীয় হয়ে উঠল। অ্যাডমিরাল সাহেব একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে তার নৌ-বাহিনীর নাবিক সংখ্যা, জাহাজ সংখ্যা, কত সাবমেরিন, কত ওয়ারশীপ, গানশীপ এবং অন্যান্য সরঞ্জামাদির শক্তি ও সংখ্যা আমাদের জ্ঞাত করালেন।

প্রাথমিক প্রতিবেদন সমাপ্ত হতেই একজন সহকারী অ্যাডমিরাল সাহেবকে জানালেন, স্যার, আপনার নৌযান যাত্রার জন্য প্রস্তুত।

অ্যাডমিরাল সাহেব দুঃখ প্রকাশ করলেন তিনি নিজে যেতে পারছেন না। কেননা, জরুরি কর্তব্য তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে। আমাদেরকে তার নিজস্ব জলযান এবং তাঁর সহকারীদের সাথে দিচ্ছেন। তারা আমাদেরকে সব কিছু দেখাবেন।

অ্যাডমিরাল সঙ্গে না থাকলে কি হবে! তাঁর জাহাজে চড়ে যাচ্ছি, চারদিকে সাজ-সাজ রব উত্থিত হল। রণতরীগুলোর সম্মুখ দিয়ে যাওয়ার সময়, সমস্ত নাবিক এবং ক্রুরা স্যালুট করে এটেনশানে থাকে। জাহাজ থেকে সম্মানসূচক সাইরেন বেজে ওঠে। একটি রণতরীর খুব নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় বুঝলাম এক-একটা যুদ্ধ জাহাজ এক-একটা গ্রাম সমতুল্য। সেসব জাহাজে নেই এমন কোন জিনিসের নাম করা সম্ভব নয়। প্রতিটি জাহাজই স্বয়ং-সম্পূর্ণ। সমস্ত পার্ল হারবারটি আমাদেরকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখান হল।

পার্ল হারবারে যেখানে অতিকায় ব্রিটিশ রণতরী প্রিন্স অব ওয়েলসকে জাপানি বোমারু বিমানের আত্মঘাতী বৈমানিক চিমনির ভিতরে বিমান নিয়ে ঢুকে পড়ে তাকে ধ্বংস করেছিল—সেখানে প্রিন্স অব ওয়েলসের ডুবন্ত ভগ্নাবশেষও দেখলাম। কিছুটা স্থান ওরা পর্যটকদের দেখার জন্য ব্যবস্থা করে রেখেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সবচাইতে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে পার্ল হারাবারে জাপানিদের সফল বোমাবাজি এবং অজেয় প্রিন্স অব ওয়েলসের অবিশ্বাস্য বিনাশ। যার প্রতিশোধে মিত্রবাহিনী জাপানের হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে এটম বোম নিক্ষেপ করে মানব ইতিহাসের আর এক ন্যক্কারজনক অধ্যায় রচনা করেছিল।

পার্ল হারবার ভ্রমণ শেষ করতেই সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। প্রশান্ত মহাসাগরের নীল জলরাশিতে ভেসে চলেছি আমরা নৌ-বাহিনীর অ্যাডমিরালের বিলাসবহুল শুভ্র নৌযানে। উষ্ণ কফি, পাশে বসা অনিন্দ্য সুন্দরী লাস্যময়ী যুবতী। মনে হচ্ছিল, কিছুক্ষণের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে এই মধুর সন্ধ্যাটি। সাগরের মৃদুমন্দ হিল্লোলে লঞ্চটিতে কিছুটা কম্পন অনুভূত হচ্ছিল। নৌযানের অতিথিদের হৃদয়ও সেই সঙ্গে নেচে উঠছিল। সেকি কেবল নতুন অভিজ্ঞতা, না নয়ন-মন জয়-করা অভিনব পরিবেশের কারণে, না মনোহারিণী সহযাত্রিনীর সুখকর সান্নিধ্যের কারণে বলা কঠিন!

একদিন হাওয়াই রাজ্যের ভ্রমণও সমাপ্ত হল। দেশে ফিরতে হয়। কিন্তু ঐশ্বর্য আর বিলাসবহুল জীবনের যে ছোঁয়া সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি তার প্রভাব কাটানো সহজতর নয়। আমেরিকান সমাজ সম্বন্ধে আমার ধারণা—It is

comfortable but complex. এ সফরে সংশ্লিষ্ট কর্তাব্যক্তিদেরকে বাংলাদেশের সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরতে যেমন সক্ষম হয়েছিলাম, নানাভাবে নানা রাজ্যের অনুষ্ঠান থেকে আমার অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারও প্রভূত সমৃদ্ধ হয়েছিল। আমেরিকাকে Land of opportunity বলা হয়। ইচ্ছে করলে তাদের প্রদত্ত সম্মানসমূহ ভাঙিয়ে অনেক সুযোগ নেওয়া যেত। কিন্তু সেদিনও আমার কাছে দেশ ছিল বড়। শত ঝড়-ঝাপটার মধ্যদিয়ে জীবন-তরী পার করার দুঃসময়েও দেশ আজও আমার কাছে তেমনি বড়।

মি. ব্রানন বলল, স্যার, আপনি দেশে চলে যাবার পূর্বে আমার মা-বাবার সঙ্গে দেখা করবেন না? তাঁরা যে আপনাকে দেখতে চান!

তার পুরনো কর্মস্থল বিধায় কোন কোনদিন আমি হোটেলে বিশ্রাম নিলে সে তার বন্ধুদের সন্ধানে বের হয়। বললাম, সে কী! তোমার বাবা-মা এল কোথা থেকে?

সে বুঝিয়ে বলল, আমি যখন হনুলুলুতে কর্মরত ছিলাম, একটি নিঃসন্তান দম্পতি আমাকে পুত্রাধিক স্নেহ দিয়েছিলেন তিনটি বছর ধরে। আমাকে বুঝতেই দেননি, পরিবার থেকে অনেক দূরে আমি পড়ে রয়েছি। তাদের দু'জনেরই বয়স আশির উর্ধ্বে। কিন্তু এখনও চলাফেরা করতে পারেন। আপনি আমার সঙ্গে একবার গেলে তাঁরা অত্যন্ত আনন্দিত হবেন।

বললাম, তাঁদের আনন্দ পরের কথা, তোমার আনন্দকে সার্থক করার জন্যই যাব। চলো, এখনই যাই।

সমুদ্রের তীর ঘেঁষে তাদের সুন্দর একতলা বাড়ি। নিজেরা মনের মতো করে তৈরি করেছেন এবং সবকিছু সাজিয়েছেন হাওয়াই দ্বীপের উৎপাদিত গৃহ-সামগ্রী দিয়ে। একটা নতুনত্ব দেখলাম তাদের স্বস্তি ও শান্তি ঘেরা সুখের নীরে। সন্তানাদি হয়নি। দু'জন দু'জনকে ভালোবাসে দুটি পাখির মতো। দু'জন প্রায় সমবয়েসী। এত সুন্দর বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধা সহজে দেখা যায় না। বিবাহের স্বর্ণ-জয়ন্তী পালন করার বিরল সৌভাগ্য তাঁরা ভোগ করেছেন। আমেরিকায় নিঃসঙ্গ বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের মধ্যে বিয়ে দেওয়ার প্রথা আছে। কেবল সঙ্গ দেওয়ার জন্যই জীবন সায়াহ্নে এসেও তারা কাউকে বেছে নেয় একাকিত্ব দূর করার জন্য। উভয়ের পুত্র-কন্যারা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে পৌত্র-পৌত্রীগণ এ ধরনের বিয়ের আয়োজন করে প্রচুর ধুমধামের মধ্যদিয়ে।

ব্রাননের হাওয়াইয়ান বাবা-মা তাদের বিবাহিত জীবন একত্রে উপভোগ করছেন অর্ধ শতাব্দীর অধিকতর সময়ব্যাপী।

বাড়িটিতে সারাক্ষণ সমুদ্রের লোনা পানির ছিটা এসে লাগে। এক বিশেষ রঙ দিয়ে তাই ঘর-দুয়ার রঞ্জিত। অন্য কেউ নেই। বুড়ো-বুড়ি পরস্পরকে আরও নিবিড় করে আঁকড়ে ধরেছে। বয়স যত বাড়ছে, তাঁদের প্রেমও ততধিক গভীর হচ্ছে।

তারা দু'জনেই কফি আর স্ন্যাকস্ তৈরি করে খাওয়ালেন। দুঃখ করলেন, তুমি ডিনারের জন্য অপেক্ষা করবে না!

ব্রানন ছোট শিশু হয়ে গেছে। বারবার দু'জনকে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরছে। পাপা, মামা বলে স্নেহের স্বরে ডাকছে। বৃদ্ধাকে বলছে, মামা, তুমি পূর্বের চাইতে অধিকতর সুন্দরী হয়েছ!

পাপা ফোড়ন কাটলেন, উইলিয়াম, তোমার মামার পা যে আর মাটিতে পড়বে না। একটু কম বল।

ব্রানন সঙ্গে সঙ্গে বলল, পাপা, তুমিও সাধুর মতো দেখতে পবিত্র হয়ে উঠেছ।

এবার গিন্নী হৈ হৈ করে উঠলেন, ওই ছিঁচকে শয়তানকে তুমি সাধু-সন্ত বানাচ্ছ! উইলিয়াম, তোমার পাপা যে গর্বে ফেটে পড়বে।

তাঁরা ব্রাননের নামের প্রথম অংশ উইলিয়াম বলে ডাকে। বৃদ্ধ-বৃদ্ধার মধুর ঝগড়া উপভোগ করছিলাম। তাঁরা ঠিক করল গাড়ি চালিয়ে আমাদেরকে হোটেলে রেখে আসবে। এই বয়সে গাড়ি চালাবে! সাহস তো কম নয়। শুনলাম, মাঝে মাঝে মার্কেটিং করার জন্য গাড়ি চালিয়ে তাদের বের হতে হয়। বললাম, তোমাদের গাড়িতে উঠব! আমার যে আমেরিকান ইন্স্যুরেন্স করা নেই।

দু'জনেই উচ্চ কণ্ঠে হেসে উঠলেন।

অশীতিপর বৃদ্ধ ড্রাইভ করছেন, পাশে বসেছেন তাঁর সহধর্মিণী অশীতিপর বৃদ্ধা ব্রাননের মাতা। বুড়ো মোটামুটি ভালোই চালাচ্ছেন। কিন্তু গিন্নী তাঁকে অনবরত নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছেন। বুড়ো বললেন, Darling! I am driving the car.

প্রতিউত্তর এল, But I am telling yon how.

চমৎকার লাগল তাদের বাদানুবাদ। ব্রাননের পাপা-মামাকে না দেখলে আমার হাওয়াই সফর অনেকটাই হাওয়ায় উড়ে যেত। ব্রাননকে ধন্যবাদ।

লে. কর্নেল উইলিয়াম ব্রানন এবার আমাকে বিদায় দাও। তোমাকে কিছু একটা গিফট করত চাই। বল, তোমার কি অভিরুচি!

সে বলল, তোমার একটা ছবি স্বাক্ষর করে দিয়ে যাও। আর কিছুর প্রয়োজন নেই।

তাকে বাংলাদেশের একখণ্ড চামড়ার বাঁধানো সংবিধান, বাংলাদেশের একটি ফ্ল্যাগ এবং আমার স্বাক্ষর করা একটি ছবি দিলাম। সে খুবই সন্তুষ্ট।

হোটেলের ম্যানেজার নিজে দেখা করতে এল, কোন তকলীফ্ হয়নি তো? আবার হনুলুলুতে এলে তোমাকে যেন আমাদের অতিথি হিসাবে পাই।

তাকে ধন্যবাদ দিলাম। আরও অনুরোধ করলাম, প্রথম দিন আমাকে যেভাবে পানীয়ের একটি প্যাকেট উপহার দিয়েছিলে, আজ যদি তেমনি একটি প্যাকেট করে দাও বাধিত হব।

সে জানতে চাইল, তুমি কি পানীয়গুলো তোমার দেশে নিয়ে যাবে?

তাকে বললাম, না, আমি মদ্যপান করি না। কিন্তু আমার আমেরিকান বন্ধু মি. ব্রানন এ বিষয়ে একটি প্রতিভা বিশেষ। তার জন্যই চাইছি। আমার বিলের সঙ্গে ওটার দাম যোগ করে দিও।

ম্যানেজার এবার আরও সুন্দর একটি প্যাকেট করে পানীয়ের অনেকগুলো বোতল আমার ঘরে পাঠিয়ে দিল; সঙ্গে লেখার জন্য কার্ড।

লিখলাম, 'ব্রাননের তৃষ্ণা নিবারণের জন্য, শুভেচ্ছাসহ, বাংলাদেশের বন্ধু শাহ্।'

প্যাকেটটি নিজে বহন করে ওর রুমে নিয়ে যখন দিলাম তখন ব্রানন শিশুর মতো আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। বারবার বলল, স্যার, আমি চেয়েছি তোমার ডলার বাঁচাতে। তুমি দেখছি সব খরচ করে যাবে!

মি. ব্রাননকে বিদায়ী ডিনার দেব পূর্বেই ঠিক করা ছিল। তাঁর ইচ্ছামতো রেস্টুরেন্টে যাব—প্রায় জায়গাই তাঁর পরিচিত। একটি সুন্দর রেস্টুরেন্টে নিয়ে গেল। বললাম, মেনু দেখে তোমার জন্য অর্ডার দাও। আমি নেব গ্রীলড্ রক প্রণ।

সে বলল, আমি এক প্লেট গরম সেদ্ধ ঝিনুক নেব। এই রেস্টুরেন্টে সবচাইতে উপাদেয় ঝিনুক পাওয়া যায়।

দু'জনের খাবারই একসঙ্গে এল। আমার গ্রীল করা পাথুরে চিংড়ি মাছ একটি সহজ খাদ্য। তবে রান্নার গুণে খুবই উপাদেয় হয়েছে। ব্রাননের জন্য এল একটা বিরাট এ্যালুমিনিয়ামের থালায় ধোঁয়া ওঠা বেশ বড় বড় অনেকগুলো ঝিনুক, তাতে সৈন্ধব লবণ ছড়ানো।

ব্রানন এক-একটি ঝিনুক খুলে ধরে সুরুৎ করে মুখে টেনে নেয়। দেখেই আমার উপাদেয় চিংড়ি খাওয়াও বন্ধ হবার যোগাড়। সে একটার পর একটা ঝিনুক খুলে মুখে পুরছে আর বলছে, ডেলিসাস। স্যার, তোমাকে এই অনবদ্য ডিনারের জন্য ধন্যবাদ।

বেটা বলে কী! সারা আমেরিকা ঘুরে কত সুস্বাদু খানা খেলাম! আর এখন এক প্লেট ঝিনুক নিয়ে এত আদিখ্যেতা।

আমার পেটে তখন আর খাদ্য ঢুকছে না। বললাম, লাঞ্চটা বেশি হয়ে গিয়েছিল, আমি এখন আর খেতে পারছি না।

সে কিন্তু মহা উৎসাহে তার প্রকাণ্ড পাত্রের সমস্ত ঝিনুক সাবাড় করে মহা তৃপ্তিতে ঢেকুর উদ্গীরণ করতে লাগল। জিজ্ঞেস করি, আর কিছু খাবে, মি. ব্রানন?

না, স্যার। আমি ঝিনুকের অপূর্ব স্বাদটা ধরে রাখতে চাই।

বিল মিটিয়ে চলে এলাম। পরদিন সকালে ফ্লাইট। গোছগাছ করে তৈরি হয়ে রইলাম। ফেরার সময় হনুলুলু এয়ারপোর্টে কেবল মার্কিনী শ্বেতাঙ্গরা আমাকে বিদায় জানাল। আমেরিকানরা আবেগপ্রবণতাকে পাত্তা দেয় না। কিন্তু বিরাট শরীরে কিশোরসুলভ একটি সুন্দর মনের অধিকারী ব্রাননের চোখ ঝাপসা হয়ে উঠতে দেখলাম। বললাম, ভালো থেকো ব্রানন, তোমাকে ভুলব না।

ব্রানন চোখে পানি, মুখে হাসি নিয়ে বলল, বনভয়েজ স্যার, চিরদিন তোমার কথা মনে রাখব।

প্লেন ছেড়ে দিল, আমার প্রথম আমেরিকা সফরের সমাপ্তি হল।

আমেরিকা মহাদেশতুল্য। বাংলাদেশের সীমানা ক্ষুদ্র মানচিত্রে খুঁজে পাওয়া ভার। তবুও ছোট্ট দেশের একজন অতিথিকে বিশাল দেশটি তাদের বিশালত্বের মানদণ্ডেই মূল্যায়ন করেছে। মার্কিনীদের সমালোচনা করতে সকলেই সোচ্চার। কিন্তু আমার প্রথম সফরের অভিজ্ঞতা যখন স্মরণে আসে, ভাবি, এত ভদ্রতা, এত উদারতা আর শালীনতার মাঝেও কেন এত হানাহানির আয়োজন! কেন বিশ্বব্যাপী তার চরিত্র এত বিতর্কিত, এত নিন্দিত!

দেশ ছোট হলেও জাতি হিসাবে আমরা বড়। জাতির হৃদয় কখন ওদের মতো বড় হয়ে উঠবে সে প্রত্যাশায় বুক বেঁধে আছি।

সূর্য উদয়ের দেশ জাপানের রাজধানী টোকিওর নারিতা বিমান বন্দরে অবতরণ করলাম। জাপানেও আমার জীবনের প্রথম সফর। হনুলুলু থেকে টোকিও দূতাবাসকে সব জানানো ছিল। একটি মধ্যম শ্রেণীর হোটেলে রুমের ব্যবস্থা করার অনুরোধ করে রেখেছিলাম। এখানে যে ক'দিন থাকব—সেটা আমার ব্যক্তিগত সফর। পয়সা গুণতে হবে নিজেকেই। শুনেছি টোকিও শহর

অত্যন্ত ব্যয়বহুল। বিমানবন্দরে আমাদের রাষ্ট্রদূত ব্যারিস্টার মুনতাকিম চৌধুরী সদলবলে উপস্থিত। ছাত্রজীবন থেকে তাঁর সঙ্গে পরিচয়—একবার সিলেট জেলায় তাঁর নির্বাচনী এলাকার কুলাউড়ায় এক জনসভায় তিনি আমাকে নিয়ে যান। তাঁর সঙ্গে আমার সহজ সুসম্পর্ক বিরাজমান।

তিনি প্রস্তাব করলেন, শাহ্ সাহেব, আপনার জন্য হোটেল আমরা বুক করে রেখেছি। কিন্তু একাকী হোটেলে সময় কাটাবেন কীভাবে? আমার বাসস্থানে উৎকৃষ্ট গেস্টরুম রয়েছে। আমি আমার স্ত্রী এবং কন্যারা আপনাকে সবসময় সঙ্গ দিতে পারব। বাড়ি সরকারের অর্থেই ভাড়া করা। কাজেই আপনি নিশ্চিন্তে আমার বাসস্থানে উঠুন।

মনে হল, যুক্তি মন্দ নয়। হোটেলে এসে সব কাজ ফেলে এরা কতক্ষণ আমাকে সঙ্গ দেবে। তারচাইতে চৌধুরী সাহেবের প্রস্তাবই গ্রহণ করা বিধেয়। চৌধুরী সাহেবের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্কের কারণে তিনি আমাকে শাহ্ সাহেব বলে ডাকেন। আমিও তাঁকে চৌধুরী সাহেব বলেই সম্বোধন করি। তাঁর বাসস্থানেই আস্তানা গাড়লাম। অল্পবয়স্কা কন্যা দুটির কথা বলব না। ওরা আড়ালে থাকতেই পছন্দ করে। তাঁর স্ত্রী আন্তরিক খুশি হলেন। আমি ছিলাম তাঁর পিতা প্রখ্যাত আইনজীবী রেজাউল করিম সাহেবের বিশেষ স্নেহভাজন। তাঁর মতো একজন প্রতিভাধর আইনজীবী আমি খুব কমই দেখেছি।

বিএনপি'র ঢাকা মহানগর কমিটির সভাপতি সাদেক হোসেন খোকার পিতা এবং পিতৃব্যের বিরুদ্ধে একটি জোড়া খুনের মামলায় আমি ছিলাম শ্রদ্ধেয় রেজাউল করিম সাহেবের সহকারী। তিনিই আমাকে ডেকে নিয়েছিলেন। দীর্ঘকাল ধরে সে মামলা চলেছিল। সে কারণে প্রায় প্রত্যহই আমাকে তাঁর বাসস্থানের চেম্বারে উপস্থিত হতে হত। সন্ধ্যার পর সেখানে গেলে তাঁর সঙ্গে অবশ্যই ডিনার খেতে হত। পাক্কা সাহেবি ডিনার। সেই লোভেও ঘন ঘন যেতাম।

তাঁর কন্যা মিসেস মুন্তাকিম চৌধুরী সেই সুযোগে আমাকে জানতেন এবং পিতার মতোই হৃদয়ের উষ্ণতায় আমাকে গ্রহণ করলেন। তিনি ছিলেন ইংরেজির ছাত্রী। শৈশব থেকে মেম রেখে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। ইংরেজি ভাষাই বলেন অধিকতর। বাংলা খুব একটা ভালো আসে না। সেন্ট গ্রেগরীজের ছাত্র আমি। আমার সঙ্গে ভালোই জমল।

চৌধুরী সাহেবের দাম্পত্যজীবনে কোথায় যেন একটা ফাঁক ছিল! জমিদার বংশের উচ্চশিক্ষিত, বিলেত ফেরত ব্যারিস্টার। তাঁর মতো নম্রভাষী ভদ্রজন সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না। তখন তিনি রাষ্ট্রদূত এবং চৌধুরী সাহেব ছিলেন অত্যন্ত সুপুরুষ। গায়ের রঙ দেখে ইংরেজ বলে ভুল হতে পারে। এমন স্বামী ক'জনের ভাগ্যে জোটে! কিন্তু কোথায় যেন তার কেটে গিয়েছে।

তাঁদের শুষ্ক বাদানুবাদ কানে বাজে। খাবার টেবিলে লক্ষ্য করি মিসেস সামান্য কারণে স্বামীর সঙ্গে তর্ক করছেন। স্বামীকে পছন্দ করেন বা ভালোবাসেন তখন মনে করার কোন সঙ্গত কারণ দেখা গেল না। একটা অহেতুক অসহিষ্ণুতা এবং বিরাগ ও অবহেলাই বরং প্রকট হয়ে উঠত।

আমার ধারণা পরে সত্যে পরিণত হয়েছিল। দু'সন্তানের জননী, ব্যারিস্টার সাহেবকে ত্যাগ করে তারই এক আত্মীয়ের সঙ্গে ঘর বেঁধেছিলেন—সে অনেক পরের ঘটনা।

রাষ্ট্রদূতকে অফিস করতে হয় এবং আরও সব দায়িত্ব পালন করতে হয়। আমাকে নিয়ে সর্বক্ষণ ব্যস্ত থাকা সম্ভব নয়। দূতাবাসে তিনি আমাকে নিয়ে গিয়ে সব দেখিয়ে-শুনিয়ে আনলেন। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সঙ্গে আলাপ হল। চৌধুরী সাহেব সময় পেলেই আমাকে নিয়ে টোকিওর বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান দেখিয়ে আনতেন। কিন্তু টোকিওর বিভিন্ন স্থানে তাঁর স্ত্রীই আমাকে নিয়ে গিয়েছেন বেশি। তিনি দূতাবাস থেকে আমার জন্য সার্বক্ষণিক একটি গাড়ি বাসায় রেখে দিয়েছিলেন। সে গাড়িতে বিভিন্ন স্থান সফর করা গেল।

জাপানের বিখ্যাত আগ্নেয়গিরি ফুজি দেখতে গেলাম। গাইড হিসাবে দূতাবাসের জাপানি এক যুবতী সঙ্গে গেল। সুন্দরী যুবতীটি খুবই আকর্ষণীয়া। ইংরেজিও ভালো বলে। সে আমাকে অনর্গল ধারাবিবরণী দিয়ে যাচ্ছে। ফুজি সান দেখতে গিয়ে জীবনের প্রথম তুষারপাত দেখলাম। পেঁজা তুলোর মতো অজস্র ধারায় ঝরে পড়ছে শুভ্র-শীতল তুষার। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা উপেক্ষা করে গায়ে বরফ পরার অনুভূতি প্রত্যক্ষ করার জন্য গাড়ি থেকে নেমে তুষারপাতে দাঁড়ালাম। মেয়েটি হেসে বাধা দিল। ঠাণ্ডা লেগে যাওয়ার ভয় রয়েছে। দূতাবাসের অন্য কর্মকর্তাটিও অত্যন্ত আপত্তি করল, স্যার, আপনার অভ্যাস নেই। অতর্কিত ঠাণ্ডা লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।

সব কথা উপেক্ষা করে প্রথম তুষারপাতের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে দ্বিধা করলাম না। ওরা শেষ পর্যন্ত আমাকে প্রায় জোর করেই একটি রেস্তোরাঁর উষ্ণতায় নিয়ে এল।

সেখান থেকে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে দেখা যায় ফুজি পর্বতমালার সেই শৃঙ্গটি যেখান থেকে অগ্ন্যুৎপাত ঘটে বর্ষিত হয়েছিল ইতিহাসের বৃহত্তম আগ্নেয় স্রোতধারা। আগ্নেয়গিরির অফুরন্ত লাভা ছড়িয়ে পড়েছিল ফুজি পর্বত শৃঙ্গের চারপাশে। জাপানিরা যে কোন জিনিসকেই মর্যাদা দিতে গিয়ে 'সান' শব্দটি ব্যবহার করে। ফুজি হল ফুজি সান। জাপানিরা বিশ্বাস করে আগ্নেয়গিরিটি সুপ্ত রয়েছে। যে কোন মুহূর্তে আবার গর্জে উঠতে পারে, ধ্বংস হয়ে যেতে পারে পম্পাই নগরীর মতো অন্য কোন জনপদ। দু'চোখ ভরে ফুজি সানকে দেখলাম। ছবি তুললাম, তুষারপাতেরও অনেক ছবি তুলেছিলাম। কিন্তু ডেভেলপ করার সময় দেখা গেল সেসব ছবি ফিল্মে অস্পষ্ট উঠেছে।

ফুজি সানও দেখা হল, সুন্দরী জাপানি রমণীর সান্নিধ্যও পেলাম। মিসেস চৌধুরীকে সব বলতেই বললেন, ব্যবস্থা করব নাকি? সঙ্গিনী যোগাড় করে দেব?

বললাম, প্রস্ফুটিত একটি গোলাপ দেখেই আনন্দ। সুঘ্রাণ ছড়ায়। কিন্তু ফুলটিকে ছিঁড়ে এনে হাতে চটকালে তার সবটুকু সৌন্দর্য ও সৌরভ বিনষ্ট হয়ে যায়।

মিসেস চৌধুরীর বেশ কয়েকজন জাপানি বান্ধবী রয়েছে। তারা দেখা করতে এলে আমার সঙ্গে তিনি আলাপ করিয়ে দেন। আমার মনে হয়, দুনিয়ার মধ্যে জাপানি মহিলারাই শ্রেষ্ঠ। পুরুষের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে কথাটি মানতেই হবে। মেয়েরা অফিস-আদালত, ব্যবসা-বাণিজ্যে যেমন কাজ করছে, বাসার কাজও তেমনি সুচারুরূপে সম্পন্ন করছে। ঘর-গৃহস্থালীর কাজে স্বামীপ্রবর কোন সাহায্য করে না। কর্মস্থলে গিয়ে নিজের কাজ সমাধা করার পর এক-এক জন সম্রাট। প্রচুর মদ্য পান, জুয়া, নাইট ক্লাব এবং আরও শত স্ফূর্তির আয়োজনে ব্যাপৃত থাকে। মহিলারা বাজার-হাট করা, সন্তানাদি পালন করা, রান্না-বান্না থেকে শুরু করে যাবতীয় কর্ম হাসিমুখে সমাধা করবে। বাড়ি-ঘর ধুয়েমুছে, কাপড় কেচে ইস্তিরী করে স্বামীর জুতোটি পর্যন্ত সাজিয়ে রাখবে। তিনি কখন মাতাল হয়ে ঘরে ফিরবেন, তাকে সর্ববিধ সেবা দিয়ে শুশ্রূষা করে আগামী দিনের জন্য তৈরি করে দেবে। শুধু তা-ই নয়, স্বামীর পরকীয়া প্রেম নিয়ে ওরা কাতর বা ঈর্ষান্বিত নয়। বরং স্বামীর শক্তি-সামর্থ্যে ওরা বেশ গৌরবান্বিত। গর্ব করে বলে, My hasband is a great tiger, he has three mistresses. অর্থাৎ স্বামী তার একটি শক্তিধর ব্যাঘ্রসুলভ, তার তিন তিনটে উপপত্নী রয়েছে!

সাধে কী লোকে বলে, পৃথিবীর তিনটি উৎকৃষ্ট জিনিস কি?

জাপানি বউ, চাইনিজ খাবার আর আমেরিকান ডলার।

তিনটি নিকৃষ্ট জিনিস কী?

জাপানি খাবার, চাইনিজ টাকা আর আমেরিকান বউ। দেশ-কাল-পাত্র ভেদে এ ধরনের কথাই হাসির ছলে প্রচলিত আছে। তাকে কেউ গুরুত্ব দেয় না। কিন্তু জাপানি মহিলা সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা না থাকলেও যা শুনেছি এবং জেনেছি তাতে মনে হয় কথাটি সত্য।

মিসেস চৌধুরীকে বললাম, সময়ে জানলে জাপানি নৌকায়ই চড়তাম।

টেলিফোন করে দেশে বলে দেব?

বললাম, বলে দেন। আপত্তি নেই। সে অন্তত খুশি হবে জেনে কোন জাপানি মহিলা নয়, আমার সিনিয়ারের সুযোগ্যা কন্যাই তার স্বামীকে টোকিওতে দেখাশুনা করছে।

বাড়িতে পরিচিত কাপড় বিক্রেতাকে ডাকিয়ে এনে মিসেস চৌধুরী সেবার কূটনৈতিকদের বিশেষ হ্রাসকৃত মূল্যে সালেহার জন্য প্রায় অর্ধ ডজন জাপানি শিফন শাড়ি পছন্দ করে দিয়েছিলেন। মেয়েরা শাড়ি পেলে সব ভুলে যায়। জাপানি শিফনগুলো স্বামীর দীর্ঘ অনুপস্থিতির কারণে সৃষ্ট মনোকষ্টের ঔষধিরূপে কাজ করেছিল।

চার সপ্তাহের ঊর্ধ্বে আমেরিকায় কাটিয়েছি। আসা-যাওয়া এবং জাপানের সপ্তাহব্যাপী অবস্থানে প্রায় দেড় মাস হয়ে গেল। অবিলম্বে দেশে ফেরা প্রয়োজন। রানার জন্য মন অস্থির হয়ে আছে। টোকিওতে সবার নিকটে বিদায় নিয়ে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। হংকং হয়ে পরদিন ঢাকা এসে পৌঁছলাম। কর্মীরা প্রায় সকলেই এয়ারপোর্টে উপস্থিত ছিল। অনেক ফুল আর মালা ভেদ করে সর্বাগ্রে রানাকে বুকে নিতে প্রাণ শান্ত হয়ে এল। দীর্ঘ সফরের ক্লান্তি মুহূর্তে মুছে গেল।

বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা হলে তিনি অনেক প্রশংসা করলেন। বললেন, আমি সব সংবাদ পেয়েছি। ভালো কাজ করেছিস। সবচাইতে বড় কথা ওখানকার অপরিমেয় ঐশ্বর্যের মোহে অনেকেই মাথা ঠিক রাখতে পারে না। তুই পেরেছিস। মদ এবং আনুষঙ্গিক পথ থেকে দূরে থেকেছিস। আমি সন্তুষ্ট হয়েছি।

দেশের সামগ্রিক অবস্থার লক্ষণীয় অবনতি ঘটেছে। সামাজিক পরিস্থিতি দিনকে দিন ক্রমান্বয়ে ঘোলাটে হয়ে উঠছে। কল-কারখানাসমূহে উৎপাদনের চাইতে হাঙ্গামা, গেট মিটিং, কর্মবিরতি, অবরোধ, হরতাল এসবই চলছিল পূর্ণোদ্যমে। জাতীয়করণকৃত বড় বড় শিল্প-কারখানাগুলোতে ক্রমাগত লোকসান দিতে দিতে তাদের অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন। কাজ নেই বললেই চলে, উৎপাদন সর্বনিম্ন কোঠায়। কিন্তু দাবির বহর বিস্তৃত। বাসস্থান চাই, চিকিৎসা চাই, চাই অধিকতর মাস মাহিনা ও মহার্ঘ ভাতা।

কে দেবে এইসব? কেন বঙ্গবন্ধু দেবেন—আপনারা দেবেন। তখন না গালভরা বুলি কপচিয়ে ছিলেন, স্বাধীন হলে সবই সহজলভ্য হবে। এখন আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা এতটা ভেঙে পড়ল কেন? কোন সদুত্তর দিতে পারি না। চতুর্দিকে একটা থমথমে ভাব, একজন আর একজনকে দোষারূপ করে পার পেতে চান।

সমাজ প্রায় ভেঙে পড়ার উপক্রম। চারদিকে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, নারী নির্যাতন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। নেতাকে কিছু বললে তিনি আমাদেরকেই ধমক-ধামক দেন। তাঁর মধ্যে সহনশীলতা, ধৈর্যের অভাব পরিলক্ষিত হয়।

ইতিমধ্যে তিনি পৃথিবীর অনেক দেশ ঘুরে এসেছেন। বিভিন্ন বিশ্ব-নেতৃবৃন্দও বাংলাদেশে এসে তাঁর নেতৃত্বের গতানুগতিক প্রশংসা করে গেছেন। জাতিসংঘে বাংলায় বক্তৃতা করে তিনি ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। তাঁকে নিয়ে সমাজতন্ত্রী দেশসমূহে বিশেষ উৎসাহের মনোভাব পরিলক্ষিত হয়। দেশের অভ্যন্তরে যতই অশান্তি থাক, তাদেরই উদ্যোগে ঢাকায় তাঁকে জুলিওকুরি শান্তিপদক দেওয়া হল জাঁকজমকের সাথে। অসুস্থ হলে চিকিৎসার জন্য অপারেশন করাতে রাশিয়া গেলেন। সেখানে কী হল জানি না! নেতা ফিরে অবধি বলতে শুরু করলেন, এভাবে দেশ চলতে পারে না। এ দেশে অবাধ গণতন্ত্র অচল। একটা বিহিত করতে হয়!

গণতন্ত্রের ত্রুটি কোথায় বোধগম্য হল না। প্রায় সকলেই তাঁর দলভুক্ত। শুধু তা-ই নয়, তাঁর কথাই যেক্ষেত্রে এ দেশে আইন, সেখানে গণতন্ত্র অচল হচ্ছে কার দোষে?

ইতিমধ্যে সংবিধান গৃহীত হবার পর দেশে নতুনভাবে নির্বাচন হয়ে গেছে। এখন সকলেই এমপি, মেম্বার অব পার্লামেন্ট। সত্তরের মতোই ফলাফল। আমাদের দলই একচেটিয়া আসন লাভ করেছিল। মাত্র কয়েকটি আসনে কয়েকজন বিরোধী দলীয় সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। তাদের সংখ্যা ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। এবার কোরবান আলী সাহেবকে মনোনয়ন দিতে আমিও পরামর্শ দিলাম। কেননা, একজন প্রবীণ নেতা পার্লামেন্টের গ্যালারিতে দর্শকের আসনে বসে থাকলে ভালো দেখায় না।

যথারীতি এবারও গড়ে সারাদেশের মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যক ভোট পেলাম। একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বীর জামানত নগ্নভাবে বাজেয়াপ্ত হল। 'স্বদেশ' পত্রিকায় কাজী খালেক বঙ্গবন্ধু ও আমার দুটো ছবি একত্রে ছেপে লিখল 'দুই বিজয়ী বীর।' খালেকের নিকট শুনলাম বঙ্গবন্ধু তাকে ডেকে ধমকিয়েছেন। বাংলাদেশে দুই জন বিজয়ী বীর হতে পারে না। এখানে একজনই বীর। অচিরেই কাজী খালেকের চাকরি গেল। পত্রিকার প্রশাসক পদ থেকে তাকে বিতাড়িত করা হল।

বিষয়টি খুবই সামান্য। কাজী খালেককে আমিও ভর্ৎসনা করেছিলাম, ওভাবে হেডলাইন করার জন্য। তার মস্তিষ্কে ঢোকেই না—পুরস্কৃত না হয়ে সে তিরস্কৃত হল কেন! বিতাড়িতই বা হল কেন! 'বুঝ হে সুজন, যে জান সন্ধান—' তুমি বাছাধন আদার বেপারী, জাহাজের খবর তুমি পাবে কোথায়!

নির্বাচনের পর দ্বিতীয়বারের মতো আমাকে চিফ হুইপ করা হল। নেতাকে জিজ্ঞেস করলাম, একটা টার্ম যদি সাফল্যজনকভাবে দায়িত্ব পালন করে থাকি, তা হলে আমি কি প্রমোশনের যোগ্যতা অর্জন করিনি?

তিনি হাসিমুখে বললেন, ওটা আমার ওপর ছেড়ে দে। সময় মতো আমি তোর সঠিক মূল্যায়ন অবশ্যই করব।

আশায় রইলাম। দলের ওয়ার্কিং কমিটিতে একবার খুব দলীয় ক্যাডার তৈরির উপর জোর দেওয়া হল। আমাদের নোয়াখালীর নুরুল হক সাহেবের ভাষায়—ওরা এত কেডর, কেডর করে কিল্লাই?

আর একবার দলকে গণতান্ত্রিককরণ এবং সরকার দলের নিকট জবাবদিহিতায় বাধ্য এসব মুখরোচক আলোচনার খই ফুটল। বঙ্গবন্ধু ঘোষণা দিলেন, তিনি প্রধানমন্ত্রীর পদে রয়েছেন বিধায় দলীয় সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগ করলেন। জনাব এ. এইচ. এম. কামরুজ্জামান সাহেবকে মন্ত্রিত্ব থেকে নিষ্কৃতি দিয়ে দলের সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হল। সাধারণ সম্পাদক পদে স্ত্রীর কারণে ভাগ্যবান জিল্লুর রহমান সাহেবই বহাল রইলেন। ছোটখাটো মানুষটি, কিন্তু ঘরে খুঁটির জোর আছে।

এ ব্যবস্থা অচিরেই ভেস্তে গেল। এটা হল 'এক নেতা, এক দেশ, বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ'—মন্ত্রপূত রাষ্ট্র। এখানে বঙ্গবন্ধুকে ব্যতীত সরকার চলবে না, দলও চলবে না। তাই বাধ্য হয়ে তাঁকে পুনরায় দলের সভাপতির পদটিও গ্রহণ করতে হল।

একথা কোনক্রমেই বলা চলবে না দলের প্রতিটি কর্মীই এসব পছন্দ করছিল। কিন্তু তারা অপছন্দও করছিল না। অন্তত তা প্রকাশ করার সাহস বা অন্য অর্থে ধৃষ্টতার অভাব ছিল। পার্লামেন্টই হচ্ছে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সর্বময় ক্ষমতার উৎস। সেখানে যিনি মেজরিটির নেতা তিনিই দেশ শাসন করেন। এই পদ্ধতিতে পার্লামেন্টের নিকট তিনিও জবাবদিহিতায় বাধ্য এবং পার্লামেন্টের দলীয় শক্তিই তার সত্যিকার বল।

আমাদের স্পিকার জনাব আবদুল মালেক উকিল সাহেবের একটি সদগুণ ছিল—কোন কোন বিশেষ মুহূর্তে তিনি অকপটে সত্য কথা বলার প্রয়াস পেতেন। একদিন তিনি এক সেমিনারে বললেন, গণভবনের বঙ্গবন্ধুর চাইতে সংসদের বঙ্গবন্ধু অনেক বড়। কথাটা সুস্থ মস্তিষ্কে চিন্তা করলে তাঁকে সাধুবাদই দেওয়া উচিত। তিনি পার্লামেন্টকে উঁচু করে তুলে ধরেছেন—সেই সঙ্গে পার্লামেন্টের অবিসম্বাদিত নেতা বঙ্গবন্ধুকেও।

কিন্তু চামচারা কি করবে—তাদেরও তো একটা কর্তব্য আছে। অবিলম্বে স্পিকারের বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর কান ভারি করা হল। কান ভার মানেই মুখও ভার। মালেক ভাই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। ভালো করতে গিয়ে শেষে কি নিজের ক্ষতি করলেন? মালেক ভাই আমাকে ডেকে পাঠালেন, বল তো ভাই

এখন কি করা যায়। বঙ্গবন্ধুকে শান্ত করতে না পারলে নিজেও যে শান্ত হতে পারছি না।

বললাম, আপনি থামুন, আমি প্রথম হাল-হকিকত যাচাই করে দেখি। তারপর আপনাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব। আমিও সেই সেমিনারে বক্তা ছিলাম। কান টানলে মাথাও আসবে—এটাই নিয়ম।

গণভবনে গিয়ে বুঝলাম মালেক ভাইয়ের বিপক্ষীয়গণ অহেতুক বঙ্গবন্ধুকে রাগান্বিত করার চেষ্টা করেছে। মালেক ভাই কখনও বলেননি, 'বঙ্গবন্ধুর কোনই ক্ষমতা নেই পার্লামেন্টের সমর্থন ছাড়া। ব্যক্তি মুজিব আমাদের কাছে বড় হতে পারে না। সংসদ নেতা মুজিবকে মানি। কাল আর একজন নেতা হলে তাকেও মানা হবে। কথাগুলো যদিও নির্ভেজাল খাঁটি। কিন্তু খাঁটি জিনিসের কদর কোথায়! সরিষার তৈলই খাঁটি মেলা ভার!

বঙ্গবন্ধুকে বুঝিয়ে বললাম, আমি সেই সেমিনারে উপস্থিত ছিলাম—প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত। মালেক ভাই যা বলেছেন, তা আপনাকে মহান করেছে, ছোট করেনি। তিনি তা করতে পারেন না।

বঙ্গবন্ধু বললেন, স্পিকার আর চিফ হুইপের সম্পর্ক খুব নিবিড়। তাই তুই মালেকের ওকালতি করতে এসেছিস।

বললাম, লীডার, আপনার বিষয়ে মালেক ভাইয়ের হয়ে ওকালতির প্রয়োজন নেই। বরং মালেক ভাই-ই আমাদের জন্য আপনার দরবারে ওকালতি করবেন। সত্যিই তাঁর কোনই ভুল এক্ষেত্রে হয়নি। তবুও সে মরমে মরে আছেন। আপনি রেগে থাকলে তিনি যাবেন কোথায়!

এক মিনিটে সব মেঘ কেটে গেল। হাতের পাইপে লম্বা টান দিয়ে হুকুম করলেন, তা স্পিকার সাহেবকে একবার সালাম দাও। তার মুখ দর্শন করি না অনেকদিন।

পাশের ঘর থেকে মালেক ভাইকে টেলিফোনে গ্রীন সিগন্যাল দিলাম। তখনই চলে আসতে বললাম।

মালেক ভাই এলে তিনি হাসিমুখে বললেন, স্পিকার হোস আর যাই হোস, তুই আমার কাছে সেই মালেকই রয়েছিস—আমি জানি, আমার মর্যাদা হানিকর কোন বক্তব্যই তুই দিতে পারিস না।

মালেক ভাইয়ের মসৃণ মুখমণ্ডল আরও তেলতেলে হয়ে উঠল।

পার্লামেন্টে প্রধানমন্ত্রীর মানানসই অফিস রয়েছে। তার স্টাফদের কোন অসুবিধা হয় না। কিন্তু তিনি গণভবনে বসতেই পছন্দ করতেন। একদিন শোনা গেল প্রকৌশলীরা পার্লামেন্ট ভবনের মাইকের তার গণভবন পর্যন্ত টানতে গিয়ে অনেক রাস্তা খোঁড়াখুঁড়ি করেছে। তিনি জানেন, পার্লামেন্টের সাউন্ড সিস্টেম সংসদ ভবনের গণ্ডি পেরিয়ে বাইরে যাওয়া রীতি-বিরুদ্ধ। পুরনো সংসদ ভবনেই তখন পর্যন্ত পার্লামেন্ট অবস্থিত ছিল। সেখান থেকে

নতুন গণভবন, অর্থাৎ আজকের করোতোয়া পর্যন্ত অনেকটা পথ বিশেষভাবে খুঁড়তে হয়েছে সেই বিশেষ লাইনটি বসানোর জন্য।

ইদানীং বক্তৃতা-বিবৃতিতেও তিনি কোন সময় এমন কথা বলে ফেলেন, যার কদর্থ করা খুব কঠিন নয়। সংসদীয় দলের সভায় একদিন বলে বসলেন, আমি তোদেরকে পয়দা করেছি।

কথাটা আমার মনে হল বেশি বলা হয়ে গেল এবং এর আভিধানিক অর্থ মোটেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। চিফ হুইপ হওয়ার কারণে সংসদীয় দলের সভায় নিজে কথা বলি কম, অন্যদের দিয়ে বলাই বেশি। কিন্তু কোন কোন সময় না দাঁড়ালে বিবেকের নিকট দায়ী থাকব। তাই দাঁড়ালাম। বিনয়ের সঙ্গে বললাম, লীডার, আপনার আজকের উক্তি দু'ভাবে নেওয়া যায়। আপনি কর্মী তৈরি করেছেন। দল সংগঠিত করেছেন। তাদেরকে মনোনয়ন দিয়ে খাটা-খাটুনি করে নির্বাচিত করিয়ে এনেছেন—সে অর্থে আপনি এদেরকে এমপি বানিয়েছেন বলা সঠিক হবে। কিন্তু যদি বলেন তোদেরকে তৈরি করেছি তা হলে আল্লাহ্‌র আরশ কেঁপে উঠবে। কেননা, তিনিই একমাত্র সবকিছু তৈরি করার মালিক।

তিনি একটু নরম হলেন। বললেন, আমি তো প্রথম অর্থেই বলেছি।

তারপরও বললাম, লীডার, আজ আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি এদের চিফ হুইপ। এদের পক্ষেও আমার কথা বলা কর্তব্য। আপনি কর্মী-বাহিনী সংগঠিত করেছেন—একথা সর্ববাদী সম্মত। কিন্তু এই কর্মীদেরও অবদান কম নয়। আজ আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছায় আপনি বঙ্গবন্ধু, একটা প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানটি তিলে তিলে গড়ে তুলতে অনেক সাজ-সরঞ্জামের প্রয়োজন হয়েছিল। আপনার সম্মুখে বসা এই কর্মীরাই সেই সরঞ্জাম। ভেবে দেখুন নেতা, এই সংসদ ভবনটি তৈরি করতে কত অজস্র ইটের প্রয়োজন হয়েছে। প্রতিটি ইট গেঁথে গেঁথে আজ এই ভবন। সংসদ ভবন কিন্তু কোন ক্রমেই দাবি করতে পারে না সে ইটগুলোকে তৈরি করেছে। বরং প্রতিটি ইট সগৌরবে দাবি করতে পারে আমরা নিজেদেরকে তোমার দেওয়ালে গেঁথে আত্মবিসর্জন দিয়ে আজ এই বৃহৎ ভবন তৈরি করেছি। তুমি আজ একটি প্রতিষ্ঠান। সেই প্রতিষ্ঠানে আমাদের মতো কত ইট-কাঠ বিলীন হয়ে রয়েছে। কাজেই আমরা গর্ব করে বলতে পারি তোমার সৃষ্টিতে আমাদেরও অবদান কম নয়। 'বঙ্গবন্ধু' প্রতিষ্ঠানটি তৈরি করতে আজকের এই কর্মীদের মতো অনেকের মাথার ঘাম, গায়ের রক্ত, জেল-জুলুমসহ শত নির্যাতন এবং প্রাণ বিসর্জন করতে হয়েছে।

সদস্যরা আনন্দে জোর হাততালি দিয়ে উঠল। উৎসাহিত হয়ে সেদিন আরও বলেছিলাম, লীডার, স্মরণ করুন ছাপ্পান্ন সালের পরের ঘটনা। অসংখ্য দুর্নীতি মামলার আসামি আপনি যুক্তফ্রন্টের ক্যাবিনেটের সাবেক মন্ত্রী।

সেদিন দেশের অধিকাংশ মানুষই সে অভিযোগসমূহ অবিশ্বাস করত না। সেই দুর্দিনে আপনার এই কর্মীটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হল প্রাঙ্গণে আইয়ুব খানের সামরিক আইন ভঙ্গ করে দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছিল, 'শেখ মুজিব আমাদের নেতা, তাঁর বিরুদ্ধে সকল নির্যাতন বন্ধ করতে হবে। মিথ্যা ষড়যন্ত্রমূলক মামলা থেকে তাঁকে মুক্তি দিতে হবে। আমরা আজ থেকে মাঠে নামলাম।'

আবারও করতালি। তিনি হাসিমুখে আমার পিঠ চাপড়িয়ে বললেন, মোয়াজ্জেম যা বলেছে তাঁর সঙ্গে আমি একমত। তোদের নিয়েই আমি, আমাকে নিয়েই তোরা।

সেদিনের সভা ভঙ্গ হতে সদস্যরা অনেকেই হাসিমুখে আমার অফিস কক্ষে ভিড় জমিয়েছিল। তাদের কথাই যে আমার কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হয়েছিল।

জানা গেল, খাদ্য মজুদ দ্রুত বিপদসীমার ঊর্ধ্বে চলে যাচ্ছে। খাদ্যমন্ত্রীর মুখ শুকনো। এতদিন যে তথ্যাদি পরিবেশন করা হয়েছে তা অনেকটা 'কাজীর গরু খাতায় আছে, গোয়ালে নেই' এরকম অবস্থা। ক্যাবিনেটে অনেক হম্বিতম্বি করা হল। চালের মজুতদার, মোনাফাখোর এবং কালোবাজারীদের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি উচ্চারিত হল। চালের ক্রমবর্ধমান মূল্য আর এক দফা বৃদ্ধি পেল। খাদ্যমন্ত্রী স্বয়ং মৌলবী বাজার, শ্যাম বাজার, সোয়ারী ঘাটে গেলেন ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আলোচনা করে মূল্যের ঊর্ধ্বগতি রোধ করার পন্থা বের করতে। ফল হল বিপরীত। ছবিসহ খবর পত্রিকাসমূহে প্রকাশিত হলে বাজারে তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া হল। আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল চালের আড়তদার মহলে। ফলে মূল্যের আরও ঊর্ধ্বগতি।

চারদিক থেকেই অবস্থার অবনতির খবর আসতে লাগল। কথায় বলে, Calamity never comes alone. সংকট কখনও বিচ্ছিন্নভাবে ঘটে না। একটার পর একটা দুরপনেয় ঘটনা ঘটতে থাকল। খাদ্য মন্ত্রণালয় চাল আমদানির ব্যবস্থা করেছিল বলে শোনা গেল। এও শোনা গেল, ক্ষুধার্ত মানুষের মুখে অন্ন তুলে দেওয়ার মানসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাহাজ ভর্তি করে চাল পাঠাবার ব্যবস্থা করছে। কার্যত কিছুই দেখা গেল না। সমালোচনার ঝড় বয়ে গেল। সমাজতন্ত্রের প্রতি অধিকতর ঝুঁকে পড়ার কারণে গোস্বা হয়ে যুক্তরাষ্ট্র তাদের খাদ্য বোঝাই জাহাজ অন্য পথে চালান করে দিয়েছে।

বাংলাদেশকে একটা শিক্ষা দিতে হবে। কথাটার সত্যতা যাচাইয়ের অবকাশ নেই।

সমাজতন্ত্রীগণ ওজস্বিনী ভাষায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের শ্রাদ্ধ করে ছাড়ল। কিন্তু যারা এতকাল সমাজ বিপ্লব আর শাসননীতির আইডিয়া ধার দিচ্ছিল অকাতরে, তাদের পক্ষ থেকে এক মুঠো খাবার এসে পৌঁছল না বিপদগ্রস্ত নিরন্ন মানুষগুলোর দ্বারে। অনেকে বলে থাকে ওদের নিজেদের উনুনই জ্বলে না মার্কিন সাহায্য ব্যতিরেকে। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের কথিত আমদানিকৃত চালের জাহাজও কি সাম্রাজ্যবাদীরা চক্রান্ত করে রাস্তা ঘুরিয়ে ভিয়েতনাম বা পূর্ব আফ্রিকায় পাঠিয়ে দিল! দোষ তো নিশ্চয়ই ওদের। তোমাদের পরিধেয় বস্ত্র খুলে গেছে, লজ্জাস্থান মানুষের দৃষ্টিগোচর হচ্ছে, দোষ কি মানুষের না তোমার অগোছাল স্বভাবের! দোষ যারই হোক, ঘটনা যা ঘটবার ঘটে গেল। বঙ্গবন্ধুর বা তাঁর সহকর্মীদের কী আন্তরিকতায় অভাব ছিল? তাঁরা কী চেয়েছে দেশের মানুষ খাদ্যাভাবে প্রাণ হারাক? না, সে কথা কারো সম্বন্ধেই বলা যায় না। কিন্তু মানুষের প্রতি কেবল ভালোবাসা থাকলেই চলবে না। আমি তোদের ভালোবাসি বলে গাল ভরা বুলি আওড়ালে শুকনো ভালোবাসায় চিড়া ভিজবে না। কাজে দেখাও তোমার ভালোবাসা কতটা নির্ভরযোগ্য।

যোগাড়যন্ত্র না করে তুমি সংসার পাতলে কেন? মানুষকে খেতে-পড়তে দিতে অক্ষম তুমি পিতা সেজে কেবল শাসনই করবে! সোহাগ কী কেবল মুখের বুলি! 'ভাত দিবার ভাতার না, কিল মারার গোঁসাই।' মানুষেরও চোখ খুলে গিয়েছে। ধবধবে সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি পরে, ছয় দফার স্মরণে ছয় বোতাম সম্বলিত কালো মুজিব কোর্ট পরিধান করে, অজানুলম্বিত দামি ঘিয়ে রঙের কাশ্মিরী শাল গলায় ঝুলিয়ে ক্ষুধার্ত মানুষকে এক থালা অন্নের পরিবর্তে ধৈর্য ধরার আহ্বান জানালে ওদের ধৈর্যের শেষ বাঁধটি ভেঙে যাওয়ার কথা। কিন্তু অভুক্ত-অশক্ত মানুষ ক্ষুধার যন্ত্রণায় কাতর, সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না, ওরা কী করতে পারে! নিরম্বু উপবাসে আস্তে আস্তে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ার পূর্বে তারা তাদের শেষ অভিযোগ জানিয়ে যায় সৃষ্টিকর্তার দরবারে, আল্লাহ্ তুমি মুখ দিয়েছিলে আহার দিবে বলেই। মুখের সে অন্ন যারা কেড়ে নিল, যারা সে অন্ন মুখে পৌঁছাতে পারল না, তাদের তুমি ক্ষমা কর না মাবুদ।

গ্রামগুলোতে কর্ম-সংস্থানের অভাব। কাজ না থাকলে উপার্জন নেই। উপার্জন নেই তো খাবে কি? মানুষ নিজেদের ভিটামাটি ছেড়ে শহরমুখী ছুটতে শুরু করল। ভিক্ষাবৃত্তি বেড়ে গেল। যুবতী মেয়েরা ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করতে না পেরে পতিতার খাতায় নাম লেখাল। ঘর থেকে বেরুলেই একের পর এক ভিক্ষুক আর ভিক্ষুক। একটু ভাত, না হয় একটু ভাতের মাড় দাও। ক্ষুধার যন্ত্রণা আর সহ্য করা যায় না।

রাস্তায় পড়ে থাকে চলচ্ছক্তিরহিত নর-নারী। গাড়ি করে যাওয়ার সময় ওদের চোখের দিকে, ওদের কঙ্কালসার দেহের দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠি। বাচ্চা কোলে শত ছিন্নবস্ত্রে লজ্জা ঢাকার ব্যর্থ প্রয়াস করছে মা। বাচ্চাটি মায়ের শুকিয়ে যাওয়া মাই চুষে কিছু না পেয়ে কঁকিয়ে ওঠে। জোরে কাঁদবার শক্তিও নেই।

মানুষ আর কুকুরের পার্থক্য ঘুচে গেল। ডাস্টবিন ঘেঁটে উভয়েই খাদ্য খুঁজে প্রাণান্ত হয়। দেশের উত্তরাঞ্চল অপেক্ষাকৃত দরিদ্র এলাকা বিধায় সেখানে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ তীব্রতর আকারে ছড়িয়ে পড়ল। অনাহারে অসংখ্য মৃত্যুর সংবাদ প্রতিদিন কাগজে ভরপুর। রংপুর জেলার অবস্থা সবচাইতে শোচনীয়। বিভিন্ন জেলা থেকে অগণিত আদম সন্তানের অনাহারে জীবনহানির সংবাদ এল।

বহুল বিতর্কিত বস্ত্রের অভাবে নাকি জাল দিয়ে গা ঢেকে লজ্জা নিবারণের প্রচেষ্টায় লিপ্ত যুবতী বাসন্তীর ছবি খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপা হয়ে দেশ-বিদেশে আমাদের লজ্জা রাখার ঠাঁই রইল না। কেউ কেউ সাফাই গেয়ে থাকে, বাসন্তী ছিল পাগলিনী। তাই ও শরীরে জাল জড়িয়েই রেখেছিল। সরকারকে বিব্রত করতে ওর ছবি ছাপানো হয়েছে। যেন বিব্রত হওয়ার মতো ঘটনা আর ঘটেনি! যেন দুর্ভিক্ষটাও পাগলের কাণ্ড, সরকারের ভাবমূর্তি নষ্ট করার প্রচেষ্টা। অসংখ্য লোকের অন্নাভাবে মৃত্যু কেবল অতিরঞ্জিত রটনা!

'৭৪ সেই দুর্ভিক্ষ জাতির জন্য সবচাইতে বড় কলঙ্ক এবং সরকারের চরম ব্যর্থতার ইতিহাস হয়ে রইল। এই সর্বনাশা দুর্ভিক্ষ জাতীয় জীবনকে বড় ধরনের নাড়া দিয়ে গেল। দুর্ভিক্ষ হঠাৎ করে আসে না। আধুনিক বিশ্বে সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত এবং পরিকল্পনা গ্রহণ করলে এ ধরনের বিপর্যয় ঠেকানো সম্ভব। কিন্তু সামন্ত-মানসিকতার বিচার-বিবেচনা নিয়ে ট্রাইবাল চিফদের মতো দেশ শাসন করলে তার পরিণতি এমনিই হতে বাধ্য।

পূর্বে কোনদিন এমন দুর্ভিক্ষ প্রত্যক্ষ করিনি। '৭৬-এর মন্বন্তর বলে এক মহা-দুর্ভিক্ষের কাহিনী বৃদ্ধদের মুখে শোনা যায়। বই-পুস্তকেও পড়ি। আমাদের সরকারের অবদান এই '৭৪-এর দুর্ভিক্ষ। এ ধরনের মানুষ-সৃষ্ট বিপর্যয় কোন জাতির ইতিহাসে পুনরাবৃত্তি না ঘটুক এটাই কাম্য।

শৈশবে একবার আমাদের দেশে চালের অভাব দেখা দিয়েছিল। অন্যান্য দ্রব্যের প্রাচুর্য থাকলেও বাজার থেকে চাল উধাও। মনে পড়ে, আমাদের বাড়িতে মা আমাদের ভাই-বোনকে দু'-দিন সেদ্ধ মিষ্টি আলু এবং মিষ্টি আলুর সঙ্গে সামান্য চাল সহযোগে এক নতুন খাদ্য পরিবেশন করে কেঁদে আকুল হয়েছিলেন। আমাদের অবশ্য আনন্দই হচ্ছিল। প্রতিদিনের ভাতের পরিবর্তে নতুন খাবার। তাছাড়া মিষ্টি আলু ছিল আমাদের নিকট প্রিয়— যদিও লোকে বলত ওটা গরিব মানুষদের খাবার, অখাদ্য। চালের

সে দুষ্প্রাপ্যতা ক্ষণস্থায়ী ছিল। কয়েকদিনের মধ্যেই চালের বাজার পূর্বাবস্থায় ফিরে এসেছিল।

এবারের দুর্ভিক্ষের অভিজ্ঞতা আমাদের সমস্ত ধ্যান-ধারণাকে গভীরভাবে পর্যুদস্ত করে দিয়ে গেল। পৃথিবী জুড়ে বন্ধু থাকলেও বিপদের মুহূর্তে কেউ কাজে লাগল না। যাদের মরার ছিল তারা মরল। দুর্ভিক্ষের আঁচড় আমাদের স্পর্শ করেনি সত্য, কিন্তু মনকে করে দিয়ে গেল ক্ষত-বিক্ষত।

সরকারের একজন হিসাবে চিহ্নিত হয়ে গৌরব বোধের কোন কারণ ছিল না। কেবল দেশের উত্তরাঞ্চলই নয়, আকালের সে সর্বগ্রাসী থাবা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পর্যন্ত দীর্ঘকালের স্বাক্ষর রেখে গেল।

বঙ্গবন্ধুর মাথায় অনেকদিন থেকেই একটা নতুন ধারণা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল—বর্তমান গতানুগতিক পথে দেশ পরিচালনা করা আর সম্ভব হচ্ছে না।

কি করতে চান?

বললেন, এই বল্গাহীন বহুদলীয় ছন্নছাড়া গণতন্ত্র দেশকে দেউলিয়া করে দিল। এর পরিবর্তন আশু প্রয়োজন। একদলীয় শাসন কায়েম করতে হবে।

একি কথা শুনি আজ মন্থরার মুখে! শহীদ সোহরাওয়ার্দীর হাতে গড়া, তাঁর উত্তরসূরি এবং ভাবশিষ্য শেখ মুজিবের কণ্ঠে আজ একি শুনছি! সারাজীবন গণতন্ত্রের পথে চলতে চলতে আজ তাঁর একি মতিচ্ছন্ন, না অন্যকিছু? বলা হল বহুদলীয় নয়, একদলীয় গণতন্ত্রই উত্তম ব্যবস্থা। আশ্চর্য হয়ে ভাবতে হয়, গণতন্ত্র অর্থই যেখানে শত ফুল ফুটতে দাও, গণতন্ত্রের আদি বক্তব্য যেখানে বহু মত, বহুতর পথ এবং বহুধা দলের অস্তিত্ব অবশ্যই থাকতে হবে, সেখানে একদলীয় প্রথাকে গণতন্ত্র বলা হচ্ছে। চোখ নেই ছেলের নাম পদ্মলোচন।

তিনি এই আজব গণতন্ত্রের ধ্যান-ধারণা কোথা থেকে পেলেন তিনিই জানেন। কিন্তু সকলকেই ধরে ধরে একদলীয় ব্যবস্থার সপক্ষে যুক্তি দেখাতে থাকলেন। আর দলও আমাদের তথৈবচ। নেতা যদি বলেন, এখানে হাঁটু জল, আমরা বলি গভীর জল। নেতা যদি বলেন কোথায় জল? আমরা প্রতিধ্বনি করি, সত্যিই তো এত দেখছি একেবারে শুকনো খটখটে!

নেতা আমার ব্যক্তিগত মত জানতেন, তবুও একদিন ডেকে বললেন, তোকে একদলীয় প্রথার সপক্ষে দলীয় সভায় বক্তব্য রাখতে হবে।

বিনীতভাবে বললাম, নেতা এ সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র জ্ঞান বা ধারণা আমার নেই। যদি বলেন এর বিপক্ষে বলতে পারি। কিন্তু পক্ষে বলা নৈব নৈব চ।

তিনি গম্ভীরকণ্ঠে বলে উঠলেন, তার অর্থ কী এই দাঁড়াল যে, তুই আমার নীতি প্রত্যাখ্যান করছিস এবং আমাকেও পরিত্যাগ করছিস?

বললাম, এর একটাও না। আমি আপনার এতদিনের সমস্ত বিঘোষিত নীতি অনুসরণ করেছি, পালন করেছি এবং প্রচার করেছি। আজ এই নয়া-নীতি আমি সমর্থন করি না এবং প্রাণপণ চেষ্টা করব আপনাকে এ থেকে বিরত রাখতে। যদি সফল না হই, অপছন্দ হলেও আমি তা গ্রহণ করব—কেবল আপনি তা প্রণয়ন করছেন বলে। আপনাকে ইহজীবনে ত্যাগ করার প্রশ্নই আসে না। আপনি তা ভালো করেই জানেন।

তিনি বললেন, সবই বুঝলাম। তুই আমাকে সাহায্য করবি না এই নতুন পদ্ধতি প্রণয়নে?

বললাম, বাধা দিয়ে অকৃতকার্য হলে অবশ্যই আপনার প্রতিটি আদেশ পালন করব।

কামরুজ্জামান ভাই, ইউসুফ আলী সাহেব, সোহরাব হোসেন, ওবায়েদ, মঞ্জুর, আমি—আমরা সকলে একত্রে সৈয়দ নজরুল ইসলাম সাহেবের সঙ্গে দেখা করলাম। তাঁকে সাধ্যানুসারে বুঝাবার চেষ্টা করলাম— নেতা বিভ্রান্ত হয়ে ভুল পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছেন, তাকে সামলানো প্রয়োজন।

তিনি আমাদের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হলেন এবং নেতাকে বুঝাবার দায়িত্ব নিলেন। কিন্তু অবস্থা যা দাঁড়াল তাতে তিনি কিছু করেছেন বা করতে পেরেছেন বলে মনে হল না। জনাব তাজউদ্দীন সাহেবকে ইতিপূর্বে মন্ত্রিসভা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। ভিতরের কারণ জানি না, কিন্তু স্বাধীনতা যুদ্ধের সফল সংগঠক, মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধানমন্ত্রী, যিনি যোগ্যতার সঙ্গে সে যুদ্ধ পরিচালনায় সমর্থ হয়েছিলেন, তাঁর বিদায়ে প্রায় সকলেই স্তম্ভিত হলেও বোধগম্য কারণেই কোন প্রতিবাদ উচ্চারিত হয়নি। এরও পূর্বে এক চিত্রনায়িকাকে কেন্দ্র করে কিছু অভিযোগের কারণে সেদিনের তথ্যমন্ত্রী মিজানুর রহমান চৌধুরীকেও ক্যাবিনেট থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। মিজান সাহেবের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ছিল নিবিড়। তাঁর বিদায়ে ক্রুদ্ধ হয়ে নেতাকে গিয়ে ধরতেই তিনি কিছু আলোকচিত্র দেখিয়েছিলেন। সেসব ছবি দেখার পর মিজান সাহেবের পক্ষে আর কথা বলার মুখ রইল না। কিন্তু তাজউদ্দীন সাহেবের বিষয় ভিন্ন। তাঁর অবদান অনস্বীকার্য এবং কোন বাহ্যিক দোষারূপও কেউ প্রত্যক্ষ করেনি। তাঁর কাছে

গেলে তিনি বিরূপ মনোভাব নিয়ে মন্তব্য করলেন, করতে দিন। যত তাড়াতাড়ি করবে তত তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে।

আমরা তাঁর কথায় অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলাম। তিনি কি ইঙ্গিত করলেন!

কোনদিকেই কিছু হচ্ছিল না। তবুও আওয়ামী লীগের গণতন্ত্রামনা ও জাতীয়তাবাদের চেতনাসমৃদ্ধ অংশটি বিভিন্নভাবে চেষ্টা করতে লাগল প্রস্তাবিত একদল প্রথার প্রচলন বন্ধ করা যায় কিনা। গণভবনে এক বৈঠক বসল নেতৃবৃন্দের অনানুষ্ঠানিকভাবে একদলীয় প্রথার দলের নাম কি হবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য। সেখানেও আর এক দফা আমরা ব্যর্থ প্রয়াস চালালাম। না, তিনি মনস্থির করে ফেলেছেন এ প্রশ্নে আর দ্বিধা নয়। এক্ষণে সে দলের নামকরণ কী হবে তা-ই নিয়ে আলোচনা হতে পারে।

অনন্যোপায় হয়ে আমরা শেষ পর্যন্ত প্রস্তাব রাখলাম, একদলই যদি করতে হয় তা হলে তার নাম আওয়ামী লীগই হোক। দীর্ঘদিনের পরিচিত দল। শত সহস্র কর্মীর আত্মদানে তিলে তিলে গড়ে ওঠা সংগঠনের এই প্রিয় নামটিকেই কেন আমরা ব্যবহার করব না! গ্রাম-গঞ্জে বাচ্চারা পূর্ণ নাম সঠিক উচ্চারণ করতে না পেরে বলে 'আম লীগ', এত জনপ্রিয় নামটিই হোক আপনার একক দলের নাম।

শহীদ সোহরাওয়ার্দী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত জিন্নাহ্ আওয়ামী মুসলিম লীগ, পরবর্তীতে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে প্রথম আওয়ামী মুসলিম লীগ, পরে অসাম্প্রদায়িক করার ফলে প্রতিষ্ঠিত হল বর্তমানের আওয়ামী লীগ। এই নামটিই রাখা হোক। কিন্তু কোথা থেকে কি কলকাঠি নাড়া হচ্ছে জানি না—বরিশালের জনাব মহিউদ্দীন আহমেদ, যিনি সারা জীবন ন্যাপের রাজনীতি করে পক্ক কেশ নিয়ে আওয়ামী লীগে যোগ দিলেও ন্যাপের মহিউদ্দীন বলেই অধিকতর পরিচিত ছিলেন; তিনি প্রস্তাব করলেন বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক আওয়ামী লীগ নামকরণ করা হোক। সংক্ষেপে বাকশাল। মহিউদ্দীন সাহেব বঙ্গবন্ধুকে বয়স এবং বন্ধুত্বের কারণে নাম ধরে ডাকতেন এবং তুমি বলে সম্বোধন করতেন। তাঁর প্রস্তাব বঙ্গবন্ধুর মনে ধরল। শেখ মণি, তোফায়েল, রাজ্জাক, জিল্লুর রহমানরা সঙ্গে সঙ্গে বাকশালের পক্ষে মত প্রদান করল। তারা কেবল লক্ষ্য রাখছে বঙ্গবন্ধুর পছন্দ কোনটি, সঙ্গে সঙ্গে ঐক্যতান। যখন যেমন তখন তেমন হায় হোসেনের দল। আজকের আওয়ামী লীগের নব্য সদস্যরা একথা ভাবতেও পারবে না এবং তাদেরকে ভাবতেও দেওয়া হবে না যে, আওয়ামী লীগের আজকের নেতৃবৃন্দ দলের এই নামটিকে সেদিন স্বচ্ছন্দে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। বাকশাল নিয়ে তখন তারা মেতে উঠলেন। রাজ্জাক একটু বিলম্বে বুঝে। তাই অন্যরা পরে আওয়ামী লীগ

পুনরায় চালু করলেও সে এবং মহিউদ্দীন সাহেব অনেক দিন পর্যন্ত বাকশাল চালিয়ে হালে পানি না পেয়ে পুনঃমূষিক ভব, আওয়ামী লীগে এসে পুনরায় নাম লেখাল।

নেতার নির্দেশে সংসদীয় দলের সভা ডাকলাম গণভবনের সুবৃহৎ সম্মেলন কক্ষে। বাকশাল গঠনের ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা, তার বৈজ্ঞানিক দিক্‌দর্শন এবং সম্ভাব্য বৈপ্লবিক কর্মসূচি নিয়ে সারগর্ভ ভাষণ দিলেন একদলীয় রাজনীতির সাম্প্রতিক অধিকারীরা। কিন্তু ব্যত্যয় ঘটল যখন মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল এম. এ. জি. ওসমানী সাহেব এর বিপক্ষে মুখ খুললেন। লক্ষ্য করলাম সভার সর্বশেষ কাতারে আসীন 'ইত্তেফাকে'র প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক মরহুম তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার জ্যেষ্ঠপুত্র ব্যারিস্টার মইনুল হোসেনও বাকশালকে সমর্থন করতে অসম্মত। ফলশ্রুতিতে রাজশাহীর সরদার আমজাদ হোসেন তাঁকে চেয়ার তুলে আঘাত করার চেষ্টা করে। কিন্তু অন্য সদস্যদের হস্তক্ষেপে সফল হতে পারে না। বাকশালের এই নতুন অগ্রদূতটি মহিউদ্দীন-রাজ্জাকরা বাকশাল গুটিয়ে ফেললেও, সে তা অব্যাহত রাখে এবং সাবেক বাকশালীদের দ্বারা নির্দয়ভাবে প্রহৃত হয়। পরে অবশ্য তার অংশের বাকশাল নিয়ে জাতীয় পার্টিতে যোগদান করে এরশাদের মন্ত্রিসভায় স্থান লাভ করে।

সেই বৈঠকের সবচাইতে উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকীর বাকশাল বিরোধী দুর্দান্ত সাহসী বক্তৃতা। ছাত্রজীবন থেকেই সে কেবল একজন প্রতিভাধর বক্তাই নয়, বাংলাদেশে তার সমকক্ষ বক্তার সংখ্যা হাতে গোনা যায়। তার অনেক বক্তৃতা শুনেছি। কিন্তু সেদিন ভাষা, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও যুক্তি সন্নিবেশ করে সে যে দীর্ঘ বক্তৃতা রেখেছিল তাতে একবার মনে হল, বুঝি বাকশাল প্রস্তাব মাঠে মারা গেল।

অবস্থা বেগতিক বুঝে বঙ্গবন্ধু সভা বন্ধ করার প্রস্তাব দিলেন। মইনুল হোসেনকে নিয়ে পশ্চাতের গোলযোগেও তিনি অতিশয় বিরক্ত হয়েছিলেন। নূরে আলমের সেই ঐতিহাসিক বক্তৃতার পর তাঁর বিরক্তির মাত্রা পূর্ণতা পেল। তাঁকে বাকশাল গঠনে পূর্ণক্ষমতা অর্পণ করে যথাবিধি সদস্যবৃন্দ তাদের পবিত্র কর্তব্য সমাপন করলেন।

বাংলাদেশে একদলীয় শাসন ব্যবস্থা এবং একদলীয় রাজনীতির ভিত্তি স্থাপন করা হল আনুষ্ঠানিকভাবে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক বাকশাল গঠনের ঘোষণা দিয়ে। নতুন যাত্রা শুরু হল।

একদলীয় শাসনকে সাংবিধানিক রূপ দেওয়ার জন্য আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা গেল। অসুবিধা নেই। প্রবীণ আইনমন্ত্রী শ্রী মনোরঞ্জন ধর হাল ধরলেন। খন্দকার মোশতাকের ক্যাবিনেটেও আইনমন্ত্রী

রূপে বাকশাল প্রথা বিলোপের আইনটিও তাঁর সুযোগ্য হস্তেই রচিত হয়েছিল।

সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী সংসদে গৃহীত হল। সংসদে পাস হতেই নেতা আমাকে আদেশ করলেন, গৃহীত আইনটি এখনই রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদউল্লাহ্‌কে দিয়ে সই করিয়ে নিয়ে আয়।

তারপর সংসদের লবীতেই ব্যবস্থা করে নতুন রাষ্ট্রপতি হিসাবে তিনি শপথ নেবেন। চতুর্থ সংশোধনীতে কেবল একদলীয় বাকশাল প্রথার আইনই ছিল তা নয়, সেখানে একথাও সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করে দেওয়া হয়েছিল, এই আইনটি গৃহীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হবেন।

সারা দুনিয়ার সংবিধান ঘাঁটলে এ ধরনের নাম ধরে আইন প্রণয়নের দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া ভার হবে। রাজ-রাজড়া তাদের রাজকীয় ঘোষণায় কোন কোন সময় উত্তরাধিকার বা অন্য জটিল প্রশ্নে নাম উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আমরা বিষয়টিকে জরুরি বিধায় সংক্ষিপ্ত বিধান রচনা করে দিলাম। সংবিধানেই লিখে দিলাম—পরবর্তী রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু স্বয়ং। রাষ্ট্রপতির নির্বাচনের ঝামেলায় গেলাম না।

বাংলাদেশ যখন জন্ম নেয় তখন তাজউদ্দীন সাহেবও একই ব্যবস্থা করেছিলেন ভিন্ন আঙ্গিকে। আমরা গরু নই, তবুও সেই পানিই খেলাম। ঘোলা করে খেলাম। মাঝে পদ্মা, মেঘনা আর যমুনার অনেক স্রোত সমুদ্রে প্রবিষ্ট হয়েছে। দিনে দিনে জাতির কাছে আমাদের ঋণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

সে সময় মোহাম্মদউল্লাহ সাহেব ছিলেন দেশের রাষ্ট্রপতি। আওয়ামী লীগের দফতর সম্পাদক সল্পভাষী মোহাম্মদউল্লাহ পেশায় আইনজীবী হলেও, পেশায় সময় দিতে সক্ষম হননি। সুদক্ষ দাবারু মোহাম্মদউল্লাহকে বার লাইব্রেরীর খেলার ঘরে মাঝে মাঝে নিবিষ্ট মনে দাবা খেলতে দেখা যেত। ছ' দফা আন্দোলনের সময় একসঙ্গে কারাগারে ছিলাম। সেখানেই তখন তাঁর রাজরোগের সূচনা হওয়ায় শীঘ্র মুক্তি পেয়ে যান। পরে অবশ্য তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠেন। তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক আমার দীর্ঘদিনের এবং সেটি ছিল সুখদায়ক।

কিন্তু আজ দুঃখদায়ক কাজ করতে এসেছি। ফাইলটি তাঁর সম্মুখে ধরে বললাম, সই করুন। সই করার পর থেকে আপনি আর রাষ্ট্রপতি থাকবেন না।

ক্যাবিনেট সচিব তৌফিক এলাহী আমার সঙ্গে ছিলেন। বোধহয় মোহাম্মদউল্লাহ্ সাহেবের একটু সময়ের প্রয়োজন ছিল, কিন্তু আমি তাঁকে সে সময় দিতে পারলাম না।

আবার বললাম, সই করুন। সবাই অপেক্ষায় রয়েছে শপথ অনুষ্ঠানের জন্য।

তিনি একবার আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ক্ষীণ হেসে আইনটিতে স্বাক্ষর করে দিলেন।

ফাইল নিয়ে সচিব কক্ষের বাইরে যেতেই বললাম, চিন্তার কারণ নেই। বঙ্গবন্ধু আপনাকে জানাতে বলেছেন আপনাকে মন্ত্রী করা হবে।

তিনি বললেন, শাহ্ সাহেব, তাঁকে বলে আমাকে পূর্ণ অবসর দেওয়া যায় না? রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালনের পর মন্ত্রিত্ব করতে ভালো লাগবে না, ভালো দেখায়ও না।

কিন্তু তিনি কেবল মন্ত্রিত্বই নয়, পরবর্তীকালে একজন সাধারণ এমপি হিসাবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনিই ছিলেন সেই ভাগ্যবান ব্যক্তি যিনি ডেপুটি স্পিকার, স্পিকার, রাষ্ট্রপতি, মন্ত্রী, উপ-রাষ্ট্রপতি এবং এমপি হিসাবে ক্রমান্বয়ে কাজ করেছেন, দলও করেছেন প্রায় সবক'টি। ঠাট্টা করে বলতাম, আপনার শুধু দারোগা হওয়া বাকি আছে!

দ্রুত গাড়ি চালিয়ে সংসদ ভবনে পৌঁছলাম। নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলাম শপথ অনুষ্ঠানের সব আয়োজন সম্পন্ন করে রাখতে। সংসদের কর্মকর্তারা সকলে মিলে সংসদ লবী বা বারান্দাতেই সেই ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানটির যথাসম্ভব আয়োজন করেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই একদলীয় শাসন তথা বাকশালের প্রথম অভিযাত্রা শুরু হল জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হিসাবে শপথ গ্রহণের মাধ্যমে।

রাষ্ট্রপতির শপথের পর মন্ত্রিসভার শপথ অনুষ্ঠান আয়োজিত হল গণভবনের সম্মেলন কক্ষে। পূর্ব সন্ধ্যায় বঙ্গবন্ধু নিজ থেকেই বললেন, কি রে, পোশাক-পরিচ্ছদ সব ঠিক আছে তো? কাল শপথ অনুষ্ঠান।

আমি হৃষ্টচিত্তে ফিরে এলাম। আমার সম্মুখেই শীর্ষ দুই নেতা বঙ্গবন্ধু এবং সৈয়দ নজরুল ইসলাম সাহেব বলাবলি করছিলেন, চিফ হুইপ, তাঁর দায়িত্ব সফলতার সাথে পালন করেছে। এবার ওর প্রমোশন হওয়া দরকার।

এ দু'জনের উপরে আর কেউ নেই। তাছাড়া দীর্ঘদিন আমি বিশ্বস্ততার সাথেই আমাকে প্রদত্ত কর্তব্য সম্পন্ন করেছি, কোন ত্রুটি বা অভিযোগ উত্থাপিত হয়নি। স্বভাবত আমার ধারণা ছিল, এবার আমাকে ক্যাবিনেটে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। বঙ্গবন্ধুর সুস্পষ্ট ইঙ্গিতে মানসিক প্রস্তুতি নিয়েই শপথ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হলাম এবং শপথগ্রহণকারীদের সারিতে আসন গ্রহণ করলাম। জিল্লুর রহমান সাহেবেরও একই অবস্থা। যথাসময়ে ক্যাবিনেট সেক্রেটারি সকলকে শপথ গ্রহণের জন্য একটি করে নথি দিলেন। আমার পাশে উপবিষ্ট কোরবান সাহেবকেও দিলেন। কিন্তু আমাকে দিলেন না।

জিল্লুর রহমান সাহেবও সেই সারিতেই বসা—তাঁকেও দিলেন না। তাঁর জেলার অন্যতম সংসদ সদস্য এবং রাজনৈতিকভাবে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী জনাব আসাদউজ্জামান খানকে শপথের কাগজ দেওয়া হল। কোরবান সাহেব হেসে আমাকে বললেন, দোয়া কর, বঙ্গবন্ধু আমাকে মন্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করছেন।

তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে নিশ্চুপ হয়ে বসে রইলাম। জানি না জিল্লুর রহমানের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর এ বিষয়ে কোন কথা হয়েছিল কিনা! আমার সঙ্গে তিনি নিজে কথা বলেছেন এবং প্রকারান্তরে আমাকে শপথের জন্য প্রস্তুত হয়ে আসতে বলেছেন। তা হলে কি তাঁর বাড়ির খানা-টেবিলের আদি ও অকৃত্রিম নীতি নির্ধারণী বৈঠকে তাঁর প্রতিশ্রুতি বাতিল হয়ে গেল! বলতে দ্বিধা নেই—আশা ভঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই মন দুঃখভারাক্রান্ত হয়েছিল। তিনি যদি পূর্বে এ সম্বন্ধে কিছু না বলতেন কোন প্রতিক্রিয়া হত না।

বঙ্গবন্ধু শপথ গ্রহণ করালেন। শপথের পর বাইরে প্যান্ডেল স্থাপিত করে চা-চক্রের ব্যবস্থা আছে। সেখানে আর যেতে ইচ্ছা করল না। মাইক ম্যানকে গাড়ি ডেকে দিতে বললাম।

সে বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল। অনুষ্ঠান চলছে, চিফ হুইপ সাহেব চলে যাচ্ছেন কেন!

তাকে তাড়া দিতেই দেখি জিল্লুর রহমান সাহেবও মুখ কালো করে গাড়ির অপেক্ষা করছে। সেও চলে যাচ্ছে।

বাকশাল একমাত্র রাজনৈতিক দল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করল। অন্য সমস্ত দল নিষিদ্ধ হয়ে গেল। তাদের অফিসসমূহে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হল। সংবাদপত্রের ক্ষেত্রেও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হল। মাত্র গুটি-কয়েক সংবাদপত্র ব্যতীত সকল পত্রিকার অনুমতি প্রত্যাখ্যান করা হল।

বাকশাল কমিটিতে বঙ্গবন্ধু চেয়ারম্যান, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সেক্রেটারি জেনারেল। জিল্লুর রহমান, শেখ ফজলুল হক মণি, আবদুর রাজ্জাক, অধ্যাপক ইউসুফ আলী প্রমুখরা বিভিন্ন দায়িত্ব পেলেন। জনাব আতাউর রহমান খানসহ অনেক প্রধান নেতাই বাকশালের সদস্য হয়ে ধন্য হলেন। সেনাবাহিনীর তিন প্রধান, বিডিআর এবং পুলিশ প্রধানসহ অনেক সরকারি কর্মকর্তা এই রাজনৈতিক দলের সদস্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হলেন। দেখলাম আমার নামও রয়েছে যথাস্থানে।

ইতিহাস বিচার করতে গিয়ে শুধু বঙ্গবন্ধুকেই যদি সমালোচনা করা হয় তা হলে সমালোচনা পূর্ণতা পাবে না। আমরা না হয় তাঁর লোক, তাঁর সঙ্গেই আমাদের রাজনীতি দৃঢ়বন্ধনে আবদ্ধ। কিন্তু আতাউর রহমান খান সাহেবের মতো সর্বজন শ্রদ্ধেয় নেতার হারাবার কী ছিল! তিনি তো আন্তরিকভাবে বাকশাল পছন্দ করতেন না, একান্তে বলতেন বাঁকাশাল।

তিনি কেন সামান্য সদস্য পদের জন্য উদ্‌গ্রীব রইলেন! দলের সদস্য না হলে সংসদে সদস্য পদ চলে যায়। সাবেক মুখ্যমন্ত্রীর যদি সামান্য সদস্যপদ চলে যায়—কি আসে-যায়! এসব নেতার কী উচিত ছিল না বিবেকের দংশনে প্রতিবাদ করা! তা তাঁরা করেননি! জাতীয় নেতা হিসাবে যেখানে তাঁদের অবস্থান নেওয়া উচিত ছিল; তা করেননি। জাতীয় নেতার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার পরিচয় দিলেন। কিন্তু জেনারেল ওসমানী এবং ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন পেরেছিলেন। তাঁরা সেইদিন বাকশাল গঠনের প্রতিবাদ করে সংসদ সদস্যপদ থেকে পদত্যাগ করেছিলেন।

নূরে আলম সিদ্দিকীকে আমি কেবল ছোট ভাইয়ের মতোই জানি তা নয়, তার জন্য সত্যিকার স্নেহ পোষণ করি। সেও অস্বীকার করে বসেছিল, বাকশাল গঠনের আইন প্রণয়নে স্বাক্ষর দেবে না। শেখ ফজলুল হক মণিও আলমকে স্নেহের চোখে দেখত। সে এসে আমাকে বলল, ভাই, যে ভাবেই হোক আলমকে দিয়ে স্বাক্ষর করাতেই হবে। নচেৎ...।

সে আর কিছু খুলে বলতে চায় না। আমি তাকে নিয়েই নূরে আলমকে পাকড়াও করলাম। আমরা দু'জনই তাঁর অকৃত্রিম মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। অনেক বুঝাতেও যখন সে রাজি হতে চাচ্ছিল না, তখন মণি তাঁর উপর অনেকটা রাগান্বিত হয়েই আমাকে আড়ালে নিয়ে বলল, বঙ্গবন্ধুকে ও চেনে না। অনেক এমপি এ দুনিয়া থেকে চলে গেছে, ভুলে গেলে চলবে না। বঙ্গবন্ধু শোকবাণী দেবেন এবং পরিবারকে অর্থ সাহায্য পাঠিয়ে দেবেন, একজন না থাকলেও দেশ চলবে, কেবল তার স্ত্রী বিধবা হবে, সন্তানেরা এতিম হবে! আপনি ধরে নিয়ে যান, ওর পক্ষে ভুল করা ঠিক হবে না।

মণির কথার মর্মার্থ বুঝলাম। তাকে অনেক বুঝিয়ে সম্মত করালাম। বললাম, মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল ওসমানী এবং মানিক মিয়ার সন্তান যা করতে পারে, তুমি তা পার না। কাজেই স্বাক্ষর না করাটা হবে চরম বোকামি।

আলম আমার অনুরোধ ফেলতে পারল না।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও দুঃখভারাক্রান্ত মন নিয়ে সই করে দিয়ে এল।

দেশের প্রতিটি জেলায় একজন করে গভর্নর নিয়োগ দেওয়া হল। গঠন করা হল বাকশালের জেলা কমিটি। গভর্নর নিয়োগে যে তদবির হল—আমার মনে হয় না এত তদবির কখনও কোথাও হয়েছে। মুশকিল হচ্ছে বঙ্গবন্ধু তাঁর কর্মীদের সারা বাংলাদেশেই নামে চেনেন। অদ্ভুত তাঁর স্মরণশক্তি। তাঁকে যতই পক্ষে বা বিপক্ষে বলা হোক না কেন, তাঁর নিজস্ব একটা ধারণা রয়েছে। তবে মানুষমাত্রই ভুল করে। তিনিও মানুষ, ভ্রান্তির ঊর্ধ্বে নন। আর যদি চারপাশে থাকে একদল—তার ভাষায়, চাটুকার তা

হলে সত্যিকারের চিত্র সর্বক্ষেত্রে তাঁর কাছে পৌছে না। লোক বাছাই করতে ভুল হতে বাধ্য। দলে দলে কর্মী ও দলীয় সদস্যগণ ঢাকা চলে এল তদবির পার্টির দায়িত্ব নিয়ে। ঢাকায় কোন আবাসিক হোটেলে স্থান পাওয়া কষ্টসাধ্য। এমপিদের নিয়ে মন্ত্রীদের দ্বারে, মন্ত্রীদের সঙ্গে নিয়ে বঙ্গবন্ধুর দ্বারে ধর্ণার বিরাম নেই।

গণভবনে উন্মুক্ত পরিবেশে মাঠের মধ্যে বেতের চেয়ার পেতে তিনি বিকেলের দিকে অনেকটা ক্লান্ত হয়ে বসেন। হাতে একটা ছড়ি। পোষা কুকুরটিকে সেই ছড়ি দিয়ে মৃদু আঘাত করছেন প্রাণীটিকে ভালোবেসে। সে তা বুঝতে পেরে পায়ের সামনে বসে আনন্দে লেজ নাড়ায়। সেখানেও মানুষজনদের বিরাম নেই। এক এক দল আসছে। আর বঙ্গবন্ধুর পদধূলি নেওয়ার জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। প্রায়ই তাঁর পাশে বসে সমস্ত কাণ্ড উপভোগ করি। যে ছড়ি দিয়ে তিনি একটু পূর্বে কুকুরকে আদর করছিলেন, সেই ছড়িই কর্মীদের মাথায়-শরীরে ঠেকিয়ে সালামের উত্তরে দোয়া এবং স্নেহ দিচ্ছেন। পদধূলির জন্য আগ্রহের আতিশয্য দেখে বিরক্ত হয়ে একদিন বললেন, The more I see my people, more I love my dog. এই খ্যাতনামা উক্তিটি কার জানি। এও জানি, বঙ্গবন্ধুও কম দুঃখে একথা উচ্চারণ করেননি। কিন্তু একই ছড়ি দিয়ে কুকুর ও দলের কর্মীদের আদর করতে দেখে আমি অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকি। বঙ্গবন্ধুর একি পরিবর্তন!

কিছু কিছু ঘটনা আমার কাছে ঘোরের মতো অনুভূত হত। বঙ্গবন্ধু কি কাজের চাপে, মানুষের চাপে বা সর্বময় ক্ষমতার অমোঘ স্রোতে অবাস্তবতায় বিলীন হয়ে যাচ্ছেন, নাকি তাঁর মনে জন্ম নিয়েছে এমন অহমিকা যা প্রকারান্তরে মানুষকে বিভ্রান্ত করে এবং যার পরিণাম কখনও শুভ হয় না।

গণভবনে তাঁর কক্ষে এক সন্ধ্যায় বিদ্যুৎ চলে গেল। তখনও এদেশে চার্জ-লাইটের প্রচলন হয়নি। আমরা মোমবাতি বা ল্যাম্প আনার জন্য ডাকাডাকি করতেই তিনি বলে উঠলেন, এই বিদ্যুৎ, এক্ষুণি চলে আয়। আমি বলছি, চলে আয়।

নিবেদন করলাম, নেতা, কোন যান্ত্রিক কারণে বিদ্যুৎ বিভ্রাট ঘটেছে। আমাদের মতো ওটা নির্দেশ পেয়ে ছুটে আসবে না। অপেক্ষা করতে হবে। বাতি আনুক।

তিনি আবারও একই সুরে বললেন, আমি বলছি, এই লাইট চলে আয়। এখনি চলে আয়।

তিনি যদি হাস্যোচ্ছলে বলে থাকেন তা হলে ঠিক আছে। কিন্তু অন্য কোন অনুভূতি থেকে বলে থাকলে সমূহ ভয়ের কারণ রয়েছে। তিনি গণভবনের ভিতরে পুষ্করিণীতে নানা রঙের মাছ ছেড়ে ছিলেন। অবসর

পেলেই সেগুলো দেখতে যেতেন। পূর্বেই বলেছি, আমার কোন গুণের জন্য নয়, তিনি আমাকে অকারণেই অধিক স্নেহ করতেন এবং কাছাকাছি দেখতে ভালোবাসতেন। এক বিকেলে বললেন, আমার মাছ দেখেছিস?

বললাম, না লীডার, দেখা হয়নি।

তিনি বললেন, চল তোকে মাছ দেখাই।

সঙ্গে আরও কেউ কেউ ছিল। তিনি ঘাটের শেষপ্রান্তে নেমে ডাকলেন, এই মাছ, এদিকে আয়!

কে কার কথা শোনে। মাছ ডাকতে হলে কিছু খাবার ছিটিয়ে দিতে হয়। ভয়ে ভয়ে বললাম, লীডার শূন্য হাতে ডাকলে হবে না—ওরা ডাক শুনতে পায় না। কিছু খাদ্যদ্রব্য ছিটিয়ে দিতে হবে।

তিনি ছোটখাটো হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, আলবৎ আমার ডাক শুনতে হবে। এই মাছের বাচ্চারা, এদিকে আয়। আমি বলছি, এদিকে আয়।

অন্ধকার ঘনিয়ে আসছিল। তাঁর চেহারার সূক্ষ্ম পরিবর্তন খুব একটা দেখতে পাইনি।

সেদিন মাছ দেখা গেল না। তিনি দৃশ্যতই হতাশ হলেন। আমার হতাশা অধিকতর। নেতার হল কী? তিনি কী কোন স্নায়বিক চাপে ভুগছেন বা অন্য কিছু! চিন্তিত হই।

শারীরিক পরিশ্রমের কাজ বঙ্গবন্ধু করার প্রশ্নই আসে না। তবুও শরীরটাকে ঠিক রাখার জন্য খানিকটা হাঁটাচলা করার প্রয়োজন। চিকিৎসকরাও সেই মতোই পরামর্শ দিয়েছেন। ইদানীং শরীর একটু ভারি হয়ে উঠেছে। কিন্তু লম্বায় বড় বলে চওড়া চোখে পড়ে না। তিনি ঠিক করলেন প্রতিদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে গণভবনের আঙ্গিনায় পায়চারি করবেন। কিন্তু ইচ্ছে থাকলেও কাজটি সহজ নয়। সবসময়ই তিনি মানুষজন দ্বারা পরিবৃত্ত থাকেন। হাঁটার জন্য উঠে আসা হয় না। একদিন আমাকে ডেকে বললেন, আজ থেকে আমি একটি হণ্টন কমিটি বানালাম। তুই তার কনভেনর। তোর কাজ হল প্রতিদিন পাঁচটার সময় গণভবনে এসে আমার যত কাজই থাকুক, আমাকে জোর করে উঠিয়ে নিয়ে কমপক্ষে আধা ঘণ্টা হাঁটার ব্যবস্থা করবি। তারপর চা খেয়ে তোর ছুটি।

উপস্থিত সকলেই বলে উঠল, আমরাও থাকব। একসঙ্গে হাঁটা আনন্দদায়ক হবে।

আমি কিন্তু অসুবিধায় পড়ে গেলাম। বিকেলে আমার বাড়িতে মহা ধুমধামে ব্যাড্‌মিন্টন খেলা হয়। চারটায় শুরু হয়ে বাতি জ্বালিয়ে রাত পর্যন্ত খেলা চলে। নূরে আলম, আকমল, ওবায়েদ, রাজ্জাক সবাই আসেন। কোন সময় শেখ কামাল আসে। মিজান সাহেব আসে। ইউসুফ ভাই, সোহরাব ভাই নিয়মিত উপস্থিত। অন্য কর্মীরা তো আসেই। খেলাকে উপলক্ষ করে প্রায়ই

চা-টা খাওয়া হয়। বেশ জমজমাট ব্যবস্থা। বঙ্গবন্ধু যে না জানেন তা নয়, তবুও আর কাউকে না বলে তিনি আমাকেই নির্দেশ দিলেন, পালন করতেই হবে।

ব্যবস্থা করলাম প্রথমেই একটা গেম খেলে শরীর গরম করে হাঁটার জন্য বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে গণভবনের মাঠে নামব। তারপর হাঁটা শেষ হলে আবার এসে বাসার খেলায় যোগ দেব। তা-ই করতে হল। অসুবিধা বিশেষ হল না। প্রতিদিন নিয়মিত হাঁটাও হচ্ছে, বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে কথা থাকলে তাও বলা যাচ্ছে। কিন্তু হাঁটার পর মাঠে বসে আয়েস করে চা খেতে গিয়ে প্রায়ই বিলম্ব হয়ে যায়।

গণভবনে মাঝে মাঝে অত্যন্ত মুখরোচক খাবার তৈরি হয়। সেদিন হয়েছে আনারসের কেক, খেতে অতি উপাদেয়। সবার প্লেটে এক পিস করে দেওয়া হল। বঙ্গবন্ধু দেখলেন, আমি কেকটি বেশ পছন্দ করে খাচ্ছি। তিনি বেয়ারাকে হুকুম দিলেন, সবাইকে এক পিস দিয়েছিস, ঠিক আছে, কিন্তু হণ্টন কমিটির কনভেনর পদাধিকার বলে দুই পিস পেতে পারে। তাকে আরও এক পিস কেক দেওয়া হোক!

কমিটির কনভেনর হয়ে সেদিন থেকে ভালোই লাভ হয়েছিল—সকলে যা পায়, আমি পাই তার দ্বিগুণ। সময়টা সকলেরই ভালো কাটছিল। নিয়মিত হাঁটার ফলে তাঁরও উপকার হচ্ছিল। এই ব্যাপারে তাঁর আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি। যত কাজই থাক, যত লোকই থাক, দেশী কিঁবিদেশী, সবাইকে অপেক্ষায় রেখে তাঁকে জোর করে বের করে আনতাম। মুখে রাগ দেখালেও অন্তরে খুশি হয়ে উঠতেন। লোকজনকে বলতেন, এখন আর হবে না, আমার হণ্টন কমিটির কনভেনর এসে গেছে। সে একটি নাছোড়বান্দা, আমাকে উঠতেই হবে।

একটি বিষয় বুঝে উঠতে পারতাম না, বঙ্গবন্ধু আর দশ জনের চাইতে আমাকে বেশি ছাড়া কম ভালোবাসতেন না। সবসময় তার প্রমাণ পেয়েছি। আমি যেসব কথা বলে পার পেতাম, অন্য কেউ হলে তা হত না। ছাত্রাবস্থা থেকেই দেখেছি, কেবল স্নেহ-ভালোবাসাই নয়—বিশ্বাস করতেন মনপ্রাণ দিয়ে। তা না হলে পাকিস্তান আমলে সামরিক শাসনের মধ্যে তাঁর ছেপে আনা পূর্ববঙ্গ মুক্তি ফ্রন্টের লিফলেট জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রাতারাতি বিতরণ করতে পারতাম না। তিনিও তা ভরসা করে দিতে পারতেন না। এত বিশ্বস্ততা, এত ভালোবাসার পরও প্রাপ্তির যোগ আমার ভাগ্যে ছিল বিড়ম্বিত। ত্যাগ-তিতিক্ষায়, নির্যাতন-নিপীড়নে, জেল-জুলুমে, সভা-শোভাযাত্রায়, সংগ্রামে আর যুদ্ধে সর্বাগ্রে থেকেও পদ-পদবী বিতরণের ক্ষণে কেন যেন পশ্চাতে পড়ে যেতাম!

অতি বড় সুন্দরী না পায় ঘর, অতি বড় ঘরনী না পায় বর। কাজেই দুঃখ করে লাভ নেই। তাছাড়া বারংবার প্রমাণ পেয়েছি, আপনা মাংসে হরিণা বৈরী। দোষ দেব কাকে!

বাকশাল হয়ে গেছে। সারা দেশে একটিই দল। রাজনীতি করব কার সঙ্গে। নির্বাচন হলে আমরাই সিদ্ধান্ত নেব কে আমাদের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। ব্যবস্থাটি বেশ সুবিধার বলেই মনে হয়। আমরা এখানে-সেখানে বক্তৃতা করে বেড়াই, 'দেশে এল নতুন বাদ—মুজিববাদ, মুজিববাদ'।

খন্দকার ইলিয়াস সাহেব বিরাটাকারে বই লিখে ফেললেন মুজিববাদ নাম দিয়ে। বললেন, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, ধর্ম নিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদ সংবিধানের এই চারটি মূলমন্ত্রই হল মুজিববাদের চার স্তম্ভ। ওদের সুবিধা রয়েছে, কে কি বলল তাতে কিছু আসে-যায় না। প্রাপ্তিযোগ নিরবচ্ছিন্ন হলে আর কোন প্রশ্ন নেই। মুজিববাদই সই!

সিরাজুল আলম খান একদিন বলল, শেষ পর্যন্ত মুজিবকে বাদ দিয়ে মুজিববাদ!

অলক্ষ্যে বসে বিশ্ববিধাতা হয়ত হাসছেন। সিরাজের কথাই ফলে গেল। একদিন তিনি বাদ পড়ে গেলেন চিত্রগুপ্তের খাতা থেকে। সে কাহিনী যেমনি মর্মান্তিক, তেমনি হৃদয়বিদারক।

তারও পূর্বে কথা রয়েছে—রয়েছে অনেক স্মৃতি। দুঃখের সাগর পাড়ি দিতে হবে—ছিল না প্রস্তুতি। ছিল না অভিজ্ঞান। রক্তের সাগর বেয়ে এসেছিল স্বাধীনতা—সেই স্বাধীনতার স্থপতিকেই একদিন আপন রক্তে সেই ঋণ শোধ করতে হল।

ইতিহাস বারবার সাক্ষ্য দেয়, ইতিহাস থেকে কেউ শিক্ষা গ্রহণ করে না। সত্যকে ঘিরে দেওয়া হয় মিথ্যার বেড়াজালে। বাম রাজনীতির প্রবক্তারা একসময় কী বক্তৃতাই না করত! মুজিবের চামড়া দিয়ে ঢোল বানিয়ে তাঁর হাড় দিয়ে ডুগডুগি বাজাব। মুজিব নেই। আজ তাদের অনেকেই বড় আওয়ামী লীগার, মুজিবপন্থী। মন্ত্রী বা মন্ত্রীর পদমর্যাদায় তাদের বসিয়েছে নিহত বঙ্গবন্ধুরই তনয়া। ওদের আহাজারির পরিসীমা নেই।

ইতিহাস থেকে শিক্ষা এখানেও নেওয়া হল না। লাল শালুর রাজনীতিতে সিদ্ধহস্ত নেত্রী-নেতারা ভালো করেই জানেন শালুর নিচে যিনি সমাধিস্থ তিনি

শিন্নী খেতে আসবেন না। এখানে যা জুটবে তাদেরই ভোগে লাগবে। তাই লাল শালু অমর হোক। লাল শালু যুগ যুগ জিয়ো।

শেখ কামালের বিয়ে হবে। দেশের প্রখ্যাত মহিলা দৌড়বিদ সুলতানা খুকির সঙ্গে ঠিক হল বিয়ে। সকলের ধারণা খেলাধুলার অঙ্গনে পরিচয় এবং সেখান থেকেই পরিণয়ের সূত্রপাত। বঙ্গবন্ধুও পছন্দ করলেন ভাবী-পুত্রবধূকে। সাড়ম্বরে ব্যবস্থা হল এই রাজকীয় বিবাহ অনুষ্ঠানের। আমরা বরযাত্রীতে শামিল হব এটাই স্বাভাবিক। বিবাহ বাসর অফিসার্স ক্লাব, মিন্টো রোড সংলগ্ন। ভাবলাম, অফিসার্স ক্লাবেই গিয়ে উপস্থিত হব। কেন জানি না বঙ্গবন্ধু আমাকে বললেন, তুই ধানমন্ডিতে আমার বাসায় আগেই চলে আসিস।

তা-ই করলাম। বঙ্গবন্ধু যখন তাঁর নিত্যদিনের পোশাক পরিধান করে নিচে নেমে এলেন, ভাবী এসে বাধা দিলেন, আজকের দিনে কালো কোর্ট পড়তে দেব না।

তিনি আপত্তি করেই ক্ষান্ত হলেন না। বঙ্গবন্ধুর দেহ থেকে মুজিব কোর্ট নিজহস্তে খুলে নিলেন। বঙ্গবন্ধু বললেন, ওটা খুলে নিলে আমার মনে হয় আমি কাপড়ই পরিনি।

ফার্স্ট লেডি, যদিও তাঁকে ফার্স্ট লেডি ডাকলে রাগ করতেন, বললেন, জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিয়েতে তোমাকে শোকের রঙের কোট আমি পড়তে দেব না। আমি বিকল্প ব্যবস্থা করে রেখেছি—এই বলে তিনি ঘিয়ে রঙের একটি সুন্দর মুজিব কোট বের করে দিলেন। বললেন, আজকের দিনের জন্য এই কোটটি আমি তৈরি করিয়ে এনেছি।

হাসিমুখে তিনি ভাবীর দেওয়া নতুন কোট পরিধান করলেন। আমি ফোড়ন কাটতে ছাড়লাম না। ভাবীকে বললাম, আজ না হয় অন্য রঙ ধরিয়ে দিলেন, কিন্তু নেতা যে সবসময় শোকের রঙই পড়ে থাকেন—তার কী বিহিত ভাবী?

তিনি বললেন, আমি অতশত বুঝি না, কামালের বিয়েতে কালো কোট চলবে না—এটুকুই বুঝি।

নেতাকে বললাম, আমি অফিসার্স ক্লাবে চলে যাই। সেখানে আপনাকে রিসিভ করব।

তিনি হাসিমুখে বললেন, সেখানে আমাকে রিসিভ করার লোকের অভাব নেই। তুই আমার সঙ্গে যাবি।

তা-ই গেলাম। অফিসার্স ক্লাবে তিল ধারণের স্থান নেই। বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিয়ে বলে কথা! কনেও সকলের পরিচিতা। দু'পক্ষ থেকে কত যে লোক এসেছে, তার হিসাব নেই। বরযাত্রী আর কন্যাযাত্রী মিলে-মিশে একাকার। খাবারের আয়োজন হয়ত ভালোই ছিল। কিন্তু অকুস্থলে পৌঁছে

একটি শূন্য আসন দখল করা বেশ প্রয়াসসাধ্য। অনেকেই সস্ত্রীক এসেছেন এবং বেকুব বনে দাঁড়িয়ে আছেন। ভিড়ের ডামাডোলে একসময় চলে এসে বাড়িতে যা জুটল তা-ই দিয়ে নৈশভোজ সারলাম।

বৌ-ভাতে নেতাকে বললাম, আপনার বেয়াইয়ের আয়োজিত খাবার ভাগ্যে জোটেনি! আজ তা সুদে-আসলে ওয়াশিল করব।

ভিআইপিদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থাধীনেই আয়োজন ছিল। গণভবনে আয়োজিত এটি ছিল একটি সুবিশাল ও সুশৃঙ্খল অনুষ্ঠান।

দু'দিন পর পুনরায় গণভবন থেকে আমন্ত্রণ পেলাম বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় পুত্র শেখ জামালের বিয়েতে। বঙ্গবন্ধুর ভগ্নিপতি যুগ্মসচিব পদে দ্রুত পদোন্নতিপ্রাপ্ত জনাব সৈয়দ হোসেন সাহেবের কন্যা রোজীর সঙ্গে জামালের বিয়ে হঠাৎ করেই স্থির হয়েছে।

গণভবনের দ্বিতলে ভিআইপিদের বসার ঘরে ঢুকে দেখি প্রায় সকলেই উপস্থিত। বঙ্গবন্ধুও আছেন। পাইপ হাতে হাসিমুখে সকলের সঙ্গে আলাপ করছেন। সময়োচিত দু'-একটা কথা সাহস করে বলার একটা বদভ্যাস আমার ছিল এবং আছে। ঘরে ঢুকে বঙ্গবন্ধুকে জিজ্ঞেস করলাম, লীডার, ব্যাপার কী? এত স্বল্প ব্যবধানে দুই ছেলের বিয়ে?

তিনি বিন্দুমাত্র চিন্তা না করেই বলে উঠলেন, আমার হাতে সময় বেশি নেই, তাই দায়িত্ব সমাধা করে যাচ্ছি।

কথাগুলো তিনি হাসিমুখেই বললেন এবং কোন চিন্তা না করেই বললেন! কিন্তু এক অমোঘ সত্য সেদিন তাঁর মুখ থেকে অবলীলায় নিঃসৃত হয়েছিল। একটু পরেই সদ্য-বিবাহিতা জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ সুলতানা কামাল, সদ্য বিবাহিতা রোজী জামালকে নিয়ে ঘরে ঢুকল মুরব্বীদের আনুষ্ঠানিক সালাম জানাতে। সুলতানা কামালের হাতের মেহেদির রঙ তখনও টাটকা, নববধূর সলজ্জ নম্রতায় সে হাত ধরে আরেক নববধূ রোজী জামালকে নিয়ে এসে জ্যেষ্ঠের কর্তব্য সম্পন্ন করল। বঙ্গবন্ধু হাসিমুখে বললেন, আমার বড় বউ আর কনে বউ হয়ে বসে থাকার সুযোগ পেল না। তাকে আর এক বধূ বরণে অগ্রণী হতে হল।

বঙ্গবন্ধুর বলা কথাটি ভাবতে ভাবতে বাসায় ফিরলাম।

এর মধ্যে একটি দুঃখজনক ঘটনা ঘটে গেল। ছাত্রজীবন থেকে আমার অকৃত্রিম বন্ধু, অমিততেজা মুক্তিযোদ্ধা এবং বরিশাল জেলার আওয়ামী

লীগের সংগঠক এবং অবিসম্বাদিত নেতা নুরুল ইসলাম মঞ্জুর ছিল বঙ্গবন্ধুর ক্যাবিনেটে যোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী। অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে সে তার দায়িত্ব পালন করছিল। কিন্তু অকস্মাৎ শোনা গেল সে প্রচুর দুর্নীতি করেছে। প্রকৃত ঘটনা হল, বরিশালের আওয়ামী লীগে অন্যান্য জেলার মতোই দুটি স্রোত বিরাজ করছিল। আদি স্রোত মঞ্জুর নেতৃত্বাধীন। দ্বিতীয় স্রোত অধুনা ন্যাপ থেকে এসে বঙ্গবন্ধুর ভগ্নিপতি হওয়ার সুবাদে জাঁকিয়ে বসা জনাব আবদুর রব সেরনিয়াবাত ও তাঁর পরিবারের নিয়ন্ত্রিত। তারা এসে বঙ্গবন্ধুকে নানা অভিযোগ করল মঞ্জুর বিরুদ্ধে। মঞ্জু নিজে ছিল একজন আইনজীবী এবং তার স্ত্রী একজন বিশিষ্ট চিকিৎসক। তাদের মিলিত আয়ে মঞ্জুর পারিবারিক সচ্ছলতার কথা সকলেই জ্ঞাত ছিল। সেরনিয়াবাতের জ্যেষ্ঠ পুত্র, আজকে যে চিফ হুইপ, সেই আবুল হাসনাত বঙ্গবন্ধুর ভাগ্নে, শুধু তা-ই নয়, বরিশাল শহরে অপরিসীম ক্ষমতাধর। মঞ্জুর অনুপস্থিতিতে যে তাঁর ওকালতির চেম্বারে বসত, মঞ্জুর পক্ষে যে সংসদ সদস্যের করণীয় কাজগুলো দেখাশুনা করত, জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক, মঞ্জুর অনুজপ্রতিম অ্যাডভোকেট সরদার জালালউদ্দীনকে তার চেম্বারে নৃশংসভাবে হত্যা করা হল। সে হত্যাকাণ্ডের বিচার হল না। কোন হত্যাকাণ্ডেরই বিচার হয়নি। হাসনাতের সম্বন্ধে অনেক কথাই শোনা যায়।

মামা বাড়িতে আবদার হল, মঞ্জুরকে বরখাস্ত করতে হবে।

বঙ্গবন্ধুর দীর্ঘদিনের কর্মী মঞ্জুর। তাঁকে কিছুমাত্র জিজ্ঞাসাবাদ না করে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে তিনি মঞ্জুরকে অপসারণ করলেন সম্ভবত '৭৫-এর জুলাই মাসের তৃতীয় সপ্তাহে—যেদিন খাজা বাবার পরম ভক্ত মঞ্জুর আজমীর শরিফ থেকে ঢাকা ফিরে আসে সেই দিন।

খবর শুনে আমাদের মন ব্যথায় ভরে উঠল। অভিমানী মঞ্জুর সপরিবারে সঙ্গে সঙ্গে সরকারি বাসভবন পরিত্যাগ করে চলে গেল লালমাটিয়াতে তার এক আত্মীয়ের বাসায়। গরীবে নেওয়াজ হযরত খাজা মঈনউদ্দীন চিশ্‌তি (রঃ)-র পরম ভক্ত মঞ্জুর কেবল বলল, আমি বাবার দরবার থেকে ফিরেই এই আদেশ পেলাম! আল্লাহ্ আছেন। তিনি সবই দেখছেন। আমি তাঁর উপরই নির্ভর করতে চাই।

সান্ত্বনার একটি কথাও মুখ থেকে বের হল না। নিঃশব্দেই বিদায় নিলাম।

কিছুদিন থেকে প্রায়ই একটা দুঃস্বপ্ন দেখতাম। দেখতাম, কাতারে কাতারে মানুষ আমাদের বাড়ি-ঘর জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দিতে ছুটে আসছে আর আমরা কেবল আত্মরক্ষার চেষ্টারত। স্বপ্নের কোন বিশ্লেষণ নেই। নেই কোন কার্যকারণ। যখন দেখতাম, ঘুমের ঘোরে যন্ত্রণা ভোগ করতাম। জেগে উঠেই সব ভুলে যেতাম। কদাচিৎ মনে পড়লেও স্বপ্ন নিয়ে বিলাসিতার মন ছিল না।

১৫ই অগাস্ট বঙ্গবন্ধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রোগ্রাম করেছেন—তার আয়োজন চলছে দীর্ঘদিন ধরে। একসময় ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলাম। আমাকে উপস্থিত থাকতেই হবে। তাছাড়া প্রটোকল দাবি করত, রাষ্ট্রপতি কোন পাবলিক প্রোগ্রামে উপস্থিত হলে আমাদেরকে সেসবে অবশ্যই উপস্থিত থাকতে হবে। চৌদ্দ তারিখ দিনভর আমার সফরসূচি ছিল আমার নির্বাচনী এলাকায়। সারাদিনে বেশ কয়েকটি সভা-সমাবেশে কথা বলেছি। চারদিক প্রকম্পিত করে স্লোগান উঠেছে, 'এক নেতা, এক দেশ, বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ। দেশে এল নতুন বাদ—মুজিববাদ মুজিববাদ।' সমস্ত দিনব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি সমাপনান্তে ঢাকা রওয়ানা হলাম সন্ধ্যার পর। যত রাতই হোক, ঢাকা পৌঁছতে হবে। কেননা, সকালে বঙ্গবন্ধুর প্রোগ্রাম রয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখানে অবশ্যই যোগদান করতে হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মুজিববাদী ছাত্রলীগ ব্যতীত জাসদপন্থী ছাত্রলীগও সক্রিয় ছিল। তাদের অবস্থান ছিল সরকার বিরোধী তথা বঙ্গবন্ধু বিরোধী। আরও শোনা গিয়েছিল, ছাত্রলীগের নেতৃত্বে ছাত্রসমাজ, যার নিয়ন্ত্রণে সেই মুহূর্তে শেখ কামালের ভূমিকা অবিস্মরণীয়, দাবি করবে বঙ্গবন্ধু আজীবন দেশের রাষ্ট্রপতি থাকবেন এবং এই মর্মে ঘোষণা দিতে তাঁকে বাধ্য করা হবে। বঙ্গবন্ধু প্রথম অস্বীকৃতি জানাবেন। উত্তরোত্তর ছাত্রদের দাবি প্রবলতর হবে। এক পর্যায়ে সে দুর্বার দাবির সঙ্গে কিছু অস্ত্রবাজির মহড়াও অনুষ্ঠিত হবে এবং উপায়ান্তর না পেয়ে শেষ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু তাদের দাবি মেনে নিতে বাধ্য হবেন। ঘোষণা দেবেন, তিনি আজীবন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি থাকবেন। চতুর্থ সংশোধনীর মতোই আর একটি সংশোধনী এনে আমরা পরে সেই ঘোষণাকে সংবিধানের অংশে পরিণত করে গৌরাবান্বিত বোধ করব।

বস্তুত বঙ্গবন্ধু ঘোষণা না দিয়েও আজীবন দেশের রাষ্ট্রপতি ছিলেন।

অনেক রাতে ঢাকা ফিরে শান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছি। অতি প্রত্যুষে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল স্লোগানের আওয়াজে। সে স্লোগান দিচ্ছে ট্রাকে আরোহী সেনাবাহিনীর লোকজন। 'নারায়ে তকবির, আল্লাহ্ আকবর। বাংলাদেশ জিন্দাবাদ' প্রভৃতি নতুন ধারার স্লোগান শুনে হকচকিয়ে গেলাম। কেউ একজন টেলিফোনে রেডিও খুলতে বলল। রেডিও খুলতেই সেই ভয়াবহ সংবাদটি ভেসে এলো মেজর ডালিমের কণ্ঠ থেকে। মেজর ডালিমের ঘোষণায় মনে হল কেয়ামত এসে গেছে। বাঁচার আর রাস্তা নেই। বাজ পড়লে মানুষ যেমন স্তব্ধ হয়ে যায়, তেমনই হয়ে গেলাম বঙ্গবন্ধুকে হত্যার কথা যখন শুনলাম। অনুভূতি ফিরে এলে প্রথম মনে হল বঙ্গবন্ধুকে যারা হত্যা করেছে, তারা

আমাকেও ছাড়বে না। চতুর্থ সংশোধনী সংসদে পাস করানো, বঙ্গভবনে গিয়ে রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষর নিয়ে এসে বঙ্গবন্ধুর শপথ অনুষ্ঠানের আয়োজন ছাড়াও তাঁর প্রতিটি কাজে আমি ছিলাম অকৃত্রিম দোসর।

আজ স্বীকার করতে দ্বিধা বা সঙ্কোচ নেই, প্রাণের ভয়ে যারপরনাই ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়লাম। স্বাভাবিক চিন্তার ক্ষমতা লুপ্ত হল। নেতাকে মেরেছে। আমাকেও মারবে—এই ধারণাই বদ্ধমূল হল। অত প্রত্যুষে ড্রাইভার, গাড়ি কিছুই নেই। স্তম্ভিত হতবাক সালেহাকে বললাম, আজিজকে টেলিফোন করে আমাকে এসে নিয়ে যেতে বলো।

একথা বলেই ছুটলাম টয়লেটে। আমি বারবার দেখেছি হঠাৎ কোন নিদারুণ প্রাণের ভয় যখন আমাকে গ্রাস করে, আমার তখন বড় বাথরুমের বেগ হয়। ভারমুক্ত না হয়ে কিছুই চিন্তা করতে পারি না। টয়লেট থেকে বের হয়েই আমি আজিজের টেলিফোন পেলাম—সে আসার চেষ্টা করেছিল, পথে ট্যাঙ্ক বাহিনীর সামনে পড়ে ফিরে গেছে। তখন শহরে কারফিউ—আসার কোন সম্ভাবনা নেই। সে বলল, আপাতত এক নম্বর মিন্টু রোডে ডা. বি. করিম সাহেবের বাসায় গিয়ে লুকিয়ে থাক। পরে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা যাবে।

ডালিমের ঘোষণা বারবার রেডিওতে ভেসে আসছিল। আমি উপায়ান্তর না দেখে ডা. বি. করিম সাহেবের বাসায় আশ্রয় নিলাম। ডা. বি. করিম সাহেব আজ দুনিয়াতে নেই। এই সেদিন সকলকে শোক-সাগরে ভাসিয়ে তিনি পরলোক গমন করলেন। তাঁর ছেলে-মেয়ের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠা ডা. নিলুফার করিম বুলবুল ঢাকাতেই বসবাস করে। অন্য কন্যা এবং পুত্রদ্বয় এখন বিদেশে রয়েছে। দেবতুল্য চরিত্রের মানুষ ডা. করিম সেদিন আমাকে পরম সমাদরে তাঁর ঘরে স্থান দিলেন। তিনিও বঙ্গবন্ধুর ভক্ত। তাঁর বুকে মাথা রেখে প্রথম ডুকরে কেঁদে উঠলাম। তিনি ছিলেন সম্পর্কে আমার মামা।

সেখানে রেডিওতে শুনলাম খন্দকার মোশতাক আহমেদ রাষ্ট্রপতি হিসাবে শপথ গ্রহণ করেছেন এবং পরপর শুনলাম সেনাবাহিনীর তিন প্রধান, বিডিআর প্রধান, পুলিশ প্রধান সকলেই একে-একে রেডিওতে গিয়ে নতুন সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছে। দ্বিপ্রহর পর্যন্ত অন্য আর নতুন কোন দুর্ঘটনার কথা শোনা গেল না। সেনা প্রধানগণ এবং অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহের প্রধানগণের আনুগত্যের ঘোষণা দেওয়ার পর ক্রমান্বয়ে সবকিছু পূর্ববৎ স্বাভাবিকতা ফিরে পেতে শুরু করল। বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর পরিবারের সদস্যগণ, তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা শেখ নাছির, সেরনিয়াবাত ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা এবং সস্ত্রীক শেখ মণিকে তারা হত্যা করেছে। বাংলাদেশের কোন

নাগরিক বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করতে পারে এ যে কোন ক্রমেই কল্পনায় আসে না। এরা কারা সদম্ভে ঘোষণা করছে—জাতির পিতাকে সপরিবারে আত্মীয়বর্গসহ হত্যা করেছে। তারা নিজেদের পরিচয়ও গর্বের সঙ্গেই দুনিয়ার কাছে তুলে ধরছে। তিন সেনাপ্রধান ও অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহের তাৎক্ষণিক আনুগত্যের ফলে তখন সকলেই ধারণা করল, এটা একটা সামরিক অভ্যুত্থান বা 'কু'। রক্ষীবাহিনীর নিয়ন্ত্রণকারী বঙ্গবন্ধুর ডানহাতস্বরূপ রাজনৈতিক ব্যক্তিটিও নিশ্চুপ। ডা. বি. করিমের বাসা থেকে টেলিফোনে প্রায় কাউকেই যোগাযোগ করতে না পেরে বাসায় ফিরে এলাম। লাল টেলিফোনে মন্ত্রীদের সঙ্গে যোগাযোগের বহু চেষ্টা করলাম। অনেক বাসায় ফোন ধরে না। যেখানে টেলিফোন কেউ ধরে, সেখান থেকে জবাব আসে, সাহেব বাসায় নেই!

বাসায় বসে নিশ্চুপ বিলাপ করা ছাড়া আর কিছু করার ছিল না। বিকেলে বঙ্গভবন থেকে টেলিফোন এল, বাসায় থাকবেন, লোক গাড়ি নিয়ে যাবে এবং আপনাকে নিয়ে আসবে। কে টেলিফোন করেছে বোধগম্য হল না। নিয়তির কাছে আত্মসমর্পণ করে বসে রইলাম। কিছুক্ষণ পর গাড়ি এল নিয়ে যেতে। সালেহা, রানা এবং অন্যান্য সবাই পাগলের মতো কাঁদতে থাকল। ইকবাল এবং মোস্তফা বলল, আমাদেরকে সাথে নিতে হবে। যদি মেরেই ফেলে, লাশটা অন্তত নিয়ে আসতে পারব। কথা শুনে ওরা বিরক্ত হল, কিন্তু ওদেরকে জায়গা দিল। বাড়িতে যে কাপড় পরা ছিল, আধ-ময়লা পাজামা-পাঞ্জাবি তা-ই পরেই চললাম। না জানি কী হয়!

ওরা ওবায়দুর রহমান এবং নূরুল ইসলাম মঞ্জুরকেও একই গাড়িতে তুলে নিয়ে বঙ্গভবনে পৌছাল। সেখানে অপরিচিত কেউ আমাদেরকে একটি ঘরে নিয়ে গেল। দেখলাম আওয়ামী লীগের আমাদের সিনিয়ররা, মন্ত্রীরা প্রায় সবাই আছেন। শ্রী মনোরঞ্জন ধর, শ্রী ফণীভূষণ মজুমদার, অধ্যাপক ইউসুফ আলী, সোহরাব হোসেন, আবদুল মান্নান, আবদুল মমিন, মোজাফফর আহমেদ চৌধুরী, এ. আর. মল্লিক, দেওয়ান ফরিদ গাজী, ক্ষিতিশচন্দ্র মণ্ডল, নূরুল ইসলাম চৌধুরী, তাহেরউদ্দীন ঠাকুর, আলতাফ হোসেনসহ প্রায় সকলেই উপস্থিত। নতুন মুখ কেবল খুলনার মমিনউদ্দীন সাহেব এবং মোশতাকের ভায়রা বরিশালের আবদুল মালেক।

শুনলাম মন্ত্রীদের শপথ গ্রহণ করা হবে। ক্যাবিনেট সেক্রেটারি একটা নথি ধরিয়ে দিলেন। দেখলাম প্রতিমন্ত্রীরূপে আমাকেও শপথ নিতে হবে। খাজা বাবার দরবার জেয়ারত করে ফিরে এলে মঞ্জুরকে অপসারিত করা হয় আত্মীয়তোষণ করার জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্ত হিসাবে। মঞ্জুর সেদিন ধৈর্য ধরেছিল। বলেছিল, আমি আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করে রইলাম। আল্লাহ্‌

তা'আলা তাকে তিন সপ্তাহের মাথায় পুনর্বহাল করল। অবশ্য একটি দফতর কমে যাওয়ায় সে অসন্তুষ্ট হল। যোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী হিসাবে রেল ও যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের শুধু রেল রইল। আমিও অসন্তুষ্ট ছিলাম। কিন্তু প্রতিবাদ করব কার কাছে! কেউ উচ্চবাচ্য করছে না। হলের অভ্যন্তরে এবং বাইরে বোধহয় তারাই রয়েছে যারা আজ এতবড় দুর্ঘটনা ঘটিয়েছে। বঙ্গবন্ধুকে মেরে তাঁর লাশ তারা সিঁড়িতে ফেলে রেখেছে। কার ঘাড়ে কয়টা মাথা যে কথা বলবে! আমি ছিলাম চিফ হুইপ। আমার প্রটোকল ছিল অনবদ্য। বঙ্গবন্ধু নিজে ঠিক করে দিয়েছিলেন মন্ত্রীদের পরে। কিন্তু প্রতি মন্ত্রীদের উপরে চিফ হুইপের অবস্থান। আজ একজন প্রতিমন্ত্রী হিসাবে আমার ডিমোশন হচ্ছে। জনাব নুরুল ইসলাম চৌধুরীর নাম প্রতিমন্ত্রীদের তালিকায় এক নম্বরে, পরে আমার নাম।

কাকে অভিযোগ করব! ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি। মোশতাক সাহেব এলে যথারীতি শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান সমাপ্ত হল। শপথের পর প্রেসিডেন্টের কক্ষে সব মন্ত্রীদের নিয়ে যাওয়া হল। প্রবীণদের পশ্চাতে ভয়ে ভয়ে আমরাও ঘরে ঢুকে চুপচাপ আসন গ্রহণ করলাম।

সেনাবাহিনীর কয়েকজন অপরিচিত অফিসার সে ঘরে রয়েছে। কারো কারো হাতে কী সব অস্ত্র! ঢোক গিলতেও ভয় হচ্ছে।

প্রেসিডেন্ট মোশতাক নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন। বললেন, যা ঘটেছে আপনারা সব শুনেছেন। জাতির এই ক্রান্তিলগ্নে আমাকে দায়িত্ব নিতে হয়েছে। শেখ মুজিব ছিলেন দেশের রাষ্ট্রপতি—তাঁর মরদেহ বাসস্থানে পড়ে রয়েছে—আমি মনে করি যথাযোগ্য মর্যাদায় তাঁর পিতা-মাতার কবরের পাশে গোপালগঞ্জে স্বগ্রামের বাড়িতে তাঁকে সমাহিত করা হোক। আপনারা যদি কেউ মরদেহের সঙ্গে যেতে চান, যেতে পারেন।

এদিক থেকে কেউ উচ্চবাচ্য করল না। সেনা কর্মকর্তাদের একজন বলে উঠল, আমরা তাঁকে বিশ্বাসঘাতক হিসাবে হত্যা করেছি। আর এক্ষণে আপনি তাঁকে মর্যাদার সঙ্গে দাফন করতে চান—এটা কেমন কথা! এ হতে পারে না।

মোশতাককে কোন দিনই বিশেষ পছন্দ করতাম না। কিন্তু সেই মুহূর্তে তাঁর ভূমিকা অপছন্দ করতে পারলাম না। তিনি ধমকের সুরে বললেন, Well, in that case you take over. If I am the president you have to carry out my orders.

তারা কিছুক্ষণ গাঁইগুঁই করে মোশতাক সাহেবের প্রস্তাব মেনে পরদিন বঙ্গবন্ধুর লাশ গোপালগঞ্জে নিয়ে গিয়ে সমাহিত করে এসেছিল। পরে শুনেছিলাম, সেনাবাহিনীর হেলিকপ্টার অবতরণ করলে ভীত গ্রামবাসী

উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে পালিয়ে গিয়েছিল। একজন মুন্সী শ্রেণীর লোককে ধরে এনে সৈন্যরা তাঁকে কবর দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিল।

একটা মহীরুহের পতন হল। একটা ইতিহাসের যবনিকা পড়ল।

প্রেসিডেন্ট মোশতাকের ঘর থেকে ছাড়া পেয়ে আমরা পড়িমরি করে বাসার দিকে ছুটলাম। ক্যাবিনেট মন্ত্রীদের গাড়িতে ফ্ল্যাগ উড়ছে। একসঙ্গে সব গাড়ি ফিরছে, দেখলাম কিছু কিছু লোক রাস্তায় দাঁড়িয়ে হাততালি দিয়ে আমাদেরকে উৎসাহিত করছে। কারফিউ জারি থাকলেও, তার কড়াকড়ি ছিল না। আজ যে যে কথাই বলুক, সেদিন ওটিই ছিল সত্য। এত বড় নিষ্ঠুর ঘটনা ঘটে গেল—মানুষ মন খুলে ইন্নালিল্লাহ্ পড়ছে বলে শোনা যায়নি। একদিন বঙ্গবন্ধুর জন্য ওরা রোজা রাখত, তাঁর কথায় হাসিমুখে লক্ষ লক্ষ মানুষ অকাতরে প্রাণ দিয়েছে, তাঁর কথায় উঠেছে-বসেছে এদেশের সর্বস্তরের মানুষ। আজ যন্ত্রণায় যন্ত্রণায় দিশেহারা সেই মানুষগুলোই নেতার মর্মান্তিক পরিণতিতে শোক প্রকাশ দূরের কথা, নতুন করে সরকারের অভিযাত্রাকে স্বাগত জানাচ্ছিল। ইতিহাস বড় নিষ্ঠুর।

ওরা যে ক'জনকে রাজনৈতিক কারণে, তা ভারত-প্রীতিই হোক বা অন্য কিছুই হোক এবং ওদের বিবেচনায় দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত বলে মনে করত তাদেরকেই মন্ত্রিসভায় গ্রহণ করেনি। বাকি সমস্তই আওয়ামী লীগের সদস্য।

কোরবান আলী সাহেব লুকিয়ে থেকেও বারবার আমার নিকট লোক পাঠাচ্ছিল, আমি যেন তাঁর মন্ত্রিত্বের পথে বাধা হয়ে না দাঁড়াই। তাঁর প্রেরিত লোককে বলতাম, কারো পক্ষে বা বিপক্ষে কিছুই করবার আমাদের কোন সুযোগ নেই—কেউ আমাদের মতামত আহ্বান করছে না, স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে কিছু বলার প্রশ্নই আসে না। কর্তাদের ইচ্ছায় কীর্তন। ছাত্রলীগের একসময়ের সভাপতি আবদুল মমিন তালুকদার কত বার যে ভাবীকে দিয়ে চিঠি পাঠালেন তাঁকে মন্ত্রিসভায় গ্রহণ করানোর চেষ্টা করার অনুরোধ জানিয়ে। ছাত্রজীবনে তিনি ছিলেন আমাদের নেতা। ভাবীকে বুঝালাম, আমাদের একটি কথা বলারও সুযোগ নেই। খন্দকার মোশতাক এবং তাঁকে ঘিরে যে সার্বক্ষণিক সেনা কর্মকর্তারা রয়েছে তারাই সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে—আমাদেরকে কিছুই জিজ্ঞেস করা হয় না। এখনও যে প্রাণে

বেঁচে আছি সেটাই যথেষ্ট। অনেকটা, 'ভিক্ষা চাই না মা, কুকুর সরাও' এর অবস্থা।

আজ অনেকেই অবস্থার আনুকূল্যে, সময়ের সুযোগ নিয়ে আমাদেরকে জিজ্ঞেস করে মোশতাকের মন্ত্রিসভায় গেলেন কেন? আমরা কী কারফিউ ভেঙে দৌড় মেরে বঙ্গভবনে চলে গিয়েছিলাম? আমরা তিন জন— ওবায়েদ, মঞ্জুর ও আমি ছিলাম বঙ্গভবনে নীত সর্বশেষ দলে। আমার হল পদাবনতি।

দোষ তবু আমাদেরই। যারা সকলের অগ্রভাগে ছিলেন, সিনিয়র ছিলেন, পূর্ণ ক্যাবিনেট মন্ত্রী ছিলেন, নতুন সংযোজিত ছিলেন বা পদোন্নতি পেয়েছিলেন—তাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই!

কেন নেই? তারা যে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে গেছে। তারা যে আবার আওয়ামী লীগে প্রত্যাবর্তন করেছে। তাদের সাত খুন মাফ! এই তিন জন ফিরে এল না কেন? তাদের বেঁধে কারাগারে নিক্ষেপ কর। বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলায় শত প্রচেষ্টা করেও সক্ষম হওনি—তাতে কী মি. কাহার! মি. হান্নান! জেল হত্যা মামলা রয়েছে না? ওটাতে ঢুকিয়ে দাও। ষড়যন্ত্রের ইল্‌জাম লাগিয়ে দাও। বুঝুক, How many paddy, how many rice. কত ধানে কত চাল বাছাধনরা টের পাবে। বক্তব্যটা কার? বঙ্গবন্ধু তনয়া, প্রতিহিংসা পরায়ণতার জ্বলন্ত অগ্নিশিখা স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর।

তাদের দোষ কী? তারা কী করেছে?

দোষ অনেক, তারা শপথ নিল কেন মোশতাক মন্ত্রিসভায়!

শপথ না নিলে তাদেরকে যদি হত্যা করা হত, তা হলে কি করতেন? বঙ্গবন্ধুর মতো বিরাট মহীরুহ তারা উপড়ে ফেলে দিল—আর এরা তো খরকুটোর শামিল! সপরিবারে যারা বঙ্গবন্ধুকে মারতে পারে, কথা না শুনলে যদি মেরে ফেলত!

বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পর সর্বাগ্রে রেডিওতে কারা গিয়েছিল আনুগত্য জানাতে?

ধরে নিয়ে গিয়েছিল, তাই যেতে বাধ্য হয়েছিল।

আচ্ছা! তা-ই নাকি? তাঁরা ছিলেন সেনাবাহিনীর প্রধান। এত সৈন্য-সামন্ত আর কামান, গোলা, বারুদ, অস্ত্রশস্ত্রের মালিকদেরকে ওরা ইঁদুরের বাচ্চার মতো খপ্ করে ধরে নিয়ে গেল! রুখে দাঁড়ানো বা প্রতিরোধ তো দূরের কথা, টু শব্দটি পর্যন্ত করলেন না! আবার নির্লজ্জের মতো কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছে—এ তিন জনকে খুব সক্রিয় দেখেছি। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ কাপুরুষ সেনাপ্রধানগণ গলায় ঝুলাবার মতো দড়িও কি বাজারে দুর্মূল্য হয়ে গিয়েছিল?

অস্ত্র-সজ্জিত সেনাপতিরা গেল তল। নিরস্ত্র, অসহায় ও নেতৃত্বহীন এরা

ক'জন বলবে হাঁটু জল! বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলায় সাক্ষী দিতে গিয়ে মোশতাকের সেনাপ্রধান এবং তাঁরই দেওয়া প্রমোশনপ্রাপ্ত শফিউল্লাহ্ কি করে নির্লজ্জ মিথ্যা বলতে এতটুকু দ্বিধা করলেন না! মোশতাকের শপথে আমরা নাকি উপস্থিত ছিলাম! সমস্ত কাগজের আলোকচিত্র, ক্যামেরার ছবি, টিভির ধারণকৃত ফিল্ম এবং বঙ্গভবনের কর্মকর্তাগণ ও সকল রেকর্ড প্রমাণ দেবে—আমরা সেখানে থাকার প্রশ্নই আসে না। বঙ্গভবনে আমাদের নিয়ে যাওয়া হয় বিকেলে। মুরব্বীকে খুশি করানোর মানসে সাবেক সেনাপ্রধান বর্তমান আওয়ামী লীগ সংসদ সদস্য নির্লজ্জ মিথ্যাচার করে গেল। আওয়ামী লীগে না থাকলে, সংসদ সদস্য না হলে, মুরব্বীকে তুষ্ট করতে না পারলে কর্তব্য অবহেলা, সংবিধান লঙ্ঘন এবং হত্যাকারীদের সমর্থনের দায়ে যার কোর্ট মার্শাল হওয়া উচিত বলে সুধীজন মনে করেন—সেখানে কোর্টে দাঁড়িয়ে আর এক দফা মিথ্যা বলায় স্খলনের বোঝা কেবল বৃদ্ধিই পেল শফিউল্লাহ্র। একদিন সত্য অবশ্যই মিথ্যাকে বিতাড়িত করবে। সেদিন মিথ্যাচারের যথোপযুক্ত সাজা হবে।

প্রবাসী সাহিত্যিক আবদুল গাফফার চৌধুরীও কি পক্ষান্তরে এ বক্তব্যই দেননি? যাদের নিকট অস্ত্র রয়েছে, তারা নিশ্চুপ থাক, খুনীদের সাহায্য করুক, প্রশয় দিক। আর যাদের হাতে একটি ব্লেডও থাকার কথা নয়—তারা প্রতিরোধ গড়ে তুলুক! ঢাল-তলোয়ারহীন নিধিরাম সর্দারেরা বিদ্রোহ করুক, ওরা ওদের রাইফেল-কামানগুলোকে বিশ্রাম দিয়ে নিজেরা একটু সিয়েস্তা উপভোগ করুক।

পুলিশ প্রধান কি করেছিলেন? কি করেছিলেন বিডিআর-এর তৎকালীন প্রধান? আজ সেই পুলিশের কর্মকর্তা কাহার, হান্নান জিজ্ঞেস করে, তখন আপনারা রুখে দাঁড়ালেন না কেন?

উত্তরে বলি, তোমরা বাছাধনরা রুখে দাঁড়িয়েছিলে? না বশংবদের বশংবদ হয়ে নতুন সরকারের পদসেবায় মন-প্রাণ ঢেলে দিয়েছিলে! কই, বাংলাদেশের একটি প্রাণীও তো টু শব্দ করেনি। তোমরা তখন বলতে, সফল সামরিক অভ্যুত্থান হয়েছে। আজ চাকা উল্টে গেছে। তোমাদের স্বীকৃত ক্যু হয়ে গেল হত্যাকাণ্ড। বরাবর আমরা সেই কথা বলেছি এবং বিচার দাবি করেছি। নারকীয় জেল হত্যার শত নিন্দা আর বিচার দাবি করে আজ ওদের হাতেই জেল হত্যার ষড়যন্ত্রের দায়ে বন্দি। ভাগ্যের এমনি নির্মম পরিহাস!

কিন্তু চাকা যখন আবার উল্টাবে, তখন কী করবে ম্যাডামের টেলিফোন পেয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ানো সুদক্ষ পুলিশ কর্মকর্তা! তোমাদের সেদিনের প্রধানের কেন বিচার কর না সুনির্দিষ্ট কর্তব্য পালনে ব্যর্থতা, সাংবিধানিক দায়িত্ব অবহেলা এবং নিরাপত্তাহীনতাজনিত এসব হত্যাকাণ্ডের এবং আরও

সংঘটিত অসংখ্য হত্যাকাণ্ডের সহায়তার অভিযোগে? আপনি আচরি ধর্ম পরকে বলো।

সেনা গেল, বিডিআর গেল, পুলিশ গেল—সবাই গেল অতলে তলিয়ে। বঙ্গবন্ধুর নিজস্ব সৃষ্টি তাঁর স্বপ্নের সন্তান, তাঁর সাধের রক্ষীবাহিনীর কী হল? ওরা কোথায় গেল? ওরাও লক্ষ্মী ছেলের মতো সব মেনে নিল।

সবাই মেনে নিলে কি সেটা সফল অভ্যুত্থান হয়ে যায় না! একে সফল করতে সকলেরই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অবদান রয়ে গেল! শুনতাম রক্ষীবাহিনী নিয়ন্ত্রণ করে বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক সহচর। ঘটনার পর রক্ষীদের দফতরে বসেই তার সঙ্গে আলাচনা হল শফিউল্লাহ্‌র, তারা সিদ্ধান্ত নিল চুপ করে থাকাই বাঞ্ছনীয়।

আজ অনেক পরে, অনেক পুরনো সত্য কাহিনী বঙ্গবন্ধুর ভাগ্নী-জামাই আর বঙ্গবন্ধু কন্যার মন্ত্রীর বিবৃতি-পাল্টা বিবৃতিতে উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে। তা হলে সেই রাজনৈতিক দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয় না কেন? এবং তাকে মন্ত্রিত্বে রেখে বৃহৎ মন্ত্রণালয় দিয়ে পুরস্কৃত করা হয় কেন? তা হলে কী এই উপসংহারে উপনীত হওয়া বেঠিক হবে না যে, মোগল সম্রাট শাহ্‌জাহান তনয় আওরঙ্গজেব সঠিক ছিলেন। সিংহাসনের জন্যই সে তার সহোদর ভাইদের হত্যা করেছিল, পিতাকে করেছিল বন্দি!

এদের সাহায্য-সহযোগিতা না পেলে, পিতৃহীন না হলে, পদটি শূন্য হত না। লাল শালু নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে কেঁদে-কেটে একাকার করে এই মোক্ষম গদীটির দখল নিতে পারা যেত না।

তা-ই দেখা যায়, স্বাধীনতার স্বপ্নদ্রষ্টার কন্যার মনোনয়নে স্বাধীনতার বিরোধী যেমন মন্ত্রিসভায় আসন পায়, শান্তি কমিটির সদস্য যেমন মন্ত্রিত্ব বাগায়, তেমনি করে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডকে সমর্থন করে 'সূর্য সন্তান'দের কাজটিকে বীরত্বগাথায় অভিষিক্ত করে খ্যাতনামা দৈনিকে সম্পাদকীয় লিখে অন্য দলের হয়েও মন্ত্রিসভার গুরুত্বপূর্ণ পদে স্থান পায়। কৃতজ্ঞতায় যমুনা সেতু দ্বিতীয়বার উদ্বোধন করতে গিয়ে বঙ্গবন্ধুর শোকে কেঁদে আকুল হয়।

খেলা রাম খেলে যা।

ওদের কথা হল, নৌকায় নদী পাড়ি দিচ্ছিলেন, ঝড় উঠল, প্রধান মাঝি ঝড়ে নিহত হল। আপনাদের উচিত অন্য সমস্ত মাঝিরা মিলে নৌকাটিকে উল্টে দিয়ে ঝড়ের মধ্যে নিক্ষেপ করা এবং সমস্ত যাত্রীসহ প্রধান মাঝির ভাগ্য বরণ করা!

তা না করে, অন্যরা ভাবলেন, হাজার কেঁদেও আর নিহত মাঝিকে পাওয়া যাবে না। এখন আশুকর্তব্য আর একজন কেউ যদি হাল ধরে, তাকে সাহায্য করা। নৌকাটি ঝড়ের কবল থেকে রক্ষা করা এবং যাত্রীদের প্রাণ বাঁচানো।

তাদের বক্তব্য আপনারা যখন শুনলেন, বঙ্গবন্ধু নেই তখন তাঁর শোকে প্রাণ বিসর্জন করলেন না কেন?

কে জিজ্ঞেস করে? আপনি কি করেছেন? আমরা না হয় সরকারে গিয়ে মহা অপরাধ করে ফেলেছি। আমরা তো সরকারেই রয়েছি, সরকার কি আত্মহত্যা করে?

আপনারা তা করলেন না কেন? যখন শুনলেন, বাবা-মা-চাচা-ভাই-ভাবীদেরসহ সব আত্মীয়স্বজনকে হত্যা করা হয়েছে, তখন কী সেই অপরিসীম শোকে গলায় দড়ি বেঁধে আত্মহত্যা করা উচিত ছিল না? ছিল না কী শরীরে কেরোসিন ঢেলে দিয়ে অগ্নিসংযোগে আত্মবিসর্জন করে এই নারকীয় হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ করা! সারা বিশ্ব তাকিয়ে দেখত, অন্তত নেতার আত্মজারা প্রতিবাদে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে। বিদেশে কেউ মুখ বন্ধ করে রাখেনি—কোন প্রতিবাদ বা প্রতিশোধের কণ্ঠ তখন ধ্বনিত হয়নি। বরং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে স্বামী, পুত্র-কন্যা নিয়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধির মহান ব্রতে অধিকতর মনোনিবেশ করেছিলেন বলেই মনে হয়।

নব্য আওয়ামী বন্ধুরা, আজ প্রয়াত নেতার জন্য তোমাদের বুক ফেটে যাচ্ছে। কই, সেদিন তো একজনকেও দেখলাম না প্রতিবাদী হতে বা প্রতিবাদে নিজেকে বিসর্জন দিতে! প্রাণের অধিক প্রিয় নেতার জন্য সব চিৎকার-চেঁচামেচি করা যাবে—যদি তা গদীটি পেতে সাহায্য করে। লাল শালুর খাদেমদের খেদমত করলেও ছিটাফোঁটা বরাতে জুটতে পারে।

সংগ্রামে আমরা, যুদ্ধে আমরা, বাড়িঘর ভস্মীভূত হবে আমাদের, কাজ করব সারা পৃথিবী ঘুরে আমরা; সুযোগ-সুবিধার সময় তোমরা। পদ-পদবি আর মন্ত্রিত্বের জন্য, লাইসেন্স-পারমিটের জন্য তোমরা। সারা জীবন-যৌবন নেতার জন্য উৎসর্গ করলেও আমরা পিতার নিজস্ব লোক হতে পারি না—নিজস্ব লোক তোমরা। নেতাই বলতেন, খায়-দায় চান মিয়া, মোটা হয় জব্বার। আর কতকাল চালাবে?

সালমান শাহ্ ছিলেন একজন চিত্রনায়ক। তাঁর বাবা মাহতাব এবং মা নীলা চৌধুরী আমাকে ভাই ডাকে। নীলা জাতীয় পার্টিতে সক্রিয় ছিল। সালমানকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করত তুমি শাহ্ হলে কি করে; সে হেসে জবাব দিত, আমি শাহ্ মোয়াজ্জেমের ভাগ্নে—ওটা মামার কাছ থেকে নিয়েছি।

সেই সালমান শাহ্ আত্মহত্যা করল বা তাঁর পিতা-মাতার মতে নিহত হল। দশ-এগারো জন এদেশের মানুষ তাঁর বিয়োগ-ব্যথায় আত্মহত্যা করেছিল। দুনিয়ার সবাই তা অবগত আছে। আর আপনারা মুখে মুখে প্রাণ দিতে পারেন। তাঁর হাঁচিটা, তাঁর কাশিটাকে মনে করে দিবস পালন করতে পারেন; সারাদিন পূর্ণ ভলিয়্যুমে মাইক চালিয়ে, 'আর যদি একটা গুলি চলে

বা এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম' এই রেকর্ড বাজিয়ে মানুষের কান ঝালা-পালা করতে পারেন। মোটা চালের খিচুড়ি রান্না করে ছিন্নমূলদের খাইয়ে বঙ্গবন্ধুর আত্মাকে তৃপ্ত করেন বা নিজেদের মনের জ্বালা মেটান। সবই ঠিক কিন্তু সালমানের ভক্তদের মতো একজন ভক্তও তো দুই যুগে বেরিয়ে এল না! দোষ কেবল আমাদের। কেননা, আমরা আওয়ামী লীগ করি না। 'যত দোষ—নন্দ ঘোষ!'

কেমন করে আওয়ামী লীগ করব! নেতা বেঁচে থাকতে তাঁর কথার অবাধ্য হইনি। তিনি চলে যাওয়ার পর কী তাঁর পুণ্যস্মৃতিকে অমর্যাদা করব? তাঁর শেষ দল কোন্‌টি? আওয়ামী লীগ, না বাকশাল? পিতৃভক্ত সন্তান প্রয়াত পিতার সর্বশেষ উইলটির মর্যাদা দিয়ে থাকে—প্রবেট বের করে। বঙ্গবন্ধুর শেষ ইচ্ছা বা উইল কী?

বাকশাল!

তাঁর কন্যা হয়ে তাঁর উইল বা শেষ ইচ্ছাকে অমর্যাদা করছেন ক্ষমতার লোভে। যদি তাঁর স্বপ্নই সফল করতে চান, যা প্রতিনিয়ত করছেন বলে দাবি করেন, তা হলে সর্বাগ্রে তাঁর রেখে যাওয়া বাকশালকে পুনর্জ্জীবিত করুন। বঙ্গবন্ধু নিজহস্তে আওয়ামী লীগের সমাপ্তি টেনে গেছেন। রাজনৈতিক ফায়দার স্বার্থে পিতার ইতি টানা দলকে সমাধি থেকে তুলে এনে নতুন করে লাল শালুর রাজনীতি চালু করেছেন। উদ্দেশ্য সর্ব মহলই জ্ঞাত।

"তোমরা যে যা বল ভাই, আমার সোনার হরিণ চাই"—দীর্ঘদিন ছিলে ভারতে। তুমি তো ওয়াজেদের বাচ্চা-কাচ্চা মানুষ করছিলে। এখানে ছিলে না। জিজ্ঞেস কর তোমার রাজনৈতিক দোসর জিল্লুর রহমান, রাজ্জাক ও তোফায়েলকে। সেদিন বাকশাল প্রবর্তনের মুহূর্তে আমরাই শেষ পর্যন্ত লড়াই করেছিলাম আওয়ামী লীগ নামটির জন্য। তারা কিন্তু চেয়েছিল বাকশাল। নেতা সাব্যস্ত করলেন বাকশাল—মেনে নিয়েছিলাম। নীতিগতভাবে নয়, নেতাগতভাবে। পিতার সুস্পষ্ট নির্দেশ এবং শেষ ইচ্ছা লঙ্ঘন করে বাকশাল গুটিয়ে আওয়ামী লীগকে পুনর্জ্জীবিত করলে—বঙ্গবন্ধুর আত্মা কী কষ্ট পাচ্ছে না?

ক্ষমতার সিঁড়ি হিসাবে ব্যবহারের জন্য আওয়ামী লীগ প্রয়োজন ছিল। নয় কী? শক্তি মদোন্মত্তে, ক্ষমতার উন্মত্ত-দম্ভে দিশেহারা আত্মজা পিতার আত্মার মর্ম কথা কী টের পান?

আজ পাবেন না, একদিন পাবেন। অনুশোচনার অন্ত থাকবে না। ক্ষমতা থেকে নেমে দাঁড়ালে চোখের ঠুলিটি খুলে পড়তেও পারে।

নূরে আলম সিদ্দিকী, মনিরুল হক চৌধুরী, শফিউল আলম প্রধান—এসব নেতৃবৃন্দকে নিয়ে ছাত্রলীগের সকল কেন্দ্রীয় সদস্য একদিন এল আমার বাসস্থানে। ব্যাডমিন্টন খেলার মাঠে আমি এবং ওবায়েদ তাদের

নিয়ে বসলাম। সমস্ত প্রেক্ষিত বর্ণনা করে বললাম, তোমরাই রায় দাও, আমরা কী অন্যায় করেছি, না সঠিক কাজ করেছি!

তারা রায় দিয়েছিল অবস্থার প্রেক্ষিতে সঠিক হয়েছে আপনাদের সিদ্ধান্ত।

বিদায়ের আগে তাদের বলেছিলাম, আজ তোমরা আমাদেরকে সঠিক বলে গেলেও একদিন তোমাদের উত্তরসূরিরা, আমাদেরও তারা উত্তরসূরি, আমাদের সম্বন্ধে অনেক নিন্দাবাদ ছড়াবে—সেদিন অন্তত তোমরা সত্য তুলে ধরতে দ্বিধা করো না।

যা বলেছিলাম অক্ষরে অক্ষরে আজ তা ফলছে। দুঃখ এই, সেদিনের প্রতিশ্রুতি বিস্মরণে তাদের খুব বেগ পেতে হয়নি।

দীর্ঘদিন সংসদীয় দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। তারা বাসায় এসে অনুরোধ করে একবার সংসদ ভবনে এসে আলোচনা করলে অনেক অস্বচ্ছতা দূর হয়ে যাবে। গিয়েছিলাম, তাদের সব প্রশ্নের উত্তরও দিয়েছিলাম। তারা সন্তুষ্টচিত্তেই বিদায় দিল। কিন্তু আজ তাদের দু'-চার জনের বক্তব্য শুনলে মনে বড় ব্যথা পাই। কেউ খুশি হবে—তাই সময়োচিত নিন্দাবাদের গীত তারাও গেয়ে চলেছে। সকলি গরল ভেল।

তাদের দাবি ছিল পার্লামেন্ট যেন ভাঙা না হয়। সেই মর্মে ক্যাবিনেটে পরামর্শ দিয়েছিলাম। পার্লামেন্ট ঠিকই টিকিয়ে রাখা হয়েছিল। কিন্তু কার্যত যখন সরকারের নিয়ন্ত্রণ হাত-বদল হল, পার্লামেন্টও বাতিল হয়ে গেল। আমরা মাঝখান থেকে নিমিত্তের ভাগী হয়ে রইলাম। আমরা সর্ববাদীসম্মত অভাগা, যেদিকে তাকাব সাগর শুকিয়ে যাবে!

বঙ্গবন্ধু যখন নিহত হলেন তখন নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত জেলা গভর্নরগণ ট্রেনিং নিচ্ছিল। সেই উপলক্ষে একসঙ্গেই তারা ছিল। তারা কোন প্রতিবাদ বা উচ্চবাচ্য করেছে বলে শোনা যায়নি। তবুও তাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হল না। এসডিওর সবেধন গাড়িটি এবং তাঁর বাংলোটি নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে গেল। ক্যাবিনেটে বাকশালী গভর্নর-প্রথা বাতিলের সিদ্ধান্ত গৃহীত হল।

মোশতাক সাহেব একটি কাঁচা কাজ করলেন। বললেন, সব জাতিরই একটি পোশাক এবং একটি মস্তক আবরণ বা টুপি থেকে থাকে। আমাদেরও থাকা উচিত।

তিনি একটি বিশেষ ধরনের ক্যাপ ব্যবহার করতেন। সেটি তুলে ধরে বললেন, এই রকম হলে কেমন হয়?

সোহরাব সাহেব আপত্তি জানালেন। বললেন, আমার গায়ের রঙ কালো, তাই রঙটি আমার পছন্দ নয়।

আমরা কয়েকজন বলেছিলাম, লোকে কিন্তু ঠাট্টা করে মোশতাকী টুপি বলবে; জাতীয় টুপি বলবে না।

আমাদের আপত্তি টিকল না। পরের সভায় একজন মন্ত্রীই কেবল সে টুপি

পরে এলেন। তিনি সকলের দাদা শ্রী ফণীভূষণ মজুমদার। প্রতিমন্ত্রীদের মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোন বিষয় আলোচ্যসূচিতে থাকলে সভায় উপস্থিত হতে হয়। এমনিতেও কোন বৈঠকে ডাকা হলে অবশ্যই যেতে হয়। যখনই গিয়েছি, অধিকাংশ সময় দেখেছি সেনাবাহিনীর তিন প্রধান, নবনিযুক্ত চিফ অব ডিফেন্স স্টাফ জেনারেল খলিলুর রহমান এবং প্রেসিডেন্টের প্রতিরক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টা জেনারেল ওসমানী রয়েছেন। তাহেরউদ্দীন ঠাকুর প্রতিমন্ত্রী হলেও তাঁর একটি অতিরিক্ত কার্যালয় ছিল বঙ্গভবনে—তাঁকেও দেখা যেত নিয়মিত।

একজন মন্ত্রীর প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করতে হলে তার কিছু নিয়ম-নীতি রয়েছে। সময় প্রার্থনা করা, প্রেসিডেন্টের সচিব কর্তৃক সব নোট করে প্রেসিডেন্টের অনুমতির জন্য পেশ করা এবং অনুমতি মিললে সচিব কর্তৃক সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীকে জানানো—এসব ছিল স্বাভাবিক কার্যক্রম। প্রেসিডেন্ট ভবনের প্রবেশদ্বারে সম্ভবত দুই জায়গায় গাড়ি এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর নাম নোট করা হয়। প্রয়োজনে এবং আহ্বানে নিশ্চয়ই যেতে হয়েছে। কিন্তু আজকের প্রচারণা শুনলে ধারণা হবে, সে সময় বোধহয় দেশটা আমরাই পরিচালনা করতাম।

তিলকে তাল এবং তালকে তিল করার কি প্রাণান্ত প্রয়াস! প্রতিমন্ত্রীরূপে ক্যাবিনেটে ছিলাম একথা কখনও অস্বীকার করেছি? কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়সমূহের দায়িত্বপ্রাপ্ত ক্যাবিনেটের পূর্ণমন্ত্রীদের নাম নিতে আপনাদের অসুবিধা কোথায়! ভাসুরের নাম মুখে উচ্চারণ করতে নেই জানি, কিন্তু এরা তো ভাসুর নয়, চাচা। ওয়াজেদের সম্পর্কে আমরাই বরং ভাসুর, ওয়াজেদ ছিল আমাদের সহকর্মী, ছোট ভাই স্বরূপ। ফজলুল হক হলে ছাত্র সংসদে আমাদের মনোনয়নেই সে সহ-সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিল। বিয়ের উদ্যোগ কে নিয়েছিল সাপ্তাহিক 'নিপুণে'র সঙ্গে সাক্ষাৎকারে সে কথা বলেছিলেন, নিশ্চয়ই তা ভুলে যাননি!

এমনি অনেক কিছুই ভুলে গেছেন। সেদিন বাকশালের মাতব্বর-সমর্থক বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠ সহচর বরিশালের মহিউদ্দীন সাহেব খন্দকার মোশতাকের বিশেষ দূত হিসাবে মস্কো সফরে যান।

আপনার পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর প্রয়াত পিতা সাবেক রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সায়ীদ চৌধুরী পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আপনার পিতার আজীবন সহচর, তাঁর মনোনীত রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদউল্লাহ্ উপ-রাষ্ট্রপতির পদে অধিষ্ঠিত হন। আমরা আড়ালে ঠাট্টা করে বলতাম, উপরে আল্লাহ্, নিচে কুমিল্লা—মাঝখানে মোহাম্মদউল্লাহ্।

শোনা যায়, স্পিকার আবদুল মালেক উকিল সাহেব লন্ডনে বঙ্গবন্ধুর

হত্যার উপরে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছিলেন, ফেরাউনের হাত থেকে আল্লাহ্ দেশটাকে রক্ষা করেছে।

তিনি অবশ্য পরে একথা অস্বীকার করেন। তাঁর অস্বীকারের ধরন দেখেই বুঝা যেত, অতটা না হলেও কিছু অবশ্যই বলেছিলেন। এই কিছুটা কি তা আমরা জানি না! জানতেও চাই না! তারা যত কথাই বলুক, বঙ্গবন্ধু সম্বন্ধে এ ধরনের মন্তব্য শুনতে আমরা অভ্যস্ত নই। এই মালেক উকিল সাহেবই একসময়ে দলের কর্ণধার হয়েছিলেন!

তারা কে কি বলল, তাতে কি আসে-যায়! অনেক তো দেখা হল। মেঘে মেঘে বেলা কম হয়নি। যা সত্য তা চিরভাস্বর। মিথ্যা যত বড়ই হোক, ফানুসের মতো একদিন উড়ে যাবে।

মোশতাক সাহেব প্রেসিডেন্ট হবার পর বঙ্গভবনেই থাকতেন। সেখানেই ছিল তার সূর্য-সন্তানেরা—যারা বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর পরিবারকে শেষ করে দিয়েছে। সেখানে কার্যোপলক্ষে গেলে তাদের সঙ্গে দেখা হয়ে যেত। ব্যক্তিগতভাবে না চিনলেও তাদের আচার-আচরণই বলে দিত তারা কারা। ইউনিফর্ম পরিহিতদের থেকে দূরে থাকতেই পছন্দ করতাম, তদুপরি তাদের হাত ছিল নেতার রক্তে রঞ্জিত। বঙ্গভবনে অস্বস্তি বোধ করতাম। তাছাড়া সচিবালয়ে ছিল আমাদের অফিস, সেখানেই আমাদেরকে ব্যস্ত থাকতে হত।

মজলুম জননেতা মাওলানা ভাসানী তাঁর সন্তোষের বাড়িতে গৃহবন্দি ছিলেন। প্রেসিডেন্ট সাহেব একদিন নির্দেশ দিলেন, টাঙ্গাইলের মান্নান সাহেব অসুস্থ, তুমি নিজে গিয়ে মাওলানা সাহেবের মুক্তির আদেশ পৌছে দাও। তিনি যেখানে থাকতে ইচ্ছা করেন, সেমতে ব্যবস্থা কর।

মাওলানা সাহেব পূর্ব থেকেই আমাকে স্নেহ করতেন। মুক্তির আদেশ পেয়ে খুবই সন্তুষ্ট হলেন। তাঁকে পিজি হাসপাতালে ভর্তির ব্যবস্থা করতে বললেন। তা-ই করা হল।

একদিন সেক্রেটারিয়েটে কাজ করছি, প্রতিমন্ত্রী সিলেটের দেওয়ান ফরিদ গাজী, আমাদের ডি.এফ. গাজী টেলিফোন করে জানাল প্রেসিডেন্ট সাহেব তাঁর অফিসে চা খাচ্ছেন। চলে আসুন।

জিজ্ঞেস করলাম, কেন?

তিনি বললেন, প্রেসিডেন্ট সাহেব সালাম দিয়েছেন।

প্রেসিডেন্ট ডাকলে যেতে হয়। গিয়ে দেখলাম, আরও মন্ত্রীরা রয়েছে। মোশতাক সাহেব বললেন, অনেকদিন সচিবালয়ে বসেছি। আজ ইচ্ছা হল ঘুরে যেতে।

মামুলি কথাবার্তার পর তিনি চলে গেলে অফিসে চলে এলাম। তিনি যখন

গাড়িতে উঠছেন, সচিবালয়ের কর্মীরা তাঁকে আনন্দের সঙ্গে হাত নেড়ে সম্ভাষণ জানাল। তিনি সচিবালয়ে এসে তাঁর প্রিয় প্রতিমন্ত্রী ডি. এফ. গাজীর কক্ষে এলেন—তাতে কোন বদনাম নেই! কেননা, জনাব গাজী আওয়ামী লীগেই আছে।

বঙ্গভবনে সামরিক পোশাক পরিহিত ব্যক্তিদের উৎপাত বড় বেশি পরিলক্ষিত হচ্ছিল। নিজেদেরকে অসহায়-অপ্রয়োজনীয় মনে হত। কিন্তু কিছু করার ছিল না। একদিন দেখলাম একজন সিনিয়র অফিসার অন্যদের কড়া ভাষায় ভর্ৎসর্না করছে, এখানে তোমাদের কি কাজ? তোমরা সুশৃঙ্খল সেনাবাহিনীর সদস্য। অহেতুক রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ে কেন? এরপর অননুমোদিত কাউকে দেখলে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

দূর থেকে চিনতে পারিনি বলে জিজ্ঞেস করে জানা গেল তাঁর নাম জিয়াউর রহমান। মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণা তাঁর কণ্ঠেই শুনেছিলাম। জিয়াউর রহমান সাহেব অপরিচিত নন। বরং সবারই পরিচিত। তাঁর সতর্কবাণীতে কিছুটা কাজ হল বলে প্রতীয়মান হল।

দেশে একটা পরিবর্তনের সুস্পষ্ট লক্ষণ দেখা গেল। অফিস-আদালত, ব্যাংক, ব্যবসা-বাণিজ্য সর্বত্র এক স্বস্তির নিঃশ্বাস পরিলক্ষিত হল। শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা থেকে যেন মানুষ পরিত্রাণ লাভ করেছে। জনসাধারণ যে কী পরিমাণ অসন্তুষ্ট, অতিষ্ঠ এবং অসহনশীল হয়ে উঠেছিল তা এখন প্রত্যক্ষ করা যায়। জননেতা হিসাবে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে মোশতাকের তুলনার প্রশ্নই আসে না। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর নিকট মানুষের প্রত্যাশা ছিল আকাশচুম্বী—প্রাপ্তিতে ঘটেছে দুর্দশা, আরও দুর্দশা। অতিষ্ঠ মানুষ নেতৃত্ব বদলে সন্তুষ্ট। আমাদের শোক, আমাদের হৃদয়ের নিভৃত ক্রন্দন কোনটাই তাদেরকে স্পর্শ করে না।

মনে হয়, নতুন করে বুঝি মানুষ মুক্তির স্বাদ পেতে শুরু করেছে। সমাজে স্থিতিশীলতা ও শান্তি নেমে এসেছে। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য হ্রাস পেয়ে মানুষের ক্রয় সীমার মধ্যে চলে আসছে। দেশে অপরাধপ্রবণতা কমে এল, চুরি-ডাকাতি, ছিনতাই, নারী নির্যাতন নেমে এল প্রায় শূন্যের কোঠায়। মনে হয় পরম করুণাময়ের অসীম রহমতে বাংলাদেশের মানুষ দুঃখের রাতের অবসানে সুখের মুখ দেখতে পেল।

কিন্তু বেশিদিন এই অবস্থা চলল না। মোশতাক সাহেব আমাদের অজ্ঞাতে এমন দু'-একটি কাজ করলেন যার পরিণতি শুভ হল না। হুইপ আবদুর রউফকে চিফ হুইপের কাজ চালিয়ে যেতে বলা হয়েছে। সে কিছু সংসদ সদস্যকে মোশতাকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়ে দিল। সেবার সবাইকে খবর পৌঁছান যায়নি। যারা এসেছিল প্রায় সকলেই আগামীতে গণতান্ত্রিক

সমাজ কায়েমের লক্ষ্যে আওয়ামী লীগের সরকারকে সমর্থন দেবে জানিয়ে গেল। তারা হাসিমুখেই বিদায় নিয়েছিল।

এবার রীতিমতো নোটিশ দিয়ে সকল সংসদ সদস্যকে নিয়ে বঙ্গভবনে সভা বসল। ইতিমধ্যে হঠাৎ কাগজে দেখলাম সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমেদ, জনাব মনসুর আলী ও কামরুজ্জামান সাহেবসহ বেশ কয়েকজন নেতা ও প্রাক্তন মন্ত্রীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গ্রেপ্তারের পূর্বে মোশতাকের সঙ্গে ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সাহেবের সাক্ষাতের একটি ছবিও কাগজে দেখলাম।

মনসুর ভাই প্রথম ক'দিন অন্যত্র লুকিয়ে ছিলেন। পরে তিনি প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে চলে এলে মোশতাক সাহেব তাঁকে বঙ্গভবনে নিয়ে গিয়ে পুনরায় প্রধানমন্ত্রী করার প্রস্তাব দেন। তিনি সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন বলে শুনেছি।

ক্রুদ্ধ মোশতাক তাঁকে সহ নেতৃবৃন্দকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন। এই পদক্ষেপ আমাদেরকে বিস্মিত ও ক্রোধান্বিত করল। কাজটি মোশতাক সাহেব ভালো করলেন না। সিনিয়র নেতাদের গ্রেপ্তার তাঁর জন্য কাল হতে বাধ্য। ব্যক্তির খেয়াল-খুশি চরিতার্থ করতে গিয়ে বাংলাদেশের অবিসম্বাদিত নেতাকেই সীমাহীন মূল্য দিতে হয়েছে। কিন্তু তারপরও মানুষ একই ভুল বারবার করে। রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্ভাবনাকে বিদূরিত করতে গিয়ে মানুষ আরও দুর্বিপাক ডেকে আনে।

এক্ষেত্রেও তা-ই হল, নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের ফলে আওয়ামী লীগের সর্ব মহলেই প্রতিক্রিয়া শুরু হল। এমনি করেই শুরু হয়। প্রথমে কিছুই মনে হয় না—পরে সেটাই বিষম হয়ে দাঁড়ায়।

সংসদ সদস্যদের সভায় বক্তব্যে বরফ গলার আভাস পাওয়া গেল। ঢাকা জেলার শামসুল হক সাহেব দীর্ঘ বক্তৃতা করে অনেক প্রশ্ন তুললেন এবং উপসংহারে বর্তমানের স্লোগান 'বাংলাদেশ জিন্দাবাদ' না বলে 'জয় বাংলা' বলে বক্তব্য সমাপ্ত করলেন। ময়েজউদ্দীন সাহেব, সিরাজুল হক সাহেব এরাও একই সুরে বক্তৃতা করলেন। রাষ্ট্রপতি ধৈর্য ধরে তাঁদের বক্তব্য শুনলেন এবং নিজেই কিছু কিছু নোট নিলেন। সভার শেষ কাতারে বঙ্গবন্ধুর আত্মস্বীকৃত হত্যাকারীদের কয়েকজনকে নির্বিকারে বসে থাকতে দেখে কেউ কেউ অস্বস্তি বোধ করেছিল। কিন্তু তাদেরকে চলে যেতে বলা সম্ভব নয়—এটাই ছিল তখনকার বাস্তবতা। সেটা সকলেই উপলব্ধি করছিল।

কোথাও যেন সমন্বয় ঘটছিল না। সরকার প্রকাশ্যে বেসামরিক এবং আওয়ামী লীগের সরকার। কিন্তু মোশতাক সাহেবের সত্যিকারের ক্ষমতার উৎস ছিল সামরিক ব্যক্তিরা। তারা ব্যারাকে নয়, সশরীরে অবস্থান করে

বঙ্গভবনে। বিষয়টি আমাদের সকলের জন্যই তেমন সুখকর নয়। কিন্তু এ নিয়ে কথা বলা যায় না। যারা নেতৃত্বে ছিলেন, সেই সিনিয়র মন্ত্রীগণ, বাহিনী প্রধানগণ, ডিফেন্স স্টাফ প্রধান এবং সামরিক উপদেষ্টার দায়িত্ব ছিল এসব প্রশ্নের নিষ্পত্তি করার। তারা তা করেনি। করেছে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার চলবে না তার ইনডেমনিটি আদেশ, আর ঘর করেছে ওদেরকে নিয়ে একই ছাদের তলে। সৈন্যরা ব্যারাকে ফিরে যাবে—এটাই স্বাভাবিক। প্রেসিডেন্ট নাকি সে মর্মে নির্দেশও দিয়েছিলেন। কিন্তু জিয়াউর রহমান সব বুঝেশুনে এগোচ্ছিলেন। তিনি প্রথম থেকেই সব জানতেন। শোনা যায় গ্রীন সিগন্যালও দিয়েছিলেন, সফল যদি হও, এগিয়ে যাও। কিন্তু কার্য সমাধা হওয়ার পর এইসব ব্যক্তিদের নিজের কর্মক্ষেত্র ক্যান্টনমেন্টে রাখতে সম্মত হলেন না। এসব কথা অনেক পরে পরম্পরায় কানে এসেছে।

জিয়াউর রহমান এই 'সূর্যসন্তান'দের যেদিন ক্যান্টনমেন্টে গ্রহণ করতে রাষ্ট্রপতির নির্দেশ অমান্য করলেন, কার্যত সেদিন থেকেই মোশতাক সাহেবের শাসনকালের অবসান ঘটতে শুরু হয়েছে। প্রেসিডেন্টের আদেশ লঙ্ঘিত হয় কী করে? জিয়াউর রহমান নাকি সুকৌশলে বলে পাঠিয়েছিলেন, এদের উপস্থিতিতে সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হতে পারে—তাই তাদেরকে প্রেসিডেন্টের হেফাজতেই রাখা যাক।

উচ্চাভিলাষী জিয়াউর রহমান প্রস্তুতি নিয়েই ভবিষ্যতের কাঁটা দূরে রাখতে চাইলেন। মোশতাক কার্যত অসহায়। বঙ্গভবনের চার দেয়ালের জৌলুসে বসবাস করা এক ক্ষমতাহীন ক্ষমতাবান লোক। তাসের ঘরের মতো মোশতাকের ঘর ধ্বংস হতে বসল। ক্যান্টনমেন্টে উচ্চাভিলাষী সেনাপতিদের আপন আপন পরিকল্পনায় এগিয়ে যাওয়া রোধ করার ব্যবস্থা ছিল না। তিন বাহিনীর তিন প্রধান থাকার পরও একটি নতুন পদ 'চিফ অব ডিফেন্স স্টাফ' সৃষ্টি করে তিন প্রধানদের অহেতুক বিরাগভাজনই হলেন। খলিলুর রহমান সাহেব সমস্যার কোন সুরাহা করতে পারলেন না; বরং স্বয়ং একটি মূর্তিমান সমস্যা হয়ে বিরাজ করতে লাগলেন। জেনারেল ওসমানী সাহেব সর্বজনশ্রদ্ধেয়। কিন্তু তিনি সামরিক উপদেষ্টা হিসাবে তাঁর বেসামরিক বসকে কি উপদেশ দিয়েছিলেন, আমাদের জানার কথা নয়। কিন্তু বাতাস ভারি ঠেকছে। নিঃশ্বাসে স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনা ক্রমশ দুরূহ হয়ে যাচ্ছে।

আমাদের মতো আদার বেপারীদের জাহাজের খবর কেউ দেয় না। তারা বুঝে না ইদানীং আদাও রপ্তানিযোগ্য পণ্য এবং তার জন্য জাহাজের বেপারীদের শরণাপন্ন হতে হয়।

জিয়াউর রহমানের পরেই শক্তিধর সামরিক কর্মকর্তা ছিল খালেদ

মোশাররফ। যুদ্ধের সময় পূর্বাঞ্চলের অধিনায়ক। সেও লাইনে আছে। সামনের মানুষটিকে একটু হটাতে পারলেই বাজিমাত! নেতা নেই—এখন বাংলাদেশ 'ওপেন হাউস'। দেখা যাক কে জিতে, কে হারে!

মোশতাক-মন্ত্রিসভার দিন ঘনিয়ে এসেছে। তাঁর নিহত হবার পর বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে সম্ভবত প্রথম শোক শোভাযাত্রা বের হল খালেদ মোশাররফের মায়ের নেতৃত্বে। '৭৫-এর ১লা নভেম্বরের ঘটনা সেটি। ধানমন্ডির ৩২ নম্বর বাসায় ওই শোভাযাত্রা নিয়ে যাওয়ার মোক্ষম সময় নির্ধারণ করা হয়েছিল। সব কিছু বিবেচনা করেই এবং খালেদ মোশাররফের জননী কর্তৃক তাঁর নেতৃত্ব দেওয়াও ছিল বৃহত্তর পরিকল্পনারই অংশ। খালেদ মোশাররফের উত্থানের সেটাই হল প্রারম্ভিক অভিযাত্রা।

বঙ্গভবনের সঙ্গে যোগাযোগ নেই। ওখান থেকে ডাক না এলে আমাদের সেখানে যাওয়ার প্রশ্ন আসে না। একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে। কিন্তু কী ঘটতে যাচ্ছে জানি না। ক্ষমতাহীন প্রেসিডেন্টের আরও ক্ষমতাহীন মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রীদের অবস্থা না-ঘরকা, না-ঘাটকা। ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু বঙ্গভবনে কী নাটক অভিনীত হচ্ছে জানা নেই।

৪ঠা নভেম্বর সকালে মর্মান্তিক খবর পেলাম, চার জাতীয় নেতা— সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমেদ, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী ও জনাব কামরুজ্জামানকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। ঘটনার আকস্মিকতায় আমরা স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। নেতৃবৃন্দকে জেলে পাঠিয়ে তারা ক্ষান্ত হল না। ইতিহাসের নিষ্ঠুরতম হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হল কারাগারের নির্জন প্রকোষ্ঠে। চার জন নেতাই ছিলেন স্বাধীনতা যুদ্ধের শ্রেষ্ঠতম স্থপতি। আওয়ামী লীগেরও তাঁরা চার জন প্রথম সারির নেতা। একজন সাবেক উপ-রাষ্ট্রপতি, দু'জন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এবং একজন দলের প্রাক্তন সভাপতি এবং সাবেক মন্ত্রী। তাঁরা আমাদের জাতীয় জীবনের চারটি পথিকৃৎ। অসহায় বন্দি নেতাদের এভাবে রাতের আঁধারে হত্যার নজির কোথাও আছে কিনা জানি না।

কীংকর্তব্যবিমূঢ় আমরা কিছু একটা করার তাগিদে একে-একে একত্রিত হলাম আমাদের অন্যতম নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এবং পরিকল্পনামন্ত্রী অধ্যাপক ইউসুফ আলী সাহেবের বাসস্থানে। পরস্পর যোগাযোগ করে মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী

সকলেই সেখানে একত্রিত হলাম। এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডের নিন্দা করার ভাষা ছিল না। প্রত্যেকেই অকৃত্রিম শোক-যন্ত্রণায় কাতর হলেন। আমাদের সেই মুহূর্তের করণীয় ঠিক করা হল। আমাদের নেতাদের জেলখানায় বর্বরোচিত নারকীয় হত্যাকাণ্ডের পর আমাদের আর মন্ত্রিসভায় থাকার প্রশ্ন আসে না। সম্মিলিতভাবে তখনই পদত্যাগ করার সিদ্ধান্ত হল। ইউসুফ আলী সাহেবের মুসাবিদায় এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে আমাদের সম্মিলিত পদত্যাগপত্র উপ-রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদউল্লাহ্ সাহেবের নিকট প্রদান করা হল—যেন তিনি সেটি বঙ্গভবনে গিয়ে রাষ্ট্রপতিকে পৌঁছে দেন। কয়েকদিন থেকে বঙ্গভবনের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ নেই। কাজেই উপ-রাষ্ট্রপতিকেই সেই দায়িত্ব দেওয়া হল।

দ্বিপ্রহর পর্যন্ত ইউসুফ ভাইয়ের বাসায় বসে মাতম করা ছাড়া আমাদের আর কিছু করার ছিল না। বাসায় এসে পতাকা নামিয়ে দিতে বললাম। পদত্যাগ করে এসেছি। বিকালে বঙ্গভবন থেকে টেলিফোন এল জরুরি সভা। সব মন্ত্রী এবং প্রতিমন্ত্রীদের অবশ্যই উপস্থিত থাকতে হবে। বললাম, পদত্যাগ করে দিয়েছি, সভায় যাব কেন?

বঙ্গভবন থেকে বলা হল, আপনাদের পদত্যাগপত্র এখনও গৃহীত হয়নি। কাজেই সভায় আসা জরুরি। তাছাড়া সভাতেই সেসব আলোচনা হতে পারে।

সহকর্মীদের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করে সভায় গিয়ে এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা গেল। যথাসময়ে ক্যাবিনেট মিটিংয়েও উপস্থিত হলাম। আজ বঙ্গভবনে সেনাবাহিনীর অনেক নতুন নতুন কর্মকর্তার উপস্থিতি লক্ষণীয়। ক্লান্ত ও বিষণ্ন খন্দকার মোশতাককে সভায় আনা হতেই কাজ শুরু হল। আমাদের পক্ষ থেকে জেল হত্যার বিষয় উত্থাপন করা হল এবং সেই সঙ্গে আমরা যে তাঁর প্রতিবাদে পদত্যাগ করেছি—বলা হল। প্রেসিডেন্টকে বলা হল পদত্যাগপত্র গ্রহণ করে নিন। এই ঘটনার পর সরকারে থাকার আর প্রশ্নই আসে না।

কম-বেশি সকলেই একই সুরে কথা বলছিলেন। মোশতাক সাহেব একবার কেবল বললেন, আমার নিকট আপনারা পদত্যাগ করেছেন। কিন্তু আমি কী আছি?

কাকে এই প্রশ্ন—নাকি স্বগতোক্তি বুঝা গেল না। চার নেতার হত্যাকাণ্ডের বিষয় নিয়ে আমরা উত্তেজিত ছিলাম। আমি, ওবায়েদ, মঞ্জুর প্রমুখ যখন কথা বলছিলাম, বয়সের কারণেই হয়ত আমাদের গলার স্বর চড়া হয়ে গিয়েছিল।

সেদিন বেশ জোর দিয়ে বলেছিলাম, এ সকল হত্যাকাণ্ডের মূল খুঁজে বের করার জন্য অনতিবিলম্বে তদন্ত কমিটি গঠন করা প্রয়োজন। প্রয়োজন তদন্ত শেষে প্রচলিত আইনে বিচার। বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হল, জাতির সেই চরম

মুহূর্তেও আমরা কর্তব্য সম্পাদনে ত্রুটি করিনি। কিন্তু কিভাবে আইন হয়ে গেল, বঙ্গবন্ধুর হত্যার বিচার হবে না—আমরা ঘুণাক্ষরেও জানতে পারলাম না। নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করা হল—আমরা পরদিন সংবাদপত্রে পাঠ করি। কে চালাচ্ছে দেশ? কারা বঙ্গভবনের ক্ষমতার মসনদের প্রকৃত মালিক? জেলখানায় চার জন শ্রদ্ধেয় নেতাকে যেভাবে হত্যা করা হয়েছে, মনুষ্য জাতির ইতিহাসে এ ধরনের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে কিনা আমাদের জানা নেই। এই সমস্ত ঘটনার মূল নায়ক এবং হত্যাকাণ্ডসমূহের হোতা সেনাবাহিনীর লোকজন। তাদেরকেই আজ আবার দেখছি বঙ্গভবন জুড়ে অবস্থান করছে। তারা বঙ্গভবন ত্যাগ না করলে ঘরের মধ্যে বসে আমাদের এই সভা নিরর্থক।

তখনও জানি না, বঙ্গভবনে গত ক'দিন ধরে কিসব নাটক অভিনীত হয়েছে! বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারী সেনা-কর্মকর্তাদেরকে বিশেষ বিমানে দেশত্যাগ করতে হয়েছে এবং ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফই এখন সব কিছুর নিয়ন্তা। সত্য-মিথ্যা কিছুই তখন জানি না। সৈন্যদের বিরুদ্ধে অনেকদিনের ক্ষোভ ঝেড়ে কথা বলতে ছাড়লাম না।

ক্যাবিনেটের সকল সদস্যই যারপরনাই ক্ষুব্ধ এবং সংশ্লিষ্ট সৈন্যদের বিরুদ্ধে সোচ্চার। নতমুখে মোশতাক শুনছেন, কিছুটা অন্যমনস্ক। হঠাৎ দরজা খুলে একদল সশস্ত্র সামরিক অফিসার ক্যাবিনেট রুমে ঢুকে চারদিকে অস্ত্র উঁচিয়ে চিৎকার করতে থাকল। অশ্রাব্য ভাষায় গাল দিতে থাকল। এদের কাউকে চিনি না, নাম জানি না। তারা মন্ত্রীদের লক্ষ্য করে অস্ত্র তাক করে ট্রিগারে হাত রেখে প্রস্তুত। যে কোন সময় আর একটি বৃহদাকারের বিয়োগান্ত ঘটনা ঘটে যাবে। একজন কেউ চিৎকার করে বলছে, We want Khaled Mosharaf. He has to be made Chief of Staff . Mr. President, you are a bastard sir, you are a killer. You all will now be finished.

এ ধরনেরই নানা গালাগাল বর্ষিত হচ্ছিল। খন্দকার মোশতাকের উপরই রাগ বেশি। তাঁকে স্যার বলছে, প্রেসিডেন্ট বলে সম্বোধন করছে আবার জারজ বলেও গাল দিচ্ছে। তাদের কেউ কেউ প্রচুর মদ্যপান করে এসেছিল। ঠিক মতো দাঁড়াতে পারছিল না। কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য পরিষ্কার হয়ে গেল। বাইরে অপেক্ষারত খালেদ মোশাররফকে তারা তাদের চিফ হিসাবে চায়। অনেক পরে শুনেছি, তাদের দেন-দরবার মোশতাকের সঙ্গে গত দু'দিন ধরেই চলছিল। খালেদ মোশাররফ বারবার মোশতাককে অনুরোধ করেছিলেন তাকে আর্মি চিফ বানিয়ে সে-ই প্রেসিডেন্ট থাকুক। মোশতাক রাজি হচ্ছিলেন না। তারা এখন তার প্রতিশোধ নেবে। পরে যার নাম সবচাইতে বেশি শুনেছি, সে হল শাফায়াত জামিল। আরও পরে একসঙ্গে জাতীয় পার্টি করেছি সেই মেজর

পারব না, কাল অত্যন্ত ব্যস্ত। পরশু সকাল দশটায় আপনাদের সঙ্গে বঙ্গভবনে সাক্ষাৎকার নির্ধারিত রইল।

তিনি তাঁর কর্মসূচিতেও সেটি ঢুকিয়ে দিলেন। আমরা তিন জনই যারপরনাই সন্তুষ্ট। আলাপ-আলোচনায় হয়ত মোশতাককে মুক্ত করতে পারব। তারপর দেখা যাবে আল্লাহ্‌র কি ইচ্ছা।

বিকেলে যখন অলি আহাদ ভাইকে সব খুলে বললাম, তিনিও সন্তুষ্ট চিত্তেই বিষয়টি গ্রহণ করলেন এবং একদিন পর বঙ্গভবনের সাক্ষাতের জন্য সাগ্রহে অপেক্ষায় রইলেন।

মাঝের দিনটি আনন্দেই কাটল। কর্মীদেরকেও সব খুলে বললাম। বললাম, যদি আলোচনা সার্থক হয় এবং সার্থক হবারই সম্ভাবনা অধিকতর তা হলে হয়ত আমরা কোন একসময় মোশতাকের মুক্তির ব্যবস্থা করতে পারব। তারপর দেখা যাবে, হয় ভালোভাবে বিরোধী দলের রাজনীতি করব। নতুবা সরকারেই অবস্থান হবে আমাদের।

দলের মধ্যে উৎসাহের লক্ষণ টের পেলাম। বঙ্গভবনে যাওয়ার দিন সকালে গোছলাদি সেরে প্রস্তুত হয়ে রইলাম। ওনারা সকলেই আমার বাসায় আসবেন এবং আমরা একসঙ্গে রওয়ানা হব।

তখনও প্রায় ঘণ্টাখানেক বিলম্ব আছে। দেখলাম গাড়ি করে কয়েকজন লোক নেমে দোতলায় আমার ঘরে চলে এসেছে। মনে মনে প্রেসিডেন্টের সৌজন্যেবোধে খুশি হলাম। তিনি গাড়িসহ লোক পাঠিয়েছেন। তারা এসে বলল, স্যার, আপনি দেখি প্রস্তুত হয়েই আছেন, চলুন যাওয়া যাক।

বললাম, আমার আরও তিন জন সহকর্মী এখানে আসবেন, তাঁরা এলে একসঙ্গে যাওয়া যাবে।

তারা পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করে বলল, স্যার, আপনি চলুন, অন্য গাড়ি ও লোক রেখে যাচ্ছি ওনাদেরকে নিয়ে যাবে। আপনার সঙ্গে হয়ত পূর্বেই প্রেসিডেন্ট সাহেব একটু আলাপ করবেন। চলুন, যাওয়া যাক।

বঙ্গভবনে যাচ্ছি বলে আনন্দিত হয়েই গাড়িতে গিয়ে বসলাম। বসে বসে ভাবছিলাম, আলাদা কী আলোচনা করতে পারেন প্রেসিডেন্ট সাহেব! উয়ারী থেকে বঙ্গভবন পাঁচ মিনিটের রাস্তা। কিন্তু দশ মিনিটের উপর হয়ে গেল গাড়ি চলছেই। বিষয় কী? বাইরে তাকাতেই বুঝতে পারলাম, বঙ্গভবনের রাস্তা এটা নয়—অন্যদিকে নিয়ে যাচ্ছে। জিজ্ঞেস করলাম, আমার তো বঙ্গভবনে যাওয়ার কথা, আপনারা আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন?

তারা এবার আর মিথ্যার আশ্রয় নিল না। বলল, স্যার, যাবেন আপনি ঠিকই, তবে বঙ্গভবনে নয়। আপাতত ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে। গাড়ি সেদিকেই যাচ্ছে।

আকাশ থেকে পড়লাম! বলে কী! স্বয়ং প্রেসিডেন্ট দিনক্ষণ ঠিক করে

দিয়েছেন সাক্ষাতের! তার পরিবর্তে জেলখানায়! এমন অভাবনীয় কাণ্ডও ঘটতে পারে! অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। মুখে কথা এল না। কিছুক্ষণের মধ্যেই জেল গেটে এসে গেলাম। তারা আমাকে অভ্যন্তরে ঢুকিয়ে জেল-কর্তৃপক্ষের হাওলা করে দিয়ে নিশ্চিন্তে বিদায় নিল।

ঘৃণায় তাদের দিকে ফিরেও তাকালাম না। এ ঘৃণা তাদের জন্য নয়—এ ঘৃণা সেই লোকটির জন্য, যে এতবড় উচ্চাসনে অবস্থান করেও এমনই নিচু স্তরের প্রবঞ্চনা এবং অহেতুক নিপীড়নের পন্থা বেছে নিতে পারে। সেদিনই ঠিক করেছিলাম আল্লাহ্ যেন এই লোকের সঙ্গে আমার আর সাক্ষাৎকার না ঘটায়। জীবনে যা-ই করি না কেন, জিয়াউর রহমানের ছায়া যেন কোনদিন মাড়াতে না হয়!

হয়ওনি। '৮১ সালে জিয়াউর রহমান দুর্ভাগ্যজনকভাবে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে সেনা সদস্যদেরই হাতে নিহত হলে তাঁর মরদেহ ঢাকা নিয়ে আসার পর স্টেডিয়ামে তার জানাজায় অলি আহাদ সাহেব এবং আমি যোগ দিয়েছিলাম। টেলিফোনে কথা বলেছিলেন একদিন, কিন্তু দেখা আর হয়নি। আমার চাইতে আমার স্ত্রীর মনোভাব ছিল আরও কঠোর। কোন অবস্থাতেই জিয়ার সঙ্গে রাজনীতি না করার অন্যতম কারণ ছিল তার অনমনীয় মনোভাব। তাঁর এক কথা, যে সাক্ষাতের সময় ঠিক করে পরে সেই সময়েই কাউকে জেলে প্রেরণ করতে পারে, তাঁর থেকে শত হাত দূরে থাকাই বিবেচনার কাজ।

পরদিন পত্রিকায় দেখলাম ডেমোক্রেটিক লীগ ও কমিউনিস্ট পার্টি অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। দুটো অফিসেই তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। কমিউনিস্টরা ওভার গ্রাউন্ডের চাইতে আন্ডার গ্রাউন্ডে কাজ ভালো করে। তাদের নিকট বৈধ-অবৈধ তারতম্যহীন। প্রকৃতপক্ষে কেবল ডেমোক্রেটিক লীগকে স্তব্ধ করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। আমাকে গ্রেপ্তার করে এনেছে। গ্রেপ্তারের কারণসমূহ বয়ান করে একটি বিবরণ প্রদান করতে সরকার বাধ্য। তার কোন হদিস নেই। গ্রেপ্তার করে জেলে রাখা হয়েছে। এ সংবাদটি কাগজে প্রকাশ করেনি। বোধহয় কোন অসৎ উদ্দেশ্য ছিল। সাত দিন পর্যন্ত কোন সংবাদ না পেয়ে পরিবারের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। পরে কোনভাবে খবর পাঠাই, বেঁচে আছি। এই কারণেই আমার চাইতেও সালেহার জিয়া সম্পর্কে মনোভাব ছিল অধিকতর কঠিন।

ওবায়েদ বেশ কয়েকজন সদস্যসহ জিয়া সাহেবের বিএনপি'তে যোগ দিয়েছিল। অবশ্য সে জেলখানায় এসে আমার সঙ্গে দেখা করে অনুরোধ করেছিল, আপনাকেসহ মন্ত্রিসভায় যোগ দিতে যাই। বলেছিলাম, সভাপতিকে জেলে রেখে আমরা যদি সরকারে যাই, মানুষ আমাদের নিন্দা করবে।

সে বলেছিল, মোশতাককে দিয়ে কিছু হবে না। দেশ স্বাধীন করেছি আমরা, ফ্লাগ লাগিয়ে ঘুরবে অন্যরা, সেটা মানা যায় না।

সে চলে গেল। সালেহাও সেসময় জিয়ার সাথে যাওয়ার বিষয়ে ঘোরতর বিরোধী ছিল। সেই ঘটনার পর সে জিয়ার কথা শুনতে পারত না।

হাইকোর্টে রিট করলাম। জেলখানায় তখন সৈন্যবাহিনীর লোকদের বিচারের নামে প্রহসন করে একের পর এক ফাঁসিকাষ্ঠে ঝোলানো হচ্ছে। কর্নেল তাহেরকেও সে প্রক্রিয়ায় ফাঁসি দেওয়া হয়। কত যে না-হক ফাঁসি হল তার সংখ্যা নিরূপণ করা কঠিন। আমি সেসময় যেখানটায় ছিলাম সেখান থেকে ফাঁসির এলাকার বাতি জ্বলে উঠতে দেখা যেত। যেদিন ফাঁসি হবে সেদিন সেই আলোটি জ্বলে ওঠে। জেলের কনস্টেবল নিজ হাতে সহোদর ভাইকে ফাঁসিতে চড়াতে নিয়ে গিয়েছে—এমন ঘটনাও ঘটেছে। ফাঁসিতে ঝুলবার পূর্ব মুহূর্তে কেউ কেউ চিৎকার করে উঠেছে, আল্লাহ্, তুমি তো জানো, আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ। আমাকে যারা ফাঁসিতে চড়াল, তুমি তাদের বিচার করো।

কথাগুলো কানে আসত। এই ঘটনার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় আমাকেও গ্রেপ্তার করে এনেছে। রাতারাতি মাথার চুল সব পেকে গেল। আমিও মনে মনে আল্লাহ্‌কে ডাকছি, হে অন্তর্যামী, তুমি তো সব জানো! এ ব্যাপারে আমার কী করার ছিল।

সরকার হাইকোর্টে গ্রেপ্তারের উপযুক্ত কোন কারণই দেখাতে পারল না। আমাকে সসম্মানে মুক্তি দেওয়া হল।

জিয়ার চরিত্রের এ দিকটা লক্ষ্য করে দূর থেকে আমরা ক্ষুণ্ন হতাম। দয়ামায়াহীন এক নিষ্ঠুর মানুষ বলে মনে হত। খুলনা জেলের কয়েদিরা বিদ্রোহ করেছিল। জিয়াউর রহমান সেখানে গেলেন। ইচ্ছা করলে ওদের বক্তব্য শুনে সমাধান দিয়ে আসতে পারতেন। তা না করে জেল কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়ে এলেন Be bold but be cold. ফলশ্রুতি, তিন শত নিরস্ত্র ও অসহায় কয়েদিকে পাখির মতো গুলি করে মারা হল। 'ঠাণ্ডা মস্তিষ্কে মানুষ খুন' বোধহয় একেই বলে।

জেল থেকে বেরুবার পর এবার নিজের বাসা গুলশানে চলে এলাম। বাড়ি তৈরি না করলেও গ্যারেজের উপরে ছোট ছোট কয়েকটি ঘর নিয়ে একটি যেনতেন প্রকারের ব্যবস্থা ছিল। সেখানেই উঠে গেলাম।

শরীর ভালো যাচ্ছিল না। দীর্ঘদিনের অর্শ্বরোগ যন্ত্রণা দিচ্ছিল, তদুপরি প্রবল জ্বর। বন্ধু আজিজ ঢাকায় এবং গুলশানে তার বাসা হওয়ায় দু'বেলা দেখে যাচ্ছে আর ইচ্ছামতো বকাঝকা করে যাচ্ছে। ঠিকমতো খাওয়া-দাওয়া করি না, কোন ব্যাপারেই নিয়ম-কানুন মানি না—অসুখ হবে না তো কি হবে, এইসব! ওর গালাগালি না শুনলেই অস্বস্তি লাগে। সকালে আজিজ মাত্র চলে গিয়েছে, সালেহা রান্নার আয়োজন তদারক করছে, ডেইজী আমার মাথা ধুইয়ে দিচ্ছে। গটগট করে দোতলার শোবার ঘরে ঢুকে গেল পাঁচ-ছ' জন ব্যক্তি। অতীতের অভিজ্ঞতায় বুঝতে পারলাম, এদের মতলব ভালো নয়। এরা পুলিশের কোন বিভাগের লোক। আমাকে অসুস্থ দেখে একটু বোকা বনে গেল। বললাম, আপনারা কারা এবং কী উদ্দেশে আমার শোবার ঘরে বিনা অনুমতিতে ঢুকে গেলেন?

তারা সে কথার উত্তর না দিয়ে বলল, স্যার, আমরা সরকারের লোক। এদিকে এসেছিলাম, শুনলাম আপনি অসুস্থ। তা-ই দেখে গেলাম।

বললাম, রোগী দেখতে আসার এই কী সরকারি নিয়ম! কথা নেই, বার্তা নেই আমার শোবার ঘরে ঢুকে পড়লেন! মনে রাখবেন, এই দিনই আখেরি দিন নয়। আরও দিন আসবে।

তারা আর বাক্য ব্যয় না করে উঠে চলে গেল। সেযাত্রা জ্বর আসায় বোধহয় রক্ষা পেলাম।

একটু সুস্থ হয়ে নিচের বসার ঘরে আছি। দশ-বারো জন কর্মকর্তা আমার বাড়িতে ঢুকে পড়ল। বসার ঘরে এসে বলল, আপনার সহায়-সম্পত্তি কি আছে তার হিসাব নিতে এসেছি। আমরা সরকারের বিভিন্ন দফতরের লোক।

বললাম, আমার স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তির হিসাব সরকারের দফতরে দেওয়া আছে। সে বিবরণী দেওয়ার পর আর নতুন কিছু যোগ হয়নি–কাজেই কিছুই বলার নেই!

তারা খুব রোষ দেখাচ্ছিল, আপনার দেশের বাড়িতেও যেতে হবে। দেশ-বিদেশে কোথায় কি আছে দেখার নির্দেশ আছে।

বললাম, আগে আমার দেশের বাড়িতে বড় বড় টিনের ঘর ছিল। এখন কেবল পুরনো দালানটি দাঁড়িয়ে আছে। ওটার দরজা-জানালা পুড়ে গিয়েছিল, কেবল ইটের দেয়াল ও ছাদ পোড়ানো সম্ভব হয়নি। পাকিস্তানি সৈন্যদের অগ্নিসংযোগের পরও ইটগুলো টিকে রয়েছে। ঘরগুলো, এমনকি টিনের পায়খানাটি পর্যন্ত ওরা ভস্মীভূত করে দিয়ে গেছে। তারপর টিন দিয়ে একটি পায়খানাও বানানো হয়নি। দালানের একটি রুম টয়লেট হিসাবে ব্যবহার করেন আমার বৃদ্ধা সৎ মা। তিনি স্বামীর ভিটা ছেড়ে নড়বেন না। যান, গিয়ে দেখে আসুন। আমার বাড়ির আঙিনা খুঁড়ে দেখুন ধন-দৌলত লুকিয়ে রেখেছি কিনা। বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর যে কোন

তিনি বললেন, Of course I mean it. I mean it cent percent. এর প্রতিটি কথা আমার বিশ্বাসের অঙ্গ।

বললাম, তা হলে আপনার সঙ্গে আমাদের তো রাজনৈতিকভাবে কোনই গড়মিল দেখছি না। আমি একটি প্রস্তাব করতে চাই, যদি অনুমতি দেন।

তিনি আগ্রহ প্রকাশ করলেন। বলুন, স্বচ্ছন্দে বলুন।

আমি তখন বললাম, আসুন, আমরা একটা চুক্তি করি। একটা কাগজের এক পৃষ্ঠায় আমাদের মতৈক্যগুলো লিপিবদ্ধ করব, অন্য পৃষ্ঠায় মতানৈক্যগুলো তালিকাভুক্ত করব। যদি মতানৈক্য অধিকতর হয়, তা হলে আমরা দু'তরফই সম্মানজনক দূরত্ব বজায় রাখব। আর যদি মতৈক্যই প্রাধান্য পায়, তা হলে আমরা একসঙ্গে কাজ করব না কেন?

তিনি সেনাবাহিনীর লোক। ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে না বলে সরাসরি বলা কথা পছন্দ করলেন। তাঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললেন, চমৎকার বলেছেন। আসুন, আমরা একদিন বসি এবং বিস্তারিত আলোচনা করে ভবিষ্যত কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করি।

বললাম, উত্তম প্রস্তাব। যদি আর একটু অনুমতি দেন তা হলে বিষয়টি জনাব মোহাম্মদউল্লাহ্ এবং ওবায়দুর রহমানের সম্মুখে স্থিরিকৃত হয়ে যাক। তাঁদেরকে এই টেবিলে ডাকতে পারি!

এতক্ষণ ধরে শুধু আমিই প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথা বলছি দেখে অন্য প্রায় সব টেবিলেরই বিষয়টি ভালো লাগছিল না। তাদের তাকানো দেখেই বুঝতে পারি। আমার সহকর্মী দু'জনও বারবার আমাকে লক্ষ্য করছিল। ইশারা করতেই তাঁরাও সাগ্রহে আমাদের সঙ্গে যোগ দিল। বললাম, Mr. President, meet the ex-President.

সকলেই আসন গ্রহণ করলে কফি পরিবেশন করা হল। আমি আমাদের দু'জনকে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আলোচনার বিষয়বস্তু খুলে বললাম। জিয়াউর রহমান সাহেবও মাথা নেড়ে প্রতিটি কথায় সম্মতি জানালেন। তারা খুবই সন্তুষ্ট হল। ঠিক হল, শীঘ্র আমাদের একটি চার জনের প্রতনিধি দল প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বিস্তারিত আলোচনা করবেন। তিনি বললেন, আপনারা তিন জন এলেই তো হয়! আবার চার জন কেন?

বললাম, অলি আহাদ সাহেব আজ আসতে না পেরে মনঃক্ষুণ্ন হতে পারেন। অনুমতি দিলে তাঁকেও নিয়ে আসতে চাই।

জিয়াউর রহমান সাহেব বললেন, তাঁর সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনি, শেষে আবার কোন ঝামেলা না সৃষ্টি হয়!

বললাম, চিন্তার কোন কারণ নেই। আমরা সব দায়িত্ব নিলাম।

তিনি বললেন, ঠিক আছে, চার জনই আসবেন।

এডিসিকে ডেকে তাঁর কর্মব্যস্ততার তালিকা পরীক্ষা করে বললেন, কাল

ধ্যান-ধারণাও ফুটে উঠল। নাম উচ্চারণ না করে তিনি কঠোর ভাষায় সমালোচনা করলেন, সেইসব দলকে যারা দিল্লীতে বৃষ্টি হলে ঢাকায় ছাতা খুলে ধরে। ভিনদেশের মুরব্বীয়ানাকে যারা আমাদের সমাজে অনিবার্য মনে করে, তিনি তাদেরকে সেদিকে আশ্রয় নেওয়া শ্রেয় বলে উপদেশ দিলেন। নিজেদের ধর্ম, সমাজ ও স্বকীয়তা ভুলে যারা দেশকে পরোক্ষভাবে অন্য দেশের পদাশ্রিতরূপে দেখতে চায়, তাদের সম্বন্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করলেন।

তিনি রাষ্ট্রপতি। ডেকে এনে তিনি যা বলবেন—শোনা প্রয়োজন। কিন্তু তাঁর সেদিনের ভাষণে যে ক্ষুব্ধ-মনের বহিঃপ্রকাশ ঘটল তা ছিল অনেকের নিকট অম্ল-মধুর, আবার অনেকের নিকট প্রয়োজনের চাইতেও অতিরিক্ত তিক্ত।

আমরা কিন্তু তাঁর ভাষণে সন্তুষ্ট হলাম। যে কারণসমূহকে বিবেচনায় নিয়ে আওয়ামী লীগ ত্যাগ করে আমরা নতুন দল গঠন করেছি, তাঁর বক্তৃতার সঙ্গে হুবহু তা মিলে গেল। মনে হল আমাদের মনের কথাই তিনি তুলে ধরেছেন। কেউ কেউ তাঁর বক্তৃতায় অসন্তুষ্টও হল। অসন্তুষ্টদের চিহ্নিত করতে বেগ পেতে হয় না। বর্ণচোরা আম দেখলেই চেনা যায়!

দ্বিপ্রহরের খাবার বড় হলঘরে যখন পরিবেশিত হল তখন দীর্ঘ বক্তৃতা শেষে বিকেল হতে আর বিলম্ব নেই। খাবার ঘরে আমরা তিন জন এক টেবিলে খাচ্ছি। লক্ষ্য করলাম, জিয়াউর রহমান সাহেব একা এক টেবিলে আহার করছেন—সঙ্গে কেউ নেই। তাঁর স্বভাবসুলভ হাসিহীন গাম্ভীর্য এবং সেদিনের কড়া-বক্তব্যের প্রেক্ষিতে কেউ হয়ত তাঁকে ঘাঁটাতে সাহস করেনি। আমি প্লেট নিয়ে উঠে তাঁর টেবিলে উপস্থিত হয়ে বললাম, প্রেসিডেন্ট সাহেব, আপনি একা খাচ্ছেন, যদি অনুমতি দেন বসতে পারি!

তিনি আমাকে ভালোই চিনতেন। আমার মিন্টু রোডের বাসায় একবার গিয়েছিলেন। বললেন, শাহ্ সাহেব, অবশ্যই বসুন। তারপর কেমন আছেন?

বললাম, এই তো কিছুদিন পূর্বে জেলখাটিয়ে আনলেন, কেমন থাকতে পারি বলুন!

সামান্য হাসিমুখে বললেন, A Tiger either lives in the jungle or in the cage. জেল তো আপনি নতুন খাটেননি! যা-ই হোক, ওসব ভুলে যান। এখন বলুন, আমার বক্তব্য কেমন লেগেছে?

বললাম, সেকথা বলার জন্যই আসা। আজকে আপনার বক্তব্য আমাদের এত পছন্দ হয়েছে যা বলার নয়। আমাদেরই কথা যেন সুন্দর করে ফুটিয়ে তুলেছেন আপনি। সামরিক বাহিনীর মানুষ আপনি, কিন্তু বক্তৃতা করলেন পাক্কা রাজনীতিবিদের মতো। অসম্ভব ভালো বলেছেন আজ।

প্রশংসা কে না পছন্দ করে! তাঁর গাম্ভীর্য দর্শনীয়ভাবে হ্রাস পেল। মুখে হাসি ফুটে উঠল। বললাম, মি. প্রেসিডেন্ট, আপনি যা বলেছেন তা কী আপনি মানেন? Do you mean it?

একজন এসে প্রথমে উপদেষ্টা পরে মন্ত্রী বানায়! কারণ? এমন বশংবদটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি!

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম কেবল অগ্নিবীণাই বাজিয়ে যাননি; অনেক কৌতুকরসও পরিবেশন করে গেছেন। "এপার থেকে মারলাম ছুরি, লাগল কলাগাছে, হাঁটু ফাইটা রক্ত পড়ে, চক্ষু গেল রে বাবা।"

কোথায় বগুড়া সেনানিবাসে তাদের নিয়মিত গোলযোগের বহিঃপ্রকাশ বা কোথায় ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে সামরিক বাহিনীর ক্যু বা বিদ্রোহ বা অন্যকিছু। কিন্তু তার জের টানতে হয় আমাদের মতো হতভাগ্য রাজনৈতিকদের এবং রাজনৈতিক দলের। চিরটা দিন একইভাবে চলবে। এর কোন ব্যতিক্রম হবে না?

এই দুটি ঘটনার পর প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান সকল দল ও মতের মানুষদের সঙ্গে মতের আদান-প্রদান করা অথবা সবাইকে তার Bit of mind বা মনের ধারণা সম্যক সমঝে দেওয়া প্রয়োজন বলে মনে করলেন। তিনি সর্বদলীয় সভা আহ্বান করলেন বঙ্গভবনে। ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মোহাম্মদউল্লাহ্ সাহেব, আমি এবং সাংগঠনিক সম্পাদক ওবায়দুর রহমান—আমরা তিন জন ডেমোক্রেটিক লীগ থেকে প্রতিনিধিত্ব করলাম। প্রেসিডেন্টের আহ্বানে সমস্ত দলই সভায় যোগ দিয়েছে। হল ভর্তি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীগণের দ্বিপ্রহরের খাবার বঙ্গভবনেই ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সকলেই মন খুলে কথা বলল। আমাদের তরফ থেকে ওবায়েদ কথা বলতে চাইল। তাকে আমাদের বক্তব্য তুলে ধরতে বলা হল। সব দলের পক্ষ থেকেই মতামত দেওয়া হল। কিন্তু সেদিনের 'ম্যান অব দি ডে' ছিলেন প্রবীণ রাজনীতিবিদ ন্যাপের জনাব মশিউর রহমান যাদু মিয়া। তিনি সেদিন ভালোই যাদু দেখালেন। দীর্ঘ বক্তৃতায় তিনি প্রাঞ্জল ভাষায় সরকারের সমস্ত অব্যবস্থা, ভ্রান্ত নীতিমালা এবং সর্বত্র সামরিকীকরণের তীব্র সমালোচনা করে বক্তব্য রেখে সকলের প্রশংসাই শুধু কুড়োলেন না, ভবিষ্যতের জন্য নিজের আখেরও গুছালেন। তাঁর খোলামেলা ভাষণে আমলাতন্ত্র-সামরিকতন্ত্র সম্বন্ধে জনগণের অনেক অব্যক্ত কথা জিয়াউর রহমানের অনুমত্যানুসারে নির্ভয়ে বললেন। তাঁর বক্তৃতা পূর্বেও শুনেছি। তেমন আহামরি কিছু নয়। কিন্তু সেদিন প্রায় সকলের মনের কথাই তিনি প্রতিধ্বনিত করে একজন প্রবীণ রাজনীতিবিদের যোগ্য কাজই করলেন। ফলশ্রুতিতে, কিছুদিন পরেই জিয়াউর রহমান যখন বেসামরিক ব্যক্তিদের সরকারে গ্রহণ করলেন তখন যাদু ভাই সিনিয়র মন্ত্রী নিয়োজিত হয়েছিলেন।

সর্বশেষে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান সাহেব বক্তৃতা করতে দাঁড়ালেন। দীর্ঘসময় নিয়ে তিনি বক্তৃতা করলেন। তাঁর বক্তব্যে তাঁর নিজস্ব রাজনৈতিক

সৌভাগ্যের বরপুত্রদের জাতি লালন-পালন করে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তির জন্য নয়।

তবুও ঘটনা ঘটে। ঢাকাতে প্রায়ই শুনতে পাই, উত্তরপাড়া গরম। কারণ কী এই উষ্ণতার? এর কারণ হল উচ্চাভিলাষী ক্ষমতালিপ্সু, উচ্চপদে আসীন হাতে গোনা দু'-চার জন। নিজেদের স্বার্থেই এরা সরলমনা সাধারণ সৈনিকদের বিভ্রান্ত করে, নির্লজ্জভাবে ব্যক্তি প্রয়োজনে ব্যবহার করে। বেসামরিক ব্যক্তিরা সব Bloody civilian. তাদের দুর্নীতি আর অব্যবস্থাপনা ঠেকাতে এসে দুর্নীতির বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার যোগ্যতা রাখে এসব গুণধর কৃতীপুরুষ!

বগুড়া ক্যান্টনমেন্টে কী হয়েছিল বিস্তারিত বিশ্লেষণের প্রয়োজন অনুভব করি না। কারণ তো সবই কমন! কিন্তু গাড়ি-বাড়ি আর এত মর্যাদা ও ক্ষমতা দিয়ে যে ডিজিডিএফআই এবং আরও বহু খবরদারি বা গোয়েন্দা সংস্থা রাখা হয়, সেসব শ্বেতহস্তীদের কাজটা কী? ওরা একটা খবরও সংগ্রহ করতে পারে না! প্রায়ই নাকি ক্যু হয়। পাঁচ-সাতটা মেডেল পরে বিশ্বের সবচাইতে দুর্দান্ত অফিসাররূপে ওরা যখন মেদিনী-কম্পিত করে চলাফেরা করে তখন মনে হয়, এমন কিছু নেই যা তাদের নখদপর্ণে নেই। মেডেলগুলো কবে এবং কি জন্য পড়েছে! ওগুলো তো আর জিঞ্জিরা বাজারে কিনতে পাওয়া যায় না!

বগুড়া ঘটনার অব্যবহিত পরই একটি জাপানি প্লেন হাইজ্যাক হল বাংলাদেশে। সেই নাটক অভিনীত হল ঢাকা বিমানবন্দরে। উপ-রাষ্ট্রপতি বৃদ্ধ মানুষ। তারও খায়েশ হল নাটক দেখার। তাকে সঙ্গ দিতে এল এয়ার ভাইস-মার্শাল, ডিজিডিএফআই। এদিকে যে পায়ের তলে মাটি নেই সে খবর নেই। কত বড় গোয়েন্দা প্রধান! আয়েস করে উপ-রাষ্ট্রপতিকে নিয়ে জাপানি প্লেনের হাইজ্যাক নাটক অবলোকন করছেন কাঁচের দেয়ালের অভ্যন্তর থেকে। এদিকে অভ্যুত্থান হয়েছে, অফিসারদের কচু-কাটা করেছে, আর দু'-চার মিনিট হলেই এই দু'জনও আল্লাহ্ তা'আলার নিকট রিপোর্ট করতেন।

অবাক হয়ে ভাবতে হয়, এরা হল গোয়েন্দা প্রধান, আবার গালভরা পদবি এয়ার ভাইস-মার্শাল। কাছা খুললে পশ্চাৎদেশ সবটাই দৃশ্যমান তবুও যাদুধনের নজরে আসে না। পি-পো-ফি-শো'র পার্টি এরা। দু'ডাকসাইটে অলসের ঘরে আগুন লেগেছে। ওরা শুয়েই আছে। অলসতার কারণে সংক্ষেপে একজন বলল, পি পো! অর্থাৎ পিঠ পোড়ে। অন্যজনও একই কারণে সংক্ষেপে উত্তর দিল, ফি শো অর্থাৎ ফিরে শোও। কথা খরচ করতেও অলসতার কমতি নেই।

আমাদের ডিজিডিএফআই! আরও কত গালভরা নাম! খবরও নেই, যম পশ্চাতে দণ্ডায়মান। এদের আবার প্রমোশন হয়! এক সেনাপতি গেলে আর

না। যা কিছু শুরু হয়েছিল তা হাইকোর্টের আপিলে মোশতাক সাহেবের মুক্তির পর। সে পরের ঘটনা।

ইতিমধ্যে দেশে দুটি বৃহৎ ঘটনা সমগ্র জাতিকে নাড়া দিল। বগুড়ার সামরিক অভ্যুত্থান এবং ঢাকায় জাপানি প্লেন হাইজ্যাকের নাটকের সঙ্গে আর একটি অভ্যুত্থানের প্রয়াস।

যতগুলো ঘটনা বা দুর্ঘটনা ঘটেছে সবক'টিই ক্যান্টনমেন্ট থেকে জন্ম। অতি দরিদ্র জনগণের ট্যাক্সের টাকায় সেনাবাহিনী পালন করা হয় দেশকে রক্ষা করার জন্য। রক্ষক যদি ভক্ষক হয়ে পড়ে, তা হলে সমস্যা। বিচারপতি কায়ানী একস্থানে বলেছিলেন, Our army is very brave, they have conquered their own country.

কথাটা সম্পূর্ণরূপে সঠিক। বাড়িতে প্রহরী নিয়োগ করা গেল জান ও মালের নিরাপত্তার জন্য। নিজের অর্থে তাকে বন্দুকও ক্রয় করে দেওয়া হল বহির্দুশমনদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য। এক সুপ্রভাতে সে এসে বন্দুক উঁচিয়ে ধরল, এখন থেকে বাড়ি আমার, এর সব কিছু আমার। তুমি হটে যাও, নয় তো জীবন সংশয়!

বঙ্গবন্ধুকে শেষ করল। তিনি ছিলেন জাতির পিতা এবং নেতা। রাষ্ট্রপতিও তিনি। আক্রান্ত হয়ে প্রধান সেনাপতিকে টেলিফোন করলেন, তোমার কিছু সৈন্য আমাকে মারতে এসেছে, কিছু একটা কর।

প্রধান সেনাপতি কী করল? হত্যাকারীদের সঙ্গে গাড়িতে করে রেডিওতে গিয়ে সরকার পরিবর্তনে আনুগত্য দিয়ে এল। সাবাস প্রধান সেনাপতি! বীরশ্রেষ্ঠ পদক তোমার অপেক্ষায় রয়েছে। স্বাধীনতাযুদ্ধের আসল চার নেতাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হল জেলখানায়, তাও করল সেই ইউনিফর্মেরই সদস্যগণ!

সেনাপতিরা মিলে তাদেরকে বিশেষ বিমানে করে পাঠিয়ে দিলেন দেশের বাইরে। আজ কার বিচার করছেন? সর্বাগ্রে রাষ্ট্রপতির নির্দেশ অমান্যকারী ওই নপুংসক প্রধান সেনাপতি ও তার পরবর্তী অপকর্মসমূহের দোসরদের বিচার নয় কেন?

দোষ খুঁজে বেড়ান, কে আপনাদের বিরুদ্ধে কেবল তাদের সম্বন্ধে, বিচারে নিয়ে আসেন ষড়যন্ত্রের অজুহাতে সেইসব কণ্ঠস্বরকে, যারা চির অকুতোভয়। যাদের সত্যভাষণ নিঃশেষ হবে নিঃশ্বাস নিঃশেষিত হলে। সহ্য করতে পারেন না। কেননা, ক্ষমতার মসনদে বসে আছেন। কিন্তু নেতা মুজিবের ভাষায়, কেউ ক্ষমতার পাগড়ি পরে আসেনি। আপনিও আসেননি। পাগড়ি পরা অসম্ভব। কিন্তু ঘোমটাও অক্ষয় নয়!

দরিদ্র মানুষের ট্যাক্সের টাকায় পালিত তাইওয়ানের জুতা, মূল্যবান পোশাক, নামমাত্র মূল্যে উত্তম খাদ্যসামগ্রী যারা ভোগ করেন, সেই

ওবায়েদও মুক্তি পেয়ে গেল। আমি একা রয়ে গেলাম ওদের মাঝে। কিন্তু আমরা যে একদলভুক্ত নই একথা বুঝবার উপায় রইল না। সকলেই ব্যক্তিগতভাবে আমাকে ভালো জানত, অশ্রদ্ধা করত না।

হাইকোর্টে রিট করে আমিও একদিন খালাস পেয়ে গেলাম এবং জেল থেকে বের হয়েই পূর্ণোদ্যমে পার্টির কাজে লেগে গেলাম।

ডেমোক্রেটিক লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয় পুরানা পল্টনে অবস্থিত ছিল। প্রতি সন্ধ্যায় নিয়মিত সেখানে যেতাম। কর্মীদের মনোবল ফিরে আসতে লাগল। দল করতে গিয়ে আমরা মোশতাক সাহেবের সাহচর্য মোটেই পাইনি। শুরুতেই গ্রেপ্তার এবং সাজা হয়ে গেল। তাঁকে রাজনৈতিকভাবে চিনবার-জানবার তেমন একটা সুযোগ পেলাম না। আওয়ামী লীগেও তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ছিল আর দশ জন সাধারণ পরিচিতের মতো। তাঁর মুক্তি দাবি তখন আমাদের অন্যতম প্রধান কর্মসূচিতে পরিণত হল।

মোশতাকের অনুপস্থিতিতেই ডেমোক্রেটিক লীগের পূর্ণ কমিটি গঠিত হয়। আহ্বায়ক কমিটিতে কাজ দ্রুত গতিতে অগ্রসর হচ্ছিল না বলে সকলেই অনুভব করল পূর্ণাঙ্গ কমিটি নির্বাচিত করে দলকে ঢেলে সাজাবার প্রয়োজন। সেমতে সকল জেলা থেকে প্রতিনিধি সমন্বয়ে কেন্দ্রীয় কমিটির বর্ধিত সভায় পূর্ণ কমিটি গঠন করা হল। খন্দকার মোশতাককে করা হল সভাপতি, আমাকে করা হল সাধারণ সম্পাদক, মোহাম্মদউল্লাহ, আবদুর রউফ চৌধুরী, অলি আহাদ প্রমুখকে সহ-সভাপতি, ওবায়দুর রহমান সাংগঠনিক সম্পাদক, আল মুজাহিদী সাংস্কৃতিক সম্পাদক, ওয়ালী আশরাফ দফতর সম্পাদক, শামিম আল মামুন সমাজসেবা সম্পাদক, মাহবুবুল হক দোলন প্রচার সম্পাদক এবং আরও অনেককে বিভিন্ন পদে নির্বাচিত করে শক্তিশালী একটি কেন্দ্রীয় কার্য-নির্বাহী পরিষদ গঠন করা হল। যারা বলতেন, মোশতাক সাহেব আমাকে সেক্রেটারি বানিয়েছিলেন তারা ইতিহাস জানেন না। তাকেই বরং তাঁর অনুপস্থিতিতে আমরা সভাপতি নির্বাচন করেছিলাম।

আমরা রাজশাহী সেন্ট্রাল জেলে গিয়েও মোশতাক সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি। দলের সভাপতির প্রতি কর্তব্য সম্পাদন করেছি এবং তাঁর অবর্তমানে দল চালাবার প্রচেষ্টা করেছি সম্মিলিতভাবে। তাই, মোশতাক সাহেব মুক্তি না-পাওয়া পর্যন্ত আমাদের মধ্যে কোন বড় মতদ্বৈততা ছিল

করে নিয়ে এল। মোশতাক সাহেবকে গ্রেপ্তার করায় নবগঠিত দলটি সমূহ বাধাগ্রস্ত হলেও অচিরেই মোহাম্মদউল্লাহ্ সাহেবকে ভারপ্রাপ্ত আহ্বায়কের দায়িত্ব প্রদান করে দল চলতে লাগল। দলগঠন এবং আমাদের মুক্তির দাবি দুটোই মুখ্য হয়ে উঠল।

আমার এবং ওবায়েদের কথা স্বতন্ত্র। জেলখানা অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে। মোশতাক সাহেবও ইতিপূর্বে অনেকবার জেলে এসেছেন। কিন্তু ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন ইতিপূর্বে কখনও জেলে আসেনি। তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার জ্যেষ্ঠ সন্তান বিলেতে লেখাপড়া সমাপ্ত করে দেশে এসে ওকালতি, 'ইত্তেফাক' এবং রাজনীতি তিনটির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়। জেলজীবনে অনভ্যস্ত মইনুল হোসেন সহজেই সব গ্রহণ করল। তার কেবল একটাই বক্তব্য, কথা নেই, বার্তা নেই—ধরে আনলেই হল? দেশে কোন আইন নেই? আদালত নেই?

আমরা বলি, নিজে ব্যারিস্টার, ভালো করেই জানেন আইনের দুয়ারে ধর্ণা দিতে কি কি প্রয়োজন এবং কতটা সময়সাপেক্ষ। ধৈর্য ধরা ছাড়া উপায়ান্তর নেই।

ভাগ্য ভালো, তাছাড়া 'ইত্তেফাকে'র সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি, সেই হিসাবে বিভিন্ন তরফ থেকে তাঁর জন্য পৃথক চাপ ছিল। তাই শীঘ্রই তাঁর মুক্তি হয়ে গেল।

ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক শফিউল আলম প্রধান তখনও জেলে রয়েছে। সে একদিন দূর থেকে চিৎকার করে বলল, আপনাদের সিদ্ধান্ত সঠিক, আমি আপনাদেরকে অভিনন্দন জানাই।

কর্তৃপক্ষের নিকট আমাদের নিবেদন ছিল আমাদেরকে যেন ছাব্বিশ সেলে রাখা হয়। তারা বলল, সেখানে সব আওয়ামী লীগের সদস্যরা রয়েছে, মোশতাক সাহেবের অসুবিধা হতে পারে।

ইতিমধ্যে মোশতাক সাহেবের বিরুদ্ধে ঘটি, বাটি, গ্লাস, চায়ের কাপ থেকে শুরু করে বৃহৎ অঙ্কের অর্থ আত্মসাৎ, গ্রামে বাড়ি ও গেস্ট হাউস নির্মাণ এইসব নিয়ে কয়েকটি দুর্নীতি মামলা শুরু হয়ে গেল সামরিক আদালতে। প্রায়ই তাঁকে কোর্টে নিয়ে যাওয়া শুরু হল। অচিরেই সেসব মামলা দ্রুত সম্পন্ন করে কর্তার ইচ্ছায় তাঁকে বেশ কয়েক বছরের সাজা দেওয়া হল।

ততদিনে আমাদেরকে ছাব্বিশ সেলে আনা হয়েছে। কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটল না। সকলেই স্বাভাবিক ভদ্র ব্যবহার করল। ছাব্বিশ সেলে তখন জিল্লুর রহমান, খুলনার সালাহউদ্দীন ইউসুফসহ অনেক আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মী আটক ছিল। এর মধ্যে মোশতাক সাহেবকে রাজশাহী জেলে স্থানান্তর করার দিন বিদায় মুহূর্তে কেবল সালাহউদ্দীন ইউসুফ তার স্বভাবসুলভ দুর্ব্যবহার করল। অন্যরা স্বাভাবিকভাবেই বিদায় দিল। কয়েকদিন পর

মোশতাক এবং সে কারণে ডেমোক্রেটিক লীগের সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য শুরু করেছে। প্রতিদিনই তাদের কণ্ঠ জোরদার হচ্ছিল।

দ্বিতীয়ত, সরকারও মোশতাক এবং তার নেতৃত্বে গঠিত দলটিকে সুনজরে দেখতে পারল না। এই একটি ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের সঙ্গে তাদের ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হল। যদি দলটির শিকড় জনগণের মনের মণিকোঠায় উত্তমরূপে গ্রথিত হয়ে যায়, তা হলে আগামীতে নতুন দল গঠনের প্রক্রিয়া পোক্ত হবে না। উভয়েরই উদ্দেশ্য এক, শুরুতেই একে খতম করে দিতে পারলেই শ্রেয়।

আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে এক বিবৃতি দেওয়া হল, বলা হল, 'আওয়ামী লীগের একটি কর্মী বেঁচে থাকতে মোশতাকের বেঁচে থাকার অধিকার নেই।'

আওয়ামী লীগের কর্মী নেই এমন কোন গ্রাম নেই। তাদের প্রতি সুস্পষ্ট নির্দেশ, মোশতাককে খতম করে দিতে হবে। এ ধরনের বিবৃতি-দাতাদের হুকুমের আসামি হিসাবে হত্যার আদেশ দানের জন্য অপরাধ দমন বিধির সুস্পষ্ট ধারায় অভিযোগ দায়ের করে সরকারের উচিত তাদেরকে বিচারে সোপর্দ করা। কিন্তু উদ্দেশ্য যেখানে অভিন্ন, সেখানে আইন প্রয়োগের প্রশ্ন তো দূরের কথা, সরকারের পক্ষ থেকেও কি ব্যবস্থা নেওয়া যায়, তারই গোপন সলা-পরামর্শ চলতে থাকল। ডেমোক্রেটিক লীগ সুসংগঠিত হবার পূর্বেই আকস্মিকভাবে সরকারি আঘাত নেমে এল। '৭৬ সালের জুন মাসের শেষার্ধে আমাকে এবং ওবায়দুর রহমানকে গ্রেপ্তার করে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে নিয়ে এল। আমরা তখনও ডেপুটি জেলারের সম্মুখে বসা—ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন এসে সেখানে উপস্থিত। আমরা খুশি হয়ে উঠলাম। সে বোধহয় আমাদের পক্ষে আইনগত পরামর্শ করতে এসেছে। মুহূর্তেই পরিষ্কার হয়ে গেল। তাকেও গ্রেপ্তার করে আনা হয়েছে।

আমাদেরকে নতুন বিশ সেলের দোতলায় তিন কম্বল সম্বল করে ঢুকিয়ে দেওয়া হল। জেল কর্তৃপক্ষ রাতের খাবারের ব্যবস্থা করেনি। মালেক জেল গেটে আমাদের জন্য কলা, রুটি দিয়ে গিয়েছিল। তা দিয়ে ডিনার সারলাম। কিছুক্ষণ পর দেখলাম, দরজা খুলে গেল এবং ভিতরে নিয়ে আসা হল ওভার-কোট আর নিজস্ব টুপি পরিহিত খন্দকার মোশতাক আহম্মদকে। এতক্ষণ আমরা তিন জন আলোচনা করছিলাম, মোশতাক সাহেব আমাদের গ্রেপ্তারের তীব্র প্রতিবাদ করবেন এবং যা প্রয়োজন করবেন। আমাদের অত চিন্তিত হবার কারণ নেই।

তাঁকেই নিয়ে এসেছে! আমরা আশাহত হলাম। নতুন বিশ সেলে সে সময় আরও কিছু অতিথি আনা হয়েছিল। আবদুল মালেক উকিল, আবদুল মোমিন তালুকদার এবং মোজাফফর হোসেন পল্টুকেও বিবিধ কারণে গ্রেপ্তার

এসে আরও লোকজনের সঙ্গে পরামর্শ করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেব। তোমরাও মানুষজনদের সঙ্গে আলোচনা শুরু কর।

আমরা নতুন দল করার উদ্যম নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। নবীন-প্রবীণ বহু সুধীজন এবং রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এ প্রস্তাবকে স্বাগত জানাল। পীর মোহসেন উদ্দীন দুদু মিয়া, অলি আহাদ সাহেব, ডা. মফিজ চৌধুরী, জনাব মোহাম্মদউল্লাহ, জনাব সুরী, ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন, হাজী সেলিম, ব্যারিস্টার কাজী কামাল, আল মুজাহিদী, শামীম আল মামুন, ওয়ালী আশরাফ, ওবায়দুর রহমান, মিয়া রসিদ, নুরুল ইসলাম মঞ্জুর, আবদুর রউফ চৌধুরী, শামসুল হুদা, ব্যারিস্টার আবদুস সালাম, অধ্যক্ষ ইরশাদ উল্লাহ, মাহবুবুল হক দোলন, হাশিমউদ্দীন আহমেদ, রিয়াজউদ্দীন আহমেদ ভোলা মিয়া, তৈমুর রাজা, শামসুল হক, মমিনউদ্দীন আহমদ, মিয়া মুসা হোসেন, মোল্লা রিয়াজউদ্দীন, ইকবাল আনসারী খান, আবদুল মান্নান, আবদুর রব, মাহমুদুন নবী চৌধুরী, আবদুর রহমান খান, আলহাজ্ব আবদুর রকিব, অধ্যক্ষা নূরজাহান বেগম, মেজর মান্নান, সিদ্দিকুর রহমান এমনি অসংখ্য বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব এবং সমাজের নামী-দামি মানুষ একত্রিত হল। দল করতে হবে—নতুন করে।

জন্ম নিল ডেমোক্রেটিক লীগ। আহ্বায়ক হলেন মোশতাক সাহেব, আমরা সকলেই কমিটির সদস্য। একটি নতুন রাজনৈতিক দল সংগঠিত করা অত্যন্ত দুরূহ কাজ। এবং বিভিন্ন মত ও পথের লোকদের সমন্বয়ে যদি সে প্রতিষ্ঠান গড়তে হয়, তা হলে বিস্তর কাঠখড় পোড়াতে হয়। তার উপর প্রধান ব্যক্তি যদি ঘরকেন্দ্রিক হয়—তা হলে আরও বেগ পেতে হয়। এসব সত্ত্বেও দ্রুত দলটির জেলা, মহকুমা ও থানা শাখা গঠিত হতে লাগল। শুরুতে বাছ-বিচার করা যাচ্ছিল না বলে এবং বিভিন্ন মতাদর্শের নেতৃত্বের প্রভাবজনিত কারণে ভিন্ন ভিন্ন স্রোতধারার সমন্বয়ে দলটি গড়ে উঠল। সে কারণে প্রারম্ভেই ভিত্তি খুব শক্তিশালী করা গেল না। তবুও শুরু করার জন্য যথেষ্ট ভেবে আমরা ভবিষ্যতে একে আরও দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করাবার চেষ্টায় ব্রতী হলাম।

দলটি যখন ক্রমশই জনগণের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছতে শুরু করল, তখন দুটি শক্তি প্রাণপণে এর অগ্রযাত্রায় বাধা সৃষ্টির প্রয়াস পেল। আওয়ামী লীগ ক্রমশ

তা-ই হল। উপকার না করলেও কোন অপকার করিনি। কেউ তাকে মন্ত্রী বানায় না সে কি আমাদের অপরাধ? জাজ্জ্বল্যমান মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার পরও কিছু হল না। পাতি হলেও মাতাল তো! কিন্তু তালে ঠিক!

মোশতাকের বাড়িতে তাঁর প্রয়াত পিতার মাযার রয়েছে। তিনি ছিলেন এলাকায় অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন পীর সাহেব। এশার নামাজের পর আলোচনায় বসে আমরা প্রশ্ন তুললাম, বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ছিলেন বলে কেউ কেউ সন্দেহ করে। এ বিষয়ে আপনার স্পষ্ট বক্তব্য আমরা শুনতে চাই। কেননা, বঙ্গবন্ধু হত্যাকারী বা তার সহায়তাকারীদের সঙ্গে আমরা রাজনীতি করব না। যে কোন হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত কোন ব্যক্তির সাথেই আমরা রাজনীতি করব না।

নামাজান্তে প্রয়াত পিতা পীর সাহেবের মাযার জিয়ারত করে এসেছেন। তিনি উঠে পবিত্র কোরান শরীফ হাতে নিতে গেলেন। বললেন, এই পবিত্র গ্রন্থ স্পর্শ করে বলতে পারি, হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হওয়ার পর যখন ওরা আমার কাছে এল দায়িত্ব অর্পণের জন্য, তখনই প্রথম জানতে পারি। তার আগে কিছুই জানতাম না।

আমরা সেকথা বিশ্বাস করলাম। বললাম, আপনার বক্তব্যই যথেষ্ট, পবিত্র গ্রন্থ নিয়ে শপথ করার প্রয়োজন নেই।

জেল হত্যার কথা উঠলই না। কেননা, সকলের ধারণা এবং বিশ্বাস এটাও উচ্ছৃঙ্খল সৈন্যদেরই কীর্তি। সর্বত্রই এই আলোচনা হত।

ভবিষ্যত রাজনীতি নিয়ে কথা উঠলে তাঁর অভিমত ছিল, রাজনীতি অনেক করেছি। আল্লাহ্ রাষ্ট্রপতি পর্যন্ত বানিয়েছেন, আর কেন? এখন অবসর নিতে চাই। চুপচাপ থেকে আল্লাহ্‌কে ডাকতে চাই।

আমাদের তখন প্রবল জেদ চেপে গেছে। একটা বড় সংগঠন গড়ে তুলে আওয়ামী লীগের অপমানের প্রতি-উত্তর দেব—প্রতিদ্বন্দ্বি রাজনৈতিক দল গঠন করে দেখিয়ে ছাড়ব।

আজ দীর্ঘদিন পর যখন নিজেদের কর্ম মূল্যায়ন করি তখন পরিষ্কার বুঝি, জীবনে যদি আমাদের কোন সত্যিকারের ভুল পদক্ষেপ হয়ে থাকে, সেটা ছিল তাঁকে নিয়ে নতুন দল করার সিদ্ধান্ত। মানুষ ভুল করে—এটা খুবই স্বাভাবিক। কোন মানুষই ভ্রান্তির উর্ধ্বে নয়। আজ স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, এটি ছিল আমাদেরও জীবনের সবচাইতে বড় ভুল। প্রায়শ্চিত্ত অনেক করেছি এবং আজও করছি।

মোশতাক সাহেব সম্মত হচ্ছিলেন না। নানা যুক্তি দিয়ে জাতির প্রতি, দেশের প্রতি দায়িত্ব এড়িয়ে অবসর জীবন যাপন যে জীবন থেকে এক প্রকার পলায়ন, তা তাকে বোঝাতে সক্ষম হলাম। অনেক পরে তিনি বললেন, ঢাকা

দোষারোপ প্রয়োগ করা হয়নি। মানুষের মুখে মুখে তার ৮৩ দিনের শাসনের কথা—বলা হয় স্বাধীনতার পর সেই স্বল্প সময়টুকু ছিল গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্যে ভরপুর। একদিকে 'দাদা নমস্কার' এর রাজনীতির অবসানে মুক্তিযুদ্ধের সত্যিকারের চেতনার উন্মেষ, অন্যদিকে সমাজের সর্বক্ষেত্রে অভূতপূর্ব শান্তি ও স্বস্তি এবং অর্থনৈতিক গণমুখিতা মানুষকে আশার আলো দেখিয়েছিল।

আমরা ভাবলাম, যদি তাঁর এই অবস্থান ও জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগিয়ে একটি দল সংগঠিত করা যায় তা হলে ক্ষতি কি?

সাব্যস্ত হল, আমরা তিন জন তাঁর গ্রামের বাড়ি কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দির দশপাড়ায় যাব। '৭৬ সালের প্রথম ভাগের কথা। সেটাই আমাদের তাঁর গ্রামের বাড়িতে প্রথম যাওয়া। এখন শুনি আমরা নাকি এক বছর পূর্বেই কি এক খেলা উপলক্ষে তার বাড়ি গিয়েছিলাম!

বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলায় সাক্ষী দিতে এসে কুমিল্লার খোরশেদ আলম, অধ্যাপক বলে পরিচয় দিতে ভালোবাসে, কিছু অবান্তর কথা বলেছে। তাকে দেখতাম মোশতাক সাহেবের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতে। সে জেলা আওয়ামী লীগের নেতা। তাকে বাদ দিয়ে বঙ্গবন্ধু সেদিনের ছেলে তাহের ঠাকুরকে মন্ত্রী করায় অতিশয় নাখোশ। বঙ্গবন্ধুকে হেন গাল নেই যা দেয়নি। বঙ্গবন্ধু বলতেন, 'ওটা পাতি মাতাল, ওকে দিয়ে কোন কাজ হবে না।' এখন মোশতাককে ধরে যদি কিছু একটা হওয়া যায়। সেই লোক কেবলমাত্র মোশতাকের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা অস্বীকার করার উদ্দেশে এবং বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে অকথ্য গালমন্দ করার অপরাধ ঢাকা দেবার জন্য এবং সেই সঙ্গে নেত্রীকে খুশি করার জন্য ডাহা মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে গেল, আমি, ইউসুফ আলী, তাহের ঠাকুর প্রমুখ এক ফুটবল খেলা উপলক্ষে মোশতাকের গ্রামে যাই। খেলা শেষে মোশতাকের বাড়িতে চা-চক্রে সরকারের সমালোচনা করা হয় এবং তাতে আমি সোচ্চার ছিলাম!

বিষয়টাই সম্পূর্ণ মিথ্যায় ভরপুর। ক্রীড়ামন্ত্রী গিয়েছিল কিনা জানি না। আমি জীবনে প্রথম মোশতাকের বাড়ি যাই '৭৬ সালে। তথাকথিত অধ্যাপক বলে '৭৫ সালে। মন্ত্রী, চিফ হুইপ, প্রতিমন্ত্রী কোথাও গেলে সরকারি প্রোগ্রাম ছাপানো হয়। মন্ত্রণালয়, এজি অফিস, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট জেলা এবং স্থানীয় প্রশাসনের নিকট সে প্রোগ্রাম যেতে হবে। সেসব কিছুই নেই। বানানো কথা কিছু বলে দিল। তর্কের স্বার্থে জিজ্ঞাস্য—নিজেদের সমালোচনা করা কি পেনাল কোডের কোন্ ধারার অপরাধ? সব মেনে নিলেও, এটা কোন্ ধরনের দোষ হল বুঝা গেল না। এখন বুঝা যাচ্ছে, ঐ মামলার কথাবার্তা চালিয়ে যদি এই মামলায় কিছু করা যায়।

আওয়ামী লীগার। এদেরকে বাদ দিয়ে সভা ডাকায় আমরা মিজান সাহেবকে প্রেরণ করলাম আমাদের বিষয়টি ফয়সালা করার জন্য। তিনি তা সুন্দরভাবে সমাধা করলেন। নিজের নিমন্ত্রণপত্রটি সংগ্রহ করে তিনি সন্তুষ্টচিত্তে ফিরে এলেন। বললেন, ওরা তোমাদের উপর খুব চটা, তোমাদের যাওয়া ঠিক হবে না।

তা হলে আপনি দাওয়াতপত্র আনলেন কেন?

কী করব, ওরা এমন করে ধরল...।

মিজান সাহেব আবার তার খেলা দেখাল। আমাদের শিক্ষা হতে অনেক বিলম্ব আছে। আমরা আলোচনা করলাম। জেদ চেপে গেল। ছাত্রলীগ এবং পরে আওয়ামী লীগ সংগঠিত করেছি, লালন করেছি এবং প্রবৃদ্ধি করেছি আমরা। আর আমরাই আজ অপাঙ্‌ক্তেয়! একটা কিছু করতে হবে।

দল করতে হবে নতুন করে—বৃহৎ একটি উদার গণতান্ত্রিক দল গঠন করতে হবে। গণতন্ত্র, ধর্মীয় মূল্যবোধ, জাতীয়তাবাদ এবং স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বকে সকলের ঊর্ধ্বে স্থান দিয়ে সমমনা রাজনৈতিক ব্যক্তিদের সমন্বয় ঘটিয়ে একটি রাজনৈতিক দল করতে হবে।

আওয়ামী লীগের যে ব্যাংক একাউন্ট আমরা খুলেছিলাম—তার চেক এখন তারা বসে বসে কাটুক। আমাদের আরও পরিশ্রম করে একটি দলের পত্তন দিতে হবে।

কিন্তু একজন এমন কাউকে দরকার যার ডাকে সবাই সাড়া দেবে। বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে একত্রিত করা খুব সহজ কাজ নয়। এর জন্য চাই একজন মধ্যমণি, যার উপর অধিকাংশের নির্ভরতা এবং আস্থা আছে। আমাদের জাতীয় পর্যায়ে সেরকম স্বীকৃতি-সম্পন্ন মানুষ পেতে হবে। চিন্তা করে দেখা গেল—একমাত্র খন্দকার মোশতাক আহমেদ—যিনি স্বেচ্ছায় ক্ষমতা ছেড়ে দিয়েছিলেন এবং জাতীয় ক্রান্তিলগ্নে যে হাল ধরেছিলেন তিনিই নেতৃত্ব দিতে পারেন।

সেটা ছিল '৭৬ সাল। মোশতাক আহমেদের জনপ্রিয়তা তখন প্রশ্নাতীত। বঙ্গবন্ধু হত্যা, জেল হত্যার কথা মানুষ বলে না। যারা বলে তারাও মোশতাককে দোষারোপ করে না। কিছু বিপথগামী সৈন্যদের কথাই আলোচনা হয়। আত্মস্বীকৃত খুনীদের কেউ কেউ নাকি সদম্ভে ঘোষণাও দিয়েছে, তারাই এ কাজ করেছে এবং তাদের সঙ্গে কোন বেসামরিক ব্যক্তি ছিল না। তাদের এ বক্তব্যে এবং মোশতাকের জনপ্রিয়তা আমাদেরকে উৎসাহিত করল তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে। তিনি রাজনীতি করবেন কিনা, করলে কী রাজনীতি, কী প্রকারে করতে চান জানা দরকার। সহকর্মীদের সঙ্গে বিস্তর আলোচনা হল। মোশতাকের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রাঙ্গণে তখনও কোন

শেষ পর্যন্ত কি হয়েছিল বিরক্ত হয়ে আর খেয়াল করিনি। তবে ঢাকা এয়ারপোর্টে নেমে দেখলাম তার সমস্ত লাগেজই এসেছে। বিমানবন্দর থেকে সরাসরি উয়ারীতে গোপীকিষাণ লেনে মালেকের বাসায় পৌঁছলাম। এরা মিন্টু রোড ছেড়ে এখানে এসে ইতিমধ্যেই সব গুছিয়ে নিয়েছে। শুনলাম, বাড়িটি মালেক কিনেছে। ভালোই হল, মিন্টু রোডে ভাড়া দিতে হত না। এখানেও সেই প্রশ্ন নেই। সালেহা ভাড়ার কথা বলতেই মালেক অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়ে বলেছিল, আমি কী বড় ভাইয়ের কাছ থেকে বাড়ি ভাড়া নেব! ভাবী, আর কোনদিন ও-কথা উচ্চারণ করবেন না।

মালেকের অন্তঃকরণ ছিল বিরাট।

গাড়ি কিনতে হল। সালেহা স্কুলে যায়—সঙ্গে রানাও যাতায়াত শুরু করেছে।

রাজনৈতিক সহকর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে দেখা গেল, মোশতাক সাহেবের মন্ত্রিসভায় ছিলাম বলে অনেকে অসন্তুষ্ট। বললাম, ওটা তো আওয়ামী লীগেরই মন্ত্রিসভা ছিল। আমরা তো ছিলাম নিচের কাতারে। উচ্চতর ব্যক্তিদের নিয়ে মাথা ব্যথা কম। কারণ ভালো করেই জানা আছে, আজ থেকে নয়, অনেক দিন থেকেই একটি চক্রের ষড়যন্ত্র চলছে। এবার কিছুটা সুবিধা করবে বলে মনে হচ্ছে।

জিয়াউর রহমান সাহেব তখন ক্ষমতাসীন। সায়েম সাহেবকে বিদায় করে দিয়ে নিজেই নিজেকে রাষ্ট্রপতি নিয়োজিত করেছেন। তিনি একদিন বললেন, I will make politics difficult in this country.

তা-ই হল। পাকিস্তানি কায়দায় রাজনৈতিক দল আইন জারি করলেন। নিয়ম-কানুনের মধ্যদিয়ে সরকারি অনুমোদন নিয়ে দল গঠন ও পরিচালনা করতে হবে। বিষয়টি হাস্যকর। তিনি সেনাবাহিনীর লোক। তিনি রাজনীতিও নিয়ন্ত্রণ করবেন। সুযোগ সন্ধানী এবং উচ্চাভিলাষী। সময়ের ফেরে আজ সে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি। শোনা যাচ্ছে, শীঘ্র রাজনৈতিক দল গঠন করবেন।

এর মধ্যে আওয়ামী লীগের একটি সভা অনানুষ্ঠানিকভাবে আহ্বান করা হল, খুলনার মোহসিন সাহেবের গুলশানস্থ 'লা-ডিপ্লোম্যাট' রেস্টুরেন্টে। আমাদেরকে ডাকা হল না। মিজান সাহেব, নূরে আলম, মঈনুল হোসেন, জেনারেল ওসমানী, ওবায়দুর রহমান, নুরুল ইসলাম মঞ্জুর—সকলেই

ছোটবেলায় জোর করে মেয়ে সাজিয়ে রাখত। বড় হয়ে রানা কত রাগ করেছে। দিনের পর দিন মেয়ে মেয়ে করে আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে তার কাতর প্রার্থনা শুনেছি। সব মনে পড়ে গেল। সবকিছু ভুলে মুলতাজিম দু'হাতে আঁকড়ে ধরে আল্লাহ্র কাছে মনপ্রাণ সঁপে দিয়ে কেঁদে কেঁদে মিনতি জানালাম, আল্লাহ্ তুমি আমাকে আর একটি সন্তান দাও এবং কন্যাসন্তান দাও।

দেশে ফিরে এলে সালেহা সন্তান সম্ভবা হল এবং আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে একটি কন্যাসন্তান দান করলেন। দিনা সেই সন্তান।

প্রথম ভেবেছিলাম লণ্ডনে যাব। ব্যারিস্টারি পড়ব। আজিজের চমৎকার বাড়ি রয়েছে। রকিবের বাড়ি রয়েছে। সুলতানার বাড়ি রয়েছে, পরে রানাদের আনিয়ে নেওয়া যাবে। কিন্তু এক মাসও হয়নি—স্ত্রী-পুত্রের জন্য প্রাণ কাঁদতে থাকল। ইউসুফ ভাই আমার পূর্বেই দেশে প্রত্যাবর্তন করছেন, তাঁকে বললাম, দেশে গিয়ে আপনি সালেহার সাথে খোলা মনে পুনরায় আলাপ করবেন। যদি বুঝেন সে আমার দেশে প্রত্যাবর্তনই অধিকতর কামনা করছে, তা হলে আমাকে লিখবেন। লন্ডন যাওয়া বন্ধ করব। আর সে যদি আন্তরিকভাবেই চায় আমি লন্ডনে চলে যাই—তা হলে তা-ই হবে। পড়াশুনার বয়স আমার নেই জানি, আবার এও জানি, পড়াশুনা যে কোন বয়সেই করা যায়।

ইউসুফ ভাই পৌঁছেই চিঠি লিখলেন, আমি সালেহার সঙ্গে আলোচনা করিনি। প্রয়োজন মনে করিনি। যেদিন ঢাকা এসে পৌঁছলাম সেদিনই ওর মামাকে নিয়ে রানা এসেছিল আমার কাছে। প্রথমেই সে জিজ্ঞেস করে, চাচা, আব্বাকে নিয়ে এলেন না? আব্বা কবে আসবে? রানার জিজ্ঞাসার জবাবে বলেছি, শীঘ্রই আসবে। আমার মনে হয় স্ত্রী-পুত্র ছেড়ে দূরে চলে যাবার সময় আপনার পার হয়ে গেছে। চলে আসুন এবং অতি শীঘ্রই।

সিদ্ধান্ত পাল্টালাম। আজিজ ও রকিবকে চিঠিতে জানালাম, সময় আমার পক্ষে নয়।

আর পড়া হল না। কিন্তু তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। দেশে প্রত্যাবর্তনের সময় ঠিক হল। বাংলাদেশের কর্মকর্তারাও ফিরছেন। বছরে একবার হজ্ব অফিস থেকে লোকজন সৌদি আরবে যেতে হয়।

বিমানেই ফিরছি, এয়ারপোর্টে এসে দেখি কায়সার সাহেবের বিরাট লটবহর। অন্তত দশ জনের ব্যাগেজ সে একাই নিয়ে যেতে চাইছে। আমাকে বলল, বিমান মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন একটু বলে দিন যাতে আমার সব মাল লাগেজে তুলে নেয়।

বললাম, এখন আমার ওদের কাজে হস্তক্ষেপ করা ঠিক হবে না।

সে বলল, বলতে চান না ঠিক আছে, এগুলো অবশ্যই যাবে। এয়ার ভাইস মার্শাল তোয়াব আমার মুরিদ, আমার মালামাল আটকায় কে?

কথা রটে গেল। আমাদের লাভই হল। সেদিন থেকে পরিমাণ মতো মাংস এবং ঘন ডালসহ ভালো খাবার পরিবেশিত হল। পাথর খেয়ে শয়তান নিজেকে শুধরে নিয়েছে।

হজ্ব সমাপনান্তে যখন এক একজন মুসলমান কাবাগৃহ থেকে নির্গত হয়, তখন আল্লাহ্ তাঁর ফেরেশতাদের ডেকে বলেন, একজন নবজাতক পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হল। যত কিছু মলিনতা ছিল, যত পার্থিব দুর্বলতা মানুষকে ক্ষুদ্র করে দিয়েছিল—সবকিছুর অবসানে পবিত্র হজ্বের কল্যাণে সে নতুন মানুষ হিসাবে পৃথিবীতে আবির্ভূত হল।

পাপ-পুণ্যের কথা বলতে পারব না, হাজ্‌রে আসাওয়াদ পাথরটি চুম্বনের জন্য কত না আকুলি। মানুষ পাগল হয়ে যায়। অনেক চেষ্টা ও শারীরিক শক্তি প্রয়োগ না করে কাছে ঘেঁষা মুশকিল। চুম্বন কি করে সম্ভব! এই হাজ্‌রে আসওয়াদের সামনে হযরত ওমর (রাঃ)-কে যখন নিয়ে আসা হয়েছিল চুম্বনের জন্য তখন তিনি পাথরটিকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, তুই একটি পাথর। তুই আমার ভালো করতে পারবি না, মন্দও করতে পারবি না। তোকে চুম্বনের প্রশ্নই আসে না। তবুও তোকে আমি চুম্বন করব এই জন্য যে, হুজুর (সাঃ) তাঁর পবিত্র ওষ্ঠ দ্বারা তোকে চুম্বন করেছিলেন।

শুনেছি এটি নাকি বেহেশতি পাথর—সেখান থেকেই মর্তে পাঠান হয়েছে। প্রথমে তার রঙ ছিল ধবধবে শুভ্র, কিন্তু মানুষের পাপ ধারণ করতে করতে কালো রঙ ধারণ করেছে। বয়স কম ছিল, বহুবার তাকে চুম্বনের সৌভাগ্য অর্জন করেছি। জমজমের পানি পান করে সমস্ত শরীরে ছিটিয়েছি। ফলাফল কী জানি না।

কিন্তু হজ্ব থেকে একটি ফল আমি আল্লাহ্ তা'আলার আশীর্বাদরূপে লাভ করতে সক্ষম হয়েছি। হজ্বের একটি মাছায়েলের বইতে পড়েছিলাম, যদি পবিত্র কাবাঘরের দরজা 'মুলতাজিম' দু'হাত দিয়ে ধরে কেঁদে কেঁদে কায়মনোবাক্যে একটি নেক প্রার্থনা করা যায়—আল্লাহ্ তা কবুল করেন। এটি বহু পরীক্ষিত। আমি মুলতাজিম ধরতে সক্ষম হলাম—প্রার্থনা জানাব। মাত্র ক্ষমতা ছেড়ে এসেছি। প্রায় স্বর্গ হতে বিদায়ের অবস্থা। এমনি মুহূর্তে পুনরায় ক্ষমতা পাওয়ার প্রার্থনা জানানই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু আমার তা না হয়ে সালেহার মুখটি চোখের সামনে ভেসে এল।

একটি কন্যাসন্তানের জন্য সে না করেছে এমন কিছু নেই। দেশের অভ্যন্তরে যত পীর, আউলিয়া এবং বুজুর্গানে দ্বীনের মাযার আছে সর্বত্র ধর্ণা দিয়েছে। যে যা পরামর্শ দিয়েছে তা-ই শুনেছে, তা-ই করেছে। একটি মেয়ের জন্য তার আকুলি না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। আমাদের প্রথম সন্তান ছেলে হওয়াতে আমি ছিলাম যত খুশি, সে প্রথম দিকে ছিল তত অখুশি। ক্রমে ছেলে তার আত্মার আত্মা হলেও মেয়ের অভাব তার ঘুঁচল না। রানাকে

আরাফাতের ময়দানে নিয়ে যাওয়া হল। আমার কাছে সবই নতুন, সবই চমকপ্রদ। কিতাবে লেখা প্রতিটি জিনিস আজ বাস্তব হয়ে আমার কাছে ধরা দিয়েছে। আরাফাতে আমাদেরকে ভালো তাঁবুতে রাখা হল। আয়োজন প্রশংসনীয়। সবকিছুই ভালোভাবে সম্পন্ন হল। কেবল মাঝখানে আরাফাতের ময়দানে এক ভয়ঙ্কর অগ্নিসংযোগে প্রথমটায় ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেও পরে আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য করতে এগিয়ে গেলাম। বাংলাদেশীদের ক্ষয়-ক্ষতি ধর্তব্যের মধ্যে নয়। প্রায় প্রতি বছরই এখানে অগ্নিজনিত দুর্ঘটনা ঘটে থাকে। কাপড়ের তৈরি তাঁবুতে রান্না করতে গিয়ে অধিকাংশ অগ্নিসংযোগ ঘটে থাকে। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আরাফাতের মাঠের প্রচণ্ড গরমে আমরা বরফ দেওয়া জলছত্র খুলে সব দেশের হাজীদের দোয়া কুড়িয়েছিলাম।

মুজদেলফায় খোলা আকাশের নিচে রাত কাটিয়ে পরের দিন শয়তানকে কণ্টক নিক্ষেপের জন্য পাথর-কণা সংগ্রহ করে যথাসময়ে বড় শয়তান আর ছোট শয়তানকে পাথর নিক্ষেপ করলাম। মোশতাক সাহেবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, একসময় কোলকাতা মোহামেডান স্পোর্টিংয়ের খ্যাতিমান ফুটবলার মোহাম্মদ নাসিম সাহেবও ডেলিগেশনে ছিলেন। তাঁর বয়স হয়েছে। তাঁর পক্ষে শয়তানদের ওখানে গিয়ে পাথর ছোঁড়া কষ্টকর।

পাথর ছোঁড়া বিষয়টি যদিও প্রতীকী, তবুও এটাকেও হজ্বের অঙ্গ মনে করা হয় এবং অত্যন্ত ভিড়ের চাপ সৃষ্টি হয়। আমাদের চোখের সামনে ভিড়ের চাপে এক লম্বা-চওড়া পাকিস্তানি প্রথমে এহরাম খুলে বিবস্ত্র হয়ে গেল, পরে নিচে পড়ে গিয়ে মানুষের পদতলে পিষ্ট হয়ে ইহলোক ত্যাগ করল। তাই নাসিম সাহেবকে পাথর মারার জন্য যেতে নিষেধ করলাম। তার পাথর আমিই ছুঁড়লাম।

কয়েকটা পাথর আমি রেখে দিলাম আমাদের শয়তান বাবুর্চির জন্য। অনেকদিন আরবে আছে এমন একজন বাঙালি বাবুর্চিকে আমাদের রান্নার কাজে নিয়োজিত করা হয়েছিল। আমাদের হিসাব মতে ও ম্যানেজারের বক্তব্য মতে যে মুরগির মাংস বা যে ধরনের ডাল আমাদের পাওয়া উচিত তা পাই না। মুরগির দুই একটা ছোট টুকরা আর আলু বাটিতে পড়ে থাকে। ডালেও পানির ভাগ এত বেশি যে, তা দিয়ে গোছল করা যায়। সকলেই নালিশ করে প্রচুর দুর্নীতির কারণেই আমাদের খাদ্যমান প্রতিদিন নিম্নগামী। যদিও বরাদ্দ টাকায় আরও ভালো খাওয়া উচিত। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, অভিযোগসমূহ সবই সত্যি।

বাসায় ফিরে সকলকে ডেকে আনুষ্ঠানিকভাবে আমি বাবুর্চিকে পাথরগুলো ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারলাম। বললাম, বাসায় শয়তান থাকতে অত দূরে এত কষ্ট করার প্রয়োজন কি?

সবাই খুব উপভোগ করেছিল আমার পাথর মারাকে। অচিরেই সর্বত্র সে

আজিজ ঢাকায় বলেছিল, হজ্ব করে সোজা লণ্ডনে চলে আসবি, আমি যাচ্ছি সেখানে। তুই দুই বছর লিংকনইনে পড়াশুনা করে ব্যারিস্টার হয়ে তোর অপূর্ণ স্বপ্ন পূর্ণ করে আয়।

সালেহাও সে কথায় সম্মতি দিয়েছিল। মক্কা থেকে ওকে চিঠি লিখতেই জবাব এল টোলগ্রামে, সব ব্যবস্থা করে রেখেছি। হজ্ব সমাপনে চলে আয়।

বন্ধু রকিবও লণ্ডন থেকে চিঠি লিখল। আজিজের সঙ্গে পরামর্শ করে আমার জন্য রান্না করার লোক ঠিক করা হয়েছে সংবাদ দিল। লণ্ডনে চলে আসতে লিখেছে। চিঠির সঙ্গে একটা ড্রাফট্ও পেলাম। জেদ্দা গিয়ে সেটা ভাঙাতেই কায়সার সাহেব আবার ধার চাইলেন। এবারও তাঁকে নিরাশ হতে হল। জমজমের পানি বহন করার জন্য একটি পাত্র, উপহারের জন্য জায়নামাজ, টুপি আর তসবিহ্ ব্যতীত অন্য কিছু ক্রয় করার প্রয়োজনই বোধ করিনি।

হজ্বের নিয়মের মধ্যে আছে আগে হোক, পরে হোক চল্লিশ ওয়াক্ত নামাজ মদিনাতে মসজিদুল নববীতে আদায় করতে হয়। আট দিন থাকতেই হবে মদিনাতে। আমরা হজ্বের পূর্বেই মদিনা রওয়ানা হলাম। সেখানেও একটি বাড়ি আমাদের জন্য বরাদ্দ করা ছিল। মাদানী সাহেবের জন্মস্থান। তিনি আমাদের সমস্ত জিয়ারতের স্থানসমূহে নিয়ে গেলেন। ইতিহাস বললেন, তাৎপর্য শোনালেন। যেখানে যেখানে নফল নামাজ পড়তে হয় বলে দিলেন। আমাদের গাইডের প্রয়োজন হল না। স্বয়ং নবীজির বংশধর সে দায়িত্ব পালন করলেন। ঢাকা নবাববাড়ির একজন ছাত্রও আমাদের সঙ্গ দান করে অনেক সহায়তা দিলেন।

মদিনাতে জ্বরে পড়ে গেলাম। তবুও গোছল ও নামাজ বাদ দেওয়া যাবে না। অচিরেই আল্লাহ্ সুস্থ করে তুললেন। মসজিদুল নববীতে 'বেহেশতের টুকরো' বলে চিহ্নিত স্থানটিতে নামাজ আদায় করতে সক্ষম হলে তার জন্য অবশ্যই বেহেশতে স্থান হবে বলে বিশ্বাস প্রচলিত রয়েছে। ওখানে প্রচণ্ড ভিড়। তা সত্ত্বেও প্রতিদিন কয়েক রাকাত নামাজ ওখানে পড়বার চেষ্টা করতাম। হুজুরের রওজার জালি মোবারক স্পর্শ করতে দেয়া হয় না। তবুও কোন ফাঁকে সেই পবিত্র মাজারের জালি মোবারক ছুঁয়ে আন্তরিক তৃপ্তি লাভ করি।

আট দিন মদিনা মনোয়ারায় কাটিয়ে মক্কা এবং পরে হজ্বের জন্য

জীবন ধন্য করার। আর আমার মতো এক পাপী, ধর্ম-কর্ম থেকে দূরের যাত্রীর আজ অপূর্ব সুযোগ হল প্রিয় নবীজির স্মৃতিবিজড়িত এই পবিত্র নগরীতে পদার্পণের। পরম সৌভাগ্য লাভ করলাম হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং মহানবী (সাঃ) কর্তৃক মহিমান্বিত কাবা শরীফ দর্শন করার। এ বিরল সৌভাগ্যের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট হাজার শোকর গোজার করলাম।

কাবা শরীফ সংলগ্ন মিস্ফালাহ্ এলাকায় আমাদের অবস্থানের জন্য একটি পৃথক বাড়ি ভাড়া নেওয়া হয়েছিল। কর্মকর্তারা আমাদের দু'জন সাবেক মন্ত্রীকে যথাযোগ্য সম্মান দেখাতে ত্রুটি করল না। সবচাইতে আলো-বাতাস সম্বলিত প্রশস্ত কক্ষটি আমাদের দু'জনকে দেওয়া হল। হঠাৎ বিছানা-পেটরা নিয়ে ডেলিগেশনের অন্যতম সদস্য জনাব কায়সার সাহেব আমাদের ঘরে ঢুকে পড়লেন। বললেন, এই ঘরটা খুব ভালো, আমিও এখানেই থাকব।

আমরা নিষেধ করতে পারি না। যা কিছু বলি বা করি সর্বাগ্রে মনে হয়, আমরা হজ্বব্রত পালন করতে এসেছি। ধৈর্য এবং সহ্য দুটোই প্রচুর থাকা প্রয়োজন। কায়সার সাহেবের সহ-অবস্থান মেনে নিলাম। কর্মকর্তারা যদিও বলল, আপনারা চাইলে তাকে অন্য কক্ষে জায়গা দেওয়া যায়। Two is company, three is crowd. তা সত্ত্বেও আমরা আপত্তি জানালাম না। কায়সার সাহেবকে ভালো করেই চিনতাম। তিনি নিজেকে কায়সার চিশতি বলে ডাকা পছন্দ করেন, পীর বলে প্রতিষ্ঠার প্রয়াস চালাচ্ছেন। নুরুল ইসলাম মঞ্জুর সঙ্গে আজমীরে তাঁর সাক্ষাৎ। স্বাধীনতার বিরোধী ছিলেন বলে বেশ কিছুদিন সেখানে গিয়ে আস্তানা গেড়েছিলেন। করিৎকর্মা লোক। ঢাকায় ফিরে এসে দিব্যি চিশ্‌তি বনে গিয়ে, দরবার খুলে দিয়ে কাওয়ালী আর কাচ্চি-বিরিয়ানীর আয়োজন করে অল্প দিনের মধ্যে জমিয়ে ফেললেন। বিমান বাহিনীর প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল তোয়াব সাহেবের নাকি তিনি পীর। একবার মঞ্জুর সঙ্গে তাঁর বাসায় গিয়ে গাওয়া ঘি সহযোগে গরম খিচুড়ি খেয়ে এসেছিলাম।

তাঁর পীরালি সম্বন্ধে কোন মন্তব্য নেই। কেননা, বিষয়টি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা নেই। তবে কায়সার সাহেব একজন কেতাদুরস্ত এবং কুশলী মানুষ। কথাও বলেন চমৎকার। সহজেই কাউকে অভিভূত করতে পারেন। ধর্মীয় বিষয়াদি নিয়ে তাঁকে তেমন একটা মাথা ঘামাতে দেখলাম না। তাঁকে অধিকতর ব্যস্ত দেখা গেল, আরও রিয়াল কি করে যোগাড় করা যায় এবং আরও জিনিসপত্র কি করে ক্রয় করা যায় তাতে তৎপর থাকতে। আমার কাছেও এক হাজার রিয়াল ধার চাইলেন, ঢাকায় টাকা পরিশোধ করবেন। আমার তাঁকে টাকা দেওয়ার ইচ্ছা হল না। কেননা, হজ্ব করতে এসে এত কেনাকাটা সমর্থন করতে পারছিলাম না।

একবার শেষে বললাম, জী লেগেছে। কি খাওয়াবেন?

তাঁর সহোদর ভাই এসেছিলেন এয়ারপোর্টে। সেকি জড়াজড়ি আর সশব্দ চুম্বন। দুই বুড়োর কাণ্ড দেখে সবাই আনন্দ পাই।

তিনি তাঁর ভাইকে বললেন, সকলের জন্য খাবার নিয়ে এসো।

তিনি একগাদা বিরাট স্যাণ্ডউইচের মতো জিনিস নিয়ে এলেন। প্যারিসেও এই জিনিস খেয়েছি। বেশ লম্বা এক টুকরো রুটির মধ্যভাগে সালাদ, পনীর এবং মাংসের টুকরো পুরে দেওয়া হয়েছে। খেতে বেশ সুস্বাদু। কিন্তু আমাদের মতো লোকের জন্য একটিই প্রয়োজনের অতিরিক্ত মনে হয়। 'হালিব চায়ে'ও খেলাম, 'হালিব চায়ে' মানে দুধ চা।

ডেলিগেশনের সদস্যদের জন্য গাড়ির ব্যবস্থা ছিল। আমাদের মক্কা-মুয়াজ্জমায় নিয়ে যাওয়া হল।

সেইটি ছিল আরবে আমার জীবনের প্রথম আগমন। পুস্তকে যা পড়েছি, তার সঙ্গে এখন কোনই মিল খুঁজে পাচ্ছি না। আধুনিক শহর, অত্যাধুনিক রাস্তাঘাট, দুনিয়ার সমস্ত আরামদায়ক গাড়ির সমারোহ। এয়ারপোর্টে তাঁবু আকৃতির বায়ুতাড়িত শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বিশাল টার্মিনাল যা দেখে আশ্চর্য হয়ে যাই। হুজুরের (সাঃ) সময়কার যেসব বর্ণনা পড়েছি, আজকের অবস্থার সঙ্গে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। জেদ্দা থেকে মক্কা পর্যন্ত প্রশস্ত পথ। আসা-যাওয়ার জন্য পৃথক ব্যবস্থা—ওয়ান ওয়ে। দু'দিকে অসংখ্য বহুতল বিশিষ্ট নতুন নির্মিত বাসগৃহসমূহ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। অধিকাংশই শূন্য। বসবাসের লোক নেই। শুনলাম, সরকার থেকে বাড়ি করে দিয়েছে। গাড়ি ক্রয়ের জন্য ঋণ দেবে। ব্যবসা করার জন্য ঋণ দেবে। যা-ই কর, সর্বপ্রকারের সহায়তা দেওয়া হবে—তারপরও স্বভাব যাযাবর বেদুঈন এবং অন্যান্য আরব গোত্রের মানুষেরা এসব ঘরবাড়ি পছন্দ করে না। জোর করে নিয়ে এলে কিছুদিন পরই পাখি উড়ে যায়। উন্মুক্ত আকাশ আর মরুভূমির অসীম বালুরাশির আহ্বান ওদেরকে ঘরছাড়া করে। তাঁবুতেই জীবন কাটাতে ভালোবাসে। অবশ্য ক্রমশই আধুনিক জীবনের সহস্র মোহ তাদেরকে অধিকতর আকর্ষণ করছে। উটের পিঠের চাইতে মার্সিডিসের সুশীতল অভ্যন্তরই ক্রমশ জনপ্রিয়তা লাভ করছে। নবীন আরবীয়রা দ্রুত জেগে উঠছে। বিদেশ থেকে মাটি এনে নানাবিধ বৃক্ষরাজি রোপণ করে ধু ধু প্রান্তরের মাঝে সবুজের বলয় সৃষ্টির প্রয়াস পাচ্ছে।

মক্কা নগরীতে প্রবেশের সময় এক বিচিত্র অনুভূতি মনকে আচ্ছন্ন করে তুলল। সেন্ট গ্রেগরীজের ছাত্র আমি। ধর্মের পথে খুব কমই হেঁটেছি। কিন্তু গাড়িতে বসেই যখন প্রথমবারের মতো পবিত্র কাবাঘরের বহির্ভাগ দৃষ্টিতে এল, পরম করুণাময়ের প্রতি কৃতজ্ঞতায় দু'চোখ বেয়ে পানি নেমে এল। কত ধার্মিক মানুষ আজীবন স্বপ্ন দেখে মক্কা মুয়াজ্জমায় আসার, কাবাঘরের দর্শনে

হজ্বের বিষয়ে বিস্তর উপদেশ দিলেন, মুখে মুখে সংক্ষিপ্ত নিয়ামাবলি বলে দিলেন। তিনি ইতিমধ্যে কয়েকবার পবিত্র হজ্ব সমাপন করেছেন।

আগের দিন আমার একান্ত সচিব কাজী মাহবুবুর রহমান আমার বাসায় মিলাদ মাহফিলে নিয়ে এসেছিল চট্টগ্রাম শাহী জামে মসজিদের পেশ ইমাম হযরত মাওলানা আবদুল আহাদ আল-মাদানী সাহেবকে। বিশাল দেহের অধিকারী তিনি। খোদ মদিনা মনোয়ারার অধিবাসী ছিলেন। চট্টগ্রামে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে ওখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। তাঁর মতো এতবড় একজন আলেম খুব কমই দেখা যায়। স্বভাবটি শিশুর মতো। আলাপ হতেই বিরাট থাবায় আমাকে বুকে টেনে নিলেন। তিনিই মিলাদ পড়ালেন এবং তাঁর নিজস্ব ভাষা আরবিতে দীর্ঘক্ষণ দোয়া করলেন। তাঁকে পেয়ে খুব আনন্দ হল। হজ্বের সময় নানাভাবে তিনি আমাদের দু'জনকে আগলে রেখেছিলেন। কোন কষ্ট করতে দেননি। তিনি ছিলেন নিষ্কলঙ্ক জীবনের প্রতিচ্ছবি। আল্লাহ্ এবং রসুলের (সাঃ) নির্দেশিত পথের বাইরে কোন দিন একটি পদক্ষেপ দেননি বলে দাবি করেন। খোদ্ রসুলে করিম (সাঃ)-এর বংশধর হযরত মাওলানা আল্ মাদানী হাসতে হাসতে আত্মবিশ্বাসে বলতেন, কোন সাহাবীদের সঙ্গে নয়, খোদ্ নবীজির সঙ্গেই আমি বেহেশ্তে যেতে চাই।

তাঁর অদ্ভুত বাংলা উচ্চারণ খুব উপভোগ করতাম। তিনি আজ পরলোকে। আল্লাহ্র নেকবান্দা মাদানী সাহেব যথাযোগ্য মর্যাদায় হুজুরের (সাঃ) সঙ্গে জান্নাতে অবস্থান করুন—আজ এই প্রার্থনাই জানাই।

হজ্বের ফ্লাইটে উঠে, হজ্বযাত্রীদের নিকট থেকে আন্তরিক অভ্যর্থনা পেয়ে মন আনন্দে ভরে গেল। কোন পরিশ্রমই বৃথা যায় না। আমরা ক্ষমতায় থাকাকালীন তাদের যে খোঁজখবর করেছিলাম এবং ক্যাম্পে সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করে দিয়েছি, সেজন্য তাঁরা কৃতজ্ঞ। আমি যে উপহারের প্যাকেট প্রতি যাত্রীকে প্রদানের জন্য বিমানকে নির্দেশ দিয়েছিলাম, সেই প্যাকেটই একটি হাসিমুখে হস্টেজ আমাকেও প্রদান করল।

জেদ্দাতে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোন কষ্ট হল না। আমাদেরকে একটি সুসজ্জিত কক্ষে বসতে দেওয়া হয়েছিল। মাদানী সাহেব বারবার জিজ্ঞেস করছেন, শাহ্ সাহেব, খিদা লাগছে?

ফেললাম। বললাম, এটা দিয়ে কি হবে? আমাকে হজ্বে পাঠাতে হলে আল্লাহ্‌কে জেলখানার দেয়াল ভেঙে আমাকে বের করতে হবে।

আল্লাহ্ তা'আলার শান বুঝা আমাদের কর্ম নয়। মাত্র দু'দিনের মাথায় অবিশ্বাস্য-পথে সিপাহী বিপ্লবের মাধ্যমে আমাকে কারাগার থেকে বের করে হজ্বে যাওয়ার সুযোগ করে দিলেন। জীবনে বহুবার পরম করুণাময়ের অজস্র রহমত এবং দয়া আমার মতো এক নগণ্য মানুষের জীবনে বর্ষিত হয়েছে। দুনিয়াতে এত জমিন নেই যেখানে সমস্ত জীবন সেজদা করলেও আমার শোকর গোজার করা যাবে।

হজ্বে যাব শুনে নূরে আলম সিদ্দিকী ছুটে এল। তাঁর স্বভাবসুলভ আবেগের সঙ্গে হাসি-কান্না মিলিয়ে সে এমন একটি ঘটনা শোনাল, যা শুনে মনে আন্তরিক আঘাত পেলাম। বঙ্গভবন থেকে যখন আমাদের গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়, সে আমাদের জীবন সংশয় চিন্তা করে দৌড়ে মিজান চৌধুরী সাহেবের নিকট গেল। সব খুলে বলে কান্নাজড়িত কণ্ঠে সে নিবেদন করল, মিজান ভাই একটা কিছু করুন। মোয়াজ্জেম ভাই, ওবায়েদ ভাই, মঞ্জু ভাই এরা সব আমাদের নেতা এবং ভাই। এদের জীবন বাঁচাতে একটা কিছু করুন।

মিজান সাহেব শুনে দুঃখ পেলেন বলেই মনে হল। অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। পরে নূরে আলমকে বললেন, ওরা আমাদের সবাইকেই মেরে ফেলবে। মরতেই যখন হবে তখন আস এক হাত তাস খেলে নিই। এই বলে তিনি বালিশের নিচ থেকে তাসের প্যাকেট বের করলেন। স্তম্ভিত এবং যারপরনাই দুঃখিত নূরে আলম তৎক্ষণাৎ ওখান থেকে চলে আসে।

এই হল মিজান চৌধুরী। সারাটা জীবন তার সপক্ষে কথা বলেছি, সুযোগ পেলেই তার জন্য কাজ করেছি। মানুষের অকৃতজ্ঞতার যেমন সীমা নেই, আমাদের বারংবার ভুল করারও তেমন বিরাম নেই। এরপরও মিজান চৌধুরীর বলয় থেকে দূরে থাকিনি। তার জন্য ক্ষতিগ্রস্তও হয়েছি বহুভাবে।

হজ্বে যাওয়ার দিন এহ্‌রাম পরে প্রস্তুত হতেই মামা বললেন, দু'রাকাত নামাজ আদায় করে আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে শোকর আদায় কর।

মামার কাছে অকপটে স্বীকার করলাম, সঠিকভাবে শোকরানার নামাজ পড়ার পদ্ধতি তেমন আয়ত্তে নেই। শুনে তিনি আফসোস করলেন। বললেন, এই জন্যই কি বাড়িতে মুন্সী রেখে ছোটবেলায় তোদেরকে নামাজ শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা করেছিলাম?

মামাকে হেসে বললাম, খুব শৈশবে শিখিয়েছিলেন বলেই বড় হয়ে ভুলে গিয়েছি। আমি নামাজ শিক্ষা সাথে নিয়ে যাচ্ছি। ইন্‌শাআল্লাহ্ প্লেনে যেতে যেতেই জরুরি বিষয়গুলো শিখে নেব।

মামা হাত ধরে আমাকে নামাজ আদায় করতে সহায়তা করলেন। পরে

অন্যান্য কর্মকর্তা এবং বিশিষ্ট আলেম ওলামাদের সমন্বয়ে একটি শক্তিশালী ডেলিগেশন এবার হজ্ব করতে যাবে এবং তারা বাংলাদেশ যে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র তার যোগ্য ভূমিকা ও মর্যাদার স্বাক্ষর রেখে আসবে।

সেভাবে হজ্ব ডেলিগেশন তৈরি হল। ইউসুফ ভাই নেতা, আমি উপ-নেতা। হাজী ক্যাম্প খোলা হল। মোশতাক সাহেব আমাদের দু'জনকে ডেকে বললেন, তোমাদের পিতা-মাতা হাজী ক্যাম্পে থাকলে তোমরা তাদের জন্য যে ব্যবস্থা করতে, সেরকম ব্যবস্থা ক্যাম্পে করতে হবে। হাজী-ক্যাম্পের ব্যবস্থাদি দেখেই যেন সকলে বুঝতে পারে ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ধর্মহীনতা আমাদের কাম্য নয়। এটা মুসলমানদের দেশ এবং সেই পরিচয়ই প্রধান বৈশিষ্ট্য হওয়া বাঞ্ছনীয়।

আমরা দু'জনই বিষয়টিকে গুরুত্ব সহকারে নিয়েছিলাম। বর্তমানে যেখানে পাবলিক লাইব্রেরি রয়েছে, সেই স্থানটি অব্যবহৃত ছিল। সেখানে হাজী ক্যাম্প স্থাপন করা হল এবং যতটুকু সাধ্য, সীমিত-সুযোগের মধ্যে আমরা তার সুব্যবস্থা করলাম। প্রতিদিন বিকেলে আমরা ক্যাম্প পরিদর্শনে যেতাম এবং হজ্বযাত্রীদের সুযোগ-সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখতাম। দু'জন মন্ত্রী বিষয়টিকে গুরুত্ব দিলে কর্মকর্তারাও বুঝে গিয়েছিল, কর্তব্যে অবহেলা করা যাবে না।

ব্যবস্থা মোটামুটি সন্তোষজনক হয়েছিল। এর মধ্যে ঘটে গেল সরকার পরিবর্তনের পালা। হজ্ব ডেলিগেশনের নেতৃত্বেও পরিবর্তন হল। প্রধান বিচারপতিকে নেতা মনোনীত করা হল। সরকার ডেলিগেশনের অন্য সদস্যদের ঠিকই রাখলেন। আমাদের দু'জনকেও সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করলেন। দু'দিনের কারাবাসের পর বেরিয়ে এসে ধর্ম মন্ত্রণালয়ের চিঠি পেলাম।

ইউসুফ ভাই সহ বসে ঠিক করলাম, হজ্ব না হয়ে অন্যকিছু হলে আমরা যেতাম না। কিন্তু মক্কা মদিনায় ঝাড়ু দেওয়ার কাজও যদি করতে হয়, আমরা যাব। এ বিষয়ে আত্মমর্যাদার প্রশ্নই ওঠে না।

আমরা চিঠি লিখে সম্মতি জানালাম। হজ্বে যাওয়ার সমস্ত বন্দোবস্ত পাকা হল।

যেদিন জেলে নিয়ে গেল তার পরদিন বাসা থেকে জামা-কাপড়ের সঙ্গে হজ্ব-পালনের একটি পুস্তিকা দিয়ে দিয়েছিল। ব্যাগ খুলে সেই পুস্তিকাটি হাতে নিয়ে মনে হল এর চাইতে বড় কৌতুক আর কি হতে পারে! সাত দিন পর ছিল আমাদের ফ্লাইট। আর আমি এখন কেন্দ্রীয় কারাগারের দশ সেলে বন্দি। কবে মুক্তি পাব এবং আদৌ পাব কিনা জানি না।

কার ওপর গোস্বা করে জানি না পুস্তিকাটি ঘরের দেয়ালে ছুঁড়ে

মালেকের আসন্ন বিয়োগ-ব্যথা সহ্য করতে পারছিলাম না। ছুটে চলে এলাম হাসপাতাল থেকে। মরণব্যাধি ক্যান্সার তাঁকে দুনিয়া থেকে নিয়ে চলে গেল দু'-একদিন পরই। পরোপকারী, সর্বাংশে বিশ্বাসভাজন, অমায়িক চরিত্রের অধিকারী মালেক আমাদের ছেড়ে চলে গেল চির অজানার পথে।

মালেক এসে প্রস্তাব করল, ভাই, এত শীঘ্র বাসা ভাড়া পাওয়া কঠিন। আমার ওয়ারীর গোপীকিষাণ লেনের বাসস্থানের দোতলাটা আপনাদের ছেড়ে দিই, আপনি সবাইকে নিয়ে সেখানে ওঠেন।

বললাম, সম্পূর্ণ বাসা নিয়ে তোরা থাকিস। দ্বিতল ছেড়ে দিলে স্থান সঙ্কুলানে অসুবিধা হবে না?

সে বলল, আমাদের পরিবারের আপনি সর্বজ্যেষ্ঠ সদস্য। আপনি অসুবিধায় থাকবেন আর আমরা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসবাস করব তা কী করে হয়! আমি দোতলা খালি করার নির্দেশ দিয়ে এসেছি, আপনার কোন কথা শুনব না।

আরও একটি বিষয় বিবেচনায় নিলাম, আমি এই আছি, এই নেই। হয় রাজনীতির পেছনে শহর-বন্দরে ঘুরছি; নয় তো সরকারের অতিথি হয়ে প্রায়ই জেলখানায় ঢুকছি। রানারা যদি মালেকের বাড়িতে তার সঙ্গে থাকে—ওদের জন্য আমাকে ভাবতে হবে না। মালেক এবং ওর পরিবারের প্রতিটি সদস্য রানাদেরকে আমার চাইতেও বেশি সুরক্ষা দেবে।

বড় দা এই পরামর্শই গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করলেন। ঠিক হল বাসা ছেড়ে আমরা মালেকের ওখানেই ওঠার ব্যবস্থা করব। সংসার গুটাতে বেশ ঝামেলা। তার চাইতে ঝামেলা বাড়ি পরবর্তন।

এর মাঝখানে ধর্ম মন্ত্রণালয় থেকে একটি চিঠি হস্তগত হল। সরকার আমাকে হজ্ব ডেলিগেশনের সদস্য মনোনীত করেছে। আমি যদি একজন সদস্য হিসাবে হজ্বব্রত পালনে সম্মত থাকি; তা হলে তাদেরকে লিখিতভাবে জানালে, তারা সর্বপ্রকার আয়োজন সম্পন্ন করতে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

বিষয়টির একটি ইতিহাস আছে। এবার হজ্বের সময় নিকটবর্তী হতেই প্রেসিডেন্ট মোশতাক আমাকে বললেন, প্রথম বারের মতো আমাদের দেশের ন্যাশনাল কেরিয়ার বাংলাদেশ বিমান হজ্বযাত্রী বহন করে সৌদি আরব নিয়ে যাবে। বিমানের প্রতিমন্ত্রী হিসাবে তোমার যাওয়া ভালো দেখাবে!

হজ্বের সুযোগ পাবার সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেলাম। অধ্যাপক ইউসুফ আলী সাহেব সম্মুখে ছিলেন। তিনি বললেন, সুযোগ থাকলে আমিও এবার হজ্ব করতে চাই।

মোশতাক সাহেব বললেন, তা হলে ইউসুফ সাহেব ডেলিগেশনের নেতা এবং বিমান প্রতিমন্ত্রী উপনেতা হিসাবে যাবে।

উঠলে অপরিপক্ক, অর্ধ-কম্যুদের 'আফগান স্টাইলে' বিপ্লবের ধ্বজা বেকায়দায় পতিত হবে। তাই পথের কাঁটা দূর করার প্রচেষ্টা প্রতিনিয়ত চলছে।

তারপরও বেঁচে আছি কি করে! আমরা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি, 'রাখে আল্লাহ্-মারে কে।' চেষ্টার অবধি নেই—আজও নিঃশেষ করা গেল না! চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে—একদিন না একদিন লক্ষ্য অব্যর্থ হতে পারে। তারই নিরন্তর প্রচেষ্টা চলছে। মোশতাক সাহেব, আপনি মহা ভ্রান্তির নজির স্থাপন করলেন। ইতিহাস কাউকে ক্ষমা করে না।

মিন্টু রোডের দুই নম্বর বাড়ি, বহু স্মৃতিবিজড়িত। হাসি-কান্নার কত না ঘটনা ছড়ানো এখানে। রানার অক্ষরজ্ঞান হতেই বাড়ির সমস্ত দেয়াল ভরে ফেলল বড় বড় 'অ, আ' লিখে। তাকে যতই কাগজ-পেন্সিল দেওয়া যাক না কেন, সাদা দেয়াল ভর্তি তার নবীন হাতের নবীনতর অক্ষরগুলো। এখান থেকেই হাবিবা ও রোজির বিয়ে হল।

মালেকের বিয়েও হল আমার বাসাতেই। মালেক আমাদের ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক। উচ্চশিক্ষিত মালেক সম্পন্ন ব্যবসায়ীর সন্তান—মায়ের পেটের ভাইয়ের মতোই সে ছিল আমার আপনজন। কর্মীদের মধ্যে একমাত্র তাকেই দেখেছি কোন প্রশ্ন না করে নির্দেশটি পালন করতে। সে বলত, নেতা নির্দেশ দিয়েছে, চিন্তা করার দায়িত্ব তার, আমাদের কর্তব্য নির্দ্বিধায় তা পালন করা।

তার বিয়েও ঠিক করলাম আমরা। সালেহা এবং আমি নারায়ণগঞ্জে গিয়ে কনে দেখে পছন্দ করলাম—তবেই মালেক বিয়েতে সম্মত হল। বৌভাত হল আমার মিন্টো রোডের বাসায়।

মালেক সারাজীবনই আমার সঙ্গে রাজনীতি করেছে। আওয়ামী লীগ, ডেমোক্রেটিক লীগ এবং জাতীয় পার্টি এই তিন অধ্যায়েই সে ছিল আমার বিশ্বস্ত সহকর্মী। নিদারুণ ব্যাধি ব্লাড্ ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে প্রায় যুবক বয়সে সে মৃত্যুবরণ করে। তাঁর মৃত্যুতে আপন ভাইয়ের মৃত্যুশোক পেয়েছিলাম—আজও তার কথা মনে হলে অন্তঃকরণ হাহাকার করে ওঠে। আর একটি মালেক জীবনে পাইনি! মৃত্যুর দু'-একদিন আগে ন্যাশনাল মেডিকেল হাসপাতালে যখন তাকে দেখতে গেলাম, সে তার স্ত্রীকে ডেকে বলল, পিতা বল, ভাই বল, সবই নেতা আমার। মৃত্যুর পর তোমরা কখনও তার নির্দেশের বাইরে চলো না।

গড়াগড়ি খাবে। আমরা তা হতে দিতে পারি না। তারা টার্গেট আমাদের করবে না, করবে তাদের যারা তাদের দেওয়া নিরাপদ আশ্রয়ে বছরের পর বছর বসবাস করে তাদের শেখানো বুলিগুলোকে স্বীয় রক্ত-কণিকায় ধারণ করে দেশে প্রত্যাবর্তন করে নেতা-নেত্রী সেজে নিজের ও মুরব্বীদের আখের গোছাবার ব্রতে অধিকতর ব্যাপ্ত!

বর্ডার-রক্ষীরা উভয় প্রান্তেই থাক, ক্ষতি নেই। দুটি পৃথক দেশের অস্তিত্বের প্রমাণ দিতে হবে না! কিন্তু প্রতিদিন হাজার হাজার গরু এদেশে পাঠান চাই। ওরা যে গোমাংস প্রকাশ্যে ভক্ষণ করে না। কাছিমের ডিম, রুই মাছ, শাক-সবজি, পিঁয়াজ, মরিচ, রসুন, তেল, ডাল, চাল এমন একটি পণ্যের নাম করা যাবে না, যা শত শত ট্রাকে করে প্রতিদিন অগণিত সীমান্ত ফাঁড়ি পার হয়ে বাংলাদেশে না ঢুকছে। দূরে যেতে হবে না, গুলশানে বসেই সব পাবেন। সীমান্ত জেলাগুলো প্রায় ওদেশেরই অংশ, প্রকাশ্যে লেন-দেন, যাতায়াত। কেবল একটু মাশুল গুনতে হয় সীমান্ত রক্ষীদেরকে। ওদের পোশাক, ওদের শাড়ি সৌখীনতার নিদর্শনরূপে গণ্য হয়। বাংলাদেশে এত গাড়ি ভাংচুর কেন? কারা এই সংস্কৃতি প্রভূত অর্থ ব্যয়ে চালু করতে সমর্থ হয়েছে! সুদূর জাপান থেকে গাড়ি আমদানি না করে নিকটস্থ মারুতি নয় কেন, হোক না তা নিম্নমানের এবং বিশ্ব-মানদণ্ডে নিকৃষ্ট। তোমাদের যুদ্ধের সময় এত করলাম, আমাদের গাড়ি না কিনে কোথায় দূরদেশ জাপানে চলে যাচ্ছ! একি শোভন! লোক লাগিয়ে গাড়ি ভাঙা হবে—এবং যেগুলো জাপানি, বেছে বেছে সেগুলো।

আমরা এসব হতে দিতে চাই না। শুধু যে চাই না—তা নয়, প্রতিরোধ করতে চাই সর্বশক্তি দিয়ে। আমরা 'টারগেট' হব না, হবে কি ওরা, যারা মসজিদ ভেঙে দিলে বক্তব্য দেয়, মোগলরাই অন্যায় করেছিল। হিন্দুদের দেবতার স্থানে মসজিদ নির্মাণ করেছিল! তেত্রিশ কোটি দেবতার দেশে সর্বত্রই দেবস্থান থাকার কথা।

বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের তীর ঘেঁষে নতুন দ্বীপ জাগলে তা হয়ে যাবে তাদের অংশ। নতজানু নীতির অনুসারীরা মুখ খুলবে না। তালপট্টি হাতছাড়া হয়ে যায় যাক—তাদের তখ্ত যেন বজায় থাকে, তাদের পট্টিও যেন অটুট থাকে। আমরা এর বিরোধী—তাই বারবার আঘাত নেমে আসছে আমাদের উপর।

নিষ্ফলা গাছে বাঁদরও চড়ে না—তা-ই গণতান্ত্রিক, ধর্মীয় মূল্যবোধ সম্পন্ন, জাতীয়তাবাদী এবং মুক্তচিন্তার ধারক-বাহক বলে বহুদিন থেকে চিহ্নিত আমাদেরকে নিশ্চিহ্ন করার পদক্ষেপ বারবারই এসেছে!

আগামী দিনের সম্ভাবনাময় নেতৃত্বের ক্ষেত্রে এরা স্বমহিমায় ভাস্বর হয়ে

কাহিনী লিখতে লজ্জা পায় না। ভিনদেশের 'মসজিদ ভেঙে মন্দির গড়ার' দলের অর্থানুকূল্যে তাদের নির্দেশিত দৃষ্টিকোণের গ্রন্থ প্রণয়ন করে বিভীষণের রেকর্ড ভঙ্গ করার গৌরব অর্জন করে। বাংলাদেশে জন্মে যারা মীরজাফর, উমিচাঁদ আর জগৎ শেঠদের প্রেতাত্মার প্রতিনিধিত্ব করে, তাদের পথ চিরদিনের জন্য রুদ্ধ করে দেওয়ার সুযোগ হেলায় হারালেন খন্দকার মোশতাক এবং জাতিকে বহুদিন ধরে তার খেসারত দিতে হবে।

আমরা কয়েকজন তরুণ মাঝি বারবার টারগেট হই কেন? আমাদের বড় দোষ নিজেদের নৌকায় আমরা চড়তে চাই। চাই না দাদাদের বৃহৎ আইডিয়াগুলোকে এদেশে আমদানি করে শান্তিতে বসবাসরত সহজ সরল ধর্মপরায়ণ মানুষগুলোকে অশান্তির অনলে নিক্ষেপ করতে। সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতার প্রশ্নে কোনদিন আপস নয়—বঙ্গবন্ধুর এই শিক্ষাকে আঁকড়ে ধরে থাকতে। বঙ্গবন্ধু প্রাণ দিয়েছেন দেশেরই কিছু সেনা-সদস্যদের হাতে। কিন্তু তার কার্যকারণ কোন কোর্ট খুঁজে দেখার কষ্ট স্বীকার করল না। এ হত্যাকাণ্ডের পশ্চাতে কোন মুরব্বী দেশের গোয়েন্দা সংস্থার হাত রয়েছে কিনা বা তাদের অনুমোদনক্রমে বৃহত্তর মুরব্বীদের অনুমত্যানুসারে এ ঘটনাটি ঘটল কিনা তা বহু আন্তর্জাতিক পুস্তক-পুস্তিকায় বিবৃত হলেও বিচারের রায়ে তার উল্লেখ হল না—তাকে বিবেচনায়ই আনা হল না। সময় নেই, ঝোলার বিড়াল যদি বেরিয়ে যায়!

আমরা বারবার টার্গেট হই এই জন্য যে, ব্রাহ্মণ্যবাদের হিংস্র ছোবল থেকে, যার কারণে একবার ভারত বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান সৃষ্টি হল, বাংলাদেশকে রক্ষা করতে চাই। দেশের মাটি বা মানুষ তাদের কাম্য নয়। সেটা বোঝা বা Liability। প্রয়োজন বারো কোটি মানুষের দেশটিকে পণ্যের বাজারে পরিণত করা। নিম্নমানের, নিম্নরুচির উৎপাদিত এই পণ্য বিক্রয়ের একটি সদা-প্রস্তুত বাজার চাই। বারো কোটি মানুষ অধ্যুষিত দেশটিতে যদি সব রপ্তানি করা যায়, তা হলে তাদের দেশের অর্থনীতি চাঙ্গা হতে বাধ্য। এর বিরোধী আমরা। শুধু আজ থেকে নয়—সেই শৈশব থেকে। তাই আমরা তাদের চোখের বিষ।

এদেশ থেকে গ্যাস যাবে। বঙ্গোপসাগরের সম্ভাবনাময় গ্যাস সুড়ঙ্গ-পথে চলে যাবে গন্তব্যে—আমরা তার বিরোধিতা করি, তাদের কোপানল আরও প্রখর হয় আমাদের বিরুদ্ধে। পূর্বাঞ্চলের বিদ্রোহ দমনে বাংলাদেশের অভ্যন্তর দিয়ে সৈন্য পাচারের জন্য, অবাধে পণ্য-রপ্তানির জন্য করিডোর ওদেরকে দিতে হবে। আমরা আপত্তি তুলে বলি, সৈন্য চলাচল করলে কেবল যে মা-বোনের ইজ্জত-সম্ভ্রম ধূলায় লুণ্ঠিত হবে তা-ই নয়, আমাদের কষ্টার্জিত স্বাধীনতাও সেই সঙ্গে ধূলায় লুণ্ঠিত হবে। সার্বভৌমত্ব সিকিম-ভুটানের মতো

Cowards die many a times before their death. ইংরেজি এই প্রবাদবাক্যটি অনেকদিন থেকেই প্রচলিত, কাপুরুষ মরার পূর্বে বহুবার মরে।

খন্দকার মোশতাক লোক ভালো, না মন্দ সে বিচারে যাব না—আজ তিনি সব বিচারের ঊর্ধ্বে চলে গেছেন। কিন্তু স্বেচ্ছায় সেদিন তিনি যে সুযোগ গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানালেন—তা কোন ভাবেই যুক্তির আলোকে সমর্থন করা যায় না।

বঙ্গবন্ধুর মতো সিংহপুরুষের হত্যাকাণ্ডের পর, মোশতাকের ভাষায় সংশ্লিষ্ট সৈনিকদের ঐকান্তিক অনুরোধে, রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করে যে ঝুঁকি নিলেন পরবর্তী সমগ্র জীবনের জন্য; আজ সেনাবাহিনীর প্রতিটি সদস্য এবং দেশের আপামর জনগণ যখন তাঁকে পুনরায় ক্ষমতায় দেখতে চায়, যখন মুখের সম্মুখে রেডিও মাইক নিয়ে বারবার ঘোষণা দেওয়ার জন্য অনুরোধ-উপরোধ করতে থাকে, সে সময় তিনি সকলকে যারপরনাই হতাশ করে, জাতিকে তার প্রত্যাশা থেকে দূরে ঠেলে এক অনিশ্চিত অন্ধকারময় পথে রেখে দিয়ে নিজের ব্যক্তিগত বা স্বাস্থ্যগত কারণ দেখিয়ে জনগণের প্রত্যাশার অমর্যাদা করলেন। ক্ষমতাগ্রহণের ক্ষমতা হারিয়ে ফেললেন। সাহসের যদি এতই অভাব, তা হলে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের পর দায়িত্ব নিতে এগিয়ে গেলেন কেন? সকলেই জানেন বাঘের পিঠে চড়লে, পিঠেই চড়ে থাকতে হয়। তা না করে পৃষ্ঠদেশ থেকে নেমে এলে সে বাঘেই খেয়ে ফেলে।

সেইজন্যই প্রবাদটির কথা উপেক্ষণীয় নয়। সত্যিই কাপুরুষরা মৃত্যুর পূর্বে অনেকবার মরে। মোশতাকও মরলেন!

একটি ঘোষণায় সেদিন ইতিহাস নতুন করে লিপিবদ্ধ হত। জাতি আবার ভরসা ফিরে পেত। দেশে শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠিত হত। উচ্চাভিলাষী সেনা কর্মকর্তারা বাংলাদেশকে ক্ষমতার অপারেশন টেবিলে নিয়ে বারবার কাটাছেঁড়া করার সুযোগ পেত না। নতুন নির্বাচন দিয়ে একটি সাংবিধানিক ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করে গণতন্ত্রমনা মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষগুলোকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় বসিয়ে একটি সমৃদ্ধিশালী ও সুখী সমাজ গড়া সম্ভব হত। লোভাতুর শকুনীদের শ্যেণ দৃষ্টি সীমান্ত অতিক্রম করে চির-স্বাধীনতাকামী বাঙালিদের পর্যুদস্ত করতে প্রয়াস পেত না।

পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রের নিকটস্থ মহানগরীতে নিয়মিত মার্কেটিং করতে অভ্যস্ত ধর্মনিরপেক্ষতার অতি আগ্রহী পথিকৃৎগণ প্লেনে চড়েই মুসলমান ঘরের মেয়ে কিন্তু হিন্দু ঘরের বউ এমনি উভচর মজুমদার গিন্নীরা মাথার সিঁথিতে পরমানন্দে সিঁদুর লেপন করে। মুসলমান ঘরের মেয়ে প্রায় জনপদ বধূ 'মুসলিম কালো পিঁপড়া' আর 'হিন্দু লাল পিঁপড়া'র কল্পকাহিনী লিখে ধর্মীয় সহনশীলতার কারণে সুখ্যাত বাংলাদেশে মুসলিম কর্তৃক হিন্দু নির্যাতনের

করেননি। জেল কর্তৃপক্ষকে বারবার জিজ্ঞেস করতেন, আমি কেমন আছি! ভালো আছি কিনা!

তারা বিরক্ত হলেও তাঁর বয়স, আভিজাত্য দেখে তাঁকে সান্ত্বনা দিয়েছে, আপনার ভাগ্নে ভালো আছে। চিন্তা করবেন না।

তিনি বলতেন, ও আমার ভাগ্নে নয়, ও আমার প্রাণ, আমার আত্মা। তোমরা ওকে কষ্ট দিও না। ওকে দেখো। কি চাও তোমরা বল!

তাঁকে কিছুতেই জেল গেট থেকে বাড়ি নেওয়া যাচ্ছিল না। দু'দিন একনাগাড়ে জেলগেটে পাগলের মতো পড়ে ছিলেন। ৭ তারিখ গভীর রাতে আত্মীয়স্বজন এসে জোর করে তাঁকে তুলে নিয়ে যায়। আমার মুক্তির সময় তাই তিনি ওখানে উপস্থিত ছিলেন না। খবর পেয়ে এখন ছুটে এসেছেন।

আরও শোনা গেল, গুজবের পর গুজবের শেষ নেই—সে সময় আমাদের এক কর্মী বোকামি করে এবং খবরের সত্যতা যাচাই না করে আমার শ্বশুরবাড়িতে খবর দেয়, আমাকে রাতে জেলখানায় হত্যা করা হয়েছে বলে সে খবর পেয়েছে—মরদেহ আনয়নের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

এ সংবাদ শুনলে যা হবার তা-ই হয়। সমস্ত বাড়িতে কান্নার রোল পড়ে যায়। আমার শ্যালিকারা দেয়ালে ঠুকতে ঠুকতে কপাল ফাটিয়ে ফেলে। বয়স্করাও সে কথা বিশ্বাস করে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, পাড়ার সমস্ত লোক বাসায় ভেঙে পড়ে।

আমার শ্যালক শওকত, সে মাত্র জেলখানা থেকে ফিরেছে। সে নিজেই গাড়ি চালাচ্ছিল। খবর শুনে গাড়ি থেকে নেমে উন্মত্ত ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হয়ে একখণ্ড কাঠ নিয়ে সে পরিবারের সদস্যদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে দিগ্‌বিদিগ।

সে বলছে, এই মাত্র আমি জেলগেট থেকে এলাম, দুলাভাই ভালো আছেন। সুস্থ আছেন। আর এখানে সবাই মিলে কপাল ফাটাচ্ছে, মরা কান্না কাঁদছে, পাড়া এক করে ফেলেছে। সবক'টাকে পিটিয়ে শেষ করব।

প্রতিবেশীরা শওকতকে কষ্টে আটকায়। কিছুটা শান্ত পরিবেশ ফিরে এলে, খবরের উৎস খুঁজে কর্মীটিকে টেলিফোন করলে সেও দুঃখে কেঁদে ফেলে স্বীকার করে তার ভুল হয়েছে। এত বড় মারাত্মক খবর যাচাই না করে পরিবেশন করার জন্য তার অনুশোচনার অন্ত নেই।

ভাগ্যিস, সংবাদটা মিন্টু রোডে পৌঁছেনি!

বিকেলে রেডিওতে মোশতাক সাহেবের রেকর্ডকৃত ভাষণ প্রচার করা হল। তিনি দেশবাসীকে জানালেন, ব্যক্তিগত কারণে তার পক্ষে দেশের রাষ্ট্রক্ষমতার গুরুদায়িত্ব আর নেওয়া সম্ভব নয়। তিনি দেশবাসীকে শান্ত থেকে খোদাতায়ালার উপর ভরসা রেখে সবকিছু স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করার নিবেদন রাখলেন। তাঁর বক্তব্যে জাতি হতাশ হল।

জনাব সিদ্দিকুর রহমান। বয়স্ক মানুষ এবং বিরাট তাঁর দেহ, শিশুর মতো কাঁদতে কাঁদতে বললেন, আমরা শুনেছিলাম আপনি আর নেই। আল্লাহ্‌কে হাজার শোকর, তিনি আপনাকে রক্ষা করেছেন।

আমাদেরকে সৈন্যরা ভবনের অভ্যন্তরে যেখানে খন্দকার মোশতাক এবং রেডিওর কর্মকর্তারা বসেছিলেন সেখানে নিয়ে গেল। মোশতাক সাহেব আমাদের দেখে তাকালেন, কিছু বললেন না। তাঁকে শুধু ক্লান্ত-শ্রান্তই মনে হচ্ছিল না, মনে হচ্ছিল একটা দুর্বার ঝড় বয়ে গিয়েছে তাঁর উপর দিয়ে। একদল সৈনিক, কেউ কেউ অফিসার ঘরে ঢুকে নিবেদন করল, মি. প্রেসিডেন্ট, স্যার! সবকিছু প্রস্তুত রয়েছে। আপনি রেডিওতে কেবল ঘোষণা দিন আপনি পুনরায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহণ করলেন। আমরা খোঁড়াকে অনেক খুঁজেছি, পেলাম না।

বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করতে একজন বলে উঠল, কর্নেল তাহের কিছু সিপাহীসহ এসে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে গিয়েছে, রেডিও থেকে যেন কোন ঘোষণা না দেওয়া হয়।

সেকথা শুনে ক্ষিপ্ত সৈন্যরা তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। পেলে সমূহ বিপদ। মুক্তিযুদ্ধে আহত কর্নেল তাহেরকে খুঁড়িয়ে চলতে হত বলে তাঁকে ব্যঙ্গ করে ওভাবে সম্বোধন করা হয়েছিল। উপস্থিত সকল সৈনিকেরা, বিশেষ করে তাদের অফিসাররা, খন্দকার মোশতাককে তৎক্ষণাৎ ঘোষণা দিয়ে দায়িত্ব নেওয়ার পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করতে লাগল।

তাঁকে গভীরভাবে চিন্তাযুক্ত এবং কিছুটা মানসিকভাবে অবসন্ন মনে হল। সকলের সম্মিলিত অনুরোধ-উপরোধ উপেক্ষা করে তিনি বললেন, আমি এখন কিছুই করব না। পরে একসময় আমার বক্তব্য তুলে ধরব।

আমাদেরকে বললেন, তোমরা বাসায় যাও। তোমাদের পরিবার-পরিজন নিশ্চয়ই ব্যাকুল হয়ে আছে।

বাসায় ফেরার জন্য মন আকুলি-বিকুলি করছিল। কত শীঘ্র সবাইকে আবার দেখব—উড়ে যেতে ইচ্ছা করছে। দ্বিতীয় বাক্য ব্যয় না করে বেরিয়ে এলাম। বেরিয়েই পেলাম আমার চির মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, আমার দুনিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ মামাকে। তিনি বুকে জড়িয়ে ধরে অঝোরে কাঁদতে লাগলেন। তাঁকে শান্ত করে সকল কর্মীদের সঙ্গে মিছিলের অগ্রভাগে মিন্টু রোডের বাসস্থানে উপনীত হলাম। ছোট্ট রানা দৌড়ে এসে বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তৃষিত চিত্ত প্রিয় সন্তানকে বক্ষে ধারণ করে অপেক্ষাকৃত স্বাভাবিক হয়ে এল।

বাসায় এসে যা শুনলাম, শুধু হৃদয়বিদারকই নয়, অকল্পনীয় এবং দুঃখজনকও বটে। মামা এ দু'দিন জেল গেটেই ছিলেন সর্বক্ষণ। তাঁকে কারা জানিয়েছে, আমাকে ভিতরে শেষ করে দেওয়া হয়েছে। তিনি তা বিশ্বাস

ট্রাকে ওঠাল। বললাম, খালাস হয়েছি, এবার ছেড়ে দিন, নিজেদের মতো বাড়ি যাই।

তারা তখন মহাউল্লাসে বলতে থাকল, স্যার, বাড়ি যাবেন পরে, আগে রেডিওতে চলেন, গভর্নমেন্ট গঠন করেন। মোশতাক সাহেব আবার প্রেসিডেন্ট হবেন, আপনারা বড় মন্ত্রী হবেন। তারপর বাড়ি যাবেন। আপনারা জেলে ছিলেন, জানেন না বাইরে সিপাহী আর জনতা এক হয়ে বিপ্লব করেছি। ভারতের দালালদের খতম করে দেওয়া হয়েছে। তারা মোশতাক সাহেব ও জিয়াউর রহমানকে ক্ষমতাচ্যুত করে বন্দি করেছিল। আমরা তাদের মুক্ত করে এনেছি। মোশতাক সাহেব রেডিও অফিসে রয়েছেন। এখুনি নতুন সরকারের ঘোষণা দেওয়া হবে।

তাদের আনন্দের সীমা নেই। মনে হচ্ছে দেশকে দ্বিতীয়বারের মতো পরাধীনতার হাত থেকে তারা মুক্ত করেছ। তাদের স্লোগান এবং বেয়নেট লাগানো রাইফেল নিয়ে নাচা-নাচিতে বেয়নেটের খোঁচায় আমার কানের পাশে রক্তাক্ত আঘাত পেলাম।

রাস্তায় মানুষের ঢল। '৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় দিবসে মুজিবনগরে ছিলাম। ঢাকার দৃশ্য দেখার সৌভাগ্য হয়নি। আজ চারদিকে মানুষ আর মানুষ। এত প্রত্যুষে সমস্ত মানুষ যেন ঘরবাড়ি ছেড়ে আনন্দের আতিশয্যে রাস্তায় নেমে এসেছে। আমার মুক্তির খবর পেয়ে কর্মীরাও চলে এসেছে। আমার জিনিসপত্র-ব্যাগ সৈন্যদের থেকে নিয়ে দৌড়চ্ছে কত আগে বাসায় গিয়ে সেগুলো দেখাবে, আমার মুক্তির সংবাদ পরিবেশন করবে। রাস্তার দু'পাশে অনেক মেয়েদেরও দেখলাম। নাজিমউদ্দীন রোডের বাড়িগুলোর দোতলা থেকে, ছাদ থেকে আমাদের ট্রাক লক্ষ্য করে ফুল ছুঁড়ছে। মালা ছুঁড়ে মারছে। হাততালি দিচ্ছে। চারদিকে সিপাহী-জনতা জিন্দাবাদ, বাংলাদেশ জিন্দাবাদ। 'নারায়ে তকবির—আল্লাহু আকবর' ধ্বনি আবার ফিরে এসেছে। জয় বাংলা ধ্বনি তিরোহিত।

সত্য এল, মিথ্যা বিদায় নিল।

মক্কা বিজয়ের পর যে আয়াত নাযেল হয়েছিল—তার কথা মনে পড়ল।

আমাদেরকে রেডিও ভবনে পৌছলে সর্বপ্রথম আমাকে আলিঙ্গন করে আকুল হয়ে কেঁদে উঠল বিক্রমপুরের অধিবাসী ফায়ার সার্ভিসের সাবেক পরিচালক

থাকলাম। সময় হয়েছে। এখনই ইহলীলা সাঙ্গ করে সৃষ্টিকর্তার কাছে হাজিরার সময় উপস্থিত। প্রতিটি রুম থেকে ভীত-উৎকণ্ঠা প্রকাশ হচ্ছিল—মাত্র ক'দিন পূর্বে এই জেলেরই অন্যত্র নেতাদেরকে হত্যা করা হয়েছে। বুটের শব্দ এবং হৈচৈ আমাদের কক্ষের দিকে এগিয়ে এল।

একজন জলদগম্ভীর স্বরে আমার আর ঠাকুরের নাম ধরে জানতে চাইল, তারা এই ঘরে থাকে?

সঙ্গের জমাদার জবাব দিল, হ্যাঁ, এই রুমেই তাঁরা দু'জন থাকে।

মশারির ভিতর থেকে চেয়ে দেখি সাক্ষাৎ যমদূতের মতো বিশ-পঁচিশ জন মিলিটারি। তাদের হাতে অস্ত্র, কারো শরীরে রক্তের চিহ্ন। ভীষণাকৃতি সব চেহারা। তারা হুকুম করল, দরজা খোলেন।

আমি ভিতর থেকে কোনক্রমে আর্তনাদের মতো বললাম, না জমাদার সাহেব, দরজা খুলবেন না। দোহাই আল্লাহ্‌র! দয়া করে তালা খুলবেন না!

ঠাকুর সাহেবের অবস্থা আমার চেয়েও শোচনীয়। কথা বের হচ্ছে না। তারা বুঝতে পারল আমরা ভয়ানক ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছি।

তখন ওদের নেতৃস্থানীয় একজন সামনে এগিয়ে এল এবং বলল, স্যার আপনাদের নিতে এসেছি। সিপাহী বিপ্লব হয়ে গেছে। সমস্ত সিপাহীরা আপনাদের পক্ষে। বেইমান খালেদ মোশাররফকে হত্যা করা হয়েছে। মোশতাক সাহেব এবং জিয়াউর রহমান সাহেবকে আমরা মুক্ত করেছি। এখন নতুন গভর্নমেন্ট গঠন হবে। আপনাদের নিতে এসেছি।

কিছু না বুঝেই মশারির নিচ থেকে বেরিয়ে এলাম এবং আর একবার অনুনয় করে বললাম, খুব ভালো করেছেন। কিন্তু আমরা কোথাও যেতে চাই না। দয়া করে আমাদের ক্ষমা করে দিন। দরজা খুলবেন না।

ওরা বুঝল, আমাদের ভয় কাটেনি।

একজন এটেনশান বলে স্যালুট করল। ঝপাঝপ সব বুটের ঠোক্করে আমাদেরকে স্যালুট দিল, যাতে আমরা বুঝতে পারি ওরা শত্রু নয়, বন্ধু। সালামের উত্তর দিতে হয় জানি, কিন্তু আমি কী আমি আছি!

জমাদারকে দিয়ে তালা খুলিয়ে ওরা ঘরে ঢুকে আমাদের সঙ্গে কোলাকুলি করল, আমাদের জিনিসপত্র নিজেরাই গুছিয়ে আমাদেরকে নিয়ে বীরদর্পে গেটের দিকে এগিয়ে গেল। দু'দিনের সহ-বন্দিদেরকে বিদায় সম্ভাষণও জানাতে পারলাম না।

একটা ঘোরের মধ্যে আছি। সব যে বুঝছি তাও নয়। কেবল মনে হচ্ছে, এরাও তো একই পোশাক পরিহিত। আবার কোন ট্র্যাপ্ নয় তো! গেটে গিয়ে দেখলাম, আমার ছাত্রজীবনের নেতা, তখন জাসদ নেতা এম. এ. আউয়ালও সুদীর্ঘ বন্দিত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে গেটে এসেছেন।

গেট খুলে কোন আনুষ্ঠানিকতায় না গিয়ে তারা আমাদের নিয়ে তাদের

বিশ্বাস করতে মন সাড়া দেয় না। তবুও দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি পেল। ঠাকুর সাহেব তাঁর জায়নামাজ নিয়েই আছেন। তাঁকে এসব জানিয়ে আর কষ্ট দিতে চাই না। দেখা যাক কী হয়! পরদিন বিকেলে দশ সেলের পেছনের খালি জায়গাটিতে পায়চারি করছি। একজন মিয়া সাহেব, মানে জেল পুলিশের সিপাই, হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল। বলল, আপনাদের সেলে নুরুল ইসলাম মঞ্জুর আর ওবায়দুর রহমান সাহেব আছে না?

স্পষ্টত বুঝলাম নামগুলো গুলিয়ে ফেলেছে। তাকে সংশোধন না করে কি সংবাদ জানার জন্য বললাম, হ্যাঁ, আছে, কি খবর?

তাদের খুব দুঃসংবাদ আছে!

কী দুঃসংবাদ?

তাদের দু'জন বন্ধু ছিল শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেন আর তাহেরউদ্দীন ঠাকুর। তারা গৃহবন্দি ছিল। গত রাতে তাদেরকে মেরে ফেলা হয়েছে।

বলেন কী? এ সংবাদ এত দেরিতে এল? কাগজেও কিছু নেই!

কি করে থাকবে, অনেক রাতে ওদেরকে মেরেছে। আজ রাতে জেলখানায় ঢুকে নুরুল ইসলাম মঞ্জুর আর ওবায়দুর রহমান সাহেবকে মারবে।

নাম-ধাম উল্টে গেছে। তাছাড়া এতক্ষণ পর্যন্ত কোন খবর পাইনি—এটা গুজব না হয়ে যায় না। তবুও মনের অবস্থা অসম্ভব খারাপ হয়ে গেল। গৃহবন্দি তাঁদের দু'জনের উপর কোন বিপদ নেমে এল না তো?

মিয়া সাহেবের দেওয়া খবর চেপে যাওয়াই ভালো মনে করলাম। তাকে বললাম, আমি ওবায়েদ আর মঞ্জুর সাহেবকে সব বলব। আপনি একথা আর কাউকে বলবেন না। কি হতে কি হয়—তখন বিপদে পড়ে যাবেন।

মিয়া সাহেবরা অধিকাংশই সাধারণ ঘরের অল্পশিক্ষিত সরল মনের লোক। বলল, সেই ভালো, আমি আর কাউকে বলব না। আপনি ওদের দু'জনকে জানিয়ে দেবেন।

সে একইভাবে চলে গেল। একরাশ দুশ্চিন্তা নিয়ে সেলে ঢুকলাম। একটু পরেই লক্‌আপ হয়ে গেল। সামান্য খেয়ে শুয়ে পড়াই শ্রেয় মনে করলাম। ঠাকুর তো ঘুমোবে না।

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঠাকুর ডেকে তুলল। শহরের চারদিক থেকে গোলাগুলির আওয়াজ এবং স্লোগানের শব্দ ভেসে আসছে। ভয় তো ছিলই—আরও বেড়ে গেল। ভাবলাম, বঙ্গভবনে যা হয়ে ওঠেনি, তা এবার হবে। কিছুক্ষণ বসে থেকে আবার শুয়ে পড়লাম। সেলের অন্যান্য ঘরের লোকজনও জেগে রয়েছে টের পেলাম।

৭ই নভেম্বর, তখনও সকাল হয়নি। লক্‌আপ খোলার বিলম্ব আছে। হঠাৎ চিৎকার-চেঁচামেচি আর বুটের শব্দে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে দু'জনই কাঁপতে

নেতার লাশ বাইরে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। নিজেদের দুর্ভাগ্যের মধ্যেও চোখের পানি আটকাতে পারলাম না। আমরা দু'জন ঢুকছি আর আমাদের চার নেতার মরদেহ বের হচ্ছে। ঘটনার কী অপূর্ব বিন্যাস!

জেলখানায় নিয়ম রয়েছে মৃতদেহ জেলের বাইরে নেওয়ার আগে কাউকে তা সনাক্ত করতে হয়। ওদের অনুরোধে চোখের পানিতে ঝাপসা দৃষ্টিতে নেতাদের মরদেহ সনাক্ত করে কারাগারের অভ্যন্তরে পা রাখলাম। সেটি ছিল '৭৫ সালের ৫ই নভেম্বরের প্রভাত।

দশ সেলের একই কক্ষে দু'জনের স্থান হল। এই দশ সেলে ছয় দফা আন্দোলনকালে দেড় বছরের মতো কাটিয়ে গিয়েছি। ঠাকুর সাহেবকে দেখলাম খুবই খোদাভক্ত মানুষ। জায়নামাজ বিছিয়ে সেই যে বসে গেলেন, ডেকে না খাওয়ালে খাবার কথা মনে থাকে না। আমাকেও নামাজ ধরাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু সূরা-কালাম জানা না থাকলে নামাজ পড়া সম্ভব নয়। বহু কষ্টে আমাকে সুরা কাউসার শেখালেন। বললেন, কতদিন থাকতে হবে জানি না। নামাজ না পড়লে কি করে চলবে?

কথা সত্যি। কেন ধরে আনল, আর কতদিন তার মেয়াদ আল্লাহ্ জানেন।

আমি দশ সেলের অন্যান্য বন্দিদের সাথে পরিচিত হলাম। ওরা সবাই আমাকে চেনে এবং একসময়, ওদের ভাষায়, আমার জানের দুশমন ছিল। সিরাজ সিকদারপন্থী কয়েকজনের সাজা হয়েছে, তারাও জানাল আপনার প্রচেষ্টাতেই মূলত আমরা আজ এখানে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সকলেই আমার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করল। বলল, এখন আমরা বিশ্বাস ফিরে পেয়েছি। আমরা সত্যিই ভ্রান্ত পথে ছিলাম। এভাবে দেশের বা মানুষের অমঙ্গল ছাড়া আর কিছুই করা যায় না। আমরা মুক্তি পেয়ে নতুন জীবনে ফিরে যাব। ও পথ আর নয়। আপনার উপর এখন আমাদের সহানুভূতি ব্যতীত আর কিছু নেই।

তাদের সাথে কথা বলে ভালো লাগল। খবরের কাগজ এলে দেখলাম প্রথম পাতায় বিরাট ছবি। হাস্যোজ্জ্বল খালেদ মোশাররফকে প্রধান সেনাপতির ব্যাজ পরিয়ে দিচ্ছে বিমান বাহিনী ও নৌ-বাহিনী প্রধানদ্বয়। জিয়াউর রহমানের কি হল? শোনা গেল মোশতাক সাহেবের মতো তাঁকেও গৃহবন্দি করা হয়েছে।

জেলখানায় আমি পুরনো খদ্দের। আমার খাতিরই আলাদা। পূর্ব পরিচিত সমস্ত স্টাফ এবার বিষণ্ন দৃষ্টিতে তাকায়। এক বৃদ্ধ জমাদার প্রায় কেঁদে ফেলে বলল, আমাদের সামনেই জেল খাটতে খাটতে এত বড় হলেন। আজ আমাদের সামনেই আপনাদেরকে যদি মেরে ফেলে—এর চাইতে দুঃখের বিষয় আর কিছু হতে পারে না।

কি করে যেন জেলে ছড়িয়ে পড়েছে, অচিরেই আমাদেরকে মেরে ফেলা হবে। সে জন্যই কোন কেস্ ছাড়াই ধরে এনে রেখেছে।

আমাদেরকে অন্য একটি ঘরে রেখে, পুলিশ কর্মকর্তাদের ডেকে এনে তাদের কাছে হাত বদল করল। রাত তখন অনেক, বঙ্গভবন থেকে সবসময় পোর্টিকো থেকে গাড়িতে উঠি। আজ আমাদেরকে হাঁটিয়ে বাইরের গেট অবধি নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। মনে করলাম, ঘরের পর্যাপ্ত আলোর মাঝে যা করতে অসুবিধা হচ্ছিল, এখন রাতের আলো-আঁধারিতে পথের মধ্যে গুলি করে মেরে ফেলবে। হয়ত সেরকম নির্দেশই রয়েছে। আমরা যে ওদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠ হিসাবে দাঁড়িয়েছিলাম। আমাদের বাঁচার অধিকার নেই। নেতা, সহকারী চার নেতা যে পথে গেছেন—সেপথে যাত্রা আসন্ন।

না, গেটের বাইরে, পুলিশের দাঁড় করানো জিপে ওঠাল। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের পুলিশ ক্যাম্পে নিয়ে এসে মর্যাদা সহকারেই আমাদেরকে ওরা বসাল।

জানতে চাইলাম, কি অভিযোগে আমাদের আনা হল। গেলাম মন্ত্রী হিসাবে, ফিরলাম বন্দিরূপে—বিষয়টি কী?

পুলিশ বলল, স্যার, কোন অভিযোগ নেই। কোন দোষ নেই। আপনাদেরকে নিয়ে আসতে বলেছে, নিয়ে এসেছি।

পুলিশের লোকেরাও সমস্যায় পড়ল আমাদের নিয়ে। চারদিকে টেলিফোন করতে লাগল কি করণীয় জানার জন্য। দুপুরের পর আর কিছু পেটে পড়েনি। শত যন্ত্রণার মধ্যেও দেহের উনুনটি ঠিকই জানান দিচ্ছে। পুলিশ যথেষ্ট ভদ্রতা করল। শেরাটন হোটেল থেকে ক্লাব স্যান্ডউইচ ও কফি এনে খাওয়াল। শেষ রাতে সিদ্ধান্ত এল নুরুল ইসলাম মঞ্জুর এবং ওবায়দুর রহমানকে যাঁর যাঁর বাসস্থানে গৃহবন্দি করে রাখা হোক, আর আমাদের দু'জনকে চুয়ান্ন ধারায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে সেন্ট্রাল জেলে ঢুকিয়ে দেওয়া হোক।

অনেকে অনেক ভাগ্য নিয়ে জন্ম নেয়। বলা হয় অমুক লোক রাজকপাল নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছে। আমার ভাগ্যে লেখা ছিল কারাগার। জেল ভাগ্য নিয়ে আমার জন্ম।

সূর্যের আলো নতুন দিনের ঘোষণার অপেক্ষায়। নবাব সিরাজউদ্দৌলা নাটকে গান আছে, 'সকালবেলা রাজা রে ভাই, ফকির সন্ধ্যাবেলা।' আমাদের বেলা অনেকটা তা-ই। ঢাকা সেন্ট্রাল জেল গেটে আমাদের দু'জনকে যখন নিয়ে আসা হল তখন জেলখানার দুই গেটের মাঝখানে চারটি কফিনে চার

শারীরিকভাবে টানাটানি করে অস্ত্রধারীদের ঘর থেকে বের করে নিতে সমর্থ হলেন। কয়েকজন ঘরের দরজায় প্রহরায় রইল।

বেশ কিছুক্ষণ পর ওসমানী সাহেব ওদের দু'-একজনকে নিয়ে কতকগুলো টাইপ করা কাগজ মোশতাক সাহেবের সম্মুখে ধরলেন এবং বললেন, স্বাক্ষর করে দিন।

নীরব মোশতাক একে-একে সবক'টি কাগজ সই করে দিলেন। পরে জানা গিয়েছিল খালেদ মোশাররফের প্রমোশন, জেল হত্যাকাণ্ডের তদন্ত কমিশন গঠন আরও কিসব কাগজে সই করে দিয়েছেন।

সই করা কাগজগুলো নিয়ে তারা আবার বাইরে গিয়ে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে ফিরে এসে বলল, শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেন, তাহেরউদ্দীন ঠাকুর, কে. এম. ওবায়দুর রহমান এবং নুরুল ইসলাম মঞ্জুর—এই চার জন মন্ত্রী ব্যতীত অন্য সকলে যেতে পারেন।

একজন সংশোধন করে দিল, ওনারা মন্ত্রী নন, প্রতিমন্ত্রী।

বলা হল, আপনারা চার জন পদত্যাগপত্র লিখে দিন।

তখন কিঞ্চিত সাহস সঞ্চার করে বললাম, আমরা ইতিপূর্বেই জেল-হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে সকলের সঙ্গে একত্রে পদত্যাগ করে দিয়েছি।

তারা বলল, ওটা তো সকলে একত্রে করেছেন, এখন ভিন্ন ভিন্ন পদত্যাগপত্র লিখে দিন। কুইক। হারিআপ্।

লিখে দিলাম, জেল হত্যার প্রতিবাদে প্রতিমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করলাম। সেগুলো গ্রহণ করার পর সবাইকে চলে যেতে বলা হল—কেবল এই চার জন ব্যতীত। সহকর্মীরা আমাদের মুখের দিকে তাকাতে পারছিল না। ক্ষিতিশ বাবু শব্দ করে কেঁদে উঠলেন। অধ্যাপক ইউসুফ আলীর চোখ থেকে পানি গড়িয়ে পড়ছিল। তবুও আমাদের রেখে তারা চলে যেতে বাধ্য হল।

মৃত্যুর পূর্বে হরিণশাবকটি যে চোখে শিকারীর দিকে তাকিয়ে তার শেষ অভিযোগ রেখে যায়—সেভাবে একবার অস্ত্রধারীদের দিকে দৃষ্টিপাত করে, আমাদের দিকে ফিরে তাকাবার মনোবল হারিয়ে তারা ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল। তারা ধরেই নিয়েছিল যে মৃত্যু সকলকে গ্রাস করতে এসেছিল। সেই মৃত্যু এখন এই চার তরুণ সহকর্মীর উপর দিয়ে যাবে।

অনেক পরে প্রফেসর ইউসুফ আলীর নিকট শুনেছিলাম, তাঁর বাসস্থানে গেলে সালেহা আর রানা এসে যদি জিজ্ঞেস করে তাকে কোথায় রেখে এলেন, এই ভয়ে সে রাতে বাসায় না ফিরে এক আত্মীয়ের সঙ্গে রাত কাটায়। কোন ভাষায়ই এ খবর তিনি ওদেরকে শোনাতে পারতেন না।

মোশতাক সাহেবকে তারা তাঁর দ্বিতলের বিশ্রামাগারে নিয়ে গেল। যাবার পূর্বে আমাদের দিকে তাকিয়ে ডান হাতটি উপরের দিকে তুলে শুধু বললেন, আল্লাহ্ আছেন।

ইকবাল, কর্নেল আবদুল মালেক এবং লে. কর্নেল জাফর ইমামও সেই দলভুক্ত ছিল।

আমরা বুঝে গেলাম, মৃত্যু আসন্ন। সকলের মুখ মনের-মুকুরে ভেসে উঠল। মনে মনে সব প্রিয়জনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যা দোয়া-দরুদ জানি পাঠ করে প্রস্তুত হয়ে গেলাম। ট্রিগারটি টিপার অপেক্ষা। তাদের হাতও কাঁপছে। যে কোন মুহূর্তে দুর্ঘটনা ঘটে যাবে। আর দুর্ঘটনাই বা বলব কেন, এই পূর্বপরিকল্পিত ঘটনা ঘটানোর জন্যই আজ ডেকে এনেছে। শুনেছিলাম বার্মায় একবার এইভাবে সামরিক বাহিনী সম্পূর্ণ ক্যাবিনেট খতম করে দিয়েছিল। বাংলাদেশেও আজ তা ঘটতে যাচ্ছে। ঘটুক, দোষ যখন কিছুই করিনি, আল্লাহ্ তা'আলার এই যদি বিধান হয়, কিছু করার নেই। বঙ্গবন্ধু তাদের হাতে গেলেন, চার নেতা গেলেন—আমরাই বা যাব না কেন!

পাশে বসা ক্ষিতিশচন্দ্র মণ্ডল এবং মমিনউদ্দীন সাহেব দু'দিক থেকে হাত বাড়িয়ে বিদায় নিল। আমরা নিশ্চিত, আজ আমাদের মৃত্যু কেউ ঠেকাতে পারবে না। কিন্তু যার ঠেকাবার তিনিই ঠেকালেন। পরম দয়াবান সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছাই পূর্ণ হয়।

জেনারেল ওসমানী সাহেব ওদের মাঝখানে ঝাঁপিয়ে পড়লেন, একি করছ, খবরদার, কক্ষণও গুলি কর না। এসো আমার সঙ্গে, তোমাদের সব দাবি পূরণ করা হবে।

তিনি এক-একজনের অস্ত্র হাতে ধরে নামিয়ে দিচ্ছেন। আর বারবার বলছেন, ছি-ছি, তোমরা না শৃঙ্খলাভুক্ত সৈনিক! তোমরা মন্ত্রীদের মারতে চাও? এরা সব সম্মানিত দেশ-নেতা!

স্তব্ধ বিমূঢ় মোশতাক সাহেবকেও তিনি বললেন, স্যার, এরা যা বলে সই করে দিন, যা চায় তা-ই করুন। এখানে আর রক্তগঙ্গা বইতে দেওয়া যায় না। আপনি সম্মত হয়ে যান।

মোশতাক সাহেব ঘাড় নেড়ে সম্মতি দিলেন। ওসমানী সাহেব ওদের হাত ধরে টেনে বাইরে নিয়ে গেলেন, 'প্রেসিডেন্ট সম্মত হয়েছে, তোমরা যা চাও তা-ই হবে। এসো, এখানে রক্তপাত করে কলঙ্ক সৃষ্টি কর না। দেশে কলঙ্কের অভাব নেই।'

বস্তুত, ইচ্ছা আল্লাহ্ তা'আলার। কিন্তু সেদিন জেনারেল ওসমানী সাহেব সময়োচিত সাহসী পদক্ষেপ নিয়ে জীবনের মায়া ত্যাগ করে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে আমাদের জীবন রক্ষা করেছিলেন। তাঁর তুলনা শুধু তিনিই। তারই ঐকান্তিক চেষ্টায় সেদিন প্রাণে বেঁচে যাই। অপ্রকৃতিস্থ সেনা-সদস্যদের নিকটও মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল এম. এ. জি. ওসমানীর অনুরোধের মূল্য ছিল। ঘরে বাজ পড়লে যে অবস্থা হয়, তেমনি অস্বাভাবিক নিস্তব্ধতায় আমরা অপেক্ষা করতে থাকলাম। ওসমানী সাহেব অতি কষ্টে,

দেশে যদি আমার একটি টাকা খুঁজে পান, তা হলে তার ব্যাখ্যা চাইবেন। সর্বাগ্রে সব দেখে আসুন।

এদের ব্যবহারে বিরক্ত ও অপমানিত বোধ করছিলাম। টেলিফোন বেজে উঠতে ধরলাম। জিজ্ঞেস করলাম, হ্যালো, কে বলছেন?

উত্তর এল, শাহ্ সাহেব বলছেন?

জী, বলছি।

আমি জিয়াউর রহমান বলছি।

আমি কণ্ঠ চিনতে পারলাম না। জিজ্ঞেস করলাম, কোন জিয়াউর রহমান বলছেন? আমি তো বেশ ক' জন জিয়াউর রহমানকে চিনি।

টেলিফোনের অন্য প্রান্ত থেকে কণ্ঠ ভেসে এল, শাহ্ সাহেব, চিনতে পারছেন না? আমি জিয়া বলছি।

পুলিশদের কারণে একটু অন্যমনস্ক ও উত্তেজিত ছিলাম। চিনতে না পেরে বললাম, ভাই, একটু পরিচয় দিন। জিয়া একাধিক আছে। এক জিয়া তো বঙ্গভবনে বসেন।

তিনি হেসে জবাব দিলেন, শাহ্ সাহেব, আমি বঙ্গভবনের জিয়াই কথা বলছি।

তৎক্ষণাৎ বোধোদয় হল। সৌজন্য প্রকাশ করে সালামান্তে বললাম, প্রেসিডেন্ট সাহেব! আপনি স্বয়ং ডায়াল করেছেন, বিষয় কী? প্রেসিডেন্টের টেলিফোন তো অনেক হাত ঘুরে আসার কথা।

ঘরে উপস্থিত পুলিশ কর্মকর্তাদের অবস্থা তখন দেখার মতো। চোখ ছানাবড়া হয়ে গিয়েছে। পারে তো ঘর ছেড়ে পালায়। সবাই উঠে দাঁড়িয়ে গেছে। হাত ইশারায় বসতে বললাম।

প্রেসিডেন্ট সাহেব মৃদু উদাস কণ্ঠে বললেন, হ্যাঁ, হাতের কাছে টেলিফোনটা ছিল, আপনার নাম্বারও পেয়ে গেলাম। তা-ই টেলিফোন করলাম, বলুন, কেমন আছেন?

আবার রাগ আমাকে আচ্ছন্ন করল। বললাম, বারংবার অকারণে জেল খাটাচ্ছেন, দলকে অবৈধ ঘোষণা করেছেন, অফিসে তালা মেরে দিয়েছেন, কেমন থাকতে পারি বুঝতে পারছেন না!

তারপর অফিসারদের দিকে তাকিয়ে বললাম, এই মুহূর্তে ডজনখানেক কর্মকর্তা আমার বাসায় উপস্থিত আমার কি কি দুর্নীতি আছে তদন্তের জন্য, কতটা ভালো থাকতে পারি উপলব্ধি করুন!

তিনি একটু দম নিলেন, পরে বললেন, ওসব কিছু না, সব ঠিক হয়ে যাবে। Let us forgive and forget.

হাজার হলেও দেশের প্রেসিডেন্ট, তাঁর এ কথার পর আর উচ্চবাচ্য চলে না। বললাম, বলুন প্রেসিডেন্ট সাহেব, কী মনে করে এই অধমকে স্মরণ করলেন?

অফিসাররা তখন সরে পড়তে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। তাদের কেউ কেউ ঘরের বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। তাদেরকে হাতের ইশারায় আবার অপেক্ষা করতে বললাম। তারা সবাই ঘর থেকে বের হয়ে বাইরে গিয়ে দাঁড়াল। ঘটনার আকস্মিকতায় তারা হতভম্ব।

জিয়াউর রহমান সাহেব বললেন, আপনার সঙ্গে আমার কিছু আলাপ ছিল। অনুগ্রহ করে একবার বঙ্গভবনে আসবেন?

বলতে বাধ্য হলাম, বঙ্গভবনে আর একবার? গতবারের শিক্ষা ভুলিনি।

তিনি আবার বললেন, ভুলে যেতেই অনুরোধ করছি। ঠিক আছে, বঙ্গভবনে না আসতে চান, ধানমন্ডিতে আমার একটি অফিস আছে, মাঝে মাঝে সেখানে সন্ধ্যার পর যাই—সেখানেও দেখা হতে পারে। আপনি সম্মত থাকলে গাড়ি এবং লোক পাঠিয়ে দেব।

বললাম, দোহাই আপনার, গাড়ি আর লোক পাঠাবেন না। আমার গাড়ি ড্রাইভার আছে, প্রয়োজন হলে নিজেই যেতে পারব।

তিনি বললেন, তা হলে কবে আসছেন বলুন?

বললাম, প্রেসিডেন্ট সাহেব, মনে কিছু নেবেন না, আমি একটু অসুস্থ। পাইল্‌সে ভুগছি। এখন তো আসা সম্ভব নয়।

ইচ্ছা করেই কণ্ঠস্বর একটু বাড়িয়ে বললাম—যাতে ওরা সবাই শুনতে পায়। এমনিতেই ওরা কান পেতে রেখেছিল।

তিনি বললেন, আপনি অসুস্থ শুনে দুঃখিত হলাম। একটা কথা কী টেলিফোনে বলব?

বললাম, নিশ্চয়ই। যা বলার অসঙ্কোচে বলুন।

তিনি বললেন, আপনি একজন সৎ মানুষ। একটা অসৎ লোকের সঙ্গে আছেন কী প্রকারে? আপনি মোশতাককে ছাড়ুন, সে একটা দুর্নীতিবাজ—ধূর্ত লোক।

প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বেশি তর্ক করা যায় না। তবুও ভদ্রতা বজায় রেখে বললাম, মি. প্রেসিডেন্ট, দুর্নীতি একটি আপেক্ষিক শব্দ। আপনি টেলিফোন করার পূর্বে আমিও দুর্নীতিরই তদন্তের বিষয়বস্তু ছিলাম। এখন তদন্তকারীরাই কাঁপছে। যেদিন প্রেসিডেন্ট থাকবেন না, সেদিন এমনি তদন্ত আপনার বিরুদ্ধেও হতে পারে। কিছুই বলা যায় না।

তিনি বললেন, আপনার কথা ফেলে দেওয়া যায় না। তবে মোশতাককে কোর্টই সাজা দিয়েছে—সে সর্ববাদীসম্মত দুর্নীতিবাজ। তাঁকে ছেড়ে আপনি কেন আমার সঙ্গে আসেন না! আপনার অবমূল্যায়ন হবে না।

বললাম, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। মন্ত্রিত্ব অনেক করেছি, ভবিষ্যতেও আল্লাহ্ চাহে তো আরও করব। কিন্তু এই মুহূর্তে কিছুই বলতে পারছি না। অসুখ সারলে তখন যদি আপনি ইচ্ছা করেন, সাক্ষাতে সব আলোচনা করব।

তিনি বললেন, নিশ্চয়ই। আপনি সুস্থ হয়ে উঠুন, তারপর আলাপ হবে। শীঘ্র ভালো হয়ে উঠুন, খোদা হাফেজ।

খোদা হাফেজ বলে টেলিফোন রেখে দিলাম।

আসলে আমি কিছুটা মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছিলাম। এত বেশি অসুস্থ ছিলাম না যে, তাঁর সঙ্গে দেখা করা যায় না। কিন্তু আমার সিদ্ধান্ত ছিল জিয়াউর রহমানের সঙ্গে আর কোনদিন নয়।

অফিসারদের ভিতরে ডেকে এনে চা দিতে বললাম। তাদের চা পান শেষ হলে বললাম, কয়েকটি কথা মন দিয়ে শুনে তারপর যান। যা ইচ্ছে গিয়ে করেন। আপনারা স্বকর্ণে শুনে গেলেন প্রেসিডেন্ট ডেকেছেন তাঁর সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য। গেলেই মন্ত্রী হব। কিন্তু আমার উত্তরও আপনারা শুনেছেন। বঙ্গভবনে যাওয়ার জন্য মানুষ পাগল, আর মন্ত্রী হওয়ার তদবিরে জুতোর সুখতলি ক্ষয় হয়ে যায়।

আবেগে কণ্ঠস্বর উচ্চগ্রামে চলে গেল। আরও বললাম, আপনারা এসেছেন আমার বিরুদ্ধে তদন্ত করতে। এই গ্যারেজে বসবাস করি। বাড়ি বলেন, গ্যারেজ বলেন এই আমার সম্বল। ওকালতি করলে দশ-বিশটা বাড়ি নির্মাণ করতে পারতাম। তা না করে রাজনীতি করে আমার এই অবস্থা। আমার অহঙ্কারে আপনারা ঘা দিয়েছেন। নিজেকে আমি একজন সৎ মানুষ মনে করি।

বলতে থাকলাম, আপনারা তদন্তকারী কর্মকর্তারা, আপনারা কারা? কার কয়টি বাড়ি আর কত ব্যাংক ব্যালেন্স রয়েছে স্বনামে-বেনামে? আজ আমার বিরুদ্ধে তদন্ত করছেন। আমি যদি সুযোগ না পাই, আমার পুত্রকে অছিয়ত করে যাব, সে বা তার পুত্র যেন আপনাদেরকে বা আপনাদের পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে এই অপমানের প্রতিশোধ নেয়; আপনাদেরকে যেন উচিত শিক্ষা দিয়ে ছাড়ে। যখনই সুযোগ পান, পাত্র-অপাত্র জ্ঞান থাকে না, কেবল উপরের আদেশ, উপরের আদেশ করেন। দেখলেন না, এক মুহূর্তেই আল্লাহ্‌র ইচ্ছে হলে ওখানটায় যাওয়া যায়!

তারা আমার দীর্ঘ-সংলাপে চুপ করে রইল। শেষ হলে সালাম জানিয়ে বাড়ির বাইরে গিয়ে নিঃশ্বাস নিয়ে বাঁচল। আর কোনদিন তারা আমার ত্রি-সীমানায় পা রাখেনি!

পরে আতউর রহমান খান সাহেব আমাকে বলেছিলেন, বিক্রমপুরেরই ছেলে, খুলনাতে ছাত্রলীগে হাতেখড়ি ফিরোজ নুন, যে পরে বিএনপি'র দলীয় ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের প্রধান হয়েছিল, জিয়া সাহেবকে আমার সম্বন্ধে অনেক বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলে আমাকে দলে টানার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছিল। আমি যখন সম্মত হলাম না। তখন ডাক্তার বদরুদ্দোজা চৌধুরীকে নিলেন—সম্ভবত এই কারণে যে, সে এবং আমি একই এলাকার লোক।

চৌধুরী সাহেব তাঁর নাড়ি টিপে প্রায়ই জিয়া সাহেবকে ডাক্তারি পরামর্শ দিতেন, স্যার, একটু বিশ্রাম করুন। রাতে একটু ঘুমের ওষুধ খাবেন। ঠাণ্ডা একটু দুধ প্রতিদিন খাবেন।

জিয়া মনে করতেন, আহা রে! লোকটি আমার কত না আপন! তাঁকে দলে নিলেন— উচ্চাসন দিলেন। আমি জিয়ার সঙ্গে না যাওয়ায় চৌধুরী সাহেবের যে এত উপকার হল তা কিন্তু তিনি কোনদিন স্বীকার করেননি—বরং বিপরীতটাই বলতেন এবং উপকারের পরিবর্তে যা করা প্রয়োজন সেটাই মনেপ্রাণে করতেন।

হাইকোর্টে খন্দকার মোশতাকের দণ্ডাদেশ রদ হয়ে গেল। আমরা সে আদেশ নিয়ে রাজশাহী গিয়ে তাঁকে ঢাকা নিয়ে এলাম। বিমানবন্দরে উষ্ণ সম্বর্ধনা দেওয়া হল।

মোশতাক সাহেবকে খুব নিকট থেকে জানার সুযোগ আমাদের ছিল না। আওয়ামী লীগে আমরা সরাসরি বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে কাজ করেছি। ডিএল শুরু করার পরই জেল-জুলুম আর নির্যাতনের কারণে একত্রে কাজ করার সুযোগ খুব কমই ছিল। জেল থেকে মুক্তিলাভের পর থেকেই বিভিন্ন কাজের মধ্যদিয়ে তাঁর পরিচয় আমাদের নিকট ভাস্বর হয়ে উঠল।

প্রথমেই যেটা আমাদের নজরে এল তা হচ্ছে, অত্যন্ত ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা। নীতি, আদর্শ বা দলের কর্মসূচির চাইতে তাঁর নিকট বড় তাঁর নিজস্ব ব্যক্তি-ইমেজ। আমাদের এই উপমহাদেশে ব্যক্তিসত্তা রাজনীতিতে কাজ করে না তা নয়। একটি সর্বজনীন দাবি বা আবেদনের পক্ষে মানুষ যখন একটি বিশেষ কর্মসূচিতে ঐক্যবদ্ধ হয়, তখন ব্যক্তিসত্তার প্রভাব তাঁকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করে। সংগঠন ব্যতীত, সুশৃঙ্খল কর্মী-বাহিনী ব্যতীত এবং সর্বোপরি একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য বা আদর্শের সর্বজনীন আবেদন না থাকলে ব্যক্তি-ইমেজ কার্যকর হয় না। কেবল হাতযশ সম্বল করে একজন চিকিৎসক অবিসম্বাদিত হতে পারে না, যদি না যন্ত্রপাতি, ওষুধপত্র, সহকারী এবং চিকিৎসাকেন্দ্রের ব্যবস্থা থাকে। মোশতাক সাহেবের ধারণা, কেবল মাত্র তাঁর নামের সুরমা ব্যবহার করেই সব রোগ উপশম হবে। আমরা রাজনীতি করতে এসেছি। নজরানার ডালি সাজিয়ে কাউকে ভোগ দেওয়ার জন্য নয়। নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য রক্ত-অস্থিমজ্জায় না থাকলে তাকে প্রচেষ্টায় অর্জন দুঃসাধ্য। আমাদের নেতা তাঁরও

নেতা ছিলেন। নেতৃত্বের মেরুকরণে তাঁর অস্তিত্ব ক্ষীণতর। আমরা ব্যাঘ্রের সঙ্গে বাস করেছি। মার্জারে প্রীতি আসবে কেন? রজ্জুকে সর্প বলে ভ্রম করা আমাদের সাজে না। বিষয়টি উভয়ত। তিনি মনে করতেন, শেখ সাহেব যদি কর্মীদের এইভাবে শাসন করতে পারে, আমি পারব না কেন?

আমরা মনে করতাম, কীসের মধ্যে কি, পান্তা ভাতে ঘি! বঙ্গবন্ধু কেবল শাসন করতেন তা-ই নয়, তাঁর সোহাগ ছিল অপরিমেয়—একথা ভুললে চলবে না।

কর্মীদের চাইতে নেতাকে ছুটতে হয় অধিকতর। ছাত্র নেতৃত্ব করতে গিয়ে দেখেছি—অনেকের চাইতে আমার পরিশ্রমের মাত্রা ছিল অধিক। তেতলায় বসে নেতার দোলনায় দোল খেতে খেতে বড় বড় বোলচাল কিছুক্ষণ সহ্য হলেও প্রতিদিনের জন্য অগ্রহণীয়। কর্মীরা লোক যোগাড় করে নিয়ে আসুক, তিনি দোয়া খায়ের করে দেবেন, সে যুগ তখন আর নেই।

বৈঠক নেই, সভা-সমিতিতে যাওয়া হবে না, কারো সঙ্গে নিজের উদ্যোগে যোগাযোগ করা হবে না, অর্থের সঙ্গতি সীমাবদ্ধ, দলের কার্যালয়েও যাবেন না—এমনি একজন নিশ্চল এবং অনড় নেতা দিয়ে আর যা-ই হোক—একটি রাজনৈতিক দলকে দ্রুত চালানো যায় না এবং একসময় কর্মীদের মনোবলও দোল খেতে থাকে।

জেল থেকে মুক্তি পেয়েছেন, দলের বর্ধিত সভা করা প্রয়োজন, প্রয়োজন ঢাকাতে প্রথম সমাবেশ করা এবং তারপর সারা দেশে সফরসূচি প্রদান করা।

তিনি বললেন, আমি পিতার মাযার জিয়ারতে গিয়ে প্রথম জনসভা দাউদকান্দিতে করতে চাই।

আপত্তি জানালাম। এখন আর আপনি দাউদকান্দির নেতা নন। জিয়ারত করে আসুন। কিন্তু প্রথম সমাবেশ ঢাকাতে হওয়া বাঞ্ছনীয়।

তিনি দাউদকান্দিতে সভা করবেনই। অগত্যা অনিচ্ছাসত্ত্বেও যোগ দিতে হল সে সভায়। তার বাড়িতে বর্ধিত সভায় আমার সঙ্গে প্রথম প্রকাশ্য দ্বন্দ্ব। সেক্রেটারি হিসাবে সভা ডেকেছি আমি। সম্পাদকের রিপোর্টও আমাকেই উপস্থাপিত করতে হবে। এটাই রীতি।

তিনি কুমিল্লা-ইজমের উর্ধ্বে উঠতে পারলেন না। বললেন, প্রথম একটি সাধারণ রিপোর্ট দেবে অলি আহাদ। সে সবসময় ছিল, তুমি তো দু'বছর জেলে ছিলে।

রাজনীতির ধ্যান-ধারণা দেখে আশ্চর্য হলাম। সব কিছুতেই কুমিল্লা। আসলে এই কু অক্ষরটাই মন্দ, ইংরেজিতে অবশ্যই মন্দ। বাংলাতেও কু দিয়ে যত কথা আছে অধিকাংশ মন্দ। কুসংস্কার, কুরূপ, কুলাঙ্গার, কুটিল আরও কত। কুমিল্লা শব্দটাও এই অক্ষর দিয়েই শুরু। আমাকে কোনক্রমেই সম্মত করাতে না পেরে নুরুল ইসলাম মঞ্জুরের শরণাপন্ন হন। জানে মঞ্জুর আমার

ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তার কথা ফেলব না। মঞ্জুর ফর্মুলা দিল, অলি আহাদ সাহেব স্বাগত ভাষণে কিছু বলুক, তারপর সেক্রেটারি জেনারেল তাঁর পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট পেশ করবে।

মেনে নিলাম। সে সভাতেই পরিষ্কার হয়ে উঠল, তাঁর ইচ্ছামাফিক দল চালাতে চান। আর আমরা চাই আলোচনার ভিত্তিতে একটি গণতান্ত্রিক পার্টি, যার শক্তির উৎস হবে জনগণ এবং কর্মী-বাহিনী। রাজনীতিতে শর্টকাট খুব একটা আছে বলে মনে হয় না। বেশি ওস্তাদি করা ঠিক নয়। কেননা, কে না জানে ওস্তাদ লাঠিয়াল লাঠির আঘাতেই প্রাণ হারায় এবং সর্পবিশারদ সাপের ছোবলেই ইহলীলা সাঙ্গ করে। তাঁকে বুঝাবার চেষ্টা করলাম দলটিকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জনগণের দ্বারে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন।

তিনি বলেন, কে নিষেধ করছে? তা-ই কর না কেন?

বললাম, আমরা করলে ফলাফল খুব সন্তোষজনক হবে না। এই কষ্ট এবং পরিশ্রম আপনাকে করতে হবে। আমরা অবশ্যই সঙ্গে থাকব।

সর্বাগ্রে ঢাকায় জনসমাবেশ আয়োজনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হল। বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে বিশাল জনসভার আয়োজন করা গেল। মানুষ বানের জোয়ারের মতো ভেঙে পড়ল। তিল ধারণের ঠাঁই নেই। ক'দিন ধরে ক্রমাগত শুনছিলাম সভায় হামলা হবে। জিয়ার দল বা আওয়ামী লীগ বা উভয়ে একত্রে আক্রমণ করবে। আমরাও যতটুকু সম্ভব সতর্ক থাকলাম। চারদিকে সজাগ কর্মীদের মোতায়েন করলাম। কয়েকদিন প্রচুর পরিশ্রম করেছি এই সভাকে সফল করে তুলতে। আমি এবং অন্য নেতৃবৃন্দ পূর্বেই মঞ্চে আরোহণ করেছি। মোশতাক সাহেব আসার সঙ্গে সঙ্গে সভা শুরু হবে। বিশেষ ব্যবস্থাধীনে তাঁকে সভায় নিয়ে আসা হল। পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করার পর মোশতাক সাহেব জনগণের উদ্দেশে যখন অভিবাদন দিচ্ছিলেন, ঠিক সেই সময় সভামঞ্চের পাশে বিকট আওয়াজে বোমা ফাটল। কেউ বলে, পেছন থেকে ছুঁড়ে মেরেছে, বেশিরভাগ লোক বলে রিমোট কন্ট্রোলে বোমা ফাটানো হয়েছে। ইতিহাসের আর এক ন্যক্কারজনক ঘটনা সংঘটিত হয়ে গেল। আহতের সংখ্যা নিরূপণ করা অসম্ভব। নিহত নয় জন। একজন সাংবাদিক রয়েছে তার মধ্যে। কেবল বোমা মেরেই ক্ষান্ত হয়নি, সভার মধ্যভাগে বিষধর সাপ ছেড়ে দেওয়া হল। মানুষজন সে সাপ পিটিয়ে মেরে ফেলল।

চারদিকে লণ্ডভণ্ড অবস্থা। মোশতাকসহ আমাদের হত্যার উদ্দেশে বোমা নিক্ষিপ্ত হয়েছিল, সেটি মঞ্চের একপাশে পতিত হয়ে এতগুলো মানুষের প্রাণ নিয়ে নিল। তখনও আশঙ্কা করছি, পুনরায় বোমা আসতে পারে, ওদের লক্ষ্য অর্জিত হয়নি। যা হবার হবে—মঞ্চ ছেড়ে আমরা নড়ব না। মোশতাক সাহেব পাগলের মতো মাইকের সামনে গিয়ে চিৎকার করে বলতে লাগলেন, 'আমাকে মারতে চাও, আস, আমাকে মার। নিরীহ জনগণকে মারছ কেন?

আমরা তাঁকে ঘিরে থাকলাম। সভামঞ্চ যদি বোমার আঘাতে উড়েও যায়, আমরা নামব না। মৃত্যু একদিন আসবেই। কাপুরুষই মরার পূর্বে বহুবার মরে। মুরগি যেভাবে তার ছানাকে আগলে রাখে, আমরা সেভাবে ছোটখাটো মানুষ মোশতাককে আগলে রাখলাম এবং একদিকে আহত-নিহতদেরকে স্থানান্তরের ব্যবস্থা করলাম, অন্যদিকে মোশতাক সাহেবকে দিয়ে বক্তব্য দেওয়ালাম।

বক্তব্য শেষ হতে নুরুল ইসলাম মঞ্জুর মোশতাককে সভা থেকে বের করে নিরাপদে বাসায় পৌঁছে দিল। আমি সভা সম্পূর্ণভাবে সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত এবং সকলকে স্থানান্তর না করা পর্যন্ত মঞ্চেই রইলাম। সমস্ত মন ঘৃণা ও ক্রোধে ছেয়ে গেল। ওরা শান্তির কথা বলে, গণতন্ত্র ও পরমতসহিষ্ণুতার কথা বলে। অন্যকে কথা বলতে দেবে না, বোমা মেরে হত্যা করবে—এটাই ওদের আদর্শ, এটাই ওদের রাজনীতি।

সেদিন মামাও বোমার আঘাতে মৃত্যুবরণ করতেন। তিনি যে স্থানটিতে বসেছিলেন সেখানেই বোমাটি বিস্ফোরিত হয়েছে। আল্লাহ্‌র ইশারা ছিল নিশ্চয়ই, আমি এক বয়স্ক সদস্যকে বলে মামাকে অন্যদিকে সরিয়ে নিতে বলেছিলাম। কেননা, তিনি উপস্থিত থাকলে আমার সিগারেট খেতে অসুবিধা হয়। তখন খুব ধূমপান করতাম। মামা বুঝতে পেরে সরে গিয়েছিলেন। তাই রক্ষা পেলেন। কিন্তু রক্ষা পেল না আনোয়ার। আমার এক অতি বিশ্বস্ত কর্মী। জ্ঞান হবার পর থেকেই স্লোগান দিত 'মোয়াজ্জেম ভাই এসেছে, বিক্রমপুর জেগেছে।' সে গুরুতর আহতাবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নীত হল।

সভার সমাপ্তি ঘোষণার পরও চারদিকে জটলা চলতে লাগল। কী মর্মান্তিক কাণ্ড ঘটে গেল তার কোন নজির এদেশে নেই। বায়তুল মোকাররমের পবিত্র প্রাঙ্গণ মানুষের রক্তধারায় রঞ্জিত হল। কর্মীরা আমাকে জোর করে নিয়ে গেল দলীয় কার্যালয়ে। কিছুক্ষণ বসেই পরবর্তী কর্মসূচি দেওয়া, আহতদের চিকিৎসা ও নিহতদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করার প্রয়োজনে উঠে পড়লাম। হাসপাতালে রওয়ানা হয়েও গাড়ি ঘোরালাম আগামসি লেনের দিকে। এর মধ্যে মোশতাককে যতটা চিনেছি, মনে হল সে হাসপাতালে নাও যেতে পার। এত আত্মকেন্দ্রিক মানুষ কম দেখেছি। পোস্টারে তাঁর ছবি রয়েছে। একটা ব্যাজ করেছিলাম তার ছবি এবং দলের নামসহ। সেটা দেখে তিনি বললেন, ছবি দিলেই চলবে, দলের নাম দেওয়ার প্রয়োজন নেই।

কঠোর-কণ্ঠে বলেছিলাম, আপনার ছবির জন্য রাজনীতি করি না—দলের জন্য করি।

আমাকে তাঁরও চিনবার কথা, তাই চুপ করে গিয়েছিলেন। যা

ভেবেছিলাম তা-ই, নিহতদের লাশ দেখতে না গিয়ে, আহতদের পাশে না দাঁড়িয়ে তিনি ক্যাসেটে তাঁর বক্তৃতার রেকর্ড শুনছেন!

ক্ষেপে গেলাম, আপনি কী মানুষ! এতগুলো লোক প্রাণ দিল, আহত হয়ে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছে আপনার কারণেই আর আপনি এখনও হাসপাতালে যাননি! সব দলের লোকেরা, এমনকি সম্ভাব্য ঘাতকরাও হাসপাতালে গিয়ে মৌখিক সহানুভূতি জানিয়ে এসেছে। আর আপনি নিজেই নিজের বক্তৃতা শুনছেন? উঠুন, এই মুহূর্তে আপনাকে হাসপাতালে যেতে হবে।

ইতস্তত করে বললেন, তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলাম।

মঞ্জুর বলল, আর এক মিনিট সময় নষ্ট না করে এক্ষুণি চলুন।

তিনি বললেন, লুঙ্গিটা বদলে পাজামা পরে আসি।

কঠিন স্বরে বললাম, না, যে অবস্থায় আছেন সে অবস্থায়ই চলুন।

অগত্যা লুঙ্গি-পাঞ্জাবি পরেই তাকে সেদিন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যেতে হয়। সকলকে ঘুরে ঘুরে দেখে, আশ্বাসবাণী শুনিয়ে, ডাক্তারদেরকে সুচিকিৎসার অনুরোধ জানিয়ে এলেন।

মঞ্জুরকে নিয়ে যখন আনোয়ারের বিছানার পাশে দাঁড়ালাম তখন আমার কথা বলার শক্তি নেই। ডাক্তার একটু পূর্বে আমাকে বলেছে ওর একটি হাত কেটে বাদ দিতে হবে। আমি ডাক্তারের দু'হাত চেপে ধরে অনুরোধ করেছিলাম, ডাক্তার সাহেব, আবার দেখুন কোনভাবে ওর হাতটি রক্ষা করা যায় কি না।

যন্ত্রণায় আনোয়ার কাতরাচ্ছে। তার মধ্যেই বলল, লীডার, আপনি ঠিক আছেন তো? লোকে বলছিল, আপনিও আহত!

বললাম, নিহত-আহতদের সরাতে গিয়ে গায়ে রক্ত লেগেছে। আমি ঠিকই আছি। তুই মনোবল হারাবি না। আল্লাহ্ তোকে সুস্থ করবেন।

মঞ্জু ডাক্তারদের সঙ্গে ঝামেলা বাধাল। সে রক্ত দেবেই। তখন রক্ত নেওয়ার সময় নয়—তারা অপারগতা জানাল। সে রক্ত তখনই দেবে। অনেক বুঝিয়ে তাকে ফিরিয়ে নিয়ে এলাম। প্রয়োজন হলে তার রক্ত নেওয়া হবে। ব্লাড ব্যাংকের রক্তেই তখনও চলছে।

আগামসিহ্ লেনে তখন বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দ এসে দুঃখ প্রকাশ করছে, সহানুভূতি জানাচ্ছে। নূরে আলম সিদ্দিকী এসে বলল, আমি ডিএল করি না। কিন্তু এই মুহূর্তে আমি ডিএলের জন্য আছি। বলুন কি করতে হবে?

হরতালে গেলাম না। কেননা, আমাদের সাংগঠনিক শক্তি ছিল সীমিত। তাছাড়া জনগণেরও কোন দোষ নেই। হরতালে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হয় অধিকতর। তিন দিনের শোক এবং চতুর্থ দিন দেশব্যাপী প্রতিবাদ দিবস ঘোষণা করে গভীর রাতে বাসায় এসে অজু করলাম। নিয়মিত নামাজ পড়ি না। সেদিন নামাজান্তে জায়নামাজে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে দু'হাত তুলে

কাতর প্রার্থনা জানালাম, তোমার যদি ইচ্ছা হয় আনোয়ারকে তুমি তুলে নাও, তা না হলে তার হাতটি ঠিক করে দাও। সে সারাজীবন একটি হাত নিয়ে আমার সম্মুখে ঘুরে বেড়াবে, সে দৃশ্য সহ্য করার চাইতে তার মৃত্যু-শোক সহ্য করা সহজ।

আল্লাহ্ তাঁর এই পাপী বান্দার প্রার্থনা সেদিন কবুল করেছিলেন। ওর পিতা-মাতার আন্তরিক দোয়ার জোর ছিল। আনোয়ারের হাত ডাক্তাররা অনেক চেষ্টায় রক্ষা করেছে। এখনও প্রতি মাসে একবার করে ব্যথা অনুভূত হয়। তবুও দুটি হাতই ওর অক্ষুণ্ন রয়েছে। আল্লাহ্কে হাজার শোকর।

চিরদিনের বিশ্বস্ত আনোয়ার আজও ছায়ার মতো আমাকে সর্বক্ষণ আগলে রাখে। উত্থানে-পতনে, সরকারে কি বিরোধী দলে সবসময়ই সে আমার সঙ্গী। অনেকেই এসেছে, দুঃখের দিনে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে গিয়েছে। কিন্তু আনোয়ার দুঃখের দিনে অধিকতর একাগ্রতায় নিরলস কর্তব্য করে যায়। ওর সেবার তুলনা হয় না।

বায়তুল মোকাররমের জনসভার এই বোমাবাজির খবর সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। মানুষ এর নিন্দা করে অকুণ্ঠচিত্তে। আমরা দাবি করেছিলাম একটি বিচার বিভাগীয় তদন্ত হোক। হাইকোর্টের কোন বিচারপতি সমন্বয়ে তদন্ত টিম গঠন করে প্রকৃত অপরাধী খুঁজে বের করে বিচার হোক, দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক। কিন্তু কার বা গোয়াল, কে বা দেয় ধোঁয়া!

আমাদের সব চিৎকার আর দাবি কাকস্য পরিবেদনার রূপ লাভ করল। রক্ষক যখন ভক্ষক হয় তখন বিচারের বাণী কেবল নীরবে নিভৃতে কাঁদে না, অট্টহাস্যে সমাজকে ভ্রূকুটি করে। এত বড় ঘটনা হয়ে গেল, সরকারের পক্ষ থেকে কিছুই করা হল না। নিরীহ, নিরপরাধী মানুষকে যখন কারো ব্যক্তি খেয়ালের চরিতার্থতায় প্রাণ দিতে হয়, তখন সেটা সীমা লংঘনের গর্হিত অপরাধে পরিণত হয়। সীমা লংঘনকারীকে সৃষ্টিকর্তা শাস্তি দেন। বারংবার বাংলাদেশের ইতিহাস তারই সাক্ষ্য দেয়।

যা ঘটবার ঘটবে, নিয়তির অমোঘ বিধান পাল্টাতে পারব না। আমরা ঠিক করলাম, বায়তুল মোকাররমের ঘটনার পর আমরা যদি মানুষের নিকট না পৌঁছি, তা হলে দলের মধ্যে গতি আনা যাবে না। প্রাথমিকভাবে বিভাগীয় শহরে এবং বিভিন্ন জেলা শহরে জনসভা ও কর্মী-সম্মেলনের মাধ্যমে আমরা দলকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কর্মসূচি গ্রহণ করলাম।

এ ঘটনার পরও প্রতিটি জনসভায় অভূতপূর্ব জনসমাগম হল। আমরা যে মোশতাকের মতকে প্রাধান্য দিয়ে ঘরে বসে থাকিনি; তার ফল হাতে হাতে পেতে থাকলাম। মানুষের ভয়-ভীতি কেটে গিয়ে তারা আমাদের ডাকে সাড়া দিতে আমরা অধিকতর উৎসাহী হয়ে উঠলাম।

এসব জনসভায় বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ তাদের সুযোগ-সুবিধা মতো যোগ দিতেন। তবে অলি আহাদ সাহেব এবং আমি সবগুলোতেই থাকতাম। স্টিমার বা প্লেন জার্নি হলে ভিন্ন কথা, নতুবা অলি আহাদ সাহেব সভাগুলোকে যোগ দিতেন ঠিকই, কিন্তু আমাদের গাড়ির বহরে তিনি থাকতেন না। তার একটা সাপ্তাহিক পত্রিকা ছিল 'ইত্তেহাদ'। সেটা প্রকাশের অজুহাত দেখিয়ে তিনি ভিন্ন পথে বা আগে-পরে সভায় গিয়ে হাজির হতেন এবং সভা সমাপ্ত হতেই একইভাবে চলে আসতেন। তাঁর সাথে আমার সম্পর্ক একদিকে ছিল কখনও মধুর, কখনও অম্ল।

একদিন তাকে ধরলাম, ভারি তো একটা সাপ্তাহিক কাগজ বের করেন তার জন্য এত ব্যস্ততার কারণ থাকতে পারে না। বলুন প্রকৃত কারণ কী? আমাদেরকে পথে এড়িয়ে চলার কারণ বলুন!

তিনি যদি সুমেজাজে থাকতেন, তা হলে অকপটে সত্য কথা বলতেন। এমনি এক মুহূর্তে বলে বসলেন, আপনারা থাকেন নেতার সাথে, আমার এত তাড়াতাড়ি মরার শখ হয়নি।

বিলম্বে বিয়ে করেছেন তিনি। স্ত্রীর কা তব কান্তা এখনও শেষ হয়নি। ভাবীর সাথে নিবিড় সম্পর্কের বিষয়ে প্রশ্ন করলে এখনও তিনি এদিক-সেদিক তাকিয়ে কেউ শোনে কিনা দেখে নতুন দুলার মতোই সলজ্জ উত্তর দিয়ে থাকেন। বিলম্বে হলেও মাত্র ফুল ফুটেছে। সৌরভে চারদিক আমোদিত। এ সময় ভ্রমর কি আকস্মিক আত্মবিসর্জনের ঝুঁকি নিতে পারে!

আমাদের বিকল্প অজুহাত নেই। 'পড়েছি যবনের হাতে খানা খেতে হবে সাথে।' উত্তর বাংলায় কয়েকটি গাড়ি নিয়ে বিভিন্ন জেলায় সফর করছি। দেওয়ালে দেখতে পাই লেখা রয়েছে, 'খুনী মোশতাকের রক্ত চাই, মোশতাক যদি বাঁচতে চাও, বাংলা ছেড়ে চলে যাও।' আরও নানাবিধ সহিংস বাণী। একটি স্থানে চা-পানির জন্য গাড়ি দাঁড় করালে মোশতাক সাহেবের ড্রাইভার বেঁকে বসল। সে আর গাড়ি চালাবে না। মুশকিলে পড়া গেল। একান্তে ডেকে তাকে কারণ জিজ্ঞেস করতেই বলল, স্যার, চারদিকে দেয়ালের লেখা পড়েছেন? মোশতাক সাহেবের গাড়ি লক্ষ্য করে যে কোন মুহূর্তে কেউ বোমা ছুঁড়ে মারতে পারে। আমার ছোট ছোট বাচ্চারা পিতৃহীন হবে, বউ বিধবা হবে।

বললাম, সেই ভয়ে গাড়ি চালাবে না?

বলল, হ্যাঁ স্যার, মোশতাক সাহেব আবার প্রেসিডেন্ট হলে আপনারা মন্ত্রী হবেন, আমি যে ড্রাইভার, সেই ড্রাইভারই থাকব। কাজেই আমাকে অব্যাহতি দেন।

সে গাড়ির চাবি আমার হাতে দিয়ে দিল। আমি নিজের গাড়ি

চালাচ্ছিলাম। ড্রাইভার আনিনি। বললাম, এক কাজ কর, তুমি আমার গাড়ি চালাও, আমিই না হয় মোশতাক সাহেবের গাড়ি চালাচ্ছি। তাতে তোমার বোমা খাওয়ার চান্স কম।

সে সম্মত হল। আমি গাড়িতে স্টার্ট দিতেই পাশে বসা মোশতাক সাহেব তাঁর পাইপ ঠুকতে ঠুকতে বললেন, সবই টের পেয়েছি। তুমি যা করছ, আমার নিজের ভাইও তা করত না।

জবাব দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। এক যাত্রায় পৃথক ফল আশা করার অর্থ হয় না। তাছাড়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আল্লাহ্ চাহে তো এমন কোন ঘটনা ঘটবে না। বায়তুল মোকাররমের পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের পরও আমাদের বোধোদয় হল না। কর্তব্য করে যাচ্ছিলাম ঠিকই। কিন্তু আনন্দের সঙ্গে নয়—অনেকটা বাধ্যতামূলকভাবে। মনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে। যাকে কেন্দ্র করে দল গঠন করেছি, তাঁর বক্তব্য, কর্মীদের সঙ্গে চালচলন, এমনকি বিভিন্ন ছোটখাটো বিষয়েও মতান্তর হতে থাকল। প্রেসিডেন্ট-সেক্রেটারির সম্পর্ক যদি সাবলীল না হয় তা হলে প্রতিপদে বাধার সৃষ্টি হয়। অতি নিকট থেকে তাঁকে যতই দেখছি, ততই বিতৃষ্ণা বৃদ্ধি পাচ্ছে। কাউকে যুক্তি দিয়ে সাময়িক শ্রদ্ধা করা যেতে পারে। কিন্তু অন্তর থেকে প্রীতি-মিশ্রিত শ্রদ্ধাবোধ স্বাভাবিক ধারায় প্রবাহিত না হলে অল্প সময়েই তার বৈপরীত্য লক্ষণীয়ভাবে দৃষ্টিগোচর হয়। একটি ঘটনা আমাকে এবং খুলনার মিয়া মুসাকে বিতৃষ্ণার চরম পর্যায়ে পৌঁছে দিল।

খুলনার আমাদের এক কর্মী, অত্যন্ত দরদ দিয়ে সে দলের কাজ করে। সে একজন সাংবাদিকও বটে। তার নাম উল্লেখ করলেই সকলে চেনে। এখানে তার উল্লেখ থাকবে না এই জন্য যে, সে অনুরোধ করেছিল বিষয়টি যথাসম্ভব জনসমক্ষে কম আসুক। তাকে এক রাতে বিপক্ষ দলের সন্ত্রাসীরা হত্যার উদ্দেশে মারাত্মক অস্ত্রাদি নিয়ে আক্রমণ করে। সে ছিল একা। ওরা তাকে এত আঘাত করেছিল যে, এক পর্যায়ে সে মরার মতো ড্রেনে পড়ে যায়। সে মরে গিয়েছে ভেবে সন্ত্রাসীরা চলে যায়। পরে রাস্তার মানুষেরা ওকে ড্রেনে পড়ে থাকতে দেখে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। হায়াত ছিল, অনেকদিন চিকিৎসা করার পর সে কিছুটা সুস্থ হয়ে ঢাকা এসেছে। প্রায় পঙ্গু অবস্থা। আরও চিকিৎসা করাতে হবে। নেতাকে সব বলবে এবং তার দুঃখ জানাবে। হয়ত সারাজীবন তাকে পঙ্গু হয়ে থাকতে হবে। এতই মর্মান্তিক তার কাহিনী।

মুসা আমাকে আগেই জানিয়েছিল। আমি তাকে আমার বাসায় এনে সান্ত্বনা দিয়ে সামান্য আর্থিক সাহায্য দিয়ে মোশতাক সাহেবের নিকট নিয়ে গেলাম। তিনি সব শুনে নিশ্চয়ই তার জন্য কিছু করবেন। শুনবেন, সান্ত্বনা দেবেন, সাহায্য করবেন—তাতেই কর্মীটির বেদনা অনেকটা লাঘব হবে।

আগামসিহ লেনের ত্রিতলে মোশতাক সাহেব তাঁর দ্বিতীয় পক্ষ নিয়ে বসবাস করেন। প্রথম পক্ষ সন্তানাদি নিয়ে দ্বিতলে থাকেন, মোশতাকের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। এমনকি একমাত্র ছেলে ইশতিয়াকের বিয়েতেও সে যায়নি। আমি তাঁর নিষেধ অমান্য করেও মানবিক কারণে সেই বিয়েতে উপস্থিত হয়েছিলাম। আমাকে পেয়ে ইশতিয়াক আনন্দে কেঁদে উঠেছিল।

মুসা এবং সেই হতভাগ্য প্রায় পঙ্গু কর্মীটি প্রায় এক ঘন্টা ধরে সমস্ত কাহিনী বর্ণনা করল। আমিও যেটুকু শুনেছিলাম যোগ করলাম। মোশতাক সাহেব গভীর অভিনিবেশ সহকারে সমস্ত বক্তব্য শুনলেন। পাইপ টানা ব্যতীত তার আর কোন ভাবান্তর ছিল না। শেষ হলে আমরা তিন জনই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি তিনি কি বলেন, কি করেন প্রত্যক্ষ করার জন্য। আমার ধারণা ছিল, তিনি উঠে এসে কর্মীটিকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করবেন। সময়োচিত সান্ত্বনাবাণী শোনাবেন এবং সর্বশেষে ওকে বেশ কিছু আর্থিক সাহায্য করবেন।

তাকে খুবই চিন্তিত মনে হল। কেউ কোন কথা বলছি না। আমরা যা বলার বলেছি, এখন শুনব।

তিনি হঠাৎ মুসার দিকে তাকিয়ে মুখ খুললেন, মুসা, আমার দেশের বাড়িতে চিড়িয়াখানায় একটা হরিণী আছে। কিন্তু কোন হরিণ নেই। বেচারা Mating করতে পারে না। আমার কাছে বিষয়টা খুবই নির্দয় মনে হয়। তুমি কি খুলনা থেকে ওর জন্য একটি হরিণ যোগাড় করে দেবে? একটি সঙ্গী পেলে বেচারা হরিণী বেঁচে যায়।

আমরা তিন জনই হতবাক! কী কথায় কী উত্তর! একি সত্যিই মানুষ, না অন্য কিছু? এতটুকু মানবিক মূল্যবোধও কী তাঁর মধ্যে অবশিষ্ট নেই? কোথায় শুনব সান্ত্বনার কথা, কোথায় সহানুভূতি ঝরে পড়বে মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরে আসা আহত কর্মীটির জন্য! কোথায় উজাড় করে দেবে সাহায্যের দুই হাত, সেখানে বলে কী! হরিণীকে যৌনতৃপ্তি দেওয়ার জন্য মিয়া মুসাকে বলছে একটি হরিণ যোগাড় করে দিতে!

সত্যিই সেলুকাস, বিচিত্র এই দেশ! তা না হলে এই দেশেই মোশতাক সাহেবের মতো লোক জন্মায়, তাঁরা আবার প্রেসিডেন্টও হয়! আমাদের মতো বুর্বকরা তার জন্য জীবনের ঝুঁকি নেয়! বোমা, গুলি আর সাপের ভয়ে ভীত না হয়ে চরম ত্যাগেও দ্বিধা করে না।

আমি একটি কথাও না বলে, এক বুক ঘৃণা নিয়ে আগামসিহ লেন থেকে বের হয়ে এলাম। ওরা দু'জনও আমাকে অনুসরণ করল। দু'সপ্তাহ আর যাই না। মামা এবং মেজর মান্নান সাহেব এসে অনেক বুঝিয়ে নিয়ে গেলেন প্রায় পক্ষকাল বাদে। কিন্তু ভাঙা মন আর জোড়া লাগতে চায় না।

মুসা সেই থেকে আমার সঙ্গেই ছিল। একজন আদি মুসলিম লীগের

লোক। তাদের ছাত্রফ্রন্ট এনএসএফ-এর সাবেক প্রেসিডেন্ট মিয়া মুসা ১৫ই অগাস্ট 'নাজাত দিবসে'র মোশতাক সাহেবের প্রস্তাব বিরোধিতা করে আমাদের শোক দিবসের প্রস্তাবের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেছিল মূলত মোশতাক সাহেব সম্পর্কে তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কারণে।

এই ১৫ই অগাস্টকে মোশতাক চক্রের প্রস্তাবিত 'নাজাত দিবস' করা হবে, না আমাদের প্রস্তাব মতে 'শোক দিবস' হিসাবে পালন করা হবে এই প্রশ্নেই শেষ পর্যন্ত ডেমোক্রেটিক লীগ চূড়ান্তভাবে দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে প্রকাশ্যে ডিএল (মোশতাক) এবং ডিএল (মোয়াজ্জেম) রূপে আত্মপ্রকাশ করল।

১৫ই অগাস্ট, '৭৫ সালে যে ঘটনা ঘটেছিল তা কেবল হৃদয়বিদারকই নয়, নৃসংশতায় পৃথিবীর অন্যতম নিকৃষ্ট উপমা। সপরিবারে যাকে হত্যা করা হয়েছিল, সে ছিল শাহাদাতের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত আমাদের অবিসম্বাদিত নেতা, রাষ্ট্রপ্রধান এবং দলপতি। তিনি বেঁচে থাকতে দলের কাউকে প্রকাশ্যে তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করতে দেখিনি। তাজউদ্দীন সাহেবের সঙ্গে তাঁর মতানৈক্য সৃষ্টি হলে, তাজউদ্দীন সাহেব মন্ত্রিত্ব থেকে বাদ পড়েন। তাঁর অভিযোগ বা অভিমান প্রণিধানযোগ্য।

মিজান সাহেবকে বাদ দিয়েছিলেন, মঞ্জুরকে বাদ দিয়েছিলেন, তাদের ক্ষোভ থাকা অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু তারাও তা প্রদর্শন করেনি। মোশতাক সাহেবের তো প্রশ্নই আসে না। সভা বা বৈঠকসমূহে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের উপর আস্থাজ্ঞাপন করতে এবং সকল বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রশ্নে বঙ্গবন্ধুর উপর নির্ভরতা সুউচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করতে মোশতাকের কোন জুড়ি ছিল না। যখন বাকশাল প্রতিষ্ঠিত হয়, আমরা অনেকে নীতিগত প্রশ্নে দ্বিমত পোষণ করেছিলাম। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর সিদ্ধান্ত দ্বিধাহীনভাবে মেনেও নিয়েছিলাম। মোশতাক সাহেব সর্বাগ্রে ঘোষণা করেছিলেন, বঙ্গবন্ধু, কবে তোমাকে আমরা মানিনি? তবে আজ এই প্রশ্ন কেন? আমরা কোনদিন তোমার প্রত্যাশাপূরণে ব্যর্থ হব না। তুমি এগিয়ে যাও—আমরা তোমার সঙ্গে ছিলাম, আছি, থাকব।

আজ বঙ্গবন্ধু নেই। তাঁর অবর্তমানে দেশের দায়িত্ব নিয়েছিলেন সে কাজের গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা রয়েছে। আমরাও সময়ের কারণে এবং দেশ বাঁচানোর উদ্দেশ্য নিয়েই সহযোগিতা করেছিলাম। কিন্তু আজ তাঁর অবর্তমানে তাঁর হত্যা দিবসকে নাজাত বা মুক্তি দিবস হিসাবে পালনের প্রচেষ্টা কেবল

হীন মানসিকতারই বহিঃপ্রকাশ নয়—তাঁর হত্যার সঙ্গে সম্পর্কহীনতার যে দাবি তিনি করেছিলেন তাতেও সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়।

জীবিত শেখ সাহেবের বিরোধিতা কোনদিন করেননি। আজ তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে, তাঁরই মৃত্যু দিবসকে নিয়ে আনন্দ করতে চান এর চাইতে জঘন্য মানসিকতা আর কি হতে পারে! আমার বক্তব্য ছিল সুস্পষ্ট, বঙ্গবন্ধু চিরদিন আমাদের নেতা ছিলেন। কোনদিন তাঁর মর্যাদার বিন্দুমাত্র হানি করিনি। এমন কর্ম করা দূরে থাকুক, চিন্তাও কোন দিন করিনি। আজ এ দুর্মতি কেন? আজ বরং একজন মুসলমান হিসাবে তাঁর আত্মার মাগফেরাত কামনা করা বাঞ্ছনীয়। একজন মুসলমান হিসাবে আর একজন মুসলমানের হত্যা দিবসকে যারা 'নাজাত দিবস' হিসাবে পালন করতে চায় তারা কী ধরনের মুসলমান আমার বিবেচনায় আসে না।

কিন্তু নাজাতীদের দলের নেতা মোশতাক সাহেব পীরের ছেলে। দ্বিতীয় প্রধান ব্যক্তি স্বয়ং একজন পীর। তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন এই উপমহাদেশের ইংরেজ-বিরোধী আন্দোলনের প্রখ্যাত নেতা এবং ধর্মীয় পুরোধা হাজী শরিয়ত উল্লাহর বংশে। তাঁদের পর্যাপ্ত অবদান রয়েছে এই অঞ্চলে ইসলামের প্রচার ও শ্রীবৃদ্ধিতে। সেই প্রখ্যাত দেশপ্রেমিক ধর্মীয় নেতার পৌত্র, পীর বাদশা মিয়ার পুত্র পীর মোহসেন উদ্দীন দুদু মিয়া কী করে একজন ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব হয়েও এ প্রস্তাব সমর্থন করতে পারেন বোধগম্য হল না। অন্য যারা মোশতাকের এই প্রস্তাবের সপক্ষে ছিল, তারা হয় ব্যক্তিগতভাবে বঙ্গবন্ধুর কট্টর বিরোধী, না হয় তারা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী শক্তির অনুসারী।

অলি আহাদ সাহেব এক বিচিত্র মানুষ। ধর্মকর্ম ঠিকই করেন। বঙ্গবন্ধুর একসময়ের সহকর্মী, কখনও ব্যক্তি মুজিবের প্রশংসায় মুখর। কিন্তু রাজনৈতিক প্রশ্নে বঙ্গবন্ধুর কঠোর সমালোচক এবং 'নাজাত দিবসে'র অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা।

এতদিন সবকিছু সহ্য করা গিয়েছিল। মতানৈক্য থাকে, থাকবে। তার মধ্য দিয়েই একত্রে কাজ চলছিল। কিন্তু এই প্রশ্ন এসে আমাদেরকে কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়াতে বাধ্য করল। 'নাজাত দিবস' যারা পালন করতে চায়, আমাদের মতে তারা কেবল মানবতাবিরোধীই নয়, ধর্ম-বিরোধীও বটে। শুধু তাই নয়, এর থেকে প্রমাণিত হয়, মোশতাকের পূর্ব-বক্তব্য ছিল অসত্য। বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক না থাকলে, তাঁরই এতদিনের নেতার হত্যা দিবসকে কখনওই 'নাজাত দিবস' রূপে পালন করতে চাইতে পারেন না।

আমাদের সন্দেহ ঘনীভূত হল। শুধু ঘনীভূতই নয়, সন্দেহ বদ্ধমূল হল। বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তির সঙ্গে রাজনীতি করা সম্ভব নয়।

আমরা তো শেষ দিন পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুরই কর্মী ছিলাম। তিনিই ছিলেন রাজনৈতিক পথিকৃৎ।

আমরা এবার সুদৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করলাম। 'নাজাত দিবসে'র প্রশ্নে প্রয়োজনে দল দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে যাবে। কুষ্টিয়ার আবদুর রউফ চৌধুরী, মিয়া মুসা হোসেন, নুরুল ইসলাম মঞ্জুর, অধ্যক্ষা নূরজাহান, আল মুজাহিদী, শামীম আল মামুন, আবদুল বারী ওয়ার্সী এবং মিসেস ওয়ার্সী প্রমুখের নেতৃত্বে বিশাল কর্মী-বাহিনী বিশেষত তরুণ কর্মীগণ আমাদের 'শোক দিবসে'র প্রস্তাবের পক্ষে সমর্থন জ্ঞাপন করল। একটি তৃতীয় মত দেখা গেল যাদের বক্তব্য হচ্ছে 'নাজাত' বা 'শোক' কোন দিবসই নয়, ১৫ই অগাস্ট ডেমোক্রেটিক লীগ নীরবে কর্মসূচি ব্যতিরেকেই কাটিয়ে দেবে। আমরা আপত্তি তুললাম—আমাদের প্রয়াত নেতার মৃত্যু দিবসে অন্তত দোয়া এবং মিলাদের কর্মসূচি থাকতে হবে। আপস-ফর্মূলা কোন পক্ষেই গ্রহণযোগ্য হল না। দু'পক্ষই তাদের অবস্থানে রইল অটল, অনড়। জনাব আবদুর রউফ চৌধুরী এবং মিয়া মুসা হোসেনের সেদিনের দৃঢ়তাকে প্রশংসা না করে পারা যায় না।

অনেক প্রচেষ্টা হল। অলি আহাদ সাহেব এলেন প্রস্তাব নিয়ে, একবার সমঝোতার জন্য মোশতাক সাহেবের সঙ্গে বসা যায় না?

অলি আহাদ সাহেব আমার স্ত্রীকে বোন সম্বোধন করতেন, আমার বন্ধুরা সকলেই সে কারণে তাকে 'রানার মামা' বলে ডাকত এবং আমিও সেই সুবাদে সুযোগ নিতে ছাড়তাম না। কিন্তু ব্যক্তিগত সুসম্পর্ক আজ আর কাজ করল না। বললাম, নিশ্চয়ই বসা যায়। কিন্তু তারপর এই দুনিয়াতে শুধু একজনই বেঁচে থাকবে। হয় তিনি, নয় তো আমি। বলুন বসার ব্যবস্থা করতে চান?

আমার এতটা উগ্র মনোভাব সে ভাবতে পারেনি। অনেক জ্বালায় জ্বলে অঙ্গার হয়েছি!

সে মুখ কালো করে চলে গেল।

আমি সেক্রেটারি জেনারেল হিসাবে দলের জরুরি কাউন্সিল অধিবেশন আহ্বান করলাম। ইতিপূর্বে মোশতাক সাহেব কারাগার থেকে মুক্তির পর এবং বায়তুল মোকাররমের ন্যক্কারজনক দুর্ঘটনার পর বিভিন্ন জেলা সফর শেষে ঢাকার ইডেন হোস্টেল প্রাঙ্গণে জাঁকজমকের সঙ্গে ডেমোক্রেটিক লীগের প্রথম প্রকাশ্য কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। দু'দিনব্যাপী সে সম্মেলনের প্রথম দিনে সম্পাদকের রিপোর্ট শেষে যে বক্তৃতা করেছিলাম তা নাকি ছিল আমার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বক্তব্য। বন্ধুরা বলে সম্মেলনে যে তেজস্বিনী বক্তৃতা হয়েছিল তা নাকি ছাত্রজীবনের পরে তারা আর শোনেনি। সমস্ত হাউস আমার নিয়ন্ত্রণে দেখে আমার ইচ্ছামতো কমিটি নির্বাচন রোধ করতে মোশতাক সাহেব এক নতুন কৌশলের অবতারণা করলেন। একটি কমিটি তৈরি করে

আমাকে তাতে স্বাক্ষর করতে অনুরোধ করলেন। আমি না দেখে স্বাক্ষর করব না, তা ছাড়া আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী অধিবেশন সম্পূর্ণরূপে আমার করায়ত্ত। মোশতাক সাহেবের নেতৃত্বে গঠিত দল হলেও তা ছিল নিষ্প্রভ।

আবদুর রউফ চৌধুরী আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। তার সনির্বন্ধ অনুরোধে সই করে দিলাম। সম্মেলনের শেষ অধিবেশনে কমিটি যখন ঘোষিত হল প্রত্যক্ষ করলাম, একটা জগাখিচুড়ি কমিটি গঠিত হল। সেক্রেটারি জেনারেলরূপে সেই কমিটি নিয়ে কাজ করা ছিল দুরূহ।

তাই এবার দলকে পরিষ্কার করার জন্য, বঙ্গবন্ধু হত্যার ইল্‌জাম মুক্ত করার জন্য এবং কর্মীভিত্তিক একটি গণমুখী রাজনৈতিক দল গঠনের জন্য নতুন সম্মেলন ডাকলাম আমার বাসভবনের আঙ্গিনায় প্যান্ডেল বেঁধে। তখনও বাড়ি নির্মাণ করিনি। প্রায় সমস্ত জায়গাটি খালি পড়ে ছিল।

দল দু'ভাগে বিভক্ত হওয়ার আনুষ্ঠানিকতা শুধু সম্পন্ন হতে বাকি। মোশতাক সাহেব আমাকে এবং মিয়া মুসাকে আগামসিহ্ লেনের ত্রিতলে বসে দল থেকে বহিষ্কার করলেন দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের কারণে। আর আমাদের কাউন্সিল থেকে এক শত একটি কারণ উল্লেখ করে খন্দকার মোশতাক আহমেদকে দল থেকে বহিষ্কার করা হল। সেই সম্মেলনেই জীবনের দীর্ঘতম বক্তৃতা—সাড়ে চার ঘণ্টাব্যাপী বিরতিহীন বক্তৃতা করেছিলাম। বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত থাকার সন্দেহ, সেই সন্দেহের প্রত্যক্ষ ফল, 'নাজাত দিবস' পালনের ঔদ্ধত্য, ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা, স্বার্থান্ধতা, দলীয় স্বার্থ ও শৃঙ্খলাবিরোধী অসংখ্য কর্মকাণ্ড এবং অরাজনৈতিকসুলভ প্রতিটি কার্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে কাউন্সিলে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়; মোশতাক জাতীয় নেতা নন, তিনি জাতীয় কলঙ্ক। তাঁকে রাজনৈতিক অঙ্গন থেকে যত দূরে রাখা যায়, ততই মঙ্গল।

আবদুর রউফ চৌধুরীকে অস্থায়ী সভাপতির দায়িত্ব দিয়ে সাবেক কমিটির অধিকাংশ কর্মকর্তাকে পুনরায় নির্বাচিত করে নতুন মুখসমূহের অন্তর্ভুক্তিতে ডেমোক্রেটিক লীগের পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠিত হল।

আজ, দুই যুগ অতিবাহিত হবার পর তাঁর কন্যা দেশের প্রধানমন্ত্রী হলে বঙ্গবন্ধুর শোকে পদ্মা, মেঘনা, যমুনার পানির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে শোকাশ্রু বর্ষিত হচ্ছে। কিন্তু সেদিন নেতার স্মৃতির প্রতি অটুট শ্রদ্ধাবশত এবং নীতিগতভাবে হত্যার রাজনীতিকে ঘৃণা করে বহু পরিশ্রম, ঘাম ও রক্তের ফসল দলটিকে কলুষমুক্ত করতে গিয়ে নিজেদের রাজনৈতিক ভবিষ্যতকে অনিশ্চিত করতে আমাদের মনে কোন দ্বিধা জন্ম নেয়নি। ১৫ই অগাস্টের শোকাবহ ঘটনাকে কেন্দ্র করেই দলেও অনেক ঘটনা সংঘটিত হল যার সুদূরপ্রসারী প্রভাব থেকে দূরত্ব বজায় রাখা ইতিহাসের পক্ষেও সম্ভব ছিল না।

সেদিনের দ্বিধা-বিভক্তি ইতিহাসের ঘটনা। সমস্ত পত্রপত্রিকায় দীর্ঘদিন ধরে

তার বিবরণ প্রকাশ পেয়েছিল। সবকিছু জানা সত্ত্বেও কেবল প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য বঙ্গবন্ধু আত্মজার কোপানলে সেই আমাদেরকেই পড়তে হল—যারা বঙ্গবন্ধুর প্রশ্নে কোনদিনই আপস করেনি। জেনেশুনেই বিষ করেছ দান!

"বন্ধু তোমার বুক ভরা লোভ, দু'চোখে স্বার্থ ঠুলি
নতুবা দেখিতে তোমাকে সেবিতে দেবতা হয়েছে কুলি।"

বঙ্গবন্ধুর কন্যাকে এটা মানায় না। এক সিংহ হৃদয় মানুষের তনয়া, মূষিকের দায়িত্ব তার নয়। অভিভাবকরা সন্তুষ্ট হলেও ইতিহাস ক্ষমা করে না।

গ্রীন রোডে বারী সাহেবের বাসায় অস্থায়ী কার্যালয় স্থাপন করা গেল। ওয়ার্সী দম্পতি সেসময় দলের জন্য প্রভূত অবদান রাখে। ১৫ পুরানা পল্টনে যেখানে একদা আওয়ামী লীগের অফিস ছিল, সালেহার দাদার বাসার এক অংশে দীর্ঘদিন ভাড়া থাকত আমাদের চেয়ারম্যান আবদুল কাদের। তার নিজস্ব বাড়ি পুরানা পল্টনে নির্মাণাধীন। তাকে বললাম, তুমি শীঘ্র কয়েকটি রুম কমপ্লিট করে নিজের বাড়িতে উঠে যাও। তোমার ফ্লাটে আমরা দলীয় কার্যালয় স্থাপন করব।

তার ফ্লাটের সঙ্গে ছিল বাড়িটির বিস্তৃত ছাদ। রাজনৈতিক অফিসের জন্য এলাকাটি যেমন উপযুক্ত, তিনটি রুম এবং ছাদ নিয়ে বাড়িটি ছিল অফিসের জন্য সম্পূর্ণ উপযোগী। কাদের কেবল আমার চিরদিনের সহকর্মীই নয়, দলেরও সে একজন। হাসিমুখে ফ্লাট ছেড়ে দিল। সালেহার দাদীকে না বলেই উঠে গেলাম। টানিয়ে দিলাম সাইন বোর্ড। নাত-জামাইয়ের উৎপাত সহ্য করতেই হয়। একটি টেলিফোনেরও ব্যবস্থা করা গেল। সবদিক থেকে সুবিধাজনক কার্যালয়ের উদ্বোধন করতে পেরে আনন্দ লাভ করলাম। নতুন করে রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতে মন্দ লাগছিল না। মোশতাক সাহেবের সঙ্গে যতদিন রাজনীতি করেছি, মনের মধ্যে প্রায়ই একটা দোষী-ভাব প্রচ্ছন্নে বিরাজ করত। যদি মোশতাক সাহেব সত্যিই বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে কোনক্রমে জড়িত থেকে থাকেন, তা হলে তাঁর সঙ্গে যোগ দেওয়াটা আমাদের জন্য খুবই ভুল হয়েছে। সে ভুল সংশোধনের সুযোগ পেয়ে নিজেদেরকে ভারমুক্ত মনে করলাম। বঙ্গবন্ধুর প্রশ্নেই বিষয়টি নিষ্পত্তি হওয়ায় আরও পুলকিত হলাম।

নব-উদ্যমে দলকে সুগঠিত করার প্রয়াস পেলাম। একথা অস্বীকার করার সুযোগ নেই, প্রারম্ভে মোশতাক সাহেবের কারণেই দলে জন-সমাগম

বাড়ছিল। কিন্তু সেটা ছিল ভাসমান লোকজন। একটি দলের সবচাইতে বড় মূলধন হল সে দলের কর্মী-বাহিনী। সুখের কথা, কর্মীরা প্রায় সকলেই আমাদের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেছিল। অধ্যক্ষা নূরজাহান বেগম এবং মিসেস ওয়ার্সীর নেতৃত্বে দলের সব ক'জন মহিলা সদস্যাও আমাদের সঙ্গেই ছিল।

অলি আহাদ সাহেবের ক'জন লোক এবং কিছু বয়স্ক নিষ্ক্রিয় সদস্য ব্যতীত মোশতাক সাহেবের অংশে তেমন লোক রইল না। জানতাম, কিছুদিন পর অলি আহাদ সাহেবও পৃথক হবে। কেননা, দীর্ঘদিন কারো সঙ্গে থাকা তাঁর ধাতে সয় না।

বিভিন্ন জেলায় সফরসূচি প্রণয়ন করলাম। ডিএল-এর ছাত্র সংগঠন দ্বিধা-বিভক্ত হলেও যুবসংগঠন এককভাবেই আমাদের সঙ্গে ছিল। শামীম-আলমামুন তার সভাপতি এবং শহিদুল আলম সাঈদ সাধারণ সম্পাদক। তারা যুব সমাজের পক্ষ থেকে একটি সুন্দর সম্বর্ধনার আয়োজন করল এবং সে সম্বর্ধনায় আনুষ্ঠানিকভাবে আমাকে 'বঙ্গকণ্ঠ' উপাধিতে ভূষিত করল। উপাধির যোগ্য আমি নই এবং তার ব্যবহার পছন্দ করতাম না বিধায় সেটিকে বহুল প্রচারিত হবার সুযোগ দিলাম না।

ঢাকা মহানগর কমিটির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট মান্নান সাহেব আমাদের সঙ্গে থাকলেও সভাপতি হাজী সেলিম সাহেব দ্বিধা বিভক্তির পর আর সক্রিয় ছিলেন না। শ্রমিক সংগঠন দু'ভাগ হল। কিন্তু মহিলা সংগঠন ও সাংস্কৃতিক সংস্থা আমাদের সঙ্গেই একাত্ম ছিল। মোশতাক সাহেব দলীয় কার্যালয়ে যেতেন না; বাড়ি বসেই অন্যদের দিয়ে কাজ করাতেন। এখানে সমস্ত নেতৃবৃন্দ প্রতিদিন সন্ধ্যায় দলের কার্যালয়ে একত্রিত হত। ফলে দলের মধ্যে প্রাণচাঞ্চল্য ফিরে এল।

সমস্যা হল একটি রাজনৈতিক দল পরিচালনা করতে অনেক অর্থের প্রয়োজন। আমাদের ভরসা ছিল কর্মীবৃন্দ। যে কোন কার্যে নেতা-কর্মীরা সম্মিলিতভাবে অর্থ যোগানের চেষ্টা করতাম। তবুও অজস্র অর্থের যোগান ব্যতীত একটি সত্যিকারের রাজনৈতিক দল চালানো শুধু কঠিন নয়, প্রায় অসম্ভব।

এর মধ্যে বিচারপতি সাত্তার সাহেব, যিনি জিয়াউর রহমান সাহেবের মৃত্যুর পর রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন, তিনি একদিন আমাকে চা-এর আমন্ত্রণ জানালেন। তিনি আমার ফুপা শ্বশুরের আত্মীয়। ফুপা হাসপাতালে ভর্তি থাকলে তিনি তাঁকে দেখতে এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে কোন কথা হয়ে থাকবে। আমি পরদিন ফুপাকে দেখতে গেলে তিনি আমাকে অনুরোধ করলেন, রাষ্ট্রপতি সাত্তার সাহেব মুরব্বী মানুষ। তিনি যদি তোমাকে দেখা করতে আমন্ত্রণ জানান, তুমি কিন্তু অসম্মতি জানিয়ো না আমি তাঁকে কথা দিয়েছি।

তাঁর কাছে স্বীকার করেছিলাম, ঠিক আছে যাব।

গেলাম বঙ্গভবনে। ওবায়েদ তখন মন্ত্রী। তার সঙ্গে কথা হল। মিলিটারি সেক্রেটারি সাদেকুর রহমান সাহেব আমাকে প্রেসিডেন্ট সাহেবের বসার ঘরে নিয়ে গেলেন। কুশলাদি বিনিময়ের পর বেয়ারাকে ডেকে বললেন, দুই কাপ চা।

দু'কাপ চা-ই শুধু এল। চা-এর দাওয়াতটি আক্ষরিক অর্থে সত্য। চা শেষ করে তিনি বললেন, আপনি তো আমাদের জামাই। বিএনপি'তে যোগ দিন। আমি আপনার দিকটা দেখব।

মনে মনে ভাবলাম, জামাই আদর যা দেখিয়েছেন, তাতেই বুঝতে পারছি কতটা দেখবেন। কিছুক্ষণ চুপ করে ভাবলাম, বলা ঠিক হবে কিনা। শেষে ভাবলাম, বলাই ভালো। তিনি যখন আমাকে সরাসরি দলে যোগ দেওয়ার কথা বললেন, আমিও সরাসরি কথা বলব না কেন!

বললাম, প্রেসিডেন্ট সাহেব, আপনাকে কে দেখবে সে চিন্তা করেছেন?

চমকে বললেন, বাবা, কথাটা বেশ করে বুঝিয়ে বলুন তো!

এর মধ্যে কিছু ঘটনা ঘটেছে যার ফলে আমাদের রাজনৈতিক মহলে ধারণা হয়েছিল, উত্তর পাড়া এল বলে! সেনাবাহিনীর কমাণ্ডার ইন চিফ এইচ.এম.এরশাদ চুপ করে বসে নেই। তাঁরও উচ্চাভিলাষের কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। কয়েকদিন পূর্বে তিনি এ ধরনের কোন মন্তব্য করেছেন যে, সেনাবাহিনী সমন্বয়ে উপদেষ্টা পরিষদ জাতীয় কোন কমিটি গঠন করা বাঞ্ছনীয়। তিনি এ প্রস্তাবনা রাখেন কী করে বোধগম্য হয় না! সরকারের প্রতিক্রিয়া নেই। ওরা অন্য কাজে ব্যস্ত। রাষ্ট্রপতির সাথে সাক্ষাৎ করেও তিনি কিছু কথা বলে গিয়েছিলেন যার অর্থ দাঁড়ায় তারা আসছে। বিএনপি'র দিন শেষ হয়ে এল বলে।

তিনি রাষ্ট্রপতি। তাঁর সংবাদ রাখা প্রয়োজন। বললাম, প্রেসিডেন্ট সাহেব, কিছু যদি মনে না করেন তা হলে বলি, বাইরে আমাদের ধারণা বিএনপি'র শাসনকাল প্রায় শেষ। যে কোন মুহূর্তে সামরিক হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা। তা ছাড়া, আপনাকে আপন জেনেই বলছি, দলটি আপনাদের দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত হয়েছে। মন্ত্রীর বাড়ি থেকে কুখ্যাত ডাকাত গ্রেপ্তার হওয়ার খবর আপনি আমার চাইতেও ভালো জানেন। সমাজের সর্বত্র, বিশেষ করে সরকারের উচ্চমহলে ঘুষ আর দুর্নীতির রাজত্ব চলছে। আমলারাও বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। মানুষের নাভিশ্বাসের যোগাড়। আপনি রাষ্ট্রপতি, কিন্তু বার্ধক্যের কারণে সবকিছু তদারক করা আপনার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। এ সুযোগ সামরিক বাহিনীর উচ্চাভিলাষী কর্মকর্তারা ছেড়ে দিবে বলে মনে হয় না। শাসন ক্ষমতা আপনার করায়ত্তে নেই। আপনি আমাকে আপনার সঙ্গে যোগ দিতে বললেন, আমার ধারণা আপনার হাতে সময় নেই। দু'মাস

পরেও যদি ক্ষমতায় থাকেন, তখন ভেবে দেখব। প্রেসিডেন্ট সাহেব, এখন ঘর সামলান, অন্যকে পরে ডাকবেন।

তিনি আমার কথায় চিন্তিত হলেন। বেশ কিছুক্ষণ পর বললেন, বাবা, আপনার খোলামেলা কথায় সন্তুষ্ট হলাম। আমি দেখছি কী করা যায়। যদি সবদিক সামলাতে পারি, তখন আবার কথা হবে।

বিদায় নিয়ে চলে এলাম। আর কথা বলার সুযোগ হয়নি। তিনি সামলাতে পারেননি। 'সুগন্ধা'য় মন্ত্রী ও দলীয় নেতৃবৃন্দকে ডেকে দোষারোপ করেছেন, ঘুষ ও দুর্নীতির অভিযোগ করেছেন। দলের ভাবমূর্তি আরও নষ্ট হয়েছে। যারা হাঁটিহাঁটি পা পা করে এগুবে মনে করেছিল; তারা দ্রুতপদে এগিয়ে আসছে—পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে।

ঢাকায় আমাদের একটি জনসভা করা একান্তই প্রয়োজন। ব্যবস্থা করা গেল। বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণেই সভা করবো। মানুষ যে মাটিতে হোঁচট খায়, সে মাটি আঁকড়ে ধরেই আবার উঠে দাঁড়ায়। পোস্টার-লিফলেট বিলির আয়োজন চলছে। বেশ রাত পর্যন্ত অফিসে আছি। জনসভার সবকিছু তদারক করছি। যে কর্মীরা বায়তুল মোকাররমের আশেপাশে পোস্টার লাগাচ্ছিল, তারা ফিরে এল। বলল, একটা কিছু ঘটে গেছে। পুলিশ আমাদের পোস্টার লাগাতে দিচ্ছে না, বলছে, সামরিক আইন জারি হয়েছে। রাজনৈতিক কার্যাদি এখন বন্ধ।

যা ভেবেছিলাম তা-ই হল। দু'মাস নয়, আমার সঙ্গে কথা হওয়ার তিন সপ্তাহের মাথায় বিচারপতি সাত্তার সাহেবের কাল শেষ হল।

এক নতুন অধ্যায় শুরু হল। অনেক আশার বাণী এবং সরকার ও সমাজের শত অব্যবস্থার দূরীকরণের আশ্বাস দিয়ে এরশাদ সাহেব এলেন। জনগণের প্রতিনিধিদের পশ্চাতে রেখে সামরিক জান্তা দেশের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হয়ে বসলেন। জিয়ার পদাঙ্ক অনুসরণ করেই এরশাদ সাহেব এসেছেন। তাঁকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। বাংলাদেশ যে 'ওপেন হাউস'! যে কেউ চেষ্টা করতে পারে। কথায় বলে 'বাপে নাম রাখছে দুইখ্যা, সুখ হবে কেমনে!' জাতির যিনি পিতা তিনিই 'এক নেতা, এক দেশ, এক রাতেই সব শেষ' নাটকের পর্দা উত্তোলন করে গিয়েছিলেন গণতন্ত্রকে বিদায় করে একদলীয় তথা এক ব্যক্তির শাসন প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে। লোকে বলে গোড়ায় গলদ।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরবর্তী ইতিহাস ঘাঁটলে একথাই সপ্রমাণ হয় শুরুতেই জাতির পিতা যে ব্যবস্থাপত্র দিলেন, সেই ওষুধেই রোগী মারা গেল। দোষ দেবেন কাকে!

রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করা হয়নি। কেবল আপাতত রাজনীতি স্থগিত করা হয়েছে। কর্মকাণ্ড বন্ধ। আমাদেরও দিন কাটছে অনেকটা ভিন্ন খাতে। পরিবারকে সময় দেওয়া যাচ্ছে। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদির জন্য অধিকতর সময় পাচ্ছি। পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে আবার যোগাযোগ স্থাপিত হচ্ছে।

এরশাদ সাহেব প্রতিদিনই কোন না কোন বক্তৃতা-বিবৃতি দিয়ে যাচ্ছেন। সমাজচিত্র যা তুলে ধরেছেন, সবটাই সঠিক। তবে আশু সমাধানের সম্ভাবনা সম্বন্ধে জনমনে অনিশ্চয়তা দূর হয়নি। একদিন সাইকেলে চড়ে ক্যান্টনমেন্ট থেকে সিএমএএল-এর মানে, মার্শাল-ল অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের অফিসে এলেন। পুরাতন পার্লামেন্ট ভবনই তাঁর অফিস। দূরত্ব খুবই সামান্য। সাইকেলে এসে ছবিসহ সমস্ত পত্রিকায় প্রতিবেদন ছাপালেন। পেট্রোল বাঁচাতে গাড়ি ব্যবহার না করে তিনি সাইকেলে এলেন।

প্রচারণার নব্য-পন্থা দেখে হাসি পায়। তাঁর সাইকেলে চলার ছবি তোলার জন্য, টিভি এবং পিআইডি'র যানবাহনসহ প্রতিটি পত্রিকার কত না সাংবাদিক তাদের বাহন নিয়ে ছুটে এসেছে। খাজনার চাইতে বাজনা বেশি।

প্রচুর আড়ম্বরের সাথেই এরশাদের সামরিক শাসনের কর্মকাণ্ড শুরু হল। প্রথমদিকে যা হয় তার ব্যতিক্রম এ ক্ষেত্রেও প্রত্যক্ষ করা গেল না। রাস্তাঘাট পরিষ্কার করা হচ্ছে, অফিস-আদালত ছিমছাম। অফিসসমূহে নিয়মানুবর্তিতার দৃশ্যমান পরিবর্তন। সর্বত্রই একটা সাজ-সাজ রব। লম্বা চুলের যুবককে দেখা গেল পরামানিকের সাহায্য নিয়ে সেগুলোকে মানানসই করতে। স্বল্পবসনা মহিলারাও শালীন পোশাক পড়ে রাস্তায় বের হয়।

কিন্তু ক'দিন? বাঙালি চরিত্রের এই এক বৈশিষ্ট্য। হঠাৎ কোন হুজুগ এলে ক'দিন তা-ই নিয়ে মাতামাতি। তারপর একসময় সবই থিতিয়ে আসে। সবকিছুই পূর্ববৎ চলতে থাকে।

এরশাদ সাহেবকে খুব একটা জানতাম না। যখন নিয়মিত স্টেডিয়ামে যেতাম খেলা দেখার জন্য, সেসময় কখনও সেনাবাহিনীর টিমের খেলা থাকলে ফুটবল মাঠে তাঁকে দেখেছি। একজন সাধারণ চেহারার বৈশিষ্ট্যহীন মানুষ বলেই তখন মনে হত। তিনি যাদেরকে তাঁর সরকারের উপদেষ্টা পরিষদে নিয়োগ করলেন তা পর্যালোচনা করে জনগণ খুব উৎসাহিত বোধ করল না। মেজর জেনারেল মহব্বতজান চৌধুরী, এয়ার ভাইস মার্শাল আমিনুল ইসলাম, মাহবুবুর রহমান প্রভৃতি ব্যক্তিকে যারা চেনে তারা তাদেরকে একটি বিশেষ চিন্তা-চেতনার ধারক-বাহক বলেই জানে।

নোয়াখালীর মাহবুবুর রহমান জগন্নাথ কলেজ থেকেই আমার পরিচিত। দক্ষিণপন্থী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ছিল। আমাদের সঙ্গে মতের মিল বা অমিল কোনটাই তেমন ছিল না—সম্মানজনক দূরত্ব বজায় রাখার প্রচেষ্টা উভয়ই পরিলক্ষিত হত।

এরশাদ সাহেবের ক্ষমতারোহণের পর তাঁর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হল রোজার মাসে এক ইফতার পার্টিতে তাঁরই আমন্ত্রণে। রোজার মাস ইফতার পার্টিরও মাস। সামাজিক এবং বিশেষ করে রাজনৈতিক মহল এই মাসটিতে ইফতার আয়োজন করে। অন্যান্যদের আমন্ত্রণ জানায় এবং বেশ একটি মেলামেশার সুযোগ সৃষ্টি করে। সাংবাদিকদের উপস্থিতি অনস্বীকার্য। প্রচারণা সকলেরই পছন্দনীয়।

রোজা থাকেন না এমন অনেককেই দেখেছি ইফতার পার্টি অবহেলা করে না। কেবল সুনীল গুপ্তই নয়, বহু মুসলমানকেও হাসিচ্ছলে বলতে শুনেছি, রোজা না করে এমনিতেই পাপ করেছি, ইফতার না করে কি জাহান্নামে যাব?

তাই তারা মনোযোগ দিয়ে প্রতিদিন প্রতিটি পার্টিতে উপস্থিত হতে ভুল করেন না। রোজাদারগণ সারাদিনের উপবাসে শ্রান্ত। বেশি খেতে পারেন না, নামাজের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন। এদিকে বেরোজদারগণ সমানে চালিয়ে যাচ্ছে। সবাই ইফতারির পূর্ণ সদ্ব্যহার করে দোজখের শাস্তি থেকে রেহাই পাবার চেষ্টারত।

এরশাদ সাহেবের ইফতার পার্টিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেল। হয়ত সেটি তাদের জন্যই ব্যবস্থা করা হয়েছিল। একদফা ইফতার করে নামাজ পড়ে ফিরে আসতেই এরশাদ সাহেবের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তিনি সৌজন্যমূলক হাসির সঙ্গে বললেন, এত তাড়াতাড়ি শেষ করলে হবে? আসুন, পীর সাহেব মিষ্টি পাঠিয়েছেন, খেয়ে দেখুন।

পীর সাহেব মানে আটরশির পীর সাহেব। একটু অবাক হলাম। সামরিক শাসনকর্তার ইফতারের আয়োজনে পীর সাহেবের মিষ্টিও সংযোজিত হয়েছে! অবশ্য এরশাদ সাহেব পীর সাহেবের বিশেষ ভক্ত বলেই শুনেছি। ভক্তের আয়োজনে ভক্তিভাজনও শরিক হয়েছেন।

কেবল যে ডেমোক্রেটিক লীগই বিভক্ত হয়েছে তা-ই নয়; এর মধ্যে দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে ইতিপূর্বেই অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। জিয়াউর রহমানের জীবিতাবস্থাতে তাঁরই পৃষ্ঠপোষকতা এবং ঐকান্তিক ইচ্ছায় আওয়ামী লীগ দ্বিধা-বিভক্ত হয়। মিজানুর রহমান চৌধুরীর নেতৃত্বে একটি আওয়ামী লীগ এবং হাসিনা ওয়াজেদের নেতৃত্বে আর একটি আওয়ামী লীগ কাজ করছিল। এরশাদ সাহেবের আনুকূল্যে এখন বিএনপি দ্বিধা-বিভক্ত হল। জনাব শামসুল হুদা চৌধুরী, ডা. মতিন এবং রিয়াজউদ্দীন আহমেদ ভোলা মিয়ার নেতৃত্বে মীরপুরের এস.এ.খালেকের সিনেমা হলে সম্মেলন করে এরা

পৃথক বিএনপি প্রতিষ্ঠা করলেন। 'টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া—হুদা, মতিন ভোলা মিয়া'—এই স্লোগান দিয়ে তারা জাঁকিয়ে বসলেন। ভোলা মিয়া নাকি এরশাদের কেমন মামা হন। তাঁরা ক্ষমতায় গেলেন বলে!

এরশাদ সাহেব আট-ঘাঁট বেঁধেই নেমেছেন। তাঁর দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা। নিজের উদ্যোগে রাজনৈতিক দল গঠন করবেন বলে সর্বমহলে জল্পনা-কল্পনা। হুদা, মতিন, ভোলা মিয়ার বিএনপি'র মাহবুবুল হক দোলন, শোনা যায়, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রীদের খসড়া তালিকাও প্রস্তুত করছে।

বেচারা দোলন। পিতা-মাতা সার্থক নাম রেখেছিলেন। কোথাও স্থায়িত্ব পায় না। আমার বিশেষ দুর্বলতা রয়েছে তার জন্য। ছাত্রজীবনে অনেক সংগ্রামের অগ্রভাগে ছিল। এনএসএফে'র নেতা হয়েও তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন এবং জনগণের দাবির প্রশ্নে দোলনের ভূমিকা ছিল প্রশংসনীয়। তার দুর্ভাগ্য, বিভিন্ন দলে তার কর্মীরা ক্যাবিনেট মন্ত্রী পর্যন্ত হয়েছে। কিন্তু সে একবার এমপি পর্যন্ত নির্বাচিত হতে পারেনি। কেউ কেউ এমনই দুর্ভাগ্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। একজন রাজনীতিবিদের যে সমস্ত গুণাবলি থাকা প্রয়োজন, অতিভোজন থেকে শুরু করে, প্রায় সব গুণই দোলনের রয়েছে—তার পরও তার ভাগ্যে শিকা ছিঁড়ে না। দেখা যাক এবার যদি কিছু হয়! দোলনের কিছু হলে খুশি হব!

এরশাদ সাহেবের অফিস থেকে আমাদের মহলে কিছু কিছু যোগাযোগ হয়েছে। একদিন হেনরী ভাই, অর্থাৎ জনাব ইকবাল আনসারী খান ডেকে বললেন, তার সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে। শীঘ্রই তাকেও সরকারে বিশেষ দায়িত্বে নেওয়া হবে।

আনন্দিত হলাম। তবুও নিবেদন করলাম, আপনি আমাদের দলের অন্যতম নেতা। আপনি সরকারে যোগ দিলে আমাদেরও অংশিদারিত্ব এসে যায়। সব বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেবেন।

তিনি জানালেন, ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের চাইতে দলগত সামগ্রিক সিদ্ধান্তই তার লক্ষ্য।

মেজর জেনারেল চিশতি ছিলেন প্রধান সামরিক আইন শাসনকর্তার প্রিন্সিপাল স্টাফ্ অফিসার—পিএসও। তাঁর তরফ থেকে একদিন আমন্ত্রণ এল, যদি একবার তাঁর কার্যালয়ে এক কাপ চা পান করতে যাই!

বুঝলাম, রাজনৈতিক আলোচনা আসন্ন। ঢাকাস্থ দলের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করলাম। ব্রাকেটের দল চালাতে সকলেরই অনীহা লক্ষ্য করা গেল। দ্বিতীয়ত, দল চালাবার আর্থিক সমস্যার সমাধানের কোন আশু সম্ভাবনা না থাকায়, বৃহত্তর কোন প্রক্রিয়ায় মর্যাদা সহকারে সম্পৃক্ত হলে সকলেই সমর্থন জানাবে বলে অভিমত দিল।

চিশতি সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলাম। সৈনিক হয়েও একজন

মিষ্টভাষী লোক বলে আমার মনে হল। দল গঠনের প্রাথমিক পর্যায় সম্বন্ধে পরোক্ষভাবে অনেক কিছুই জানতে চাইলেন। তাঁকে খোলামেলা প্রশ্ন করলাম, রাজনৈতিক দল গঠন রাজনৈতিক ব্যক্তিদের কাজ, আপনারা এতে উৎসাহী কেন? জিয়াউর রহমান সাহেব যেমন ক্যান্টনমেন্টে বসে বিএনপি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, আপনাদের প্রধান এরশাদ সাহেবেরও কি সে পরিকল্পনা রয়েছে?

তিনি হেসে বললেন, সেকথা তাঁর সঙ্গেই আপনাদের হতে পারে।

আমি কিছু জ্ঞান আহরণ করতে চাই। প্রথম দিন সৌজন্যমূলক আলোচনা সেরে চা-পানান্তে হাসিমুখে বিদায় নিয়ে এলাম। দলীয় নেতৃবৃন্দকে বললাম, ওরা বোধহয় আমাদেরকে বাজিয়ে দেখছে।

তিনি আর একদিন চা-এর আমন্ত্রণ জানালেন। এদিন গিয়ে দেখি মিজান সাহেব এবং জনাব শামসুল হক সাহেবও আছেন। তাঁদের সঙ্গে হাসিগল্পে চা-পান ভালোই হল। চিশতি সাহেবের ওখানে সেদিন সাইয়িদ তারেককে প্রথমবারের মতো দেখলাম। আকর্ষণীয় ধারালো চেহারার যুবক। একসময় জাসদ করত—সাংবাদিকতা পেশায়ও ছিল। সেও আলোচনায় অংশ নিতে শুরু করল এবং এক পর্যায়ে হয়ত চিন্তা-ভাবনা না-করেই জিজ্ঞেস করে বসল, যদি দল করতেই হয়, তা হলে আপনারা তা ঠিক কিভাবে করবেন?

মিজান সাহেব ও শামসুল হক সাহেবকে ইঙ্গিতে থামিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার পরিচয় না পেলে আলাপে সুবিধা হচ্ছে না।

তখন তার পরিচয় এবং পেশা জানা গেল। এখন নতুন দল গঠনে সহায়তা করতে চিশতি সাহেবের সঙ্গে আছে। বললাম, জাসদ করতেন, তার প্রতিষ্ঠাতা সিরাজুল আলম খানকে জিজ্ঞেস করবেন দল কী করে প্রতিষ্ঠা করতে হয়। সিরাজুল আলম দীর্ঘদিন আমার সঙ্গেই ছাত্রলীগ করেছে। আমি তাঁর নেতা ছিলাম। দল করার অভিজ্ঞতা তাঁর আমাদের সঙ্গেই হয়েছিল। সে-ই আপনার প্রশ্নের ভালো উত্তর দিতে পারবে।

মনে হল সে হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছে, আমি কি বলতে চাচ্ছি।

সে বলল, আমি আপনাদের অভিমত জানতে চাচ্ছিলাম মাত্র।

হেসে বললাম, বৃদ্ধ পিতামহকে বাসরের অভিজ্ঞতা জিজ্ঞেস না করাই ভালো!

সবাই হেসে উঠলেও তার ফরসা মুখ রক্তিম হল। পরে বহুবার, বহুদিন তারেকের সঙ্গে অনেক আলোচনাই হয়েছে। কিন্তু আমার সঙ্গে কথা বলতে সে সবসময়ই নিত্য-সত্য চিন্তা করে বলত।

এরশাদ সাহেব ইতিমধ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে মত বিনিময়ের কর্মসূচি নিয়েছিলেন। একদিন আমাদের বরাবরেও চিঠি এসে পৌঁছল—পরদিন রাত আট ঘটিকায় ডেমোক্রেটিক লীগের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক মত বিনিময় করবেন।

আমাদের অস্থায়ী সভাপতি অধিকাংশ সময় কুষ্টিয়াতে থাকতেন। তাঁর সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করছি, ভাগ্যক্রমে সে ঢাকা এসে উপস্থিত। আমি, রউফ চৌধুরী, ইকবাল আনসারী খান, আবদুল বারী ওয়ার্সী, মিসেস আমেনা বারী, শামীম আল মামুন, শহিদুল আলম সাঈদ, অ্যাডভোকেট দেলোয়ার হোসেন, আবদুল হাকিম, আবদুল কাদেরসহ্ আমরা পনেরো জনের একটি দল জনাব হোসাইন মোহাম্মদ এরশাদের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য পুরাতন সংসদ ভবনে অবস্থিত প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের কার্যালয়ে যথাসময়ে উপস্থিত হলাম।

এরশাদ সাহেব সদলবলে ঢুকলেন। মেজর জেনারেল মহব্বতজান চৌধুরী, মেজর জেনারেল আবদুল মান্নান, মেজর জেনারেল চিশতি এবং অন্যান্য অফিসারদের নিয়ে আসন গ্রহণ করার পূর্বে সকলের সঙ্গে পরিচিত হলেন এবং হাত মিলালেন। তিনি এবং আমি পাশাপাশি বসলাম। টিভি এবং অন্যান্য ক্যামেরা তখন সচল। সৌজন্যমূলক আলাপ-আলোচনার পর এরশাদ সাহেব তাঁর সরকারের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য সম্বন্ধে নাতিদীর্ঘ ভাষণ দিয়ে আমাকে প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা শাহ্ সাহেব, এতদিন যাবৎ রাজনীতি করছেন, বলুন তো দেশের মূল সমস্যা কোন্‌টি?

তাঁর এবং অন্যান্য আর্মি অফিসারদের সচরাচর একটা ধারণা থাকে, যার নেই কোন গতি, সে করে ওকালতি, নয় হোমিওপ্যাথি, নয় রাজনীতি। কোন ক্রমে টেনেটুনে মেট্রিক, আইএ, বিএ এবং ল' কয়েক চান্সে সাপ্লিমেন্টারি বা কমপ্লিমেন্টারিতে পাস করে ওকালতি করে এবং অবসরে শখের রাজনীতিতে সময় কাটায়। একটা সূক্ষ্ম অবহেলার ভাব তাদের অজান্তেই ফুটে ওঠে। প্রশ্নটি সেভাবেই করা হল কিনা বলা সম্ভব নয়!

বললাম, সমস্যার দেশের অপর নাম—বাংলাদেশ। অসংখ্য এর সমস্যা। মূলত তিনটি সমস্যাই প্রধান—শিক্ষা, যোগাযোগ এবং বিদ্যুতায়ন। তবে সব সমস্যার মূল সমস্যা হল অপ্রতিরোধ্য ও ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা।

তাঁর বোধহয় কিছুটা ধারণা পরিবর্তিত হল। সমস্যার মূল সম্বন্ধেই ইঙ্গিত করেছি। ধান-চাল দিয়ে নয়, রীতিমত অর্থ ব্যয় করে লেখাপড়া করেছি। সেন্ট গ্রেগরীজের ছাত্র, ব্যাপটিস্ট মিশন থেকে ঢাকা কলেজ, জগন্নাথ কলেজ এবং সর্বশেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিস্টিংশন নিয়ে এমএ এবং ল' পাস করেছি। সে কথা তাঁর জানা না-ও থাকতে পারে।

একজন জেনারেল বললেন, রাজনীতিবিদগণ আর কিছু না জানুক কথা বেশ ভালোই জানেন।

একটু ক্ষোভের সঙ্গেই জবাব দিলাম, কেউ কেউ আরও কিছু জানেন। হাফ-প্যান্ট পরা অবস্থা থেকে আন্দোলন করতে জানেন। দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্যদিয়ে মাতৃভাষাকে প্রতিষ্ঠা করতে জানেন। নির্যাতন-নিপীড়ন

সহ্য করে বছরের পর বছর জেল খাটতে জানেন, বাঙালিদের ন্যায্য দাবিসমূহ নিয়ে আপসহীন সংগ্রাম করতে জানেন। কর্মসংস্থান, বিশেষ করে সেনাবাহিনীতে তাদের যোগ্য স্থান প্রদানের দাবি জানাতে জানেন, প্রয়োজনে হাতে অস্ত্র তুলে নিয়ে যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করতে জানেন এবং সেই স্বাধীন দেশের রাষ্ট্রক্ষমতা তাদেরই নিয়োজিত সেনাবাহিনীর হস্তে তুলে দিতেও জানেন। জেনারেল সাহেব, রাজনীতিবিদগণ কথা বলা ব্যতীত একেবারেই কিছু জানেন না তা সঠিক নয়। আপনারা যখন কমিশনড অফিসার হয়ে কাঁটা চামচ দিয়ে ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ, ডিনার করেন, চাকরিতে প্রমোশন নিয়ে ঘরসংসার করে আনন্দময় এবং অর্থবহ জীবন-যাপন করেন, তখন আমরা বছরের পর বছর আন্দোলন করি, জেল খাটি। জীবন ও যৌবনের শ্রেষ্ঠ সময় সংগ্রাম করতে করতেই কাটিয়ে দেই।

আমাদের দলের প্রতিনিধিবৃন্দ যারপরনাই সন্তুষ্ট। 'যেমনি বুনো ওল, তেমনি বাঘা তেঁতুল।'

এরশাদ সাহেবের ভালোই বোধোদয় হয়েছে। আমার সম্বন্ধে খোঁজ-খবরও কিছু নিয়েছেন শুনেছি। তিনি বললেন, আপনি কিছু মনে করলেন নাকি? উনি কথার ছলেই ওকথা বলেছেন।

হেনরী ভাই উত্তর করলেন, মোয়াজ্জেমও কথার পৃষ্ঠেই কথা বলেছে!

এরশাদ সাহেব বললেন, আচ্ছা শাহ্ সাহেব, এই যে জনসংখ্যার সমস্যার কথা বললেন, এটাকে আপনি কতটা গুরুতর মনে করেন?

বললাম, দেশের এক নম্বর সমস্যা বলে মনে করি। এটা জনসংখ্যা বৃদ্ধি বললে কম বলা হবে। এটা হচ্ছে জনসংখ্যার বিস্ফোরণ। সমস্ত উন্নয়ন ও প্রগতির প্রচেষ্টা ব্যাহত হয়ে যাবে যদি অনতিবিলম্বে এই জন্মগতি রোধ করা না যায়। বাংলাদেশে প্রায় সব কল-কারখানায় কর্মবিমুখতা, হরতাল, বিরতি এসব প্রত্যক্ষ করবেন। কেবল বাড়িতে বাড়িতে যে উৎপাদনের কারখানাগুলো ফিট করা আছে সেখানে কোন শৈথিল্য নেই। নেই কোন ধর্মঘট বা বিরতি। প্রতি মুহূর্তে সেখানে বিশ্বরেকর্ড ভঙ্গ করে উৎপাদনের মাত্রা মিনিটে পাঁচ জনে পরিণত হচ্ছে।

আরও বললাম, সিএমএলএ সাহেব, সমস্যাটার একটা অতি সাধারণ উদাহরণ দিয়ে বলি। আপনার এই সুন্দর সাজানো ঘরে জনাপঁচিশেক লোক আমরা বসে আছি। বেশ স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করছি। যদি আরও দশ জন আসতে চায়, তা হলে ততটা স্বাচ্ছন্দ্য থাকবে না। কিন্তু আরও শতাধিক লোক যদি এই ঘরেই আপনার-আমার সংলাপ শোনার জন্য ঢুকে পড়ে; তা হলে মাভৈ! 'কোই ইধার গিরা, কোই উধার গিরা'—এই অবস্থা হবে। আমরা কথা বলার সুযোগ পাব না, বরং পরস্পরকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে নিজের জন্য খানিকটা স্থান সঙ্কুলানের চেষ্টা করব।

তিনি সম্পূর্ণরূপে একমত হলেন। বললেন, আপনাদেরকে অশেষ ধন্যবাদ। জাতীয় জীবনের এই সমস্যাটির কথা এত গভীরে প্রবেশ করে আমাদের নিকট কেউ তুলে ধরেনি।

আরও অনেক কথা হল। সেনাসুলভ কাঠিন্য কখন কেটে গেছে। স্বাভাবিক ভাষায় আমাদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে আলাপচারিতা করতে লাগলেন। একবারের জায়গায় দু'-বার চা দেওয়া হল। এক ঘণ্টা সময় স্থির করা ছিল, দু'ঘণ্টা পার হয়ে গেছে। তিনি তাঁর অন্য প্রোগ্রাম ক্যানসেল করে দিতে বললেন।

হঠাৎ উৎসাহিত হয়ে আমার হাত ধরে বললেন, চলুন, আমার 'অপ্স' রুম দেখবেন।

বুঝতে না পেরে তাকিয়ে থাকতেই বুঝিয়ে বললেন, আমার অপারেশন রুম দেখবেন। যেখানে সমস্ত তথ্য বা ডাটা সংগ্রহ করা আছে এবং কাজের গতিবিধিও চিহ্নিত করা আছে। আসুন, আপনাদের ভালো লাগবে।

সে ফাঁকে মিসেস আমেনা বারী তাঁকে আমার লেখা 'নিত্য কারাগারে' বইটি উপহার হিসাবে প্রদান করলেন। তিনি খুবই সন্তুষ্ট হয়ে তখনই সুদৃশ্য মোড়কটি খুলে বইটি নাড়াচাড়া করে দেখলেন। বললেন, বাহ্। খুবই খুশি হলাম। আপনি দেখি গুণী লোক। বাংলা একাডেমী ছেপেছে, নিশ্চয়ই ভালো বই। আমিও কবিতা লিখি। আমি আজই পড়ব। আগ্রহ নিয়ে পড়ব। বইটি দেওয়ার জন্য অনেক ধন্যবাদ।

বললাম, নিজের বই বলে আমি আনতে চাইনি। ওটার জন্য ধন্যবাদ কারো প্রাপ্য হলে তিনি মিসেস আমেনা বারী। তিনিই বইটি সংগ্রহ করে নিয়ে এসেছেন।

তিনি তাঁকেও বিশেষ ধন্যবাদ দিয়ে বইটি হাতে করেই 'অপস' রুমের দিকে এগিয়ে গেলেন। এক হাতে আমার বই, অন্য হাতে আমার ডান হাত ধরে আছেন।

ঘুরে ঘুরে সব দেখলাম। কাজের লোক বলেই মনে হল। বাংলাদেশের কোথায় কী আছে সব স্পষ্ট করে লিপিবদ্ধ আছে। নানা রঙ দিয়ে বিচিত্র সব গ্রাফ অঙ্কিত রয়েছে। প্রতিটি উৎপাদিত দ্রব্য, আমদানিকৃত পণ্য এবং রপ্তানি-মালামালের সর্বশেষ সংবাদ, খাদ্যশস্যের প্রতিদিনের মজুতের ওঠা-নামা, কতজন লোক, কোথায় কর্মরত, কতটা টাইপরাইটার রয়েছে তার হিসাবও সেখানে বিদ্যমান।

বললাম, এগুলো সঠিক চিত্র, না আপনাকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য আমলাদের প্রচেষ্টার ফসল?

বললেন, আমি নিজে সব ক্রস্ চেক করি। আপনি যে কোন একটি সংখ্যা নিয়ে যান, যদি ভ্রান্ত হয় তা হলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বুঝলাম তিনি শুধু কথার কাজী নন, কাজের কাজী। তাঁর সম্বন্ধে আগ্রহ জন্ম নিল। বিদায়ের মুহূর্তে তিনি উষ্ণতার সঙ্গে বুক মিলালেন এবং একান্তে বললেন, দু'-একদিনের মধ্যে টেলিফোন করব। অনুগ্রহ করে একবার আসবেন। কিছু কথা আছে।

বললাম, আমাকে একটু সময় দিতে হবে। আপনার প্রস্তাব কী হবে অনুমান করছি। কিন্তু আমাদের দলের সকলের সঙ্গে আলোচনা ব্যতিরেকে কিছুই করা যাবে না।

তিনি বললেন, ঠিক আছে, আপনি সকলের সঙ্গে আলোচনা করেই আসুন।

সম্মত হয়ে সকলকে নিয়ে সন্তুষ্টচিত্তেই ফিরে এলাম।

নেতৃস্থানীয় সকলের সঙ্গে আলোচনান্তে অফিস বাড়ির ছাদের উপরেই দলের প্রতিনিধি সভা আহ্বান করা হল। বাংলাদেশের আমাদের বিশিষ্ট সব নেতা-কর্মীকেই ডাকা হল। বিস্তারিত আলোচনা হল সে সম্মেলনে। দেখা গেল আমাদের চিন্তা-চেতনার সঙ্গে ঢাকার বাইরের নেতা-কর্মীদের চিন্তা-চেতনার সমন্বয়ের অভাব নেই। তারাও একমত, এই ধরনের দ্বিধা-বিভক্ত দল নিয়ে বিবৃতিসর্বস্ব একটি কাগুজে দল চালিয়ে যাওয়া হয়ত সম্ভব কিন্তু জাতীয় ভিত্তিতে একটি বৃহৎ রাজনৈতিক মঞ্চ ব্যতীত উদ্দেশ্য সফল হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই।

সম্মেলন সর্ব-সম্মতিক্রমে আমাকে পূর্ণ ক্ষমতা অর্পণ করল যাতে এ বিষয়ে যে কোন সিদ্ধান্ত এককভাবে আমি গ্রহণ করতে পারি এবং সেটাই হবে দলের সর্বসম্মত রায়। মানসিকভাবে সকলেই একটি সরকারি দল গঠনের প্রস্তুতি নিয়ে সম্মেলন থেকে বিদায় নিল।

এরশাদ সাহেবের লোকজন আমাদের কর্মপ্রবাহের দিকে সাগ্রহে লক্ষ্য রাখছিল। সম্মেলনের দু'দিন পরই এরশাদ সাহেব আমাকে তাঁর অফিসে আমন্ত্রণ জানালেন। রউফ চৌধুরী কুষ্টিয়া চলে যাওয়াতে আমাদের মধ্যে সবচাইতে প্রবীণ জনাব আবদুল বারী ওয়ার্সীকে নিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম।

অফিসে পৌঁছতেই এরশাদ সাহেব জড়িয়ে ধরলেন এবং বললেন, আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আপনাদের পার্টি যেভাবে আপনার পেছনে আছে জেনে আনন্দিত হলাম।

বললাম, আমাদের দল ছোট হলেও আমরা ঐক্যবদ্ধ আছি এবং আমরা যেটা করার সিদ্ধান্ত নিই, সেটা পূর্ণ আন্তরিকতার সঙ্গেই করে থাকি।

তিনি আমাকে বললেন, মোয়াজ্জেম সাহেব, আজ থেকে এই নামেই আপনাকে ডাকব। আমি আর্মির মানুষ। সরাসরি কথা বলতে পছন্দ করি। আমি একটি রাজনৈতিক দল করতে চাই, আপনাকে সেই দলের দায়িত্ব নিতে হবে।

বললাম, আর্মির লোক না হয়েও আমিও সরাসরি কথা সোজা করে বলাই পছন্দ করি। আপনার পার্টির উদ্দেশ্য-আদর্শ না জেনে কিছু বলা সম্ভব নয়।

তিনি বললেন, আপনাদের দলের মেনিফেস্টো আমি পড়েছি। গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, উন্নয়ন এবং ইসলামী মূল্যবোধের বিকাশই হবে নতুন দলের মূলমন্ত্র।

বললাম, একথা অনস্বীকার্য যে, কোন দলের ঘোষণাপত্রেই গণ-বিমুখ কোন কর্মসূচি থাকে না। প্রতিটি ধর্মপুস্তকে যেমনি করে কেবল সৎ-কর্মেরই উপদেশ থাকে, তেমনি করে সকল দলের ঘোষণাপত্রই জনগণের কল্যাণের বার্তাই বহন করে। নির্ভর করে দল পরিচালনা যারা করবে তাদের উপর। আমরা দলে সরকারি তদারকির পরিবর্তে সরকারে দলের তদারকি পছন্দ করি।

তিনি বললেন, এক পর্যায়ে দুটি একই শক্তিতে পরিণত হবে। তবুও আপনারা অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ, যেভাবে দলকে পরিচালনা করতে চাইবেন সেইভাবেই তা পরিচালিত হবে। এখন বলুন, আপনি দায়িত্ব নিতে সম্মত আছেন?

বারী ভাই জানতে চাইলেন, দায়িত্ব নেওয়া বলতে আপনি কী বুঝাতে চাচ্ছেন যদি একটু খুলে বলেন। আমাদের নেতার যা বয়স তাতে দলের সভাপতির দায়িত্ব তাকে মানাবে না। অবশ্য দলের মূল দায়িত্ব থাকে চিফ একজিকিউটিভ বা সাধারণ সম্পাদকের উপরে। আমাদের দলের কথা অবশ্য পৃথক। আমাদের দলের সাধারণ সম্পাদকই দলের নেতা।

এরশাদ সাহেব বললেন, কোন প্রবীণ নেতাকে সভাপতি করে মোয়াজ্জেম সাহেবকে যদি সেক্রেটারি জেনারেল বা মহাসচিব করা যায়, তা হলেই সর্বোত্তম ব্যবস্থা হবে। আমি সে কথাই বলতে চেয়েছি।

আকারে-ইঙ্গিতে এই প্রস্তাব বিভিন্ন তরফ থেকে প্রতিদিনই আসছে। মনে মনে একপ্রকার প্রস্তুতি চলছে। তবুও জানতে চাইলাম প্রস্তাবিত পার্টিতে আর কারা কারা আসছেন?

তিনি বললেন, অনেকের সঙ্গেই যোগাযোগ হয়েছে। আমি সর্বাগ্রে আপনার সম্মতি চাই। আপনি দায়িত্ব নিতে সম্মত হলে, আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করেই অন্যসব কাজ সমাধা করা যাবে।

আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলাম না সেই মুহূর্তেই কথা দেওয়া সঠিক হবে কিনা। একবার কথা দিলে, আমি তা থেকে সরে দাঁড়াই না—আমার অতি সমালোচকরাও তা স্বীকার করে। তিনি উঠে এসে আমার ডান হাত চেপে ধরলেন। মানুষ যেভাবে এজ্বিন নেয়, সেভাবে তিনি আমার সম্মতি কামনা করলেন।

বললাম, আল্লাহ্ চাহে তো দায়িত্ব অবশ্যই নেব। দায়িত্ব নিয়ে কাজ করার জন্যই রাজনীতি করছি। তবে আপনার বর্তমান উপদেষ্টামণ্ডলী সম্বন্ধে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে।

তিনি সঙ্গে সঙ্গে বললেন, বুঝেছি, বুঝেছি। আপনারা যেভাবে পরামর্শ দেবেন সেভাবেই সব ঠিক করব।

এরশাদ সাহেবের গুণই বলি বা দোষই বলি, তিনি 'না' বলতে কমই শিখেছেন। আমার কাছে এই মুহূর্তে যা 'হ্যাঁ' বললেন পর মুহূর্তে অন্য একজনের সম্পূর্ণ বিপরীত প্রস্তাবেও 'হ্যাঁ' বলে দেবেন। তখনও এসব কথা জানা ছিল না। খুশি হয়েই আগামীতে তাঁর দলের দায়িত্ব নেওয়ার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করে তাঁর কার্যালয় থেকে বেরিয়ে এলাম।

পরদিই বিএনপি'র তিন নেতা শামসুল হুদা চৌধুরী সাহেব, ডা. মতিন সাহেব এবং রিয়াজউদ্দীন আহমেদ ভোলা মিয়া টেলিফোন করে বারী সাহেবের বাসায় এসে উপস্থিত। আমিও সেখানে উপস্থিত রইলাম। অনেক আলোচনা হল। আগামীদিনে একসঙ্গে কাজ করব—এই প্রত্যয় ব্যক্ত করে হুদা সাহেব বললেন, আমাদের দল থেকে মহাসচিবের কোন প্রার্থী নেই। শাহ্ সাহেব, আপনিই আমাদের প্রার্থী।

তাঁর বক্তব্য সর্বদাই উপভোগ করি। তাঁর প্রতিটি কথাতে একটি আনন্দের সুর বাজে। দীর্ঘদিন বেতার জগতের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তাঁর জীবনসঙ্গিনী লায়লা আর্জুমান্দ বানু একজন প্রথম শ্রেণীর কণ্ঠশিল্পী।

আমাদের পক্ষ থেকে বারী দম্পতি তাঁদেরকে অনেক ধন্যবাদ দিলেন। তাঁরা হাসিমুখে বিদায় নিলেন। যেতে যেতে ভোলা ভাই তাঁর স্বভাবসুলভ কণ্ঠে বললেন, তবে আমার বস্ চিরদিনই আমার বস্ থাকবেন।

জানা গেল, মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী সাহেবের পুত্র আবু নাসের খান ভাসানী বহু বিভক্ত ন্যাপের একটি অংশ নিয়ে এই প্রক্রিয়ায় যোগ দিচ্ছেন। ইকবাল আনসারী খানের পিতা আলী আমজাদ খানের নেতৃত্বেও একটি দল রয়েছে; তারাও এতে আসছেন। উপরন্তু জাসদের দলছুট কিছু নেতা-কর্মী নতুন দলে আসছে। মুক্তিযোদ্ধা বা ব্যক্তিগতভাবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত কিছু কিছু লোকও অগ্রণী ভূমিকা নিচ্ছে। সাবেক ডিআইজি আবদুল হকের প্রগতিশীল দল বলে যা ছিল তাও উঁকি-ঝুঁকি মারছে। এই কম্বিনেশনের চিন্তা করে খুব একটা তৃপ্তি পাচ্ছিলাম না। মিজান চৌধুরীর আওয়ামী লীগও এই প্রক্রিয়ায় শামিল জেনে এই ভেবে আনন্দ হল যে, সেখানে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষ শক্তি অধিকতর বিরাজমান। নূরে আলম সিদ্দিকী তখন তার সাধারণ সম্পাদক।

উৎসাহ নিয়েই মিজান সাহেবের সঙ্গে এত কাণ্ডের পরও যোগাযোগ করলাম। শামসুল হক সাহেব এবং নূরে আলমকেও এই প্রক্রিয়ায় সম্মত দেখা গেল। ভাবলাম, মিজান সাহেবের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ, হুদা সাহেবের নেতৃত্বাধীন বিএনপি এবং আমাদের ডেমোক্রেটিক লীগ এই তিন

দলের প্রধানদের একটি শীর্ষ বৈঠক হওয়া বাঞ্ছনীয়। পূর্বাহ্নে কিছু কিছু বিষয় ফয়সালা করে নেওয়া ভালো।

প্রস্তাব করতেই মিজান সাহেব বললেন, কাল সকালে আমি, শামসুল হুদা সাহেব এবং তুমি একত্রে তোমার বাসায় নাস্তা করব। সালেহাকে বলো তার হাতের খিচুড়ি অনেকদিন খাই না।

হুদা ভাইকেও আমন্ত্রণ করলাম। তিনিও আনন্দের সঙ্গে যোগ দিতে সম্মতি জানালেন।

আমার বাসায় নতুন দল গঠনের প্রক্রিয়াধীন তিনটি প্রধান দলের তিন নেতার প্রথম বৈঠক বসল। আলোচনার এক পর্যায়ে বললাম, রাজনীতির বয়স হুদা ভাইয়ের সবচাইতে বেশি। তিনি শুরু করেছেন সেই ব্রিটিশ-ভারতে ছাত্র সংগঠনের মধ্যদিয়ে। আজ, আমরা একত্রে কাজ করতে পারব ভেবে আনন্দ পাচ্ছি।

চুটকিতে মিজান চৌধুরীকে কেউ হারাতে পারে না। সে টিপ্পনী কাটল, হুদা ভাইয়ের ব্রেক অব স্টাডীজ বাদ দিলে এখানে রাজনীতিতে আমিই প্রবীণ।

আমরা তিন জনই হেসে উঠলাম।

এখানেও কথা উঠলে হুদা সাহেব বললেন, শাহ্ মোয়াজ্জেম হবে আমাদের মহাসচিব।

মিজান সাহেবও সম্মতি জ্ঞাপন করলেন। আমরা একমত হলাম, এরশাদ সাহেবকে বলে যারা যারা মিলে দল করছি তাদের সব নেতৃবৃন্দকে তাঁর কার্যালয়ে একত্রে ডাকলে ভালো হয়। দলের জন্য একটা উপযুক্ত নামও সাব্যস্ত করা যাবে। অনেকগুলো বাস্তব প্রশ্নে আমরা একমত হলে সে বৈঠক সমাপ্ত হয়।

আমাদের প্রস্তাব মতে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের বৈঠককক্ষে সমস্ত দল ও গ্রুপের দু'জন করে প্রতিনিধি নিয়ে বৈঠক বসল। প্রবীণদের মধ্যে শামসুল হুদা চৌধুরী, মিজান চৌধুরী, শামসুল হক, আলী আমজাদ খান, নাসের ভাসানী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। তাদের দলের অন্য প্রতিনিধিও ছিল। আমি এবং রউফ চৌধুরী সাহেব আমাদের দলের প্রতিনিধিত্ব করছিলাম। পরস্পরে আনুষ্ঠানিক পরিচয়াদি সমাপ্ত হতেই এরশাদ সাহেবের অনুমতি নিয়ে জনৈক মেজর বা অন্য কোন পদবিসম্পন্ন ব্যক্তি আমাদের উদ্দেশে সেনা সদস্যের কণ্ঠস্বরে ইংরেজিতে বক্তৃতা করতে শুরু করল। দল কাহাকে বলে, কয় প্রকার এবং কি কি ইত্যাদি যখন বুঝাচ্ছিল ছড়ি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে, সমস্ত প্রবীণ রাজনীতিবিদগণ তখন পরস্পরের মুখ অবলোকনে ব্যস্ত রইল। ভদ্রতা করে কিছু বলতে পারছিলেন না। আমার সহ্য হল না। উঠে দাঁড়ালাম। এরশাদ সাহেবকে সিএমএলএ সাহেব বা জেনারেল সাহেব বলে সম্বোধন করতাম। তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্য নিযুক্ত হওয়ার পরেই কেবল স্যার বলে সম্বোধন করায় অভ্যস্ত হয়েছি। পরে জেনেছিলাম বক্তৃতারত তরুণ

অফিসারটির ডাক নাম মুন্না, সেসময় পর্যন্ত সে ছিল তাজউদ্দীন সাহেবের মেয়ের জামাই।

এরশাদ সাহেবকে উদ্দেশ্য করে বললাম, যে সম্বন্ধে আপনার অফিসার বক্তৃতা করছে, সে বিষয়ে এখানে উপস্থিত প্রতিটি সম্মানিত ব্যক্তি বক্তার চাইতে অনেক গুণ বেশি ওয়াকেবহাল। যদি সৈন্যবাহিনীর কোন বিষয় নিয়ে সে বক্তৃতা করে তা হয়ত শোনা যেতে পারে, কিন্তু রাজনীতির ক্লাসে সে অধ্যাপক এবং আমরা ছাত্র, এটা বোধহয় অত্যন্ত দৃষ্টিকটু হয়ে যাচ্ছে। আপনার অফিসারটি কারো পুত্র বা কারো পৌত্রের বয়েসী হবে। কোন অনভিজ্ঞ ব্যক্তি রাজনীতি সম্বন্ধে আমাদেরকে লেকচার দেবে এটা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

অফিসারটির মুখ রক্তিম হয়ে গেল। কিন্তু এরশাদ সাহেব বিষয়টি ততক্ষণে উপলব্ধি করতে পেরেছেন, ইশারায় তাকে চলে যেতে বলে নিজেই উদ্যোগী হয়ে আলোচনা শুরু করলেন। বললেন, সকলের আগে দলের জন্য একটি সুন্দর নাম আপনারা ঠিক করুন।

বিভিন্ন জন সঙ্গে সঙ্গে তাদের পছন্দের নাম প্রস্তাব করল। সকলের শেষে আমি দাঁড়ালাম। বললাম, আমি একটি ছোট নাম প্রস্তাব করব, যার কোন সংক্ষিপ্তকরণ করা যাবে না, অন্য কোন ভাষায় রূপান্তর করা যাবে না, আকার-ইকার-ওকার কোন স্বরবর্ণের ধ্বনি থাকবে না এবং জনগণ ও তাদের সংগঠনের নাম সম্পৃক্ত থাকবে।

তিনি উৎসাহিত হয়ে বললেন, আপনি তো একজন লেখক, আপনার লেখা বই পড়েছি। একাজ আপনাকেই মানায়। বলুন, আপনার কী সাজেশান?

বললাম, দলটির নাম হোক জনদল।

পূর্বাপর অন্য কিছু নেই কেবল এই নামটি গ্রহণ করতে প্রথমে ইতস্তত করলেও বারবার উচ্চারণের ফলে সকলেরই পছন্দ হল। এক পর্যায়ে এরশাদ সাহেবের মুখও উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললেন, আমার মনে হয়, নামটি খুবই আকর্ষণীয়। জনদল নাম রাখাই সঠিক হবে।

সেভাবেই সিদ্ধান্ত হল।

সিরাজদ্দৌলা নাটকে নবাবের ফরাসি সেনাপতি মশিয়ে লালির একটা ডায়ালগ রয়েছে, 'কথা হইল একরকম, যুদ্ধ হইতাছে আর একরকম।' মীর জাফর

আলীর কথার বরখেলাপে ক্ষিপ্ত মশিয়ে লালি সেদিন এ ধরনের মন্তব্য করেছিলেন। এরশাদ সাহেবের বিষয়েও দেখলাম অনেকটা সে রকম। পুরাতন সংসদ ভবনের কমিটি রুমকে সম্মেলন কক্ষে রূপান্তরিত করা হয়েছে। সেখানে নতুন রাজনৈতিক দলটির একটি কর্মী-সভায় তিনি ঘোষণা দিলেন আজই দ্বিপ্রহরে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে নতুন দলের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেওয়া হবে। আমরা আমাদের স্বীয় রাজনৈতিক দলকে বিলুপ্ত করে ততদিনে নতুন রাজনৈতিক মেরুকরণের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেছি। কর্মী-সম্মেলনে মিজান সাহেবকে কিছুটা অন্যমনস্ক দেখা গেল। নূরে আলম সিদ্দিকী জানিয়ে দিয়েছে সে এই দলে যাবে না। শামসুল হক সাহেব আমাকে চুপিচুপি বললেন, মিজান সাহেবকে ছাড়বেন না। এখান থেকে একসঙ্গে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে যাবেন। ছেড়ে দিলে কিন্তু সেও কেটে পড়বে।

আমি নিজেও দ্বিধায় পড়েছি, আমাকে যদি মহাসচিব বা সাধারণ সম্পাদক করা হয়, তা হলে অন্তত পূর্বাহ্ণে আমার সঙ্গে আলোচনা একান্ত প্রয়োজন। কিছুই হল না। কিন্তু দল অবলুপ্ত করে দিয়ে এখন আর চিন্তা করে লাভ নেই। এক প্রকার জোর করেই মিজান সাহেবকে নিয়ে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত হলাম।

হল ভর্তি কর্মীরা আমাদের বিভিন্ন নেতার নামে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে 'এগিয়ে যাও, আমরা আছি তোমার সাথে' স্লোগান দিচ্ছে। আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন, কে কার সাথে আছে! কর্মীদের ভিড়ে সাংবাদিকগণ বসার স্থান পাচ্ছে না। একটা চরম অব্যবস্থার মধ্যে মঞ্চে উঠে দেখি বিচারপতি আহসানউদ্দীন চৌধুরী ও জনাব এ.আর.এস. দোহা দুটি চেয়ার নিয়ে বসেছেন। অন্য সকল নেতৃবৃন্দই দাঁড়ানো অবস্থায় আছেন। মিজান সাহেব এই অপমানজনক অবস্থায় চলে যাওয়ারই পক্ষে। তবুও কেবল আমার অনুরোধে রয়ে গেলেন। আমার বক্তব্য হল, সবে তো শুরু। এত শীঘ্র ধৈর্য হারালে চলবে কি করে!

বিচারপতি আহসানউদ্দীন চৌধুরী সাহেবকে আহ্বায়ক এবং জনাব এ.আর.এস. দোহাকে সদস্য সচিব করে জনদলের এক কমিটি ঘোষিত হল। সকল দল থেকেই দু'জন করে সদস্য রাখা হল। আমার এবং রউফ চৌধুরীর নামও আহ্বায়ক কমিটিতে সদস্য হিসাবে স্থান পেল।

সম্পূর্ণ অরাজকতাময় হলের মঞ্চ থেকে কি পড়া হল, কি বলা হল কিছুই বোধগম্য হল না। বিচারপতি আহসানউদ্দীন চৌধুরী সাহেব ঢাকাস্থ জেলা জজ থাকার সময় থেকে আমাকে স্নেহের চোখে দেখেন। তিনি ইশারায় আমাকে ডেকে বললেন, এসব কী হচ্ছে? আমি রাজনৈতিক দলের কী বুঝি? আমাকে নিয়ে এইসব কেন?

কী উত্তর দেব! চুপ করে থাকাই শ্রেয় মনে করলাম। কিন্তু কিছুটা আঘাত

প্রথম দফায় দলের আরম্ভ হতেই গায়ে এসে লাগল। অপেক্ষা করাই শ্রেয়তর মনে করলাম। জানি, এই কমিটি দীর্ঘদিন চলতে পারে না। রাজনীতিবিদদের বাদ দিয়ে রাজনৈতিক দল চলে না—হাডুডু খেলা চলে!

হলও তা-ই। বিভিন্ন দিক থেকে আপত্তির মুখে স্বল্প সময়ের ব্যবধানেই নতুন পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করার জন্য আমাদেরকে সেনাভবনে ডাকা হল। যে ঘরে, যে টেবিলে জিয়াউর রহমান সাহেব বিএনপি গঠন করেছিলেন, সেই ঘরে, সেই টেবিলেই এরশাদ সাহেব জনদলের কমিটি গঠন করলেন। বিচারপতিকে আপাতত চেয়ারম্যান রেখেই কমিটি গঠন করা হল। এরশাদ সাহেব ঘোষণা দিলেন, আমি ডা. মতিনকে মহাসচিবের দায়িত্ব দিচ্ছি। মিজান চৌধুরী, শামসুল হুদা চৌধুরী. শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেনসহ কয়েকজন ভাইস-চেয়ারম্যান। আপনারা এখন পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠনে আমাকে সহায়তা করুন।

আমি হকচকিয়ে গেলাম। আমার সঙ্গে বারবার কী কথা হল! আর এখন হচ্ছেটা কি! কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই ভেবে আমি ওই বিষয়ে আর কোন প্রচেষ্টা করার প্রয়োজন মনে করিনি। বিএনপি'র নেতৃবৃন্দ আমার কথা স্বেচ্ছায় বলে এসেছিলেন। তবে কী সবটাই ধোঁকাবাজি! এদেরকে নিয়ে আগামীতে চলব কী করে! দুশ্চিন্তায় মন ছেয়ে গেল। আমার পক্ষে তখনই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ত ঠিক হত। কিন্তু জেদ চেপে গেল। কেননা, কাগজে দেখলাম রউফ চৌধুরী সাহেব নতুন দল থেকে নাম প্রত্যাখ্যান করেছে। তার স্ত্রী তাকে বুঝাতে সমর্থ হল, ডেমোক্রেটিক লীগ থেকে মন্ত্রী করলে একজনকেই করা হবে। তার ললাটে শূন্য পড়বে।

দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বের ইতি টানা হল। শুনেছি স্ত্রী-বুদ্ধি ভয়ঙ্করী হয়। রউফ সাহেবের স্ত্রী দ্বিতীয় পক্ষ, ভদ্রমহিলারও এটা দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ। অভিজ্ঞতা সবদিকে সমান হয় না। রউফ সাহেব পরবর্তীতে বিএনপি'তে যোগ দিয়ে সাংসদ হয়েছিল। পরে দল তাকে পরিত্যাগ করেছে বলে শুনেছি।

এরশাদ সাহেব কমিটি করতে বসে প্রথমেই বললেন, দলের নামটি খুবই সুন্দর হয়েছে। এখন এটিকে সুন্দর করে সাজিয়ে তোলার দায়িত্ব আপনাদের।

মনে মনে ভাবছি, শুরুতেই যেখানে এত বৈকল্য, দিনে দিনে আরও না জানি কত খেলা দেখতে হবে। হয়েছিলও তো তা-ই! কমিটি গঠনের একটা প্রক্রিয়া রয়েছে। সাধারণত ছোট একটি সাব-কমিটিকে দায়িত্ব দেওয়া হয় এসব ঝামেলার কাজ সম্পন্ন করতে। সাব-কমিটি একটি খসড়া তৈরি করলে তার উপর আলোচনা হতে পারে; পরিবর্তন-পরিবর্ধন হতে পারে। এখানে এক-একটি পদের জন্য নাম চাওয়া হলে সকলেই নিজের পছন্দের লোকের নাম প্রস্তাব করবে—এটাই স্বাভাবিক। তা-ই হল। কিছুক্ষণ ধৈর্য ধরে

কয়েকটি পদ পূরণ করে এরশাদ সাহেব বললেন, আপনারা বসে বাকি পদগুলো পূরণ করে আমার অনুমতি নিয়ে পত্রিকায় দেবেন।

ডা. মতিন একজন কুশলী লোক। মিজান চৌধুরীর বাসায় সভা ডাকলেন। আমাকে হাত ধরে বললেন, আমার অভিজ্ঞতা কম, সহায়তা করবেন।

তাকে সর্ববিধ সহযোগিতার আশ্বাস দিলাম। মিজান সাহেবের বাসায় কমিটি পূর্ণাঙ্গ করতে গিয়ে পুনরায় অনেক কসরৎ করতে হল। এখানে সাবেক ডিআইজি আবদুল হক সাহেব এসে উপস্থিত। ছাত্রাবস্থায় আমাকে সে একবার গ্রেপ্তার করেছিল, তাছাড়া তার সম্বন্ধে এত কথা শুনেছি যে, তার সাথে রাজনীতি করতে মন সায় দেয় না। কেউ একজন বলল, আপনি কী জানেন, টিভির সুন্দরী সংবাদ পাঠিকা ফারহানা হক তাঁর মেয়ে?

বললাম, তাতে কী আসে-যায়?

সে বলল, আপনার না আসতে-যেতে পারে, কারো হয়ত আসে-যায়। আপনার পূর্বেই সে মন্ত্রী হয়ে গেলেও আশ্চর্য হব না!

চুপ করে তাকিয়ে থাকা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। সে সভায় বর্তমানে ঢাকার মেয়র মোঃ হানিফও যোগ দিয়ে বলল, জাতীয় কমিটিতে তাকে যেমন সম্মানজনক পদ দিতে হবে, ঢাকা মহানগর কমিটিতেও তার কর্মীদের মূল্যায়ন করতে হবে।

পরে কোন কারণবশত তার আর জনদলে অন্তর্ভুক্তি হয়ে ওঠেনি।

অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে একটা কমিটি দাঁড় করান গেল। আপাতত কাজ চলা প্রয়োজন। বিভিন্ন জেলায় নেতৃবৃন্দের সাংগঠনিক সফরের কর্মসূচি প্রণীত হল। আমরা বিভিন্ন জায়গায় উপস্থিত হয়ে নানা দৃশ্য দেখতে পাই। সরকারের বিভিন্ন চ্যানেলে অনেক লোকের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে, সাবেক দলগুলোর আঞ্চলিক নেতৃবৃন্দ রয়েছে, রয়েছে সময়ের কারণে গজিয়ে ওঠা নতুন সুযোগ-সন্ধানীরা। রয়েছে কিছু অবসরপ্রাপ্ত অফিসার। সকলেরই নেতা হবার উদগ্র বাসনা। তাদের ধারণা, নেতৃত্ব পেলেই মন্ত্রিত্ব পাবে, নিদেনপক্ষে লাইসেন্সটা, পারমিটটার তো কথাই নেই! তাই যে কোন প্রকারে কমিটির আহ্বায়ক বা যুগ্ম-আহ্বায়ক হতেই হবে। লোক ভাড়া করে, অস্ত্রপাতি, অর্থ যোগান দিয়ে সে এক এলাহী কারবার। বিভিন্ন স্থানে কীভাবে যে সম্মেলন করে অক্ষত অবস্থায় ফিরে এসেছি, সে কেবল আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন। ক্যাপ্টেন হালিম চৌধুরী তো গুরুতর আহত অবস্থায় যশোরের সভা থেকে ঢাকা ফিরে এসেছিলেন।

আমাদের দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা, কর্মীদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক এবং সর্বোপরি প্রকাশ্যে নিরপেক্ষতার কারণে কোথাও অসম্মানিত হতে হয়নি। নারায়ণগঞ্জ জেলার সম্মেলন ফতুল্লায় সিনেমা হলে অনুষ্ঠিত

হচ্ছে। নেতৃবৃন্দসহ সেখানে উপস্থিত হতেই দেখি বিরাট বিরাট রামদা নিয়ে একদল লোক হলে ঢুকে নর্তন-কুর্দন শুরু করে দিল। কি তারা চায়, কার তারা সমর্থক কিছুই বুঝার উপায় নেই! পেছনে চেয়ে দেখি নেতৃবৃন্দ, নাম প্রকাশ বাঞ্ছনীয় নয়, স্টেজের নিচে নিরাপদ আশ্রয় নিয়েছে। আমি বীর পুরুষ নই, কাপুরুষও নই। এভাবে চলতে দেওয়া যায় না। দেখি কি হচ্ছে!

ডায়াস থেকে চিৎকার করে লাফিয়ে পড়লাম। আমাকে প্রটেকশন দেওয়ার জন্য এগিয়ে এল সাহসী মুক্তিযোদ্ধা ইসমাইল হোসেন বেঙ্গল। আমার চিৎকার এবং ঝাঁপিয়ে পড়ার কারণে রামদাওয়ালা অহেতুক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীরা হকচকিয়ে গেল। আমি সুযোগ ছাড়লাম না। তাদের এক নেতাকে রামদাসহ ঝাপটে ধরলাম। বললাম, রামদা দিয়ে কাকে কোপাতে এসেছো? কে তোমাদেরকে নিয়ে এসেছে বল?

বেঙ্গলকে বললাম, বাইরে পুলিশ রয়েছে, ওদেরকে ডাক। আজ ফয়সালা একটা হয়েই যাক।

পুলিশের আগমনবার্তা শুনেই রামদা পার্টি জানলা দিয়ে চম্পট! কেবল আমার হাতে ধরা পড়া লোকটি রয়েছে। সে তখন কাকুতি-মিনতি করছে, স্যার, আমাকে ছেড়ে দিন। আর কোনদিন এ কাজ করব না।

দিলাম ছেড়ে। সে দৌড়ে পালাল। হলের শৃঙ্খলা ফিরে এলে নেতৃবৃন্দ ডায়াসের নিচের নিরাপদ আশ্রয় থেকে বের হয়ে এসে গরম বক্তৃতা করে হল আরও গরম করে দিলেন।

দুষ্কৃতিকারীরা প্রতিরোধকারীদের ভয় করতে বাধ্য। দুষ্কর্মই তাদের বড় দুর্বলতা। সময়োচিত প্রতিবাদ এবং কিছুটা প্রতিরোধে এদেরকে সহজেই কাবু করা যায়। কিন্তু ভদ্রতার তিন দশা। ভদ্রলোক পড়ে পড়ে মার খাবে, তবু উঠে প্রতিবাদ করবে না। সে কারণেই এইসব দুষ্কৃতিকারীদের সাহস এবং কার্যক্ষেত্র বিস্তৃতি লাভ করছে দিনকে দিন।

একথা ঠিক, এরশাদ সাহেব ক্ষমতায় রয়েছেন, তিনি দল করতে চাচ্ছেন, মানুষজনও চারদিক থেকে প্রচুর উৎসাহ নিয়ে এগিয়ে আসছিল। টাঙ্গাইলে সম্মেলন করতে গেলে ভাসানী হলে তিল ধারণের ঠাঁই নেই। এর মধ্যেই খবর এল টাঙ্গাইল জেলার অন্যতম নেতা গোলাম কিবরিয়া সাহেবের এলাকা থেকে বাসে প্রতিনিধিরা আসতে গিয়ে দুর্ঘটনা কবলিত হয়ে ছয় জন ঘটনাস্থলেই মৃত্যুবরণ করেছে। এদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণের ওয়াদা কোনদিনই পূরণ হয়নি।

বৈশিষ্ট্য যেটা লক্ষ্য করা যাচ্ছিল, সেটা ছিল মানুষের উৎসাহ-উদ্দীপনার প্রাবল্য এবং সমারোহ। যত ঘটনাই ঘটুক না কেন, মানুষের সমর্থন এবং উদ্দীপনা আমাদেরও উৎসাহিত করছিল। ক্ষমতা বড়ই আকর্ষণীয় বস্তু।

বাংলাদেশের জনগণও ছিল দুর্ভাগা—একদল কেবল বক্তৃতা করে গেল। সারাজীবন গণতন্ত্রের জয়গান গেয়েও সেই গণতন্ত্রকে টুঁটি চেপে হত্যা করে গেল তারা। লাল বাহিনী, নীল বাহিনী আর দুর্ভিক্ষ হয়ে রইল তাদের অক্ষয় কীর্তি। উন্নয়ন কেবল বক্তৃতা মঞ্চে। আর একজন এসেও নির্লজ্জ, নিষ্ঠুরতায় কত না মায়ের কোল শূন্য করে গেল। খাল কেটেই দিন গুজরান করল, নদীতে পানি নেই তাতে কি! দুর্নীতিবাজদের আখড়ায় পরিণত হল তার প্রতিষ্ঠিত দল। স্বাধীনতার যে স্বপ্ন মানুষ দেখেছিল তা রইল অবাস্তবায়িত। দ্রুত উন্নয়নশীল পৃথিবীতে তারা পশ্চাতে মুখ থুবড়ে পড়েছিল। আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি দুই প্রধান দলই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে ব্যর্থ হয়েছিল, তারা জনগণের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেনি।

তাই তাদের ব্যর্থতার কালিমায় এরশাদের আশাভরা বাণী আলোর সঞ্চার করল। উন্নয়নের বক্তৃতা যারা শুনেছে, তারা স্বচক্ষে তা প্রত্যক্ষ করতে চায়। তাই তার দলকে জনগণের কাছে পৌঁছাতে বিশেষ বেগ পেতে হল না। স্বল্প সময়ের ব্যবধানেই বিরাট পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল। দ্রুত পরিবর্তনই বিপ্লব।

জনদল মাত্র গঠিত হয়েছে। ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় সাহায্য-সামগ্রী নিয়ে যাচ্ছি গজারিয়ার কলিমুল্লাহর লঞ্চ নিয়ে। এখন যেখানে বুড়িগঙ্গার চীন-বাংলাদেশ মৈত্রী সেতু, এই বরাবর আসতেই আমাদের লঞ্চে জনদলের ব্যানার দেখে একদল শ্রমজীবী মানুষ লঞ্চ লক্ষ্য করে ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে তাদের মনোভাব জানিয়ে দিল। এই শ্রমজীবীদের কোন ক্ষতিই করা হয়নি। তদুপরি আমরা ঘূর্ণিঝড়ের সাহায্যে ব্যানার টানিয়েছি। দলের নামে প্রশংসা পাওয়ার মতো কাজ, কিন্তু ভাগ্যে জুটল ঘৃণা এবং ইট-পাটকেল। ক্ষুব্ধ হয়ে মন্তব্য করেছিলাম, আজ যারা ইট-পাটকেল মারছে, তাদের হাতেই একদিন ফুলের মালা নেব। তা যদি না পারি, দল করে সার্থকতা নেই।

তা-ই হয়েছিল। বুড়িগঙ্গা সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের পর সে স্থানটিতেই শ্রমজীবী মানুষেরা আমাদেরকে সম্বর্ধনা দিয়েছিল। সেদিনের ফুলের মালার প্রাচুর্য আর একদিনের ইট-পাটকেল নিক্ষেপের বেদনাকে ঢেকে দিয়েছিল।

এরশাদ সাহেব আঠারো-দফা কর্মসূচি দিয়েছিলেন। সেটি নিয়ে আঠারো-দফা বাস্তবায়ন কমিটি গঠিত হয়েছিল। মাহবুবুর রহমান সাহেব তার প্রধান। একাধারে মন্ত্রী এবং আঠারো-দফা বাস্তবায়ন কমিটির কর্তা। তার গতি ছিল দ্রুততর। আঠারো-দফা ছিল সরকারের উন্নয়ন কর্মসূচির দফাওয়ারী বিবরণ। এটা বাস্তবায়নে সম্পূর্ণ সরকারি কাঠামোরই প্রয়োজন। বাস্তবায়ন কমিটি নাম দিয়ে কেন্দ্র থেকে শুরু করে নিম্নস্তর পর্যন্ত কমিটি গঠন করা এবং প্রায়শ সে কমিটিসমূহের সভা, সম্মেলন ও বৈঠককে আমাদের নিকট মনে হত অহেতুক বাগাড়ম্বর এবং ব্যক্তি বিশেষের কর্তাভজা নীতির সুস্পষ্ট বহিঃপ্রকাশ। বিশেষত যখন সরকারের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য

বাস্তবায়নের জন্য একটি বৃহৎ রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সে সময় এ ধরনের বাস্তবায়ন কমিটি অবাস্তব। কিন্তু কে শোনে কার কথা! এক স্বামীর যেন দুই স্ত্রী। একদিকে জনদল, অন্যদিকে বাস্তবায়নওয়ালারা। মাহবুবুর রহমান একাই একশ'। আর মাশাআল্লাহ্, এরশাদ সাহেবও আয়েসী স্বামীর মতো যখন যে স্ত্রীর সান্নিধ্যে থাকতেন তার প্রশংসায়ই পঞ্চমুখ। সতীনদ্বয়ের ঝগড়া ভালোই উপভোগ করতেন বলে মনে হচ্ছিল।

জনদলের সর্ব শ্রেণীর কর্মীদের প্রত্যাশা ছিল, পূর্বতন উপদেষ্টা, যারা পরবর্তীতে মন্ত্রী হয়েছে তাদের কয়েকজনকে অব্যাহতি দিয়ে জনদল থেকে কয়েকজনকে মন্ত্রী করা হোক। রোজই পত্রপত্রিকায় জল্পনা-কল্পনা থাকে, শপথের আর বিলম্ব নেই। প্রতিটি তালিকাতেই আমার নাম থাকে কমন। কাজেই কাগজে-কলমে মন্ত্রী বনেই গিয়েছি, বাস্তবে যা-ই হোক না কেন! এরশাদ সাহেব এবং তাঁর পরামর্শকরা নির্বিকার। এমনি সময়ে জনদলের এক বর্ধিত সভায় যশোরের আলি তারেক এক গরম বক্তৃতা দিয়ে প্রস্তাব করল, অবিলম্বে জনদল থেকে যদি মন্ত্রী করা না হয়, তা হলে সরকারের কর্মকাণ্ডের অংশীদারিত্ব আর স্বীকার করা হবে না এবং এই মুহূর্তেই সভা স্থগিত করে দলের সকল কর্মকাণ্ড বন্ধ রাখা হোক।

প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হল এবং সভা স্থগিত হয়ে গেল। দলের অনেকেই মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী বা উপমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন দেখত—তাই বিষয়টি অবিবেচনাপ্রসূত হলেও প্রস্তাবে বাধা দিলাম না। বাধা দিয়ে লাভও হত না। সকলেই একমত।

সন্ধ্যায় সিএমএল-এর ওখানে যখন সভা ডাকা হল, নেতৃবৃন্দকে জেনারেল সাহেবরা, বিশেষ করে চিশতি সাহেব, বেশ দু'কথা শোনালেন। বললেন, আপনারা একজন অর্বাচীনের প্রস্তাব মেনে নিয়ে প্রমাণ করেছেন দলের চাইতে ক্ষমতার আসনের প্রতিই আপনাদের আগ্রহ অধিকতর।

বললাম, কিছু মনে করবেন না চিশতি সাহেব। আপনারা কী ক্ষমতার আসনে বসেই একথা বলছেন না? কাজ করব আমরা, সরকারের সমালোচনার জবাব দেব আমরা, বিরোধী দলের শত্রুতার লক্ষ্যবস্তু হব আমরা, আর অনুগ্রহ করে মন্ত্রিত্ব করবেন ক'জন ভাগ্যবান—এটাও কোন যুক্তির কথা নয়। একজন খেয়ে ঢেঁকুর তুলবে আর একজন ঘ্রাণ শুঁকেই তৃপ্তি লাভ করবে—এ আশা করা বৃথা। আমাদের দলের সরকারের অংশগ্রহণ এখন একেবারে অনিবার্য হয়ে পড়েছে।

তা-ই করা হল, খবরের কাগজে নাম বের হল আগামীকাল চার জন 'জনদলী'য় মন্ত্রীর শপথ হবে। যথারীতি আমার নাম রয়েছে। বিশ্বস্তসূত্রে জানা গেল, খবর সঠিক। বিকালে জনসভা ছিল মোহাম্মদপুরে। সেখানে মন্ত্রীর সম্বর্ধনা দেওয়া হল অগ্রিম। সভা শেষে এক কর্মীর বাসায় চা খেতে

গিয়ে তখনই অটোগ্রাফ দেওয়া শুরু হয়ে গেল। সকাল দশটায় শপথ। মানসিকভাবে মন্ত্রী হয়েই গিয়েছি।

পরদিন সকালের কাগজে দেখি আমার নামের পরিবর্তে, যার নাম একবারও আসেনি, সেই সাবেক ডিআইজি আবদুল হকের নাম রয়েছে শপথের তালিকায়। জানা গেল, সন্ধ্যা পর্যন্ত আমার নাম তালিকাভুক্ত ছিল। রাতে মেজর জেনারেল মহব্বতজান চৌধুরী, এয়ার ভাইস-মার্শাল আমিনুল ইসলাম এবং মাহবুবুর রহমান সাহেব প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁকে অনেক বুঝিয়ে আমার নাম কাটিয়েছে। সেস্থানে এরশাদ সাহেব আবদুল হককে নেওয়াই যুক্তিযুক্ত মনে করেছেন। ইতিমধ্যে এরশাদ সাহেব আনুষ্ঠানিকভাবে প্রেসিডেন্ট হিসাবে শপথ গ্রহণ করে দেশের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হয়ে বসেছেন।

কর্মীদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত নিবিড়। তারা আমার প্রশ্নে কোন গ্রুপে বিভক্ত ছিল না। সকলেই আমাকে ভালোবাসত, শ্রদ্ধা করত এবং মনেপ্রাণে যথাযোগ্য মর্যাদার আসনে দেখতে চাইত। আমাকে মহাসচিব না করায় দীর্ঘকাল কর্মীরা ছিল যারপরনাই অসন্তুষ্ট। এবার আর এক দফা ধোঁকার কারণে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে প্রতিদিনই ধানমন্ডির চার নম্বর সড়কের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে বিক্ষোভ দেখাত এবং প্রায় দিনই কিছু না কিছু আসবাবপত্র ভাংচুর করত।

আমার দুঃখ হয়েছিল ঠিকই কিন্তু কর্মীদের চোখের পানি দেখে তাদেরকেই সান্ত্বনা দিতে হল। বললাম, অচিরেই সব ঠিক হয়ে যাবে, কিছু ভেব না।

কয়েকদিন অফিসে যাইনি। মিজান ভাই টেলিফোন করলেন, একবার এসে কর্মীদের থামাও, টেবিল-চেয়ার আর রইল না।

সে এবং শামসুল হুদা সাহেব অবশ্য বাস্তবচিত্র তুলে ধরে প্রেসিডেন্টকে অনুরোধ করেছিল, আর কাউকে না নিলেও অনতিবিলম্বে কর্মীদের প্রিয়ভাজনটিকে মন্ত্রিত্বে না নিলে দলের সমূহ বিপর্যয় এড়ানো যাবে না।

প্রেসিডেন্ট সাহেবের অনেক কীর্তির মধ্যে একটা ছিল ঘন ঘন মহাসচিব বদল করা। তাঁর এই পরিক্রমায় ডা. মতিন, মাহবুবুর রহমান, রিয়াজউদ্দীন আহমেদ ভোলা মিয়া, মিজানুর রহমান চৌধুরী, মাহমুদুল হাসান প্রভৃতি

সকলকেই এক বা একাধিকবার মহাসচিব করেছেন এবং অব্যাহতিও দিয়েছেন। কিন্তু যাকে সকলের আগে কথা আদায় করে দলে ঢুকিয়েছিলেন, তার কথাই বেমালুম ভুলে থাকতেন। শুনেছি, তার 'ফরমেশন কমান্ড' নাকি মত পোষণ করত শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেনকে দিয়ে তাদের ইচ্ছামতো কাজ করানো যাবে না। সত্যি-মিথ্যা জানি না। শুধু এইটুকু জানি, আমাকে নিয়ে তিনি খুব সুবিধায় ছিলেন না। ফেলতেও পারেন না, দলের সকলে, বিশেষ করে কর্মীরা, দারুণভাবে চায়। গিলতেও পারেন না। কেননা, তাঁর সহকর্মীদের আন্তরিক আপত্তি।

শিল্পকলা একাডেমীতে কি একটা অনুষ্ঠান হচ্ছে। মন্ত্রী শামসুল হুদা চৌধুরী সাহেব, মাহবুবুর রহমান সাহেবসহ অন্যান্য মন্ত্রীরা সকলেই মঞ্চে উপস্থিত আছেন। মাহবুবুর রহমান তখন মহাসচিব। আমাকে বারবার মঞ্চে ডাকা হয়েছে। মিজান সাহেবও সেখানে। আমি দর্শকের আসনেই সেদিন বসে থাকতে পছন্দ করলাম। শত ডাকাডাকিতেও উপরে গেলাম না। সমস্ত হল বিষয়টি উপলব্ধি করে ক্ষুব্ধ হল। বক্তৃতা করার জন্য যখন ডাকা হল, হলের সমস্ত শ্রোতা-দর্শকরা যেভাবে করতালির মাধ্যমে স্বাগত জানাল, বক্তৃতা না করে পারলাম না। হুদা ভাই রসিক মানুষ। তিনি বললেন, শাহ্ মোয়াজ্জেমের জন্য আমাদের এখন অনুরোধের আসর বসাতে হবে।

বক্তৃতার মাঝেই তার জবাব দিলাম, একসময় হুদা ভাই এবং আমি একসঙ্গেই পালা গেয়েছি। আজ অবস্থান বদল হয়েছে। তার দোহারী করা এখন আমাকে পোষাবে না।

এক গায়েনের চুটকি বললাম, গানের আসরে বয়াতী গানের কলি ভুলে গেছে, বারবার দোহারদের দিকে তাকিয়ে গানে গানেই জিজ্ঞেস করছে, লঙ্কা করেছে জয় তার নাম কী? লঙ্কা করেছে জয় তার নাম কী?

দোহারগণ দেখল, এই সুযোগ। তারাও ধুঁয়ার মাধ্যমেই উত্তর করল, দশ আনি-ছ' আনি ভাগ আমরা জানি কী?

বয়াতী নিজে দশ আনা নিয়ে ছ' আনা অন্য সকলের মধ্যে বিতরণ করত। সে দেখল মহাবিপদ। তাই ওদের দাবি মেনে নিয়ে বলল, আজ হতে হল ভাগ সমানে সমান।

অমনি দোহাররা জবাব দিল, লঙ্কা করেছে জয় বীর হনুমান।

চুটকিটির মর্মার্থ অনুধাবন করে হলের চেয়ার-টেবিলও বোধহয় অট্টহাস্যে ফেটে পড়েছিল। শুধু মহাসচিবকে দেখা গেল ছাদের অপূর্ব শোভা দুই চোখ মেলে নিরীক্ষণ করছে। মুখে হাসি নেই। বিষণ্ন সে বদন!

পরদিন আমার বন্ধু বিখ্যাত পুস্তক ব্যবসায়ী আদিল ব্রাদার্সের অন্যতম স্বত্বাধিকারী আনোয়ারুল হক হেনুর পুরনো ঢাকার বাসায় তাসের আড্ডায় বসেছি

স্কুলজীবনের বন্ধুদের সাথে। টেলিফোন এল, শামসুল হুদা চৌধুরী সাহেব কথা বলতে চাচ্ছেন। উঠে গিয়ে ধরতেই টেলিফোনের লাইন কেটে গেল।

ফিরে এসে খেলায় মেতে উঠেছি, পুনরায় টেলিফোন। পাশের ঘরে গিয়ে আবার ধরতেই পূর্ববৎ লাইন কেটে গেল। বেশ ঝামেলায় পড়া গেল। হুদা ভাইও ধৈর্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবেনই। তৃতীয়বার টেলিফোন ধরে তাঁকে পেলাম। তিনি বললেন, তোমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। প্রেসিডেন্ট সাহেবের সঙ্গে কথা বলে আসছি। দু'-একদিনের মধ্যে তোমার শপথ হচ্ছে। তোমাকে মন্ত্রী না করা পর্যন্ত কোথাও টিকতে পারছি না।

বললাম, হুদা ভাই, আপনি আন্তরিকভাবেই চান জানি। মহাসচিবও করতে চেয়েছিলেন একইভাবে। কিন্তু কপাল আমারই মন্দ। তাই অন্যলোকে সে পদ পেয়ে যায়। মন্ত্রিত্বের বিষয়েও একই কথা খাটে। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। শপথ হয়ে গেলেই বুঝব মন্ত্রী হলাম; তার আগে নয়।

তিনি খুব হাসলেন এবং বললেন, এবার যদি কথা রক্ষা না হয় তবে আমিও তোমার কাতারে গিয়ে দাঁড়াব।

তাঁকে অনেক ধন্যবাদ দিয়ে টেলিফোন রাখলাম। বন্ধু সেলিমুল্লাহ্, ওয়াদুদ, আব্বাস, হেনু, হাবিব, হারুন আজিজ, রাইস উদ্দীন, রিয়াসতউল্লাহ্ সকলেই আগাম অভিনন্দন জানাল।

পরদিন সকালে এরশাদ সাহেবের টেলিফোন, কী বিপ্লবী নেতা! আমার উপর খুব চটে আছেন, না?

তিনি মাঝে মাঝে আমাকে এভাবে রসিকতা করে সম্বোধন করতেন। বললাম, আপনার উপর চটে বাংলাদেশে বাস করা যাবে? কুমিরের সঙ্গে ঝগড়া করে জলে বাস?

তিনি হেসে উঠলেন। বললেন, খুব যদি ব্যস্ত না থাকেন দশটায় আমার সঙ্গে খুলনা চলেন। বিরাট জনসভা রয়েছে। অনেকদিন আপনার বক্তৃতা শুনি না। তাছাড়া এতবড় জনসভা আপনাকে ছাড়া জমবেও না।

বললাম, আপনি নির্দেশ করেছেন, অবশ্যই যাব।

যথাসময়ে এয়ারপোর্টে উপস্থিত হয়ে প্রধানমন্ত্রী আতাউর রহমান খান এবং রিয়াজউদ্দীন আহমেদ ভোলা মিয়াকে পেলাম। তাঁরাও আমাদের সঙ্গে যাচ্ছেন। একটি হেলিকপ্টারে আমরা, অন্য একটিতে টিভি, পিআইডি, সাংবাদিক, প্রেসিডেন্ট সাহেবের সহকারীরা রয়েছে। প্রেসিডেন্ট সাহেব মাঝখানে বসেছেন। এক পাশে আমি, অন্য পাশে প্রধানমন্ত্রী। প্রেসিডেন্ট সাহেব সহজ ভঙ্গিতে বললেন, কাল সকাল দশটায় আপনার শপথ হবে।

তারপর পেছন ফিরে ভোলা ভাইকেও বললেন, মামু, কাল আপনারও শপথ হবে।

প্রেসিডেন্ট সাহেব, প্রধানমন্ত্রী এবং অন্যরা আমাদেরকে অভিনন্দন জানালেন। জবাবে আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়ে প্রেসিডেন্ট সাহেবকে বললাম, আমার একটা দাবি আছে আপনার কাছে।

তিনি কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে হাসিমুখে বললেন, আপনার আবার কী দাবি থাকতে পারে? মন্ত্রী হোন, নিজেই সে দাবি মিটাতে পারবেন।

বললাম, না, এই দাবি আপনি ব্যতীত কেউ পূরণ করতে পারবে না।

তিনি বললেন, বলুন, শুনি কী আপনার দাবি?

বললাম, ঢাকা-মাওয়া বিশ্বরোড সমাপ্ত করে পাকা করে দিতে হবে। শুধু এইটুকু আমার দাবি। বিক্রমপুরের মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি ঢাকার সঙ্গে সড়ক যোগাযোগ। একবার এ.আর.এস. দোহা সাহেবের পিতা জনাব সামসুদ্দোহা পাকিস্তানের পূর্তমন্ত্রী হয়ে শ্রীনগর এলে এই রাস্তার জন্য বিক্ষোভ জানাতে গিয়ে আমি কৈশোরে গ্রেপ্তার হয়েছিলাম। বঙ্গবন্ধুর সময়ে রাস্তাটির পরিকল্পনা গৃহীত হয়ে জমি অধিগ্রহণ করা হয়, জিয়াউর রহমানের সময়ে মাটির কাজ হয়। আপনি এটিকে পাকা করার ব্যবস্থা করুন।

তিনি বললেন, শুনেছি মাটির কাজ প্রায় শেষ। কতদিন লাগতে পারে এটি পাকা করতে?

বললাম, আমার কোন ধারণা নেই। মাস তিনেক লাগতে পারে।

তিনি হাসতে হাসতে বললেন, তিন মাস অনেক সময়। এক মাসের মধ্যে ইন্‌শাআল্লাহ্ রাস্তা পাকা করে দেব।

খুলনাতে সেদিন দ্বিপ্রহরে প্রেসিডেন্ট সাহেবের সঙ্গে নৌ-বাহিনীর এক জাহাজে মধ্যাহ্নভোজ খেলাম। অনেকদিন এত উত্তম খানা ভাগ্যে জোটেনি। যুদ্ধ করুক আর না-ই করুক, ওরা খানাপিনা ভালোই করে। সেদিন খুলনার জনসভা জমে ওঠার সেটাও অন্যতম কারণ।

এবার আর নাম কাটা গেল না। সকালে বঙ্গভবনে পৌঁছতেই প্রেসিডেন্ট সাহেবের বিশেষ সহকারী একসময়ের এনএসএফ-এর নেতা ব্যারিস্টার এ.আর.ইউসুফ আমাকে স্বাগত জানিয়ে তাঁর কক্ষে নিয়ে গেলেন। তাঁর সঙ্গে আমার ছিল সুসম্পর্ক। তাঁকে আমরা রসিকতা করে এ্যাসিসটেন্ট প্রেসিডেন্ট বলে ডাকতাম। আনুষ্ঠানিকভাবে শপথগ্রহণ সমাপ্ত হল।

কর্মীদের আনন্দ আর ধরে না। দিনভর তাদের অভিনন্দন, ফুল এবং মিষ্টির বাহুল্য। মনে হল, ওরাই বুঝি মন্ত্রিত্বের পদ পেয়েছে। পরদিন সন্ধ্যায় বাসায় মিলাদ অনুষ্ঠিত হল। প্রধানমন্ত্রী এবং অন্যান্য মন্ত্রীবৃন্দসহ দলের সমস্ত নেতা-কর্মীরা তাতে শরিক হলেন। আমাকে শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয় দেওয়া হয়েছিল। সমস্যা হল একদিন পরই শ্রমমন্ত্রীর জেনেভা রওয়ানা হবার কথা আইএলও'র সম্মেলনে যোগ দেবার জন্য। শ্রমসচিব এবং অন্যান্য প্রতিনিধিরা পূর্বেই চলে গিয়েছে। মন্ত্রণালয় পরিবর্তনের

কারণে পূর্বতন শ্রমমন্ত্রী অবসরপ্রাপ্ত এয়ার ভাইস-মার্শাল আমিনুল ইসলাম সাহেব যেতে পারেননি। মন্ত্রণালয় থেকে জরুরি ভিত্তিতে নথি প্রেসিডেন্টের ওখানে গেলে তিনি লিখলেন, একদিন পূর্বে যিনি নতুন মন্ত্রী হলেন তার পক্ষে এই সম্মেলনে যাওয়া সম্ভব হবে? পূর্বতন মন্ত্রীই এবার সম্মেলনে যোগ দিলে চলে না?

ফাইল নিয়ে জনাব আমিনুল ইসলাম, যিনি বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় পেয়েছিলেন, নিজেই প্রেসিডেন্টের দফতরে গিয়ে তাঁকে বুঝালেন, এই সম্মেলনে বিশ্বের সকল শ্রমমন্ত্রীরা উপস্থিত হবেন। এখানে অন্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী যাওয়ার প্রশ্নই আসে না।

প্রেসিডেন্ট সাহেব আমাকে যাওয়ার নির্দেশ সই করে দিলেন। জনাব আমিনুল ইসলাম আমার পাশের গ্রামের মানুষ। একই বিদ্যালয়ে বড় দার সহপাঠি। তাঁকে ডাক নামে লাল দা বলেই ডাকতাম। তিনি নিজেই ফাইল নিয়ে আমার ঘরে এলেন এবং দফতরের সাবেক মন্ত্রী হিসাবে সময়োচিত কিছু উপদেশও দিলেন।

সুইজারল্যান্ডকে বলা হয় ভূস্বর্গ। আজিজসহ এর আগেও দু'বার সুইজারল্যান্ড যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল। অপূর্ব নৈসর্গিক সৌন্দর্য ভরা পাহাড় আর লেকের দেশ সুইজারল্যান্ড। সৌন্দর্য, শান্তি এবং সুস্বাস্থ্যের দেশ সুইজারল্যান্ড। পৃথিবীর সমস্ত ধনাঢ্য ব্যক্তিদের স্বপ্নের দেশ সেটি। স্বাস্থ্যনিবাসও বটে।

আমি যাচ্ছি সরকারি অর্থে। ভালো হোটেল-স্যুটে থাকব, সরকারি গাড়ি থাকবে দিবা-রাত্রি। রানার মাকে বললাম, তুমিও চল। কেবল একটি টিকেট ক্রয় করলেই হবে, অন্যসব ব্যবস্থা আমার জন্য যা রয়েছে উভয়ের জন্য যথেষ্ট।

অন্য কেউ হলে এ সুযোগ ছাড়ত না। কিন্তু ছেলে-মেয়ে রেখে আর এত ঘণ্টা প্লেনে কাটাবার দুশ্চিন্তায় সে সম্মত হল না। একাই গিয়ে উপস্থিত হলাম আইএলও'র হেড়কোয়ার্টার জেনেভাতে। ফ্রান্সের প্রান্ত ঘেঁষে অবস্থিত জেনেভার বিমান বন্দরে অবতরণ করতেই আমাদের রাষ্ট্রদূত, শ্রমসচিব, দূতাবাসের অন্যান্য কর্মকর্তা এবং সম্মেলনের জন্য আগত প্রতিনিধিবৃন্দ স্বাগত জানাল। শ্রমসচিব এগিয়ে এসে বললেন, স্যার, আমার নাম গোলাম

রব্বানী। আমি আপনার মন্ত্রণালয়ের সচিব। পূর্বেই চলে আসতে হয়েছে বলে দেখা হয়নি।

হেসে বললাম, আমার মন্ত্রিত্বের বয়স অর্ধ সপ্তাহ। দেখা হওয়ার কথা নয়।

লেকের পারের মনোরম হোটেল রামাদায় আমার থাকার আয়োজন করা হয়েছে। প্রায় চার সপ্তাহ থাকতে হবে, আয়োজন বেশ ভালোই হয়েছে মনে হল। বিশেষ করে হোটেলটি বিখ্যাত জেনেভা লেকের পাশে হওয়াতে ভূস্বর্গের কিছু আস্বাদ পেলাম।

রাতে রাষ্ট্রদূতের বাসস্থানে স্বাগত নৈশভোজের আয়োজন করা হয়েছিল। রাষ্ট্রদূতের বাড়ি বিক্রমপুরে। সহকর্মী বন্ধু ব্যারিস্টার কাজী কামাল সাহেবের সে কনিষ্ঠ ভ্রাতা। আমার আদর-আপ্যায়নে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। পরদিন সকাল থেকে সে নিজে উদ্যোগী হয়ে অলৌকিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি জেনেভা শহরের এবং পার্শ্ববর্তী দর্শনীয় স্থানসমূহে সফরে নিয়ে গেল। সেদিনই প্রথম গ্লেসিয়ার দেখলাম। জেনেভা লেকের চতুষ্পার্শে এক চক্কর দিতেই একবেলা লেগে যায়। বৃহৎ সে লেকের আয়তন। চারদিকে শুধু বিনোদন আর অবসর যাপনের নানাবিধ উপকরণ। সমস্ত দিনের চড়াই-উৎড়াই ভ্রমণেও ক্লান্তি এল না। শুনেছিলাম সুইজারল্যান্ডে এসে মানুষ আর ফিরতে চায় না। কথা ঠিকই মনে হল। পরদিন থেকে শুরু হবে সম্মেলনের কাজ, তখন ব্যস্ত হয়ে পড়ব।

সম্মেলন উদ্বোধন করতে এসেছিলেন একজন ইউরোপীয় রাষ্ট্রপ্রধান। বিশ্বের শ্রম আন্দোলনে তাঁর একসময় প্রভূত অবদান ছিল। তারই স্বীকৃতিস্বরূপ আন্তর্জাতিক সম্মেলন উদ্বোধনের সুযোগ। কিন্তু এশিয়া, আফ্রিকা এবং বিশেষ করে মুসলিম দেশসমূহের উদ্যোগে তাঁর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান বর্জনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। বিশ্বনিন্দিত বর্ণবৈষম্য প্রথার সে একজন প্রবক্তা—তাই তাঁর অনুষ্ঠানে প্রথা বিরোধীরা উপস্থিত থাকবে না। বাংলাদেশও সে বর্জনে শরিক হল। সে এক দেখার মতো দৃশ্য। বিশালাকার সম্মেলন কক্ষে ঢুকে প্রধান অতিথি তার জন্য রক্ষিত বিশেষ আসনে উপবেশন করতেই হলের প্রায় অর্ধেকের মতো প্রতিনিধি অনুষ্ঠান বর্জন করে হল থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল। সে এক বিরাট বর্জন। প্রথম দিকে প্রধান অতিথি এবং অন্যান্যরা ঘটনায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলেও পরক্ষণেই তারা সশব্দে টেবিল চাপড়িয়ে বর্জনের বিপরীতে স্বাগত জানাল।

প্রতি বছর যেমনি হয়, প্রতিটি দেশের প্রতিনিধি দলের নেতার বক্তব্য সাধারণ অধিবেশনসমূহে এবং বিভিন্ন সাব-কমিটিতে প্রতিনিধিবৃন্দের অংশগ্রহণ, বিশ্বশ্রম পরিস্থিতি পর্যালোচনা, প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন, বিধি-নিষেধ আরোপ এবং শ্রমজীবীদের কল্যাণে যুগোপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণের মধ্যদিয়ে তিন-চার সপ্তাহ অতিবাহিত হয় ইন্টারন্যাশনাল লেবার

অর্গানাইজেশনের এই মহাসম্মেলন। এর মধ্যে রয়েছে লাঞ্চ, ডিনার এবং ককটেলের আমন্ত্রণ। দলনেতাকে প্রায় প্রত্যহই এসব নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে হয়। তাছাড়া আরও নানাবিধ সাংস্কৃতিক ও সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠান থাকে। আইএলও'র ডিরেক্টর জেনারেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হল। তিনিই অর্গানাইজেশনের প্রধান নির্বাহী। বাংলাদেশের শ্রম পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হল। আমরা উন্নত দেশসমূহে অধিকতর শ্রমিক বিনিয়োগের সুপারিশ করলাম। তিনি অধিবেশনে প্রদত্ত আমার বক্তৃতার ভূয়সী প্রশংসা করলেন। পাকিস্তানের শ্রমমন্ত্রী ও তাঁর স্ত্রী তাঁদের রাষ্ট্রদূতের বাসায় ডিনারের আমন্ত্রণ জানালেন। রাষ্ট্রদূতের স্ত্রী একসময় ঢাকায় ছিলেন। নানা খবরাদি সংগ্রহ করলেন, স্ত্রীকে নিয়ে আসলাম না কেন জিজ্ঞেস করলেন এবং অতি উপাদেয় কাচ্চী বিরিয়ানী, কাবাব এবং বোরহানী সহযোগে নৈশভোজ পরিবেশন করলেন।

হোটেল রামদাতে আমাকেও একটি নৈশভোজের ব্যবস্থা করতে হল। কেবল দাওয়াত খেয়েই যাব, খাওয়াব না—এটা তো দেশের মর্যাদার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। ভারত, পাকিস্তানসহ এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের অনেক দেশের নেতৃবৃন্দ সানন্দে যোগ দিয়েছিলেন। আমাদের পার্টিতে মদ সরবরাহ করা হয় না বলে অনেক অতিথি বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে চান না।

হোটেলের স্যুটে বিশ্রাম করছি, হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠল। বঙ্গ-ললনার কণ্ঠস্বর সুমধুর মনে হল। বলল, আমি সম্পর্কে আপনার দাদী শাশুড়ি।

বললাম, বিদেশ-বিভূঁয়ে একটি দাদী শাশুড়ি মন্দ কি!

তিনি পরিচয় দিলেন, দূতাবাসের ইকোনমিক মিনিস্টার হাবিবুর রহমান সাহেবের স্ত্রী। সম্পর্কে আমার স্ত্রীর দাদী হন। ভদ্রমহিলা বেশ সুরসিকা। হাসতে হাসতে বললেন, নাত-জামাই, দাদী শাশুড়ি হলেও আমি কিন্তু এখনও বৃদ্ধা হয়ে যাইনি! ডিনারে আসুন, দেখতেই পাবেন।

বললাম, আজকাল কি বাইরে থেকে দেখে কিছু বুঝা যায়! হাতেনাতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করে কিছুই মেনে নেওয়া যায় না। সে শর্তে রাজি থাকলে নিশ্চয়ই আসব। ডিনার নয়, দাদী শাশুড়িই মূল আকর্ষণ।

তিনি খুব হাসলেন। বললেন, টেলিফোন করে কিন্তু নাতনিকে সব জানিয়ে দেব।

বললাম, দোহাই আপনার। সব কথা কী সবাইকে জানানো যায়! জেনেভার এই রোমান্স দু'জনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা শ্রেয় নয় কী?

ভদ্রমহিলা অনেকক্ষণ ধরে হাসলেন, টেলিফোনে তার হাসিটি খুবই শ্রুতিমধুর লাগছিল।

হাবিবুর রহমান সাহেব পরদিন এসে পাকড়াও করে তাঁর এপার্টমেন্টে

নিয়ে গেলেন। সত্যিই, তাঁর স্ত্রী কেবল সুন্দরীই নন, সুদেহীও বটে। হাসি-গল্পে দাদী শাশুড়ির সযত্নে রান্না বাংলা খাবার উপভোগ করলাম। নাত-জামাইয়ের চাইতে দাদী শাশুড়ির বয়স অনেক কম!

তাকে বললাম, Two is company, three is crowd. দাদা শ্বশুরের অবাঞ্ছিত উপস্থিতির কারণে আজ নিভৃতে প্রেম করা গেল না। ঢাকায় এর দ্বিগুণ আদায় করব।

তিনিও কম যান না। বললেন, দেখা যাবে। নাতনিকে সামাল দিতেই হিমসিম অবস্থা! তা আবার দাদীকে নিয়ে টানাটানি!

তাদের সুসজ্জিত ড্রয়িংরুমে বসে অনেকদিন পর হাসি-গল্পে মেতে উঠলাম। ডিনারের পরও অনেকক্ষণ থাকতে হল। দাদী বললেন, হোটেলে গিয়ে সেই তো একাকীত্বে পড়বেন। তার চাইতে দাদীর কাছে আর একটু থাকুন না।

বললাম, আমার তো সারারাত থাকতে ইচ্ছা করছে। কিন্তু দাদা কী আজ রাতের জন্য আপনাকে ধার দিয়ে আমার হোটেলে গিয়ে রাত কাটাতে সম্মত হবেন?

তারা দু'জনই সশব্দে হেসে উঠলেন। দ্বিতীয় কাপ কফি শেষ করে তাঁদের দু'জনকে অনেক ধন্যবাদ দিয়ে বিদায় নিতে গিয়ে দেখি তাঁরা আমার গাড়িটি সে রাতের মতো ছেড়ে দিয়েছেন। নিজেদের গাড়িতে তাঁরা আমাকে রাতের জেনেভা ঘুরিয়ে দেখিয়ে বেশ রাতে হোটেলে পৌঁছে দিয়ে বিদায় নিলেন।

আমার গাড়ির ড্রাইভার ছিল শ্রীলঙ্কার লোক। ইংরেজি, ফরাসি দু'ভাষাই কাজ চালাবার মতো বলতে পারে। বেড়াতে বের হয়ে একদিন সে আমাকে ফ্রান্সের এক উপ-শহরে নিয়ে গেল। রাস্তায় সীমান্ত-ফাঁড়িতে পাসপোর্ট দেখল। আমার ফরাসি ভিসা ছিল। ঢাকা থেকেই নিয়ে এসেছিলাম। জেনেভার কাজ শেষ করে এক চক্কর প্যারিস ঘুরে আসব। প্যারিস আমার কাছে সর্বদাই স্বপ্নের শহর। ওরা লাল পাসপোর্ট এবং ভিসা দেখে দূতের গাড়ি লক্ষ্য করে কোন সিল-ছাপ্পর না দিয়ে ছেড়ে দিল। ড্রাইভার আমাকে ফরাসি দেশের পল্লী এলাকা দেখিয়ে যে শহরে নিয়ে এল তাকে শহর বা গ্রাম দুটোই বলা চলে। সে বলল, স্যার, তোমাকে একটা লেকের ধারে নিয়ে যাব—তুমি বোধহয় এ দৃশ্য দেখনি।

সত্যিই তা-ই। একটা বৃহৎ লেকের চারদিকে শত শত নারী-পুরুষ, যুবক-যুবতী, কিশোর-কিশোরী এমনকি বাচ্চা-কাচ্চারাও 'বার্থ ডে স্যুট' পরে রৌদ্রস্নানরত। একজনকেও দেখা গেল না কাপড় পরে আছে। মেয়েদের কেউ কেউ নিম্নাঙ্গ ঢেকে রেখেছে। অধিকাংশেরই দেহে কিছুই

নেই। গাড়িতেই সব খুলে রাখার নিয়ম। যেমন ওদের দেহ সৌষ্ঠব আর সৌন্দর্য তেমন বর্ণ, তেমন রূপ।

ওরা আমাদের পোশাক পরা দেখে বিরক্ত। আমরা যেন অপরাধ করে ফেলেছি। কোথাও একজন আর একজনের দেহের উপর সটান শুয়ে আছে। কেউ ভ্রূক্ষেপও করছে না। চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা অসম্ভব ছিল। সুসভ্য ফরাসিরা সভ্যতার আবরণ ছুঁড়ে ফেলে আধুনিক আদিমতায় ফিরে যাবার প্রয়াস পাচ্ছে। ভদ্রতা রক্ষা করে যতক্ষণ সেখানে কাটানো সম্ভব, কাটিয়ে দৃষ্টিভোজে পরিতৃপ্ত হয়ে ফিরে এলাম।

সম্মেলনের কাজ প্রায় শেষ। পরিকল্পনা ছিল জেনেভা থেকে প্যারিস যাব। সেখানে কয়েকটা দিন কাটিয়ে ঢাকা ফিরে আসব। ঢাকা থেকে হঠাৎ প্রাইভেট সেক্রেটারির টেলিফোন, স্যার, আর তিন দিন পর ঢাকা-মাওয়া রোড উদ্বোধন হতে যাচ্ছে। আপনি কী এর মধ্যে আসবেন? না প্রোগ্রাম ঠিকই থাকবে?

বললাম, এখনই আমি ঢাকা ফেরার ব্যবস্থা করছি। সব প্রোগ্রাম ফেলেই আমি চলে আসছি। সুইজারল্যান্ড, ফ্রান্স হয়ত আবার দেখা যাবে, কিন্তু আমাদের দীর্ঘদিনের আকাঙ্ক্ষিত রোডটি উদ্বোধন হবে, আর আমি অনুপস্থিত থাকব তা হয় না।

রাষ্ট্রদূতকে নির্দেশ দিলাম অনতিবিলম্বে আমার ঢাকা ফেরার ব্যবস্থা করুন। প্যারিস ভ্রমণ স্থগিত। রব্বানী সাহেবকে রেখে এলাম সম্মেলনের সমাপনী অনুষ্ঠানসমূহে যোগদানের জন্য।

রাস্তা উদ্বোধনের পূর্বদিন ঢাকা ফিরে এলাম। প্রেসিডেন্ট সাহেব দেখেই বললেন, আপনার তো আরও এক সপ্তাহ জেনেভায় থাকার কথা। পূর্বেই চলে এলেন কেন?

বললাম, স্যার, আগামীকাল আপনি ঢাকা-মাওয়া রাস্তাটি উদ্বোধন করবেন; আমি সেখানে উপস্থিত না হয়ে পারি না।

তিনি বললেন, হ্যাঁ, এটা তো আপনারই আবদার ছিল। ভালোই হল এসে গেছেন। আমি মনে করেছিলাম আপনাকে 'বিগ সারপ্রাইজ' দেব।

বললাম, স্যার, আপনি বলেছিলেন এক মাসে শেষ করবেন, এখন তো তিন সপ্তাহের মাথায় উদ্বোধন করছেন। এত তাড়াতাড়ি কাজ শেষ হল কীভাবে?

বললেন, ইচ্ছা থাকলেই সম্ভব। লোক বাড়ানো হয়েছে। প্রকৌশলী পাঠিয়েছি বেশ কয়েকজন। নিজেও তদারক করেছি। কাজ এভাবেই করতে হয়।

এই একটি বিষয়ে তাঁর কট্টর সমালোকরাও বলবে, লোকটি কাজ বুঝে এবং তার আনজাম দিতে জানে। মানুষের কোন না কোন গুণ তাকে বড় করবেই। তাঁর হয়ত অনেক দোষ রয়েছে কিন্তু উন্নয়নমূলক প্রতিটি কাজে তাঁর ছিল অসীম আগ্রহ এবং কাজটি সমাধা না হওয়া পর্যন্ত তার পেছনে লেগে থাকার ধৈর্য। স্বয়ং প্রেসিডেন্ট যদি একটি কাজের বারবার তদারকি করেন তা হলে সে কাজ সুষ্ঠুভাবে সমাধা হবে না কেন?

ঢাকা-মাওয়া রোডের ব্যাপারে একদিনই তাঁকে অনুরোধ করেছিলাম। তারপর বিদেশে চলে গেলাম। তিনি কিন্তু একটি দিনের জন্যও কাজটির কথা ভোলেননি। প্রতিদিন কাজের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করেছেন। নিজে জিপ চালিয়ে নির্মাণস্থল পরিদর্শন করেছেন, পরামর্শ দিয়েছেন এবং অর্থ ও জনবল অকাতরে যোগান দিয়েছেন। শুধু এই রাস্তার বিষয় নয়, তাঁর সঙ্গে গাড়িতে যেতে যেতে দেখেছি, যদি কোথাও রাস্তার একটি লাইট দেখেছেন জ্বলছে না, সঙ্গে সঙ্গে নিজ হাতে ডাইরিতে নোট করেছেন। এবং গাড়ি থেকেই টেলিফোনে ইঞ্জিনিয়ারকে নির্দেশ দিয়েছেন লাইটটি জ্বালাবার ব্যবস্থা করার জন্য। আমরা হয়ত দেখতামই না। আর দেখলেও কাউকে কিছু বলতাম না। যদি বলেও থাকি, পরদিন নিশ্চয়ই সেটি ঠিক হল কিনা ব্যক্তিগতভাবে গিয়ে দেখতাম না। কিন্তু এরশাদ সাহেব তা করেন। তিনি সেই রাস্তা দিয়ে পরদিন আবার যাবেন, নোটবই মিলিয়ে দেখতেন লাইটটি সারানো হয়েছে কি না। ইঞ্জিনিয়ারের ঘাড়ে কয়টা মাথা! কাজ না হয়ে যায়!

এই ছিল এরশাদ সাহেবের বৈশিষ্ট্য। সে কারণেই আমার চাহিদার রাস্তাটি তিন মাসের স্থলে তিন সপ্তাহে সমাপ্ত হল। অনেক আনন্দ করে প্রেসিডেন্টকে নিয়ে মন্ত্রী আমিনুল ইসলামসহ বুড়িগঙ্গার ওপারে প্রথম উদ্বোধনের অনুষ্ঠান সেরে তাকে নিয়ে খোলা জিপে করে সারাটা পথ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রাস্তায় নেমে আসা আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার বহুদিনের স্বপ্ন সার্থক হওয়ার অনাবিল আনন্দে শরিক হতে পেরে আমরাও যারপরনাই আনন্দ উল্লাসে মেতে উঠেছিলাম। বিক্রমপুরের কৃতজ্ঞ জনগণ সেদিন তাদের রাষ্ট্রপতিকে যে প্রাণঢালা সম্বর্ধনা দিয়েছিল, তার যেমন তুলনা হয় না, প্রেসিডেন্ট এরশাদও সেদিন কামধেনু সেজেছিলেন এবং অকাতরে স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসাসহ সকল প্রতিষ্ঠানে প্রভূত অনুদান দিয়েছিলেন। আমার বিশেষ অনুরোধে শ্রীনগর কলেজ ও বালিকা বিদ্যালয়কে সরকারিকরণ করেছিলেন। দীর্ঘ যাত্রাপথে যেখানে বলেছি, নেমেছেন, বক্তৃতা করেছেন, প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেছেন। আমাদের এলাকার জনসাধারণ সেদিন এরশাদের জয়ধ্বনিতে বিক্রমপুরের আকাশ-বাতাস মুখরিত করেছিল।

সারাদিন লেগে যেত ঢাকা থেকে বাড়ি পৌঁছতে। সেখানে দুটি ফেরি থাকার পরও দেড় ঘন্টায় বাড়ি পৌঁছানো কেউ কল্পনাও করতে পারত না। ফেরি তুলে দিয়ে যখন সেতু নির্মিত হবে তখন এক ঘণ্টারও কম সময়ে আমরা বিক্রমপুরের শেষ মাথায় পৌঁছব। দেশের লোকেরা সেদিন মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছিল এরশাদের সঙ্গে রাজনীতি করতে গিয়ে ভুল করিনি—বরং উন্নয়নের রাজনীতি তাদের জন্য আশীর্বাদ বলেই পরিগণিত হল।

সারা দেশেই উন্নয়নের একটা জোয়ার শুরু হল। যেখানে রাস্তা ছিল না, সেখানে রাস্তা তৈরি হল। আমরা হিসাব করে দেখেছি প্রতিদিন গড়ে প্রায় দুই কিলোমিটার পাকা রাস্তা সে সময় নির্মিত হয়েছে। সেতু নির্মিত হয়েছে অসংখ্য। নদীবহুল বাংলাদেশে নদ-নদী, খাল-বিলের কারণে সড়ক যোগাযোগের ক্ষেত্রে এক বিপ্লবের সূচনা করা হল। বাংলাদেশের যে কোন উপজেলা বা থানায় গাড়ি নিয়ে ভ্রমণের চিন্তা যেখানে অকল্পনীয় ছিল, সেটাই বাস্তবায়িত হল। সকল উপজেলার সঙ্গে সড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হল।

বিদ্যুতায়নের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হল। হাজার কিলোওয়াটের নিচের বিদ্যুৎ উৎপাদনকে প্রায় আড়াইগুণ বর্ধিত করা গেল। পূর্বে প্লেনে বাংলাদেশের উপর দিয়ে যাওয়ার সময় প্রায় সমস্ত দেশটাকে অন্ধকারাচ্ছন্ন দেখা যেত, আজ তার এক তৃতীয়াংশ আলোকিত। শহর-বন্দর, উৎপাদনকেন্দ্র, থানা হেড্‌কোয়ার্টার এবং সমস্ত কলকারখানায় লোড শেডিং হ্রাস পেল। বিভিন্ন স্থানে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ কলকারখানা স্থাপিত হল। মানুষ তাদের ভাগ্য নির্ধারণের সুযোগ পেল। ব্যাংক এবং বিভিন্ন ঋণদান সংস্থা জনগণকে নব নব উদ্যোগ গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করল। ব্যবসায়ীরা জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলল। সর্বত্রই একটি কর্মযজ্ঞ শুরু হল। সামান্য পান দোকানদারই নয়, রিকশাচালকও দ্বি-গুণ, তিন গুণ অর্থ উপার্জন করতে সমর্থ হল। সরকার ব্যয় করলেই জনগণ আয় করে। সরকার সর্বক্ষেত্রে রেকর্ড পরিমাণ অর্থ ব্যয় করছিল। জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থার দর্শনীয় পরিবর্তন সাধিত হল।

শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রেও প্রভূত উন্নতি সাধিত হল। প্রায় প্রতিটি গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হল। প্রাথমিক শিক্ষকদের চাকরি সরকারিকরণ করে তাদেরকে মর্যাদাজনক বেতন-ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করা হল। নতুন স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হল। এইসব শিক্ষায়তনের শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি করে প্রায় অর্ধেকটাই সরকারি ভাতা হিসাবে প্রদানের ব্যবস্থা করা হল। অসংখ্য কলেজকে সরকারিকরণ করা হল। নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হল। শিক্ষাক্ষেত্রে জাতি এক নব জাগরণের ধারায় উপনীত হল।

সমাজের সর্বত্র নতুন জীবন-জোয়ার পরিলক্ষিত হল। আমাদের সন্তানেরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে কেবল যে মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রাই অর্জন করল তা নয়, মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা পৃথিবীর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃতিত্বের নতুন নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করল। দেশ-বিদেশে বাংলাদেশ আর তলাবিহীন ঝুড়ি হিসাবে বিবেচিত নয়। বৈদেশিক সাহায্য সংস্থাসমূহ এবং সাহায্যদাতা দেশসমূহও অধিকতর আর্থিক সহায়তা প্রদানে উৎসাহিত হল। মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহে এবং বিশ্বের অন্যত্র বাংলাদেশের সেনাবাহিনী শান্তি রক্ষায় প্রেরিত হয়ে প্রভূত সুনাম অর্জন করল।

সমাজের সকল ক্ষেত্রেই অবিস্মরণীয় উন্নয়ন সাধিত হল। সবই কী এরশাদ সাহেব একা করেছেন? না, তাঁর সৌভাগ্য হয়েছিল বাংলাদেশের বহু প্রবীণ এবং নবীন রাজনীতিককে একত্র করার। তাঁর রাজনৈতিক দলে আতাউর রহমান খান, বিচারপতি আহসানউদ্দীন চৌধুরী, শামসুল হুদা চৌধুরী, বিচারপতি এ.কে.এম. নুরুল ইসলাম, বিচারপতি বি.এ. সিদ্দিকী, মিজানুর রহমান চৌধুরী, কাজী জাফর আহমেদ, ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ, ডা. এম.এ. মতিন, হুমায়ূন রশীদ চৌধুরী, রিয়াজউদ্দীন আহমেদ ভোলা মিয়া, এম. কোরবান আলী, এয়ার ভাইস-মার্শাল আমিনুল ইসলাম, শামসুল হক, ক্যাপ্টেন হালিম চৌধুরী, অধ্যাপক ইউসুফ আলী, সুনীল গুপ্ত, সরদার আমজাদ হোসেন, ইদু চৌধুরী, সৈয়দা রাজিয়া ফয়েজ, ব্যারিস্টার রাবেয়া ভূইয়া, মাহবুবুর রহমান, কর্নেল (অবঃ) এম.এ. মালেক, ব্যারিস্টার আবুল হাসানাত, সিরাজুল হোসেন খান, মেজর জেনারেল (অবঃ) শামসুল হক, মতিউর রহমান, আবদুস সাত্তার, ডা. আজিজুর রহমান, এ.বি.এম. গোলাম মোস্তফা, টি.আই.এস. ফজলে রাব্বি, মীর্জা রুহুল আমিন, সালাহউদ্দীন কাদের চৌধুরী, আনোয়ার জাহিদ, আনোয়ার হোসেন মঞ্জু, মোস্তফা জামাল হায়দার, হাবিবুল ইসলাম ভূইয়া, তাজুল ইসলাম চৌধুরী, শেখ শাহিদুল ইসলাম, কাজী ফিরোজ রশীদ, কর্নেল এম.এ. গফফার, লে. কর্নেল (অবঃ) জাফর ইমাম, মেজর জেনারেল (অবঃ) মাহমুদুল ইসলাম, ব্যারিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, নাজিউর রহমান মঞ্জু, এ.বি.এম. রুহুল আমিন হাওলাদার, মামদুদুর রহমান চৌধুরী, ইকবাল হোসেন চৌধুরী, এম.এ. সাত্তার, মেজর (অবঃ) মঞ্জুর কাদের, ব্যারিস্টার সুলতান আহমেদ চৌধুরী, গোলাম সরোয়ার মিলন, জিয়াউদ্দীন বাবলু, ফারুক রশীদ চৌধুরী, নুরুল আমিন খান পাঠান, খালেদুর রহমান টিটো, নাজিমউদ্দীন আল আজাদ, আবুল খায়ের চৌধুরী, টি.এম. গিয়াসউদ্দীন, শফিকুল গণি স্বপন, মাঈদুল ইসলাম, ফখরুল ইসলাম মুন্সী, সৈয়দ কাওসার হোসেন, নুরুন নবী চাঁদ, মমিন মণ্ডল, মোজাফফর হোসেন, নিতাই রায় চৌধুরী, এ.বি.এম. শাহজাহান, মিসেস মমতা ওয়াহাব, অ্যাডভোকেট ফজলে রাব্বী, মাওলানা

আবদুল মান্নান, হাজী মোহাম্মদ মনসুর, মাঈনউদ্দীন ভূইয়া, মমিনউদ্দীন আহমেদ, নুর মোহাম্মদ খান, মেসবাউদ্দীন আহমেদ বাবলু, বি.কে. দেওয়ান, মাইকেল সুশীল অধিকারী, এম.এ. হক, আবদুস সালাম, হাশিমউদ্দীন আহমেদ, আবু নাসের খান ভাসানী, মজিবুল হক চুন্নু, কোরবান আলী, রশীদ ইঞ্জিনিয়ার, এ.আর.এস. দোহা, শাহ্ মোফাজ্জল হোসেন কায়কোবাদ, মুফতি মোঃ ওয়াক্কাস, ব্যারিস্টার এ.আর. ইউসুফ, হুমায়ূন কবির, সৈয়দ দিদার বখ্‌ত, মাহবুব উজ্জামান।

এতদ্ব্যতীত তদানীন্তন সামরিক বাহিনীর উচ্চপদস্থ কতিপয় বিশিষ্ট কর্মকর্তা এবং বেসামরিক ব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে এরশাদ সাহেবের সরকারে দায়িত্বপূর্ণ পদে অবস্থান করে প্রশাসন পরিচালনা ও উন্নয়ন কার্যক্রমসমূহে প্রভূত প্রশংসনীয় অবদান রাখেন। তাদের মধ্যে ছিলেন রিয়ার এ্যাডমিরাল মাহবুব আলী খান, রিয়ার এ্যাডমিরাল সুলতান আহমেদ, এয়ার ভাইস-মার্শাল এ.কে. খন্দকার, এয়ার ভাইস-মার্শাল এ.জি. মাহমুদ, এয়ার ভাইস-মার্শাল সুলতান মাহমুদ, মেজর জেনারেল মহব্বতজান চৌধুরী, মেজর জেনারেল মান্নান সিদ্দিকী, মেজর জেনারেল এম.এ. মুনিম, এ. জেড্ ওবায়দুল্লাহ খান, সাইদুজ্জামান, ডা. মাজিদ খান, ডা. ওয়াহিদুল হক, ডা. সাফিয়া খাতুন, ডা. মিজানুর রহমান শেলী, আবুল মাল আবুল মুহিতসহ আরও অনেক ব্যক্তি যারা নিজ নিজক্ষেত্রে বিস্তৃত প্রতিভার অধিকারী ছিলেন—তাঁরা সকলেই নিজেদের সাধ্য মতো কোন না কোন ক্ষেত্রে, কোন না কোন সময়ে সরকারে প্রভূত অবদান রেখেছেন।

এরশাদ সাহেব ছিলেন একজন ভাগ্যবান ব্যক্তি। এই সমস্ত মানুষকেই তিনি প্রয়োজনে টেনে কোলে তুলে নিয়েছেন, আবার প্রয়োজন ফুরোতেই ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন। তবে দেশের উন্নয়নে, জাতির কল্যাণে এদের কোন অবদানকেই খাটো করে দেখার সুযোগ নেই।

অবশ্য ক্ষমতার সর্বময় উৎস ছিলেন তিনি। খেলোয়াড়সুলভ দেহ কাঠামোর সুস্বাস্থ্যের মানুষটি পরিশ্রম করতে পারতেন প্রচুর এবং তাঁর কর্মস্পৃহা কখনও অবদমিত হত না। দেশের বিচার বিভাগেও পরিবর্তনের প্রয়াস নিলেন। মানুষ কোর্ট-কাচারিতে দ্রুত বিচার পেত না। অহেতুক দীর্ঘসূত্রিতা, বিচারকের অপ্রতুলতা এবং আদালতের সংখ্যা সীমিত থাকায় জনগণের নিকট বিচারের বাণী-নীরবে নিভৃতে ক্রন্দন করত। তিনি চারটি নতুন হাইকোর্ট স্থাপন করলেন সিলেট, রাজশাহী, চট্টগ্রাম এবং রংপুরে। ভীমরুলের চাকে ঢিল পড়ল। বিচারপতিরা ঢাকার সাজানো ঘর-বাড়ি ছেড়ে নতুন স্থানে নতুন করে সংসার পাতায় অনাগ্রহী। দৈনিক হাজার হাজার টাকা উপার্জনকারী নামী-দামি আইনজীবীগণ রাজধানীর সর্বপ্রকার আরাম-আয়েস ছেড়ে মফস্বলে পাড়ি জমাতে বিন্দুমাত্র সম্মত নন। আন্দোলন সেখান থেকেই

দানা বেঁধে উঠতে লাগল। অসন্তুষ্ট রাজনৈতিক নেতারা এবং অপ্রয়োজনীয় রাজনীতিক দল উন্নয়নের সকল সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেও সরকারের বিরুদ্ধাচারণ করাকেই কর্তব্য মনে করল।

এরশাদ সাহেবের হলও অনেকদিন। Familiarity breeds discontent. মুজিব জিয়া গেল তল, এরশাদ বলে কত জল! উভয় দলের ব্যর্থতার ভাগ্যাকাশে এরশাদ সৌভাগ্যের বিজয় কেতন উড়িয়ে উভয় দলেরই হিংসা এবং প্রতিহিংসার খোরাক হয়ে দাঁড়ালেন।

উপজেলা পদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে এরশাদ সরকারেরই সৃষ্টি। আমাকে তখন স্থানীয় সরকার, সমবায় ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সকল স্থানীয় সরকারের প্রতিষ্ঠানসমূহের নিয়ন্ত্রণ ছিল এই মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন। অনেক ভাবনা ও পরিকল্পনার ফসলরূপে স্থানীয় সরকারের থানা পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধি সমন্বয়ে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে সমন্বিত প্রচেষ্টায় কেন্দ্রীভূত করার লক্ষ্যে উপজেলা পদ্ধতি প্রণয়ন করা হল। সেখানে কোর্ট-কাচারি প্রতিষ্ঠা করা হল। উন্নয়ন কর্মসূচির সঙ্গে সম্পৃক্ত অধিকাংশ মন্ত্রণালয় বা বিভাগের দায়িত্বপূর্ণ কর্মকর্তাকে উপজেলায় প্রেরণ করা হল, সকলের কাজ সমন্বয়ের জন্য জনপ্রতিনিধিদের সমন্বয়ে নির্বাচিত উপজেলা চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে উপজেলা পরিষদ গঠনের ব্যবস্থা নেওয়া হল। একজন উপজেলা নির্বাহী অফিসার দেওয়া হল পরিষদের কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের জন্য। অন্যান্য কর্মকর্তাদেরকে তদারকির দায়িত্বও তাকে দেওয়া হল। একটি উপজেলাতে কমপক্ষে পনেরো-বিশ জন বা ততোধিক গেজেটেড্ অফিসার নিয়োগ করা হল।

প্রথমদিকে রাজধানী, জেলা, মহকুমা বা শহরসমূহে অবস্থানরত কর্মকর্তাবৃন্দ মফস্বলে যেতে সম্মত হত না। বাসস্থান নেই, বিদ্যুৎ নেই, টেলিফোন নেই, সিনেমা হল নেই, ভিসিআর নেই, ক্লাব-রেস্তোরাঁর সুযোগ নেই, সে পাণ্ডববর্জিত পল্লী অঞ্চলে পরিবার নিয়ে বসবাস অকল্পনীয়। ছোট শ্যালিকাটিকে এত আদর করে—সেও নাক ফুলিয়ে গোস্বা করল, মফস্বলে যাবে না!

উপজেলায় ধীরে ধীরে প্রাণসঞ্চার হতে লাগল। ডাকবাংলো, বাসস্থান, উপজেলার গৃহায়ন শুরু হয়ে গেল। বিদ্যুৎ এল, টেলিফোন, টেলিভিশনও এল, সিনেমা হল, ক্লাব তৈরি হল। রাতে বিদ্যুতের আলোতে মেয়েদেরকেও ব্যাড্‌মিন্টন খেলতে দেখা গেল। অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং অপরাধসমূহের কেন্দ্রবিন্দু থানা হেড্‌কোয়ার্টারগুলো উপজেলা পদ্ধতি প্রবর্তনের ফলে এক-একটি উপশহরে পরিণত হল। এখন আর কর্মকর্তারা মফস্বলে নিয়োগপ্রাপ্ত হলে সেটি বাতিলের জন্য উঠে-পড়ে লাগে না। দুধ, মাছ, টাটকা শাক-সবজিতে অভ্যস্ত হয়ে ক্রমেই তারা মফস্বলপ্রেমী হয়ে উঠল। জিপ্, মোটর

সাইকেল বাংলাদেশের নিভৃত প্রান্তরেও প্রচুর পরিমাণে পরিলক্ষিত হল। উপজেলা পদ্ধতিকে জনগণ আশীর্বাদরূপে গ্রহণ করল। এলাকার সকল উন্নয়নের উৎসরূপে কাজ করল এই নতুন পদ্ধতি।

সুপেয় পানীয় জল ছিল দুষ্প্রাপ্য। আমরা প্রতি দেড় শ' লোকের জন্য একটি নলকূপ স্থাপন করে দূষণমুক্ত পানীয় জলের ব্যবস্থা করলাম। হাসপাতাল-স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হল। অনেক উপজেলাতে অ্যাম্বুলেন্স এবং অগ্নিনির্বাপক গাড়ি দেওয়া হল। গ্রাম আর গ্রাম রইল না।

ওদের এতটা সহ্য হবে কেন? ওরা উঠে-পড়ে লাগল। এরশাদের দলকে হটাতে হবে। দুর্ভিক্ষ হয় না। মানুষ না খেয়ে মরে না। বন্যা হলে বুক পর্যন্ত পানিতে নেমে রাষ্ট্রপতি, মন্ত্রীরা রাত-দিন বন্যা প্লাবিত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে খাবার, পানীয় জল, ওষুধ তুলে দিচ্ছে! এ কেমন সরকার! একে অবিলম্বে হটানো প্রয়োজন—নইলে তাদের ভবিষ্যত কোথায়?

মহকুমাগুলোকে জেলায় রূপান্তরিত করে প্রতিটি নতুন জেলায় জেলা সদর নির্মাণ করা হল। অফিস, আদালত, কর্মকর্তাদের বাসস্থান ও অন্যান্য সমস্ত সুযোগ-সুবিধার বিধান করা হল। সার্কিট হাউস নির্মিত হল প্রতিটি জেলা সদরে। ম্যাডামরা এরশাদের তৈরি মসৃণ সড়কযোগে পাজেরো গাড়িতে চড়ে মফস্বলে গিয়ে সার্কিট হাউসে ওঠেন, সেখানে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে বিশ্রাম নিয়ে ঠাণ্ডা হয়ে বিকালে মাঠে গিয়ে গরম বক্তৃতা করেন—এ সরকারকে হটাতেই হবে! এরা কিছুই করেনি!

চাল-ডালের দাম মানুষের ক্রয় সীমার মধ্যে। নিত্য ব্যবহার্য পণ্য দেশেও প্রস্তুত হচ্ছে, বিদেশ থেকেও আসছে। মূল্য নাগালের মধ্যেই।

আমাদের সরকারের পতনের মুহূর্তে আমি ছিলাম খাদ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে। ছ' টাকা দরে চাল খাইয়ে আমরা হলাম স্বৈরাচার—ষোল টাকা সের চাল খাইয়েও ওরা রইল গণতান্ত্রিক! প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিচ্ছেন গণতন্ত্রের!

সত্যিই বিচিত্র এই দেশ সেলুকাস!

এদিকে আন্দোলন দানা বেঁধে উঠছে। রাষ্ট্রপতিও তাঁর দলের মহাসচিব কেবল পরিবর্তন করে যাচ্ছেন। কাউকেই দীর্ঘদিন পছন্দ হয় না। এক জনসভায় ভোলা ভাইকে পরিবর্তন করা হল বক্তৃতার মাধ্যমে। ভোলা ভাই নিজেও মহাসচিব হতে চাননি। তিনি বলতেন, পিতা-মাতা আমার নাম রেখেছে ভোলা। আমি ইচ্ছা করলেই কী সব মনে রাখতে পারি!

যে কেউ একটা কাগজ তাঁর কাছে ধরলে সে সই করে তাকে খুশি করে দিল। কর্মীরা সকলেই দলে কোন না কোন পদ বাগিয়ে নিল ভোলা ভাইয়ের স্বাক্ষরের সুবাদে।

তাকে যখন বললাম, ভোলা ভাই, ঊনত্রিশ জন যুগ্ম-সচিব করেছেন। এভাবে কী দল চলে?

তিনি নাকে একটিপ নস্য গুঁজে দিয়ে হাসিমুখে বলতেন, বস্, ওরা তো খুশি হল! পরে আপনারা দল পুনর্গঠন করে নিবেন!

এই হল ভোলা ভাই। তাকে মহাসচিব করা হয়েছিল। আবার একদিন জনসভায় দাঁড়িয়ে এরশাদ সাহেব তাকে অব্যাহতিও দিলেন। মূল কথা ছিল, রাজনৈতিক দলের গঠনপদ্ধতি বা নীতিমালা তিনি মেনে চলতেন না।

তখনও শ্রম মন্ত্রণালয়ে আছি। আমার মন্ত্রণালয় পরিবর্তন হয়—যখন আমি কার্যোপলক্ষে বিদেশে সফরে থাকি। এসব নিয়ে কখনও মাথা ঘামাইনি। একদিন এরশাদ সাহেব আমাকে তাঁর অফিসে ডেকে পাঠালেন। যেতেই বললেন, আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আপনাকে মহাসচিব হতে হবে।

আমি চুপ করেই রইলাম, অতীতের অভিজ্ঞতা সুবিধাজনক নয়। তিনি আবার বললেন, আমি অনেককেই দায়িত্ব দিয়ে দেখলাম, তেমন সুবিধা হয়নি। আজ থেকে এই দলের মহাসচিব আপনি।

এই বলে তিনি ড্রয়ার থেকে পার্টির একটি ফাইল বের করে আমাকে মহাসচিব করার সিদ্ধান্তে স্বাক্ষর করলেন।

মনে হল, শেষ পর্যন্ত তা হলে কাজটি হল। মন্ত্রিত্বের চাইতে পার্টির মহাসচিবের দায়িত্ব আমি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ মনে করতাম। আমি তাঁর অফিস থেকে বের হয়ে খবরটি সকলকে, বিশেষ করে দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান চৌধুরী এবং অন্য সব কর্মীদের অবগত করার জন্য আগ্রহী হলাম। দুপুরের খাবার সময় হয়ে এসেছিল। তিনি আমাকে তাঁর সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজে শরিক হতে অনুরোধ করলেন। প্রেসিডেন্টের অনুরোধ মানেই আদেশ। কিন্তু আজ আর বিলম্ব সয় না। বললাম, স্যার আজ আমাকে ক্ষমা করুন। আমার এখুনি উচিত যাকে চেয়ারম্যানের দায়িত্ব দিয়ে রেখেছেন, সেই ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানকে খবর দেওয়া। কর্মীদেরকে খবর দিতে হবে। আজই যদি অফিসে যাই তা হলে সেভাবেই ব্যবস্থা করতে হবে। স্যার, রাজনীতির একটা বাহ্যিক রূপও রয়েছে—তারও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে হবে।

তিনি হেসে বললেন, বুঝেছি, অফিসে সন্ধ্যায় সম্বর্ধনা হবে।

তিনি আরও বললেন, আজ খবরটি প্রকাশিত হলে আগামীকাল সব পত্রপত্রিকায় আসবে। রেডিও, টিভি সবাই লক্ষ্য করে না। আপনি বরং কাল অফিসে যান, তা হলে বিষয়টি বেশ জাঁকজমক হবে।

তাঁর কথা যথার্থ মেনে নিয়ে বের হতেই রাষ্ট্রপতির পিএসও মেজর জেনারেল আতিকুর রহমান সাহেবের সঙ্গে দেখা। তিনি আমাকে অভিনন্দন জানালেন। মহাসচিব হয়েছি তিনি তা জানেন। তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে ছুটলাম সর্বাগ্রে মিজান সাহেবকে খবরটি দিতে। সে যথারীতি তাঁর বিছানায় অর্ধ-শোয়া অবস্থায় আছেন, আমাকে দেখেই ভাবীকে ডেকে বললেন, নতুন মহাসচিব এসেছে, স্বাগত জানাও।

ভাবীর সঙ্গে আমার মধুর অহিনকুল সম্পর্ক। তাঁকে দেখলেই আমি গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করি, প্রায়ই এখানে আপনাকে দেখা যায়! আপনি কি মনে করে এসেছেন? এখনও স্বভাব ভালো হল না?

মিজান ভাই আমাদের ঝগড়া খুব উপভোগ করেন। ভাবীও পান চিবুতে চিবুতে আমাকে পাল্টা আক্রমণ করবেন, আপনি আবার কার পেছনে লাগতে এখানে এসে জুটেছেন?

মিজান সাহেব উঠে আমাকে অভিনন্দন জানালেন, বুক মিলালেন। অনেক আনন্দ প্রকাশ করলেন। সবাইকে ডেকে বললেন, এবার পার্টি হবে। উপযুক্ত লোকের উপর দায়িত্ব পড়েছে।

বুঝলাম, এরশাদ সাহেব তাঁকে টেলিফোনে খবর দিয়েছেন। দুপুরে সেদিন মিজান সাহেবের অনুরোধে তাঁর সঙ্গে ভাত খেলাম। রাষ্ট্রপতির সঙ্গে না খেয়েও আমি তার সঙ্গে খেলাম। কেননা, তার সঙ্গে দলের স্বার্থে এখন থেকে আরও সুসম্পর্ক রাখা প্রয়োজন। সেদিন পার্টি অফিসে যাওয়া বাদ দিলাম। সংবাদটা অবশ্য অনেকটাই প্রকাশ হয়ে গেছে বলে মনে হল। টেলিফোন আসছে, কর্মীরা দল বেঁধে আসছে। বললাম, কাল সকালে খবরের কাগজ না দেখে সঠিক কিছু বলা যাচ্ছে না। এ ধরনের একটি সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে শোনা যাচ্ছে।

আমি ওদেরকে কেন জানি সব ভেঙে বললাম না। মাহবুবুল হক দোলন ব্যক্তিগতভাবে আমার প্রিয়জন। ডিএলএ'র প্রচার সম্পাদক ছিল। এখানেও অনেকদিন একসঙ্গে কাজ করছি। গভীর রাতে ভগ্নদূত দোলন টেলিফোন করে, মোয়াজ্জেম ভাই, খবর অন্যরকম শোনা যাচ্ছে। প্রেসিডেন্ট সাহেব বোধহয় তাঁর সিদ্ধান্ত পাল্টেছেন। আমি লোকমুখে শুনতে পাচ্ছি মিজান সাহেবকেই নাকি মহাসচিব করা হচ্ছে।

আমার ঘুম পাচ্ছিল। বললাম, দোলন, ঘুমোতে যাও। যা হবার হবে। কাল দেখা যাবে। ওনার মাছ উনি যদি মাথার দিকে না কেটে লেজের দিক থেকে কাটেন, কিছু বলার নেই।

মন একটু দমে গেলেও, কথার গুরুত্ব তেমন দিলাম না। তা ছাড়া মিজান সাহেবের কি এখন মহাসচিব হওয়ার বয়স আছে!

তখন সকালে অফিস বসত। সেক্রেটারিয়েটে ঢুকতেই মিজান সাহেবের ফোন, শাহ্, ব্যাপারটা কী রকম হল? তোমার জন্য মেয়ে দেখতে গিয়ে নিজেই যে বিয়ে করে এলাম। তোমাকে মহাসচিব করার জন্য ধন্যবাদ দিতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত আমাকেই সেই দায়িত্ব গ্রহণ করে আসতে হল।

বললাম, আপনার চারিত্রিক দুর্বলতার কথা কে না জানে? ছোট ভাইয়ের বিয়ে ঠিক করতে গিয়ে মেয়ে পছন্দ হওয়ায় নিজেই বিয়ে করে নিয়ে এলেন!

মিজান সাহেবের সঙ্গে এ ধরনের হাসি-ঠাট্টা আমাদের চলত। মিজান সাহেব মন্দের ভালো। এ যাবত যে ক' জনকে মহাসচিব করা হয়েছে, তাদের মধ্যে বয়স এবং অভিজ্ঞতা তাঁর সবচাইতে বেশি। অবশ্য অত্যধিক অভিজ্ঞতা কোন কোন ক্ষেত্রে অসুবিধারও সৃষ্টি করে।

মিজান সাহেবকে মহাসচিব করায় মন খুব একটা খারাপ হল না। আরও অনেক অভিজ্ঞতা যে আমার ভাণ্ডারে জমা রয়েছে। আর্মির লোক, ইঞ্জিনিয়ারিং কোরের মেজর জেনারেল মাহমুদুল হাসানকে পর্যন্ত তিনি মহাসচিব বানালেন। সে ছিল কৃষিমন্ত্রী, তাকে দফতরবিহীন মন্ত্রী করে মহাসচিবের দায়িত্ব দেওয়া হল। কী চমৎকার কম্বিনেশন! লেফটেন্যান্ট জেনারেল হলেন পার্টি চেয়ারম্যান, মেজর জেনারেল পার্টির মহাসচিব। দলটি রাজনীতির কিন্তু চেয়ারম্যান মহাসচিব দু'জনই অরাজনৈতিক। বিরোধী দলের তূণে আর একটি তীর তুলে দেওয়া হল। মাহমুদুল হাসান দফতর হারিয়ে অতিশয় খাপ্পা। অভিনন্দন জানাতেই বিরক্ত হয়ে বলল, এই উর্দু চুলটা কি দিল আমাকে?

সে অবশ্য বাংলা শব্দটাই ব্যবহার করেছিল। বললাম, পদটা ভালোই দিয়েছে। যদি ঠিকমতো ব্যবহার করতে পারেন—মন্ত্রিত্বের দফতরের চাইতে অনেক বেশি ক্ষমতাধর।

সে তা বুঝতে চায় না। রাজনৈতিক মহলে তার যা সুনাম ছিল, কান পাতা যায় না। শোনা যায় বিএনপি নেত্রী তাকে 'থিফ অব বাগদাদ' নাম দিয়েছেন। সত্য-মিথ্যা নিরূপণ কঠিন। এই নামকরণের প্রতিউত্তরে দেয়ালে বড় বড় হরফে লিখে দেওয়া হল, 'মাহমুদুল হাসানের চরিত্র, ফুলের মতো পবিত্র।'

কী পরিমাণ পবিত্র পরে টের পেয়েছিলাম। অনেক পরে এরশাদ সরকারের পদত্যাগেরও বহু পরে এই ফুলের মতো পবিত্র চরিত্রের অধিকারী তাদেরই নাম দেওয়া 'থিফ অব বাগদাদ'কে বিএনপি'তে বরণ করে নেওয়া হয়।

বুঝ হে সুজন যে জান সন্ধান!

পরদিন মিজান সাহেবের পার্টি অফিসে সম্বর্ধনা সভা আমি নিজেই

পরিচালনা করে বুঝাতে চেষ্টা করলাম, শেষ মুহূর্তের পরিবর্তনে আমি অসন্তুষ্ট নই। এরশাদ সাহেবও বিষয়টিতে সন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন।

যখন যে মহাসচিব হয়েছে, তাকেই পূর্ণ সহযোগিতা দিয়েছি। কারণ আমি আন্তরিকভাবে চাইতাম দলটি সুষ্ঠুভাবে গড়ে উঠুক এবং বিরোধী দলসমূহের অহেতুক কর্মকাণ্ডের মোকাবিলায় রাজনৈতিক শক্তি নিয়ে দণ্ডায়মান হোক। কিন্তু গোড়ায় যদি গলদ থাকে, তা হলে শত চেষ্টাও বিফল হতে বাধ্য। যারা সিদ্ধান্ত নেয় 'ফরমেশন কমান্ড' থেকে, রাজনৈতিক দল তাদের নিকট জিন্দাবাদ আর তোরণ নির্মাণের দায়িত্ব ব্যতিরেকে বাহুল্য মাত্র।

জিয়াউর রহমান সাহেব আন্তরিকভাবেই দল তৈরি করতে চেয়েছিলেন। শুনেছি দলের কাজে তিনি পার্টি অফিসেও রাত কাটাতেন। তাঁর শোবার জন্য একটি খাটিয়াও সেখানে রক্ষিত ছিল। দলের বিবাদ মিটাতে চট্টগ্রামে গিয়ে শাহাদাত বরণ করেন। আর একই জায়গা থেকে ক্ষমতার শিখরে উঠে আসা আমাদের দলের চেয়ারম্যান প্রয়োজন হলে সর্বাগ্রে দলটিকে বঙ্গোপসাগরে নিক্ষেপ করতে দ্বিধা করবেন না। দল তাঁর নিকট কেবল মুহূর্তের প্রয়োজনের বাহন। জিয়ার দল তাই তাঁর অবর্তমানেও শক্তিশালী এবং সংগঠিত। আর এরশাদ সাহেব বেঁচে থাকতেও তাঁর দল বলতে গেলে বেঁচে নেই। একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক দল ছাড়া যে রাজনৈতিক ক্ষমতায় টিকে থাকা যায় না, বা কোন রাজনৈতিক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা যায় না—এ কথা তাঁকে বুঝাতে আমরা অসমর্থ হয়েছিলাম। তাঁর আরও অনেক কাজ! কত না খেলাধুলা, দলের প্রয়োজনে সময় কোথায়! কয়েকজন আছে কেবল পার্টি পার্টি করে, ওদের তা করতে দাও।

শ্রম মন্ত্রণালয়ে শ্রমিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যোগাযোগের প্রচুর সুযোগ ছিল। দেখা গেল, শ্রমিকদের অবস্থা যা-ই হোক না কেন, নেতৃবৃন্দ বেশ বহাল তবিয়তেই আছে। কারো কারো বাহ্যিক বেশভূষা দেখে বুঝার উপায় নেই তারা বেশ শাসালো নেতা। নিয়মিত চাঁদা এবং অন্যান্য 'বিবিধ পন্থায়' তাদের রোজগার ঈর্ষাযোগ্য। অনেকেরই গাড়ি-বাড়ি আছে। ছেঁড়া সেণ্ডেল এবং গিঁট দেওয়া পাজামা পরিহিত ব্যক্তিও একান্তে 'বেনসন এন্ড হেজেস' টানে। প্রায়ই বিদেশ সফরের সুযোগ তাদের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার যেমন সমৃদ্ধ করছে, পকেটও হয়েছে বেশ ওজনদার। অবশ্য অতি সাধারণ জীবন যাপন করে, শ্রমিকদের মতো বিড়ি পান করে পরিবার ও নিজের দিকে না তাকিয়ে শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণে আজীবন সংগ্রাম করে যাচ্ছে এমন লোকও রয়েছে। এদের সংখ্যা হাতে গোনা যায়। এরা ব্যক্তিস্বার্থের উর্ধ্বে। কোন প্রলোভনেই এদেরকে নীতিবিচ্যুত করা যায় না। অত্যাচার-নিপীড়ন এদেরকে বিপথে ঠেলে দিতে পারে না। আদর্শবাদী নীতিবাগীশ এই ধরনের শ্রমিক নেতৃত্ব ক্রমশই হ্রাস পাচ্ছে।

আমার পূর্বতন মন্ত্রী শ্রমিক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদ বা 'স্কপে'র সঙ্গে এক বিশদ চুক্তি স্বাক্ষর করে গেছেন—শ্রমিকদের সম্মিলিত ধর্মঘটের হুমকির মুখে। সে চুক্তি বাস্তবায়নের দায়িত্ব পড়েছে আমার কাঁধে। চুক্তির অধিকাংশ শর্তগুলো ইতিমধ্যেই বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বাস্তবায়ন করেছে বা করছে। কিছু আইন প্রণয়নের কাজ তখনও অবশিষ্ট। 'স্কপ' জানে, এরশাদ সাহেবকে হুমকি দিলেই ফল পাওয়া যায়। দাবি ঘোষণা করে একবার তাঁর কাছে পৌঁছতে পারলেই হয়। তিনি সবই মেনে নিতে প্রস্তুত। কোন সময় এমনও হয়েছে, ওরা চেয়েছে এক শ', তিনি বলে উঠেছেন ওতে কী হবে? দেড় শ' করে দেওয়া হোক।

'স্কপে'র নতুন হুমকির মুখে এবার আমি দৃঢ় পদক্ষেপের পক্ষপাতী। প্রধানমন্ত্রী আতাউর রহমান খানও আমাকে সমর্থন করছেন। আমরা রাষ্ট্রপতিকে বুঝাতে সক্ষম হলাম, কেবল দাবি মেনে নিলেই জনপ্রিয় হওয়া যায় না। 'স্কপ' সারা দেশের কতজন মানুষের প্রতিনিধিত্ব করে? সাধারণ মানুষের ভাগ্যোন্নয়নের বিষয়ে অধিকতর মনোযোগী না হয়ে আমরা যদি একটি অংশের অবিবেচিত চাপের মুখে নতি স্বীকার করি, সেটা হবে নৈতিকতাবিরোধী এবং দুর্বলতা।

রাষ্ট্রপতি সব বুঝলেন। প্রধানমন্ত্রী এবং আমাকে সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব অর্পণ করলেন। আমরা জানতাম, কথা চলছে। অতি শীঘ্র কাজী জাফরসহ অনেকে আমাদের রাজনৈতিক বলয়ে সম্পৃক্ত হতে যাচ্ছেন। বাইরে কিন্তু তাদের আওয়াজ খুব গরম। তারা 'স্কপে'র উল্লেখযোগ্য নেতাও বটে। তাদেরকে প্রধানমন্ত্রীর বাসস্থানে বৈঠকে আমন্ত্রণ জানান হল। তারা আসবে না। রাষ্ট্রপতি ব্যতীত তারা অন্য কারো সঙ্গে সংলাপ করবে না। জনাব আতাউর রহমান খান অভিজ্ঞ রাজনীতিক। আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। বললেন, মোয়াজ্জেম, ওদের একটু শিক্ষা দেওয়া যায় না?

বললাম, স্যার, আপনার সম্মতি থাকলে ওদেরকে উপস্থিত করার ব্যবস্থা করছি।

তিনি বললেন, যা-ই কর, রাষ্ট্রপতিকে তো চেন। তিনি যেন আবার চটে না যান।

বললাম, সে ঝুঁকি তো নিতেই হবে। আপনি কেবল আমাকে দোষারূপ করবেন। যা হবার আমার উপরই হোক।

তিনি হেসে বললেন, আমাকে তুমি এতই স্বার্থপর ভাবছ? বেশ, যা ইচ্ছা হয় কর, আমি আছি তোমার সঙ্গে।

আমি খবর রাখছিলাম, ওরা কোথায় সভা করছে। পুলিশ পাঠিয়ে সব ক'জনকে ধরে নিয়ে আসা হল।

কাজী জাফর আমার ছাত্রজীবনের সহকর্মী। সে ছাত্র ইউনিয়নের নেতা

ছিল। একসঙ্গে অনেকদিন কাজ করেছি। সবাইকে ধরে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে উপস্থিত করলে হেসে বললেন, বুঝতে পেরেছি বুদ্ধিটা কার! আপনি রাষ্ট্রপতির সঙ্গে কথা বলুন, সমঝোতায় পৌঁছতে অসুবিধা হবে না।

প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে সমঝোতায় পৌঁছতে বিলম্ব হল না।

সব শুনে রাষ্ট্রপতি খুব হাসলেন। বললেন, পন্থা যা-ই হোক, ওদেরকে বসিয়ে সমঝোতা করেছেন এতেই আমি সন্তুষ্ট। জাফর তো আমারই লোক, শীঘ্র টের পাবেন।

টের পেতে বিলম্ব হল না। জাতীয় ফ্রন্ট প্রতিষ্ঠিত করে কাজী জাফর, সিরাজুল হোসেন খান, আনোয়ার জাহিদ, ব্যারিস্টার মওদুদসহ আরও অনেককে এই রাজনীতিতে সম্পৃক্ত করা হল। ব্যক্তিগতভাবে জনদলকে বিলুপ্ত করে জাতীয় ফ্রন্ট গঠন এবং পরবর্তীতে জাতীয় ফ্রন্টকে জাতীয় পার্টিতে রূপায়ণে আমি সম্মত ছিলাম না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, আর একটু চেপে ধরলে এরা নিজেদের দল বিলুপ্ত করে জনদলেই অন্তর্ভুক্ত হত। ক্ষমতার রাজনীতির অমোঘ আকর্ষণ তখন তাদের শিরায় নতুন প্রবাহ সৃষ্টি করছে। প্রধানমন্ত্রী আমাকে এ সম্বন্ধে প্রকাশ্যে কোন মন্তব্য না করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করলেন। তাকে মুরব্বী হিসাবে মানতাম। আমার বিয়ের সময় আমার বাসায় গিয়ে নিজ হাতে তিনি আমাকে বিয়ের পাগড়ি পরিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর কথা সম্ভব হলে মেনে চলতাম। এক্ষেত্রেও তা-ই করলাম। কাজী জাফর করিৎকর্মা লোক। অচিরেই মন্ত্রী, উপ-প্রধানমন্ত্রী হয়ে গেলেন এবং তার অনুসারী অনেককে মন্ত্রিত্ব এবং দলীয় পদ প্রদানে সমর্থ হলেন।

ডা. মতিন সাহেব চোখের ডাক্তার। একজন স্পেশালিস্ট। শোনা গেল সেনাবাহিনীর 'ব্লু-আইড বয়' তাদের প্রিয়ভাজন ব্যক্তি, জনদলেরও সে প্রথম মহাসচিব। জাতীয় পার্টিতেও তাকেই প্রথম মহাসচিব করা হল। তাঁর রাজনীতির বয়স ছিল বছর আটেক, যার দ্বিগুণ সময় আমাদের কারাভ্যন্তরেই কেটেছে। তাতে কী হবে! যার চোখে যাকে লাগে!

এরশাদ সাহেবের চোখেরই কেবল সে চিকিৎসক নয়, তাঁর চোখে রঙ ধরিয়ে দিতেও সে সক্ষম হয়েছিল। এই মতিন সাহেবই পরবর্তীতে তাকে প্রধানমন্ত্রী না করায় পদত্যাগ করে, বিরোধী দলের চরম আন্দোলনের মুখে প্রায় ত্রিশ জন সংসদ সদস্য নিয়ে সংসদ থেকে পদত্যাগ করে এরশাদ সরকারের ভরাডুবি তরান্বিত করেছিল এবং সরকারের পদত্যাগের পর যখন নতুন করে জাতীয় পার্টি বিরোধী দলের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়, তখন বিএনপি'তে যোগ দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে শামসুল হুদা চৌধুরীকে নিয়ে ভিন্ন রাজনৈতিক দল গঠন করে এবং সেখানেও সুবিধা

করতে না পেরে পুনরায় জাতীয় পার্টির রাজনীতিতে প্রত্যাবর্তন করে যখন এরশাদ সাহেব দীর্ঘদিন কারা নির্যাতন ভোগ করে মুক্তি পেয়ে বেরিয়ে এসেছেন।

জনাব আতাউর রহমান ছিলেন দেশের প্রবীণতম রাজনীতিবিদ। তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের আওয়ামী লীগ সরকারের মুখ্যমন্ত্রী এবং সম্ভবত শ্রেষ্ঠতম মুখ্যমন্ত্রী। প্রখ্যাত আইনজীবী, সুপণ্ডিত ও একজন লেখক হিসাবে তিনি ছিলেন সকলের অত্যন্ত শ্রদ্ধার পাত্র। সকলের সঙ্গেই তাঁর ছিল প্রীতির সম্পর্ক। দেশে সর্বদলীয় নেতা হিসাবে যদি কাউকে গণ্য করতে হয়, তা হলে তিনি ছিলেন আতাউর রহমান সাহেব। বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে তাঁকে আমন্ত্রণ জানালে সানন্দে যোগ দিতেন। কাচ্চি বিরিয়ানী পছন্দ করতেন। খাওয়ার টেবিলে আমাকে কাছে ডেকে বসাতেন এবং নিজে খাবার তুলে দিতেন। বলতেন, হাড়সহ মাংস খেও। nearer the bone, sweeter the meat.

জিয়া সাহেবের আমলে একবার তিনি বহুধা বিভক্ত বিরোধী দলের ঐক্য প্রচেষ্টায় অনশন ধর্মঘট করেন। তাঁকে দেখতে গিয়ে হেসে বলেছিলাম, স্যার, যে পরিমাণ কাচ্চির ফ্যাট আপনার শরীরের ভিতর মজুত আছে, অনশন আপনাকে সহজে কাবু করতে পারবে না। অন্য কোন পন্থা খুঁজে বের করুন!

এই আতাউর রহমান খান সাহেবকেও এরশাদ সাহেব প্রলুব্ধ করতে সক্ষম হলেন প্রধানমন্ত্রিত্বের টোপ ফেলে। তিনি মুখ্যমন্ত্রীর পদে আসীন ছিলেন। গালভরা নাম প্রধানমন্ত্রিত্ব ভালোই শোনাচ্ছিল। কিন্তু ভিতরে যে শূন্যগর্ভ সেটা জানতেন না। ক্ষমতা যা কিছু রাষ্ট্রপতির হাতে, প্রধানমন্ত্রীকে একটি পিয়ন নিযুক্ত করতে হলেও রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের প্রয়োজন হত। এমনি বিধিমালা প্রণয়ন করে নেওয়া হয়েছিল। তবুও খান সাহেব টোপটি গলাধকরণ করলেন। প্রধানমন্ত্রী হলেন, রাষ্ট্রপতি তাঁকে শপথের পর বললেন, আমাকে এরশাদ বলেই ডাকবেন, আমি আপনাকে 'স্যার' বলে ডাকব।

তিনি হাসিমুখে বলেছিলেন, আচ্ছা বাবা, তা-ই হবে।

সেই আতাউর রহমান সাহেবের প্রয়োজন শেষ হয়ে এল। প্রবীণ মানুষটি হুঁকার গড়গড়িতে টান মেরে মাঝে মাঝে সত্য কথা বলে ফেলেন। তাঁকে নিয়ে আর পোষায় না। অব্যাহতি দেওয়া হল তাঁকে। মিজান সাহেবকে করা হল পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী। টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রী। মন্ত্রণালয় যা-ই হোক, সামনে মোটর সাইকেলে সার্জেন্ট রয়েছে, বাঁশি বাজাচ্ছে রাস্তা পরিষ্কার করার জন্য। প্রধানমন্ত্রী যাচ্ছেন, পেছনে পুলিশের ভ্যান। সোজা কথা নাকি! দেশের প্রধানমন্ত্রী বলে কথা!

এই মিজান সাহেবই একসময় পৃথক জনদল গঠন করতে যাচ্ছিলেন এবং এরশাদ সাহেব তাঁকে দল থেকে বহিষ্কারের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। সেদিন 'ছাই ফেলতে ভাঙা কুলা' এই মোয়াজ্জেমকেই সংকট নিরসনে একাকী রুখে

দাঁড়াতে হয়েছিল, যার ফলশ্রুতিতে মিজান চৌধুরীর বহিষ্কারাদেশ অকার্যকর রইল এবং পরে এই মিজান সাহেব ক্ষমতার সিঁড়ি বেয়ে প্রধানমন্ত্রী এবং একসময় দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হতে পেরেছিলেন।

আমি তখন মন্ত্রী হয়েছি, খুব বেশিদিন হয়নি। জনাব আতাউর রহমান খান প্রধানমন্ত্রী, মাহবুবুর রহমান দলের মহাসচিব, ডা. মতিন, শামসুল হুদা চৌধুরী, শামসুল হক, ভোলা ভাই এবং অন্যান্য সকলেই মন্ত্রিসভায় আছেন। একটি জরুরি বৈঠক বসেছে বঙ্গভবনে, মন্ত্রিসভার সকল সদস্যই উপস্থিত। আলোচ্যসূচি মিজান চৌধুরীর দলীয় শৃঙ্খলা বিরোধী কর্মকাণ্ডের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া। মিজান সাহেব বেশ কিছুদিন যাবতই একটু ভিন্নমত পোষণ করছিলেন। সব ভেঙে বলতে চাইত না। কিন্তু সরকার এবং এরশাদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করতে দ্বিধা করত না। প্রাপ্তিযোগ হয়ত হ্রাস পেতে শুরু করেছিল। সঙ্গে জুটেছিল সাইদ তারেক। সে প্রথমদিকে জনদলের কো-অর্ডিনেটর হয়ে সংগঠনের সকল বিষয়েই প্রচুর হস্তক্ষেপ করত। স্বল্প সময়েই স্বর্গ হতে তার বিদায় হয়, ক্ষমতার বলয় থেকে তারেক অনেক দূরে ছিটকে পড়ে। অনেকে বলে, তার স্বরূপ প্রকাশ হয়ে পড়ে। সে তখন মিজান সাহেবের স্কন্ধে ভর করে। জায়গাটিকে সে নির্ভরযোগ্য বলে মনে করে।

মিজান সাহেবের সঙ্গে দলের ব্যবধান এবং এরশাদ সাহেবের দূরত্ব ক্রমাগতই বৃদ্ধি পাচ্ছিল এবং সে প্রশ্নে সাইদ তারেকের ভূমিকা বেশ উল্লেখযোগ্যই বলা চলে। অবস্থান এমন দাঁড়াল যে, মিজান সাহেব তাঁর সমমনা লোকদের এক ইফতার পার্টিতে আমন্ত্রণ জানাল দলকে দ্বিধা-বিভক্ত করার সঙ্কল্প নিয়ে। এমতাবস্থায় দলও বসে থাকতে পারে না। তার বিরুদ্ধে অবিলম্বে ব্যবস্থা না নিলে সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা।

মাহবুবুর রহমান সময় ক্ষেপণ করতে প্রস্তুত নয়—মিজান চৌধুরীকে মাঠ থেকে সরিয়ে দেওয়ার এই তো মোক্ষম মুহূর্ত। বল তো এখন তারই কোর্টে। বৈঠকে সকলেই বিস্তারিত আলোচনায় অংশগ্রহণ করল এবং প্রায় সকলেই এই অভিমত প্রকাশ করল যে, আর বিলম্ব নয় এক্ষুণি একটি ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন।

মিজান সাহেবের সাবেক দল আওয়ামী লীগের শামসুল হক সাহেব তখন তথ্যমন্ত্রী। তিনি একটিও কথা না বলে নিশ্চুপ থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ মনে করলেন। মাহবুবুর রহমান সঙ্গে সঙ্গেই মিজান চৌধুরীর বহিষ্কার আদেশ লিখে ফেলল। কলম এগিয়ে দেওয়া হল রাষ্ট্রপতিকে স্বাক্ষর করার জন্য।

আমি প্রথম থেকেই নিশ্চুপ ছিলাম। দেখি কোথাকার পানি কোথায় গড়ায়! আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল এরশাদ সাহেব একবার আমাকে জিজ্ঞেস করবেনই। আমি সবসময় লক্ষ্য করেছি, আমার অভিমত গ্রহণ করুন বা না করুন, তিনি রাজনৈতিক প্রশ্নে আমার মত সর্বদাই জানতে চান। আজও তা-

ই চাইবেন বলে আমি ধারণা করেছিলাম। হলও তা-ই। তিনি স্বাক্ষর করার আগে একবার আমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, মোয়াজ্জেম, আপনি যে বড় চুপচাপ? আপনি কী এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত নন?

আমি বললাম, না স্যার। আমি একমত নই।

সকলেই কথা বলে উঠল। অন্যদের থামিয়ে প্রেসিডেন্ট সাহেব বললেন, আপনারা আপনাদের মত দিয়েছেন, আমিও আপনাদের সঙ্গে একমত। একজন যদি ভিন্নমত পোষণ করে ক্ষতি কী? জানা যাক না, সে কি চিন্তা করছে। বলুন মোয়াজ্জেম, আপনার অভিমত বলুন।

দাঁড়িয়ে হাসিমুখে বললাম, স্যার, ভয়ে বলব, না নির্ভয়ে?

তিনি গাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশেও হেসে ফেললেন। বললেন, আপনি সব বিষয়ে এত নোক্‌তা লাগান কেন? বলুন কি বলতে চান?

আবার বললাম, স্যার, পূর্বকালে রাজাদের দরবারে নির্ভয়ে বলার অনুমতি নিতে হত। এখন রাজা নেই। রাজার স্থলে রাষ্ট্রপতি। আপনি যদি অভয় দেন যে আজ এখানে যা বলব, অন্তত এ কারণে আমার মন্ত্রিত্বটি যাবে না, তা হলে কয়েকটি কথা নির্ভয়ে বলতে পারি।

তিনি হাসিমুখে বললেন, আচ্ছা অভয় দিলাম, নির্ভয়েই বলুন।

বললাম, স্যার, আমি প্রথমেই আপনার 'প্রটেকশান' চাই, আমি এতক্ষণ চুপ করে ছিলাম। আমি যতক্ষণ বলব, অন্যরাও যেন অনুগ্রহ করে চুপ থাকেন।

তিনি সম্মতি জানালেন। আমি বললাম, স্যার, কেউ যেন বেয়াদবি মনে না করেন—এখানে আমরা সকলেই রেসে আছি। আমাদের সকলেরই একাগ্রদৃষ্টি রেসে প্রথম হয়ে কী করে প্রধানমন্ত্রীর আসনটি দখল করা যায়! আপনার রাষ্ট্রপতির আসনের দিকে বোধগম্য কারণেই কারোই নজর পড়তে পারে না। সমস্ত দৃষ্টি আমাদের ঐ প্রধানমন্ত্রীর আসনটির দিকে। সেই রেসে আমিও আছি। কিন্তু কনিষ্ঠ মন্ত্রী হিসাবে প্রতিযোগিতার দৌড়ে আমার অবস্থান সর্বশেষ পর্যায়ে। আতাউর রহমান সাহেব আজ আছেন, কাল যদি তাঁকে কোন প্রকারে ধাক্কা মেরে ফেলে দেওয়া যায়, তা হলে আসনটি শূন্য হবে এবং এখান থেকে একজন তা পূরণ করতে চেষ্টার ত্রুটি করবে না। সে প্রতিযোগিতায় মিজান সাহেব যেমন আছেন, শামসুল হুদা চৌধুরী, ডা. মতিন, মাহবুবুর রহমান প্রমুখরাও আছেন। আজ যদি মিজান চৌধুরীর মতো একজন সম্ভাবনাপূর্ণ প্রার্থীকে বের করে দেওয়া যায়, প্রতিযোগী কমে গেল। পরবর্তী প্রতিযোগীদের জন্য সেটি একটি অগ্রগতি।

কিন্তু আপনি? আপনার কি সুবিধা হচ্ছে এতে? এ বছরই প্রেসিডেন্টের নির্বাচন—আপনি তাতে আমাদের প্রার্থী। এই সময় যদি আর একটি

জনদল হয়—সেটা কি আমাদের জন্য মঙ্গলজনক হবে? জানি, আমাদের তুলনায় মিজান চৌধুরীর অংশে লোক খুব কমই থাকবে। তবুও, জনদল (এরশাদ) এবং জনদল (মিজান) নামে পরিচিত হবে। এই ব্রাকেটের সুযোগ তাঁকে দেওয়া সঠিক নয়। তিনি কেন আপনার বিরোধিতা করছেন? কী তাঁর অভিযোগ, কোথায় তাঁর সমস্যা একবার আলোচনা করে দেখলে দোষ কী? এই মুহূর্তে আমাদের পার্টির পিতার আসনে আপনি আছেন, ভাই-ভাই অনেক ঝগড়া হতে পারে, কিন্তু পিতা কী তাতে পক্ষ টানবে, না সে নিরপেক্ষ থেকে সমস্যাটি নিষ্পত্তির চেষ্টা করবে? আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ আপনি সমস্যা মিটাবার উদ্যোগ নিন। আমাদের কাউকে দিয়ে এ কাজ হবে না। এই মুহূর্তে আপনি টেলিফোনটা উঠান, তাকে বলুন ইফতার পার্টি বন্ধ করতে এবং আজই আপনার সাথে ইফতার করতে তাঁকে ডাকুন। তিনি যদি পার্টি স্থগিত করে আপনার ডাকে সাড়া দেন—সমস্যার সমাধান হবে। তা যদি না হয়, আমার কিছু বলবার থাকবে না। আপনার যা ইচ্ছা ব্যবস্থা নেবেন। ধন্যবাদ মি. প্রেসিডেন্ট।

মন্ত্রীরা সকলেই ক্রোধান্বিত, কিন্তু চুপ। ব্যারিস্টার এ.আর.ইউসুফ আমাদের এ ধরনের রাজনৈতিক বৈঠকে থাকত। সে কিছু বলার জন্য অনুমতি চাইল। প্রেসিডেন্ট সাহেব তাকে বললেন, আপনি আবার কবে থেকে জনদল করা শুরু করলেন? আমি তো জানি আপনি পার্টি করেন না।

ইউসুফ সাহেব বললেন, স্যার, আমি দল করি না ঠিকই। কিন্তু এরশাদের কাজ করি। কাজেই এরশাদের দলও করি বলতে পারেন।

প্রেসিডেন্ট সাহেব বললেন, বলুন কী বলতে চান!

তিনি বললেন, স্যার, মোয়াজ্জেমকে আমি ছোটবেলা থেকে চিনি। সে যে এত বিজ্ঞজনোচিত বক্তব্য রাখবে ভাবিনি। তাকে আমরা জানি বিপ্লবী কণ্ঠস্বর হিসাবে। আজ দেখলাম সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং প্রাজ্ঞ বক্তব্য। স্যার, আমি শুধু এটুকু বলতে চাই, শ্রমমন্ত্রীর বক্তব্যে যথেষ্ট চিন্তার খোরাক আছে। আপনার সেসব বিবেচনা করে দেখা উচিত। ধন্যবাদ মি. প্রেসিডেন্ট।

প্রেসিডেন্ট সাহেব টেলিফোন উঠিয়ে মিজান সাহেবকে লাইন দিতে বললেন।

ডা. মতিন, মাহবুব প্রমুখ আপত্তি জানাল। একজন তো প্রায় টেলিফোন চেপে ধরে।

আমার সুবিধা হল।

দাঁড়িয়ে আবার বললাম, স্যার, দেখুন, আপনার এক সহকর্মীকে আপনি টেলিফোন করবেন, এদের কত আপত্তি! আমি যা বলেছিলাম দিনের আলোর মতো পরিষ্কার।

তিনি টেলিফোনে মিজান সাহেবকে ধরলেন। ও প্রান্ত থেকে কী বলছিল

তা কিছুটা এ প্রান্তের জবাবের ধরন থেকেই বুঝা যায়। এরশাদ সাহেব তাকে ভালোভাবেই বললেন, আপনি আমার সঙ্গে রাজনীতি করতে এসেছেন, এখানে অন্য লোকের কথার কী মূল্য রয়েছে? আপনি আমার নির্দেশ শুনুন, আজই কাগজে বিবৃতি দিয়ে ইফতার পার্টি বন্ধ করুন এবং সন্ধ্যায় আমার সঙ্গে ইফতার করতে আসুন।

ও প্রান্তে মিজান সাহেব হয়ত আপত্তি তুলেছিলেন, এখন আর গিয়ে কী হবে, এই শেষ মুহূর্তে ইফতার পার্টি বন্ধ করা ঠিক হবে না।

এরশাদ সাহেব দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, আমি আপনার নেতা। আমি নির্দেশ দিচ্ছি, ইফতার পার্টি বন্ধ করে আজই আমার বাসায় আসুন। সব কথা সেখানেই হবে।

মিজান সাহেব সম্মত হতেই তিনি টেলিফোন রেখে দিলেন।

সেদিনের মতো সভা সমাপ্ত হল। এ.আর.ইউসুফ সাহেব এবং শামসুল হক সাহেব ব্যতীত সকলেই পারলে আমাকে আস্ত গিলে ফেলে। নেহাত রোজার দিন, তাই ছেড়ে দিল!

সভা থেকে বের হয়ে সোজা মিজান সাহেবের বাসায় গেলাম। সব বললাম। এও বললাম, ভুল করবেন না। লেগে থাকুন। একদিন না একদিন আপনার সঠিক মূল্যায়ন হবে।

সাইদ তারেকদের সব প্রচেষ্টা ভণ্ডুল হয়ে গেল। এরশাদ সাহেবের সঙ্গে মিজান সাহেবের সমঝোতা হয়ে গেল। ফলশ্রুতিতে একসময় তিনি প্রধানমন্ত্রী এবং পরবর্তীতে পার্টির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হয়ে কৃতজ্ঞতাস্বরূপ আমাকে প্রচুর বংশদণ্ড প্রয়োগ করতে বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করেননি।

কারো উপকার করলে অন্ততপক্ষে এটুকুও সে করবে না, এতটা কৃতঘ্ন কাউকে ভাবা উচিত নয়!

মিজান সাহেব যখন দলের মহাসচিব, মানিক মিয়া এভিনিউতে জনদলের পক্ষ থেকে এক বিশাল জনসভার আয়োজন করা হয়েছিল। সভাকে সফল করার জন্য ঐকান্তিক প্রচেষ্টার কোন ঘাটতি ছিল না। রাষ্ট্রপতি আমার এ দিকটা খুব পছন্দ করতেন এবং জনসভা হলেই আমাকে অবশ্যই বক্তৃতা দিতে বলতেন।

বায়তুল মোকাররমে যুব সংহতির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় রাষ্ট্রপতি প্রধান অতিথি। আমি ধরে নিয়েছি আমাকে বলতেই হবে। কিন্তু দলের মহাসচিব যে লিস্ট দেখাল তাতে নাম না দেখে ঠিক করলাম আজ রাষ্ট্রপতি বললেও বক্তৃতা করব না।

এক পর্যায়ে এরশাদ সাহেব বললেন, মোয়াজ্জেমকে দেওয়া হোক।

সভার সভাপতি শেখ শহীদ এসে বিনীতভাবে বলল, ভাই, আপনাকে এবার বলতে হয়। রাষ্ট্রপতির ইচ্ছা।

বললাম, আজ বলব না। যেদিন দলের মহাসচিব হব সেদিন বক্তৃতা করব।

কথাটা এরশাদ সাহেবের কর্ণগোচর হল। আমাকে ডেকে বললেন, বিপ্লবী নেতা, কী হয়েছে?

বললাম, না স্যার। আপনাকে জানাবার মতো কিছুই হয়নি।

তিনি সকলকে শুনিয়েই বললেন, আজ যদি বলতে না চান বলবেন না। কিন্তু এরপর থেকে প্রত্যেকটা জনসভায় আপনাকে অবশ্যই বলতে হবে।

মানিক মিয়া এভিনিউর মহাসমাবেশ একটু ভিন্ন ধরনের করা হল। ডায়াসের উপর মাত্র চারটি চেয়ার রাখা হল। সমস্ত মন্ত্রীদের জন্য নিচে পৃথক আসনের ব্যবস্থা করা হল। উপরে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী আতাউর রহমান খান, মহাসচিব মিজান চৌধুরী এবং আমার জন্য আসন।

চৌধুরী সাহেব দলের অফিস থেকে প্রেসিডেন্টকে টেলিফোন করে জেনে নিয়েছিলেন কারা বক্তৃতা করবে। তিনি এই চার জনের নাম দিয়েছিলেন। মিজান সাহেব বলেছিলেন, সভা যে পরিচালনা করবে তার জন্য একটি আসন থাকা প্রয়োজন।

তিনি বললেন, মোয়াজ্জেম বক্তৃতা করবে এবং সভাও পরিচালনা করবে।

প্রেসিডেন্ট সাহেবের এতখানি আস্থায় সহকর্মী বন্ধুরা খুব সন্তুষ্ট হলেন বলে মনে হল না!

দলের জেলা কমিটি গঠন নিয়ে প্রায় সর্বত্রই এক বা একাধিক গ্রুপ বা লবি দেখা যেত। সরকারি দল, এতে একটি ভালো স্থান করতে পারলে, আখের গুছাতে সুবিধা। ক্ষুধার্ত দেশের মাটিতে 'ফিস এন্ড লোভস' এর রাজনীতি অবশ্যই থাকবে। তার সঙ্গে যোগ হত উপর থেকে নেতৃবৃন্দের কল্যাণে সৃষ্ট রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব। ফলে কমিটি গঠনে তার প্রতিফলন ঘটত। অনেক জেলাতে কমিটি করার জন্য যাওয়াই যেত না। মারামারি, গোলমাল, সম্মেলন পণ্ড এসব ছিল নিত্যদিনের ঘটনা। দিনাজপুরে আমাদের আট জন মন্ত্রীকে পাঠিয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট একটি প্যানেল প্রস্তুত করার জন্য। সভাকক্ষে গিয়ে দেখি এক দফা দক্ষযজ্ঞ হয়ে গেছে। বক্তৃতা করে সার্কিট হাউসে ফিরে এসে আমরা সম্মিলিত সিদ্ধান্ত নিলাম, এখানে কর্মীদের মতামতের প্রয়োজনীয়তা নেই। এখানে গণতন্ত্র নিচ থেকে উঠে আসবে না, উপর থেকে চাপিয়ে দিতে হবে।

তা-ই করা হয়েছিল। কোন কোন স্থানে স্বয়ং প্রেসিডেন্টকে হস্তক্ষেপ করতে হত। অতি সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট। চট্টগ্রামে কমিটি করতে গিয়ে এমন অবস্থার সৃষ্টি হল যে, আমাকে জে.এম.সেন হলে যেতে দিল না আমাদের ঢাকা থেকে আগত নেতা-কর্মীরা।

বারী সাহেব, তার স্ত্রী, অধ্যক্ষা নূরজাহান বেগম, জলী রহমান প্রমুখ আমাকে একপ্রকার জোর করে আমাদের বিশ্বস্ত কর্মী শফিকুল ইসলাম বাচ্চুর বাসায় নিয়ে ওঠাল। পরিস্থিতি এত ভয়ঙ্কর ছিল যে, তারা ভয়াবহ কিছু আশঙ্কা করছিল। এমনকি আমাকে হোটেলে পাঠাতেও তারা সম্মত নয়। সকলের সঙ্গে বাচ্চুর আতিথ্য স্বীকার করে সম্মেলনে না গিয়ে পরদিন ঢাকা ফিরে এলাম। এ ধরনের অভিজ্ঞতা অবশ্য অন্য কোথাও হয়নি।

আমার নিজ জেলা মুন্সীগঞ্জে ঘটল আরও আজব কাণ্ড। যাকে কনভেনর করব বলে কমিটি টাইপ করে ঢাকা থেকে নিয়ে গিয়েছি, সেই ব্যারিস্টার কাজী কামাল সাহেব, কার প্ররোচনায় জানি না, কিছু ভাড়াটে লোক ঠিক করল তার পক্ষে স্লোগান দেওয়ার জন্য। ফলে সম্মেলনে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটল। সেখানে আর কমিটি না করে নিজে কমিটি করব বলে দায়িত্ব নিয়ে এলাম। টাইপ করা কাগজটা কাজী কামালকে দেখাতে তার বোধোদয় হল। ততক্ষণে তার ক্ষতি সে নিজেই করে ফেলেছে। আমি মনস্থির করেছিলাম, তাকে আর নয়। মুন্সীগঞ্জের গভর্নর হয়েছিল বাকশাল আমলে অ্যাডভোকেট শামসুল হক সাহেব। সে আমাদের সঙ্গেই ছিল। তাকেই আহ্বায়ক করে কমিটি করলাম। কাজী কামাল সাহেবের ক্ষমা প্রার্থনা ও কান্নাকাটিতেও আর কাজ হল না।

এরশাদ সাহেব বলেই দিয়েছিলেন মুন্সীগঞ্জের বিষয়ে আমি যা সাব্যস্ত করব—তাই হবে। কিন্তু বেশি দিন এই অবস্থা রইল না। আগের দিন আমি জনদলের পক্ষে সিরাজদিখানে বক্তৃতা করে এসেছি—আওয়ামী লীগ ও বিএনপি এবং তাদের নেতাদের বিরুদ্ধে। কোরবান আলী সাহেব সেদিনই লৌহজং-এ বক্তৃতা করেছেন জাতীয় পার্টি ও আমাদের বিরুদ্ধে। তিনি তখন আওয়ামী লীগের অন্যতম নেতা। সকালে পত্রিকা খুলে দেখি আজ তাঁর শপথ হবে এরশাদের ক্যাবিনেটে। মন্ত্রী হয়েই তিনি যোগ দিচ্ছেন জনদলে এবং যথারীতি এসেই আমিনুল ইসলামের সঙ্গে মিলে কী করে আমার গতিকে রুদ্ধ করা যায় তার প্রচেষ্টা। সঙ্গে আরও অনেকে জুটে গেল। টাঙ্গাইলের কৃতীপুরুষ, ফুলের মতো পবিত্র চরিত্র নিয়ে শালুক চিনল গোপাল ঠাকুর। সে কোরবান সাহেবের পক্ষ টানল।

পরে যখন জাতীয় পার্টি হল, তখন কাজী জাফরকে সে সহজেই পক্ষভুক্ত করতে সক্ষম হল। নির্বিবাদে দল করা এখানেও হল না। আওয়ামী লীগ পরিত্যাগ করে চলে আসার অন্যতম কারণ ছিল সেখানে কোরবান সাহেবের

সঙ্গে রেষারেষি ভালো লাগছিল না। কিন্তু কোন লাভ হল না, তিনিও এসে জুটলেন। আমি যদি যাই বঙ্গে, আমার কপাল যায় সঙ্গে।

একদিকে ভালোই ছিলাম। দেশে উন্নয়নের প্রচুর কাজ হচ্ছিল, তার সঙ্গে জড়িত থাকতে পেরে আনন্দ পাচ্ছিলাম। দলের কাজের কোন দায়িত্ব নেই, চাপও নেই। সভা আয়োজন করলে গিয়ে মেহমানের মতো বক্তৃতা করে আসি।

আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি মনে করেছিল আমাদের কোন রাজনৈতিক দল হবে না। এমনকি আমরা ঢাকায় কোন জনসভাও করতে পারব না। তার উত্তর দিয়েছিলাম শাপলা চত্বরে বিরাট জনসভা করে। সেখানে জনতার ভাষায় বলেছিলাম, 'আমরা গাঙে ভাইস্যা আসি নাই। এই দেশ যারা বানিয়েছে, আমরা তাদেরই অন্যতম। জনদলকে বৃহত্তম দলে পরিণত করব ইনশাআল্লাহ্!'

হলও তা-ই। মাঝখানটায় দল গেল জলে, ভেসে এল ফ্রন্ট, গড়ে উঠল পার্টি। জাতীয় পার্টি। তা-ই সই, নামে কি আসে-যায়। কিন্তু এখানেও 'অরিন্দম কহিলা বিষাদে।'

জাতীয় পার্টি একটি রাজনৈতিক দল, না মঞ্চ? এখানে কট্টর বামপন্থী অর্থাৎ কম্যুনিস্ট আছে। এখানে গোড়া-দক্ষিণপন্থী অর্থাৎ ধর্মীয় মতাবলম্বীরা আছে। আর আমরাও আছি—মধ্যপন্থী। লোকে রসিকতা করে বলে 'মিডলিস্ট'। ধর্ম বাদ দেওয়ার প্রশ্নই আসে না, তাকে যথার্থ মূল্যায়ন করতে হবে। জাতীয় চেতনা ও অনুভূতিকে সমুন্নত রেখে গণতান্ত্রিক সমাজ কাঠামো গড়াই ছিল এই মধ্যপন্থীদের রাজনৈতিক ধারা। এখন সব লেজে-গোবরে হয়ে গেল।

কেউ সাম্যবাদ কায়েম করতে চায়, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আন্তর্জাতিক স্বীকৃত পন্থায়, কেউ এটাকে ইসলামিক দেশ হিসাবে দেখতে চায়। আবার কেউ দুই ধারাকেই পরিহার করে পশ্চিমা গণতান্ত্রিক ধারায় একটি সমাজব্যবস্থা গড়তে উৎসুক জাতীয়তাবাদের কাঠামোয়।

নেতা এরশাদের বড় গুণ বা দোষ তিনি সকলকেই সমর্থন করেন এবং যখন যে যেটা তুলে ধরে সেটাকেই উপযুক্ত মনে করেন। লোকে বলে এটাও একটা চাল। আসলে যেনতেন প্রকারে ক্ষমতায় থাকাটাই তাঁর সব নীতির মূলনীতি। যাদের তিনি সংগ্রহ করলেন, তাদেরকে কেন সংগ্রহ করলেন তার ব্যাখ্যা পাওয়া দুষ্কর। আতাউর রহমান সাহেবকে আনলেন এবং বিদায় করলেন। অধ্যাপক ইউসুফ আলীকে আনলেন, অমর্যাদায় বিদায় করলেন। হালিম চৌধুরী সাহেব দু'হাত জোড় করে জনগণের নিকট ক্ষমা চেয়ে বিদায় নিলেন।

স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় বিরোধী পক্ষে ছিলেন বিচারপতি নুরুল ইসলাম সাহেব, যিনি বিচারপতিদের মধ্যে একমাত্র কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন। তাকে আনলেন, উপ-রাষ্ট্রপতি বানালেন আবার অব্যাহতিও দিলেন। ব্যারিস্টার মওদুদকে এরশাদ সাহেবের মিলিটারি সেক্রেটারি ব্রিগেডীয়ার ইলিয়াস ইতিপূর্বে মার্শাল ল' কোর্টের বিচারক হিসাবে সামরিক আইনে বার বছর সাজা দিল দুর্নীতির কারণে। দু'বছর জেলখাটার পর তাকে মুক্তি দিয়ে পরপর মন্ত্রী, উপ-প্রধানমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী এবং উপ-রাষ্ট্রপতি করলেন। স্বাধীনতা বিরোধী আর এক প্রখ্যাত ব্যক্তি, যাকে মুক্তিযোদ্ধারা সেই সময় পেলে ভর্তা বানিয়ে খেত—সেই মাওলানা মান্নানকেও ক্যাবিনেটে ঢুকালেন। আমাকে এবং জনাব শামসুল হুদা চৌধুরীকে পাঠিয়ে শাহ্ আজিজুর রহমানকে সম্মত করালেন দলে নেওয়ার প্রশ্নে। পরে কেন পিছটান দিলেন জানা গেল না!

এতসব কেন? 'কত রঙ্গ জানো রে যাদু, কত রঙ্গ জানো!' কথায় বলে রঙ্গ-রসে ভরপুর রংপুর।

কিন্তু এত রঙ্গ সামলানো দায়। এক-আধটা কম্যুনিস্ট সামলানো বিপজ্জনক, সেখানে একগাদা কম্যুনিস্ট ঘরে ঢুকিয়ে দিলেন। এরা দু'ভাগে বিভক্ত। এক ভাগ নতুন মুসলমান যেমন বেশি করে গরু খায়, এদেরও সে অবস্থা। কম্যুনিস্টরা যখন ক্যাপিটালিস্ট হয় তখন রাতারাতিই তা হয়ে থাকে। হক না হক কিছু বাছ-বিচার তাদের কেতাবে নেই। উদ্দেশ্যই মূল কথা, পন্থা যা-ই হোক না কেন। এরশাদ সাহেবের কম্যুনিস্টরা গরু খাওয়া নতুন মুসলমানের মতো সবকিছুতে হামলে পড়ল। অর্থ চাই, গাড়ি চাই, বাড়ি চাই, নারী চাই! অনেক অনেক চাই। চাওয়ার শেষ নেই, পাওয়ারও শেষ নেই। শুধু জায়গা মতো ভাগ দেওয়া চাই।

অন্য কম্যুনিস্টরা আদর্শ ধুয়ে জল খায়। প্রথম দলের ছিটা-ফোঁটা তাদের গায়ে এসে লাগে। বই-পুস্তক আর লিফলেট প্রকাশের সুযোগ থাকে। দুটি লাইন যদি ঢুকিয়ে দেওয়া যায়! এইসব লাল মিয়ারা বিশ্বের দিকে একবার তাকিয়েও দেখে না—সমাজতন্ত্রের সমাধি রচিত হয়ে গেছে তার উৎসেই।

তবে নব্য কম্যুনিস্টরা খুব করিৎকর্মা। সবসময় স্থান মতো ঘুর ঘুর করতে জানে, জানে কখন কোথায় কিভাবে বিশুদ্ধ তেল প্রয়োগে কাঠিন্যকে অচিরেই দ্রবীভূত করা যায়। বিশেষ গুণে গুণান্বিত এইসব কর্মী-পুরুষরা পারে না এমন কোন কাজ নেই। তাই তাদের শনৈ্ শনৈ্ উন্নতি ঠেকায় সাধ্য কার! শুধু নিজের নয়, ওদের লোক যে যেখানে রয়েছে সকলের জন্য জায়গা খুঁজে দেওয়ার মতো কাজও ওরা ভালোই পারে। যেসব অবিশ্বাস্য গুণ থাকলে সফল রাজনৈতিক ব্যবসায়ী হওয়া যায়—সবই তাদের রয়েছে। সুতরাং রাজনীতির ব্যবসায় তাদের মূলধন দ্রুত ফুলে-ফেঁপে ওঠে।

একদিকে ক্ষমতা, অন্যদিকে অর্থ—দুটিই যদি একসঙ্গে কেন্দ্রীভূত হয় তা হলে আর চাই কি? What is the price of this damned world? দুনিয়াটা কত টাকায় বিকোয়?

এতদিন যেভাবে চলছিল তা আর সেভাবে চলছে না। সবকিছুর মধ্যেই একটা ভিন্ন আঙ্গিক, ভিন্ন অর্থ দাঁড় করান হয়। জনদলের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ছিল না। লতিফ মুন্সী, আলি ইমাম, আবদুর রউফ, মোস্তাইন বিল্লাহ্ এরা এসে আমাকে ধরল দলের একটি স্বেচ্ছাসেবা ইউনিট থাকা প্রয়োজন। বললাম, দলের না হোক, তোমাদের নিশ্চয়ই প্রয়োজন। অন্য কোথাও তোমরা সুবিধা করতে পারনি, তাই নতুন সংগঠন গড়ার আগ্রহ।

তারা আমাকে সংগঠনটির আশু প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করাতে চেষ্টা করল। হেসে বললাম, আমি নিজের থেকেই এই প্রস্তাব দেব মনে করেছি। চিন্তিত হওয়ার কারণ নেই।

আমাদের একটি বৈঠক বসল রাষ্ট্রপতির বাসভবন সেনাভবনে। অন্যান্য আলোচনার মধ্যে আমি স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন গড়ার যুক্তি তুলে ধরলাম। যারা একটা কিছু প্রস্তাব এলেই বক্রদৃষ্টিতে তা বিবেচনা করে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল, একটা নতুন উৎপাতের উৎপত্তি হবে বলে তাদের ধারণা।

স্বেচ্ছাসেবক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা, রাজনৈতিক অঙ্গনে ঐতিহাসিক পদচারণা এবং সর্বোপরি অনেক নতুন কর্মীর দায়িত্ব ও পদবিতরণের সুযোগও রাজনৈতিক দলের জন্য বড় কথা। সবই তুলে ধরলাম।

প্রেসিডেন্ট সাহেব আমার যুক্তি গ্রহণ করলেন এবং স্বেচ্ছাসেবক দল গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হল। কর্মীরা যারপরনাই আনন্দিত। সেই সভাতে প্রেসিডেন্ট সাহেব এমন কতকগুলো মন্তব্য করলেন, যা আমার জন্য অত্যন্ত আত্মশ্লাঘার বিষয় হলেও আমার সহকর্মীরা মর্মাহত হল।

প্রেসিডেন্ট সাহেব বললেন, প্রতিদিন রেডিও, টিভি এবং পত্রিকা খুললে দেখতে পাই—মোয়াজ্জেম এই কথা বলেছে, সে এই সমাবেশ করেছে, ওখানে গিয়েছে, এখানে এসেছে। আপনারা সবাই কী করেন? আপনাদের সভা-সমিতির কোন খবর বা বক্তব্যের তেমন কোন শব্দ শুনি না কেন? আপনারা সব মন্ত্রিত্ব করছেন আর সে কেবল একাই রাজনীতি করছে।

কোরবান সাহেব ইতস্তত করে বললেন, আমরাও সভা করি, বক্তৃতা দিই, কিন্তু আমাদেরটা প্রকাশ হয় না।

প্রেসিডেন্ট সাহেব বিরক্ত হয়েই বললেন, এমন বক্তৃতা করে লাভ কী যা প্রকাশ হয় না?

তারপর নিজের থেকেই বললেন, অবশ্য মোয়াজ্জেম বলে ভালো। তার বক্তব্য-বিবৃতি মানুষ আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করে।

তিনি হয়ত সরল মনেই বললেন, কিন্তু আমাদের অনেকে সহকর্মীর মন থেকে গরল উপচে পড়তে লাগল।

মাঝে মাঝে তিনি এমন সব মন্তব্য করতেন যাতে সহজেই অন্যদের ঈর্ষার বিষয়বস্তুতে পরিণত হতাম। তিনি বলেই খালাস, কিন্তু তার জের টানতে হত আমাকে।

প্রেসিডেন্ট সাহেবের নির্বাচনের জন্য খুব খাটাখাটুনি করলাম। আমার স্বভাবই এই। যখন যেটা করি মনপ্রাণ দিয়েই করি, কাজ হাতে নিয়ে ফাঁকি দেওয়া আমার আসে না। সুবিধাও ছিল। স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ে থাকার কারণে সকল স্তরের স্থানীয় সরকারের জনপ্রতিনিধিদেরকে নিয়ন্ত্রণ করার একটা সুযোগ ছিল। সেটা কাজে লাগালাম। প্রতিটি বিভাগে তাদের সম্মেলন করে উদ্বুদ্ধ করলাম। সর্বশেষ জাতীয় সম্মেলন ঢাকায় আহ্বান করলাম অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে। সভায় রাষ্ট্রপতি যোগ দেবেন। তাঁকে বরণ করে নেওয়া হবে জনপ্রতিনিধিদের সমাবেশে। ঢাকা জেলার ডেপুটি কমিশনার নিজামউদ্দীন তার সহকর্মীদের নিয়ে আন্তরিকভাবে সম্মেলনকে সফল করার জন্য চেষ্টা করেছিল।

সম্মেলনের পূর্বে বুকে ব্যথা অনুভব করে সোহরাওয়ার্দীতে গেলাম চেকআপের জন্য। তারা আমাকে আর বাসায় ফিরতে দিল না। হাসপাতালে ভর্তি করে রীতিমত চিকিৎসা শুরু করে দিল। হার্টে কিসব সমস্যা রয়েছে। সবাই ভিড় করে হাসপাতালে, আমার দুশ্চিন্তা হয় যদি সম্মেলনের পূর্বে সুস্থ না হই—সম্মেলনে যোগ দেব কিভাবে!

এ সময় আমাদের মন্ত্রণালয়ের সচিব হোসাইন আহমেদ সাহেব আমার একটি উপকার করলেন। তিনি প্রতিদিন নিয়ম করে আমাকে দেখতে আসতেন। সেদিনও চেয়ার নিয়ে আমার বেডের পাশে বসে কথা বলছেন। আমি শুয়ে শুয়েই সিগারেট টানছি। তিনি হঠাৎ বললেন, স্যার, আমার একটা কথা রাখবেন?

বললাম, কী কথা না জেনে বলতে পারি না রাখা যাবে কিনা।

তিনি বললেন, স্যার, আপনার জন্য খুবই সহজ এবং উপকারী এমন একটি অনুরোধ করব যা রাখতে কোনই অসুবিধা হবে না।

বললাম, তা হলে নিশ্চয়ই রাখব।

তিনি আমার হাত থেকে সিগারেটটি নিয়ে ফেলে দিলেন। বললেন, কথা দিন আজ থেকে আর সিগারেট খাবেন না।

এক মুহূর্ত চিন্তা করলাম, কথাটা কী সারা জীবন রাখা যাবে! তারপর হাসিমুখে তার সঙ্গে করমর্দন করে বললাম, যান, কথা দিলাম, আর কোনদিন সিগারেট খাব না।

কথা রেখেছি, তারপর থেকে আর কোনদিন সিগারেট স্পর্শ করিনি। আমি তো জার্মান ফিলোসফার নই যে, বলব, To give up smoking is very easy. I have done it many times in my life.

সিগারেটের খুব একটা নেশা না থাকলেও, সভা-সমিতির মাঝে বা কাজে ব্যস্ত থাকলে প্রচুর ধূমপান করতাম। অন্য কোন নেশার বস্তু চিনি না। এমনকি যে পান, যা প্রতিটি বাংলাদেশের মানুষ প্রতিনিয়ত চিবুচ্ছে, তা আমি জীবনে একবারও খেয়ে দেখিনি। এমনকি একটা পানের বোঁটা পর্যন্ত দাঁতে কাটিনি। জীবনে একটাই নেশা—সেটা হল রাজনীতি।

প্রেসিডেন্ট সাহেব হাসপাতালে দেখতে এসে বললেন, সম্মেলন ডেকে এখানে শুয়ে রয়েছেন—এখন কী হবে?

বললাম, সম্মেলনের প্রস্তুতির সকল আয়োজন চলছে। আমি এখানে শুয়েই খেয়াল রাখছি। চিন্তা করবেন না, সম্মেলনে আল্লাহ্ চাহে তো আমি উপস্থিত হব।

তিনি বললেন, আমি তা জানি না। ডাক্তাররা না ছাড়া পর্যন্ত আপনি কোথাও যাবেন না। সম্মেলনের যা হবার হবে—আগে নিজে সুস্থ হয়ে উঠুন।

সম্মেলনের দিন সকালে ডাক্তারদের ডেকে বললাম, আমাকে ছেড়ে দিন, আমি এখন সুস্থ।

তারা বলল, আপনি সুস্থ না অসুস্থ তা নির্ধারণ করব আমরা, আপনি নন।

শেষ পর্যন্ত রফা হল, তারা আমার সঙ্গে ডাক্তার দিয়ে দু'ঘণ্টার জন্য ছুটি দেবেন। তাদেরও ধারণা সম্মেলনে যেতে না পারলে আমি আরও অসুস্থ হয়ে পড়ব।

বিশাল প্যাণ্ডেলে পুরাতন বিমানবন্দরের মাঠে সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। আমি যেমনটি চেয়েছি, ঠিক তেমনটিই করা হয়েছে। এত বিশাল আয়োজন ইতিপূর্বে কেউ দেখেনি। সমগ্র দেশের চেয়ারম্যান, মেম্বার ছাড়াও উপজেলা চেয়ারম্যান, জেলা চেয়ারম্যান, মিউনিসিপ্যালিটিসমূহের চেয়ারম্যান এবং কমিশনারগণ সে সম্মেলনে উপস্থিত ছিল। সুসজ্জিত সম্মেলন প্রাঙ্গণ সেদিন পতাকা আর সুদৃশ্য ব্যানারে সুশোভিত ছিল। মঞ্চ ছিল দেখার মতো। প্রেসিডেন্ট সাহেবকে উপহার দেওয়ার জন্য মঞ্চে রক্ষিত ছিল একটি রৌপ্য নির্মিত কৃষকদের ব্যবহারের সাইজের লাঙ্গল। লাঙ্গলই ছিল তাঁর নির্বাচনী প্রতীক।

সম্মেলনে এসে প্রেসিডেন্ট সাহেব যত না খুশি, তার চেয়েও অবাক আমাকে উপস্থিত দেখে। বললাম, স্যার, পালিয়ে আসিনি, ছুটি নিয়ে এসেছি, ডাক্তার সঙ্গে আছে।

মনে হল বাহ্যিক অন্য কথা বললেও, অন্তরে তিনি খুশিই হয়েছেন আমাকে দেখে। নিজের কথা অন্য লোকে বলা সর্বোত্তম।

রৌপ্য নির্মিত লাঙ্গলটি যখন তাঁকে অর্পণ করা হল, তিনি খুশিতে বাগ্ বাগ্ হয়ে কেবল বলে চলেছেন, করেছেন কী মোয়াজ্জেম, করেছেন কী!

বক্তৃতা করব না, ডাক্তারদের কথা দিয়েছিলাম। কিন্তু এত বৃহৎ সম্মেলনে কথা বলার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না। প্রেসিডেন্ট সাহেবও বলছেন, এসেছেনই যখন ধীরে ধীরে কিছু বলুন। আপনার বক্তৃতা না হলে সম্মেলন অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে।

বক্তৃতায় বললাম, যারা আজ এখানে উপস্থিত তারা আপনার সর্বনিম্ন স্তরের জনপ্রতিনিধি। আপনার জন্য আমরা রয়েছি। সৈন্য-সামন্ত, কর্মচারী, কর্মীর অভাব নেই। মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, দলীয় সদস্য রয়েছে অসংখ্য। তবুও, এদেরও বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে আপনার নির্বাচনে। আপনি তো ওদেরও রাষ্ট্রপতি। পয়েটামের পঙ্‌ক্তি ক'টি মনে পড়ল—বললাম, কবি বলেছিলেন,

> "কে লইবে মোর কার্য, কহে সন্ধ্যা রবি,
> শুনিয়া জগৎ রহে নিরুত্তর ছবি।
> মাটির প্রদীপ ছিল, সে কহিল স্বামী,
> আমার যেটুকু সাধ্য লইব তা আমি।"

সমস্ত সম্মেলন করতালিতে মুখরিত হল। প্রেসিডেন্ট সাহেবও মর্ম উপলব্ধি করে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন।

আমি আরও বললাম, দেশের চারদিকে একটা না-মানার আওয়াজ উঠছে, ওরা কিছুই মানতে চায় না। সম্মুখে যা আসে চিৎকার করবে, মানি না, মানি না। কেন মানেন না, কী মানেন না!

আমাদের হোস্টেলে ছিল জুব্বার আলী। পিতার নাম বন্দে আলী। সে এক মহাবিপ্লবী। সব কথায়ই নাকি সুরে বলে উঠত, 'মানি না, মানি না'।

একদিন বিরক্ত হয়ে বললাম, জুব্বার আলী, তোমার বাবার নাম যে বন্দে আলী সেটা মানো?

সে ঝোঁকের মাথায় বলে ফেলল, মানি না, মানি না।

দেশ মানে না, সমাজ মানে না, অভিভাবক মানে না, শিক্ষক মানে না। পিতা-মাতাও নাকি মানে না। পশুরাই শুনেছি মা-বোন মানে না। আজ একি অধোগতি!

কিন্তু আপনার সম্মুখে যারা বসে আছে তারা মানার দলে। তারা আল্লাহ্

মানে, তার রসুলকে মানে, ধর্মগ্রন্থ ও তার বিধানকে মানে। সমাজ মানে, তার বিধি-নিষেধ মানে, পিতা-মাতাকে মানে এবং আপনি এসব মানেন বলে আপনাকেও মানে। নতুন বাংলাদেশ গড়ব মোরা—যে গান আপনি উপহার দিয়েছেন কর্মে ও সাধনায়, তার মর্মার্থ ওরা মানে। তাই আপনার বিশ্বস্ত কর্মীরূপে ওরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এ নির্বাচন, কেবল আপনার নয়, ওদের সকলেরই নির্বাচনের দিন সেটি। তাকে সফল করার প্রত্যয় নিয়ে ওরা ফিরে যাবে যার যার কর্মক্ষেত্রে।

প্রেসিডেন্ট সাহেব উঠে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরতেই সমস্ত পাণ্ডেল একযোগে দাঁড়িয়ে তাঁর প্রতি ঐকান্তিক সমর্থন জ্ঞাপন করল।

যতটুকু আশা করেছিলাম, তার চাইতে অনেকগুণ বেশি সফলতায় সন্তুষ্ট হলাম। ফিরে গেলাম হাসপাতালে।

প্রেসিডেন্টের নির্বাচনের বহু পূর্বেই হাসপাতাল থেকে বের হয়ে কাজে ব্যাপৃত হয়ে পড়লাম। নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হল। কোন বিঘ্ন ঘটল না। শোনা গিয়েছিল, কারা নাকি পুলিং বুথ উড়িয়ে দেবে। ভোটের আগে ভাত দাও নইলে গদী ছেড়ে দাও। কত রোমাঞ্চকর স্লোগান। শব্দের ধ্বনিই কেবল ইথারে ভাসতে থাকল, বাস্তবে কিছু নজরে এল না।

প্রেসিডেন্ট সাহেব সপরিবারে ওমরাহ করতে যাবেন, নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়ায় আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে শোকর আদায় করতে। তার সমস্ত আয়োজন প্রায় সম্পন্ন। ভাবলাম, হৃদরোগ থেকে সেরে উঠেছি, আমারও আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা উচিত। প্রেসিডেন্ট সাহেবকে দ্বিধা নিয়েই টেলিফোন করলাম। তাঁর সফরের প্রস্তুতি প্রায় সম্পন্ন, এই সময় তাঁর সহগামী হতে চাওয়া কী ঠিক হবে!

বললাম, স্যার, সঙ্কোচ হচ্ছে বলতে, তবুও বলছি, ওমরাহ করতে যাচ্ছেন, আমাকে কী সঙ্গে নেওয়ার সুযোগ আছে?

তিনি আনন্দের সঙ্গেই জবাব দিলেন, নিশ্চয়ই সুযোগ আছে। আমারই উচিত ছিল আপনাকে বলা। একটা অসুখ থেকে উঠে দাঁড়ালেন। আপনি তৈরি হোন, সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

এসব ব্যাপারে তাঁর তুলনা হয় না। আমারও প্রেসিডেন্টের সঙ্গে প্রথম বিদেশ সফর, একটা নতুন অভিজ্ঞতা হবে।

জেদ্দা বিমানবন্দরে অবতরণ করতেই সেখানকার গভর্নর একজন যুবরাজ প্রেসিডেন্ট সাহেবকে স্বাগত জানালেন। সৌদির নিয়মানুসারে ফার্স্ট লেডিকে অন্য গাড়িতে নিয়ে যাওয়া হল। বিমানবন্দরের আনুষ্ঠানিকতা সেরে মোটর শোভাযাত্রা সহকারে আমাদেরকে জেদ্দাতে একটি প্রাসাদে নিয়ে যাওয়া হল। প্রেসিডেন্ট ও তাঁর পরিবারের জন্য রাজকীয় স্যুট বরাদ্দ হল। আমার জন্যও একটি বিলাসবহুল স্যুট দেওয়া হল। আমাদের অন্যতম সফরসঙ্গী ছিলেন সে সময়ের সংসদ সদস্য জনাব আমানউল্লাহ্। তাঁকেও যথাযোগ্য রুম দেওয়া হল। প্রেসিডেন্টের সহকারীদের জন্যও স্থান নির্দিষ্ট হল।

রাজপ্রাসাদে অবস্থানের অভিজ্ঞতা ছিল না। সবকিছুই অত্যাশ্চর্য মনে হচ্ছে। প্রাসাদের নির্মাণশৈলী অপূর্ব। অত্যন্ত মূল্যবান হাল্কা সবুজাভ পাথর এবং চন্দন কাঠের সংমিশ্রণে সোনার কারুকাজ করা বিশাল সে প্রাসাদের এক-একটি দরজা দেখলে বিস্মিত হতে হয়। ঐশ্বর্য এবং বিলাসিতার এরূপ সমন্বয় আর কোথাও দৃষ্টিগোচর হয়নি। সমস্ত প্রাসাদ শব্দহীন শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। স্যুটে ঢুকে দেখলাম, অ্যালকোহল ফ্রি বিয়ার থেকে শুরু করে দুনিয়ার সমস্ত কোমল পানীয় এবং ফলের রসের সমাহার। টেবিলে ফলের একাধিক ঝুড়ি। আরাম-আয়াসের বিচিত্র সম্ভারে প্রসাদটি আধুনিক রুচিতে সুসজ্জিত।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেওয়ার পর স্যার তাঁর রুমে ডেকে পাঠালেন। দেখলাম রয়েল স্যুটের অফিস ঘরে তিনি বসে আছেন।

আমাকে বললেন, কেমন দেখছেন? কেমন লাগছে?

বললাম, স্যার, এ ধরনের কিছু পূর্বে দেখিনি বলে কোন তুলনা করতে পারছি না। এক কথায় বলা যায়, অপূর্ব।

তিনি হাসলেন। বললেন, চলে যান, শোবার ঘরটা দেখে আসুন। আপনার ভাবী রয়েছে ভিতরে, অসুবিধা নেই, চলে যান।

গেলাম। ভাবী সাদকে নিয়ে সেই ঘরে ছিলেন। আমি টোকা দিতেই ঘরে প্রবেশের অনুমতি দিলেন। আমাকে দেখে তিনি হেসে বললেন, আপনার স্যার নিশ্চয়ই পাঠিয়েছে শোবার ঘর দেখার জন্য!

বললাম, তা-ই।

তিনি বললেন, শোবার ঘর দেখার পর, স্নানের ঘরটিও দেখতে ভুলবেন না।

ঘুরে ঘুরে সব দেখলাম। বিলাসিতার যত আয়োজন মানুষের কল্পনায় আসতে পারে সব কিছু সেখানে সন্নিবেশিত হয়েছে। গোছলখানাকে মনে হল হাডুডু খেলার একটি মাঠ। জরুরি অপারেশন করার জন্য যেন সমস্ত যন্ত্রপাতি সেখানে সন্নিবেশ করা হয়েছে। যতই দেখছি, কেবল অবাক হয়ে ভাবছি, এত ভোগ-বিলাস আর ঐশ্বর্যের মাঝে কী খোদাতায়ালাকে খুঁজে পাওয়ার ব্যবস্থা আছে!

মনে পড়ল, হুজুরের সময়ে যুদ্ধজয়ের পর 'মালে-গণিমত' নিয়ে কোরেশদের মধ্যে কখনও বিবাদ-বিসম্বাদ বেঁধে যেত। যুদ্ধ জয় হলে বিজিতদের সমস্ত মালামাল, উট, গৃহপালিত অন্যান্য পশু, এমনকি তাদের মেয়েদেরকেও 'মালে গণিমত' রূপে গণ্য করে নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করা হত। এই নিয়েই কোন কোন সময় সংঘাতের সূত্রপাত হত। এমনি একটি ঘটনার সময় তিনি সকলকে ডেকে বলেছিলেন, 'তোমরা সামান্য জিনিস নিয়ে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করছ! আল্লাহ্ তোমাদের জন্য মাটির নিচে এত ধন-সম্পদ রেখেছেন, তোমরা কল্পনাও করতে পারবে না। কিন্তু তখন তোমরা খোদা এবং তাঁর রসুলের পথ থেকে অনেক দূরে থাকবে।'

মনে মনে ভাবি, সে সময় কী এদের এখনই চলছে না!

পরদিন মোটর শোভাযাত্রা সহকারে আমাদেরকে মক্কা শরীফে পবিত্র কাবাগৃহে নিয়ে আসা হল। রাজকীয় নিরাপত্তা বাহিনী এবং রাজকর্মচারীরা সমভিব্যাহারে আমরা ওমরাহ্ পালনের সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করলাম। জেদ্দাতেই বাদশাহ্র পক্ষ থেকে ওমরাহ করার জন্য আমাদেরকে বিশেষ টাওয়াল এবং পাদুকা দেওয়া হয়েছিল। তাওয়াফের শেষ পর্যায়ে আমরা যখন মুলতাজিমের সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছি তখন ঘটে গেল আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা। দিনটি ছিল শুক্রবার। অগণিত লোকের সমাবেশ সেদিন। তাছাড়া বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট এসেছেন বলে মক্কা নগরীতে বসবাসরত সমস্ত বাংলাদেশীরা জুমার নামাজ পড়তে কাবা মসজিদে চলে এসেছে। হঠাৎ চারদিক থেকে 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি শুনে চমকে উঠলাম। ক'বছর পূর্বে এই কাবাগৃহে পৃথিবীর অন্যতম বিয়োগান্ত ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। প্রেসিডেন্ট সঙ্গে আছেন, চমকে তাকাতেই দেখতে পেলাম আমাদের চোখের সামনে কাবা ঘরের দরজা খুলে গেল। কাবা ঘরের দরজা খোলা অবস্থায় দেখতে পাওয়াকে মুসলমানগণ অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয় বলে বিবেচনা করে। তাই আনন্দের 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি! একটি সিঁড়ি দেওয়া হয়েছিল। প্রেসিডেন্ট সাহেব, ফার্স্ট লেডি এবং আমি পরপর ভিতরে প্রবেশ করলাম। পরে আমাদের সহযাত্রীরাও প্রবেশ করল।

ভিতরে কী দেখেছিলাম? বলতে পারব না। হৃদয় তখন উত্তাল হয়ে উঠেছিল। সে আবেগের যেমন ভাষা হয় না, ভিতরের দৃশ্যেরও বর্ণনা হয় না। নিজের অপরিসীম সৌভাগ্য বিবেচনা করে বারবার পরম করুণাময়ের দরবারে লক্ষ কোটি শুকরিয়া আদায় করছিলাম।

ছাদের দিকে সাবেক আমলের কিছু লোহা বা অন্য ধাতুর তৈজসপত্র টানানো দেখলাম। চারটি দেয়াল এবং সংলগ্ন থাম ব্যতীত আর কিছু নজরে পড়ল না। নজরে পড়ার মতো মনের অবস্থাও ছিল না। মন কান্নায় কান্নায় পূর্ণ হয়ে ছিল। এত সৌভাগ্যও আল্লাহ্ তা'আলা আমার মতো একজন পাপীর

জন্য রেখেছিলেন! প্রতি দেয়ালের সম্মুখে দু'-রাকাত করে নফল নামাজ পড়লাম রাজকীয় মুয়াল্লিমদের নির্দেশ মতো। ফার্স্ট লেডি প্রেসিডেন্ট সাহেব ও সাদকে নিয়ে প্রতিটি দেয়াল ধরে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে অনেক আকুতি জানালেন। ওমরাহ করার সুযোগ দানের জন্য এবং তাঁর ঘরের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট করার অভূতপূর্ব সৌভাগ্য প্রদানের জন্য পরম করুণাময়ের প্রতি অজস্র কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করে সদলবলে বেরিয়ে এলাম।

পবিত্র কাবা ঘর থেকে বের হলে আমাদেরকে সাফা-মারওয়াতে প্রদক্ষিণের জন্য নিয়ে যাওয়া হল। সাত বার আসা-যাওয়া করতে হয়। কিছুটা আরোহণও রয়েছে। সকল আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে ওখানেই একটি বিশেষ কক্ষে আমাদেরকে বিশ্রামের জন্য নিয়ে যাওয়া হল। নাপিত ডেকে নিয়ম পালন করা হল এবং সুশীতল পানীয়যোগে সাফা-মারওয়াজনিত ক্লান্তি দূর করা হল।

সাফা-মারওয়াতে যখন দ্রুত পার হচ্ছিলাম, প্রেসিডেন্ট সাহেব পেছনে পড়ে আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, কোন অসুবিধা হচ্ছে না তো? বুকে কোন ব্যথা অনুভব করছেন না তো?

তাঁর সহানুভূতিতে মন ভরে গেল। সামান্য কথা, কিন্তু আমাকে তা অসামান্য সন্তুষ্টি এনে দিল। তাঁকে অনেক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলাম।

তিনি একটি চমৎকার কথা বললেন, আল্লাহ্র ঘরের মেহমান আপনি, আজ আমাকে কৃতজ্ঞতা জানাবেন না। তাঁর নির্দেশ ব্যতীত আপনি, আমি কেউ এখানে আসতে পারতাম না।

কথাটা অত্যন্ত সত্য। আর একবার তা হৃদয়ঙ্গম করলাম। জুমার নামাজ আদায় করে কাবা ঘরের সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা সেরে আমরা জেদ্দাতে প্রত্যাবর্তন করলাম। আহারাদি সেরে বিশ্রাম নেওয়ার পর প্রেসিডেন্ট সাহেব বললেন, চলেন, মার্কেট থেকে ঘুরে আসি। নতুন জুতা কি এসেছে দেখে আসি, পছন্দ হলে কয়েক জোড়া জুতা আর টাই কিনব।

জানি, এ দুটি জিনিসের প্রতি অদম্য শখ রয়েছে তাঁর। জেদ্দার শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বিপণি কেন্দ্র বেশ আকর্ষণীয়। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত উত্তম পণ্যসামগ্রী এখানে পাওয়া যায়। নিরাপত্তা বাহিনীসহ তিনি সেখানে পৌঁছলে লোকজনের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল। বাংলাদেশী দু'-চার জন এগিয়ে এসে কথাও বলল। তিনি কয়েকটি দোকান ঘুরে কয়েক জোড়া ইটালির জুতা ক্রয় করে প্রাসাদে ফিরে এলেন।

পরদিন বাদশা ফাহাদের ব্যক্তিগত প্লেনে আমাদেরকে নিয়ে যাওয়া হল মদিনা মনোয়ারাতে প্রিয় নবীজির মাযার জেয়ারত এবং মসজিদে নববীতে নামাজ আদায় করার জন্য। এই প্লেনেই আমি, আমার মতে, পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরীকে দেখতে পেয়েছিলাম। বাদশার জন্য বিশেষভাবে নির্মিত

প্লেনটিতে বসবার স্থান, বিশ্রামের স্থানসহ পৃথক পৃথক ব্যবস্থা করা আছে এবং যে দুটি গ্রীক মেয়েকে হোস্টেস নিযুক্ত করা হয়েছে, তাদের একজনের কোন তুলনা হয় না। 'তিলোত্তমা' শব্দটি কেবল পুস্তকেই পড়েছি, আজ মনে হল উর্বশী, মেনকা, রম্ভা সকলের রূপ একদেহে ধারণ করে সদাহাস্য এবং লাস্যময়ী যুবতীটি এইমাত্র স্বর্গ হতে নেমে এসেছে। মনে হয়, বিশ্বকর্মা নিজ হস্তে তার যেখানে যা প্রয়োজন তা স্থাপন করে বারবার ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখেছেন কোন ত্রুটি রইল কিনা। যখন নিশ্চিন্ত হলেন অনুপম সৌন্দর্য সৃষ্টিতে আর কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হল না, তখনই কেবল তাকে ধরাধামে প্রেরণ করা হয়েছে। মেয়েটি তার নিজের রূপ-যৌবন সম্বন্ধে সচেতন। সকলেই অবাক বিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে। তা সে দেখছে এবং হাসিমুখে উপভোগও করছে। তার সঙ্গে ছবি তুললাম, আলাপ করলাম। অনেক রিয়াল বেতনে তাকে বাদশাহ্‌র নিজস্ব প্লেনে সেবার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে।

মেয়েটির রূপ-লাবণ্য যেন ঝলমল করছে। তার সৌন্দর্যের একটি স্নিগ্ধ রূপ রয়েছে। অবাক হয়ে চেয়ে দেখতে আগ্রহ থেকেই যায়। বারবার দেখে তৃপ্তি হয় না। কিন্তু কোন কুচিন্তা, কামনা-বাসনা তাকে ঘিরে জেগে ওঠে না। তার রূপের সেই স্বর্গীয় বৈশিষ্ট্যই তাকে আরও মোহনীয় এবং লোভনীয় করে তুলেছে।

প্রেসিডেন্টের এবং ফার্স্ট লেডির সঙ্গে তার কয়েকটি ছবি তুলে দিলাম। প্রেসিডেন্ট সাহেব মেয়েটির সঙ্গে আমার ছবি তুলে দিলেন। মেয়েটি বলেছিল, আমাকে কপি দেবে?

বলেছিলাম, দেব।

কিন্তু ছবি দেওয়া হয়নি। ক্যামেরা ব্যতিরেকেই হৃদয়ের গভীরে তার যে ছবি উঠে রয়েছে তা কোনদিন ভোলা যাবে না।

মদিনাতে আমরা স্বল্প সময় কাটালাম। বিশেষ ব্যবস্থাপনায় মহানবীর মাযার জিয়ারত করে, মসজিদে নববীর বেহেশতের টুকরায় কয়েক রাকাত নামাজ আদায় করে আমরা অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা সেরে গাড়িতে উঠলাম। সেখান থেকে বিমানবন্দর এবং প্লেনে করে এবার যাত্রা দাহরান শহরের উদ্দেশে। সেখানেই বাদশা তখন অবস্থান করছিলেন, তাঁর সঙ্গে দ্বি-পাক্ষিক আলোচনাও হবে দাহরান রাজপ্রাসাদে।

পারস্য উপকূলের তীরে অবস্থিত এই আরব স্বাস্থ্যনিবাসটির অদূরেই যোগাযোগ ব্যবস্থার অপরূপ সৃষ্টি সাগরের উপরে নির্মিত কজওয়ে সড়ক পরিদর্শনের সুযোগ পেলাম। এখানে যে রাজপ্রাসাদে আমাদের রাখা হল, সেটি যদি এক শত নম্বর পায় তা হলে জেদ্দার প্রাসাদ পাবে ষাট নম্বর। দুটির ব্যবধান প্রায় এ রকম। এক একবার যত খাদ্যদ্রব্য একজনের কক্ষে

সরবরাহ্ করা হয়, তা দিয়ে ডজনখানেক মানুষকে অনায়াসে পরিতৃপ্তির সঙ্গে ভোজন করানো যায়।

রাতে বাদশা আমাদের সঙ্গে তাঁর প্রাসাদে দেখা করলেন। প্রাসাদের দ্বারপ্রান্তে এসে প্রেসিডেন্ট সাহেবকে স্বাগত জানালেন এবং হাত ধরে ভোজসভায় নিয়ে গেলেন। রাষ্ট্রীয় ভোজসভায় শ' দু'য়েক অতিথি নিমন্ত্রিত ছিল। বাদশাহ সেই প্রাসাদেই অবস্থান করছিলেন। ভোজসভার আয়োজন করা হয়েছে একটা বিশাল হলঘরে। সেদিন সেটি বিশেষভাবে সজ্জিত করা হয়েছিল। চারদিকে মখমলের উপরে সাচ্চা জরীর কাজ করা পর্দা ঝুলছে। তিন দিকে টেবিল সাজিয়ে খাবার দেওয়া হয়েছে। কত প্রকারের যে খাবার তার হদিস মেলা ভার।

বাদশাহ্ বসেছিলেন মাঝখানে, একপাশে প্রেসিডেন্ট সাহেব, অন্য পাশে আমি। আমার বাম পাশে বসেছেন ক্রাউন প্রিন্স। বাদশাহ্ তাঁর কনিষ্ঠ পুত্রকে খুবই স্নেহ করেন। তাকে না নিয়ে খানা খান না। সে কারণেই চৌদ্দ-পনেরো বছর বয়েসী সেই যুবরাজ ছিল ভোজসভার সর্ব কনিষ্ঠ সদস্য।

সৌদি বাদশাহ্‌র সে ভোজসভার বর্ণনা করা কঠিন। খাদ্যের এত প্রাচুর্য এবং পদের এত বাহার কমই দেখেছি। আমার সম্মুখে ছিল এক খাঞ্চা অতি উৎকৃষ্ট খেজুর। মনে হচ্ছে খেজুরগুলো স্বচ্ছ। কি সুন্দর তার রঙ। সচরাচর এত বড় খেজুর দেখা যায় না। আমি একটার পর একটা খেজুর খেয়ে যাচ্ছি। যদিও ডায়েবেটিসের রোগী, কিন্তু এত উৎকৃষ্ট খেজুর ডায়েবেটিস মানে না। ক্রাউন প্রিন্স বিলেতে লেখাপড়া করেছেন। চমৎকার ইংরেজি বলেন। তিনি বললেন, তুমি যেভাবে খেজুর খেয়ে যাচ্ছ, ডিনার খাবে না?

বললাম, ইউর রয়েল হাইনেস, আজ মনে হচ্ছে খেজুরযোগেই আমি ডিনার সমাধা করব। এত উপাদেয় খেজুর পূর্বে কখনও খাইনি।

তিনি বললেন, তুমি খেজুর এত পছন্দ কর, তোমার স্যুটে খেজুর পৌঁছে যাবে।

বললাম, রক্ষা করুন, আমার ডায়াবেটিস রয়েছে।

তিনি খাঞ্চাটি ঈষৎ ঠেলে দিয়ে বললেন, তা হলে আর খাওয়া ঠিক না!

প্রতিটি অতিথির পশ্চাতে একজন করে খেদমদগার হাজির রয়েছে। খাবার সবই টেবিলে স্তূপীকৃত। খেদমদগার সেগুলো এগিয়ে না দিলে কেউ নিচ্ছে না।

সর্বাগ্রে প্রধান অতিথি আমাদের প্রেসিডেন্ট সাহেবকে খাবার দেওয়া হচ্ছে। তাঁর সম্মুখে খাবারের পাত্রটি ধরা হচ্ছে। তিনি কাঁটা-চামচে তুলে নেন। তারপর বাদশাহ্‌কে দেওয়া হচ্ছে। তারপর আমার পালা। শুনেছি বাদশার হৃদরোগ রয়েছে। কিন্তু তিনি তাঁর প্লেটে যা তুলে নিলেন, সেটা কমপক্ষে দু-তিন জন ব্যক্তির খোরাক। রাজকীয় প্লেট, কাঁটা-চামচ সবগুলোর

আয়তনও রাজকীয়। শিক কাবাব জাতীয় একটা খাবার ধরা হল। বাদশাহ্ দুটি কাবাব তুলে নিলেন। বিরাট সাইজের কাবাব একেবারে মাখনের মতো নরম। আমি অর্ধেকটা নিলাম। কেননা, আরও এত খাবার রয়েছে।

প্রেসিডেন্ট সাহেব খুব হিসাব করে খান। তিনি এক ফাঁকে বললেন, মোয়াজ্জেম, রাজকীয় খানা কাকে বলে দেখেছেন!

কথাটা উভয় অর্থে প্রযোজ্য।

শুধু হেসে তাঁর কথার প্রতিউত্তর দিলাম।

ক্রাউন প্রিন্স ভালোই খেলেন। তবে সকলকে টেক্কা মারলেন স্বয়ং বাদ্শাহ। যে আইটেমই আসুক, তিনি বেশ খানিকটা প্লেটে তুলে নেন। বেশ ভোজনবিলাসী বলে মনে হল।

মূল খাবারের পর ফল এল। এল শুকনো ফলের বাটি। এল আইসক্রিম। সবশেষে কফি। আমি ফাঁক পেলেই দু'-একটি খেজুর খেয়ে নিচ্ছিলাম।

খানা শেষ। হাত কেউ ব্যবহার করেনি। সবটাই কাঁটা-চামচের ব্যবহার। তারপরও এল সুগন্ধী মিশ্রিত গরম ছোট টাওয়াল। প্রয়োজন হলে হাত মোছা যাবে। বাদশা টাওয়ালে হাত মুছে দু'হাত একসঙ্গে একদিকে বাড়িয়ে দিলেন। খেদমদগার এক শিশি অতি উৎকৃষ্ট ফরাসি সুগন্ধি তাঁর হাতে ঢেলে দিল। আমাকে দিতে এলে বললাম, মাফি। প্রয়োজন নেই।

ক্রাউন প্রিন্সও সুগন্ধি ঢেলে নিলেন হাতে। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এটা পছন্দ কর না?

বলা হয়ত উচিত হয়নি, তবুও মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, আমাদের ওটা ব্যবহারের সামর্থ্য নেই।

তিনি গম্ভীর হয়ে গেলেন। আর কথাবার্তা জমল না।

ভোজের পরে উভয় তরফ থেকে সৌজন্যমূলক সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখা হল। দুই মুসলিম ভ্রাতৃপ্রতিম দেশের নেতৃদ্বয় শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছার সঙ্গে পরস্পরের ক্রমবর্ধমান বন্ধুত্বের অঙ্গীকার ব্যক্ত করলেন। মুসলিম উম্মাহ্র অগ্রগতির প্রশ্নে উভয় দেশ একযোগে কাজ করারও প্রত্যয় ব্যক্ত করল। পরদিন সকালে হবে আনুষ্ঠানিক আলোচনা, তাই বক্তৃতা দীর্ঘ হল না।

অনেক খেজুর খেয়ে ফেলেছি। ওষুধ খেতে হবে। ঘুমও পাচ্ছে। রাজপ্রাসাদে রাজকীয় খানার পর রাজবিছানায় রাজার মতো যদি একটা ঘুম না দিতে পারি তা হলে সবই বৃথা!

স্যুটে ফিরে এসে ঘুমিয়ে পড়লাম। সকালে উঠে প্রাতরাশ সেরে তৈরি হয়ে নিলাম। বাদশাহ্র সম্মেলন কক্ষে দ্বি-পাক্ষিক আলোচনা হবে। আমাদের তরফে প্রেসিডেন্ট সাহেবের পরই আমি এবং রাষ্ট্রদূত। অবশ্য আলোচনা প্রায় সবটাই প্রেসিডেন্ট সাহেব নিজেই করছেন। কনফারেন্স টেবিলে মুখোমুখি বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সৌদি পক্ষ বেশ শক্তিশালী মনে হল। বাদশাহ্কে

সাহায্য করার জন্য পররাষ্ট্রমন্ত্রী, ক্রাউন প্রিন্স, দাহরান অঞ্চলের গভর্নর এবং আরও অনেকে ছিলেন। একই রকম পোশাকে সকলকেই আমার এক রকম মনে হত। চেহারা গুলিয়ে যেত।

সৌজন্য আদান-প্রদানের পর প্রেসিডেন্ট আমাদের মতলবের কথায় এলেন। তিনি প্রস্তাবিত যমুনা বহুমুখী সেতুর কথা তুললেন। বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে এটির অতীব প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করলেন। দীর্ঘদিন ইংরেজ ও পাকিস্তানিদের শাসনের কারণে সেতুটি নির্মিত হয়নি, সে কথাও জানালেন। নিবেদন করলেন, বাংলাদেশের পক্ষে ভাই-বন্ধুদের সাহায্য ব্যতীত এত বিরাট অর্থের যোগান দেওয়া সম্ভব নয়। তাই আমাদের আরজ, সৌদি বাদশা—যিনি মুসলিম বিশ্বের অভিভাবকও বটে, যদি এই বিষয়টি বিবেচনায় নেন এবং যমুনা সেতু নির্মাণে অর্থ সাহায্য করেন তা হলে বাংলাদেশ আর কোন দেশের কাছে এ বিষয়ে সাহায্য চাইবে না। সৌদি সরকার যদি অনুগ্রহ করে এটি গ্রহণ করেন, তা হলে বাংলাদেশের এক শত মিলিয়ন মানুষ চির উপকৃত হবে এবং চিরদিন কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তা স্মরণ করবে।

বাদশাহ্ জবাব দেবার পূর্বে তাঁর দু'পাশে বসা পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও ক্রাউন প্রিন্সের সঙ্গে কিছুক্ষণ নিজেদের ভাষায় আলোচনা করলেন। পরে তাঁর বক্তব্য বললেন, দোভাষীর কাজ তাঁদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী নিজেই করছিল। বিনয়ের সঙ্গেই বাদশাহ্ বললেন, বাংলাদেশের এমন একটি প্রয়োজনীয় প্রকল্পে তাঁরা শরিক হতে পারলে খুবই আনন্দিত হতেন। বাংলাদেশ তাঁদের অত্যন্ত প্রিয় ভাইদের দেশ, তাদের প্রয়োজনে কাজে লাগতে পারলে তাঁরা নিজেদেরকে গৌরবান্বিত মনে করতেন। কিন্তু এই মুহূর্তে অন্যত্র তাঁদের কমিটমেন্ট এত বেশি রয়েছে যে, ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তাঁদের পক্ষে সাড়া দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না বলে তাঁরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

প্রেসিডেন্ট সাহেব অনেক আশা করেছিলেন, তাঁকে বেশ আশাহত দেখাচ্ছিল। বললেন, মোয়াজ্জেম, আর একবার সেতুর নামকরণ 'বাদশা ফাহাদ সেতু' করা হবে বলে দেখব?

বললাম, স্যার, চেষ্টা করে দেখুন। আর এ নাম রাখা হলে ভালোই হবে। বাংলাদেশের মানুষও সন্তুষ্ট হবে।

তিনি আবার অনুরোধ করলেন। বললেন, দেশের মানুষ এই সেতুটিকে 'বাদশা ফাহাদ সেতু' নামকরণ করতে পারলে খুবই আনন্দিত হবে।

এবারও বিনীত জবাব এল, আমরাও অত্যন্ত আনন্দিত হতাম যদি পরিকল্পনাটিতে সাহায্য করতে পারতাম। নামকরণের প্রয়োজন হত না। আমাদের যদি অন্যত্র অনেক অঙ্গীকার না থাকত তা হলে অবশ্যই ভ্রাতৃপ্রতিম দেশের জন্য আমাদের এটা করা উচিত হত। আগামী দিনে আমরা অবশ্যই

ভাইদের পাশে দাঁড়াবার চেষ্টা করব। আশা করছি অন্য কোন স্থান থেকে তোমাদের সেতু নির্মাণে অর্থের ব্যবস্থা হবে।

বিফল মনোরথ হয়েও এ সমস্ত আলোচনার টেবিলে হাসিমুখেই কথা বলতে হয়। আমরা বাদশাহ্ এবং সরকারকে অনেক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানালাম আমাদেরকে অতি উষ্ণ আতিথেয়তা প্রদানের জন্য। ওমরাহ করার সুযোগ এবং সেই সঙ্গে আল্লাহ্র ঘর কাবা শরীফের দরজা খুলে দিয়ে সৌদি বাদশা যে নজিরবিহীন সৌজন্য প্রদর্শন করে আমাদেরকে সৌভাগ্যবান করেছেন, তার জন্য তাঁকে বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানানো হল।

বাদশাহ্ও খুব সুন্দর করে জবাব দিলেন, মক্কা এবং মদিনার মসজিদ দুটি সারা পৃথিবীর মুসলমানদের সম্পদ। আমি কেবল সে দুটিকে রক্ষণাবেক্ষণ করি। যখনই মন চাইবে, তোমরা চলে আসবে। আল্লাহ্র ঘর এবং মসজিদে নববীতে তোমাদেরকে বারবার স্বাগত জানাতে পারলে আমরা আনন্দিত হব।

বিনয় আল্লাহ্ তা'আলার পছন্দের গুণ। সৌদি বাদশাহ্ তা প্রভূত পরিমাণেই আয়ত্তে রেখেছেন।

দাহরান থেকে জেদ্দা এবং বিমানবন্দর থেকেই ঢাকার উদ্দেশে রওয়ানা হলাম। রথ দেখা ও কলা বেচার দ্বিতীয়টি না হলেও আমাদের মন এই সফরে কানায় কানায় পূর্ণ ছিল। এই সফরেই আমরা পবিত্র কাবা শরীফের অভ্যন্তরে প্রবেশের সুযোগ পেয়েছিলাম। একজন মুসলমানের জীবনে এর চাইতে বড় প্রাপ্য আর কিছু হতে পারে না।

ঢাকায় এসে আবার কর্মব্যস্ত হয়ে পড়লাম। দেশের রাজনৈতিক অঙ্গন বেশ উষ্ণ হয়ে উঠেছে। এরশাদ সাহেবের বিরুদ্ধে প্রতিদিন জনমত সৃষ্টি হচ্ছিল। দেশের সাধারণ মানুষ যদিও সুখী ছিল, কিন্তু নাগরিক জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে শিক্ষিত সমাজ, ছাত্র, শিক্ষক, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী, কবি-সাহিত্যিক, শিল্পী, এমনকি সরকারি কর্মচারী এবং শ্রমিক সমাজও ক্রমান্বয়ে আমাদের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করছিল।

এরশাদ সাহেব নিজেও একজন কবি। এই নিয়েও কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে ঠাট্টা-মস্করার অভাব ছিল না। কোন সময় তিনি কবিতার আসর বসাতেন বঙ্গভবনে। বাহ্যত সরকার সমর্থক সকল কবি এসে স্বরচিত কবিতা

শুনিয়ে যেতেন। প্রতিটি কবিতা শোনাবার পরই অনেক সাধুবাদ বর্ষিত হত। কিন্তু স্বয়ং প্রেসিডেন্ট যখন তাঁর রচিত কবিতা পাঠ করতেন, তখন সাধুবাদ তোষামোদে রূপান্তরিত হয়ে প্রশংসার এমন নগ্ন প্রতিযোগিতা হত আমাদের লজ্জা না থাকলেও লজ্জায় পড়তে হত। আমরা তাঁর মন্ত্রী, 'আহা, বেশ, বেশ' করা আমাদের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে; কিন্তু বিদগ্ধ কবি সমাজ! তাদের এত উৎসাহের কারণ কী! দেশের প্রেসিডেন্ট সন্তুষ্ট থাকলে কত কী করা যায়! বিদেশে যাওয়া যায়, দেশের অভ্যন্তরে সম্মান প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়, মহানগরীতে বাড়ি নির্মাণের প্লট পাওয়া যায়। অনুগ্রহ বিতরণের অজস্র পন্থা আয়ত্তে আনা যায়।

দু'দফায় তথ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলাম। সাংবাদিক এবং শিল্পী মহলের সঙ্গে অধিকতর সম্পর্ক স্থাপনের সুযোগ ছিল। সাংবাদিকদের কথা পৃথক। তাদের অনেকেই মনে করেন তারা কেবল নেবেন, দেবেন শুধু তীর্যক সমালোচনা, সময়োচিত নিন্দাবাদ আর গোত্রভুক্ত রাজনৈতিক বিষোদগার। সুযোগ যা নেবার সেটা তাদের স্বতঃস্ফূর্ত অধিকার, সে অধিকার অর্জনে বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই। কিন্তু প্রতিদানে তাদের প্রতিষ্ঠানে স্বাগত জানাতেও অনীহা। বোধগম্য কারণেই পৃথিবীর আদিম পেশার সঙ্গে এদেরকে সমপর্যায়ে ভুক্ত করা হয়।

শিল্পী-সাহিত্যিকরা এক পৃথক জগতের মানুষ। সংস্কৃতির অনুপম ধারায় তাঁরা সর্বদা বিচরণ করে। এক মোহময় জগতে শিল্পের বিভিন্ন শাখায় নিত্য নতুন সৃষ্টি রহস্যে তারা ব্যাপৃত। সরকারের বিরুদ্ধে তাঁদেরও ক্ষোভের অন্ত নেই। এরশাদের বদান্যতায় তাঁদের আগ্রহের পরিসীমা নেই। অনুগ্রহের প্রতিদানে তাদের কিছু করণীয় নেই। কিন্তু সরকারকে বিব্রত করতে তারাও জোটবদ্ধ।

শিক্ষকদের জন্য অনেক কিছুই করা হয়েছে, তারপরও তারা আরও প্রাপ্যের আশায় আন্দোলনরত। সে আন্দোলন অচিরেই সরকার বিরোধিতায় পর্যবসিত হল।

ছাত্রসমাজের কথা উল্লেখ না করাই উত্তম। একটি সময় ছিল যখন ছাত্রসমাজকে বলা হত জীবন ও বিবেকের প্রতিভূ। সমাজের যে কোন অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে সরকারের সকল নির্যাতন-নিপীড়ন উপেক্ষা করে তারা আপসহীন সংগ্রামে অব্যাহত থাকত। ভাষা আন্দোলন, স্বাধিকার আন্দোলন এবং সর্বোপরি মুক্তিযুদ্ধে তাদের ছিল সিংহভাগ অবদান। সর্বমহল কর্তৃক প্রশংসিত ছাত্রসমাজ তখন কোন রাজনৈতিক দলের অঙ্গ হিসাবে পরিগণিত হত না। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে বহুধা বিভক্ত রাজনৈতিক দলগুলোকে জাতীয় স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ করতে তাদের ভূমিকা ছিল অগ্রণী। এখন আর সেদিন নেই। এখন ছাত্ররা রাজনৈতিক দলের ক্যাডার। তাও সশস্ত্র ক্যাডার। নেতা-নেত্রীরা যে আদেশ-নির্দেশ দেন তা-ই তাদের শিরোধার্য।

তারুণ্যের বল্গাহীন গতির সঙ্গে অবৈধ অস্ত্র আর নিরাপদ দলীয় আশ্বাস তাদেরকে বেপরোয়া, সমাজবিরোধী এবং দুষ্কৃতকারীরূপে চিহ্নিত করেছিল। চাঁদাবাজি, অস্ত্রবাজি, ছিনতাই, নারী নির্যাতন এমনকি সহপাঠিনী ধর্ষণেও তারা দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে সমর্থ হল। রাজনৈতিক দলের ব্যক্তি-বিশেষ বা অঞ্চলভিত্তিক নেতৃত্বের প্রভাবও তাদেরকে প্রভাবিত করত। রাজনৈতিক দলসমূহের উদ্যোগ, অর্থব্যয় এবং প্রলোভনেই ছাত্রসমাজ ঐক্যবদ্ধ মোর্চা গঠন করল। এরশাদকে, তাঁর দলকে অবিলম্বে হটাতে হবে।

শ্রমিক-কর্মচারীরা যা পেয়েছে এরশাদের আমলে, তাদের স্বীকারোক্তি মতেই, তা ছিল সর্বকালের রেকর্ড পরিমাণ প্রাপ্য। তা সত্ত্বেও তারাও অবস্থান নিল সরকারের বিরুদ্ধে। অনেক পেয়েছির দলভুক্ত ওদের যুক্তি কী? আমাদের অঞ্চলে একটা কথা আছে, 'বোয়াল উজায়, গজার উজায়, শোল উজায়, কৈ, শিং, টাকিও উজায়, পুঁটি, খল্‌সে কেন উজাবে না?' সমাজের সর্বস্তর থেকেই শক্ত আঘাতের প্রস্তুতি চলতে লাগল।

এ আঘাত মূলত এরশাদের বিরুদ্ধে, তাঁর দলের এবং সরকারের বিরুদ্ধে।

এতদিন পর্যন্ত মানুষ জানত এরশাদ নিঃসন্তান। সেটা কোন অপরাধ হতে পারে না। মানুষজন তা স্বাভাবিক বলেই গ্রহণ করেছিল। তাঁর পালিত কন্যার সম্বন্ধেও কোন বক্তব্য ছিল না। হঠাৎ এরশাদ সাহেব ঘোষণা দিলেন তাঁর সন্তান হবে। সবাই স্তম্ভিত হয়ে গেল। সন্তানসম্ভবা মহিলাকে দেখেই বুঝা যায়। মিসেস এরশাদকে গতকালও যারা দেখেছে, কেউ তার মধ্যে মাতৃত্বের লক্ষণ দেখতে পায়নি। অপেক্ষাকৃত রুগ্ন স্বাস্থ্যের ফার্স্ট লেডীর গর্ভে সন্তান এলে প্রতিদিনের সাক্ষাতে আমাদের তা জানার কথা। আমরা অন্ধ নই। কিন্তু লোকজনের জিজ্ঞাসার জবাবে উত্তর খুঁজে না পেয়ে নিশ্চুপ থাকতে বাধ্য হই। দেশের কোন মানুষ বিশ্বাস করল না—ঘোষণার স্বল্প দিনের মধ্যে একটি নাদুশ-নুদুশ পুত্রসন্তানের জনক বনে গেলেন এরশাদ সাহেব। আজও আমার এ সম্বন্ধে কোন সঠিক ধারণা নেই। যখন দেখি পুত্রকে নিয়ে এরশাদ সাহেব এবং তাঁর স্ত্রী কাবা ঘরের অভ্যন্তরে ঢুকছেন তখন বিশ্বাস করতেই ইচ্ছা জাগে।

তাঁর পুত্রকে নিয়ে যে শ্লোগান ওরা দিত তা কোন ভাষায় লিপিবদ্ধ করার যোগ্য নয়। ইংরেজিতে কথা রয়েছে, Power corrupts, absolute power corrupts absolutely. ক্ষমতা মানুষকে দুর্নীতিবাজ বানায়। একচ্ছত্র ক্ষমতা একচ্ছত্রভাবেই দুর্নীতিবাজ গড়ে তোলে। বহুদিন বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এক-একটি প্রবাদ সমাজে স্বীকৃত রয়েছে। মিথ্যা হলে সময়ের ধোপে তা টিকত না। বাংলাদেশেও এরশাদ সাহেব দীর্ঘসময় ধরে ক্ষমতার শিখরে অবস্থান করছেন। তাঁর উপরে কথা বলার লোক কোথাও নেই। শোনা যায়, দেশের অভ্যন্তরে এবং বৈদেশিক সংস্থাসমূহের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধীয়

যে কোন চুক্তি বা লেনদেন হোক, তাতে একটি অংশ থাকতেই হবে। অবশ্য বিশ্বস্ত ও স্নেহসিক্ত ছোট সাহেবদেরও অংশীদারিত্বের ভাগাভাগিতে উৎসাহের প্রাবল্য দেখা যেত। বড় সাহেবকে খুশি করলেই কেবল হবে না, তার ঘরও সামাল দিতে হত। ব্যাপক সর্বগ্রাসী এক অসৎ চক্রের আশু তৎপরতায় সরকারের ভাবমূর্তি দ্রুত ক্ষুণ্ন হতে লাগল। ভালো কাজের স্মৃতি অচিরেই মন থেকে মুছে যেতে থাকল। উন্নয়নের বিভিন্ন সর্বস্বীকৃত সাফল্যগুলো ম্লান হতে লাগল। এ যেন করার কথা ছিল—করা হয়েছে আর কি!

পক্ষান্তরে নিত্য নতুন কেলেঙ্কারীর গাল-গল্প চতুর্দিকে ছড়াতে লাগল। সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তিটির বিরুদ্ধে আক্রোশ স্বভাবতই সর্বাপেক্ষা বেশি। সরকারের অন্যান্য কর্তাব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কম-বেশি সমালোচনা ছিল। তবে একদল বর্ণচোরা ব্যক্তি সরকারেও দিব্যি চালিয়ে যাচ্ছিল। আবার বিরোধী দলের সঙ্গেও গভীর প্রীতির সম্পর্ক বজায় রাখত। নৈশভ্রমণে গাড়িতে বিরোধী নেতাদের প্রায়ই দেখা যেত। মাসিক মাসোহারার বরাদ্দ নিয়মিত প্রদানে ত্রুটি হত না। এরশাদ আমলের প্রথম সংসদ নির্বাচনে বিএনপি নির্বাচন বর্জন করলেও প্রাথমিকভাবে অনেক দেন দরবারের পর লং ড্রাইভের সুবাদে যথোপযুক্ত প্রাপ্তিজনিত কারণে আওয়ামী লীগ নির্বাচনে এসে বিরোধী দলের ভূমিকায় বসে ক্ষমতার বৃক্ষ থেকে নিপতিত ফল নিচ থেকে কুড়িয়ে খেতে আপত্তি করেনি। এরশাদ সাহেব জানতেন কাকে কীভাবে ম্যানেজ করতে হয়। মন্দ চলছিল না। কিন্তু দ্বিতীয় নির্বাচনে আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি উভয়ই নির্বাচন বর্জন করায় গৃহপালিত একটি বিরোধী দল তৈরি করতে গিয়ে নিজেদের বিজয়ী প্রার্থীদেরকে পরাজিত ঘোষণা করতে 'অপারেশন মানিস' অর্থাৎ ডা. মতিন এবং এই কর্মে এরশাদ সাহেবের আস্থাভাজন মন্ত্রী আনিস মিলে নিজেদের পছন্দ-অপছন্দের বিবেচনায় যে কীর্তি স্থাপন করল এবং যার ফলে এক শিখণ্ডী নেতাকে অনেক সদস্য উপহার দিয়ে এবং প্রয়োজনীয় আরও সবকিছু দিয়ে সুসজ্জিত করে বিরোধী দলে বসিয়ে দেওয়া হল—তা যেমনি ছিল দৃষ্টিকটু, তেমনি ছিল রাজনৈতিক রুচিহীনতার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

আমি কোন দলেই পড়তাম না। 'খাই দাই, ঘুড়ি উড়াই'—দলেও না। ন্যায্য কথা বলতে দ্বিধা করতাম না। এত পেয়েও সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের অকৃতজ্ঞতা আমাকে ক্ষুব্ধ করত। এদের বিরুদ্ধে বলতাম, সুস্পষ্টকণ্ঠে বক্তব্য রাখতে দ্বিধা করতাম না। এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীদেরকে বললাম, 'বিবৃতিজীবী'। তাদেরকে পরামর্শ দিলাম জাতিকে আর কুবুদ্ধি দেবেন না। হরতালকে নামকরণ করলাম 'ভয়তাল' হিসাবে, নর্তন কুর্দন সর্বস্ব দেশীয় আধুনিক পপ সঙ্গীতকে নাম দিলাম 'ব্যায়াম সঙ্গীত'। জনৈকা নেত্রীর ফিনফিনে শাড়ি পরে বন্যা উপদ্রুত অঞ্চলে প্রচারসর্বস্ব রিলিফ

প্রদানের সমালোচনা করলাম। দুই নেত্রীর মিলন নিয়ে সংবাদপত্রগুলো যখন প্রতিদিন ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন সৃষ্টির উস্কানীতে নতুন নতুন কাহিনী রচনায় মগ্ন তখন বলেছিলাম, দুই মহিলার মিলনে কিছুই হবে না। চার 'ম' অর্থাৎ মিজান, মওদুদ, মতিন, মোয়াজ্জেমকে ধরে আনার জন্য এক নেত্রী যখন কর্মীদের ঢালাও নির্দেশ দিলেন, তখন সবিনয়ে বলেছিলাম, এক মহিলা চার জন পুরুষ খুঁজতে পারে না। পুরুষদের ব্যাপারে শরিয়তে বিধান থাকলেও মহিলার পক্ষে তা একান্ত নিষিদ্ধ।

সকলেই এই সব দাঁতভাঙা জবাবে হৈ হৈ করে উঠল। অশ্লীল, কুৎসা, খিস্তি-খেউর কত কি বলে গাল দিতে দ্বিধা করল না। সহকর্মী বন্ধুরা সমর্থনে মুখ খুলল না। ঝড় একদিক দিয়ে যাওয়াই মঙ্গল। পৃথিবীর যে কোন দেশ হলে, যেখানে রাজনৈতিক হিউমারের জন্য প্রশংসিত হতাম সেখানে সম্মিলিত আক্রমণে বিপর্যস্ত হলাম। কেবল বিরোধী দল বা তাদের পত্রিকাসমূহই নয়, আমার সহকর্মীদের মধ্যে যারা বিরোধীতোষণ নীতিতে বিশ্বাসী তারাও দেখলাম গালভার করে আছেন। ক্যাবিনেট মিটিংয়ে একজন অভিযোগই করে বসলেন, মোয়াজ্জেম সাহেব বড় বেশি বলছেন। তাকে সামলানো প্রয়োজন। তা না হলে নেত্রীরা গোস্বা হতে পারেন।

নেত্রীদের জন্য দরদে তাদের কলিজা ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে! ভাগ্য ভালো আমাকে কোন জবাব দিতে হয়নি। প্রেসিডেন্ট সাহেবের পিএসও মেজর জেনারেল আতিকুর রহমান তার শুভ্র গোঁফ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন, মোয়াজ্জেম সাহেব যা বলেছেন, ঠিক বলেছেন, বরং কম বলেছেন। আরও বলা উচিত। ওরা যে ভাষায় যেভাবে আমাদের আক্রমণ করছে প্রতিদিন, মোয়াজ্জেম সাহেব তার এক-চতুর্থাংশও বলছেন না। আপনারা সবাই চুপ থেকে উভয় কূল রক্ষা করছেন। তবুও ভালো যে একজন অন্তত সত্য বলতে ভয় পান না।

তাঁর তীব্র ভাষণে সবাই চুপ করে গেল। প্রেসিডেন্ট সাহেবও তখন বললেন, আপনারা তো বলবেনই না, একজন লোক সাহস করে কিছু বলে, আপনারা তাঁর পেছনেও লেগেছেন। আপনারা আসলে চান কী আমি বুঝতে অপারগ!

কথা আর এগুয়নি। মেজর জেনারেল আতিক এবং প্রেসিডেন্ট সাহেবের প্রতি কৃতজ্ঞ হলাম। জনদলকে জাতীয় পার্টিতে রূপান্তরিত করায় উপকার কী হল হৃদয়ঙ্গম হল না। কাজী জাফরের অনেক কিছু হল বলাই বাহুল্য। মন্ত্রী, উপ-প্রধানমন্ত্রীও হলেন, সিরাজুল হোসেন খান, মোস্তফা জামাল হায়দার, আনোয়ার জাহিদ প্রমুখ মন্ত্রী হলেন। সালাহউদ্দীন কাদের চৌধুরীও দলে যোগ দিয়ে মন্ত্রী হয়েছিলেন। এরা প্রত্যেকেই নিজেদের ক্ষেত্রে প্রভূত গুরুত্বপূর্ণ। জাতীয় পার্টি ভাঙা-গড়া নিয়ে ব্যস্ত রইল—আর অন্যদিকে সরকারকে হটানোর আন্দোলন তীব্রতা লাভ করতে থাকল। দেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকেও কোন সুসংবাদ আসছিল না।

এদিকে আমাদের মধ্যে নতুন সব প্রতিভার সমাগমে প্রেসিডেন্টকে অনেক তত্ত্ব দেওয়া হল। বাঘা বাঘা রাজনীতিবিদরা অনেক পরিকল্পনা, অনেক নীতি ও পদ্ধতি নিয়ে বিতর্ক জুড়ে দিল। সংগঠন জোরদার না করে, রাজনীতিকে রাজনীতি দিয়ে মোকাবিলা না করলে কোন অবস্থাতেই শেষ রক্ষা হবে না—আমি এই মতে বিশ্বাসী ছিলাম। দেশের আপামর জনগোষ্ঠি এখনও এ সরকারকেই চায়, তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ কেবল প্রেসিডেন্ট সাহেব নন, আমরাও যদি জনসভা করতে যাই, লোক এগিয়ে আসে, মনোযোগ দিয়ে আমাদের কথা শোনে এবং সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দেয়। তবুও শহর ও রাজধানী কেন্দ্রিক নাগরিক আন্দোলনে আমরা প্রায় ধরাশায়ী। বিরোধী দল হরতালের দিন মতিঝিলে অবস্থিত 'আল্লাওয়ালা' ভবনে মহানগরী জাতীয় পার্টি এবং যুব সংহতির কার্যালয় আক্রমণ করল। কার্যালয়ে পূর্ব থেকেই পুলিশ মোতায়েন ছিল। বিরোধী দলের আক্রমণাত্মক কর্মসূচি এবং অস্ত্রবাজি এত দূর গিয়ে পৌঁছাল যে, তারা রাইফেল, বন্দুক, বোমা নিয়ে সরকারি দলের অফিস আক্রমণ করতেও দ্বিধা করল না। চিরদিন দেখেছি, সরকার আক্রমণ করে বিরোধীদের উপর, এখানে ঘটল সম্পূর্ণ বিপরীত ঘটনা। বিরোধী দলই আক্রমণ করল সরকারি দলের কার্যালয়। কার্যত ওদের সহিংস আন্দোলন এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, পুলিশ ওদের ঘাঁটাতে সাহস পেত না। ওরা নির্বিবাদে ভাংচুর, গাড়ি পোড়ান, অফিস-আদালতে অগ্নি সংযোগ করা, ব্যাংক-বীমা আক্রমণ, এমনকি পেট্রোল পাম্পে অগ্নিসংযোগের মতো নাশকতামূলক কার্যকলাপে মেতে উঠল। ওদের বাধা দেওয়ার কেউ নেই। আণবিক শক্তি কমিশনেও ওরা অগ্নিসংযোগ করল। মনে হচ্ছিল এক গভীর ষড়যন্ত্র বাংলাদেশের ভাগ্যাকাশকে আচ্ছন্ন করে আছে।

মন্ত্রীরা তাদের রুটিন কার্যকলাপে নিজেদের গুটিয়ে ফেলল। প্রচুর নিরাপত্তার ব্যবস্থা হলে তারা বৈঠক, সেমিনার বা সভা-সমিতিতে যেতে চাইতেন। তাঁদেরকেও দোষ দিয়ে লাভ নেই। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী পুলিশ বাহিনী কার্যত একটি দায়িত্বহীন, উদাসীন বা ব্যর্থ শক্তি বলে পর্যবসিত হল।

'দৈনিক পত্রিকা' নামে একটি দৈনিক খবরের কাগজের প্রকাশনা উদ্বোধন করতে গিয়ে আমি প্রেসক্লাবে ছাত্রদের বিক্ষোভের মুখে পড়লাম। ওরা আমার গাড়ির পেছনের কাঁচ ইট মেরে ভেঙে দিল এবং অস্ত্রপাতি নিয়ে আমার উপর

ঝাঁপিয়ে পড়ল। অসীম সাহসে ভর করে, আমার ব্যক্তিগত নিরাপত্তাকর্মীদের বিবেচনা ও বুদ্ধির ফলে এবং আমার সঙ্গী দলীয় কর্মীদের দুর্ভেদ্য ব্যূহ রচনা করায় ওরা সেদিন আমাকে আঘাত করার সুযোগ পায়নি। অসংখ্য সাংবাদিক তাদের ক্লাবে বসেই সে ঘটনা প্রত্যক্ষ করল। তাদের ক্লাবেরও ক্ষতি সাধিত হয়েছিল। এক শত গজ দূরে দণ্ডায়মান পুলিশের বক্তব্য ছিল, ওখানে তাদের ডিউটি ছিল না।

পরদিন সংবাদপত্র পাঠ করে বিস্মিত হলাম, আক্রমণের ফলে আমি পালিয়ে না গিয়ে যে রুখে দাঁড়িয়েছি তাতে তারা নাখোশ। ছাত্ররা মারতে এসেছিল, মার খেলে কি এমন অসুবিধা হত! ছাত্ররা যে কত বড় অন্যায় করেছে, আমার গাড়ি ভেঙেছে, প্রেসক্লাবের ক্ষতি সাধন করেছে, আমার যে প্রাণের সংশয় ছিল—এসব কোন ধর্তব্যের বিষয় নয়। ধর্তব্যের বিষয় তথ্যমন্ত্রী তার প্রিয়ভাজন ব্যক্তি কর্তৃক প্রকাশিত খবরের কাগজ উদ্বোধন করতে গিয়ে মোটেই ভালো কাজ করেননি। খুলনার মিয়া মুসা হোসেন আমার সঙ্গে দীর্ঘদিন কাজ করছে। তার সম্পাদনায় দৈনিক পত্রিকা প্রকাশের আয়োজন করা হয়েছিল। আমরা দু'জনেই সরকারি দলের, ওদের ভালো লাগতে পারে না। ক্যাবিনেট বৈঠকেও এরশাদের প্রিয়ভাজন যোগাযোগমন্ত্রী আনোয়ার হোসেন মঞ্জু বলল, মোয়াজ্জেম ভাই ছাত্রজীবন থেকে আমার নেতা। তিনি আক্রান্ত হবেন এটা ভাবাই যায় না। তার সবকিছু বিবেচনা করে এবং প্রস্তুতি নিয়েই ওখানে যাওয়া উচিত ছিল।

বললাম, আমি একটি অনুষ্ঠান উদ্বোধন করতে গিয়েছিলাম, যুদ্ধ করতে নয়। আর যুদ্ধ করে ওদের পরাস্ত করে এলে তুমিই সর্বাগ্রে বলতে সর্বনাশ হয়ে গেল, আর সরকার টিকানো যাবে না। এক শত গজের ব্যবধানে দণ্ডায়মান পুলিশবাহিনী এগিয়ে আসে না—সরকারের অস্তিত্বের কোন প্রমাণ আছে?

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নাখোশ হলেন। বললেন, আপনি কেবল পুলিশকে দোষারোপ করছেন কেন?

প্রেসিডেন্ট সাহেবই জবাব দিলেন, দোষারোপ নয়, যা ঘটছে তা-ই সে বলেছে। বলা হয়েছিল, পুলিশকে 'এরশাদাইজড্' করে ফেলা হয়েছে। এই তার নমুনা?

কর্তার মুখের উপরে মানুষটিকে বড় একটা কথা বলতে দেখা যায় না।

এরশাদ সাহেব বললেন, কিছু একটা করা দরকার, এভাবে চলে না। তিনি কী করবেন বুঝে উঠতে সময় লাগল না। যা পারেন, দলের মহাসচিব বদলাতে। তা-ই হয়ত করবেন। যে যেখানে যেভাবে রয়েছে সব ঠিক থাকবে। একজন ব্যক্তিকে একটি বিশেষ পদ থেকে সরিয়ে দিয়ে আর

একজনকে তার স্থলাভিষিক্ত করে দায়িত্ব শেষ। এ প্রক্রিয়ায় লোক তিনি কম পরিবর্তন করেননি। একসময় মহাসচিব হতে চেয়েছিলাম ঠিকই, কিন্তু আমার পূর্বে যারা পদটি অলঙ্কৃত করে গেছেন তাদের পদাঙ্ক আর অনুসরণের বাসনা নেই।

প্রেসিডেন্টই দলের চেয়ারম্যান। দু'-একদিন পরই এক সন্ধ্যায় তিনি আমাকে ডেকে পাঠালেন। '৮৭ সালের জুলাই মাসের ঘটনা। গিয়ে দেখি দলের মহাসচিব মাহমুদুল হাসান সাহেব মুখ কালো করে বসে আছেন। আমি এসেছি খবর পেয়ে, স্যার আমাকে ভিতরে ডেকে পাঠালেন। যেতেই বললেন, মোয়াজ্জেম, আপনাকে দলের দায়িত্ব নিতে হবে। আজ থেকে আপনি মহাসচিব।

সবিনয়ে বললাম, স্যার, যখন দল শুরু করেছিলেন, তখন এই ভাবেই বলেছিলেন, হয়নি। মাঝখানেও একবার আদেশ স্বাক্ষর করেছিলেন। তাও হয়নি। এবার আবার কী করতে যাচ্ছেন?

তিনি বললেন, এবার আমি সিরিয়াস। দলের দায়িত্ব আপনাকেই নিতে হবে। এক্ষুণি আমি সই করব। মাহমুদকে এনে বসিয়ে রেখেছি।

বললাম, স্যার, আমার এখন মহাসচিব হওয়ার আগ্রহ নেই। মাহমুদ সাহেবকেই কাজ চালাতে বলুন। আমি সব মহাসচিবকেই সহযোগিতা করেছি। মাহমুদ সাহেব যদি চান তাকেও সহযোগিতা করব। দলের এই ক্রান্তিলগ্নে তাকে ব্যর্থতার গ্লানিসহ বিদায় করা ঠিক হবে না। তার মাধ্যমেই দলকে অধিকতর কার্যকর করা যেতে পারে।

তিনি একটু অধৈর্য হলেন বলে মনে হল। বললেন, শেষ পর্যন্ত আপনিও ভয় পেলেন? আমি মনে করেছিলাম, একজন অন্তত আছে যে ভয় পাবে না।

আমার অহঙ্কারে তিনি জেনেশুনেই আঘাত করলেন। তিনি ভালো করেই জানেন, ভয় আমি একটু কমই পেয়ে থাকি।

একটু দম নিলাম। তারপর বললাম, স্যার, ভয়ের কারণে নয়, দলের শুভ চিন্তা করেই এই মুহূর্তে আমি পরিবর্তনের বিপক্ষে। কিন্তু ভয়ের খোঁটা দিয়ে আপনি একদিকে ভালোই করেছেন। আমি মনস্থির করলাম, ইনশাল্লাহ্ দায়িত্ব নেব।

তিনি উঠে এসে আমাকে গভীর আন্তরিকতায় জড়িয়ে ধরলেন এবং বললেন, আমি জানতাম আপনি আমাকে নিরাশ করবেন না। আপনার উপরই আমি ভরসা করে আছি।

তিনি মাহমুদ সাহেবকে ভিতরে ডাকলেন এবং ফাইল নিয়ে সই করে দিলেন। সেই মুহূর্ত থেকে জাতীয় পার্টির মহাসচিব হলাম।

রাষ্ট্রপতিকে নিবেদন করলাম, স্যার আমার কয়েকটি কথা বলার ছিল। যদি অনুমতি দেন, মাহমুদ সাহেবের উপস্থিতিতেই বলি।

তিনি বললেন, স্বচ্ছন্দে বলুন।

বললাম, আমার প্রথম কথা, আমাকে কাজে স্বাধীনতা দিতে হবে। যদি ভুল করি শুধরে দেবেন, কিন্তু কাজের ফলাফল বিচার না করে অন্যের হস্তক্ষেপ আমার কাম্য নয়। দ্বিতীয় কথা, আমাকে কোন প্রশ্ন করতে হলে, কৈফিয়ত চাইতে হলে বা যে কোন আদেশ-উপদেশ দিতে হলে আপনি নিজে দেবেন। আপনার মুখের ঝাল আমি অন্যের মুখে চাখতে চাই না। আর তৃতীয়ত, অন্য মহাসচিবদের মতো দল চালাবার টাকা আমি হাত পেতে নেব না। আপনার নিজস্ব লোক থাকবে, যেখানে যা নির্দেশিত হবে দেবে। কিন্তু কোন ক্রমেই টাকা-পয়সার দায়-দায়িত্ব আমি নেব না। অর্থই যত অনর্থের মূল।

দৃশ্যত তিনি খুব খুশি হলেন। বললেন, আর কিছু বলার আছে আপনার?

বললাম, আজকের মতো এটুকুই বলবার ছিল। ক্রমশ আরও হয়ত বলব।

তিনি বললেন, আপনার সব কয়টি কথা আমি মেনে নিলাম। আমি এমন একজনকেই চাচ্ছিলাম যে স্বাধীনভাবে কাজ করে দেখাবে, আমাকে জড়াবে কম। আমি দোয়া করছি আপনি যেন কামিয়াব হন।

অনেক কাজ পড়ে আছে। তাড়াতাড়ি বের হয়ে বাসায় এসে কর্মীদের সংবাদ দিলাম। রেডিও, টিভি এবং পত্রিকায় প্রেসিডেন্ট সাহেবের ওখান থেকেই খবর চলে গেছে। আগামীকাল সন্ধ্যায় অফিসে যেতে হবে এবং যাওয়ার মতো যেতে হবে। বাংলায় যদিও কথা রয়েছে, যার শেষ ভালো তার সব ভালো। কিন্তু ইংরেজিতে আছে—Morning shows the day. প্রভাতই দিনটির পরিচয় দেয়। তাই ভাবলাম শুরুতেই খানিকটা চমক সৃষ্টি করা দরকার। বলে দিলাম, আগামীকাল সন্ধ্যায় দলের কার্যালয়ে কর্মী-সভা, কোন সম্বর্ধনা নয় এবং পরের দিন ঢাকা মহানগরীতে জাতীয় পার্টির উদ্যোগে এক বিশাল শোভাযাত্রা বের করব—নাশকতামূলক বিরোধী রাজনীতির বিরুদ্ধে, শান্তি ও সমৃদ্ধির পক্ষে।

দলের জন্মলগ্ন থেকেই কর্মীরা মনেপ্রাণে চাইত আমি যেন দলের মহাসচিব হই। আজ বিলম্বে হলেও সে আশা পূর্ণ হওয়াতে তারা আর একবার আশান্বিত হয়ে উঠল। এবার দল হবে এবং রাজনীতি করা যাবে। নিমেষে খবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। মোয়াজ্জেম ভাই মহাসচিব হয়েছে এবং হয়েই শোভাযাত্রার প্রোগ্রাম করেছে। চারদিকে সাজ-সাজ রব পড়ে গেল। দু'জন পিএ'কে লাগিয়ে যতজনের টেলিফোন রয়েছে কথা বললাম, সহযোগিতা ও দোয়া চাইলাম। আমাকে সফলতায় পর্যবসিত করার ওয়াদা তাঁদের নিকট থেকে আদায় করলাম।

দলীয় সহকর্মীদের আগামীকালের কর্মী-সভার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিলাম।

মন্ত্রিসভার সহকর্মীদের কথাও জানা গেল। অধিকাংশ সদস্যই সন্তোষ প্রকাশ করেছে এই বলে যে, রাজনীতি এখন একজন রাজনৈতিক ব্যক্তির হস্তেই সঁপে দেওয়া হয়েছে। শুনলাম কাজী জাফর সাহেব খুবই নাখোশ হয়েছেন এবং আমার মহাসচিব হওয়াকে মন্তব্য করেছেন, Last nail in the coffin of Jatiya Party—বলে। তাঁর মতে আমার নিয়োগ জাতীয় পার্টির কফিনে শেষ লৌহশলাকা। তাকেও টেলিফোন করে সহযোগিতা কামনা করলাম। আমার সাথে সরাসরি আলাপে কেউ এদিক-সেদিক বলবে না, জানা কথা। তাছাড়া সেও অভিজ্ঞ রাজনীতিক। 'মনের কথা গোবিন্দ জানে' এই কথা সেও বিশ্বাস করে।

পরদিন সমস্ত দিন কেবল যোগাযোগ করলাম। আমাদের যে সব পকেট আছে, যেসব জায়গায় ঘাঁটি আছে বা আমার এলাকা বিক্রমপুরের লোক রয়েছে সেসব স্থানে নিজেই ঘুরলাম। সবাইকে অনুরোধ করলাম, আমার প্রথম কর্মসূচি বাস্তবায়িত করতে হবে। এজন্য আমি একটি পয়সাও দল থেকে নেব না—তাদেরকেও দেব না। আমার দিকে তাকিয়ে তারা কী একটি দিন দলের কাজে নিঃস্বার্থভাবে ঝাঁপিয়ে পড়বে না?

সকলেই আমার ব্যক্তিগত উপস্থিতিতে আনন্দিত হল এবং উৎসাহিত বোধ করল। কথা দিল, টাকা-পয়সা যা লাগে তারা বহন করবে। প্রথম শোভাযাত্রাকে দারুণভাবে সফল করতে হবে। এটা যেন ইতিহাস হয়ে থাকে। সূত্রাপুর, বাংলাবাজার, শ্যাম বাজার, গেণ্ডারিয়া, সদরঘাট, ওয়ারী, কমলাপুর, মোহাম্মদপুর, ইসলামপুর, মীরপুর এ সমস্ত জায়গায় সারাদিন দৌড়ালাম।

তাজুল ইসলাম চৌধুরী ছিল দফতর সম্পাদক। তাকে সমস্ত অঙ্গ সংগঠন ও মহানগর কমিটির সাথে লাগিয়ে দিলাম। কমিশনারদের সঙ্গে নিজে কথা বলে দায়িত্ব দিলাম। সকলেই সন্তুষ্টচিত্তে এগিয়ে আসার প্রতিশ্রুতি দিল।

বলেছিলাম, কোন সম্বর্ধনা নয়, কিন্তু অফিসে গিয়ে মন ভরে গেল। কর্মীরা এসেছে ঈদের খুশি নিয়ে। প্রায় সকলের হাতেই মালা বা ফুলের তোড়া। মালা নিচ্ছি, খুলছি, আবার গলা ভরে উঠছে। মালা যে কত এল তার হিসাব নেই। অনেকের চোখে আনন্দাশ্রু। অভিভূত হয়ে গেলাম। এত ভালোবাসা এদের রক্ষিত ছিল আমার জন্য!

ফুল-মালার পর্ব শেষ হতে সময় লাগল। মাইক টেনে এনে এক আবেগময় বক্তৃতায় কর্মীদের শপথ করালাম, জীবনকে বাজি রেখে হলেও আজ থেকে দলের পতাকা উর্ধ্বে তুলে রাখতে হবে। যার দল নেই, তার বল নেই। জিজ্ঞেস করলাম, আমাদের কী দল নেই? আমাদের কী বল নেই?

ওরা সমস্বরে চিৎকার করে উঠল, আছে আছে।

সাহসে বুক বেঁধে নতুন উদ্দীপনা নিয়ে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার ঝিলিক দেখতে পেলাম প্রতিটি কর্মী ভাই-বোনদের চোখে। বললাম, এতদিন

কর্মীদের কথা কেউ বলার ছিল না। মন্ত্রীদের দফতরে ছিল না তাদের কোন মর্যাদা। আজ থেকে কর্মীদের প্রতিটি ন্যায্য দাবি পূরণ করতে হবে। মনে রাখতে হবে, সবার উপরে দল বড়। দল সমর্থন না করলে মন্ত্রিত্ব থাকতে পারে না।

কর্মীরা আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠল। কথাগুলো আমি ইচ্ছা করেই বললাম। প্রথমত, দলে মন্ত্রীদের অধিকতর সক্রিয় করে তুলতে চাই। দ্বিতীয়ত, কর্মীদের সম্মানজনক মূল্যায়ন করা আশু প্রয়োজন। সকলে মন্ত্রী হবে না, তাই বলে দলের কর্মীদের মূল্য কিছু কম হতে পারে না।

বায়তুল মোকাররমের দক্ষিণ গেটে শোভাযাত্রার জন্য সমবেত হলাম। শত শত ব্যানার, প্রেসিডেন্টের অগণিত ছবি, ফেস্টুন আর না বলা সত্ত্বেও অনেক বাদ্যযন্ত্রের সমারোহ দেখা গেল। সব মিলে একটা জাঁকজমকপূর্ণ আনন্দ মিছিলের রূপ লাভ করল। আশাতীত জনসমাগমে দলের সম্ভাবনাময় ভবিষ্যত কল্পনায় মন আনন্দে ভরে উঠল। প্রারম্ভিক বক্তব্য শেষে মিছিলের অগ্রভাগে অবস্থান নিয়ে সুশৃঙ্খল সেই ঐতিহাসিক শোভাযাত্রাটিকে নিয়ে এগিয়ে চললাম। বিশাল সেই মিছিলে শত শত মহিলাও অংশ নিয়েছিল। মন্ত্রীরাও কেউ কেউ মিছিলে যোগ দিয়েছিল।

বায়তুল মোকাররম থেকে শুরু করে বিজয়নগর, মগবাজার, বাংলা মোটর হয়ে ভিআইপি রোড অতিক্রম করে পায়ে হাঁটা সে দীর্ঘ শোভাযাত্রার পরিক্রমা শেরে বাংলা নগরে মানিক মিয়া এভিনিউতে শেষ হলেও সুদীর্ঘ মিছিলের আনন্দানুভূতি, উল্লসিত জয়ধ্বনি আর বিচিত্র সব বাদ্যযন্ত্রের কারণে কোন ক্লান্তি আমাদেরকে স্পর্শ করল না।

প্রেসিডেন্ট সাহেবের রাজধানীর বাইরে একটি প্রোগ্রাম ছিল। তিনি রওয়ানা হয়েছিলেন। মোবাইল টেলিফোনে সংবাদ পেলেন, সকল দলের সকল মিছিলকে ম্লান করে দিয়ে জাতীয় পার্টির সর্ববৃহৎ শোভাযাত্রা বের হয়েছে তাঁর প্রতিকৃতিসহ। খবরটি বিশ্বাস করতে তাঁর দ্বিধা হচ্ছিল। তিনি বারবার বলছিলেন, মাত্র একদিন হল নতুন মহাসচিব করা হয়েছে—এটা কি করে সম্ভব!

তাঁর লোকজন মিছিলেই ছিল। তারা তাঁকে হলপ করে বলল, এত বৃহৎ, এত শৃঙ্খলাপূর্ণ এবং আনন্দময় মিছিল তারা পূর্বে কখনও প্রত্যক্ষ করেনি।

প্রেসিডেন্ট সাহেব তাঁর গাড়ির পথ ঘুরাতে বললেন। প্রোগ্রাম বাতিল। শোভাযাত্রা দেখতে হবে। ওয়াসা বিল্ডিংয়ের সম্মুখ দিয়ে যখন দীর্ঘ মিছিলটি দীপ্ত পদভরে এগিয়ে চলেছে, হঠাৎ প্রেসিডেন্ট সাহেবের গাড়ি উল্টা দিক থেকে এসে দাঁড়াল। শোভাযাত্রার কলেবর দেখে তিনি অভিভূত হয়ে গেলেন। গাড়ি থেকে নেমে মিছিলের নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে এলেন। মিছিলের আনন্দ আর ধরে না। মুহুর্মুহু 'প্রেসিডেন্ট এরশাদ জিন্দাবাদ', 'জাতীয় পার্টি

জিন্দাবাদ', 'নাশকতার রাজনীতি বন্ধ কর, বন্ধ কর' প্রভৃতি শ্লোগানে সমস্ত রাজপথ মুখরিত হল। প্রেসিডেন্টকে মিছিলে পেয়ে কর্মীরা যারপরনাই উল্লসিত। প্রেসিডেন্ট সাহেবের হাসি ধরে না। আমাকে জড়িয়ে ধরেই তিনি হাঁটছেন আর বারংবার জিজ্ঞেস করছেন, কী করে এটা করলেন? কী করে এমন অভূতপূর্ব শোভাযাত্রা সফল হল? আমি তো একটি পয়সাও দিইনি!

তাঁর কোন কথারই জবাব দেবার প্রয়োজন ছিল না। হাসিমুখে তাঁর বাহুবন্ধনেই এগিয়ে চললাম। শোভাযাত্রার শেষ সীমা পর্যন্ত তিনি সকলের সঙ্গে হেঁটে গেলেন, শ্লোগানও দিলেন। তাঁর জীবনের বোধহয় প্রথম মিছিলে সমাপনী বক্তব্যও তিনি রাখলেন। সকলকে মোবারকবাদ দিলেন—তাঁর মহাসচিব নির্বাচন সঠিক হয়েছে উল্লেখ করলেন। নিজেই শ্লোগান দিয়ে মিছিলের সমাপ্তি ঘোষণা করলেন।

সাফল্যজনকভাবে প্রথম কাজটি সমাধা করতে পেরে মন আনন্দে নেচে উঠল। ঢাকা মহানগর জাতীয় পার্টির সভাপতি অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল আবদুল মালেক ছিলেন একজন নিবেদিতপ্রাণ, খোলামনের উচ্ছলিত কর্মী-পুরুষ। বিশাল হাসি আর একমুখ পান নিয়ে তিনি প্রতিটি দলীয় কাজে আমাকে সার্বক্ষণিক সহযোগিতা দিয়েছেন। একসময়ে খালেদ মোশাররফের সহযোগী মালেক সাহেব এখন আমার কেবল বিশ্বস্ত সহকর্মীই নন, দলের প্রতিটি সাফল্যজনক কর্মসূচিতে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। একজন সফল ব্যবসায়ী, ঢাকার মেয়র এবং মন্ত্রী মালেক সাহেব দলের জন্য অর্থব্যয়ে কার্পণ্য করেন না। তিনি এবং মহানগরের সাধারণ সম্পাদক মীরপুরের এস. এ. খালেক সাহেব আমাকে মহাসচিব হওয়ায় মীরপুরে এক প্রেক্ষাগৃহে একটি অভিনব সম্বর্ধনা দিলেন।

আমার কথা ছিল কোন সম্বর্ধনার প্রয়োজন নেই। কাজের সফলতাই আমার সম্বর্ধনা। তারা আমাকে একটি কর্মী-সভায় যোগ দেওয়ার নাম করে এক ফুল ও মালার সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করলেন। ডায়াসে তাঁদের দু'জনার মাঝখানে দাঁড়াতেই আজানুলম্বিত এক-একটি ফুলের মালা এসে কণ্ঠে জমা হতে লাগল। প্রতিটি কমিশনার এবং ওয়ার্ডের জাতীয় পার্টির নেতৃবৃন্দ একটি করে সুদৃশ্য পুষ্পমাল্য নিয়ে এসেছে। প্রায় দু'ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থেকে হাসিমুখে এই আনন্দজনিত অত্যাচার সহ্য করতে হল। মালেক সাহেবের বিশাল হৃদয়ের মতো তার বিশাল হাসি কিছুতেই হ্রাস পায় না। এস. এ. খালেকের বক্তব্য সহজ এবং সরল। প্রেসিডেন্ট সাহেব একজন ঢাকার লোক নির্বাচন করে এবারই সর্বোত্তম কাজটি করেছেন। ঢাকার মহাসচিবের সঙ্গে ঢাকাবাসী পূর্ণ সহযোগিতা দেবে।

সকল অঙ্গ-সংগঠনকে নিয়ে বসলাম। তাদেরকে সুসংগঠিত করা প্রয়োজন। প্রয়োজন তাদেরকে অফিসের স্থান, গাড়ি এবং অর্থের যোগান

দেওয়া। কাজ কর বললেই হয় না, কর্মের সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে হয়। অঙ্গ-সংগঠনগুলো অচিরেই চাঙ্গা হয়ে উঠল। যে সংগঠন তার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হবে—তাদেরকে ভেঙে দেওয়া হবে। প্রতিটি অঙ্গ-সংগঠনের কর্মী-সভায় বিস্তারিত বক্তব্য রেখে তাদেরকে উজ্জীবিত করার প্রয়াস পেলাম। তাদের প্রয়োজন মিটাবারও ব্যবস্থা হল।

মহানগর কমিটিকেও নতুন করে প্রাণ-সঞ্চারিত করার ব্যবস্থা করা হল। যে সমস্ত ওয়ার্ডে কমিটি দুর্বল তাদেরকে পরিবর্তন করে নতুন কমিটি গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হল। দল চারদিক থেকে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

দলের কেন্দ্রীয় কমিটির বর্ধিত সভা আহ্বান করলাম ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে। সকল সংসদ সদস্য, জেলা কমিটির সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, অঙ্গ-সংগঠনের প্রতিনিধি, মহানগর কমিটিসমূহের প্রতিনিধি এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সকল সদস্য-সদস্যাদের নিয়ে প্রথমবারের মতো সে সভা অনুষ্ঠিত হল অত্যন্ত জাঁকজমকের সঙ্গে।

তাজুল তার সহকর্মীদের নিয়ে হলের সম্মুখভাগ, মঞ্চ এবং হল-অভ্যন্তরকে এমনিভাবে সুসজ্জিত করেছিল যে দেখলেই মনে হবে একটি শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ রাজনৈতিক দলের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

চেয়ারম্যান সাহেব গাড়ি থেকে নামতেই সুশৃঙ্খল স্বেচ্ছাসেবক দল তাঁকে অভিবাদন প্রদান করে ব্যাজ পরিয়ে দিল এবং দু'পাশে দণ্ডায়মান কর্মীদের উল্লসিত জয়ধ্বনির মধ্যদিয়ে তিনি হলে প্রবেশ করে মঞ্চে আসন গ্রহণ করলেন। তাঁর বিশালাকৃতির প্রতিকৃতি, দলীয় ও জাতীয় পতাকার মাঝে মঞ্চের শোভা বর্ধন করছিল।

পবিত্র কোরান তেলাওয়াতের পরই একদল শিল্পীর কণ্ঠে ধ্বনিত হল 'নতুন বাংলাদেশ গড়ব মোরা'—এরশাদের অনবদ্য সৃষ্টি এই সঙ্গীতটি। প্রেসিডেন্ট এবং হলের সকলে তালে তালে করতালিতে অংশগ্রহণ করল।

পার্টির যুগ্ম-মহাসচিব ক্যাবিনেট মন্ত্রী জাফর ইমাম বীরবিক্রমকে সেদিনের অনুষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব দিলাম। সর্বাগ্রেই মহাসচিবের স্বাগত ভাষণ। অনেকটা নীতি নির্ধারণী বা অভিষেকের ভাষণও বলা চলে বিধায় একটি লিখিত বক্তব্য তৈরি করেছিলাম কোন কিছু যেন বাদ না যায় সে চিন্তা করে। আমার নাম প্রস্তাব করতেই লিখিত ভাষণটি হাতে করে উঠে দাঁড়ালাম।

মাইকে দাঁড়িয়ে লিখিত বক্তব্যটি উত্থাপনের প্রারম্ভেই অধিবেশনের সভাপতি এবং দলের চেয়ারম্যান প্রেসিডেন্ট সাহেব বাধা দিলেন। তিনি তাঁর টেবিলে রাখা মাইকটি 'অন' করে বললেন, মহাসচিবকে আমি লিখিত বক্তব্য দিতে অনুমতি দিলাম না। তাঁকে অলিখিত মৌখিক বক্তব্য রাখতে নির্দেশ দিচ্ছি।

শ্রোতারা আমার লিখিত বক্তব্যে অভ্যস্ত নয়। তারা আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল। কথায় বলে, 'একে তো নাচুনি বুড়ি, আরও যদি পায় ঢোলের বাড়ি'। লিখিত বক্তব্য আমাকে তেমন মানায় না।

সেদিনও একটি উল্লেখযোগ্য বক্তব্য এবং অনেকের মতে ঐতিহাসিক বক্তব্য রেখেছিলাম বলে তারা মনে করে। পূর্বাপর রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিশ্লেষণ, আওয়ামী লীগ-বিএনপি'র শাসনামলসহ তাদের রাজনীতি, জামায়াতে ইসলামী এবং অন্যান্য দলসমূহের ভূমিকা তুলে ধরলাম। পক্ষান্তরে এরশাদ সাহেবের সরকারের উন্নয়নমূলক রাজনীতির তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরলাম এই জন্য যে, প্রতিনিধি পর্যায়ের নেতা-কর্মীরা যেন সম্পূর্ণ বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হয়।

বক্তৃতায় বলেছিলাম, প্রথম নির্বাচনে বিএনপি অংশ নেয়নি। শোনা যাচ্ছিল আওয়ামী লীগও একই পথে যাবে, কিন্তু কী করে কী হয়ে গেল, কে কাকে নিয়ে নিশিথে লং ড্রাইভে গেল, কোথায় সিঙ্গাপুরে প্রাপ্তিযোগ ঘটনা ঘটল, আমরা তার কিছুই জানতে পারলাম না। কিন্তু আওয়ামী লীগ সুবোধ বালকটির মতো নির্বাচনে অংশ নিল—এর মাজেজা আজও জানি না। চেয়ারম্যান সাহেবই জানেন এবং প্রয়োজনে আমাদের বুঝিয়ে বলবেন। আমাদের কেবল জিজ্ঞাসা, অপর দলটিতেও সেই একই জিনিস রয়েছে, বরং আর একটু উত্তম বলে বাহির থেকে মনে হয়, সেখানেও কী একই মাজেজা কাজ করতে পারে না?

প্রেসিডেন্ট সাহেব সপারিষদ হাসতে হাসতে বিষম খেলেন।

সাংগঠনিক বিষয়াদি সবিস্তারে তুলে ধরার পর নিবেদন করলাম, আপনার দলকে নিয়ে মাঠে-ময়দানে পরিশ্রম করতে পারব, রাজনীতির মোকাবিলা রাজনীতি দিয়ে করতে সক্ষম হব, ইটের জবাব পাথর দিয়ে দিতে পারব। সভার বিপরীতে সভা, মিছিলের উত্তরে মিছিল, কর্মসূচির মোকাবিলায় পাল্টা-কর্মসূচি দিতে পারব। কিন্তু আপনার কান পাহারা দিতে পারব না। আমি কর্মীদের নিয়ে ব্যস্ত থাকব দলীয় কর্মকাণ্ডে আর বিভীষণের দল বসে বসে সর্বক্ষণ আমার বিরুদ্ধে আপনার কান ভারি করে তুলবে—এটা ঠেকানো আমার সাধ্যাতীত।

হলে উপস্থিত প্রতিটি মানুষ আমার সে বক্তব্যকে আন্তরিক সমর্থন জানাল এবং করতালি ও স্লোগানের মাধ্যমে তাদের একাত্মতা প্রকাশ করল।

'কান পাহারা দিতে পারব না'—এটিই হয়ে দাঁড়াল কর্মীদের হৃদয়-নিঃসৃত সম্মিলিত মর্মবাণী।

বক্তব্য শেষ হতে প্রেসিডেন্ট সাহেব আবার তাঁর মাইক 'অন' করে মন্তব্য করলেন, মহাসচিব যদি লিখিত বক্তব্য দিত তা হলে কী এমন একটি চমৎকার বক্তৃতা আমরা শুনতে পেতাম?

হলের সকলেই তাঁর সঙ্গে একমত হল।

তিনি আমার সঙ্গে বুক মিলালেন এবং অনেক অভিনন্দন জানালেন। জিজ্ঞেস করলেন, এই বক্তৃতার পর আমার বক্তব্য ওরা শুনবে?

বললাম, ওরা শুধু শুনবে না, ওরা আপনার প্রতিটি বাক্য হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করবে।

প্রেসিডেন্ট সাহেবও সেদিন অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক বক্তব্য রাখলেন। তিনি বললেন, আপনাদের সরকার আছে, পার্লামেন্ট আছে, আছে আপনাদের একজন নিরলস চেয়ারম্যান ও কর্মঠ রাষ্ট্রপতি, নীতি রয়েছে, রয়েছে বিশাল কর্মী-বাহিনী। তাদের জন্য একজন সুদক্ষ ক্যাপ্টেন প্রয়োজন ছিল, বিলম্বে হলেও, আজ আপনাদের তাও রয়েছে। এখন জাতীয় পার্টি বিকশিত হবে না কেন! আমাদের চাইতে বেশি কাজ আর কে করেছে বা করতে পারবে? বাংলাদেশের মানুষ অকৃতজ্ঞ নয়। তারা কিছুই ভোলে না। এই দলকেই তারা হৃদয়ের মণিকোঠায় স্থায়ী আসন দেবে।

অনেক প্রস্তাব গৃহীত হল। অনেক প্রত্যয় ব্যক্ত হল। সকলের সঙ্গে বসে প্রেসিডেন্টও রাজনৈতিক লাঞ্চ খেলেন।

আমাদের যাত্রা শুরু হল।

প্রেসিডেন্ট সাহেব আটরশি যাচ্ছেন হেলিকপ্টার নিয়ে। তিনি জানতেন আমি আটরশি যাই এবং বেশ পূর্ব থেকেই। আমাকে বললেন, চলুন, মহাসচিব হয়েছেন, হুজুরকে সালাম করে আসবেন।

সঙ্গে গেলাম। হুজুর খুশি হলেন, অনেক দোয়া-খায়ের করলেন। তিনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন বলেই আমি জানতাম।

অনেক আগে জিয়াউর রহমান সাহেবের জেল থেকে দ্বিতীয়বার মুক্তি পাওয়ার পর আমার খালাত বোন ফিরোজা বুজি আমাকে প্রথমবার আটরশি নিয়ে যান। প্রথম সাক্ষাতেই তাঁর সম্বন্ধে আমার মনে অত্যন্ত ভক্তির উদ্রেক হয়। তিনি আমাকে বললেন, বাবা জেল থেকে বের হয়েছেন, শরীরটা একটু খারাপ। বেশি চিন্তা করবেন না, আল্লাহ্‌কে ডাকবেন। প্রতিদিন সকালে উঠে একটু ঠাণ্ডা দুধ খাবেন, আপনার গ্যাসের উপকার হবে।

তাঁর কথামতো ঠাণ্ডা দুধ খেয়ে উপকার পেয়েছিলাম। সেই থেকে যাওয়া শুরু। অ্যাডভোকেট মঞ্জুরুর রহিম আমার পরম বন্ধু এবং ওকালতি জীবনের

নিকটতম সহকর্মী। তিনিও আটরশির ভক্ত। তাঁর জন্য এবং মুন্সীগঞ্জের বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা আমার একান্ত স্নেহভাজন ফজলে এলাহীর উৎসাহে অনেকবার সেখানে যাতায়াত করায় হুজুরের দোয়া ও স্নেহ পেয়ে ধন্য হই। প্রেসিডেন্ট সাহেবের সঙ্গে কয়েকবার গিয়েছি। হুজুর তাঁকে খুবই স্নেহ করতেন। সেই সুবাদে আমার যাতায়াত বৃদ্ধি পেল।

'ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও বাড়া ভানে' বলে একটা কথা আছে। আমার অবস্থাও তা-ই হল।

ইসলাম সম্বন্ধে কতটুকই বা জানি। সেন্ট গ্রেগরীজ, ব্যাপটিস্ট মিশনে স্কুল-কলেজ জীবন কেটেছে খ্রিস্টান সাহেবদের তত্ত্বাবধানে। সেই আমাকেই বিভিন্ন ইসলামী জলসায় জাকের ভাইরা দাওয়াত করতে লাগল। তারা এসে বলত, হুজুর নির্দেশ করেছেন।

তখন তথ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলাম। আর কারো বক্তৃতা বিবৃতি রেডিও-টিভি বা পত্রিকায় থাক আর না থাক, তথ্য মন্ত্রীরটা অবশ্যই যাবে। এতটুকু সুবিধা না থাকলে আবার তথ্যমন্ত্রী!

ধর্মের কথা তেমন জানা ছিল না। সাধারণ যা জানতাম, আটরশির হুজুরকে যেমন দেখেছি এবং তাঁর জাকের মঞ্জিলের শিক্ষাবলি সাধারণ ভাষায় তুলে ধরতাম। দেখা গেল, ইসলামী পণ্ডিতদের জ্ঞানগম্ভীর বয়ান এবং আরবি-ফারসির অফুরন্ত উদ্ধৃতি বারবার শুনতে শুনতে শ্রোতারা হয়ত ক্লান্ত। তাই তারা আমার মতো একজন আরবি না জানা লোকের সাদামাটা কথা অধিকতর গ্রহণ করতে আগ্রহী।

জাকের ভাইরা বাংলাদেশের সর্বত্র ইসলামী জলসা করে থাকে। গভীর রাত পর্যন্ত ওয়াজ নছিহত শেষে তেহারি পরিবেশিত হয়। হুজুর আমাকে একদিন বললেন, বাবা, আপনার বক্তব্য মানুষ খুব ভালোভাবে গ্রহণ করছে বলে আপনার জাকের ভাইরা আমাকে বলেছে। তাদের জলসাগুলোতে বেশি বেশি যাবেন।

তাঁর নির্দেশ শিরোধার্য।

আমি হৃদরোগ হাসপাতালে ভর্তি থাকার সময় ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে বিরাট জলসা। উদ্যোক্তারা হুজুরের কাছে 'নালিশ' করল, হুজুর কাকে নিয়ে যাব জলসায়? ব্রাহ্মবাড়িয়ায় জাকেরদের বিরোধীদের প্রতিপত্তি প্রবল। তিনি বললেন, বাবা, মোয়াজ্জেমকে নিয়ে যান, সে গেলে প্রশাসনও সহযোগিতা করবে।

জাকের ভাইরা নিবেদন করল, তিনি তো হাসপাতালে অসুস্থ, কি করে যাবেন?

হুজুর বললেন, বাবারা, সে সুস্থ হয়ে উঠবে ইনশাআল্লাহ্ এবং আপনাদের জলসায় যাবে।

জাকের ভাইরা হাসপাতালে এসে দেখা করে হুজুরের নির্দেশ জানাল। তারা পোস্টার-লিফলেট ছেপেছে দেখাল। আমার কিছু বলার রইল না।

হাসপাতাল থেকে বের হবার একদিন পরই ব্রাহ্মণবাড়িয়ার জলসা। আমার পরিবারের সদস্যদের ঘোর আপত্তি। সব আপত্তি ঠেলে ফেলে দিয়ে যাওয়ার আয়োজন করলাম।

ফজলে এলাহী এবং রানা সাথে গেল। তারা একজন ডাক্তারও সাথে নিল। রেলে সেলুনে গেলাম। কোনই অসুবিধা হল না। তবুও এলাহী ও রানার তদারকির শেষ নেই।

সার্কিট হাউস থেকে এশার নামাজের পর জলসায় গেলাম। প্রচুর লোক সমাগম হয়েছে। বিরোধী মনোভাবাপন্ন লোকেরাও এসেছে।

বক্তৃতার প্রারম্ভেই বললাম, আমি অসুস্থ, তাই ধীরে কথা বলব। কারো কোন প্রশ্ন থাকলে আমি শেষ করার পর করবেন, তার পূর্বে নয়। আমি জবাব দেব।

সকলেই মন দিয়ে আমার সহজ-সরল কথাগুলো শুনল। হুজুর সম্বন্ধে সমাজে যেসব গুজব ও মিথ্যা চালু আছে সেসব খণ্ডন করে আমি বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর শিক্ষা, তাঁর উপদেশ এবং তাঁর নছিহতের কথা তুলে ধরলাম।

স্বর একটু উচ্চগ্রামে চলে যেতেই, তিন জন পেছনে এসে দাঁড়ায়। ডাক্তার, অনুজপ্রতিম এলাহী এবং পুত্র রানা। তাদের শাসন মেনে জিজ্ঞেস করলাম কারো কোন প্রশ্ন আছে কিনা?

কেউ প্রশ্ন করল না। হুজুরের জাকের মঞ্জিল সম্বন্ধে সকলের উৎসাহ বৃদ্ধি পেল।

একদিন আটরশি গিয়েছি। হুজুরের নির্দেশে অনেক ভালো ভালো খাবার আসতে লাগল। আমি বললাম, ভালো খাবার সবসময়ই খাচ্ছি। আমি সকলের সঙ্গে লাইনে বসে খেতে চাই—হুজুর যদি অনুমতি দেন।

তিনি অনুমতি দিলেন। সকলের সঙ্গে সাধারণ খাবার খেতে বসে মনে মনে চিন্তা করছিলাম, গরম ভাতের সঙ্গে যদি গরম গরুর মাংস পাওয়া যেত! কেউ একজন খাদেম জাকের ভাই এসে বললেন, আজ গরুর মাংস রান্না হয়নি। হুজুর বলেছেন, মাংস আপনার বাসায় পৌঁছে যাবে।

বিষয় কী! আমি তো কাউকে কিছু বলিনি!

ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে ফিরে এসে দেখি হুজুরের ওখান থেকে কয়েক ডেকচি বিরিয়ানি এবং রান্না করা গরুর মাংস এসেছে! আনন্দের সাথে সে খাবার নিজেরা খেলাম এবং বাসায় যারা এসেছে তাদেরকে খাওয়ালাম। হুজুরের পাঠানো শিন্নির বরকত হল অনেক। ডেকচিগুলো ফেরত নিতে এলে আমি সেগুলো দিলাম না। বললাম, হুজুরের প্রেরিত এই তৈজস বংশ-পরম্পরায় আমার বাড়িতে বিয়ে এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত হবে। এগুলো ফেরত দেব না।

হুজুর শুনে হাসলেন এবং মন্তব্য করলেন, আমি জানি, বাবা এগুলো ফেরত দেবে না।

আমি বেশ কয়েকটি নতুন বড় ডেকচি কিনে বাবুর্চি আনিয়ে বিরিয়ানী রান্না করে লঞ্চে করে সেসব নিয়ে হুজুরের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। হুজুর খুবই সন্তুষ্ট হলেন। দোয়া করলেন প্রাণ ভরে। মন শান্তিতে ভরে গেল।

ফরিদপুর শহরে জলসা হবে, বাবা মোয়াজ্জেমকে খবর দাও। আমার পীর, প্রেসিডেন্টের পীর। তাঁর নির্দেশ অমান্য করা যায়!

কুড়িগ্রামে প্রতিবছর ঐতিহাসিক জলসা হয়। আটরশিভুক্ত সকল ওলামায়ে কেরাম সেখানে গিয়ে থাকেন। এবার ভক্ত জাকের ভাইরা হুজুরকে 'নালিশ' করল, আমাদের জাকের ভাই মোয়াজ্জেম সাহেবকে হুজুর বলে দিন। তাকে এবার নিয়ে যাব।

হুজুর বললেন, তোমরা আয়োজন কর, বাবা যাবে।

আমি তখন পাইল্‌স রোগে শয্যাশায়ী। ফিস্টুলা থেকে গেজ নির্গত হয়ে আমার অবস্থা তখন খুবই শোচনীয়। আবার ফজলে এলাহীর আগমন, ভাই, হুজুর সব ব্যবস্থা করতে বলেছেন, আপনাকে তো যেতেই হবে!

বললাম, তুমি তো দেখছ আমার অবস্থা। কী করে যাব? হুজুরকে দোয়া করতে বলো এবং বুঝিয়ে বলো।

এলাহী কুড়িগ্রামের দলবলসহ আবার আটরশিতে গিয়ে হুজুরকে 'নালিশ' জানাল। মোয়াজ্জেম ভাই গুরুতর অসুস্থ, এখন কি করা যায়?

তিনি শান্ত কণ্ঠে হাসিমুখে প্রতিউত্তর করলেন, বাবারা, বলেছি তো, বাবা মোয়াজ্জেম আপনাদের জলসায় যাবে। সে ঠিকই যাবে। আপনাদের চিন্তার কারণ নেই।

ওরা এসে আমাকে সে কথা জানাল। আমি হুজুরের কথায় উদ্দীপ্ত হলাম। বললাম, হুজুর যখন এভাবে বলেছেন তা হলে যান, লাশ হয়ে গেলেও জলসায় যাব।

আমার স্ত্রী-পুত্র-কন্যা বহু পূর্বেই ধরে নিয়েছে, আমি এক ধরনের পাগল! আমাকে বলে লাভ নেই!

প্লেনে আধ-শোয়া অবস্থায় সৈয়দপুর এসে পৌঁছলাম। ডিসি, এসপি কুড়িগ্রাম থেকে অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে এসেছে—তাতে শুইয়ে নিয়ে যাবে। সকলে ধরাধরি করে প্লেন থেকে নামিয়ে অ্যাম্বুলেন্সে শুইয়ে দিল। শুরু হল দীর্ঘ সড়কপথে যাত্রা। ফজলে এলাহী অ্যাম্বুলেন্সেই আছে। সে চিন্তিত। আমার যা অবস্থা, রাস্তায় যদি কিছু একটা হয়ে যায়! সারা রাস্তা শুয়ে ব্যথায় কাতরালাম। বহু তোরণ নির্মাণ করে লোকজন রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে তাদের জাকের ভাইকে অভ্যর্থনা করার জন্য। কিন্তু জাকের ভাই তখন অ্যাম্বুলেন্সে শুয়ে তীব্র ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছে, কোথাও নামার প্রশ্নই আসে না।

বেশ রাত করেই জলসাস্থলে পৌঁছলাম। সকলেই জানে আমি গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় এসেছি। তারা খুবই কৃতজ্ঞ। মঞ্চে একটা সোফা রয়েছে, যদি হেলান দিয়ে বসে বক্তৃতা করতে পারি!

জলসার লক্ষাধিক ধর্মভীরু মানুষ যখন আমাকে দেখে তকবির দিয়ে সম্বর্ধনা জানাল, তখন আমি ব্যথা ভুলতে শুরু করেছি।

বসে নয়, দাঁড়িয়েই কথা বললাম। হুজুরের মুখমণ্ডল স্মরণে এনে প্রায় এক ঘণ্টা কী করে যে বক্তৃতা করলাম বলতে পারব না! আল্লাহ্ তা'আলার অসীম রহমত, মানুষের শুভ ইচ্ছা এবং সর্বোপরি হুজুরের দোয়ার ফলেই তা সম্ভব হল। লোকজন খুবই প্রীত হল আমার কথাগুলো শ্রবণ করে।

ঠিক করলাম রাতেই অ্যাম্বুলেন্সে রংপুর সার্কিট হাউসে গিয়ে অবস্থান করে সকালের ফ্লাইটে ঢাকা প্রত্যাবর্তন করব। রংপুরের রাস্তা আর শেষ হয় না। আমি আর পারি না। সহ্যের সমস্ত সীমা পার হয়ে গিয়েছে।

এলাহী, আর কতদূর?

সকরুণ এলাহী আমার মাথায় হাত বুলায়। সান্ত্বনা দেয়, আর বেশি দূর নয়।

আবার জিজ্ঞেস করি, এলাহী, রংপুর পৌঁছাতে পারব তো? তার পূর্বেই প্রাণ বের হয়ে যাবে না তো?

এলাহী মনে মনে দোয়া-দরূদ পড়তে পড়তে বলে, হুজুরের দোয়া আছে আপনাকে ঘিরে। ইনশাআল্লাহ্, আপনার কিছুই হবে না।

হলও না কিছু। গভীর রাতে রংপুর সার্কিট হাউসে পৌঁছে দেখি গাড়ির ধকলে ফিস্টুলা ফেটে রক্তারক্তি অবস্থা। অন্তর্বাস-পাজামা পুঁজ আর রক্তে ভেসে গেছে। ডাক্তার এসে সব ধুয়ে ঔষধ লাগিয়ে দিতেই অনেকটা সুস্থ হয়ে কিছুক্ষণের জন্য ঘুমিয়ে পড়লাম। সকালে আবার অ্যাম্বুলেন্সে সৈয়দপুর এবং প্লেনে ঢাকা।

এখন আর হুজুরের কাছে যাই না। আমাদের সরকারের বিদায়ক্ষণ যখন ঘনিয়ে আসেনি তখন থেকেই যাই না। এত শ্রদ্ধা ভক্তি এবং অন্যদিকে এত স্নেহ, দোয়া কোথায় গেল!

আটরশিতে প্রতি বছর হুজুরের পীর কেবলা হযরত এনায়েতপুরীর ওরস মোবারক অনুষ্ঠিত হয় তিন দিনব্যাপী অত্যন্ত জাঁকজমকের সঙ্গে। লক্ষ লক্ষ ধর্মপ্রাণ জাকের তাতে শরিক হয় তাদের খেদমত নিয়ে। কেউ চাল, কেউ ডাল, তেল, লবণ, যার যেটা ইচ্ছে নিয়ে আসছে পর্যাপ্ত। কত যে গরু, খাসী, এমনকি একবার উটও এল, আরও কত কি আসে তার হিসাব রাখা দুরূহ। একদল নিয়ে আসে—অন্যরা তাই রান্না করে সবাইকে খাওয়ায়। সে খানকায় শৃঙ্খলা দেখার বস্তু।

প্রতিবারই তিন দিন ধরে ওয়াজ, জিকির-আসকার, মিলাদ, নফল

নামাজ চলতে থাকে। প্রেসিডেন্টের সঙ্গে একবার ওরসে গেলাম। হুজুর তাঁকে এবং আমাকে বক্তৃতা করার নির্দেশ দিলেন। বক্তৃতার পর বললেন, বাবা, সকলে আপনার প্রশংসা করে, আজ নিজের কানে শুনলাম। আল্লাহ্ আপনার খায়ের করুন।

দ্বিতীয়বার ওরসে রাত্রি যাপন করলাম আটরশিতে। আমার শোবার ঘর দেওয়া হল মাদ্রাসার দ্বিতলে। সকালে প্রাতরাশের পরই হুজুর ডেকে পাঠালেন, বাবা, এখন আপনি বক্তৃতা করবেন।

তাঁর নির্দেশ পালন করলাম। মানুষ মুহুর্মুহু তকবির দিয়ে উঠছিল। সেদিন কথা বলে নিজেই তৃপ্ত ছিলাম। শেষ করে হুজুরের ঘরে যেতেই তিনি তাঁর পাক কণ্ঠে বলে উঠলেন, বাবা, আপনি আমার দরবারকে বোলন্দ্ করে দিয়ে গেলেন, যেভাবে নবীয়ে করিম (সাঃ)-এর দরবার বোলন্দ করেছিলেন হযরত ওমর (রাঃ)। আল্লাহ্ তা'আলার কাছে প্রাণভরে দোয়া করছি, তিনি যেন আপনার মঙ্গল করেন।

আমার অবস্থান এবং এত স্নেহ ও প্রশ্রয় হুজুরের পক্ষ থেকে পাচ্ছি যে, কিছু কিছু খাদেম এবং স্বার্থান্বেষী জাকের আমাকে রীতিমতো হিংসা করতে লাগল। তাদের করার কিছু ছিল না।

কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলারই বোধহয় ইচ্ছা ছিল না আমাদের পীর-মুরিদ বা পিতা-পুত্রের সম্পর্ক টিকে থাকুক। তা না হলে এত মহব্বত, এত দোয়া সব কর্পূরের মতো উবে গেল!

একদিন হঠাৎ টেলিফোন পেলাম প্রেসিডেন্টের। সব কাজ ফেলে এক্ষুণি চলে আসার জন্য। এসে দেখি মিনি ক্যাবিনেট বসে আছে। মওদুদ, জাফর, মাহমুদ, নাজিউর প্রমুখ উপস্থিত। প্রেসিডেন্ট সাহেব অত্যন্ত বিমর্ষ। তাঁর চোখে-মুখে রাগ, ক্রোধ মাঝে মাঝে ঝলসে উঠছে।

জিজ্ঞেস করে জানলাম, গতকাল আটরশিতে গিয়েছিলেন। সেখানে তাঁর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা হয়েছে! যাঁকে এত সম্মান প্রদর্শন করা হত। হুজুর নিজের সন্তানের মতো মনে করতেন, তাঁকে এবার অমর্যাদা করায় প্রেসিডেন্ট সেখানে পানি পর্যন্ত গ্রহণ করেননি এবং সেই থেকে ঢাকায় এসেও কিছু খাননি। তিনি খুবই ভেঙে পড়েছেন।

পারিষদ নানা বুদ্ধি দিচ্ছে। এখনই আটরশির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তাঁর মেজো ছেলেকে ঢাকায় গ্রেপ্তার করে ফেলতে হবে। সে বিলাসবহুল জাঁকজমকের জীবনযাপন করে। সবার আটরশি যাওয়া বন্ধ করতে হবে। এইসব তপ্ত আলোচনা হতে লাগল। এরাই প্রায় সকলে পদোন্নতির জন্য প্রেসিডেন্টের পীর বলে হুজুরের নিকট ধর্ণা দিতে দ্বিধা করেনি।

আমি দ্বিমত পোষণ করলাম। বললাম, আপনি এবং আমি দু'জনেই জাকের। এরা জাকের নন। জেনারেল নুরুদ্দীন সাহেবও বাইরে আছেন, তিনিও জাকের।

এটা যেহেতু জাকের মঞ্জিল নিয়ে সংকট, আমরা জাকের-ত্রয় পূর্বে বিষয়টি বিবেচনা করে পরে এদের সঙ্গে আলোচনা করলেই ভালো হয়।

তিনি আমার কথা গ্রহণ করলেন এবং আমাকে নিয়ে জেনারেল নুরুদ্দীন যেখানে বসে ছিল সেখানে এসে আবার তাঁর অভিযোগ বললেন।

বিস্তারিত না শুনেও আমি বললাম, স্যার, চলুন আমরা তিন জন মিলে এখনই একবার আটরশি যাই। জিজ্ঞেস করি আপনার সাথে এই ব্যবহার কেন? আপনি অনেক দূর নিয়ে গিয়েছেন এই দরবারকে। আপনারই অবদান সবচাইতে বেশি। আর আপনার সঙ্গেই দুর্ব্যবহার! প্রয়োজনে আমরা সকলেই সেখানে যাওয়া বন্ধ করব। কিন্তু তাঁর আগে একবার শেষবারের মতো আমাদের যাওয়া উচিত এবং প্রতিবাদ করা প্রয়োজন।

নুরুদ্দীন সাহেব আমাকে সমর্থন করলেন। প্রেসিডেন্ট তখন মানসিকভাবে খুব বিপর্যস্ত ছিলেন। হঠাৎই বললেন, ঠিক আছে, চলেন এখনই যাই।

হেলিকপ্টার রেডি হতে হতে বাসা থেকে আমি কয়েকটি খবরের কাগজ ফাইল করে নিয়ে এলাম।

আটরশিতে গতকাল প্রেসিডেন্ট গিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে প্রেসিডেন্টসুলভ তো নয়ই, তাঁকে সাধারণ ভদ্রতার সঙ্গেও কেউ রিসিভ করেনি। আজও গতকালের মতোই হল। আমরা অবশ্য মানসিকভাবে প্রস্তুতই ছিলাম।

হুজুর সমীপে গিয়ে তাঁকে সালাম করলাম এবং হঠাৎ আসার কারণ ব্যাখ্যা করলাম। তিনি সব শুনলেন। জানতেনও সব। বললেন, বাবা এরশাদ, ভাইর উপর রাগ করতে নেই, পিতার উপর রাগ করতে নেই। পিতা আর পীর ভিন্ন নয়।

রাষ্ট্রপতি কবি মানুষ। আবেগ তাঁর প্রবল, যত তাড়াতাড়ি রেগে ছিলেন, তত তাড়াতাড়ি শান্ত হয়ে স্বাভাবিক হয়ে গেলেন। বুঝলাম, ঘটনা আরও রয়েছে। কিন্তু দু'পক্ষ কেউ যখন তা তুলছে না, তখন আমার গরজ কী?

বললাম, হুজুর, কাল থেকে আপনার ছেলে রাষ্ট্রপতি এরশাদ কিছু খাননি। মন খারাপ করে ছিলেন।

হুজুর ব্যস্ত হয়ে বললেন, খাবারের ব্যবস্থা কর।

আমি তখন একটি অন্য বিষয় উত্থাপন করলাম। একসময় ওকালতি করতাম। সেভাবেই এগুলাম। হুজুরের অনুমতি নিয়ে বললাম, হুজুর, আপনি তো আমাদের পীর এবং পিতা। আপনি বলে থাকেন, জাকেরগণ আপনার রূহানি সন্তান। আরও বলেন, রূহানি সন্তান রক্তের সন্তানের চাইতে সত্তর গুণ বেশি আপন।

তিনি বললেন, হ্যাঁ বাবা, কথা ঠিকই বলেছেন।

বললাম, হুজুর, সেক্ষেত্রে আপনার রক্তের সন্তান ও রূহানি সন্তানের মধ্যে কোন ভুল বোঝাবুঝি হলে আপনিই তার নিষ্পত্তি করে দেবেন।

তিনি বললেন, নিশ্চয়ই, এখন বলুন তো বাবা কী হয়েছে?

আমি একটি খবরের কাগজ খুলে আমার একটি বক্তৃতার উদ্ধৃতি দেখিয়ে বললাম, হুজুর, গেল বন্যায় এক জাকের ভাই নারায়ণগঞ্জে বন্যার্তদের জন্য লঙ্গরখানা খুলেছে। আমাকে নিয়েছে উদ্বোধন করতে। সেখানে বক্তৃতায় আমি বলেছিলাম, 'ইনশাল্লাহ্ আমরা এ বিপদ কাটিয়ে উঠব। আমাদের উপর আমাদের পীরের দোয়া আছে।' হুজুর, আমি কী ঠিক বলিনি? আপনার কী দোয়া নেই আমাদের উপর? আপনার দোয়ায় বিপদ কেটে যাবে বলে আমি কী কোন অন্যায় করেছি, না আমার পীরকে অনেক বড় করে তুলেছি!

তিনি বললেন, বাবা আপনি কোন অন্যায় করা তো দূরের কথা, আপনার পীরকে অনেক উঁচুতে তুলে ধরেছেন। এভাবেই পীরকে শ্রদ্ধা করতে হয়।

তখন বললাম, তা হলে হুজুর আপনার রক্তের সন্তান, আমাদের মেজো ভাইজান যদি পরদিন প্রেসক্লাবে গিয়ে সংবাদ সম্মেলন করে এ কথার উত্তরে বলেন যে, জাতীয় পার্টির মহাসচিব এ কথা বলে আমাদেরকে রাজনৈতিকভাবে জড়িয়ে ফেলেছে—তাঁর এই বক্তব্য কি অন্যায় নয়?

হুজুর একটু অন্যমনস্ক হলেন, মেজ ভাইজানের মলিন মুখ মলিনতর হল।

কিছুক্ষণ পর হুজুর ধীরে ধীরে বললেন, বাবা, আপনার বক্তৃতায় কিছুটা জড়িয়ে ফেলা হয় বৈকি!

আমি নিশ্চুপ হয়ে গেলাম। একটু পূর্বে হুজুর কী বলেছেন আর এখন কী বলছেন! রক্তের সন্তান আর রূহানি সন্তানের মধ্যে সত্তর গুণের ব্যবধান বুঝতে আর সময় লাগল না!

উঠে গিয়ে হুজুরকে সালাম করলাম। হয়ত শেষ সালাম।

বললাম, হুজুর আপনি অনুমতি দিয়েছিলেন বলেই এত কথা বলেছি, কোন দোষ হয়ে থাকলে ক্ষমা করবেন।

তিনি পুনরায় অন্যদিকে তাকিয়ে বললেন, পীরের সঙ্গে তর্ক করলে কিছুটা দোষ তো হয়ই বাবা!

সেদিনই মনে মনে স্থির করলাম দূর থেকে শ্রদ্ধা করব, কিন্তু আর নয়। পীরের কাছে আর নয়। শুধু আটরশি কেন, কোন পীরের কাছেই নয়।

বিভাগীয় হেড্ কোয়ার্টারে পার্টির কর্মী-সম্মেলন দিলাম। দলের গঠনতন্ত্রে বিভাগীয় কোন শাখা না থাকলেও বিভাগের অন্তর্গত জেলাসমূহের কর্মীদের

একত্র করে তাদেরকে উজ্জীবিত করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলাম এবং প্রথমেই বিভাগসমূহে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। সে বিভাগের সমস্ত সংসদ সদস্য, কেন্দ্রীয় নেতৃবর্গ এবং মন্ত্রীবর্গও উপস্থিত হওয়াতে অনুষ্ঠানগুলো সাফল্যজনকভাবে সমাপ্ত হল।

এরপর প্রতিটি জেলায় প্রথমবারের মতো কাউন্সিল অধিবেশনের মাধ্যমে নির্বাচিত কর্মকর্তাদের নিকট জেলা শাখার দায়িত্ব অর্পণ করা হবে। দলের মধ্যে গণতন্ত্র চর্চা না করে অন্যত্র গণতন্ত্রের বুলি আওড়ালে চলবে না।

এর মধ্যেই বিরোধী দলসমূহের এক বিরাট চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হল। তারা 'ঢাকা অবরোধ' নাম দিয়ে রাজধানীতে সারা দেশ থেকে লোক নিয়ে এসে এক চরম অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি করার উপক্রম করল। সভা, শোভাযাত্রা, হরতাল, বিক্ষোভ—এসব কর্মসূচি তাদের নিকট অকার্যকর মনে হল। ভাংচুর, অগ্নিসংযোগ, বোমা বিস্ফোরণসহ অন্যবিধ নানা নাশকতামূলক কাজ চালিয়েও সুবিধা হচ্ছে না। এবার ঢাকা অবরোধ করতে হবে, রাজধানী অচল করে দিতে হবে। একবার ঢাকায় অবস্থান নিতে পারলেই কাজ সমাধা। এমনিতেই যে অবস্থার সৃষ্টি তারা করেছে, তাতে এত অধিক সংখ্যক লোক যদি ঢাকা শহরকে অবরোধ করতে পারে তা হলে, সরকারি ব্যবস্থা যেটুকু দৃশ্যমান রয়েছে, আইন-শৃঙ্খলার যেটুকু ভগ্নাবশেষ অবশিষ্ট তাও নিঃশেষ হয়ে যাবে, জনমনে নৈরাজ্যের উদ্রেক হবে। তখন সরকারের পতন হবে অনিবার্য। এ নিয়ে অনেক সলাপরামর্শ হল, অনেক বৈঠক বসল। পুলিশে হবে না, বিডিআর মোতায়েন করতে হবে। বিডিআরও যথেষ্ট নয়। সেনাবাহিনী নামাতে হবে—কত কী পরিকল্পনা!

আমি এবার এক বিশেষ অবস্থানে অনড় রইলাম। পুলিশ, বিডিআর বা সেনাবাহিনী নয়, জাতীয় পার্টির কর্মীদের দ্বারা এইবার অবরোধ মোকাবিলা করা হবে। আমার পরিকল্পনা খুলে বললাম। ওদের অবরোধ করার সুযোগই দেওয়া হবে না। ঢাকা অবরোধের আগেই ওদেরকে ঢাকা আসার পথে অবরুদ্ধ করে ফেলতে হবে। আইন প্রয়োগকারীরা উপস্থিত থাকতে পারে, কিন্তু সংঘর্ষ বাঁধলে তারা যেন তাদের চিরাচরিত পন্থায় নিষ্ক্রিয়ই থাকে। যা করবার কর্মীরাই করবে।

ক্যাবিনেটের অধিকাংশ সহকর্মীই আমার পরিকল্পনায় মহা সংকটের সংকেত দেখতে পেল। দেশকে গৃহযুদ্ধের দিকে ঠেলে দেওয়া হবে। আইন হাতে তুলে নেওয়া হবে। মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হবে। নানা গালভরা বুলি আওড়াতে লাগল।

জবাবে নিরুদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললাম, ওরা বুঝি ঢাকায় শান্তি সম্মেলন করতে আসছে! বোমা মারা, গুলি করে মানুষ হত্যা করা, অগ্নিসংযোগ করা, একের

পর এক নাশকতামূলক কাজ করা সবই তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার! এবার ঢাকা এসে শহরটিকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার করে দিলেই বোধহয় মানবাধিকারের পূর্ণতা অর্জিত হতে পারে!

প্রেসিডেন্ট সাহেব আমার প্রস্তাব গ্রহণ করতে চান। আবার ঝুঁকি নিতেও চিন্তা করেন। সৈন্য-সামন্ত মোতায়েনও যুক্তিযুক্ত মনে করছেন না। অনেকটা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নিয়েই সিদ্ধান্ত দিলেন, মহাসচিবের পরিকল্পনা মতো এবার চেষ্টা করে দেখা যাক। পরবর্তী অধ্যায় তো রইলই!

সকল কেন্দ্রীয় নেতা, মন্ত্রী এবং অঙ্গ-সংগঠনের নেতৃবৃন্দকে নিয়ে কার্যপদ্ধতি ঠিক করলাম। ঢাকা মহানগরীতে ঢোকার জন্য যেসব পয়েন্ট রয়েছে, সে সমস্ত স্থানের নেতাদের ডেকে আনা হল এবং পার্শ্ববর্তী জেলাসমূহের নেতৃবৃন্দকেও জরুরি তলব দিয়ে ঢাকায় আনা গেল। স্থির করা গেল, ঢাকা তো দূরের কথা, আশেপাশেই তাদেরকে ঢুকতে দেওয়া হবে না। বাস-ট্রাক বা ট্রেন, লঞ্চ-স্টিমারে করে ঢাকা আসার পথেই তাদেরকে রুখতে হবে। ঘটনা যা-ই ঘটুক না কেন, ঢাকা আসার সুযোগ দেওয়া হবে না।

কর্মীরা একটা কাজের মতো কাজ পেয়ে মেতে উঠল। সুস্পষ্ট নির্দেশ রইল, কাউকেই জীবনে ক্ষতি করা চলবে না—আর সবই করা যাবে। গায়ের জোরে ওরা যদি আমাদেরকে কাবু করতে চায়, ওদের সে সুযোগ দেওয়া কাপুরুষতারই নামান্তর। কর্মীরা মেতে উঠল। হাতে হাত রেখে নেতৃবৃন্দ ওয়াদা করে গেল—পরিকল্পনা মতোই সমস্ত কার্য সুচারুভাবে সমাধা করা হবে। সরকারের গায়ে এবার আঁচড়ও লাগতে দেওয়া হবে না।

হলও তা-ই। যতই গর্জাক, বর্ষাবে না। আমরা জানি, নিজেদের উপর আঘাত এলে মানুষ নিজের নিরাপত্তা নিয়ে প্রথম ব্যস্ত হয়ে পড়ে। নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, আদমজী, নরসিংদী, গাজীপুর, টঙ্গী, সাভার, মানিকগঞ্জ, কেরানীগঞ্জ সর্বত্র বিশেষ ব্যবস্থাধীনে ব্যাপক কর্মী মোতায়েন করা হল। ঢাকার দিকে আসার যানবাহন পূর্বদিন থেকে বন্ধ করে দেওয়া হল। বৃদ্ধ রোগী, স্ত্রীলোক বা শিশুদের ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া রইল। অন্যরা কেউ কর্মীদের ব্যূহ ভেদ করে আসতে পারবে না।

বেশ কয়েকটি জায়গায় সংঘাত হল। নিহত হল না কেউ, তবে দু'দিকেই কেউ কেউ আহত হল। যা-ই ঘটুক না কেন, আমাদের পণ ছিল ওদের ঢাকা অবরোধের কর্মসূচি বানচাল করে দিতে হবে। কারো সাহায্য ব্যতিরেকে জাতীয় পার্টির কর্মীরাই সেই চ্যালেঞ্জ সার্থকভাবে মোকাবিলা করল। ঢাকা অবরোধ দূরের কথা, ওরা ঢাকার বাইরে অবরুদ্ধ হয়ে গেল।

সরকার একটা বড় সংকট কাটাতে সক্ষম হল। প্রেসিডেন্ট সাহেব দলীয় কার্যালয়ে এসে সমস্ত কর্মীদের মোবারকবাদ দিলেন এবং তাঁর

কৃতজ্ঞতাস্বরূপ কর্মী-সাধারণের প্রতিভূ হিসাবে আমার হাতে একগুচ্ছ রজনীগন্ধা তুলে দিলেন।

একটি বড় কাজ সফলতার সঙ্গে সমাধা করতে পারার আমেজে জাতীয় পার্টি উত্তরোত্তর শক্তিশালী হতে লাগল। পরিষ্কার বুঝা গেল, উদ্দেশ্য যদি সঠিক হয় এবং দৃঢ় মনোবল নিয়ে ন্যায়সঙ্গতভাবে দাঁড়ানো যায় তা হলে অনেক অসাধ্য সাধন করা যায়। যারা দলকে খাটো করে রাখতে চাইত তারা নিজেরাই খাটো হয়ে গেল। পার্টির তৎপরতা অপরিসীম বৃদ্ধি পেল।

এরই মধ্যে এমন একটা সিদ্ধান্ত প্রেসিডেন্ট সাহেব নিলেন যার সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়ার ফল ভোগ করার জন্য আমাদেরকে প্রস্তুতি নিতে হল। এক-একটা সময় আসে যখন মানুষ একের পর এক ভুল করতে থাকে। এরশাদ সাহেবেরও ভুলের পরিক্রমা শুরু হয়ে গেল। যে সিদ্ধান্ত সেদিন গৃহীত হল, তার ফলে গোটা ইতিহাসই বদলে যেতে বাধ্য হল।

কিছুদিন থেকেই তিনি ছাত্রসংগঠন এবং ছাত্র-আন্দোলনের উপর আস্থা হারিয়ে ছিলেন। শুধু আস্থাহীনতাই নয়, তাঁর মধ্যে ব্যাপক বিতৃষ্ণা জন্ম নিয়েছিল ছাত্রদের অসংখ্য অবিমিশ্র কার্যকলাপের দরুন। তিনি গভীরভাবে ভাবছিলেন ছাত্রসংগঠন নিষিদ্ধ ঘোষণা করা যায় কিনা। বক্তৃতা-বিবৃতিতে ছাত্র সংগঠনগুলোকে রাজনৈতিক দলের অঙ্গ-সংগঠন হিসাবে গ্রহণ না করার জন্য বিভিন্নভাবে রাজনৈতিক দলগুলোর নিকট অনুরোধ জ্ঞাপন করেছিলেন। কিন্তু সকলই অরণ্যে রোদন। কে শোনে কার কথা। এরশাদ সাহেবের কথা শোনার তো প্রশ্নই আসে না। ছাত্র সংগঠনগুলো আরও মারমুখী হয়ে উঠল।

পার্লামেন্ট ভবনের উত্তর প্লাজায় এক নাগরিক সম্বর্ধনায় এরশাদ সাহেব ছাত্রআন্দোলন এবং তার বিষক্রিয়া সম্বন্ধে অনেক বিষোদ্গার করলেন। আমার বক্তৃতা করার কথা ছিল না। তবুও অনুমতি নিয়ে বলতে দাঁড়ালাম। বললাম, এককভাবে ছাত্রসমাজকে দোষ দিয়ে লাভ কী? ওরা কারা? আমাদের কেউ ভাই, কেউ সন্তান! আমরা বা সমাজ কী দায়ী নই? শিক্ষকরা কী যত্নবান? অভিভাবকরা কী দায়িত্ববান? আমরা রাজনীতিবিদরা কী দায়ী নই? কেবল ছাত্রদের দোষ দিয়ে লাভ হবে না। বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজসমূহ, বিদ্যাপীঠ না হয়ে অবৈধ অস্ত্রাগারে পরিণত হয়েছে। শিক্ষার বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের নতুন নামকরণ করা যেতে পারে, ডিপার্টমেন্ট অব ভাংচুর, যেখানে ভাংচুরের উপরে উচ্চতর ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা থাকবে। ফ্যাকাল্টি অব অটোমেটিক উইপন্স—যেখানে সমস্ত স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রসমূহের উপরে হাতে ধরে শিক্ষা দেওয়া হবে, অগ্নিসংযোগের উপর পিএইচডি'র ব্যবস্থা করা যেতে পারে, বোমা তৈরি এবং তার ব্যবহারের বিষয়ে সর্বশেষ টেকনোলজি শিক্ষার জন্য

আধুনিক বোমা-বিজ্ঞান অনুষদ করা যেতে পারে। সবই কী ছাত্রদের দোষ! অন্যদের কারোই কিছু করার নেই! ছোটবেলায় বাল্যশিক্ষায় পড়তাম :

"সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি,
সারাদিন আমি যেন ভালো হয়ে চলি।
আদেশ করেন যাহা মোর গুরুজনে,
আমি যেন সেই কাজ করি ভালো মনে।"

আর এখন বইপত্রে কী দেখছি :

"হাট্টিমাটিম টিম্
ওরা মাঠে পাড়ে ডিম
ওদের মাথায় খাড়া দুটো শিং।"

মাথায় যদি শিং থাকে তা হলে তো ওরা গুঁতাবেই। এককভাবে ওদের দোষ দিয়ে আত্মরক্ষা করা যাবে না।

আমার কথাগুলো অভিনিবেশ সহকারে শুনলেও তাতে কোন ফল হল বলে মনে হল না। মিনি ক্যাবিনেটের সভা বসল। আলোচ্য বিষয়—জাতীয় পার্টির ছাত্রসংগঠন নতুন বাংলা ছাত্রসমাজ অবলুপ্ত করতে হবে। এরশাদ সাহেবের সব ডিকটেটারের মতোই বড় দোষ ছিল, একটা কিছু মাথায় ঢুকলে হল—সেটা না করা পর্যন্ত স্থিরতা নেই, ফলাফল যা-ই দাঁড়াক না কেন। তাঁর আহ্বানে কোন দল সাড়া দিক বা না দিক, তাকে নিজ দল বন্ধ করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে। যুক্তি এল, আপনি আঁচড়ি ধর্ম পরকে বল। কেউ বলে উঠলেন, কবি বলেছেন, 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চল রে।'

আমি ঠাট্টা করে বললাম, একলা চললে কেবল ভূতের ভয়ই নয়, চোর-ডাকাতের হাতে পড়ার সম্ভাবনাও আছে।

আরও বললাম, আজকের জগতে এমন ভুল কেউ করতে পারে না। যুদ্ধরত সকলকে অস্ত্র সংবরণ করতে বলা হল—আক্রমণকারীরা সংবরণ করল না। আক্রান্ত অস্ত্র ফেলে দিল। অচিরেই তার দিন ঘনিয়ে আসবে। ছাত্রসংগঠন অবলুপ্ত করে দেওয়া আমার মতে মারাত্মক আত্মঘাতী—এর ফলে যে বিপর্যয় নেমে আসবে তার ছবি আমি কল্পনায় দেখতে পাচ্ছি। এটা হবে ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ ভ্রান্তি।

আমার সহকর্মীরা আমার কথা উড়িয়ে দিল। তারা বলল, আমি নাকি ভয় পেয়ে গিয়েছি। ছাত্র আন্দোলনের মাধ্যমে যাদের রাজনীতিতে হাতেখড়ি সেই কাজী জাফর, জিয়াউদ্দীন বাবলু, আনোয়ার হোসেন মঞ্জু, মওদুদ আহমেদের কথা শুনে আমি তো হতভম্ভ হয়ে গেলাম। বিশেষ করে কাজী জাফর এবং জিয়াউদ্দীন বাবলু দু'জনই ছাত্র আন্দোলনের প্রোডাক্ট। তাঁরা কী করে ছাত্রসংগঠন বন্ধের যুক্তিকে সমর্থন করতে পারে! কর্তার ইচ্ছায় কীর্তন—বালু

বনে গড়াগড়ি একেই বলে। নির্লজ্জ চাটুকারিতায় তারা একথাও বলতে দ্বিধা করল না, ইতিহাসে আপনি অমর হয়ে থাকবেন, আপনার নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে।

সহ্য হল না। বললাম, অতীত চলে গিয়েছে। বর্তমান শেষ হতে চলেছে। দিন আর অবশিষ্ট নেই। এখন শুধু ইতিহাসই বাকি। তার আঁস্তাকুড়ে নিক্ষেপ হওয়ার এই আয়োজন আমি সমর্থন করি না—আমি দুঃখিত।

প্রেসিডেন্ট সাহেব আমাকে সমর্থন করতে পারছেন না। তিনি দৃশ্যত অসন্তুষ্ট। তবুও বললেন, আপনার অভিমত খুলে বলুন।

বললাম, স্যার, রাজনীতিতে আমার হাতেখড়ি, প্রবৃদ্ধি বা শ্রীবৃদ্ধি, সুনাম বা সুযশ যা-ই বলুন সবকিছু এসেছে ছাত্রআন্দোলন এবং ছাত্রদের সংগঠন ছাত্রলীগ থেকে। সেই আমাকেই আপনি দলের মহাসচিব করার পর আমার ডান হাতটি কেটে দিতে চাচ্ছেন; আমি তা কিছুতেই সমর্থন করতে পারি না।

দ্বিতীয়ত, ছাত্রআন্দোলন আজ অবশ্য বিপথে পরিচালিত, কিন্তু এটি বিশ্বময় স্বীকৃত একটি আন্দোলন। এই বাংলাদেশের ইতিহাস বলবে, ছাত্র সমাজ কত বড় বড় বিজয় অর্জন করেছে দেশ ও জাতির জন্য। ছাত্ররা দু'ধারি চাকুর মতো। সেটি ব্যবহারের উপর নির্ভর করছে তা দিয়ে কী করতে চান। আপনি ফল কাটতে পারেন, আরও অজস্র ভালো কাজ সম্পন্ন করতে পারেন, আবার সে চাকুই কারো পৃষ্ঠদেশে বসিয়ে দিতে পারেন। আজ আমাদের বিরুদ্ধে সবচাইতে মারমুখী সংগ্রামী ছাত্রঐক্য। নিজেদের সংগঠন গুটিয়ে নিলে সমস্ত বাঁধা অপসারিত হয়ে ওরা আরও মারমুখী হয়ে উঠবে। এখন বাঁধা দেওয়ার কেউ আছে, অস্ত্রের ব্যবহার চাইলে তাও করা যায়। ওয়াক ওভার দিলে খেলা জেতার প্রশ্নই আসে না।

তৃতীয়ত, সরকারি দলে বোধগম্য কারণেই যত ডানপিটে, মাস্তান এবং রংবাজদের সমন্বয় ঘটে। এরা চাইলে এবং সরকার সহযোগিতা করলে অসম্ভবকে সম্ভব করা যেতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া ঢাকার বিভিন্ন শিক্ষায়তনে আমাদের প্রতিনিধিরাই অধিকাংশ সংসদ নির্বাচনে জয়ী হয়েছে। নিজেদের ক্যাডারকে নিরস্ত্র করে যুদ্ধের ময়দান থেকে তুলে নিয়ে যুদ্ধ জয়ের আশা বাতুলতা মাত্র। ছাত্রসমাজ বন্ধ করে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এমন আঘাত আসবে যা সহ্য করবার শক্তি কারোরই থাকবে না। আমি সনির্বন্ধ অনুরোধ করি, অন্য দলসমূহ তাদের সংগঠন বন্ধ না করলে আমাদের ছাত্রসংগঠন বিলীন করে দেওয়া মানে জেনে-শুনে বিষপানের শামিল হবে।

ডিজিডিএফআই জেনারেল লতিফ একমাত্র ব্যক্তি যিনি বললেন, আমি প্রেসিডেন্ট সাহেবের সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত হয়েও বলতে চাই, আমি দলের মহাসচিব হলে এই কথাগুলোই বলতাম। মহাসচিবের বক্তব্য যথার্থ।

রাষ্ট্রপতি তখন বললেন, সিদ্ধান্ত নিয়ে রাখলাম, কখন ঘোষণা দেব, পরে আলোচনা করব।

সেদিনের মতো সভা শেষ হল। এত খারাপ লাগছিল! কারো সঙ্গে সৌজন্য বিনিময় না করে চলে এলাম।

পরদিন শাহজাহান সাজু আমাকে নরসিংদী নিয়ে যাচ্ছে জনসভার জন্য। একদা সে ছিল ছাত্রসমাজের সাধারণ সম্পাদক। আমাকে জিজ্ঞেস করল, ভাই, শুনছি, ছাত্রসমাজ ভেঙে দেওয়া হবে। সর্বনাশ হয়ে যাবে। আপনি এই সিদ্ধান্ত যেভাবেই হোক ঠেকান।

ওকে বলতে পারলাম না সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। এখন শুধু ঘোষণা বাকি। নরসিংদী থেকে ফেরার সময়েই গাড়ির রেডিওতে শুনলাম নতুন বাংলা ছাত্রসমাজ বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে।

আলোচনা করবেন বলেছিলেন, করলেন না। দিন বুঝি ঘনিয়ে এল!

কাজী জাফরকে একসময় মন্ত্রিসভা থেকে বাদ দেওয়া হল। আমি তার অন্তর্ভুক্তির খবর যেমন জানতাম না, বের করে দেবার সংবাদও কাগজ সই না হওয়া পর্যন্ত জানতে পারলাম না। রাষ্ট্রপতি জানতেন, আমরা দুই মেরুতে অবস্থান করি। রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বলে রাজনীতির নিয়মনীতি বা কৌশল প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোন কোন সময় একমত হলেও রাজনীতির মূলধারায় আমরা ছিলাম ভিন্নমতাবলম্বী। আর আমার দোষ, আমি মনে এক, মুখে অন্য ভাব দেখাতে পারতাম না। তাই সম্মুখ তর্ক বা মতানৈক্য ঘটলেও দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক ট্রেডিশনের কারণে তা কখনও অপ্রীতিকর হত না। রাষ্ট্রপতি নিজেই আমাকে বললেন, মোয়াজ্জেম, ভাবতে পারবেন না সে কী পরিমাণ দুর্নীতিবাজ। তার জন্য আমার প্রচুর বদনাম হয়ে গেছে। চিনি কেলেঙ্কারীর ফলে তাকে কাজী জাফর না বলে লোকে 'চিনি জাফর' বলে এবং দোকানে গিয়ে লোকে আধ কেজি চিনি দিন না বলে , 'আধ কেজি জাফর দিন' বলে থাকে।

আমি কোন মন্তব্য করা থেকে বিরত রইলাম। রাষ্ট্রপতির নিকট আজ সে যতটা মন্দ, দু'দিন পর আবার তার চেয়েও অধিকতর প্রিয় হতে কতক্ষণ!

শত কাজের ফাঁকে ফাঁকে বিদেশেও যেতে হচ্ছে। সে সময় জাফর ইমাম মহাসচিবের দায়িত্ব যোগ্যতার সাথেই পালন করে। পরপর ভারত, থাইল্যাণ্ড,

ইরাক, সৌদি আরব, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশসমূহে সরকারি কাজেই সফর করলাম। স্থানীয় সরকারের দায়িত্বের সময় সিরডাপের চেয়ারম্যান হওয়ার সুবাদে এশিয়া ও প্যাসিফিক দেশসমূহের পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রীদের সম্মেলন ঢাকায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা গেল। এই অঞ্চলের মন্ত্রীরা যোগ দিলেন। প্রেসিডেন্ট সাহেব সেটি উদ্বোধন করলেন। পরের বার নয়া দিল্লীতে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। বিদায়ী চেয়ারম্যান হিসাবে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আমাকে সভাপতিত্ব করতে হল। উদ্বোধন করলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী রাজিব গান্ধী। সেদিনই প্রধানমন্ত্রী একটি মধ্যাহ্নভোজ সভায় আপ্যায়ন করলেন সমস্ত প্রতিনিধিদের। আমার আসন ছিল প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে একই গোল টেবিলে। মাতামহ ও মাতার অবিস্মরণীয় প্রতিভার উত্তরসূরি রাজিব গান্ধীও খাওয়া এবং গল্প করা একসাথেই চালিয়ে যাচ্ছিলেন। ভোজের শেষ পর্যায়ে নানাবিধ ডেজার্ট এল। মিষ্টান্নের এক পাশে কয়েকটি সুপক্ক আমও দেখতে পেলাম। ভালো আমের আমি চিরদিনই ভক্ত। অন্য মিষ্টি না নিয়ে একটি আম তুলে নিলাম এবং ছুরি-কাঁটা দিয়ে সেটির সদ্ব্যবহার করলাম। আমটি ছিল খুবই উপাদেয়। আর একটি খেতে বড়ই ইচ্ছা হচ্ছিল, আবার লজ্জাও পাচ্ছিলাম। ওরা কী ভাববে! শেষ পর্যন্ত লোভই জয়ী হল। আরেকটি আম তুলে নিতেই প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হল। তিনি হাসিমুখে বললেন, আমি লক্ষ্য করেছি অন্য ডেজার্ট না নিয়ে তুমি দুটি আম নিলে। আম বুঝি তুমি খুব পছন্দ কর?

ধরা পড়ে আমিও হাসিমুখে স্বীকার করলাম, আম আমার খুবই প্রিয়।

রাজিব গান্ধী হাসিমুখে বললেন, তোমাকে আমি ভারতের শ্রেষ্ঠ আম খাওয়াব। তা হলে বুঝবে আম কাকে বলে! কিন্তু এখন সে আম পাওয়া যায় না। তুমি ডিসেম্বর মাসে আসো, বোম্বের আলফান্সো আম তোমাকে খাওয়াব।

বললাম, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। আপনার আজকের আমও অতি উপাদেয়। তবে ডিসেম্বরে আসতে পারব কিনা বলতে পারি না—রাষ্ট্রপতি আম খেতে আসার জন্য অনুমতি দেবেন না।

তিনি হাসিমুখেই বললেন, ওটা আমি দেখব। আমি তোমাদের প্রেসিডেন্টকে টেলিফোন করে তোমাকে আনিয়ে নেব। তুমি হবে আমার ব্যক্তিগত মেহমান।

ডিসেম্বর এসেছে, চলে গেছে। আমার যাওয়া হয়নি। রাজিবজীও দুনিয়া থেকে চলে গেছেন। কিন্তু তাঁর স্বেচ্ছাপ্রণোদিত আমন্ত্রণের কথা ভুলব না। একটি ভালো আম হাতে এলেই তাঁর আনন্দমুখর মুখের অমলিন হাসিটি চোখের সম্মুখে ভেসে ওঠে।

ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের পক্ষ থেকে আমন্ত্রণ এল তাঁদের জাতীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করতে জাতীয় পার্টির মহাসচিবকে বাগদাদে

প্রেরণের জন্য। আমাকে নির্দেশ করা হল ইরাক যেতে। বাগদাদে হযরত বড় পীর আবদুর কাদের জিলানী (রহঃ)-এর মাযার আমাদের জন্য বড় আকর্ষণ। প্রাচীন সভ্যতার অন্যতম লীলাভূমিতে রয়েছে রাজা নেবুচাঁদ নেজারের তৈরি ব্যাবিলনের শূন্যউদ্যান, রয়েছে অনেক নবীগণের মাযার। মুসলমানদের, বিশেষ করে শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমানদের তীর্থস্থান ইরাক। সেখানেই রয়েছে ফোরাত নদীর তীরবর্তী শোকাবহ কারবালা প্রান্তর। হযরত আলী (রাঃ), মা ফাতেমা (রাঃ) এবং তাঁর দুই চোখের মণি হযরত হাসান (রাঃ) ও হযরত হোসেন (রাঃ)-এর স্মৃতিবিজড়িত পবিত্র স্থানসমূহ। সে কারণে ইরাক যেতে স্বাভাবিকভাবেই একজন মুসলমানের মনে আনন্দের শিহরণ জেগে ওঠে।

আমারও তা-ই হল। আমার একান্ত সচিব হালিম সাহেবকে সাথে নিয়ে বাথ পার্টির নির্বাচন পর্যবেক্ষণের উদ্দেশে ইরাক উপস্থিত হলাম। রাজধানী বাগদাদের বিলাসবহুল ইন্টারন্যাশনাল প্যালেস হোটেলে আমাদের রাখা হল। আমাদের রাষ্ট্রদূত এবং দূতাবাসের অন্য কর্মকর্তাগণ সর্বক্ষণ আমাদেরকে সঙ্গ দিচ্ছে। তারা আমাদেরকে বাগদাদ ও পার্শ্ববর্তী ঐতিহাসিক স্থানসমূহ পরিদর্শনে নিয়ে গেল। হোটেলে আছি, খাচ্ছি-দাচ্ছি, ঘুরে বেড়াচ্ছি। নির্বাচনের দিন একবার গিয়ে বুথের সামনে দিয়ে ঘুরে এলাম। একদলীয় নির্বাচন। কোন উত্তেজনা বা কোন প্রচারণার তোড়-জোর নেই। নির্বাচন বলেই মনে হয় না। সমস্ত শহর এবং সম্ভবত সমস্ত দেশ সাদ্দাম সাদ্দাম ব্যতীত আর কিছু করে কিনা বুঝা গেল না। সাদ্দাম সাহেবের অনেকগুলো প্যালেস। কখন কোথায় থাকেন কেউ জানে না। তবুও প্রেসিডেন্ট ভবনের সামনের রাস্তায় কোন গাড়ি দাঁড়ানো দূরের কথা, সেখানে এসে স্পীড বাড়িয়ে দিতে হবে। সবই তাঁর নিরাপত্তার স্বার্থে।

তবে যুদ্ধবিধ্বস্ত বাগদাদকে এরা নতুন করে গড়ে তুলেছে। রাস্তাসমূহ, অফিস-আদালত সব নতুন করে নির্মাণ করা হয়েছে। জাতীয় স্মৃতিসৌধটি দেখে মুগ্ধ হলাম। সবুজ পাথরের তৈরি অর্ধচন্দ্রাকৃতি হৃদয় দুই খণ্ডে বিভক্ত। শহরের বাইরে তৈরি ইরাকের 'হোদাইবিয়ার' যুদ্ধ ক্ষেত্রের যে প্রতিচ্ছবি তারা নির্মাণ করেছে তা এত জীবন্ত প্রতীয়মান হয় যে, মনে হয় যুদ্ধের ময়দানেই এসে দাঁড়িয়েছি। একদিন মশুল শহরে গেলাম। কয়েকজন নবীর মাযার রয়েছে সেখানে। নবীদের সেসব পবিত্র মাযার যেভাবে অবহেলা ও অনাদরে রক্ষিত রয়েছে, দেখে কষ্ট পেলাম।

তার চাইতেও বড় কথা, যে বড় পীর হযরত আবদুল কাদের জিলানীর (রাঃ) নামে সারা বিশ্বের মুসলমান সম্প্রদায় শ্রদ্ধায় মাথা নত করে, বাগদাদ শহরের অনেকেই সেই বড় পীর সাহেবের মাযারের খবর রাখে না। ট্যাক্সি

ড্রাইভারদের সাধারণত সব জানা থাকে, তারাও জানে না দেখে কেবল আশ্চর্যান্বিতই হলাম না, ক্ষুব্ধও হলাম।

প্রথম দিনই বড় পীর সাহেবের মাযারে যাব বলে বেরিয়ে অনেক ঘুরতে হল। সরকারি ড্রাইভার মাযারের খবর রাখে না। রাষ্ট্রদূত অনেক করে বুঝিয়ে তাকে রাস্তা দেখিয়ে গিয়ে গেল।

মাযারের প্রবেশদ্বারে আমি একটি ছোট ফুল বিক্রেতা ইরাকি মেয়ের যে স্বর্গীয় হাসি দেখেছিলাম তা জীবনে আর ভুলব না। ভিআইপি'দের জন্য গাড়ি রাখার স্থান ঘেঁষে ও তার ফুলের পসরা নিয়ে বসেছে। হয়ত ওখানটায় তার বসা বৈধ নয়। তবুও যারা মাযার জিয়ারতে যাবে তারা ফুল নিতে পারে মনে করে মেয়েটি ওখানে একটু ঠাঁই করে নিয়েছে। যে কেউ এসে তাকে উঠিয়ে দিতে পারে। তাই কিছুটা শঙ্কিত। আমাদের ফ্ল্যাগওয়ালা গাড়ি ওর পশরার সামনে দাঁড়াতেই বছর আট-নয়ের ওই ফুটফুটে ফুলওয়ালী আমাদের দিকে তাকিয়ে এমন একটি হাসি দিল যার বর্ণনা দেওয়ার ভাষণ জানা নেই। কিছুটা শঙ্কা, কিছুটা অভ্যর্থনা বা আপ্যায়নমিশ্রিত অমলিন নিষ্পাপ হাসিটির মূল্য লক্ষ মিলিয়ন ডলার। আমাদেরকে হাসি দিয়ে ও খুশি করতে চাচ্ছে, যদি কিছু ফুল ক্রয় করি! আবার ভয়ও পাচ্ছে! ফ্ল্যাগওয়ালা গাড়ি যদি কর্তাদের হয়ে থাকে, যদি ওকে উঠিয়ে দেয়! তাই একটি স্বর্গীয় হাসি ঘুষ দিয়ে সে সব জয় করে নিতে চাচ্ছে। আল্লাহ্ সেরকম হাসি যাকে দান করেছেন, তার আর পার্থিব কোন কিছুর প্রয়োজন হয় বলে মনে হল না।

দরকার ছিল না, তবুও ফুল ক্রয় করতে গেলাম। বললাম, তুমি আর একটি বার আমাদের জন্য হাসবে?

ড্রাইভার আরবিতে তাকে বুঝিয়ে বলতেই এবার মেয়েটি আকর্ণ বিস্তৃত আর একটি অনন্তকাল স্মরণে রাখার মতো হাসি উপহার দিল।

ইরাকে সেই ছোট্ট ফুলওয়ালীর হৃদয়নিঃসৃত অকলঙ্ক হাসিটিই ছিল আমার দ্বিতীয় পুরস্কার। প্রথম পুরস্কার ছিল হযরত বড় পীর সাহেবের মাযার জিয়ারতের সৌভাগ্য।

মোতাওয়াল্লী সাহেব বড় পীর সাহেবেরই বংশধর। তিনিও অশীতিপর বৃদ্ধ। ইসলামী ধ্যান-ধারণার একজন খাঁটি জ্ঞান-বৃদ্ধ। আমাদের পরিচয় পেয়ে নিজেই জিয়ারত করালেন, দোয়া পরিচালনা করলেন, পুরনো হস্ত-লিখিত পবিত্র কোরআন এবং অন্যান্য গ্রন্থের সংগ্রহশালা দেখালেন এবং তাঁর অফিস ঘরে নিয়ে চা খাইয়ে ছাড়লেন। শুনলাম, সরকার থেকে খুব একটা দৃষ্টি এদিকে দেওয়া হয় না।

গাড়ি নিয়ে কারবালা প্রান্তর দেখতে গেলাম। এখন আর প্রান্তরের চিহ্ন নেই। কয়েকটি মাযার এবং মসজিদ রয়েছে। সেসব মসজিদের গম্বুজ থেকে শুরু করে অভ্যন্তরে প্রচুর স্বর্ণের কারুকার্য রয়েছে। স্বর্ণের এত ব্যবহার অন্য

কোথাও দেখা যায় না। হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর মাযারে প্রচুর স্বর্ণালঙ্কার। এসব কার ব্যবহারের তা বুঝিয়ে বলার লোক নেই।

থাকলেও ভাষার কারণে তেমন বুঝা গেল না। সেখান থেকে প্রাচীন শহর ব্যাবিলনে পৌঁছে রাজা নেবুচাঁদ নেজার কর্তৃক নির্মিত শূন্যউদ্যানের ভগ্নস্তূপের মধ্যে ভগ্ন দেয়ালসমূহ আর মেয়ে মানুষের মুখাকৃতির বিশালাকার সিংহের পাথরের মূর্তি দেখে আর গাইডের বিরক্তিকর বক্তৃতা শুনে ক্লান্ত হয়ে ফিরে এলাম।

ঐতিহাসিক স্থানসমূহ পরিদর্শন ব্যতীত অন্যত্র খুব একটা উপভোগ্য হল না। সরকারের দ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব উপ-প্রধানমন্ত্রী জনাব ইজ্জত ইব্রাহীমের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক সাক্ষাৎ হল। প্রেসিডেন্ট সাদ্দামের জন্য রাষ্ট্রপতি এরশাদের চিঠি তাঁকে হস্তান্তর করলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের নির্বাচন কেমন দেখলেন এবং দেশটা কেমন লাগছে?

উত্তরে অকূটনৈতিক সুলভ জবাব দিলাম, আপনাদের নির্বাচনে দেখার তেমন কিছু ছিল বলে মনে হল না। দেশটি নিশ্চয়ই অতি চমৎকার। একজন পর্যটকের চোখে যেটুকু দৃশ্যমান হয়।

তিনি কী বুঝলেন তিনিই জানেন। হোটেলে ফিরে আসতেই তাদের কয়েকজন মন্ত্রী পর পর আমার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য এলেন এবং খুব অনুরোধ করতে থাকলেন মধ্যাহ্নভোজ ও নৈশভোজের আমন্ত্রণ গ্রহণের জন্য। রাষ্ট্রদূতও পরামর্শ দিল অন্তত শ্রমমন্ত্রীর নিমন্ত্রণ রক্ষা করার জন্য। কিন্তু আমি মনঃস্থির করে ফেলেছিলাম, ইরাক থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দেশে ফিরব। বিনয়ের সঙ্গে সময়ের স্বল্পতার কারণ দেখিয়ে নিমন্ত্রণসমূহ প্রত্যাখ্যান করলাম। দেশে অনেক কাজ পড়ে আছে।

পরদিনই রাতে ফ্লাইট ছিল। তাতেই সব ব্যবস্থা করা হল। কয়েকজন মন্ত্রী, অন্যান্য কর্মকর্তা আমাদের রাষ্ট্রদূতসহ মোটর শোভাযাত্রায় আমাদেরকে বিমানবন্দরে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে আমাদের ভিআইপি লাউঞ্জে বসানো হল। প্রটোকলের কর্মকর্তারা এসে আমাদের টিকিট নিয়ে গিয়ে আনুষ্ঠানিকতা সেরে বোর্ডিং-কার্ড দিয়ে জানাল প্রায় আধঘণ্টা পরে প্লেন ছাড়বে। তারা এসে যথাসময়ে আমাদের বিমানে নিয়ে যাবে। আমরা ততক্ষণ একটু কফি পান করতে পারি। সুদৃশ্য কাপে কফি দেওয়া হল, তার স্বাদও চমৎকার। হাল্কা মনে কফি পান করছি, মন্ত্রীদের সঙ্গে আলাপ করছি। প্রায় আধঘণ্টা কেটে গেছে। রাষ্ট্রদূতকে হালিম সাহেব বলল, স্যার, সময় তো হয়ে গিয়েছে। প্রোটকলের ওরা এখনও আসছে না কেন?

সঙ্গে সঙ্গেই প্রটোকলের লোক আমাদেরকে নেওয়ার জন্য এল। সকলের নিকট বিদায় নিয়ে প্লেনে আরোহণের উদ্দেশে গেটে যেতে কর্তব্যরত কর্মচারী জানাল, তোমাদের প্লেন তো মিনিট পাঁচেক পূর্বে উড়ে গিয়েছে!

বলে কী!

ভিআইপি রুমে আমরা বসা। কয়েকজন মন্ত্রীও আছেন আমাকে বিদায় জানাতে। আমি সরকারের অতিথি, প্রথম শ্রেণীর যাত্রী। তাছাড়া প্রটোকল কর্মকর্তারাই সবকিছু করেছে। তারপর প্লেন আমাদেরকে ফেলে চলে যেতে পারে!

অসম্ভব।

মন্ত্রীরাও এগিয়ে এলেন, প্রটোকলের লোকজন, অন্যান্য অনেকেই এগিয়ে এলেন। তারাও একবাক্যে বললেন, হতেই পারে না। কোথাও কোন বিরাট ভুল হয়ে গিয়েছে।

ভুল হোক, যা-ই হোক, ঘটনা হল, প্লেন আমাদের ফেলেই উড়ে চলে গেছে। আমরা বিমানবন্দরে পড়ে রইলাম একান্ত অসহায় যাত্রী। সপ্তাহে একবারই ঢাকা যাওয়ার ফ্লাইট।

সকলে মিলে অনেক হট্টগোল করল। এর চাকরি খাবে, ওকে ডিসমিস করা হবে ইত্যাদি অনেক হম্বি-তম্বি হল।

আমি চুপ করে বসে ভাবছি, একটা সভ্য দেশে, আধুনিক বিমানবন্দরে, একজন সরকারি অতিথি, ভিআইপি ও প্রথম শ্রেণীর যাত্রীর সঙ্গে এরকম কী করে হতে পারে! সবটাই কল্পনার অতীত। দুঃখে এবং অপমানে আমার তখন বিচারশক্তি রহিত।

মন্ত্রীরা এবং সরকারের অন্যান্য কর্মকর্তাগণ নিজেদের মধ্যে অনেক আলোচনা এবং নানা স্থানে টেলিফোনে কথা বলে শেষ পর্যন্ত আমার নিকট এসে তাদের আন্তরিক দুঃখ জানাল। যারই গাফিলতি হোক না কেন, তারা এটার কঠোর ব্যাবস্থা নেবে। তবুও মার্জনা চাইবার তাদের ভাষা নেই। তারা আমাকে হোটেলে তাদের আতিথেয়তায় প্রত্যাবর্তনের অনুরোধ করল। যত শীঘ্র সম্ভব তারা আমার দেশে ফেরার ব্যবস্থা করবে আশ্বাস দিল।

আমি বেঁকে বসলাম, ইরাকে আর নয়। যে কোন প্লেনে, যে কোন দেশে আমাকে পাঠানো হোক, আমি যাব, কিন্তু আমার ইরাক সম্বন্ধে সমস্ত মোহ ঘুচে গেছে। এখানে আর এক দণ্ডও নয়।

হালিম সাহেব কেবল আমার একান্ত সচিবই নয়, দীর্ঘদিনের সহচর। সে আমার ভ্রাতৃবৎ সুহৃদও বটে। মুন্সীগঞ্জের একসময়ের এসডিও হালিম সাহেব অর্ধযুগের বেশি আমার সঙ্গে আছে। সে আমাকে ভালো করেই চেনে। সে সকলকে বুঝালো, একবার যখন মনস্থির করেছেন, তখন তার আর নড়চড় হবে না। যে কোন বিকল্প ব্যবস্থা ব্যতীত গত্যন্তর নেই।

জানলাম এক ঘণ্টার মধ্যেই একটি পিআইএ বিমান করাচি যাচ্ছে। বললাম, ওটাতেই ব্যবস্থা করতে বলুন।

করাচি যাওয়ার ভিসা নেই। সেটা সংগ্রহ করা কোন সমস্যা হবে না।

তাছাড়া আমরা করাচিতে বসে থাকব না, কোন না কোন ভাবে ঢাকা পৌঁছবার ব্যবস্থা হবে।

তা-ই করা হল। পিআইএ'র বিমানে অনেক সিট যাত্রীশূন্য ছিল। ওরা সাগ্রহে আমাদের তুলে নিল। বিমানের ক্যাপ্টেন একসময় ঢাকাতে কর্মরত ছিল। সে এসে শুভেচ্ছা বিনিময় করল, ঢাকার খোঁজখবর করল। বিমান থেকে করাচিকে জানিয়ে দেওয়া হল, বাংলাদেশের উপ-প্রধানমন্ত্রী অকস্মাৎ করাচি আসছেন, প্রটোকলের লোকজনদের খবরটি জ্ঞাপন করা প্রয়োজন।

করাচি বিমানবন্দরে সরকারি লোকজন কিছুটা আশ্চর্য হল। এভাবে কোন ভিআইপি আসেন না। তারা সব অবগত হলে আমাদেরকে ভিআইপি লাউঞ্জে অপেক্ষা করার জন্য অনুরোধ করল। ভিসার আনুষ্ঠানিকতা বিমানবন্দরেই ওরা করবে। আমি কিছুটা ইচ্ছাকৃত খাম-খেয়ালিপনা দেখালাম। হালিম সাহেবকে ইশারায় বুঝিয়ে দিয়ে ইমিগ্রেশন পার হয়ে হাঁটা ধরলাম, তখন করাচিতে সবে সূর্য উদয় হয়েছে। ওরা আমাকে দৈহিকভাবে বাধা দিতে সাহস পেল না। হালিম সাহেব ওদের বুঝাতে সক্ষম হল, স্যারকে এয়ারপোর্ট হোটেলে বিশ্রাম করতে দিয়েও সব আনুষ্ঠানিকতা সারা যায়!

আমি জোরে জোরেই বললাম, এটা একসময় আমাদেরই দেশ ছিল। আমাদের অংশ আছে এর প্রতিটি জিনিসের উপর।

তারা বোধহয় ভেবেছিল, বাংলাদেশের উপ-প্রধানমন্ত্রী ছিটগ্রস্ত, বেশি না ঘাঁটানোই যুক্তিযুক্ত মনে করল। এয়ারপোর্টের গাড়িতেই সংলগ্ন হোটেলে গিয়ে উঠলাম। ম্যানেজারকে ডেকে রুম খুলে দিতে বললাম এবং ভালো প্রাতরাশের আয়োজন করতে বললাম। ওদেরও ধারণা জন্মাল, আমি ঠিক আর দশ জন স্বাভাবিক স্বভাবের মানুষের মতো নই। সমস্ত ব্যবস্থা করে ফেলল।

হালিম সাহেব টেলিফোন গাইড ঘেঁটে বাংলাদেশের ডেপুটি হাই-কমিশনারকে লাইনে পেলেন। তাঁকে আমার আগমনের সংবাদ জানাতে বয়স্ক ভদ্রলোক নিজেই গাড়ি চালিয়ে সেই প্রত্যুষে বিমানবন্দরে আসতে গিয়ে প্রায় দুর্ঘটনা ঘটিয়েছিলেন। তার ড্রাইভারের ডিউটিতে আসার তখনও সময় হয়নি। সে সব শুনে আশ্বস্ত হল এবং তার বাসায় টেলিফোন করে ড্রাইভারকে এখানে আসতে বলল।

হালিম সাহেবকে নিয়ে সে আমাদের ঢাকা ফেরার ব্যবস্থা করতে বিমানবন্দরে গেল। আমি কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেওয়ার জন্য বিছানায় গেলাম। দশটা নাগাদ উঠে জানলাম সন্ধ্যায় নেপাল যাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। পরে ওখান থেকে ঢাকা গেলেই হবে।

আশ্বস্ত হয়ে সমস্তটা দিন ডেপুটি-হাইকমিশনারকে উপহার দিলাম। যেটুক ঘুরে-ফিরে দেখা যায়। করাচিতে পূর্বে কখনও বিমানবন্দরের বাইরে

যাইনি। আমরা শহর ঘুরে দেখলাম। সমুদ্র সৈকতে গেলাম, নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর বাসভবন দেখলাম, পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর সমাধি দেখতে গেলাম। পথ চলতে চলতে ড্রাইভার প্রায়ই দিক পরিবর্তন করছিল আর বলছিল, এদিকে রায়ট চলছে, যাওয়া যাবে না।

জিজ্ঞেস করলাম, করাচিতে অন্য ধর্মাবলম্বী তেমন কেউ নেই, রায়ট কার সঙ্গে?

সে বেশ রসিক লোক। বলল, 'হাম লোগ আপসমে লড়তা হায়!' নিজেরা নিজেরাই রায়ট করছে!

সন্ধ্যায় কাঠমুন্ডুর উদ্দেশে প্লেনে উঠলাম। সেখান থেকে ঢাকার প্লেন পাওয়া গেল। বেশ রাতে ঢাকা এসে পৌঁছলাম। আমার ইরাক সফরের পরিসমাপ্তি হল। বড় পীর সাহেবের মাযার না থাকলে সিদ্ধান্ত নিতাম যেখানেই যাই না কেন, ওদেশে আর নয়।

ঢাকা ফিরে হরতালের বিভীষিকায় পড়লাম। আজকাল হরতালের কত নিন্দাবাদ। হরতাল এখন সমাজবিরোধী কাজ। ওদের মাছলা-মাছায়েল বড় চমৎকার। এখন প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা দেন তারা আর হরতাল করবে না। বিরোধী দলেরও হরতাল না করাই বিধেয়। বিরোধী দল সহজেই বলতে পারে, আমরাও ক্ষমতায় গিয়ে হরতাল করব না। প্রধানমন্ত্রীরা কখনও হরতাল করে না—ওটা বিরোধী দলে থাকার সময় যদি বলতেন মূল্য হত। প্রায় পৌনে দুই শত দিন হরতাল করার যাদের রেকর্ড রয়েছে তারা বলে হরতাল ভালো নয়। সরকারে থাকলে জায়েজ, সরকারে না থাকলে না-জায়েজ। চমৎকার যুক্তি। সাধে কী আর বলে দশ হাত কাপড়েও কাছা হয় না!

জাতীয় পার্টিকে ক্ষমতা থেকে নামাতে তখন সকলেই কোমর বেঁধে লেগেছে। অর্ধদিবস হরতাল, পূর্ণদিবস হরতাল, আট চল্লিশ ঘণ্টা, বাহাত্তর ঘণ্টাও হরতাল চলেছে। 'লাগাতার' শব্দটি বাংলা ভাষায় নতুন সংযোজিত হল। হরতাল সরকারেরও গা সহা হয়ে গেল। মন্ত্রী এবং কর্মকর্তাগণ শেষ রাতে বা কেউ কেউ সন্ধ্যারাত থেকেই অফিসে বিছানাপত্র নিয়ে আসা শুরু করলেন। হরতাল শেষ হলে বাড়ি ফিরতেন। মানুষজন সাপ্তাহিক ছুটির মতোই হরতালের দিনগুলোকে ঘরে বসে ভিসিআর-এ ছবি দেখে কাটাতে লাগল। রেডিও, টিভি বা কোন পত্রপত্রিকায় সরকারি নিষেধাজ্ঞার কারণে

হরতালের কর্মসূচি প্রকাশিত না হলে কি হবে, জনগণ গভীর মনোযোগে বিবিসি ও ভয়েস অব আমেরিকার খবর শুনে হরতাল পালন করত। আমি বলতাম, ভয়তাল পালন করত।

দোকান খুললে ওটা লুট হয়ে যাবে। গাড়ি বের করলে ওটা পুড়িয়ে দেওয়া হবে। হেঁটে অফিসে যাচ্ছে চিনতে পেরে তার পরিধেয় বস্ত্র খুলে নিয়ে দিগম্বর করে ছেড়ে দিল। কে ঝুঁকি নিতে যাবে! তার চাইতে হরতালের সঙ্গে যুক্ত থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ।

আমার কাছে এই হরতাল হরতাল খেলা হাস্যকর মনে হত। আমি যথাসময়েই লোকজন নিয়ে গাড়ি নিয়ে সচিবালয়ে ঢুকতাম। মাঝে মাঝে অসহ্য হলে সচিবালয় থেকে কয়েকটি গাড়ি নিয়ে শহর পরিভ্রমণে বের হতাম। পুলিশের গাড়ি, জিপ এবং সর্বোপরি পশ্চাতে কালো কাগজে ঢাকা মাইক্রোবাস নিয়ে কেরানীগঞ্জের কোন্ডার চেয়ারম্যান বিশাল বপুর শাহাবুদ্দিন আমার গাড়ির বহরে থাকত। তারা মনে করত, মাইক্রোবাসে কি যেন রয়েছে! কিন্তু শাহাবুদ্দিন নিজেই তা চালাত, গাড়িতে কিছুই নেই, দ্বিতীয় যাত্রীও নেই।

বিভিন্ন স্থানে গাড়ি থামিয়ে দোকান খুলে দেওয়ার অনুরোধ জ্ঞাপন করতাম। দোকানদার বা তাদের কর্মচারীদের কেউ আশে-পাশেই থাকত। নিবেদন করত, স্যার, আপনি বলছেন দোকান খুলে দিলাম, তারপর আপনি চলে যাওয়ার পর যখন হামলা হবে তখন সামলাবে কে?

যুক্তি অকাট্য। কিছু করার নেই। অনেক স্থানেই ঘরে তালা মেরে তারা সারাদিনের জন্য চলে যেত। এমনি এক পরিভ্রমণে কলাবাগানে আমাকে লক্ষ্য করে পিস্তলের গুলি বর্ষণ হলে মানুষজন যখন ছুটোছুটি করছিল আমি গোলাগুলির মাঝখানেই গাড়ি থেকে লাফিয়ে অবতরণ করলাম। চিৎকার করে নিজের পরিচয় দিয়ে কাপুরুষদের সম্মুখে আসতে বললাম। আমার লোকজন আকাশের দিক লক্ষ্য করে কয়েক রাউণ্ড গুলিবর্ষণ করল। আমি ঝোঁকের মাথায় অতিরিক্ত হৈচৈ করাতে এলাকার কয়েকজন মুরব্বী এসে অনেক অনুরোধ করে আমাকে গাড়িতে তুলে দিল। সঙ্গের কর্মীরা হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।

আরেক দিন আমার গাড়ি যখন পিজি হাসপাতালে সন্নিকটে এসেছে তখন দক্ষিণ পাশের ছাত্রদের হল থেকে বিরাট এক বোমা আমার গাড়িকে লক্ষ্য করে নিক্ষেপ করা হল। প্রচণ্ড আওয়াজে ঢাকা শহর প্রকম্পিত হয়ে উঠল।.ভাগ্যক্রমে গাড়ির উপর না পড়ে বোমাটি গাড়ির সম্মুখে পতিত হয়ে রাস্তায় একটি বড় গর্ত সৃষ্টি করল। একটু পেছনে পড়লেই সেদিন ভবলীলা সাঙ্গ হত।

তাদের হরতালের প্রতিবাদে আমাদের তরফ থেকে সভা-শোভাযাত্রা

আমরা অব্যাহত রাখলাম। এমনি এক শোভাযাত্রায় ভিআইপি জিপ লক্ষ্য করে পেট্রোল বোমা নিক্ষিপ্ত হল। আল্লাহ্ যখন মানুষকে রক্ষা করেন তখন কোন কিছুই তার ক্ষতি করতে পারে না।

আমার গাড়ির ড্রাইভার সবিনয়ে নিবেদন করল, স্যার, হরতালের সময় আমাকে গাড়ি চালাতে আদেশ দেবেন না—যখন তারা আপনাকে লক্ষ্য করে বোমা নিক্ষেপ করবে বা গুলিবর্ষণ করবে তখন আপনার সঙ্গে আমিও মরব। আমার সন্তানেরা এখনও শিশু।

বললাম, ঠিক আছে। তুমি সচিবালয়ে বিশ্রাম কর। আমি নিজেই গাড়ি চালাচ্ছি।

এক শোভাযাত্রায় আমি মালেক সাহেবকে নিয়ে একটি জিপে ছিলাম। বহন-ক্ষমতা বহির্ভূত যাত্রী নিয়ে মোড় ঘুরতে গিয়ে জিপটি উল্টে গেল। আমি পড়লাম নিচে, আমার উপরে মালেক সাহেব, তার উপরে অন্যেরা এবং সকলের উপরে উল্টানো জিপটি। সেটি সরিয়ে ধরাধরি করে আমাদের দু'জনকে কোনক্রমে বেইলী রোডের আমার বাসস্থানে নিয়ে আসা হল। কর্মীদের এক বিরাট অংশ সেখানে এসে জড়ো হল। ডাক্তাররা এসে দেখলেন আমার পাল্‌স্ সর্বনিম্ন পর্যায়ে রয়েছে। এক সপ্তাহের পূর্ণ বিশ্রাম এবং ওষুধের ব্যবস্থা করলেন। ডাক্তাররা চলে যেতেই উঠে কর্মীদের সামনে আগামীকাল আবার শোভাযাত্রার প্রোগ্রাম দিলাম। মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন।

রাতে প্রেসিডেন্ট সাহেব টেলিফোনে সালেহাকে বললেন, আপনি আপনার কর্তাকে একটু সামলে রাখতে পারেন না? গভীর রাতে টেলিফোন এলে আমি ভয় পাই, হয়ত শুনব মহাসচিবকে কেউ বোমা মেরেছে বা গুলি করে মেরে ফেলেছে। অথবা সে কোন দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে। আপনি তাকে একটু ধীরে চলতে বলুন।

রানার মা ব্যথিত কণ্ঠে জবাব দেয়, আপনিই তো তাকে মহাসচিব বানিয়ে এই অবস্থা করেছেন। এরা এক ধরনের পাগল। যেটা ধরে সেটার শেষ না দেখে ছাড়ে না। ওকে কিছু বলে কোন লাভ হবে না!

গণচীনের প্রধানমন্ত্রী এবং কম্যুনিস্ট পার্টির প্রধান মি. ঝাও জিয়াং বেশ কিছুদিন পূর্বেই আমাদের দলের একটি প্রতিনিধি দলকে গণচীন সফর করার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। দলের চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি নীতিগতভাবে সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন এবং দলের মহাসচিবের নেতৃত্বে অবিলম্বে একটি প্রতিনিধি দল সে দেশ সফর করবে জানিয়ে দিয়েছেন। প্রতি মাসেই একাধিকবার চীনের রাষ্ট্রদূত আমার সঙ্গে দেখা করেন এবং সফরসূচি চূড়ান্ত করার জন্য তাগিদ দেন। দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি দেখিয়ে তাঁকে বুঝিয়ে রাখি। কিন্তু সে এর মধ্যে একটি চিঠি নিয়ে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করে

তাঁকেই তাগিদ দেন। তখন তিনি আমাকে ডেকে বলেন, দু'সপ্তাহের জন্য ঘুরে আসুন। আপনার কিছুটা বিশ্রামেরও প্রয়োজন।

তাঁকে জানালাম, সঙ্গে উত্তর কোরিয়াও যেতে হবে, আপনি তাদেরকেও কথা দিয়েছেন গণচীন সফরের সঙ্গে সেটিও যোগ করে দেবেন। আপনার সে দেশে যাওয়ার কথা ছিল, যেতে পারেননি। এখন আমারও যদি যাওয়া না হয় তা হলে কি ভালো দেখাবে!

তিনি খুশি হয়ে বললেন, খুব ভালো কথা মনে করেছেন। আপনাকে প্রায় তিন সপ্তাহই বাইরে থাকতে হবে। দেশের রাজনীতির যা হাল! যা-ই হোক, ওদের অনেকদিন পূর্বে কথা দেওয়া হয়েছে, ঘুরেই আসুন। দেশ উপকৃত হবে।

দুটি দেশের সফরসূচি একসঙ্গে প্রণয়ন করা হল। দুই রাষ্ট্রদূতসহ বসে একটা খসড়া তৈরি করে তাদের দেশদ্বয়ের অনুমোদনের জন্য তারা ফ্যাক্স করে দিল। অচিরেই সে খসড়া অনুমোদিত হয়ে এল। দলের টিম আমিই ঠিক করলাম, চেয়ারম্যান সাহেব তাতে অনুমতি দিলেন। আবুল খায়ের চৌধুরী, তাজুল ইসলাম চৌধুরী, শামীম আল মামুন, ফরিদ আহমেদ এবং সাঈদ সিনহাকে নিয়ে প্রতিনিধি দল গঠন করলাম। বিএসএস থেকে সাংবাদিক দেলোয়ার হোসেন যাচ্ছে। বাসায় যখন সব বললাম, রানা বলল, আব্বা, আমাকে সঙ্গে নেবে? আমার খুব চীনের প্রাচীর দেখার শখ!

সে সাধারণত আমার সঙ্গে কোথাও যেতে চাইত না। সে তখন ইন্টার মিডিয়েটে সাইন্স পড়ছে ঢাকা নটরড্যাম কলেজে।

বললাম, আমার আপত্তি নেই। কিন্তু তোমার মায়ের অনুমতি নাও। ছোটবেলায় তোমাকে একবার স্টেডিয়ামে ছেড়ে এসেছিলাম বলে সে তোমাকে আর আমার সঙ্গে কোথাও দেয় না।

তার মা হেসে বলল, এখন রানা বড় হয়েছে, এখন আর ভয় নেই। তুমি স্বচ্ছন্দে ওকে নিয়ে যেতে পার।

রানার আনন্দ আর ধরে না।

দুই দেশের রাষ্ট্রদূতদের আমার একান্ত সচিব জানাল মহাসচিবের একমাত্র ছেলেও সফর-সঙ্গী হতে চায়। তার টিকেট আমরাই ক্রয় করব। তারা যেন তাকে কেবল প্রতিনিধিদের পর্যায়ভুক্ত করে নেয়। তারা সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে সে প্রস্তাব গ্রহণ করল এবং রানার টিকেটও আমাদের ক্রয় করতে দিল না। সব খরচ তারাই বহন করল। তাদের বদান্যতায় মুগ্ধ হলাম।

গণচীন ও উত্তর কোরিয়া দুটিই সমাজতান্ত্রিক দেশ। আমরা ভিন্ন ধারার রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। তবুও আমাদেরকে তাদের দেশে আমন্ত্রণের মধ্যে যে আগ্রহ এবং সদিচ্ছা দেখা গেল তার তুলনা হয় না। দুই রাষ্ট্রদূতই

আমাদেরকে নৈশভোজে আপ্যায়িত করল এবং সেখানে তাদের দেশ সম্পর্কে একটা সাধারণ ধারণা প্রদান করল। চীন দেশীয় খাবার আমরা অত্যন্ত পছন্দ করি শুনে তারা আনন্দিত হল। উভয় দেশেই কম-বেশি একই খাবারের প্রচলন রয়েছে। তবে দেশ ভেদে রান্নার তারতম্যে খানিকটা পার্থক্য ধরা পড়ে। রাষ্ট্রদূতদ্বয়ের বাড়িতে নৈশভোজেই একটা ধারণা জন্ম নিল—সামনের প্রায় এক মাস আমাদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা কি রকম হবে! দুটি নৈশভোজই আমরা উপভোগ করলাম।

চীন যাত্রার দিন ঘনিয়ে এল। দীনা তখন বছর দশেকের। সে ঠোঁট ফুলালো, আব্বা, ভাইয়াকে নিয়ে যাচ্ছ, আমাকে নিচ্ছ না!

বললাম, মা, তুমি চলে গেলে তোমার আম্মাকে দেখবে কে?

ও বলল, আম্মাকেও নিয়ে চল।

বললাম, ভালোই বলেছ। কিন্তু ওরা যে সমস্ত পরিবার নিমন্ত্রণ করেনি।

ও তখনই যুক্তি দেখাতে শুরু করেছে, ভাইয়াকেও তো নিমন্ত্রণ করেনি। তাকে নিতে পারছ, শুধু আমার বেলায় এত কথা!

রানা সালিশী করে দিল, তোকে আব্বা পরের বার নিয়ে যাবে। এবার আর আবদার করিস না।

ওর অভিযোগ তখনও যায়নি, আব্বা, ভাইয়াকে বেশি ভালোবাসে!

ওকে কোলে তুলে নিয়ে অনেক আদর করে বললাম, তুমি তো আমার মা, তোমাকে কম ভালোবাসি?

সে সেবারের মতো মেনে গেল।

সালেহা মজা দেখছিল। ও বলল, মেয়ের কাছে কেমন জব্দ!

অনেকদিন থেকেই পত্রপত্রিকায় লেখালেখি হচ্ছিল আমাকে শীঘ্রই প্রমোশন দিয়ে ডেপুটি-প্রাইম মিনিস্টার করা হবে। কয়েকবার প্রেসিডেন্ট সাহেবও ধারণা দিয়েছেন, You deserve a promotion. কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। আমার স্বভাবেও নিজের জন্য তদবিরের কোন সুযাগ নেই। তবুও সফরে রওয়ানা হওয়ার পূর্বদিন যখন রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করলাম, তিনি চীন ও উত্তর কোরিয়ার নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনার বিষয়ে কয়েকটি সূত্র প্রদান করলেন। মি. ঝাও জিয়াং এবং কিম ইল সুং-এর বরাবর ব্যক্তিগত চিঠি এবং উপহার প্রদান করলেন। সব শেষে যখন বিদায় নিতে যাচ্ছি, তখন বলেই ফেললাম, স্যার, কাল দ্বিপ্রহরে ফ্লাইট। সব গোছগাছ করে আর সময় পাব না দ্বিতীয়বার দেখা করার। যাদের নিমন্ত্রণে যাচ্ছি, তাদের একজন অত বড় দেশের প্রধানমন্ত্রী এবং পার্টির সেক্রেটারি জেনারেল, অন্যজনও সেদেশের চেয়ারম্যান এবং দলের সেক্রেটারি জেনারেল। আমি মহাসচিব হয়েও কেবল একজন ক্যাবিনেট মিনিস্টার। আপনি কয়েকবারই বলেছেন, আমার পদোন্নতি প্রাপ্য। যদি তা-ই হয়, এখনই কী সময় নয়? চীন ও

কোরিয়া কী যাব কেবল একজন সাধারণ মন্ত্রী হিসাবে? সেটা কী মানানসই হবে স্যার?

তিনি এক মিনিট চিন্তা করে বললেন, ঠিকই বলেছেন। শুধু একজন ক্যাবিনেট মিনিস্টার হয়ে প্রধানমন্ত্রী ও দেশের চেয়ারম্যানের আমন্ত্রণে যাওয়া সঠিক দেখায় না। দেখি কী করা যায়! আপনি তো বাসায়ই থাকবেন?

বললাম, একবার পার্টি অফিসে যাব। সেখান থেকে এসে বাসায়ই থাকব।

তিনি বললেন, আমি রাতের মধ্যেই আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব।

সারাদিন কাটল অধীর প্রতীক্ষায় কখন রাষ্ট্রপতির ডাক আসে। কিন্তু তাঁর নিকট থেকে কোন সংবাদ এল না। ভগ্ন মন নিয়ে পার্টি অফিস থেকে ফিরে এসে বেশ রাত করেই ঘুমোতে গেলাম, যদি টেলিফোন আসে!

সকাল থেকে প্রস্তুতি নিচ্ছি। লোকজনও আসছে প্রচুর। যাতায়াত নিয়ে প্রায় মাসখানেকের ধাক্কা। শেষ মুহূর্তের তদবির সবসময়ই অপেক্ষা করে থাকে।

রানা সাথে যাচ্ছে। সে গরম কাপড় নিচ্ছে কিনা, কী কী নিচ্ছে খোঁজ নিতে উপরে উঠতেই লাল টেলিফোন বেজে উঠল। ধরতেই প্রেসিডেন্ট সাহেবের কণ্ঠস্বর, মোয়াজ্জেম, কনগ্রেচুলেশন্‌স, আপনাকে ডেপুটি-প্রাইম মিনিস্টার করা হল। এক্ষুণি স্বাক্ষর করলাম, আজ ঘোষণা যাচ্ছে, ফিরে এলে শপথ হবে।

বললাম, স্যার, আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। আমি এখনই আসছি ব্যক্তিগতভাবে কৃতজ্ঞতা জানাতে।

তিনি বললেন, আমি জানি দুপুরে আপনার ফ্লাইট, হাতে সময় কম। আসার প্রয়োজন নেই, ফিরে এলেই দেখা হবে। ওখান থেকে সুযোগ পেলেই ফোনে সব খবরাদি দেবেন। এই নিন, আমার স্ত্রীর সাথে কথা বলুন।

ফার্স্ট লেডি টেলিফোন ধরে অভিনন্দন জানালেন এবং অনেক শুভ কামনা করলেন।

তাঁকেও অজস্র ধন্যবাদ দিলাম।

সময় হতে নিচে নেমে সমবেত কর্মী এবং দর্শনার্থীদের সুখবর দিলাম। সকলেই পরম উল্লাস প্রকাশ করল।

দায়িত্বপ্রাপ্ত মহাসচিব জাফর ইমাম এসে উপস্থিত, আমাকে এয়ারপোর্টে পৌঁছে দিতে এসেছে। তার সঙ্গে গাড়িতে যখন বিমানবন্দরে প্রবেশ করছি তখনই গাড়ির রেডিওতে ঘোষণাটি ভেসে এল, রাষ্ট্রপতি হোসেন মোহাম্মদ এরশাদ এক আদেশবলে আজ জাতীয় পার্টির মহাসচিব ও স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেনকে সরকারের উপ-প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেছেন। নব নিযুক্ত উপ-প্রধানমন্ত্রী দ্বিপ্রহরে বিমানযোগে গণপ্রজাতন্ত্রী চীন ও উত্তর কোরিয়া সফরের উদ্দেশে হংকং-এর পথে রওয়ানা

হচ্ছেন। দুই দেশে প্রায় তিন সপ্তাহের সরকারি সফর শেষ করে দেশে প্রত্যাবর্তন করলে উপ-প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তিনি শপথ গ্রহণ করবেন।

জাফর ইমাম খবরটি শুনেই আনন্দে লাফিয়ে উঠল, শাহ্ ভাই, আপনি আমাকে কিছুই বলেননি! কনগ্রেচুলেশান্স। অনেক অনেক অভিনন্দন।

বললাম, তোমাকে সারপ্রাইজ দেওয়ার জন্যই খবরটি দিইনি! তাছাড়া আমিও কিছুক্ষণ পূর্বেই জানতে পারি।

এয়ারপোর্টে অনেক ফুলের তোড়া আর মালার সমাগম দেখা গেল। কয়েকজন মন্ত্রীও এসেছেন বিদায় জানাতে। নতুন খবরে সকলেই আনন্দিত। রানার আম্মা সাধারণত আমার আসা-যাওয়ার সময় বিমানবন্দরে আসে না। আজ এসেছে। সব ফুল এবং মালা শেষ পর্যন্ত গিয়ে তার ওখানেই স্থিতি পেল।

দলের কর্মীরা বলছিল, ভাই ডিপিএম হওয়াতেই ভাবী এয়ারপোর্টে এসেছে!

বললাম, সেজন্য নয়। তার ছেলে আজ বিদেশে যাচ্ছে, তাকে বিদায় জানাতেই তার আসা। আমি এলাম, না গেলাম তা নিয়ে তার মাথা ব্যথা নেই।

সালেহা রানাকে নিয়েই ব্যস্ত। এদিকে খেয়াল দেবার সময় নেই।

থাই এয়ার লাইনসের প্লেনে আমরা হংকং পর্যন্ত যাব। সেখান থেকে চায়না এয়ার লাইন্সে পিকিং বা বেইজিং। আট জনের মধ্যে কেবল আমারই ছিল প্রথম শ্রেণীর টিকেট। আর সবাই ইকনমি ক্লাসে। সাত জন একসাথে থাকলে নরকও স্বর্গ হয়ে ওঠে। আমি আছি একা। খবরের কাগজ, ম্যাগাজিন পড়ে সময় কাটাচ্ছি। আমার পাশের সিট যাত্রীশূন্য ছিল।

এয়ার হোস্টেজ এসে সবিনয়ে বলল, ইউর এক্সেলেন্সি, আপনি যদি অনুমতি করেন তা হলে বিমানের ক্যাপ্টেন একবার আপনার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে আসতে চায়।

বললাম, বিমানের সে-ই হচ্ছে সর্বময় কর্তা, তার অনুমতির প্রয়োজন হয় না। অবশ্যই আসতে বলুন। আমি খুব আনন্দিত হব তার সঙ্গে আলাপ করে।

থাই ক্যাপ্টেন এসে হাসিমুখে দাঁড়াল। হাত মিলিয়ে শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর আমার পাশে বসে বলল, মি. ডেপুটি প্রাইম মিনিস্টার, আমি শুনেছি তোমার ছেলেও এই প্লেনে ইকনমি ক্লাসে রয়েছে। আমি তাকে 'আপগ্রেডেড্' করে দিচ্ছি। সে তোমার সঙ্গে প্রথম শ্রেণীতে ভ্রমণ করুক, ছেলের সঙ্গ পাবে, তোমার একাকিত্ব দূর হবে।

তাকে অনেক ধন্যবাদ দিলাম। জানি প্লেনে ক্যাপ্টেনই প্রধান। তার পক্ষে এটা আইনসিদ্ধ। সে স্টুয়ার্ডকে বলে দিল ইকনমি ক্লাস থেকে রানাকে প্রথম

শ্রেণীতে নিয়ে আসতে। আমার ধারণা ছিল, প্রথম শ্রেণীতে ভ্রমণ করার সুযোগ পেলে রানা আরও খুশিতে আত্মহারা হবে। কিন্তু ছেলে আমাকে অবাক করে দিল। স্টুয়ার্ডকে ধন্যবাদের সঙ্গে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল। সে বলল, আমার পিতা ডিপিএম, সে ফার্স্ট ক্লাসে ট্রাভেল করতে পারে। কিন্তু আমি একজন ছাত্র। আমার এটা শোভা পায় না।

স্টুয়ার্ড, ক্যাপ্টেন, হোস্টেজরা সকলেই বলাবলি করছিল, কলেজের ছাত্রের এই মনোভাব সত্যিই প্রশংসনীয়, সহজে দেখা যায় না। শুনে পিতা হিসাবে গর্বিত হলাম। সকলকে দেখতে ইকনমি ক্লাসে গেলাম। হাসি-গল্পে ওরা সবাই মশগুল। রানাই আনন্দ করছে বেশি। আবুল খায়ের চৌধুরী সাহেব বললেন, ভাই, আপনি আমাদের ভাতিজাকে আমাদের নিকট থেকে নিয়ে যেতে চাচ্ছেন, কাজটা ভালো হচ্ছে না। আমরা রানাকে নিয়ে অনেক আনন্দ করছি।

বললাম, আমি নিতে চাইনি। এটা ছিল ক্যাপ্টেনের বিবেচনা। ঠিক আছে, আপনারা আনন্দে থাকলেই আমি সন্তুষ্ট।

আমি ফিরে আসতেই খায়ের ভাইও সাথে উঠে এল এবং বলল, ভাই আপনার ছেলেকে আমি আজ প্রাণ ভরে দোয়া করছি। এই বয়সে সে যে লোভ সংবরণ করল—তা সচরাচর দেখা যায় না।

বললাম, দোয়া করবেন সে যেন চিরদিন এমনই নির্লোভ থাকতে পারে।

কিন্তু খাবারের সময় আমিই সব ভেস্তে দিলাম। ইকনমি ক্লাসের খাবারও ভালো। কিন্তু ফার্স্ট ক্লাসের খাবারের তুলনা হয় না। আমি স্টুয়ার্ডকে এবার বললাম, আমার ছেলেকে গিয়ে বলুন তাকে ফেলে আমি খাব না। অন্তত খাওয়ার সময় সে আমাকে সঙ্গ দিক। না আসতে চাইলে বলবেন, তোমার বাবা সেক্ষেত্রে না খেয়ে থাকবে।

সে ঠিকমতোই বলেছে। আমাদের প্রতিনিধিরা সবাই রানাকে জোর করে উঠিয়ে দিয়ে গেল।

সে বলল, আব্বা, সবাই ওই খাবার খাচ্ছে, আমার তাদের সঙ্গেই খাওয়া উচিত নয়?

বললাম, না, তোমাকে এবেলা আমার সঙ্গেই খেতে হবে। এরপর থেকে ওদের সঙ্গে খেয়ো।

সে আর কথা বাড়াল না। ওরা খাবার সার্ভ করল।

যখন বিভিন্ন দেশে সরকারি সফরে যাই, যে সম্মান এবং আতিথেয়তা তারা প্রদর্শন করে তা দেখে আশ্চর্য হয়ে যাই। পৃথিবীর অন্যতম দরিদ্র এবং ছোট দেশ আমাদের। কোন প্রত্যাশা আমাদের নিকট তাদের থাকতে পারে না। অধিকাংশই দাতা এবং আমরা গ্রহীতা। তারপরও যে সৌজন্যমূলক

আচরণ তারা করে থাকে তাতে মনে হয়, বুঝি দুটি সমপর্যায়ভুক্ত দেশের প্রতিনিধি বিনিময় হচ্ছে।

চীন বিরাট দেশ। একসময় মাঞ্চুরীয় শাসনামলে আফিমের নেশায় বুঁদ হয়ে ঝিমিয়ে থাকা জাতি মাও-সে-তুঙের নেতৃত্বে জেগে উঠেছে। রাজতন্ত্রের অবসানে দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে ঘুমন্ত জাতি এক মহা কর্মযজ্ঞের ব্রত নিয়ে জেগে উঠেছে। আফিম বিদায় হয়েছে, নতুন কর্মযোগের নেশায় তারা এখন আচ্ছন্ন।

চীনদেশে কম্যুনিস্ট শাসন চলছে। পার্টির সেক্রেটারি জেনারেলই সর্বাধিক ক্ষমতাবান ব্যক্তি, তিনি প্রধানমন্ত্রীও বটে। আমি গতকাল পর্যন্ত ছিলাম ক্যাবিনেটের অন্যতম সদস্য। এদের নিকট তার মূল্য যৎকিঞ্চিত। মূল্য যা ছিল, সে কেবল ক্ষমতাসীন দলের মহাসচিব হওয়ার কারণে। তাদের মহাসচিব মহাক্ষমতাধর, সে কারণেই মহাসচিব বিষয়ক দুর্বলতা।

মহাচীনের রাজধানী বেইজিং পৌছে যে সম্বর্ধনা পেলাম সেটা আমাদের প্রত্যাশার বহির্ভূত। এক দল টপ ব্রাস। কে যে কার বড় কিছুই বুঝার উপায় নেই। পরনের পোশাক দেখে আন্দাজ করা কঠিন। কোট, ওভারকোটের উপর দিয়ে অনেক প্রকারের তারকা খচিত রয়েছে। একজন প্লেনের দোরগোড়ায় এসে স্বাগত জানাল, জানা গেল তিনি পররাষ্ট্র বিষয়ক একজন মন্ত্রী এবং আমাদের এই সফরের সার্বিক দায়িত্বে নিয়োজিত। তাঁকে দেখে অন্যান্য সকলে স্যালুট করাতে বুঝতে সক্ষম হলাম—উপস্থিত তিনিই কর্তা ব্যক্তি। তিনি মিনিস্টার-ইন-ওয়েটিং। সঙ্গে একটি তরুণী দোভাষী রয়েছে। কথাবার্তা তিনি চীন ভাষায়ই বললেন, আমাকে মাতৃভাষার পরিবর্তে ইংরেজিই ব্যবহার করতে হল। পরে একসময় রাষ্ট্রদূতকে বললাম, ওরা যদি চীনা ভাষা ব্যতীত অন্য ভাষা ব্যবহার না করে তা হলে আমরাই কেন বাংলা ব্যবহার না করে ইংরেজিতে আলাপ করছি!

সে বলল, স্যার, আমরা বললে ওরা বাংলা জানা দোভাষী নিয়োগ করবে। তবে সে বাংলা বুঝাতে আমাদের কাউকে আবার উপস্থিত থাকার প্রয়োজন হবে।

রাষ্ট্রদূত ঠিকই বলেছিল। ছোটবেলায় শুনেছি, এক ইংরেজ সাহেব বাংলা

শিখেছে, সে যত্রতত্র বাংলা বলার প্রয়াস পায়। তার বিশুদ্ধ বাংলা চলতি ভাষায় অভ্যস্ত সাধারণ মানুষদের বোধগম্য হতে বিড়ম্বনার একশেষ।

সাহেব একদিন নদীর পার দিয়ে হাঁটছে। একটি নৌকা নদী বেয়ে যাচ্ছে, সাহেবের ইচ্ছা হল, নৌ-ভ্রমণের। সে আহ্বান করল, 'ওহে কর্ণধার, তরণী তটে সংলগ্ন কর।'

মাঝি তার কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝেনি। সে তার মতো নৌকা বেয়েই চলেছে। সাহেব পুনঃ পুনঃ একই আহ্বান জানাতে লাগল। কিন্তু সবই বিফল।

এক পথিক বিষয়টি বুঝতে পেরে হাঁক দিল, এই বেটা মাঝি, নৌকা পাড়ে ভিড়া।

সঙ্গে সঙ্গে মাঝি নৌকা ভিড়িয়ে দিল। সাহেব চমৎকৃত। জিজ্ঞেস করল, তুমি কোন ভাষায় মাঝিকে ডাকলে?

সে জবাব দিল, বাংলা ভাষায়। তবে সেটা পুস্তকের ভাষা নয়। সাধারণ মানুষের কথ্য ভাষা।

এই বেইজিং শহরেই আমাদের এক অনুরূপ অভিজ্ঞতা হল। 'পিকিং ডাক' বলে একটা বিখ্যাত রেস্তোরাঁ রয়েছে বেইজিং-এ। সেখানে কেবল ডাক বা রাজহংসেরই হরেক প্রকার রান্না পরিবেশন করা হয়। বিদেশীরা সে রেস্তোরাঁ খুবই পছন্দ করে। একদিন নৈশভোজে আমাদেরকেও সেই রেস্তোরাঁয় নিয়ে যাওয়া হল। সরকারি গেস্ট হাউস, যেখানে আমরা অবস্থান করতাম, সর্বত্র আমাদের সঙ্গে অন্যান্য কর্মকর্তা, মিনিস্টার-ইন-ওয়েটিং এবং দোভাষীরাও খাবার টেবিলে অংশগ্রহণ করল। 'পিকিং ডাকে'ও সবাই উপস্থিত। আজ এক বাংলা বিশারদ দোভাষীকে আনা হয়েছে। সে চাইনিজ উচ্চারণে বিশুদ্ধ বাংলা ভাষার শ্রাদ্ধ করে ছাড়ল!

ডাকের শরীরের বিভিন্ন অংশ দিয়ে বিভিন্ন পদ রান্নার বিবরণ দিতে গিয়ে সে বলল, ইহা মস্তিষ্ক প্রসূত, এই খাদ্যটি বক্ষপিঞ্জর হইতে সংগৃহীত, ইহা পাদুকার দ্বারা প্রস্তুত।

সকলেই একসঙ্গে হেসে উঠল। যদিও আমাদের বুঝতে অসুবিধা হল না যে, খাবারগুলো ডাকের মাথা, বুক এবং পায়ের অংশ দ্বারা প্রস্তুত।

হেসে বললাম, মস্তিষ্ক আর বক্ষে আপত্তি নেই, কিন্তু খাওয়াতে এনে 'জুতা খাওয়াচ্ছেন', কাজটা কী ভালো হল?

ওরা প্রথমে বুঝতে পারেনি। রাষ্ট্রদূত ওদের বুঝিয়ে দিতেই হাসতে হাসতে টেবিল প্রকম্পিত করল। তরুণী দোভাষী বিষম খেল।

বিমানবন্দরে সকলের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ওদের নাম-পদবি মনে রাখা দুষ্কর। আমাদের রাষ্ট্রদূত পাশে পাশে থেকে যতটা সম্ভব আমাকে সহায়তা দিচ্ছিল। বিমানবন্দরের আনুষ্ঠানিকতা শেষে

আমাদেরকে শহরের মধ্যদিয়ে মোটর শোভাযাত্রা সহকারে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবনে নিয়ে যাওয়া হল। অতিথি ভবনের একটি কমপ্লেক্স রয়েছে। অতিথি ভেদে ভবন বরাদ্দ করা হয়। শুনলাম, রাষ্ট্রপতি এরশাদকে পাশের ভবনটি বরাদ্দ করা হয়েছিল। আমাদেরকে দিল এমন একটি ভবন যা অতিথি প্রধানমন্ত্রীদের দেওয়া হয়। ভবনে এত ঘর রয়েছে যে, একটি পল্টন সেখানে অনায়াসে ঢুকিয়ে দেওয়া যায়।

দ্বিতলের সবচাইতে প্রশস্ত এবং বিলাসবহুল স্যুটটি আমার জন্য সংরক্ষিত ছিল। রানাকে আমার ঘরে আসতে বলাতে সে ঘোরতর আপত্তি জানাল, আব্বা, দেখে যাও আমার জন্য কত সুন্দর একটি ঘর দেওয়া হয়েছে! আমি সে ঘরেই থাকব।

তার ঘরও দ্বিতলে আমার স্যুটের পাশেই। দেখে এসে হাসিমুখে সম্মতি জানালাম। ছেলে বড় হয়ে গিয়েছে!

রানার বয়স যা-ই হোক, আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় স্বাস্থ্য তার ভালো। দেখতেও আমার মতো হতশ্রী হয়নি। লোকে বলে, চেহারায় আমার সাদৃশ্য পেলেও গায়ের-রঙ শারীরিক গঠনে অনেকটা মায়ের ধাঁচ পেয়েছে। তবুও রক্ষা, সেটাও যদি আমার মতো পেত তা হলে অসুবিধা ছিল! দলনেতার ছেলে এবং বয়সে সর্বকনিষ্ঠ বলে তার আদরও ছিল সার্বজনীন। দেখলাম আমার তরুণী দোভাষীর দৃষ্টি পিতার চাইতে পুত্রের দিকেই অধিকতর বিনম্র।

কিন্তু সে-ই ভুল করল বড় ধরনের। রানাকে জিজ্ঞেস করল, তোমার সন্তান কয়টি?

ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসের ছাত্র, বিবাহিত কিনা জিজ্ঞেস না করে একেবারে সন্তান কয়টি জিজ্ঞাসার হেতু বোধগম্য হল না। আমরা সব তাকিয়ে আছি, রানা কি জবাব দেয়!

সে গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর করল, আমার একটি পুত্র সন্তান!

প্রশ্ন হল, সে কত বড় হয়েছে?

রানা বলল, তার বেশ বয়স হয়েছে। সে আমাদের দেশের উপ-প্রধানমন্ত্রী। সম্প্রতি আমার সঙ্গে চীন ভ্রমণে এসেছে।

এতক্ষণে মেয়েটি তার বোকামি বুঝতে সক্ষম হল! ফরসা মেয়ে, লজ্জায় লাল হয়ে গেল। সালেহা বলেছে, ওই মেয়ে অনেকদিন রানার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে পরে হাল ছেড়ে দিয়েছে। রানার ধাতই পৃথক।

অতিথি কমপ্লেক্সে একটি বিরাট লেক রয়েছে। সুন্দরভাবে সেটি রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। অনেক রঙের পাখি, হাঁস প্রভৃতি তার শোভা আরও বর্ধন করেছে। কয়েকদিন পর প্রচণ্ড শীত এলে সে লেকের পানি বরফ হয়ে গেল। লেকের পাড়ে রানা আর সাংবাদিক দেলোয়ারের পরস্পরে বরফ

নিক্ষেপের সেকি ছেলেমানুষি খেলা! দেলোয়ার ছিল তার সার্বক্ষণিক সঙ্গী। তারা একটি গাড়ি পেয়েছিল দু'জনায়। শুধু আমার জন্য পৃথক গাড়ি। সেখানে কর্তব্যরত মন্ত্রী এবং দোভাষীর স্থান নির্দিষ্ট ছিল। অন্য সকলের জন্য প্রতি দু'জনে একটি গাড়ি। রানা গলায় ক্যামেরা ঝুলিয়ে ঘোষণা দিল, দেলোয়ার চাচা সাংবাদিক আর আমি এই দলের ফটোগ্রাফার।

সে ছবি ভালোই তুলত। কারো ছবি তোলার প্রয়োজন হলেই রানার খোঁজ পড়ত। রানা যখন আমার ও ঝাও জিয়াং সাহেবের ছবি তুলছিল, তখন তিনি মন্তব্য করেছিলেন তোমাদের ফটোগ্রাফারের বয়স নিতান্তই কম।

মিনিস্টার-ইন-ওয়েটিং তাঁকে জানিয়ে দিল, সে পেশাগত আলোকচিত্রী নয়। সে মাননীয় উপ-প্রধানমন্ত্রীর পুত্র। চীনের প্রাচীর দেখার আগ্রহে পিতার সফরসঙ্গী হয়েছে।

ঝাও জিয়াং সাহেব রানাকে কাছে ডেকে স্নেহ দেখালেন।

রাষ্ট্রদূত প্রথম দিনই একটি ছাপানো কর্মসূচি দিলেন। প্রায় তিন সপ্তাহব্যাপী প্রোগ্রামের দিন, তারিখ, স্থান ও সময় নির্ধারণ করে প্রতিটি কর্মসূচির জন্য কত সময়, যাতায়াতের সময় সব কিছুই উল্লেখ করা রয়েছে। রাষ্ট্রদূতের বাসস্থানে আমাদের দেওয়া রিসেপশনের উল্লেখ রয়েছে। কাজের মধ্যে এতটুকু ভুল-ভ্রান্তির সুযোগ নেই। সবকিছু নিখুঁতভাবে লিপিবদ্ধ করা রয়েছে। আমাদের সফরসূচিতে সরকার পক্ষের বা কম্যুনিস্ট পার্টির কর্মকর্তাদের সঙ্গে প্রায় প্রতিদিনই আনুষ্ঠানিক বৈঠক, দ্বিপাক্ষিক আলোচনা, সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকার সন্নিবেশিত ছিল। দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন কল-কারখানা এবং উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ড সরেজমিনে পরিদর্শন। তৃতীয়ত, ঐতিহাসিক এবং বিপ্লবজনিত খ্যাত স্থানসমূহ পরিদর্শন এবং চতুর্থত, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ। তারা আমাদের প্রোগ্রাম এভাবে সেট করেছিল যাতে প্রাতরাশ সেরে আমরা বেরিয়ে পড়তে পারতাম। দ্বি-প্রাহরিক ভোজের নিমন্ত্রণ না থাকলে অতিথি ভবনে প্রত্যাবর্তন করে লাঞ্চ গ্রহণ, বিশ্রাম সেরে আবার বেরিয়ে পড়া। সান্ধ-চায়ের ব্যবস্থা একাধিক স্থানে করা রয়েছে দেখা যেত। রাত পর্যন্ত সেদিনের কর্মসূচি সেরে ঘরে ফিরে আসা। নৈশভোজ না করে থাকলে অতিথি ভবনের বিশাল খানা-কামরায় সর্ব প্রকার সুস্বাদু দৈনিক রান্নার অপূর্ব স্বাদ গ্রহণ। এ কাজটিতে খায়ের চৌধুরী সাহেব সকলকে টেক্কা দিতেন। তিনি ছিলেন সর্বভুক। পাথর খেয়েও হজম করার মতো শক্তি রাখত তার পাকস্থলী। আমরা সকলেই অতিথি ভবনের বিশেষ বিশেষ রান্নার ভক্ত হয়ে উঠলাম।

রাঁধুনী এবং পরিবেশনকারিনীরাও আমাদের খাইয়ে, বিশেষ করে খায়ের ভাইকে খাইয়ে তৃপ্তি পেত। তারা হাসিমুখে আমাদের খাবার দেখত এবং মা-বোনের স্নেহে এটা-ওটা এগিয়ে দিয়ে আরও খেতে উৎসাহ যোগাত। চাইনিজ

খাবারের বিশেষ গুণ—ভূরিভোজ হলেও পেটে কোন ব্যাধির সৃষ্টি করে না। তা না হলে খায়ের ভাইকে সুস্থ ফিরিয়ে আনা যেত না।

তাজুল ইসলাম চৌধুরীর দায়িত্ব ছিল সকলের খবরদারী করা এবং ঠিক সময়ে আমার পূর্বেই যেন সকলে গাড়িতে আরোহণ ও অবতরণ করে তার তাগিদ দেওয়া। সে তার দায়িত্ব দক্ষতার সঙ্গেই পালন করছিল।

চীন ভ্রমণ ছিল আমাদের নিকট একটি অত্যন্ত চমকপ্রদ, আনন্দময় ও শিক্ষণীয় ভ্রমণসূচি। কেবল প্রচণ্ড শীতের প্রকোপ ব্যতীত সবই ছিল অত্যন্ত উপভোগ্য। অত শীত না থাকলে আমাদের সেই সফর আরও আকর্ষণীয় হত।

দেলোয়ার প্রতিদিনই একটি করে 'ডেসপাচ' পাঠাত এবং দূতাবাসের প্রেস কাউন্সিলারের সাহায্যে সেগুলোর যথোপযুক্ত সদ্ব্যবহারের চেষ্টা করত। দেশে টেলিফোন করে খবরাখবর সংগ্রহ করার চেষ্টা করেও সবসময় সফল হতাম না। টেলিযোগাযোগ শিল্পে ওরা তখনও ততটা উন্নতি সাধন করতে সক্ষম হয়নি।

আমাদের চীন দেশের সফরসূচি শুরু হল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং গণচীন কম্যুনিস্ট পার্টির তদানীন্তন প্রধান মি. ঝাও জিয়াং এর সঙ্গে আনুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে। কম্যুনিস্ট পার্টির হেড্ কোয়ার্টারে তাঁর সুবিশাল কার্যালয়ে আমাদের সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করা হল। সেদিন সেটিই ছিল আমাদের প্রথম কর্মসূচি। যথাসময়ে আমাদেরকে পার্টি দফতরে নিয়ে যাওয়া হল।

পার্টি অফিস সম্বন্ধে আমাদের ধ্যান-ধারণা হল—কয়েকটি অগোছালো কক্ষ। সংবাদপত্র, দলীয় প্রচারপত্র এবং দুনিয়ার অখাদ্য ম্যাগাজিন ও সাপ্তাহিকসমূহের ডিপো, কর্মীদের বসার বা আড্ডা দেওয়ার জন্য সাধারণ চেয়ার-টেবিল, কর্মকর্তাদের ঘর অপেক্ষাকৃত উন্নত হলেও অভুক্ত-অর্ধভুক্ত চা আর বিস্কুটের ছড়াছড়ি। পোড়া সিগারেটে সমৃদ্ধ অ্যাসট্রে এবং কিছু অবিন্যস্ত নথিপত্রের স্তূপ বা দু'-একটি বহু ব্যবহৃত আলমারি। অবশ্য প্রথম শ্রেণীর দলীয় কার্যালয়ে টাইপ রাইটার ও অন্যান্য আয়োজনও পরিলক্ষিত হয়। সভা করার জন্য একটি বড় ঘর। এই ছিল দলীয় কার্যালয় সম্বন্ধে আমাদের ধারণা।

সাক্ষাতের পূর্বে আমাদেরকে অফিস গৃহের কতিপয় অংশ ঘুরিয়ে দেখানো হল। সুবিশাল লাইব্রেরি, যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরির সমতুল্য। রাজনীতি সম্বন্ধীয় হেন পুস্তক নেই যা সেখানে দুষ্প্রাপ্য। আমাদের দেশের জন্য নির্দিষ্ট আলমারিতেও অনেক পুস্তক, আমাদের সংবিধান ও বিভিন্ন দলের ঘোষণাপত্র, কর্মসূচি রয়েছে। একইভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বই-পুস্তকেও তাদের অফিস সমৃদ্ধ। সেখানে বসে নিবিষ্ট চিত্তে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পড়াশুনার ব্যবস্থা রয়েছে। কেউ বিরক্ত করবে না।

তাদের সেক্রেটারিয়েট আমাদের সরকারি সচিবালয়ের চাইতেও সুশৃঙ্খল এবং ব্যবস্থায় উন্নত। ঝকঝকে আসবাবপত্র, কত না যন্ত্রপাতি এবং সুসজ্জিত নর-নারীরা সকলেই কাজে ব্যস্ত। অযথা গাল-গল্প বা গোলমাল সেখানে অনুপস্থিত। আমাদের পার্টি অফিস জমে সন্ধ্যার পর, অবসর মুহূর্তে। ওদের পার্টি অফিস প্রায় সার্বক্ষণিক। কিছুটা সরকারি অফিসের সময়সূচি মাফিক।

বিভিন্ন কামরায় পদানুযায়ী কর্তাব্যক্তিদের অবস্থান। বড় সভা কক্ষ, ছোট সভা কক্ষ। সম্মেলনের বিরাট হল। কর্মকর্তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের পৃথক কামরা সবই সেখানে বিদ্যমান। সবকিছু দেখতে হলে আমাদের সময়ে কুলাবে না বলে আংশিক দেখিয়ে আমাদেরকে কয়েকটি স্তর পেরিয়ে খোদ ঝাও জিয়াং সাহেবের সাক্ষাৎকার গ্রহণের ঘরে নিয়ে নির্দিষ্ট আসনসমূহে বসিয়ে দেওয়া হল। সবই পূর্ব নির্ধারিত, অন্যথা করার নিয়ম নেই। সকলেই নীরবে কাজ করে যাচ্ছে। এক্ষুণি সর্বোচ্চ বসের আগমন হবে।

ঝাও জিয়াং সাহেব সপারিষদ ঘরে প্রবেশ করলেন। আমাদের সকলের সঙ্গে উষ্ণ করমর্দন করলেন এবং তিনিও নির্দিষ্ট আসনে বসলেন। তাঁর এবং আমার সোফার মাঝে আমাদের দোভাষীয় বসার স্থান। শুনেছিলাম, তিনি ইংরেজি ভালোই জানেন। কিন্তু অন্য সকলের মতো চীন ভাষায়ই কথা বললেন। ওদের সরকারি ফটোগ্রাফার এবং রানা প্রচুর ছবি তুলল। টেলিভিশন ও আলোকচিত্র শিল্পীদের কাজ শেষ হলে আনুষ্ঠানিক আলোচনায় আসা গেল।

তিনি প্রথমেই আমাদেরকে মহাচীনে স্বাগত জানালেন। বললেন, এটি একটি বড় দেশ। এর বড় ইতিহাস রয়েছে। অনেক বড় বিপ্লবও এই দেশ করেছে। তোমরা যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছ। এই দেশের জনগণ, সরকার ও কম্যুনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে আমি তোমাদেরকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। এই দেশ দেখতে আসার জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আশা করি তোমাদের অবস্থান তাৎপর্যপূর্ণ হবে এবং তোমাদের এখানে কষ্ট করে আসা সার্থক হবে।

আমি তাঁকে প্রেসিডেন্ট এরশাদের চিঠি এবং উপহারের প্যাকেটটি হস্তান্তর করে বললাম, তুমি কেবল মহাচীনেরই নেতা নও, এত বড় জাতির নেতা হিসাবে তুমি বিশ্বেরও অন্যতম নেতা। আমাদের মতো গরিব দেশের একটি পার্টি—জাতীয় পার্টির প্রতিনিধিদের নিমন্ত্রণ করে এনে তুমি বড় মনের পরিচয় দিয়েছ। কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ তোমার প্রাপ্য। তোমার দেশে পদার্পণের পর থেকে যে উষ্ণ আতিথেয়তা আমাদেরকে অহরহ ঘিরে রেখেছে তার তুলনা হয় না। আমরা দেখব, শিখব এবং নিজেদের দেশে সে অভিজ্ঞতা বহন করে নিয়ে যাব।

তিনি খুশি হলেন এবং বললেন, এরশাদ সাহেব কেমন আছেন, তোমাদের দেশের হাল বল।

আমি আসার পূর্বপর্যন্ত দেশের যে রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল তা সবিস্তারে বর্ণনা করলাম। তিনি সব মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করলেন। দু'জন ব্যক্তি আমাদের সমস্ত কথোপকথন নোট করছিল।

তিনি সব শুনে বললেন, আমার ধারণা অতীতের রাজনৈতিক ব্যর্থতাজনিত কারণে এত উন্নয়নের কাজ করা সত্ত্বেও তোমাদের সরকার বিরোধিতা ভোগ করছে কেবল মাত্র রাজনৈতিক ঈর্ষা থেকে। এটা হবেই। যে কাজ তারা করতে পারেনি, সে কাজ তোমরা করছ। এটা তাদের কাছে প্রশংসিত হবার বাসনা তোমরা করো না। বিরোধিতার মুখেই তোমরা আরও উন্নয়নের কাজ করে দেশের মানুষকে তোমাদের পক্ষে নিতে পারো।

বললাম, দেশের অধিকাংশ মানুষ, বিশেষ করে গ্রামের মানুষ আমাদের পক্ষেই রয়েছে। তারা সাইলেন্ট মেজরিটি। ক্ষিপ্ত মাইনরিটিই আজ দেশের অভ্যন্তরে, বিশেষ করে নাগরিক জীবন বিপর্যস্ত করে তুলেছে।

তিনি বললেন, অনুন্নত দেশসমূহে এমনই হয়ে থাকে। এতে পিছপা' হলে চলবে না। গণচীন সর্বান্তকরণে তোমাদের দেশের সরকারকে এবং তাদের গণমুখী সংস্কারমূলক উন্নয়ন কর্মসূচি সমর্থন করে। তুমি এরশাদকে জানিয়ে দাও, আমাদের শুভেচ্ছা তাঁর সরকারের সঙ্গে আছে। আমরা যদি কোন কাজে লাগতে পারি, বাংলাদেশের কল্যাণে, আমাদের জানালে আমরা অবশ্যই করবো। আমরা তোমাদের সঙ্গে আন্তরিকভাবে একাত্মতা ঘোষণা করছি।

ঝাও জিয়াং এর এই অকুণ্ঠ সমর্থন পরদিন বাংলাদেশের সমস্ত পত্রিকাসমূহে বড় হেড লাইনে ছাপা হয়েছিল।

আমরা তাঁকে অজস্র কৃতজ্ঞতা জানালাম। তাদের মহান জাতি বিশ্বে যে নতুন অভিযাত্রা শুরু করেছে কর্মে ও সাধনায়, তার থেকে অনুন্নত ও দরিদ্র বিশ্ব উপকৃত হতে পারে বলে অভিমত ব্যক্ত করলাম।

তিনি আরও বললেন, তোমরা সব ভালো করে দেখ এবং তোমাদের মতামত জানিয়ে যেও। আমি প্রয়োজনে তোমাদের সাথে আবার কথা বলব।

তিনি উঠে দাঁড়ালেন। রানা এবং অন্যান্য ফটোগ্রাফারগণ এসে অনুরোধ করল সকলকে একসঙ্গে দাঁড়াতে; তারা ছবি নেবে। তিনি আমাকে হাত ধরে নিয়ে গিয়ে এক স্থানে দাঁড়ালেন। অনেক ছবি তোলা হল। এক পর্যায়ে রানাকে টেনে নেওয়া হল। সেই ছবি আজও আমাদের সংগ্রহে সযত্নে রক্ষিত।

রাতে অনেক চেষ্টায় প্রেসিডেন্ট সাহেবকে লাইনে পেলাম। তিনি আমাদের কুশল জানতে চাইলেন। আমি চীনা নেতার সঙ্গে সাফল্যমণ্ডিত

আলোচনার কথা বলায় তিনি খুশি হলেন। বললেন, ওখান থেকে একটা 'রাইট আপ' পাঠাবার ব্যবস্থা করুন। এখানকার সমস্ত কাগজে তার বিবরণ ছাপা হওয়া প্রয়োজন।

আমি জানালাম ইতিমধ্যেই তা করা হয়েছে।

জিজ্ঞেস করলাম, দেশের রাজনৈতিক অবস্থা কী রকম স্যার?

তিনি বললেন, নতুন কিছু নয়। আমাদেরকে হটাতে হবে এটাই তাদের মূল কথা। আপনি ও নিয়ে চিন্তা করবেন না। সফর শেষ করে চলে আসুন।

সেদিন ঝাও জিয়াং সাহেবের অফিস থেকে বের হতে আমাদের নিয়ে যাওয়া হল সুবিখ্যাত 'তিয়েন মিন স্কয়ারে'। সেখানেই গ্রেট হলের সন্নিকটে রক্ষিত আছে গণচীনের মহানায়ক মাও-সে-তুঙ এর মরদেহ। রাশিয়াতে যেমন দেখেছি, এখানেও একই পদ্ধতিতে গণচীনের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মহান নেতার দেহকে অবিনশ্বর করে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আশ্চর্য হয়ে যাই দেখে, বিজ্ঞান মানুষকে কোথায় নিয়ে গিয়েছে! বুঝবার কোন উপায় নেই এটি একটি মৃতদেহ। রণক্লান্ত মহান বিপ্লবী একটু বিশ্রাম নিচ্ছেন। তাঁর পরনের কোটটি, তাঁর প্যান্টটি পর্যন্ত নিখুঁত পরিপাট্যে রক্ষিত। কোথাও খুঁত ধরার ব্যবস্থা নেই। আমরা সেই মরদেহের সামনে নীরবে দাঁড়িয়ে আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করলাম।

তিনি একটি বিরাট জাতিকে ঘুম থেকে জাগ্রত করেছেন, তাদেরকে আত্মমর্যাদায় দীক্ষিত করেছেন, অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করেছেন, লং মার্চ করে একের পর এক বিজয় ছিনিয়ে এনেছেন, দুনিয়ার বুকে শ্রমজীবী মানুষের মুক্তির বাণী কেবল শুনিয়েই যাননি, তাদের মুক্তির মহামন্ত্র শিক্ষা দিয়ে সাফল্যজনকভাবে বাস্তবায়িত করে সকলকে জাগ্রত করে নিজে অনন্ত ঘুমের ঘোরে আশ্রয় নিয়েছেন।

মহান জাতির মহান নেতাকে অন্তর থেকে অজস্র শ্রদ্ধা নিবেদন করে সমাধিস্থল থেকে বের হয়ে এলাম।

প্রতিদিনই কোন না কোন কর্তাব্যক্তির সঙ্গে আমাদের সাক্ষাতের ব্যবস্থা থাকে। সাক্ষাতের পর অনিবার্যভাবে কোন কল-কারখানা বা কোন প্রকল্প প্রদর্শনের ব্যবস্থা থাকে। দেশে কোনদিন কোন কারখানায় প্রবেশ করিনি কিন্তু এখানে তাদের অগ্নিরোধক আলখেল্লা পরে, লোহার টুপি মাথায় দিয়ে ফারনেসের পাশে গিয়ে দাঁড়াচ্ছি; গলিত স্টিল বা অন্য কোন ধাতুর নব রূপায়ণ প্রত্যক্ষ করছি। ওদিকে ছবি তোলা হচ্ছে। সব শেষে অফিসে নিয়ে গিয়ে প্রচুর স্ন্যাকস্ সহযোগে চা সেবন এবং প্রত্যাবর্তনের সময় সে কারখানা বা প্রকল্পটির মনোগ্রাম উপহার হিসাবে গ্রহণ নৈমিত্তিক বিষয় হয়ে দাঁড়াল।

চীনের একটি বৈশিষ্ট্য খুব লক্ষণীয়। সম্রাট ও রাজাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে রাজতন্ত্রের অবসান করলেও ঐতিহাসিক মূল্যবোধের কারণে তাদের

কোন দুর্গ, রাজপ্রাসাদ, কোন প্রমোদভবন বা পুষ্পউদ্যান ওরা নষ্ট করেনি। সেসব পৌরাণিক কীর্তি হিসাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে। বর্তমান প্রজন্মের মানুষেরা আগ্রহ নিয়ে সেসব পরিদর্শন করছে। বেইজিং শহর ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে এ ধরনের যেসব দুর্গ বা রাজপ্রাসাদ, সম্রাটের প্রমোদ-উদ্যান রয়েছে সেগুলো আমাদের দেখানো হল। ওদের যেসব নাটক-নাটিকা বা গীতিনাট্য দেখার সুযোগ হল—প্রায় সবগুলোই পৌরাণিক কাহিনী ও রাজ-রাজড়াদের ঘিরেই রচিত। রঙ-বেরঙের প্রাচীনকালের মতো জোব্বা-জাব্বা পরিহিত নট-নটীর দল চ্যাং-ম্যাং করে কি অভিনয় করে ওরাই জানে। চীনারা খুব সমঝদারের মতো অভিব্যক্তি প্রকাশ করে। আমরা বোকার মতো বসে ভাবি, কখন অভিনয় শেষ হবে!

চীনের প্রাচীর দেখার জন্য রানা অস্থির হয়ে ছিল। আমাদেরও উৎসাহের অভাব ছিল না। কিন্তু কর্তৃপক্ষ আমাদেরকে জানাল ডিসেম্বর মাস হওয়ায় ওখানটায় অস্বাভাবিক শীত। অনভ্যস্ত ব্যক্তিদের অসুবিধা হতে পারে। যা-ই হোক না কেন, অচিরেই সেই মহাপ্রাচীর, পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের অন্যতম দেখার জন্য আমাদেরকে গাড়িতে করে বেইজিং থেকে প্রাচীরের নিকটতম পয়েন্টে নিয়ে যাওয়া হল। সমগ্র চীন জুড়েই প্রাচীরের অবস্থান। না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন, এত দীর্ঘ এবং প্রশস্ত একটি প্রাচীর মানুষের দ্বারা প্রস্তুত হয়েছে! এখন বরং মনে হয়, হিমালয় পর্বত যেমন মানুষ তৈরি করেনি, চীনের সেই সুবিশাল সহস্র-সহস্র মাইলের প্রাচীরও মানুষ তৈরি করেনি। দৈর্ঘ্যে সেই প্রাচীর প্রায় চীনেরই সমতুল্য, প্রস্থে একসঙ্গে বারো জন ঘোড়-সওয়ারি পাশাপাশি দৌড়াতে পারত। বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষার জন্য সে দিনের নৃপতিরা যা নির্মাণ করেছিলেন রাজকোষের অর্থ ব্যয় করে; আজ সেটিই হয়েছে সারা পৃথিবীর পর্যটকদের চীন ভ্রমণের আদি এবং অকৃত্রিম কারণ। চাঁদ থেকে পৃথিবীর যে দুটি জিনিস দৃষ্টিগোচর হয়, তার মধ্যে চীনের মহা প্রাচীর অন্যতম। অন্যটি দুবাই সমুদ্রবন্দর।

আমরা সাধ্যমতো শীতের কাপড় নিয়ে এসেছিলাম। রানার মা কোথায় শুনেছিল চীনের শীত খুব বাঘা। তাই আমাদের না জানিয়ে রানা ও আমার জন্য দুটি অস্বাভাবিক মোটা গরম ওভারকোট তৈরি করিয়ে দিয়ে দিয়েছিল। এখন বাপ-বেটায় তার কাজের খুব প্রশংসা করছি। কিন্তু হলে কি হবে, সে জিনিস তো এয়ার-প্রুফ নয়। বাতাস প্রবেশ করতে পারে এ ধরনের কাপড়ে এই শীত আটকায় না। কাপড়-চোপর পরে আমরা এক-একটি বস্তায় পরিণত হয়েছি। প্রথমে গেঞ্জি-জাঙ্গিয়া, পরে গরম লিঙ্গারী, পরে শার্ট-প্যান্ট, সোয়েটার এবং কোট। তার উপরে ওভারকোট, মাফলার এবং বাঁদরের টুপি। তবুও শীত মানে না। মানবে কী! ওটা তো শীতেরই কারখানা। প্রাচীরের ওখানকার আবহাওয়া সেদিন খুবই মন্দ। শীত নাকি বেশি পড়েছে। নিচে

গাড়ি রেখে হেঁটে উঠতে হয়। গাড়ি থেকে নামতেই মনে হল, সহস্র ছুরিকাঘাতে আমি জর্জরিত। শীত কোথা থেকে কীভাবে ঢুকছে আল্লাহ্ জানেন। আমি কেবল দেখছি আমি জমে যাচ্ছি। প্রাচীরের উপরে উঠেই জ্ঞান হারাবার উপক্রম। সঙ্গের নিরাপত্তা-কর্মীরা আমাকে ধরে তাড়াতাড়ি গাড়িতে নিয়ে এল।

কিন্তু রানা? সে কোথায়?

চেয়ে দেখি সেই প্রচণ্ড শীতের মধ্যেই সে প্রাচীরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পটাপট ছবি তুলছে। তাকে ডাকলাম, রানা, আর নয়, জলদি এসো।

সে থু থু ফেলল। সেটাও জমে বরফ হয়ে গেল। শীতে কাঁপছে, হয়ত পড়ে যাবে। তবুও অল্প বয়সের গরম রক্তের কারণে সে তখনও টিকে আছে। হঠাৎ দেখি রানার গাল, ঠোঁট চৌচির হয়ে রক্ত ঝরছে এবং সঙ্গে সঙ্গে সে রক্ত বরফ হয়ে যাচ্ছে। ছেলের এ অবস্থা কোন পিতা সহ্য করতে পারে না। গার্ডদের বললাম, ওকে জোর করে ধরে গাড়িতে ঢুকিয়ে দিতে।

ওরা তা-ই করল। কথা বলার সময় নেই। চীনাদের কাছেও সেদিনের শীতকে পাঁজি শীত বলে মনে হচ্ছে। তারা রানাকে জোর করে ধরে এনে গাড়িতে ওঠাতে ছেলের খেয়াল হয়েছে তার দু'গাল ফেটে রক্ত ঝরছে। তার মধ্যেই সে বলছে, আব্বার বকুনির কারণে আরও ছবি তোলা গেল না।

ওর দিকে মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করলে এখনও ওর গণ্ডদেশে চীনের মহাপ্রাচীরের চিহ্ন কিছুটা দৃশ্যমান হয়।

জীবনযাত্রার মান এখনও সাধারণ মানুষের জন্য সাইকেল পর্যায়ে। ইউরোপ, আমেরিকায় যেখানে গাড়ি ব্যবহৃত হয় পর্যাপ্ত, চীনে তেমনি সাইকেলের প্রচলন খুবই বেশি। অফিস-কারখানায় যাওয়া-আসার সময় সমস্ত রাস্তা জুড়ে কেবল সাইকেল আর সাইকেল। গাড়ি যা দেখা যায়, তার অধিকাংশই সরকারি কর্মকর্তাদের। বেইজিং শহর রাজধানী। পূর্বে নাম ছিল পিকিং। নাম পরিবর্তনের একটা হিড়িক বিশ্বজুড়ে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বোম্বে হয়ে গেল মুম্বাই। মাদ্রাজ হল চেন্নাই। পিকিং এর নতুন নামকরণ হল বেইজিং। অনেক সুদৃশ্য অট্টালিকা নির্মাণ করা হয়েছে শহরের প্রধান অঞ্চলসমূহে। আবাসিক এলাকায় বহুতলবিশিষ্ট অট্টালিকার সমারোহ। সরকারি উদ্যোগে, সরকারি ব্যয়ে সেসব নির্মিত। সরকারই তার বিলি ব্যবস্থা করে থাকে। ঘুরে ঘুরে শহরের প্রধান প্রধান এলাকাসমূহ দেখা হল। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পৃথিবীর অন্যতম জনবহুল শহর হিসাবে বেইজিং চিহ্নিত।

বাংলাদেশ প্রধানত মুসলমানদের দেশ। তাই তার প্রতিনিধিদের চীনের একটি মুসলিম অধ্যুষিত প্রদেশে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা হল। যে মন্ত্রীকে সার্বক্ষণিক দায়িত্ব দেওয়া ছিল, তিনি এবার সঙ্গে গেলেন না। অন্য দু'জন

কর্মকর্তা সঙ্গী হলেন। বললেন, প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষই মূলত আমাদের সফরের সার্বিক দায়িত্বে রয়েছে, তাই কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সেখানে যাওয়া অপ্রয়োজনীয়।

একটি বিশেষ বিমানে করে আমাদেরকে উত্তরাঞ্চলের সে প্রদেশটিতে প্রেরণ করা হল। রানা ছোট প্লেনই বেশি পছন্দ করে। তার বক্তব্য, পাখির মতো ওড়ার একটা অনুভূতি ছোট প্লেনেই পাওয়া যায়। এখন সে আমেরিকাতে প্লেন বিষয়েই পড়াশুনার শেষ পর্যায়ে। তার মায়ের নিষেধ সত্ত্বেও সুযোগ পেলেই সে ছোটে প্লেনে চড়ে, তার আনন্দই নাকি অনবদ্য। আমাকেও তার ওখানে যেতে প্লেন বদল করতে গিয়ে কয়েকবার দশ জনের যাত্রীবাহী প্লেনে উঠে সে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয়েছে। আমার বরং ভয় ভয়ই লাগে। আজকের প্লেনটি তো বেশ ছোটই বলা চলে। তবে দক্ষ পাইলটের গুণে অথবা শান্ত আবহাওয়ার কারণে দু'ঘন্টার সে যাত্রা মন্দ লাগল না।

বিমানবন্দরে প্রাদেশিক গভর্নর আমাদেরকে স্বাগত জানাল। মোটর শোভাযাত্রায় একটি অতিথি ভবনে নিয়ে যাওয়া হল। এই অতিথি ভবনের বিশেষত্ব, এখানে সকলেই মহিলা-কর্মী। চীনে পুরুষ-মহিলা কর্মের শ্রেণীভেদ প্রায় উঠেই গিয়েছে। গাড়ি থামতেই এক সুসজ্জিতা মহিলা এসে দ্বার খুলে দিল। অতিথি ভবনের প্রবেশদ্বারের দুই দিকে সুন্দরী সুসজ্জিতা মেয়েরা দাঁড়িয়ে হাততালি দিয়ে আমাদের অভ্যর্থনা জানাল।

এক মহিলা দোভাষী রসিকতা করে বলল, ইউর এক্সেলেন্সি, তোমাদের খেদমতগারগণ সবাই মহিলা, তোমাদের সুবিধাই হল!

তাকে হেসেই জবাব দিলাম, তুমিও মহিলা, কিন্তু বিশেষ কোন সুবিধা ভোগ করেছি কী?

সে প্রাণ খুলে হাসল।

চা পানের পর খানিকটা বিশ্রাম নেওয়া গেল। তারপরই একঘেয়ে বক্তৃতার আসর। সকলের বেশ আরাম। তারা আয়েস করে প্রত্যেকের সুমুখে রক্ষিত ছোট ছোট চিনামাটির কেটলির সুগন্ধি চাইনিজ চা সেবন করবে, সঙ্গে সুস্বাদু নানা বিস্কুট, পেস্ট্রি এবং চকোলেটের সমারোহ। আমাকে তাদের প্রত্যেকটি কথা শোনার ভান করতে হবে, দোভাষীর কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে এবং তাৎক্ষণিকভাবে সেসবের যোগ্য জবাব দিতে হবে। আমার সহকর্মীরা বেশ আরামেই আছে!

ফরিদ এবং মামুন বলাবলি করছিল, ভাই এখন নেতা হওয়ার ধকল সামলাচ্ছে।

খায়ের ভাই এবং তাজুল খেতে খেতেই অবশ্য কিছুটা সাহায্য করে। কোন শব্দের ঘাটতি হলে পূরণ করে দেয়, কোন পয়েন্ট ভুলে গেলে মনে করিয়ে দেয়।

আনুষ্ঠানিক আলাপ শেষে আমাদেরকে মুসলিম এলাকা পরিদর্শনে নিয়ে যাওয়া হল। বয়স্ক চীনাদের মাথায় টুপি দেখে বুঝতে অসুবিধা হল না, এলাকাটি মুসলিম অধ্যুষিত। একটি মসজিদেও নিয়ে যাওয়া হল। মসজিদ এবং মাদ্রাসা। সঙ্গে শিক্ষক, ছাত্র এবং অন্যান্যদের অবস্থানের ব্যবস্থা। অনেকটা ইসলামি কমপ্লেক্সের মতো। দোভাষীর মাধ্যমে কথা বললাম। তারা জানাল, সরকার ধর্ম নিয়ে কোন হস্তক্ষেপ করে না। বরং এলাকার উন্নয়নে সমান যত্নবান।

কিছু কল-কারখানা থাকলেও প্রদেশটি কৃষিকার্যের জন্যই খ্যাত। তারা জানাল, সেখান থেকেই সবচাইতে বেশি ভেজিটেবল উৎপাদিত হয়ে অন্যান্য স্থানে প্রেরিত হয়।

একটি মুসলিম পরিবারে আমাদের নিয়ে যাওয়া হল। কর্তা-গিন্নী দু'জনাই প্রাচীন। তাদের ছেলে-মেয়ে, বউ, নাতি-নাতনী নিয়ে একান্নবর্তী বিরাট পরিবার। চীনে তখনও এ ধরনের পরিবারের দেখা পাওয়া যায়। তারা আমাদেরকে ঘরে তৈরি তিলের পিঠা জাতীয় একপ্রকার মিষ্টি এবং ছোট কেটলীতে ঐতিহ্যবাহী চৈনিক-চা পান করতে দিল। পিঠাগুলো দেখতে খুব একটা হৃদয়গ্রাহ্য না হলেও খেতে বেশ উপাদেয়ই ছিল। রানা এবং দেলোয়ার কয়েকটা পিঠা পকেটে পুরতেই ওরা সবগুলো পিঠা প্যাকেট করে ওদেরকে উপহার দিয়ে খুবই সন্তুষ্ট হল। অতিথি ভবনে এসে আমাদের দেখিয়ে দেখিয়ে তারা দু'জন সেগুলো উদরস্থ করল, আমাদেরকে একবারও সাধল না!

মাঠ ভর্তি শাক-সবজির ক্ষেত। কত প্রকারের যে সবজি সেখানে উৎপাদিত হয়, দেখলে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়। ওরা বলল, এই প্রদেশের মাটি নাকি শাক-সবজি উৎপাদনের জন্য উত্তম। প্রয়োজনীয় সার এবং প্রচুর সেচ ব্যবস্থার ফলে তাদের চাষাবাদ পদ্ধতি উন্নত হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের পূর্বে এ সমস্ত এলাকা বিরান পড়ে থাকত এবং খুব কম লোকই এখানে বসবাস করত। যারা ছিল তারাও অতিশয় দরিদ্রতার মধ্যে জীবন-যাপন করত। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা তাই তাদের নিকট আশীর্বাদস্বরূপ এবং মহান নেতা মাও-সে-তুঙ তাদের ভাগ্যের পরিবর্তক।

পরদিন আমাদের চীনের দুঃখ নামে পরিচিত হোয়াং হো নদীর উপর নির্মিত চীনের অন্যতম গৌরবের নিদর্শন হোয়াং হো বাধ পরিদর্শন হল। নদীর উত্তাল জলরাশি নিয়ন্ত্রণ করে একদিকে চাষাবাদের জন্য সেচের ব্যবস্থা, অন্যদিকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিরাট সেই বাঁধের বিভিন্ন দিক দেখতে দেখতেই একবেলা কেটে গেল। হোয়াং হো এখন আর চীনের দুঃখ নয়, সেটি এখন চীনের উন্নয়ন ও প্রগতির এক

উৎস। স্কেল বা মাপযন্ত্র নির্মাণের একটি বিরাট কারখানাও দেখা হল। চাষাবাদের পাশাপাশি শিল্পোন্নয়ন লাভজনকভাবেই সম্ভব, গণচীন তা হাতেনাতে করে দেখিয়েছে।

দু'দিন পর আমরা বেইজিং প্রত্যাবর্তন করলাম। মনে হল বেড়াতে গিয়েছিলাম, গৃহে প্রত্যাবর্তন করলাম। দু'দিনের অনুপস্থিতিতে কর্মকর্তা, সেবিকা, পরিবেশনকারিনী সকলেই যেন ম্রিয়মাণ। ঘরের ছেলেরা ঘরে ফিরে আসায় তারা আকর্ণ বিস্তৃত হাসি উপহার দিল এবং আন্তরিক খুশি হল। প্রমাণস্বরূপ তারা ডিনারে নতুন নতুন আইটেম পরিবেশন করল। খায়ের ভাই খুবই আনন্দিত।

এ সময়ের মধ্যে যা দেখা সম্ভব, যা করা সম্ভব, সবই দেখা হল, করা হল। এবার চলে যাবার পালা। ক'দিনেই একটা মায়া বসে গেছে সবকিছুর উপর। রাষ্ট্রদূতের বাসায় একটি সম্বর্ধনার আয়োজন করা হল আমাদের পক্ষ থেকে। প্রধানমন্ত্রী ব্যতিরেকে চীনের পক্ষে প্রায় সকলেই উপস্থিত ছিল। যে ক'জন স্বল্প সংখ্যক বাংলাদেশী ছিল বেইজিংয়ে, তারাও উপস্থিত হলেন। সকলের সঙ্গে হাসি-আনন্দে সে সন্ধ্যাটি সুন্দর কাটল। সম্বর্ধনা থেকে বের হয়ে ওরা আমাদেরকে বেইজিংয়ের একমাত্র শুল্কমুক্ত বিপণি কেন্দ্রে নিয়ে গেল। এখানে বৈদেশিক মুদ্রায় কেবলমাত্র বিদেশী নাগরিকরাই পছন্দমতো জিনিসপত্র ক্রয় করতে পারে। পরিদর্শনই আমাদের মূল উদ্দেশ্য। ক্রয়ের কোন প্রয়োজনীয়তা ছিল না। সমুদ্রযাত্রা শিপিং কর্পোরেশনের স্বত্বাধিকারী খায়ের চৌধুরী সাহেব প্রচুর অর্থের মালিক। তিনি রানাকে যে কোন একটা কিছু কেনার জন্য বারবার উপরোধ করতে লাগল। রানার কিছু প্রয়োজন নেই—তবুও খায়ের ভাই একান্ত স্নেহে তাকে কিছু দিতে চায়। বললাম, একটা কিছু পছন্দ কর, চাচা এত করে বলছেন।

রানা অগত্যা একটা পাথরের তৈরি ছুটন্ত ঘোড়ার মূর্তি পছন্দ করল। জেড্ পাথরের তৈরি সে ঘোড়াটির দাম কত ছিল জানবার উপায় রইল না। খায়ের ভাই তার 'প্লাস্টিক মানি' বের করে মূল্য পরিশোধ করলেন। সে দুরন্ত ঘোড়া আজও তেমনি ছুটন্ত অবস্থায় আমাদের বসার ঘরে শোভা পাচ্ছে।

চীনের সকল মহলের নিকট থেকে আনুষ্ঠানিক বিদায় নিলাম। অজস্র কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলাম। বললাম, তোমাদের এই ঐতিহাসিক আতিথেয়তা কোনদিন ভুলব না। এটা পরিশোধযোগ্য নয়। বিস্মরণ যোগ্যও নয়।

তারা আমাদেরকে আবার চীন ভ্রমণের আমন্ত্রণ দিয়ে রাখল। বলল, পরের বার একটু বেশি সময় নিয়ে এস। এটা বড় দেশ।

দেশই শুধু বড় নয়, মানুষের মনও বড়।

উত্তর কোরিয়াতে ওদের নিজস্ব প্লেন ব্যতীত একমাত্র চীন দেশের

বিমানই যাতায়াত করে। একটি বিশেষ বিমানে চীনারা আমাদেরকে কোরিয়ায় নামিয়ে দিয়ে বিদায় নিল।

ব্যান্ড-বাদ্য সহযোগে একদল পার্টি-কর্মীর অভিবাদনের মধ্যদিয়ে আমাদের উত্তর কোরিয়া ভ্রমণ শুরু হল। আমেরিকা সরকার উত্তর কোরিয়া আসাটাকে তেমন পছন্দ করে না বলে অকম্যুনিস্ট দেশসমূহের কেউ বড় একটা এখানে আসে না। আমরা একটা অকম্যুনিস্ট দেশের প্রতিনিধি এবং সরকারি দলের মহাসচিবের নেতৃত্বে চীন সফর শেষে এ দেশে এসেছি। আমাদের অভ্যর্থনার ঘটা বেশ বাহুল্যপূর্ণ। কত রকমের যে কর্মকর্তা এল এবং পরিচিত হল মনে রাখা দায়। একজন ক্যাবিনেট মন্ত্রীকে সার্বক্ষণিকভাবে আমার সঙ্গী করে দেওয়া হয়েছে। সে কেবল তাদের মহান নেতা কিম ইল সুং সম্বন্ধে আমাকে জ্ঞান দিতে লাগল। সে যে রকম আন্তরিকতার সঙ্গে কিম ইল সুং-এর মহিমা, ব্যক্তিত্ব ও আদর্শ সম্বন্ধে আমাকে ক্লান্তিহীন তথ্য পরিবেশন করছিল, তাতে মনে হল আর একটু ভজালেই বোধহয় আমি তাঁর সুবিখ্যাত 'জুসে' আইডিয়ার ভক্তে পরিণত হব।

এয়ারপোর্টে কিম ইল সুং-এর বিরাট প্রতিকৃতি শোভা পাচ্ছে। এটা পরিষ্কার হয়ে গেল, এখানে এই উত্তর কোরিয়ার নেতা বলা হোক, শাসনকর্তা বলা হোক, সকল উন্নয়নের স্বপ্নদ্রষ্টা বলা হোক না কেন, কিম ইল সুং-ই হলেন সে দেশের একচ্ছত্রাধিপতি বা ভাগ্যদেবতা। দেশের জনগণ একবাক্যে তা মানে। সে মানা কী রকম মানা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন।

রাস্তাঘাটে গাড়ি বা অন্য যানবাহন নেই বললেই চলে। কেবল সরকারি দু'-চারটি গাড়ি এবং বাস-ট্রাকযোগে শ্রমিক-কর্মীদের নিয়ে আসা-যাওয়া ছাড়া তেমন একটা যানবাহন চোখে পড়ল না। কিন্তু মজা হচ্ছে, মোড়ে মোড়ে ট্রাফিক পুলিশ রয়েছে এবং তারা সেদেশের সবচাইতে সুন্দরী মহিলা। মনে হল, সুন্দরী প্রতিযোগিতায় যারা অংশ নেওয়ার যোগ্যতা অর্জন করবে তাদেরকেই কেবল ট্রাফিক কন্ট্রোলের দায়িত্বে দেওয়া হবে। সে এক দেখার দৃশ্য। সুউচ্চ পুলিশ বক্সের মধ্যে দাঁড়িয়ে, এদিকে হাত ওঠাচ্ছে, ওদিকে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে, মনে হবে কোন নৃত্য পটিয়সী উর্বশী তার নৃত্যকলার মহড়া দিচ্ছে।

রাজধানী পিয়ং ইয়ং-এর এক সুরক্ষিত উদ্যানের অভ্যন্তরে এক সুরম্য

অতিথিভবনে আমাদেরকে রাখা হল। এখানেও কর্মীদের অধিকাংশই মহিলা। মনে হয় আমরা প্রমীলা রাজ্যে অবস্থান করছি। আমরা এবং সেবক-সেবিকা ব্যতীত আর কোন মানুষ দৃষ্টিগোচর হল না। পরে জানলাম, এটি একটি সেনানিবাসের অভ্যন্তরে অবস্থিত। লোক চলাচল নিষিদ্ধ। এক অল্পবয়স্ক যুবক পার্টি-কর্মীকে দোভাষী হিসাবে আমার সঙ্গে দেওয়া হয়েছে। অবশ্য মন্ত্রী নিজেও ইংরেজি জানে এবং বলে। অন্যত্র এই দোভাষীর সাহায্যের প্রয়োজন। সে তার কাজ ভালোবাসে এবং তার চাইতেও ভালোবাসে তাদের একদেশ, একদল ও এক নেতার থিওরিকে। কিম ইল সুং-জ্বরে সে অধিকতর আক্রান্ত। প্রতিটি বাক্যে একবার করে আমাদের মহান নেতা এই বলেন, এই ভাবেন, এই করেন আছেই। শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে গেল। যেখানেই যাই, মহান নেতার মহা প্রতিকৃতি আর মূর্তি হাত উঁচিয়ে দেশের মানুষকে কর্মের পথে নির্দেশনা দিচ্ছে।

বললাম, বন্ধু, চলো সর্বাগ্রে সে দেবদর্শন করে আসি। তোমাদের মুখে শুনে শুনে ইতিমধ্যেই আমরা প্রায় তাঁর অন্ধভক্ত হয়ে পড়েছি। "অন্ধ জনে দেহ আলো"—আমাদেরকে আলো দেখাও, কিম ইল সুং দেখাও।

তারা খুশি হল। আনুষ্ঠানিক প্রোগ্রামের শীর্ষেও মহান নেতার সঙ্গে সাক্ষাৎকারই নির্দিষ্ট করা রয়েছে। সফরের দ্বিতীয় দিনে প্রাতরাশের পরই সে মাহেন্দ্রক্ষণ এসে উপস্থিত। ওরা নোটিশ দিল আজ সৌভাগ্য রবি উদিত হবে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদেরকে নিয়ে যাওয়া হবে বিশ্বের সেই বিরল ব্যক্তিত্বের নিকট যিনি কম্যুনিস্ট নীতিতে বিশ্বাসী হয়েও তার নিজস্ব এক থিওরি দাঁড় করিয়েছেন এবং সারা বিশ্বকে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে দ্বিধা-বিভক্ত কোরিয়ার একাংশে গণমুখী একব্যক্তি শাসনের একপদ্ধতির সফল প্রবর্তনে দেশকে ক্রমান্বয়ে উন্নতি ও প্রগতির পথে এগিয়ে নিচ্ছেন।

কিম ইল সুং নামটির সঙ্গে বাংলাদেশের মানুষ খুব বেশি পরিচিত নয়। মনে পড়ল, উত্তর কোরিয়ার এই নেতার জন্মদিনে পূর্বানী হোটেলের এক সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে তদানীন্তন স্পিকার আবদুল মালেক উকিল সংসদ সদস্যা মিসেস ফরিদা রহমানকে একটি বাণী পড়তে দেন। ইংরেজিতে লেখা সেই বাণীটি অধ্যাপিকা মিসেস রহমান পড়ার সময় কিম ইল সুং-এর স্থলে 'কিম দ্বিতীয় সুং' পড়ে এক হাস্যরসের অবতারণা করেছিল। নামটির সঙ্গে আমরা স্বাধীনতার পরই পরিচিত হতে আরম্ভ করি।

উত্তর কোরিয়াতে আমাদের পৃথক কোন দূতাবাস নেই। গণচীনের দূতাবাসই এখানকার বিষয়াদি তত্ত্বাবধান করে থাকে। একজন ফার্স্ট সেক্রেটারি বেইজিং থেকে আমাদের এই সফর কভার করার জন্য এসেছিল। যথাসময়ে সদলবলে আমরা দেব-দর্শনে চললাম। একজন মানুষ জনগণের হৃদয়ে কতটা গভীরে আসন গ্রহণ করতে পারে কিম ইল সুং তার প্রকৃষ্ট

দৃষ্টান্ত। যে ড্রাইভার আমাদেরকে তাঁর কাছে নিয়ে যাচ্ছে সে আনন্দিত। সঙ্গে যাচ্ছে দোভাষী, তার আনন্দ ধরে না। মন্ত্রীরও মুখমণ্ডলে ফুটে উঠল এক অনির্বচনীয় জ্যোতি। অনেক তোরণ পাড় হয়ে এক সুবিশাল প্রাসাদোপম ভবনে এনে আমাদের অবতরণ করানো হল। মহামান্য চেয়ারম্যানের ব্যক্তিগত সহকারী দু'জন এসে আমাদেরকে সাক্ষাৎকার গ্রহণের কক্ষে নিয়ে গেল। আমাদের নির্দিষ্ট আসনসমূহে বসিয়ে দিয়ে তারা নেতাকে আনতে গেল। অল্পক্ষণের মধ্যেই নাতিদীর্ঘ মধ্যমাকৃতির সৌম্যদর্শন ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন কিম ইল সুং এসে দাঁড়ালেন। টেবিলের এ প্রান্তে এসে একটু ঝুঁকে ঝুঁকে সকলের সঙ্গে করমর্দন করে আমার মুখোমুখি আসনে উপবিষ্ট হলেন। তাঁর সম্বন্ধে ইতিমধ্যে এত শুনেছি এবং পড়ে ফেলেছি যে, মানুষটি যে রক্ত-মাংসে আমাদের সম্মুখে উপবিষ্ট তা হৃদয়ঙ্গম করে পুলকিত হলাম। আমরা নিজেদের ভাগ্যবান মনে করলাম। লক্ষ্য করলাম তাঁর ঘাড়ে একটি সুবৃহৎ মাংসপিণ্ড রয়েছে।

আমিই প্রথম বললাম, ইউর এক্সেলেন্সি, মহামান্য চেয়ারম্যান, আমরা খুবই সৌভাগ্যবান যে, তুমি অনুগ্রহ করে আমাদের তোমার দেশে নিমন্ত্রণ করে এনেছ এবং তোমার দর্শনলাভের বিরল সৌভাগ্যে আমাদের সম্মানিত করেছ। তোমাকে আমাদের দেশের জনগণ, সরকার, জাতীয় পার্টি এবং রাষ্ট্রপতির পক্ষ থেকে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাচ্ছি।

দোভাষী তাদের ভাষায় আরও সুন্দর করে রূপান্তরিত করে দিতেই মি. কিম ইল সুং এর উজ্জ্বল মুখমণ্ডল উজ্জ্বলতর হয়ে উঠল। আমার প্রারম্ভিক বক্তব্যে তিনি সন্তুষ্ট হয়েছেন বুঝা গেল। ধীরে ধীরে মাথা ঝুঁকিয়ে ঝুঁকিয়ে বললেন, তোমরা যে আসতে পেরেছ, সেজন্য তোমাদের ধন্যবাদ দিই। উত্তর কোরিয় জনগণের পক্ষে আমি তোমাদের আন্তরিক স্বাগত জানাই। এদেশে তেমন কেউ একটা আসে না। সাম্রাজ্যবাদীরা বাধা দেয়। তোমাদের আগমন আমাদের জন্য নতুন বাতাবরণ সৃষ্টি করবে। আমাদের জনগণ খুবই আনন্দিত হবে।

লক্ষ্য করলাম, কথার মধ্যে বারংবার 'জনগণ' শব্দটি তিনি ব্যবহার করছেন। বুঝলাম জনগণের হৃদয়ে যার অনড় আসন তাঁর পক্ষেই সেই জনগণের কথা সর্বক্ষণ স্মরণ করা শোভা পায়।

তিনি বললেন, তোমাদের দেশ নতুন। এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর তোমরা স্বাধীনতা লাভ করেছ। পরাধীনতার সমস্ত অভিশাপ মুক্ত হয়ে নতুন করে দেশকে গড়ার কাজে তোমরা এখন ব্যস্ত। আমি তোমাদের শুভ কামনা করি। তোমাদের প্রেসিডেন্টের এ দেশে আসার কথা ছিল। কর্ম-ব্যস্ততার জন্যই হয়ত তা হয়ে ওঠেনি। তাঁকে এবং তাঁর সরকার ও জনগণকে আমার এবং আমাদের জনগণের সম্ভাষণ জানিয়ো।

বললাম, নিশ্চয়ই জানাব। তুমিও তাঁর আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিবাদন নিয়ো। তিনি এই চিঠিটি এবং সামান্য কিছু উপহার তোমার জন্য পাঠিয়েছেন। গ্রহণ করলে বাধিত হব।

তিনি সহাস্যে সেসব গ্রহণ করলেন এবং তাঁর সহকারীদের কি সব নির্দেশ দিলেন! দোভাষী বলল, উপহার সামগ্রী সরকারি তোষাখানায় রাখতে নির্দেশ দিলেন। আলোচনার পরই তিনি উপহার প্রথমে দেখবেন। পরে সেসব যথাস্থানে নিয়ে যাওয়া হবে।

বললাম, মহামান্য চেয়ারম্যান, স্বল্প সময় কেটেছে তোমার দেশে এসেছি, এখনও তেমন কিছু দেখে উঠতে পারিনি। তবুও, এরই মধ্যে যে কর্মস্পৃহা, শৃঙ্খলাবোধ ও নেতৃত্বের প্রতি অগাধ আস্থা তোমার জনগণের মধ্যে প্রত্যক্ষ করলাম, সেটা অভূতপূর্ব। একটা জাতির এ সমস্ত গুণাবলি থাকলে সে জাতিকে কেউ দাবিয়ে রাখতে পারে না। তারা উন্নতির শিখরে আরোহণ করবেই। নেতৃত্বের যে সুমহান যাদুমন্ত্রে তুমি তোমার সমগ্র জনগোষ্ঠীকে মাতিয়ে রেখেছ তা কেবল অদৃশ্যপূর্বই নয়, সেটি যদি অনুকরণ করা যায় তা হলে সকলেই প্রভূত উপকৃত হবে। তোমার দেশে এক কর্মযজ্ঞ চলছে। সেই কর্মযজ্ঞের মহান নেতা তুমি। মানুষই মেশিন তৈরি করে, কিন্তু সেই মেশিনের পশ্চাতে যে মানুষটি থাকে, সে মেশিনটির চাইতে অনেক বড়। তার চালিকা-শক্তি সেই মস্তিষ্কেই নিহিত থাকে। তুমি হচ্ছ সেই চালিকা-শক্তি। এ জাতির জন্য তুমি নতুন ইতিহাস রচয়িতা, কিন্তু দুনিয়ার বুকে তুমি এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী মহান মানুষ।

তিনি খুবই প্রীত হলেন বলে মনে হল। তিনি কিছু বলতেই আমাদের সাথী মন্ত্রী শ্রদ্ধাবনত চিত্তে বারবার কি জবাব দিল। দোভাষী পরে বলেছে, তিনি আমাদের অবস্থানের সময়ে যেন কোন অসুবিধা সৃষ্টি না হয় তা দেখার জন্য বিশেষভাবে বলে দিলেন। মন্ত্রী তারই উত্তরে 'জী হুজুর' কথাটি কেবল বারংবার উচ্চারণ করে কৃতার্থ হয়েছে।

তিনি আমাদের দেশ, সরকার ও দল সম্বন্ধে কিছু তথ্য জানতে চাইলেন। সবিনয়ে সাধ্যমতো বিভিন্ন তথ্য পরিবশেন করলাম এবং দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতির একটা চিত্র তুলে ধরলাম। এখানেও লক্ষ্য করছি, একান্তে বসে একজন সাঁটলিপিতে সবকিছু লিখে রাখছে।

সাক্ষাৎকার শেষ হয়ে এল, তিনি উঠে দাঁড়ালেন। শেষে হাত ধরে কক্ষের বাইরে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। সেখানে পশ্চাতে কোরিয়ার পাহাড়-পর্বতমালার ছবিসহ একটি তৈলচিত্রকে পশ্চাতে রেখে গ্রুপ ফটো তোলা হল। সরকারি আলোকচিত্রী প্রস্তুত হয়েই ছিল। এখানে দেখলাম, কাউকে কিছু নির্দেশ করতে হয় না। যার যা দায়িত্ব সে তা নিঃশব্দে এবং সুচারুরূপে পালন

করে। ছবি তোলা হলে তিনি কিছুটা এগিয়ে এসে আমার সঙ্গে কী মনে করে বুক মেলালেন। সাধারণত করমর্দনের বাইরে তিনি কিছু করেন না। অজস্র ধন্যবাদ দিয়ে গাড়িতে আরোহণ করলাম। আমার দোভাষী পারে তো কেঁদে ফেলে! সে বলে, মহান নেতা তোমার সঙ্গে বুক মিলিয়েছেন, তুমি খুবই ভাগ্যবান! তোমার মতো সৌভাগ্য অন্য কারো দেখিনি!

মনে হল সে তার ডান হাতটি আর পানিতে ভিজাবে না। কেননা সেই হাতে মহান নেতা তার সঙ্গেও হাত মিলিয়েছেন।

কিম ইল সুং-এর সঙ্গে তোলা সেই গ্রুপ ছবি আজও আমার ঘরে অম্লান রয়েছে। তিনি এই বিশ্বের সকল কর্ম ও সাধনার অবসানে সাধনোচিত-ধামে চির বিদায় নিয়ে চলে গিয়েছেন। তাঁর পুত্র কিম ইল জং তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন।

তখনই শুনে এসেছি আমার দোভাষী উত্তেজিত কণ্ঠে বলছিল, আমরা খুবই উৎসাহিত বোধ করছি যে, আমাদের মহান নেতার যদি তিরোধান হয় তা হলে তাঁর সুযোগ্য পুত্র কিম ইল জংকে তিনি তৈরি করে রেখে যাচ্ছেন। জনগণ পিতৃহীন হবে না।

রসিকতা শোভা পায় না, তবু বললাম, বাপ-বেটা দু'জনেই জনগণের পিতা হবে কি করে!

সে সঙ্গে সঙ্গে প্রতিউত্তর করল, নেতাই আমাদের পিতা। নেতার ছেলেই নেতা হবে। আমরা খুবই উৎসাহ বোধ করছি।

আর কিছু বলে তার উৎসাহে ভাটা ফেলতে চাই না। সেটা সম্ভবও ছিল না।

আমাদেরকে তারা নিয়ে গেল একটি বাঁধ নির্মাণ দেখতে। হাজার হাজার মহিলা-পুরুষ কাজ করছে, কোন শব্দ নেই। সকলেই নিঃশব্দে কাজ করছে। মাটি কাটা হচ্ছে একটি সম্মুখবর্তী পাহাড় থেকে। অনেক যন্ত্রপাতি, গাড়ি-ট্রাক ব্যবহৃত হচ্ছে। সেসবের আওয়াজ ব্যতিরেকে সমগ্র এলাকায় কেবল মাইকে গণসঙ্গীত শোনান হচ্ছে। সঙ্গীতের মাঝে মাঝে কিম ইল সুং-এর বাণীসমূহও প্রচারিত হচ্ছে। এত মানুষের নিশ্চুপে কাজ করার কথা চিন্তা করা যায় না। কিন্তু কি যাদুবলে সেটা সম্ভব তা মহান নেতাই জানেন। বিরুদ্ধবাদীরা বলে থাকে লোকগুলোকে যন্ত্রে পরিণত করা হয়েছে। তারা একে বলে Forced labour বা জবরদস্তিমূলক শ্রম। হয়ত ঠিক। কিন্তু একজন মানুষ এত অধিক সংখ্যক মানুষকে যদি যন্ত্রে পরিণত করতে সক্ষম হয়, সে যন্ত্র যদি নিঃশব্দে-নীরবে কাজ দেয় এবং সে যন্ত্র যদি কাজে সন্তুষ্ট থাকে তা হলে তাদের বলার কি থাকতে পারে। Men do not live by bread alone. কথা অতি সত্য। কিন্তু যাদের রুটির ব্যবস্থা আছে তারাই না একথা বলতে পারে। অন্যরা সর্বাগ্রে রুটির টুকরোটির কথাই ভাববে। ওরা

বলল, প্রতিটি স্বেচ্ছা-শ্রমিককে দুপুরের খাবার এবং বৈকালিক চা সরবরাহ করা হয়ে থাকে। তারা সন্ধ্যা পর্যন্ত একনাগাড়ে কাজ করবে। মাঝখানে কিছুটা বিশ্রামেরও অবকাশ রয়েছে।

মি. কিম ইল সুং-এর মস্তিষ্কপ্রসূত 'জুসে আইডিয়া' বিষয়টি সম্বন্ধে ওরা আমাদেরকে অনেক জ্ঞান দান করার চেষ্টা করল। কিছু কাগজপত্রের ইংরেজি অনুবাদও পরিবেশন করল। কিন্তু মাথার ঘিলু জাতীয় পদার্থের স্বল্পতা হেতু সবকিছু দুর্বোধ্যই রয়ে গেল। নদীর তীরে এই 'জুসে আইডিয়া' নিয়ে ধ্যান-ধারণার পরীক্ষা-নিরীক্ষার একটি কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। আমাদেরকে সে কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হল। কেন্দ্রের পুস্তকাগার ও পাঠকক্ষ অভিজাত রুচিসম্মত। কিন্তু খুব একটা ব্যবহার হয় বলে মনে হল না। একটি সুন্দর স্তম্ভও সেখানে নির্মিত হয়েছে। উদ্দেশ্য বোধগম্য না হলেও বিধেয় আমাদের মন্দ লাগল না।

সহজে পাঠোদ্ধার সম্ভব হবে না মনে করে মন্তব্য বইতে বাংলায় লিখলাম, 'শুনলাম, দেখলাম, বুঝলাম না কিছুই'। এ মন্তব্য নিশ্চয়ই আমাদের চলে আসার পর দেখে থাকবে অথবা আদৌ দেখেনি, তা না হলে, এরপরও আদর-আপ্যায়নের ঘটা হ্রাস পায়নি, বরং বৃদ্ধি পেয়েছে।

আমার পিয়ং ইয়ং ভ্রমণে সবচাইতে ভালো লেগেছিল বাচ্চা মেয়েদের একটি বিদ্যালয় পরিদর্শনে গিয়ে। বলা হল এটি একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং কেবলমাত্র মেয়েরা পড়াশুনা করে থাকে। সহশিক্ষা ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকলেও এ ধরনের বিদ্যাপীঠ দু'-একটি রয়ে গেছে। বিরাট স্কুল। মনে হল কয়েক সহস্র বালিকা সেখানে অধ্যয়নরত। ঘুরে ঘুরে সব দেখানো হল। ক্লাসে ঢুকতেই মেয়েরা সব 'স্বাগতম বাংলাদেশ, স্বাগতম জাতীয় পার্টি' এ ধরনের একটা কলধ্বনি করে ওঠে। বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করে জানা গেল বাচ্চাদের কচি-কণ্ঠে বিচিত্র সুরে এ কথাগুলোই অনেক দিনের মহড়ায় এই রূপ লাভ করেছে। খুবই ভালো লাগল।

প্রধান শিক্ষয়িত্রীর অফিস-কক্ষে চা-পানের ব্যবস্থা করা হল। বিনীতভাবে তা প্রত্যাখ্যান করলাম। ওরাই বলছিল মেয়েরা অনেকদিন থেকে প্রস্তুতি নিচ্ছে আমাদেরকে এক ঘণ্টার একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপহার দেবে। সেখানেই কিছুটা সময় বেশি দেব ভাবলাম।

প্রধান শিক্ষয়িত্রীকে বললাম, আমার স্ত্রীও একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধান। শুধু তা-ই নয়, সে নিজেই অনেক কষ্টে বিদ্যালয়টিকে তার সাধনা ও শ্রম দিয়ে গড়ে তুলেছে। কর্মের সুবাদে তুমি আমার স্ত্রীর সমগোত্রীয়। দেশে প্রতিদিনই প্রধান শিক্ষিকার প্রস্তুত চা-পান করে থাকি, আজ ছাত্রীদের গান শুনব।

সে হাসিমুখে আমাদেরকে অনুষ্ঠান কক্ষে নিয়ে গেল। বিরাট হলভর্তি শুভ্র বসনা অগণিত পরীর বাচ্চারা উঠে দাঁড়িয়ে সমস্বরে আমাদেরকে স্বাগত জানাল। মনে হল, এই উপলক্ষেই আজ তাদেরকে নতুন শুভ্র বস্ত্র সরবরাহ করা হয়েছে। জানা গেল, বিদ্যালয়ের পোশাকই শ্বেত বর্ণের।

মঞ্চে একঝাঁক শ্বেত কবুতর উঠে এল। তাদেরকে পশ্চাতে রেখে মাইক্রোফোন হাতে একটি সাদা পুতুল এগিয়ে এসে 'বাও' করল এবং তার বহু মহড়া দেওয়া বিচিত্র বাংলায় বলল, 'বাংলাদেশের জাতীয় পার্টির মহাসচিব ও উপ-প্রধানমন্ত্রী মাননীয় শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেন এবং তাঁর সফর সঙ্গীবৃন্দ, আপনাদিগকে আমরা ক্ষুদেরা আন্তরিক স্বাগত জানাচ্ছি। স্বাগতম বাংলাদেশ, স্বাগতম জাতীয় পার্টি।'

আমরা কিছুটা বুঝে, কিছুটা না বুঝেই জোর হাততালি দিলাম। কচি-কণ্ঠের অদ্ভুত বাংলা উচ্চারণ সবটুক বোধগম্য না হলেও, তাদের প্রচেষ্টা দেখে মুগ্ধ হলাম। ওরা ওদের অনুষ্ঠান শুরু করল। গান বুঝতে সক্ষম হই না। দোভাষী বুঝিয়ে দিল। গানে গানে ওরা আমাদেরকে বরণ করছে পাহাড়-নদী আর মানুষের দেশ কোরীয় মাটিতে, ওরা আমাদের বরণ করছে নতুন জাগরণের দেশ কোরীয়-মাটিতে, ওরা আমাদের বরণ করছে মহান নেতা কিম ইল সুং-এর উত্তর কোরীয় মাটিতে। ভাষা না বুঝলেও, সুর-ব্যঞ্জনা বুঝতে সক্ষম হলাম। মিষ্টি রিন্‌রিনে কণ্ঠস্বরের কোরাসে যে লয় ও ভাব ফুটে উঠল তা ছিল অনবদ্য। মনে হচ্ছিল, দুলে দুলে বরণ-সঙ্গীত গাইছে ওরা রক্ত-মাংসের মানুষের কেউ নয়, আকাশ থেকে নেমে আসা একদল অপ্সরী কন্যা। গান শেষ হলে ওরা 'বাও' করে নিষ্ক্রান্ত হল। উঠে এল আর একঝাঁক বাচ্চা যন্ত্রীর দল। একটার পর একটা যন্ত্র-সঙ্গীত বাজিয়ে গেল। সুর মূর্চ্ছনায় আমরা বিমুগ্ধ হয়ে গেলাম। কতই বা এদের বয়স! কিন্তু কী সাধনাই না করেছে! প্রোগ্রামে এতটুকু ত্রুটি পরিলক্ষিত হল না। কী গান, কী বাদ্য বাজনা, কী সম্মিলিত যন্ত্রসঙ্গীত—প্রতিটি বিষয়ে ওরা প্রশংসার দাবিদার। বিশেষ করে যে ছোট্ট মেয়েটি সমস্ত অনুষ্ঠানটি পরিবেশনায় ছিল, তার সুন্দর মুখশ্রী, অপূর্ব কণ্ঠস্বর এবং আনন্দময় বাচনভঙ্গি আমাদের সকলেরই অত্যন্ত ভালো লাগল।

অনুষ্ঠান শেষ হতে প্রধান শিক্ষিকা এবং মন্ত্রীবর আমাকে মঞ্চে নিয়ে গেলেন বাচ্চাদের সঙ্গে মিলিত হতে। ওদের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াতেই ওরা আমাকে হাসতে হাসতে চুতর্দিক থেকে জড়িয়ে ধরল। এত ভালো লাগছিল, ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়। অনুষ্ঠান ঘোষিকা মেয়েটিকে কাছে ডাকতেই ও দু'হাত দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে বুকের সঙ্গে মিশে রইল।

নিশ্চয়ই সবকিছুই মহড়া দেওয়া। তবুও বলব, অনেক আদর-আপ্যায়ন, সুস্বাদু ভূরিভোজ, অপূর্ব সব নৈসর্গিক দৃশ্যাদি উপভোগ বা সরকারের

কর্তাব্যক্তিদের বন্ধুত্বের অঙ্গীকার, উন্নয়ন ও প্রগতির বিস্তৃত পর্যবেক্ষণের সুযোগের মধ্যেও বাচ্চা মেয়েদের অনুষ্ঠানটি অনেক বড় এবং অনেক বেশি হৃদয়গ্রাহী হল।

বিদায় নেওয়া পর্যন্ত ওরা আমাদেরকে ঘিরে রাখল। বাচ্চাদের সাহচর্যের এই সময়টি পিয়ং ইয়ং-এ আমাদের সবচাইতে উপভোগ্য হয়ে রইল।

যারা প্রচারণা করে বেড়ায়, মানুষগুলোকে সব যন্ত্রে পরিণত করে ফেলেছে তারা নিশ্চয়ই আমাদের মতো একটি শ্রমজীবীদের সভায় উপস্থিত ছিল। আমাদের কর্মসূচির মধ্যে ছিল, শ্রমজীবী মানুষদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার। সেটি হয়ে দাঁড়াল একটি নিয়ন্ত্রিত জনসভা। জনসমাগমসহ সবটাই কর্মজীবী মানুষের এবং তাদেরকে আনা হয়েছে বলেই প্রতীয়মান হল। ওয়ার্কার্স পার্টির সুবিশাল অডিটরিয়মে তিল ধারণের স্থান নেই। পুরুষ-মহিলা প্রায় সমান সমান। আমাদের দেশের মতোই দু'দেশের জাতীয় সঙ্গীত বাজানো হল। যদিও এক্ষেত্রে আমাদের ওখানটায় তা নিয়মসিদ্ধ নয়। তারপর বক্তৃতার পালা। ওদের তরফ থেকে জনাতিনেক বক্তা, জনৈক শ্রমিক নেতা, একজন শ্রমজীবী মহিলা এবং একজন বাংলাদেশের উপর বিশেষভাবে ট্রেনিংপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বক্তৃতা করলেন। সবটাই গতানুগতিক। বাংলাদেশের জাতীয় পার্টির প্রতিনিধিদের সাদর সম্ভাষণ, দু'দেশের শ্রমিক সম্প্রদায়ের মধ্যে মানবিক যোগসূত্র, উত্তর কোরিয়ার ক্রমবর্ধমান প্রগতি এবং সর্বোপরি মহান নেতা কিম ইল সুং-এর বন্দনা—সব মিলিয়ে বক্তব্য। পূর্ব থেকেই বোধহয় মহড়া দেওয়া ছিল কোথায় কোথায় হাততালি পড়বে। কেননা, সমস্ত শ্রোতৃমণ্ডলী একই সঙ্গে, একই লয়ে হাততালি দেবে, এতটুকু ব্যত্যয় ঘটবে না—তা কি করে সম্ভব!

এ ধরনের সভায় শ্রোতা বা বক্তা কেউ তৃপ্তি পায় না। কেননা, বক্তৃতা প্রতি লাইনে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে দোভাষীর কারণে। সর্বশেষ আমাকে দাঁড় করানো হল। আমিও গতানুগতিকতার উর্ধ্বে ওঠার প্রয়োজন বোধ করলাম না। আমাদেরকে সম্মানিত করার জন্য, কর্মজীবী মানুষদের সঙ্গে মিলিত হবার সুযোগ দানের জন্য ধন্যবাদ জানালাম। বাংলাদেশ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ধারণা দিয়ে বললাম, সেখানকার কর্মজীবীদের অনেক শিক্ষণীয় রয়েছে উত্তর কোরীয় মানুষের নিকট। শ্রম কি করে সাধনায় পর্যবসিত হয় এবং শ্রমের মর্যাদা কোন্ স্তরে পৌঁছলে একটি দেশ এত দ্রুত উন্নয়নের পথে এগুতে পারে তা পর্যবেক্ষণ করতে হলে উত্তর কোরিয়া আসতে হবে। আমরা অনেক কিছু শিখলাম। মহান নেতা কিম ইল সুং-এর নেতৃত্বে এ দেশ উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি লাভ করুক এটাই বাংলাদেশের মানুষের কাম্য।

দলের মানুষগুলো তাল-লয় ঠিক রেখে মানবিক অভিব্যক্তির উর্ধ্বে উঠে নির্ধারিত মুহূর্তে মুহুর্মুহু করতালি দিয়ে হল মুখরিত করল।

উত্তর কোরিয়ার শীতও চীনেরই মতো। সেদিন বোধহয় শৈত্যপ্রবাহ একটু বৃদ্ধি পেয়েছিল। ডিনারে বসে তখনও আমরা অভ্যন্তরীণ-শীতলয় কাঁপছিলাম। মন্ত্রী বলল, একটি স্যুপ খেলে মুহূর্তেই তোমাদের শরীর উষ্ণ হয়ে উঠবে।

তাকে বললাম, তা হলে বিলম্ব কেন? শীঘ্র সে স্যুপ আনতে বল।

শামীম আল মামুন সব জিনিসেই একটু খুঁতখুঁতে। সে বলল, আগে জেনে নিন, ওটা কীসের স্যুপ!

ঠিকই বলেছে, এদের তো খাদ্যাখাদ্যের ভেদ নেই। জিজ্ঞেস করলাম, এত গুণান্বিত স্যুপটি কী দিয়ে প্রস্তুত?

এতক্ষণে মন্ত্রী প্রবরের বোধোদয় হল। আমাদের খাবার সম্বন্ধীয় বিধি-নিষেধ তার অজানা থাকার কথা নয়। একটু ইতস্তত করে বলল, তোমরা বোধহয় সে স্যুপ খাবে না। প্রচুর সময় নিয়ে জ্বাল দেওয়া কুকুরের হাড়ের মজ্জা থেকে তৈরি হয় এই স্যুপ।

টেবিল থেকে উঠে দাঁড়ালাম। বললাম, এই স্যুপ খাওয়ার তো প্রশ্নই আসে না। যে সমস্ত পাত্রে তার স্পর্শ লেগেছে, সে পাত্রের রান্নাও খাওয়া সম্ভব নয়। আমাদের জন্য নতুন হাঁড়িতে নতুন করে রান্না করতে বল।

সে বলল, তোমাদের চিন্তার কোন কারণ নেই। তোমাদের জন্য ভিন্ন পাত্রেই খাবার রান্না হয়।

সে রাতে কিছুতেই খেয়ে তৃপ্তি পেলাম না। সবাই নিজ নিজ কক্ষে চলে গেল। মন্ত্রী বলল, তোমার শরীর গরম করার সব রকম ব্যবস্থাই আমাদের হাতে রয়েছে। একটু ইঙ্গিত করলেই তোমার কক্ষে পৌঁছে যাবে।

সে কী ইঙ্গিত করল বুঝার চেষ্টা করলাম না। আমার কোন কিছুরই প্রয়োজন ছিল না।

পরদিন তাদের সচিবালয় ও দলের কার্যালয় পরিদর্শন করা গেল। বিকেলে আমাদের নিয়ে যাওয়া হল তাদের বিখ্যাত ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে। তখন দোকানের সময় উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু করিৎকর্মা দোভাষী বলল, কোন অসুবিধা নেই। দোকানের কর্মচারীরাও সকলেই দলীয় সদস্য। যতক্ষণ প্রয়োজন খোলা রাখা সম্ভব।

ওখানে ক্রয়ের মতো কিছু ছিল না। তবুও অনেক কিছুরই প্রশংসা করলাম, ক্রয় করলাম কেবল কয়েক বোতল জিন সেং। বলবর্ধক ঔষধের জগতে কোরীয় ও চীন দেশের জিন সেং সারা বিশ্ব জুড়ে নাম করেছে।

প্রায় তিন সপ্তাহ হল দেশ থেকে এসেছি। স্যারকে টেলিফোন করে জানলাম, ইতিমধ্যে বিরোধীদের কর্মসূচি বিরামহীনভাবে চলছে। তিনি দুঃখের সঙ্গে বললেন, অহেতুক মানুষের জান-মালের ক্ষতি হচ্ছে। এভাবে আর কতদিন চলবে!

তাঁর কণ্ঠে নৈরাজ্যের আভাস পেলাম। সাথীদের বললাম, বাক্স-পেটরা বাঁধো, অনেক বেড়ানো হল, বিশ্রাম হল, চলো দেশে গিয়ে নব-উদ্যমে কাজে লেগে পড়ি।

যথারীতি বিদায় নিয়ে হংকং-ব্যাংকক হয়ে ঢাকা এসে পৌঁছলাম। পরদিন বঙ্গভবনে একক শপথানুষ্ঠানে উপ-প্রধানমন্ত্রীরূপে দায়িত্ব লাভ করলাম।

জাতীয় পার্টিতে প্রচুর রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সমাবেশ ঘটলেও, প্রতিষ্ঠানটির কাঠামো ছিল এড্-হক ভিত্তিক। অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসাবে কাজ চালিয়ে নিয়ে যাওয়াই কথা। জনদল বা জাতীয় পার্টির সাংগঠনিক ভিত তাই যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল না। কমিটি নিয়েও প্রায় প্রতিটি জেলাতে কোন্দল। উপদলীয় সংঘাতে সংগঠন দুর্বল। কেন্দ্রীয় কমিটি এবং সম্পাদকমণ্ডলীর সভায় সিদ্ধান্ত নিলাম, সম্মেলনের মাধ্যমে কাউন্সিলারদের মতামতের ভিত্তিতে জেলা কমিটিসমূহ গঠিত হবে। আমরা সেসব সম্মেলনে উপস্থিত হয়ে নির্বাচন সম্পন্ন করব। তারপর সে জেলা কমিটির দায়িত্ব হবে উপজেলা সম্মেলনের মাধ্যমে কমিটি গঠন এবং তাদের দায়িত্ব হবে নিম্ন পর্যায়ে ইউনিয়ন কমিটি গঠন করা। কোনও এক স্থান থেকে শুরু করতে হয় তাই আমরা জেলা পর্যায় থেকেই কাজ শুরু করলাম।

সমস্ত মন্ত্রিমণ্ডলী, কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ, সংসদ সদস্যগণ এবং অঙ্গসংগঠনসমূহের সকল নেতা-কর্মীকে যথেষ্ট আগাম নোটিশ দেওয়া হল জেলা সম্মেলনের বিষয়ে। বিদ্যমান জেলা কমিটিগুলোকে সম্মেলনের কর্মসূচি দিতে বললে অনেক বাহানায় তা কেবল বিলম্বিতই হতে থাকে। তাই চেয়ারম্যান সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ করে আমি প্রায় তিন মাসের একটি সাংগঠনিক কর্মসূচি প্রণয়ন করলাম চূড়ান্তভাবে। অনেক সময় হাতে রেখে, অনেক বিবেচনায় প্রস্তুত সে কর্মসূচি কোনক্রমেই পরিবর্তিত হবে না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হল। দলীয় কার্যালয়ে বিরাট বোর্ডে সে ম্যারাথন সফরসূচি টানিয়ে দেওয়া হল।

একটি রাজনৈতিক দল এবং সে দলটি যদি একটি বড় দল হয় ও সরকারে থাকে সেখানে স্বার্থের টানাপোড়েনে, মতাদর্শের বিভিন্নতায় এবং নেতৃত্বের প্রভাবজনিত কারণে স্বভাবতই কিছুটা অনৈক্য, উপদলীয় বিবাদ এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষার বলয় সৃষ্টি হবে। কিন্তু কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব যদি দৃঢ়,

পক্ষপাতশূন্য এবং যোগ্যতার মূল্যায়নে উদ্যোগী হয় তা হলে অনেক অসম্ভবকে সম্ভবে পরিণত করা যায়।

জনদল গঠনের প্রাথমিক পর্যায়ের কথা মনে পড়ে। কত না দ্বন্দ্ব, কত না বিবাদ এবং মারাত্মক সংঘর্ষ ও রক্তপাত সংঘটিত হয়েছিল! কোথাও সম্মেলন করে কমিটি গঠনের ব্যবস্থা করা যায়নি। কিন্তু আজ দলকে দৃঢ় প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তির উপর দাঁড় করানোর আমাদের ঐকান্তিক আগ্রহ অনেক বাধা অতিক্রম করতে সাহায্য করল। নিয়ম করেছিলাম এই রকম, সকাল দশটার মধ্যে সম্মেলনের উদ্বোধন হবে জাঁকজমকের সঙ্গে। কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ এবং স্থানীয় নেতৃবৃন্দের বক্তৃতার তালিকা আমি প্রস্তুত করে দিতাম। কাউন্সিলারদের মধ্য থেকেও কয়েকজনকে সুযোগ দেওয়া হত। সর্বশেষ আমি বক্তৃতা করতাম। দীর্ঘ বক্তৃতায় কর্মীদের উজ্জীবিত করে তোলার প্রয়াস পেতাম।

মধ্যাহ্নভোজের সময় প্রায় প্রতিদিনই পার হয়ে যেত। কিন্তু কর্মীদের অভিযোগ ছিল না। বিকেলে-দুপুরের খাবার খেয়ে কমিটি গঠনের কাজে লেগে যেতাম। সম্মেলন থেকে সর্বত্র একই প্রকারের সাবজেক্ট-কমিটি গঠন করে আনতাম। কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ, জেলার সংসদ সদস্যগণ, বিদ্যমান জেলার আহ্বায়ক বা সভাপতি-সম্পাদক এবং উপজেলাসমূহের প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারিকে সাবজেক্ট কমিটিতে নিয়ে আমরা বসতাম। এ কাজে সর্বাধিক সাহায্য করেছে দলের দফতর সম্পাদক ও মন্ত্রী তাজুল ইসলাম চৌধুরী। আমাদের অবস্থানস্থল সার্কিট হাউসে বৈঠক বসত। সাবজেক্ট-কমিটিতে তাজুলকে দায়িত্ব দিয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতাম এবং সার্বক্ষণিক দৃষ্টি রাখতাম কোন বিসম্বাদ যেন না ঘটে। তাজুল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঐক্যমত্যের কমিটি গঠন করে হাসিমুখে কৃতিত্ব নিত। যেখানে দ্বিমত বা ত্রিমত কিছুতেই সুরাহা করতে পারত না, তখন আমার ডাক পড়ত।

সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে বিভ্রাট এড়ানো শক্ত নয়। সকলেই বুঝত মহাসচিব সংগঠনের স্বার্থ ব্যতীত আর কিছু বিবেচনায় নেবে না। তারাও অন্যায় আবদার করত না। প্রেসিডেন্ট-সেক্রেটারির প্রার্থী একাধিক হলে বলতাম, একজনই পদটি পাবে, দু'জন নয়। আপনারা নিজেরা আমার ঘরে গিয়ে ঠিক করে আসুন।

অনেক সময় কাজ হত। একজন আর একজনকে প্রভাবিত করে ফেলত। তারা একমত হয়ে বেরিয়ে আসত। একজনকে সভাপতি, অন্য জনকে সহ-সভাপতি করে দিতাম। যেখানে ঐক্যমত হত না, জানতে চাইতাম আমার উপর তাদের আস্থা রয়েছে কিনা। একাধারে সরকারের উপ-প্রধানমন্ত্রী, অন্যদিকে দলের মহাসচিব এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের আস্থা-শ্রদ্ধার পাত্র বলেও বিবেচনা করত। তাই তাদের আস্থা জানাতে দ্বিধা করত না। তখন

তাজুলের অসমাপ্ত প্যানেলের পাশে তাদের অনুমোদনসূচক স্বাক্ষর নিতাম। তারপর বিবেচনায় নিতাম কার যোগ্যতা কতটুকু, কার বয়স বেশি, কার পেশা কি! সমস্ত বিবেচনায় যে অধিকাংশের পছন্দের ব্যক্তি হত তাকেই প্রধান পদে দিয়ে অন্যদেরকে পরবর্তী মর্যাদায় রাখার ব্যবস্থা করতাম। সকলেই মেনে নিত বা মেনে নিতে বাধ্য হত। কার ঘাড়ে ক'টা মাথা! এই নিয়ম মেনে সর্বত্র নির্ঝঞ্ঝাটে সর্বসম্মত কমিটি গঠন করতে সক্ষম হই। নিজে নিরপেক্ষ থাকলে সহজেই বৃহৎ ফল পাওয়া যায়। কর্মীরা এই প্রচেষ্টাকে সর্বতোভাবে সমর্থন করত। দল দ্রুত গড়ে উঠতে লাগল।

ঝামেলা বেঁধে যেত পূর্ণ কমিটি গঠন করে স্যারের অনুমোদনের জন্য পাঠালে; তিনি কোন কোন সময় কারো পরামর্শে সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদকের নাম কেটে অন্য নাম বসিয়ে দিতেন। তাতে যে সম্পূর্ণ কমিটির ব্যত্যয় ঘটে যায়, এটা তিনি বুঝতে চাইতেন না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অরাজনৈতিক কোন উৎস থেকে এই ধরনের পরিবর্তনের প্রস্তাব আসত এবং দলের ভারসাম্য নষ্ট করে দিত।

কোন কারণেই প্রোগ্রাম পরিবর্তন করতাম না—একথা সর্ব মহলে বিদিত ছিল। কেউ তা পরিবর্তনের চেষ্টাও করত না। সব রকম যানবাহন ব্যবহার করে ঠিক স্থানে ঠিকমতো উপস্থিত হতাম। কোন ব্যত্যয় না হওয়ার দরুন কর্মীদের মধ্যেও একটা নতুন শৃঙ্খলাবোধ জেগে উঠল। ঝড়-বৃষ্টি বা যে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগকে অবহেলা করতে শিখেছিলাম। গাড়ি, লঞ্চ, স্টিমার, রেল, অ্যারোপ্লেন, হেলিকপ্টার সব রকম যানবাহনই ব্যবহার করতে হয়েছে বাহাত্তরটি সাংগঠনিক জেলায় সফর করার সময়। সে সময় জাতীয় পার্টির কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে যে উৎসাহ-উদ্দীপনা ও কর্মচাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল তা ছিল অভূতপূর্ব। সম্মেলন শেষে অনেক স্থানে জনসভায়ও ভাষণ দিতে হত।

যেদিন কুষ্টিয়াতে কর্মসূচি পড়ল, সেদিনই বিকেলে ফরিদপুর শহরে একটি কর্মী-সভা রেখেছিলাম। কুষ্টিয়া অপেক্ষাকৃত ছোট জেলা, তেমন কোন ঝামেলা হওয়ার কথা নয়। কুষ্টিয়াতে রানার মামা বাড়ি, ওর নানী সেখানে গ্রামেই থাকেন। হেলিকপ্টার নিয়ে যাচ্ছি। রানা বলল, আব্বা, আমি তোমার সঙ্গে যাব। তুমি যতক্ষণ সম্মেলন করবে ততক্ষণে আমি একটা গাড়ি নিয়ে গিয়ে নানীকে দেখে আসব। তোমাদের সম্মেলন শেষ হওয়ার পূর্বেই আমি ফিরে আসব।

ওকেও সঙ্গে নিলাম। সম্মেলন শেষ করে হেলিকপ্টারে উঠলাম। সেদিন আরও তিন জন মন্ত্রী আমার অনুগামী—জাফর ইমাম, মোস্তফা জামাল হায়দার এবং তাজুল ইসলাম চৌধুরী। এই তিন জন মন্ত্রীসহ অন্যান্য কর্মকর্তারাও সঙ্গে ছিল।

হেলিকপ্টার ফরিদপুরের পথে রওয়ানা হয়ে মধ্যপথে ঝড় ও বৃষ্টির কবলে নিপতিত হল। পাইলটরা বলল, স্যার, কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

প্রচণ্ড ঝড় ও বৃষ্টির ফলে কোন কিছুই দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল না। ঝড়ের প্রকোপে হেলিকপ্টার ভীষণভাবে আন্দোলিত হতে লাগল। একবার উপরে উঠে যাচ্ছে, আবার নিচে পড়ে যাচ্ছে। এক-একসময়ে কাত হয়ে এক-এক দিকে চলে যাচ্ছে। পরিস্থিতি পাইলটদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। হঠাৎ পাইলট দু'জন চিৎকার করে উঠল, স্যার, ইঞ্চিনে আগুন ধরে গেছে।

তাকিয়ে দেখি কপ্টারের ইঞ্জিনে আগুন। একদম সময় নেই। যে কোন মুহূর্তে দপ করে সারা হেলিকপ্টারে আগুন ছড়িয়ে পড়বে। এক শত ভাগ অকটেনে হেলিকপ্টার চলে। এসব ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক আগুন সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ারই কথা।

ভাবলাম, অনেক অনেক ঝড়-ঝঞ্ঝা পাড় হয়ে জীবন এখানে এসে যবনিকা টানল। আমি চলে যাব, ঠিক আছে, কিন্তু আমার একমাত্র পুত্রও আজ সঙ্গে। একবার ভাবলাম, রানাকে দরজা খুলে নিচে ফেলে দেই, হাত-পা ভেঙেও যদি জীবনে বেঁচে থাকে—তার মধ্যে আমিও বেঁচে থাকব। কিন্তু ভাবা পর্যন্তই, কোন পিতাই পারে না তার পুত্রকে এইভাবে ঝড়-বৃষ্টির তাণ্ডবে অন্ধকারের মধ্যে আকাশ থেকে নিচে ফেলে দিতে!

পাইলটদের বললাম, এক সেকেন্ড বিলম্ব করো না, যেখানে আছ সেখানেই অবতরণের চেষ্টা কর।

তারা বলল, নিচে কি রয়েছে জানা নেই! নদ-নদী থাকতে পারে, বিদ্যুতের লাইন থাকতে পারে, হিতে বিপরীত হতে পারে।

বললাম, সবই হতে পারে, কিন্তু হেলিকপ্টার যে কোন মুহূর্তে সম্পূর্ণ জ্বলে উঠে আমাদের সবাইকে অঙ্গার বানিয়ে দিতে পারে। সময় নেই, যেখানে আছ সেখানেই নামার চেষ্টা কর।

ওরা প্রাণপণ চেষ্টায় তা-ই করল এবং আল্লাহ্ তা'আলার অসীম রহমতে হেলিকপ্টারটি সম্পূর্ণ জ্বলে ওঠার পূর্বেই অবতরণ করতে সমর্থ হল। যেখানে নামল, সৌভাগ্যক্রমে সেটি একটি বাড়ির আঙিনা। হেলিকপ্টারের ডানার আধ ইঞ্চির মধ্যে বিদ্যুতের সচল লাইন। আল্লাহ্র কী অপার মহিমা, জীবনের আশা আবার ফিরে পেলাম। সবাই লাফিয়ে নেমে সামনের একটি ঘরে ঢুকে পড়লাম। সকলেই অক্ষত রয়েছি। বৃষ্টির চোটে হেলিকপ্টারের আগুনও নির্বাপিত হয়ে গেছে। আল্লাহ্ তাঁর সীমাহীন ক্ষমতায় আর একবার আমাদের নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচালেন।

যে বাড়িতে কপ্টার নেমেছে সেটি একজন ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যের বাড়ি। আমি তখন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের

দায়িত্বে রয়েছি। সে লোক হাতে আকাশ পেল। দু'মিনিট পূর্বে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে উঠবার কিছুক্ষণের মধ্যেই কলা, বিস্কুট, চানাচুর এবং রসগোল্লা এসে গেল আমাদের জন্য। ঝড়-বৃষ্টির প্রকোপের মধ্যেই হাজার হাজার মানুষ ছুটে এল কয়েকজন মন্ত্রীসহ হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় পড়েছে তা দেখার জন্য। ঝড়-বৃষ্টি কমতে ফরিদপুর থেকে ডিসি, এসপি'ও জিপ নিয়ে ঝড়ের বেগে এসে উপস্থিত। তারা অবাক বিস্ময়ে দেখল, উঠানে অক্ষত হেলিকপ্টার আর ঘরে আমরা সকলেই সুস্থ, অক্ষত এবং জলযোগরত। তারাও আল্লাহ্‌র অসীম রহমতের কথা বারবার উচ্চারণ করল।

এত মানুষ জমে গেল যে, বাড়িওয়ালা সামাল দিতে হিমশিম খেতে লাগল। স্থানীয় কর্মীরা ও আনসার-পুলিশ মিলে মানুষের ভিড়কে সংহত করল।

মেম্বার ও গ্রামবাসীকে ধন্যবাদ দিয়ে ডিসি, এসপি'র সঙ্গে আমরা ফরিদপুর শহরে পৌঁছে বিলম্বিত কর্মী-সম্মেলনে যোগ দিলাম। সেদিন আর ঢাকা না ফিরে ফরিদপুর সার্কিট হাউসে রাত অতিবাহিত করলাম।

খবর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে, মন্ত্রীরা ঝড়ের কবলে, হেলিকপ্টারের বাধ্যতামূলক বিপজ্জনক অবতরণ—এসব খবর নানাভাবে ঢাকায়ও পৌঁছেছে। প্রেসিডেন্ট সাহেব টেলিফোনে কথা বলে সব শুনে অনেক শুকরিয়া আদায় করলেন এবং আমাকেও খানিকটা শাসন করলেন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এইভাবে দলের জন্য প্রাণপাত করার জন্য।

বললাম, ঝড়-বৃষ্টি তো আসতেই পারে! তার জন্য সব কাজকর্ম বন্ধ রাখা যায় না। আপনি ভাববেন না স্যার, আল্লাহ্‌ আমাদের সহায়।

বাসায় টেলিফোন করলাম। আমরা সুস্থ আছি, আল্লাহ্‌ অনেক বড় বিপদ থেকে আমাদের রক্ষা করেছেন। সালেহাও রানার সঙ্গে কথা বলার পর পরিপূর্ণ আশ্বস্ত হল।

গতি থামাইনি। হেলিকপ্টার ঝড়ে পড়েছে, গাড়ি দুর্ঘটনায় বিনষ্ট হয়েছে, লঞ্চ চরে আটকা পড়ে গেছে। কিন্তু কোন না কোন উপায়ে সেই সমূহ বাধা অতিক্রম করে জায়গা মতো পৌঁছেছি।

কিছুদিনের মধ্যেই আর একটি বিমান দুর্ঘটনায় জীবনাশঙ্কা হয়েছিল।

বগুড়ার জয়পুরহাটে সেদিন আমার প্রোগ্রাম ছিল। বগুড়ার নবাব বাড়ির সন্তান আমাদের মন্ত্রিসভার সদস্য মামদুদুর রহমান চৌধুরী, জনাব মজিবর রহমান চিশতি, আমার বিশেষ স্নেহভাজন জগন্নাথ কলেজের সাবেক সাধারণ সম্পাদক এস.আর. নোমানী এবং অন্যান্য সহকারীরা সঙ্গে ছিল। ফ্লাইং ক্লাবের ছোট বিমান নিয়ে আমরা মাঝে মাঝে চলাফেরা করি। সেদিনও তেমনি একটি বিমান নিয়ে বগুড়া পৌঁছলাম। ক্যান্টেনমেন্টের পাশের 'স্ট্রিপটি'-এ জাতীয় প্লেন ওঠা-নামার জন্য ব্যবহৃত হয়। আমরা নির্বিঘ্নেই

পৌঁছলাম। সেখান থেকে সড়কপথে জয়পুরহাটে প্রোগ্রাম সেরে পুনরায় বগুড়ায় এসে সেই প্লেনেই ঢাকায় প্রত্যাবর্তনের কথা। বগুড়ার সমস্ত কর্মীরা সেখানে উপস্থিত। ডিসি, এসপিসহ অন্যান্য জেলা কর্মকর্তাও উপস্থিত। মামদুদ দু'-একদিন বগুড়াতে থাকবে। সকলের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে ছোট্ট প্লেনটিতে উঠে বসলাম। সকলেই আসন গ্রহণ করার পর প্লেন স্টার্ট দেওয়া হল এবং রানওয়েতে দৌড়ের শেষ পর্যায়ে ওড়ার পূর্বমুহূর্তে বিপর্যয় ঘটে গেল। প্লেনটি উড়তে সক্ষম হল না। দৌড়ের গতিবেগ তখন সর্বোচ্চ পর্যায়ে। সেটি রানওয়ে থেকে ছিটকে বাইরে গিয়ে পড়ল। ডিসির গাড়ি নিয়ে ড্রাইভার দণ্ডায়মান ছিল। তার মাথা উড়ে গেল। একটি বৃক্ষের সাথে ধাক্কা লেগে শেষ পর্যন্ত বিমানটি ভাঙাচোরা অবস্থায় একটি খালে নিমজ্জিত হল। মামদুদ এবং কর্মীরা সব হায় হায় করে উঠল। বগুড়ায় এসে মোয়াজ্জেম ভাইকে প্লেন দুর্ঘটনায় প্রাণ দিতে হল! ওরা চিৎকার করতে করতে প্লেনের দিকে দৌড়ে আসতে লাগল।

আল্লাহ্‌র কি অসীম মেহেরবানি, প্লেনটি দুমড়ে-মুচড়ে একটি পিণ্ডের আকার ধারণ করেছিল। দুটি পাখা এবং বডির অনেকটাই গুঁড়িয়ে গেছে। যাত্রীরা সকলেই দুর্ঘটনায় জ্ঞান হারিয়েছে। আমার জ্ঞান হারায়নি। সবকিছু ঠিক ঠিক বুঝতে সক্ষম হচ্ছি। চেয়ে দেখি পাইলটদ্বয়সহ সকলেই অচেতন। জোরে ধাক্কা মেরে পাইলটদের জ্ঞান ফিরালাম। বললাম, দরজা খুলছে না। যে কোন মুহূর্তে আগুন লেগে যাবে! তাড়াতাড়ি দরজা ভেঙে সকলকে বের করার ব্যবস্থা করুন।

তারা প্রথম ধাক্কা ততক্ষণে সামলে নিয়েছে। নিজেরা বেঁচে রয়েছে, অন্যদের বাঁচাবার চেষ্টায় লেগে গেল। তারা কোন প্রকারে বের হয়ে টানাটানি করে দরজা খুলে দিতেই চেতনা ফিরে আসা সকলকে প্লেন থেকে বের করলাম। আগুন জ্বলেনি। তাছাড়া প্লেনের ভগ্নাংশ খালের পানির মধ্যে পড়েছে। আমি ধীরে-সুস্থে সকলের পর বের হলাম। একটি স্যান্ডেল খুঁজে পাচ্ছিলাম না। সেটিও খুঁজে-পেতে বের করে স্যান্ডেল হাতে করে বেরিয়ে আসতেই মামদুদ আমাকে জীবিত দেখে হাউমাউ করে কেঁদে বুকে জড়িয়ে ধরল। কর্মীরা এসে হাত-পা নেড়ে দেখতে লাগল সব ঠিক আছে কিনা এবং অক্ষত আছে কিনা। আমি সবাইকে সুস্থ আছি দেখিয়ে মামদুদকে নিয়ে কাজে নেমে পড়লাম।

ডিসি চিৎকার করে কাঁদছিল। তার ড্রাইভারের দেহ একধারে, মুণ্ডুটি অনেক দূরে পড়ে আছে। আমি দেখেছি এ ধরনের বিপদের মুহূর্তে আমার মস্তিষ্ক ঠিকই কাজ করে। ডিসিকে ডেকে বললাম, এখন কাঁদবার সময় নয়। জরুরি কয়েকটি কাজ করুন। সেনাবাহিনী দিয়ে জায়গাটি ঘিরে ফেলার

ব্যবস্থা করুন, নাশকতা কিনা তদন্ত হবে। লোকজন সামলাবার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এই মুহূর্তে ড্রাইভারের ধড় ও দেহ এখান থেকে সরিয়ে পোস্টমর্টেমের জন্য প্রেরণ করতে হবে।

আরও বললাম, গাড়ি আনান, আমরা সকলে সার্কিট হাউসে যাব। সিভিল সার্জনকে খবর দিন, আমাদের সকলকে পরীক্ষা করুক।

মামদুদ পরে বলছিল, স্যার, এমন মুহূর্তে কি করে আপনি মাথা ঠিক রেখে পরপর সমস্ত নির্দেশ সঠিকভাবে প্রদান করলেন!

বললাম, এ সময় আল্লাহ্‌ই আমাকে সাহায্য করেন।

ডিসি, এসপি এবং অন্যান্য কর্মকর্তাগণ মিলে সেনাবাহিনীর সাহায্য নিয়ে অচিরেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এল এবং আমার নির্দেশসমূহ সঠিকভাবে পালন করল।

কীভাবে খবর রাষ্ট্র হয়ে যায়! সার্কিট হাউসে পৌঁছতেই সকলের আগে টেলিফোন এল পররাষ্ট্রমন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদের। সে ছিল ফ্লাইং ক্লাবের সভাপতি।

বললাম, আনিস, দুঃখিত, তোমার একটি প্লেন বিনষ্ট হল।

সে বলল, আল্লাহ্‌কে অজস্র ধন্যবাদ আপনার কিছু হয়নি। প্লেন বিনষ্ট হয়েছে—সেটা কিছুই নয়। শরীরে কোন আঘাত পাননি তো?

বললাম, সত্যিই আল্লাহ্‌র অনেক মেহেরবানি। প্লেনটি একটি ধ্বংসপিণ্ডে পরিণত হলেও আমাদের কারো গায়ে একটি আঁচড়ও লাগেনি। অভাবিত কাণ্ড!

সে পুনরায় আল্লাহ্‌কে শোকরিয়া জানাল। বলল, প্রেসিডেন্ট সাহেব টেলিফোন করবেন। লাইন ছেড়ে দিচ্ছি। ঢাকায় দেখা হবে।

সঙ্গে সঙ্গে প্রেসিডেন্টের টেলিফোন, মোয়াজ্জেম, আপনি আমাকে স্বস্তিতে থাকতে দেবেন না? আপনার কিছু হলে আমাদের কী হবে অনুমান করতে পারেন?

চুপ করে রইলাম। এসব অনুযোগের জবাব হয় না। তারপর নিজেই আবার বললেন, আমি সব শুনেছি। আল্লাহ্‌কে লাখো শুকুর যে আপনার কিছু হয়নি। আপনি এখন কেমন আছেন?

বললাম, স্যার, আপনাদের সকলের দোয়া ছিল, আল্লাহ্ তা'আলা আর একবার আমার উপর অশেষ রহমত বর্ষণ করেছেন। আমার কিছুই হয়নি। আমি সম্পূর্ণ সুস্থ। আপনি দুশ্চিন্তা করবেন না।

তিনি বললেন, আমি এখনই হেলিকপ্টার পাঠাচ্ছি। চলে আসুন।

বললাম, স্যার, হেলিকপ্টার পাঠাবেন না। আমি আকাশ পথে যাওয়ার মন-মানসিকতা হারিয়ে ফেলেছি, আমি আজ আর বেরুব না। কোথাও

যাবার মতো মনের অবস্থা নেই। ইনশাআল্লাহ্ কাল সকালে ঢাকা রওয়ানা হব।

তিনি বুঝলেন। বিশ্রামের পরামর্শ দিয়ে টেলিফোন রেখে দিলেন।

বাসায় সালেহাকে বুঝাতে বেশ বেগ পেতে হল। শেষ পর্যন্ত মামদুদ তাকে প্রবোধ দিল, ভাবী, স্যারের যে মানসিক শক লেগেছে, সেটা কাটাতে সময় লাগবে। কাল তাকে আমি সঙ্গে করে নিয়ে আসব। আপনি চিন্তা করবেন না।

পরদিন ঢাকায় এলে প্রেসিডেন্ট সাহেব আমার বাসায় এসে আমাকে অনেকক্ষণ বুকে জড়িয়ে রাখলেন। দেখি তাঁর চোখ সজল হয়ে উঠেছে। মাঝে মাঝে আমার বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় যে, তাঁর অন্তরে হয়ত আমার জন্য একটি সত্যিকারের স্নেহানুভূতি রয়েছে।

টেলিভিশনে ভাঙাচোরা প্লেনটির ছবি দেখে আমার নিজেরই বিশ্বাস হতে মন চায় না, ওই প্লেনের অভ্যন্তরে আমরা ছিলাম এবং আমাদের কারো কিছু হয়নি। প্রেসিডেন্ট সাহেবকে আমি নিবেদন করেছিলাম, স্যার, বিষয়টির সূক্ষ্ম তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। এটি একটি নাশকতামূলক কাজ বলে অনেকেই সন্দেহ করে।

তিনি বললেন, অবশ্যই তদন্ত হবে এবং সত্য উদ্ঘাটিত হবে।

তদন্ত কী হয়েছিল তা জানি না। আমার বক্তব্য গ্রহণের জন্যই যখন কেউ আসেনি তখন আর তদন্ত হল কোথায়!

দেশের উপ-প্রধানমন্ত্রীর জীবনসংশয় হয়েছিল—এমন ঘটনারও তদন্ত ধামা-চাপা পড়ে যায়! সরকারের উপরেও কোন্ অদৃশ্য সরকার রয়েছে?

ব্যক্তিগত দুর্ঘটনার বিষয়টি বড় নয়। বড় হল, ঘটনা এবং পূর্বাপর সূত্রসমূহ। প্লেনে যান্ত্রিক কারণেও গোলযোগ ঘটতে পারে, আবার নাও পারে। আমার শত্রু-মিত্র কোনটারই অভাব নেই। সারাদিন বগুড়া শহরে প্লেনটি দাঁড়িয়ে ছিল। পাইলট দু'জন প্রাকৃতিক কারণে হোক বা লাঞ্চের জন্য হোক জাহাজ ছেড়ে অন্যত্র যেতে পারে এবং সেই সুযোগে ওখানে একটা কিছু অপকর্ম ঘটা অমূলক নাও হতে পারে। বিষয়টির সুষ্ঠু তদন্ত হলেই সব প্রকাশ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু 'কার বা গোয়াল, কে বা দেয় ধোঁয়া'।

আমরা আছি আমাদের তাল নিয়ে। সেখানে বেতাল হলেই সমস্যা। কেউ টাকা কামাচ্ছি, কেউ একটু নহ বধূ, নহ কন্যা, নহ মাতা বলে হুমড়ি খেয়ে পড়ছি, কেউ দুটোই করছি। আবার কেউ সংগঠন করার দুরূহ স্বপ্ন নিয়ে দৌড়-ঝাঁপ করছি। ব্যস্ত আমরা সকলেই। তদন্ত অনুষ্ঠানের সময় কোথায়।

কাজী জাফর পুনরায় কক্ষপথে ফিরে এল। কিছুকাল ধৈর্য ধরে ক্ষমতার

রাজনীতি থেকে নির্বাসিত জীবনযাপন করে পুনরায় এরশাদ সাহেবের মন জয় করতে সমর্থ হল। কী ভোগে দেবতা খুশি তা অভাজনদের জানার কথা নয়! আমরা দেখলাম, সে অধিকতর ঘনিষ্ঠতায় প্রথমে রাষ্ট্রপতির প্রধান রাজনৈতিক উপদেষ্টা, পরে উপ-প্রধানমন্ত্রী নিয়োজিত হল। অনেকেরই ধারণা ছিল, আমি বোধহয় তার সম্বন্ধে সর্বদাই বিরূপ প্রচারণা করে রাষ্ট্রপতির কাছে তাকে হেয় প্রতিপন্ন করতাম। ঘটনা সম্পূর্ণ ভিন্ন। রাজনৈতিক কারণে যে মতবিরোধ তা প্রকাশ্যে উদ্‌ঘাটনে আমার বিন্দুমাত্র দ্বিধা ছিল না। কিন্তু তার অগোচরে সুযোগ নেওয়ার কুঅভ্যাস আমার ছিল না। অতি বড় সমালোচকরাও একথা স্বীকার করবেন যে, প্রকাশ্যে মত প্রকাশের সৎসাহসের অভাব আমার কোনদিন ছিল না এবং গোপনে কুৎসা রটনা আমি অপছন্দ করি।

কে এল, কে গেল সেটা আমার নিকট বড় বিষয় ছিল না। আমি সাংগঠনিক কাজেই মগ্ন রয়েছি। সপ্তাহের ছ' দিন মফস্বলে থাকি। শনিবার অনেক রাতে ঢাকায় ফিরে আসি। সারাদিন মন্ত্রণালয়ের কাজ করি, রাতে ক্যাবিনেট মিটিং-এ যোগ দিয়ে পরদিন প্রত্যুষে আবার বেরিয়ে পড়ি। আমার শুভাকাঙ্ক্ষী কেউ কেউ বলছিল এভাবে রাজধানী ফেলে চলে গেলে ক্ষমতার বলয়ে স্বীয় রাজনীতি অরক্ষিত থেকে যায়। আমার সেদিকে ভ্রূক্ষেপ ছিল না। মনে করতাম কর্মের যোগ্য মূল্যায়ন হবেই। কিন্তু ভুল, সবই ভুল।

কাজী জাফরকে নিয়ে কুমিল্লার সম্মেলন করে এলাম। সম্মেলনে প্রচুর ঝামেলা থাকলেও সহকর্মীর মর্যাদায় এতটুকু আঁচড় লাগতে দিইনি। ডা. মতিন সাহেবকে নিয়ে সিরাজগঞ্জে সম্মেলন করে এলাম। মহাসচিব হিসাবে প্রধান অতিথি যদিও আমিই ছিলাম, লক্ষ্য করলাম সবক'টি তোরণই ডা. মতিনের নামেই নির্মাণ করা হয়েছে। এর প্রতিউত্তরে একদিন তাকে মুন্সীগঞ্জ নিয়ে গিয়ে সবক'টি তোরণ তার নামে নির্মাণ করে দেখালাম। মতিন সাহেব বুদ্ধিমান মানুষ, না বুঝার কথা নয়।

অবশ্য, সেই দুই বন্ধুর গল্পের মতো হলে আর কথা নেই! দুই বন্ধু একটি কেক কিনেছে ভাগ করে খাবে বলে। একজনকে ভাগ করতে দেওয়া হল। সে নিজের ভাগটি বড় রেখে ছোটটি অন্যজনকে দিল। শেষোক্ত বন্ধু অভিযোগ করল, এটা কেমন ভাগ হল? নিজে নিলে বড়টা আর আমার জন্য ছোটটা!

প্রথম বন্ধু মৃদু হেসে বলল, আচ্ছা, তোকে ভাগ করতে দিলে তুই কি করতিস?

সে জবাব দিল, আমি ছোটটি নিয়ে তোকে বড়টা দিতাম।

প্রথমোক্ত বন্ধু বলল, তাই তো পেয়েছিস। তা হলে আর অভিযোগ করছিস কেন?

অভিযোগ আমার তো মানায় না।

মওদুদ আমার কলেজ জীবনের সহপাঠি বন্ধু এবং ঢাকা কলেজ ছাত্রসংসদে আমি জেনারেল সেক্রেটারি, সে প্রমোদ-সম্পাদক। আমাদের দু'জনার সম্পর্ক সবসময়ই ভালো। তাকে নিয়ে নোয়াখালীতে সম্মেলন করলাম। ভিন্নমত থাকলেও সেখানে তার অভিমতেরই মর্যাদা দেওয়া হল।

মুন্সীগঞ্জ জেলা সম্মেলনে অনির্ধারিতভাবে প্রেসিডেন্টকে নিয়ে গেলাম। সে এক কাহিনী! পোস্টার, লিফলেট, ব্যাজ, তোরণ সবকিছু হয়েছে আমার নামে। আমিই সে সম্মেলনের প্রধান অতিথি। মুন্সীগঞ্জের কর্মীরা আমার নিকট থেকে একটি পয়সাও নেয়নি। তারা নিজেরাই সমস্ত অর্থ ব্যয় করেছে। তাদের বক্তব্য সরল—মহাসচিবের জেলা মুন্সীগঞ্জ। এখানে তাকে নিয়ে এমন সম্মেলন করতে হবে যেন সকলেই হতবাক হয়ে যায়। আয়োজন সেরকমই হয়েছিল। কত যে তোরণ নির্মিত হয়েছে আমার নামে তার কোন হিসাব নেই।

সেদিন প্রেসিডেন্ট সাহেব অতি প্রত্যুষে বিদেশ থেকে একটি সফর শেষে সপরিবারে দেশে ফিরছেন। সকালেই সকলকে বাধ্যতামূলক বিমানবন্দরে যেতে হচ্ছে। নিয়মটি যতই অর্থহীন হোক না কেন, যথেষ্ট যৌক্তিক কারণ না থাকলে কেউ প্রেসিডেন্টের যাওয়া-আসায় অনুপস্থিত থাকত না। আমিও বিমানবন্দরে তাঁর অভ্যর্থনায় গিয়েছি। আমার সঙ্গে কথা বলার সময় জিজ্ঞেস করলেন, আজ আপনার কোন প্রোগ্রাম নেই?

বললাম, স্যার, আজ আমার নিজ জেলা মুন্সীগঞ্জে সম্মেলন।

তিনি হাসিমুখে বললেন, আমার তো আজ তেমন কাজ নেই, মুন্সীগঞ্জ নিয়ে চলুন।

বললাম, স্যার, এর চাইতে সুখবর আর কিছু হতে পারে না। মুন্সীগঞ্জের লোকজন আপনাকে পেলে যারপরনাই খুশি হবে। কর্মীরা হাতে আকাশের চাঁদ পাবে।

ফার্স্ট লেডি আপত্তি জানালেন, এতটা সফর করে এসে আজ বিশ্রাম নেওয়া প্রয়োজন। মুন্সীগঞ্জ যাওয়া ঠিক হবে না।

বললাম, ভাবী, দ্বিপ্রহরের খাবারের পর রওয়ানা দিলেও চলবে। স্যারকে এখন বিশ্রামের সুযোগ দিয়ে লাঞ্চের পর আমি নিজে এসে নিয়ে যাব। কোন অসুবিধা হবে না।

স্যার বললেন, ঠিক আছে, তা- হবে। আমি কোন সম্মেলনে যাই না, আপনার এই অভিযোগ আজ মুন্সীগঞ্জে গিয়েই খণ্ডন করব।

খুবই হৃষ্টচিত্তে বাসায় ফিরেই মুন্সীগঞ্জে লোক পাঠিয়ে দিলাম। টেলিফোনে ডিসি, এসপি এবং কর্মীদের সঙ্গে কথা বললাম। মুন্সীগঞ্জে খবর পৌঁছতেই সেখানে সাজ সাজ রব পড়ে গেল।

যথাসময়ে লোকজনসহ তাঁকে সেনাভবন থেকে তুলে নিজেই গাড়ি ড্রাইভ করে নিয়ে চললাম। মুন্সীগঞ্জে প্রবেশ দ্বারের তোরণটিতে কোনক্রমে তাঁর নামে ওরা ব্যানার দিতে পেরেছে। বাকি সব আমার নামে। স্যারকে সে কথা বলতেই তিনি হাসিমুখে বললেন, আমি বুঝতে পারছি। আমার তো আসার কথা ছিল না! আর মহাসচিবের নামে আয়োজন করলে সেটা চেয়ারম্যানের নামেই করা হল। আমি খুবই সন্তুষ্ট।

লোকজন হয়েছিল প্রচুর। আমার প্রত্যাশারও অধিক। মুন্সীগঞ্জ শহর দেখে তিনি অবশ্য খুবই হতাশ হলেন। বললেন, এই শহরের এত হীন অবস্থা কেন?

বললাম, প্রদীপের নিচেই অন্ধকার থাকে। রাজধানীর নিকটবর্তী হওয়াতে লোকজন ঢাকার উপরই অধিকতর নির্ভরশীল।

স্টেডিয়ামের সেই পার্টি সম্মেলন প্রেসিডেন্টের আগমনে জনসভায় রূপান্তরিত হয়ে গেল। কর্মীরা স্বল্প সময়ের মধ্যেই তাঁকে কিছু উপহার সামগ্রী দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিল। আমার নামের পরিবর্তে তাঁর নামাঙ্কিত করতে বিকল্প ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তিনি সম্মেলন দেখে, বিশেষ করে যে আমেজে সেটি অনুষ্ঠিত হচ্ছিল, তা দেখে খুবই সন্তুষ্ট হলেন।

তিনি তাঁর বক্তৃতার এক পর্যায়ে বললেন, আমার মহাসচিবের জেলাশহর এমন অনুন্নত থাকতে পারে না। আজ থেকে এ শহরের উন্নয়নের দায়িত্ব আমরা গ্রহণ করলাম। বৃহত্তর ঢাকার উন্নয়নের সঙ্গে যেভাবে নারায়ণগঞ্জকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে, সেভাবে মুন্সীগঞ্জ শহরকেও উন্নয়নের আওতায় নেওয়া হল। জেলাশহরের যাবতীয় উন্নয়ন কার্যক্রমের সঙ্গে সঙ্গে এখানে সরাসরি ডায়াল সিস্টেমের টেলিফোন এবং সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য প্রাকৃতিক গ্যাস দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। মুন্সীগঞ্জের দুঃখ শহরের মধ্যবর্তী খালটি মাটি ভরাট করা হবে। রাস্তাসমূহ প্রশস্ত করা হবে এবং সর্বতোভাবে একে একটি আধুনিক জেলাশহরে রূপান্তর করা হবে।

আমি আবেদন করেছিলাম, দেশের একমাত্র 'রিভার সার্কিট হাউস' মুন্সীগঞ্জে স্থাপন করার জন্য। তিনি সে দাবিও মেনে নিলেন।

মুন্সীগঞ্জের জনগণ সেবারই প্রথম একজন রাষ্ট্রপতির ঘোষণা পেল, যেখানে তাদের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা পূরণের আশ্বাস রয়েছে। এরশাদ সাহেবের একটি গুণ ছিল, যেখানে যা কথা দিতেন, তা পালন করতে ক্রুটি

করতেন না। তিনি যখন যেখানে যেতেন, দু'হাতে অনুদান দিতেন। দিতেও জানতে হয়। আমাকে একদিন বললেন, আপনাদের 'স্বেচ্ছা ফাণ্ড' সীমিত, এক কাজ করবেন, যেখানে যাবেন গড়ে পঞ্চাশ হাজার টাকা আপনি অনুদান দিয়ে আসবেন। এসে আমাকে একটা নোট পাঠিয়ে দেবেন। টাকা পৌঁছে যাবে।

আমি তা-ই করতাম। প্রতিটি সফরে তাই মুখ রক্ষা হত।

যশোরের জেলা সম্মেলনে যোগ দিতে সদলবলে প্লেনে যাচ্ছি, যাত্রীদের আসন প্রায় সবটাই সেদিন জাতীয় পার্টির নেতা-কর্মীরা নিয়ে নিয়েছে। প্লেন ছাড়ার পূর্ব মুহূর্তে মাত্র দু'জন সহকারী নিয়ে প্রেসিডেন্ট সাহেব প্লেনে উঠে এলেন। হেলিকপ্টার নিয়ে তাঁর বেনাপোল বর্ডারে যাওয়ার কথা ছিল। কি মনে করে সিদ্ধান্ত শেষ মুহূর্তে পরিবর্তন করে প্লেনে যাওয়া সাব্যস্ত করেছেন। তিনি প্লেনে উঠতেই, কর্মীরা সব আনন্দে হাততালি দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। তিনি সহাস্যে সকলের অভিবাদন গ্রহণ করে আমার পাশের আসনে বসে বললেন, মোয়াজ্জেম, বিষয় কী, প্লেন কি চার্টার করছেন নাকি?

সুযোগ পেয়ে বললাম, স্যার, আপনি বলতেন, পার্টি 'টেক অফ্' করছে না। এখন দেখুন, ইনশাআল্লাহ্, পার্টি 'টেক অফ্' করেছে এবং নিরাপদ ভ্রমণে প্রস্তুত।

তিনি বললেন, তাই তো দেখছি! আজ বোধহয় যশোরে সম্মেলন। দেখি যদি কাজ সারতে পারি, সম্মেলনে যোগ দেব।

বললাম, স্যার, খুবই ভালো হয়। আপনি সম্মেলনে এসে কর্মীদের 'সারপ্রাইজ' দিন—ওরা খুবই খুশি হবে। আপনিও দেখুন সম্মেলন কেমন হচ্ছে।

তিনি বললেন, এক শর্তে আসব। কাউকে পূর্বাহ্নে কিছু জানাবেন না।

তাতেই সম্মত হলাম। আরও কথা নিলাম তিনি লাঞ্চের পূর্বেই সম্মেলনে আসবেন এবং কর্মীদের সঙ্গে একত্রে একই খাবার খাবেন। আমার খুবই আনন্দ হল।

আমাদেরকে কোক দেওয়া হয়েছে। তিনি বেশ খোশ মেজাজেই আছেন বলে মনে হল। জিজ্ঞেস করলাম, স্যার, শুনছি মওদুদকে উপ-রাষ্ট্রপতি করে নতুন প্রধানমন্ত্রী করবেন। কথাটা কী ঠিক?

তিনি বললেন, হয়ত ঠিক। কেন আপনিও কী প্রধানমন্ত্রীর প্রার্থী নাকি?

বললাম, শুধু প্রার্থী নই! একমাত্র আদি এবং অকৃত্রিম প্রার্থী। আমার মোকাবিলায় অন্য কোন প্রার্থী থাকতেই পারে না!

তিনি বললেন, বটে! তাই নাকি? কী করে?

বললাম, একদিন বলেছিলেন যমুনার ওপার থেকে প্রেসিডেন্ট হওয়াতে প্রধানমন্ত্রী এপার থেকে করবেন। তা-ই যদি হয়, তা হলে ডা. মতিন,

কাজী জাফর ও আমার মধ্যে একজন অর্থাৎ ডা. মতিন বাদ পড়ল। বাকি রইলাম নদীর এপারে দুই জন। এখন আপনি বিবেচনা করুন কি কি গুণ থাকলে একজনকে আপনি প্রধানমন্ত্রী করবেন, সেভাবে নম্বর দিন, দেখুন কে কত পায়!

তিনি হাসতে হাসতে হাতের নোট বইতে নম্বর দিতে শুরু করলেন।

বললেন, প্রধানমন্ত্রীকে অবশ্যই একজন অভিজ্ঞ পার্লামেন্টারিয়ান হতে হবে, সেখানে অবশ্যই দু'নাম্বার আপনি পাচ্ছেন, কাজী জাফর প্রথমবার পার্লামেন্টের সদস্য হয়েছে। আপনি হয়েছেন অনেকবার এবং দু'বার চিফ হুইপও ছিলেন।

তারপর তিনি একে-একে নাম্বার দিতে থাকলেন, সংবিধান ও কার্যপ্রণালী বিধিতে অভিজ্ঞ হতে হবে। বললেন, উভয় ক্ষেত্রেই আপনি ছিলেন এ দুটির অন্যতম প্রণেতা—ফলে আপনার আরও দু'নম্বর। একজন আইনজ্ঞ হলে ভালো হয়, তাকে হতে হবে জাতীয়তাবাদী এবং ইসলামী মনোভাবাপন্ন। এই তিন বিষয়েও আপনি পাচ্ছেন ছয় নম্বর। এখনও কাজী জাফরের কোন স্কোর নেই। প্রধানমন্ত্রীকে হতে হবে একজন সুদক্ষ বক্তা এবং সর্বোপরি একজন মুক্তিযোদ্ধা। এই দুই ক্ষেত্রেও আপনিই পয়েন্ট পাচ্ছেন। নদীর এপারে বলে কাজী জাফর প্রথম দু'নম্বর পেল, আপনিও এখানে দু'নম্বর পেয়েছেন।

বললাম, স্যার, টোটালি কি দাঁড়ালো?

তিনি হেসে বললেন, আপনি পেয়েছেন ষোল নম্বর এবং জাফর পেয়েছে দুই নম্বর।

বললাম, স্যার, জাফর সাহেবকে আরও দুই নাম্বার দেওয়া যায়!

তিনি বললেন, কীভাবে?

বললাম, তাঁর চেহারা ভালো। এজন্য তার আরও দু'নম্বর প্রাপ্য। এক্ষেত্রে আমার প্রাপ্তিযোগ শূন্য।

তিনি হেসে বললেন, আপনার যত বাজে রসিকতা!

রাষ্ট্রপতিকে এতক্ষণে কিছুটা গম্ভীর হয়ে উঠতে দেখলাম। তিনি নিজেই আস্তে আস্তে বললেন, আমি এসব চিন্তা করে দেখিনি। সত্যিই তো, আপনার দাবি অগ্রগণ্য।

বললাম, স্যার, বলেছিলাম না আমিই একমাত্র আদি ও অকৃত্রিম প্রার্থী। এখন যোগ করতে চাই, আমি অদ্বিতীয় প্রার্থীও বটে!

তাঁকে অধিকতর চিন্তিত মনে হল। আমি কিন্তু মনে মনে রাজ্য জয় করে ফেলেছি।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আপনার প্রোগ্রামের অবস্থা কী?

বললাম, এ মাসের শেষ সপ্তাহে আমার সমস্ত জেলা-সম্মেলনের কাজ শেষ হবে।

তিনি বললেন, এক অসাধ্য সাধন করলেন আপনি। সারা দুনিয়াতেই দেখছি সরকারি দলে কত না গোলযোগ হয়! আপনি বাহাত্তরটা সম্মেলন সমাপ্ত করলেন বিন্দুমাত্র গোলযোগ ব্যতীত। আপনাকে অনেক অভিনন্দন।

বললাম, স্যার, কেবল অভিনন্দন জানালে হবে না। একটু আগে রেকর্ড নম্বর পেয়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি, অকৃতকার্য করা চলবে না।

তিনি হেসে উঠলেন। বললেন, মাথার মধ্যে ওটাই এখন ঘুরপাক খাচ্ছে!

তাঁকে বললাম, স্যার, আপনার সঙ্গে আমার জরুরি কিছু আলোচনা রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন করা আপনার দায়িত্ব। আমি চাচ্ছি, কয়েকজন অপেক্ষাকৃত কম বয়েসী কর্মীকে উপ-মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রী বানিয়ে দলীয় কার্যে অধিকতর দায়িত্ব দেওয়ার ব্যবস্থা করা। সারা দেশ জুড়ে এ ধরনের একটি তালিকা আমার নিকট প্রস্তুত আছে; আপনি তা থেকে পছন্দ করতে পারেন।

তিনি খুশি হয়ে বললেন, আমি দুঃখিত। কোন বারই ক্যাবিনেট গঠনের পূর্বে আপনার সঙ্গে কথা হয়নি। এবার আপনার পরামর্শ সবিস্তারে শুনব।

রসিকতা করে বললাম, স্যার, এটাই নিয়ম, দলীয় রাজনীতিতে মহাসচিবের সাথে পরামর্শ করেই মন্ত্রিসভা মনোনয়ন করা প্রয়োজন। তাছাড়া যাকে প্রধানমন্ত্রী করছেন, তার মতামতও নেওয়া সমীচীন বৈকি!

তিনি জোরে হেসে উঠলেন। যশোর এয়ারপোর্টে অবতরণের সময় ঘনিয়ে এসেছে। তিনি বললেন, আপনার প্রোগ্রাম শেষ করে ঢাকা আসুন। একদিন পূর্ণ বিশ্রাম করুন এবং পরদিন রাত আটটায় আপনার সঙ্গে আমার বৈঠক। যা-ই করি, আপনার সঙ্গে পরামর্শ করার পরই করব।

দু'জনই ডায়েরিতে আমরা নোট করে নিলাম। যশোর অবতরণের পর তাঁকে গাড়িতে তুলে দিতে গিয়েও সম্মেলনে আসার কথা স্মরণ করিয়ে দিলাম। তিনি পুনরায় কথা দিলেন, অবশ্যই সম্মেলনে উপস্থিত হবেন, তবে পূর্বাহ্নে কাউকে জানানো যাবে না।

তিনি বর্ডারে চলে গেলে কর্মীদের সম্বর্ধনায় শোভাযাত্রার ভিতর দিয়ে টাউন হলে উপস্থিত হলাম। যশোরের স্থানীয় নেতা খালেদুর রহমান টিটোকে শুধু বললাম, প্রেসিডেন্ট সাহেব সম্মেলনে আসবেন।

সে ব্যস্ত হয়ে উঠতেই বললাম, কিছুই করার প্রয়োজন নেই। তাঁরই নির্দেশ। তোমার আয়োজন যা দেখছি তাতে তিনি সন্তুষ্টই হবেন। কাউকে এখন কিছু জানান চলবে না।

সম্মেলনকে বিকেল পর্যন্ত চালিয়ে নিয়ে গেলাম। মধ্যাহ্নভোজের ব্যবস্থা ছিল। অনেক বিলম্ব হয়ে গেল। তাঁর দেখা নেই! পরে খবর পেলাম তিনি আসবেন না। আমি ও টিটো হতাশ হলাম। ভাগ্য ভালো, তাঁর কথা শুনে কাউকে কিছু প্রকাশ করিনি।

ঘটনার জেরটুকু আরও চমকপ্রদ। শেষ জেলা-সম্মেলন ছিল বাগেরহাটে। সেটা সেরে, সন্ধ্যায় গাড়িতে উঠলাম, সড়কপথে ঢাকা পৌঁছব। বেশ রাত করে দৌলতদিয়া ঘাটে পৌঁছলাম। সুদীর্ঘ কর্মসূচি সমাপনান্তে লম্বা সড়কপথ পাড়িতে ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে ফেরিতে উঠলাম। দেখি, রাজবাড়ি জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এবং স্বেচ্ছাসেবক পার্টির সভাপতি মুন্সী আবদুল লতিফ একটা বিরাট মাছ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে ফেরির বাবুর্চিকে নির্দেশ দিল মাছটি রান্না করে শীঘ্র আমাদের খাবার দিতে। মাছ রান্না হচ্ছে, ততক্ষণ মাস্টার্স ক্যাবিনে একটু গড়িয়ে নেওয়া যাক।

ফেরি চলতে শুরু করেছে, উজান ঠেলে যাচ্ছে বলে সময় লাগছে। কে একজন কর্মী এসে ঘরের দরজায় টোকা দিল। সে ভিতরে প্রবেশ করে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল, এত খাটা-খাটুনি করে কী হল? ওরা ঢাকা বসে সব ভাগ-বাটোয়ারা করে নিয়েছে। রেডিওতে ঘোষণা দিয়েছে, কাজী জাফর পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী এবং আগামীকালই শপথ হবে।

ভাবি, বারবারই আমার সাথে এমনটি হয় কেন? নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র সেরকমই ইচ্ছা। আমি বড় করে পাতা বিছালে কি হবে, পরিবেশকের হিসাব আছে। ধৈর্য ধরা ছাড়া আর কী করার রয়েছে! পদ্মার ঘোলা পানি এখনও শুকিয়ে যায়নি, ঘোর অমানিশার আড়ালে ওখানেও গা এলিয়ে দেওয়া যায়। কেউ কথা রাখল না, কেউ কথা রাখে না, কেউ কথা রাখবে না!

ডা. মতিন প্রতিবাদ করে পদত্যাগ করল। আমি তা করলাম না। কোথায় যাব এবং কী করব! রাজনীতি করে আসছি কৈশোর থেকে। এখন তা ছেড়ে দিলে 'জল বিন মছলি'র অবস্থা আশঙ্কা করি। ভাগ্য বলেও একটা কথা আছে। আওয়ামী লীগ করতাম, নেতাই সেটাকে বিলুপ্ত করে বাকশাল করে চলে গেলেন। করলাম 'ডেমোক্রেটিক লীগ' যা অচিরেই মতাদর্শের কারণে দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে গেল। তারই এক ভাগ নিয়ে এরশাদ সাহেবের সঙ্গে এলাম। এখানেও এমন অবস্থার সৃষ্টি হল যে, ছেড়ে দিলেই সম্মান থাকে। কিন্তু ইতিমধ্যে নদীতে অনেক পানি গড়িয়েছে। অনেক কর্মীকে এই দলের সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছি। তাদের ভাগ্য এতে জড়িত। তারা এরশাদকে দেখে দলে আসেনি। তারা অনেকে এসেছে আমাদের কারণে। দীর্ঘদিনের সম্পর্ক, সাহচর্য এবং ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনই তাদেরকে অধিকতর আকর্ষণ করেছে। আজ তাদেরকে ফেলে কোন পদক্ষেপ নেওয়া সমীচীন নয়। যাদের সঙ্গে পরামর্শ করলাম, তারাও ধৈর্য ধরারই পরামর্শ দিল।

কিন্তু সহ্যেরও একটা সীমা আছে। মওদুদ হয়ে গেল প্রধানমন্ত্রী, উপ-রাষ্ট্রপতি। দু'বছর শাস্তি ভোগের পর তাকে দশ বছরের সাজা মওকুফ করে এসব পদে অভিষিক্ত করা হল। তার স্ত্রীকেও সংসদ সদস্যা করা হল। কাজী জাফরকে দুর্নীতির কারণে পদচ্যুত করে বলা হল চিনি কেলেঙ্কারীর

কারণে তাকে অপসারণ করা হল। তাকেই পুনরায় ফিরিয়ে এনে প্রধান উপদেষ্টা ও প্রধানমন্ত্রী করা হল। তাদের বিশেষ যোগ্যতা কোথায় খুঁজে পাওয়া ভার! তা হলে কী একবার দুর্নীতির ছাপছোপ গায়ে না লাগালে কর্তাদের পছন্দে আসা যায় না! দলের জন্য ত্যাগ-তিতিক্ষার প্রশ্নে এরশাদ সাহেব নিজেই বলেন মোয়াজ্জেমের তুলনা হয় না। কাজের বেলায় একজন, পদ-পদবির বেলায় অন্যজন। এই নীতি স্বীকার করে নেওয়া সম্ভব না হলেও আমি অবস্থার শিকার। শুনতে পাই, খোদ বড় কর্তা যে কর্তাদের মতের উপর অধিকতর নির্ভরশীল, তারা আমাকে না পেরে সহ্য করে। তারা মনে করে আমাকে দিয়ে তাদের মর্জিমাফিক কাজ করান যাবে না। তবুও সারা দলের কর্মীদের ব্যাপক সমর্থনের কারণে ফেলতেও পারে না, গিলতেও পারে না।

এরশাদ সাহেবের এটাই সম্ভবত সমস্যা। তিনি যখন সভা-সমাবেশে যান, কর্মীদের সঙ্গে মিলিত হন, আমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। আমি খোশ, কর্মীরাও খোশ। তিনি সবদিক ম্যানেজ করার বিদ্যা ভালোই জানেন।

কিন্তু এবারের আঘাতটি ছিল বেল্টের নিম্নাংশে। একে হজম করতে বেশ বেগ পেতে হল। একটা দুর্বিনীত অভিমান মনকে আচ্ছন্ন করল। বাহ্যত তা প্রকাশ করলাম না। প্রেসিডেন্ট সাহেব দলীয় কার্যালয়ে এসে আর এক দফা প্রশংসা করলেন, সংসদের উপনেতা বলে ঘোষণা দিলেন। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি, গোড়া কেটে গাছের মাথায় পানি ঢালা হচ্ছে।

নিম্নস্তরের লাঞ্ছনার শেষ নেই। এমন এক পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়েছে রাষ্ট্রপতির নির্দেশ ব্যতীত একটি খড়-কুটোও পরিবর্তন করা যাবে না। প্রধানমন্ত্রীসহ প্রায় এক ডজন মন্ত্রী ও সংসদ সদস্য ময়মনসিংহের ডিসির অপসারণের জন্য অনেক অনুরোধ-উপরোধ জ্ঞাপন করল। প্রধানমন্ত্রী আনুষ্ঠানিক নোটও প্রেরণ করল রাষ্ট্রপতির বরাবরে। ডিসির কিছুই হল না। কেননা, তাকে বরাভয় দিয়েছিল ফার্স্ট লেডির জ্যেষ্ঠা ভগ্নি মিসেস মমতা ওয়াহাব।

আমি বান্দরবানে সম্মেলন করতে গিয়ে লৌহজং থেকে জরুরি টেলিফোন পাই। রোরুদ্যমান ইকবাল জানাল আমার বিশ্বস্ত-কর্মী সদ্যবিবাহিত চেয়ারম্যান মতিনকে দুষ্কৃতকারীরা আমাদের দলের উপ-দলীয় কোন্দলের সুযোগে প্রকাশ্য দিবালোকে হত্যা করেছে। হত্যাকারীদের সহায়তা দিচ্ছে জাতীয় পার্টিতে তাৎক্ষণিক আশ্রয় নেওয়া একটি বিশেষ মহল। তাদেরকে প্রত্যক্ষ সহায়তা করছে জনৈক মন্ত্রী। তাকে সাহায্য করছে ফুলের মতো পবিত্র আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তারই ইঙ্গিতে এলাকার পুলিশ কর্মকর্তা হত্যাকারীদের সর্বপ্রকার প্রত্যক্ষ সাহায্য-সহযোগিতা দিচ্ছে। আমাদের কর্মীদের সনির্বন্ধ অনুরোধ, তারা আইন প্রয়োগকারী

কর্তৃপক্ষের নিরপেক্ষতা শুধু কামনা করে। পুলিশ সার্কেল অফিসারকে অবিলম্বে অন্যত্র প্রেরণ করা হোক।

আমি সেখান থেকেই প্রেসিডেন্ট সাহেবের সাথে যোগাযোগ করলাম। দীর্ঘদিন তাঁর সরকারে রয়েছি, আজ পর্যন্ত একজন অফিসার সম্বন্ধেও আমি কোন অভিযোগ করিনি। কারো পোস্টিং বা বদলির বিষয়ে কখনও অনুরোধ করিনি। আজ কর্মীদের প্রকাশ্য অভিযোগের কারণে তাঁকে অনুরোধ করলাম সংশ্লিষ্ট অফিসারকে উঠিয়ে নিতে। এমনিতেই তার তিন বছরের বেশি একস্থানে অবস্থান হয়ে গিয়েছে। কিন্তু সে কাজটিও হল না। তিনি নাকি নির্দেশ দিয়েছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে। সে নির্দেশ পালিত হল না। সে সাত-পাঁচ বুঝিয়ে দিল। রাষ্ট্রপতি তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে পছন্দ করলেন।

আমাদের কর্মীরা প্রেসক্লাবে গিয়ে প্রকাশ্য সংবাদ-সম্মেলনে মন্ত্রীকে দায়ী করে দুষ্কৃতকারীদের নামোল্লেখ করে অভিযোগ উত্থাপন করল। কিছুই হল না।

মানুষ মনে করে দলের মহাসচিব ও উপ-প্রধানমন্ত্রী কত না ক্ষমতাধর!

উপজেলা নির্বাচনের সময় এক অভিনব পদ্ধতি গ্রহণ করা হল। অনেক স্থানেই দলীয় মনোনয়ন উন্মুক্ত রাখা হল। যে বিজয়ী হবে সে হবে আমাদের। মুন্সীগঞ্জে তা-ই করা হল। আমি যাদেরকে পছন্দ করতাম এবং যারা সুষ্ঠু ভোট হলে বিপুলভাবে জয়ী হত বলে ধারণা, তাদেরকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নির্দেশে অন্য মন্ত্রীর পরামর্শ মতে নির্বাচনের আগের দিন পুলিশ হামলা করে তাদের ক্যাম্পসমূহ ভেঙে গুঁড়িয়ে দিল। প্রার্থীসহ বিশেষ বিশেষ কর্মীদের আমানুষিকভাবে প্রহার করে গুরুতর আহত করে এলাকা থেকে তাড়িয়ে দিয়ে একতরফা নির্বাচন করল।

তারা হাত-পা ভাঙা অবস্থায় সর্বত্র ব্যান্ডেজ নিয়ে ঢাকা এসে উপস্থিত। তাদের অবস্থা দেখে সিদ্ধান্ত নিলাম, অনেক হয়েছে, আর নয়। একটা চূড়ান্ত বুঝাপড়ার এটাই সময়।

এর পূর্বেও টঙ্গীর পৌরসভা নির্বাচনে দু'জনের মধ্যে আসন উন্মুক্ত রাখা হয়েছিল। হাসান সরকারের ভাই সাহাবউদ্দীন সরকার এবং কাজী মোজাম্মেল প্রার্থী। হাসান তখন কাজী জাফরকে ছেড়েছে। আমার সঙ্গে রাজনীতি করে। স্বভাবতই হাসান তার ভাইকে সমর্থন করবে। আমি সে নির্বাচনে কোন অংশ নিইনি। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী হাসানের ভাইয়ের বিপক্ষে কাজী মোজাম্মেলের পক্ষে অবস্থান নিল। উন্মুক্ত আসনে আমাদের নিরপেক্ষতাই কাম্য ছিল। স্থানীয় পুলিশ কর্মকর্তা সংসদ সদস্য এবং জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাসান সরকারের উপর আক্রমণ করে তাকে শারীরিকভাবে নির্যাতন করে আটক করল। এত বড় ঘটনা কার ইঙ্গিতে ঘটল সহজেই অনুমেয়। পুলিশ এত স্পর্ধা কোথায় পেল! আমরা হতবাক হয়ে গেলাম।

পরদিন পার্লামেন্টারি দলের সভায় প্রেসিডেন্ট সাহেব হাসান সরকারের বিষয়ে সহানুভূতি প্রদর্শন না করে, পুলিশের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের কথা না বলে, তীব্র আক্রোশে হাসান সরকারের বিরুদ্ধেই বিষোদ্গার করলেন। সে কেন নির্বাচনে গেল, এটাই তার দোষ। সে উঠে দাঁড়িয়ে বলতে গেল, ভাইয়ের নির্বাচনে সে যাবে না কেন! প্রধানমন্ত্রী কেন যায় উন্মুক্ত আসনের নির্বাচনী প্রচারণায়?

প্রেসিডেন্ট সাহেব তাকে ধমক দিয়ে বসিয়ে দিল! তার সত্য কথা বলার, ন্যায় অভিযোগ করার সুযোগও রইল না। প্রেসিডেন্ট সাহেব আমার উপরও পরোক্ষে নাখোশ। হাসান কেন আমার সমর্থন পায়!

অনেক জ্বালায় জ্বলে স্থির করলাম, আজই সবকিছুর অবসান হোক। লাল টেলিফোন ওঠালাম। প্রেসিডেন্ট সাহেবকে বললাম, স্যার, আমি আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই।

তিনি বললেন, মোয়াজ্জেম, আজ তো হবে না। আজ আমি অত্যন্ত ব্যস্ত, কাল কথা বলব।

বললাম, স্যার, কাল নয়, আজ এবং এক্ষুণি কথা বলতে চাই।

আমি আসছি, বলে তাকে ফোনে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে রিসিভার রেখে দিলাম। প্রেসিডেন্ট সাহেব এতদিনে আমাকে যে একেবারে চিনেননি তা নয়। সমস্ত আহত কর্মীদের সেক্রেটারিয়েট অফিসে বসিয়ে রেখে গাড়ি নিয়ে বের হয়ে গেলাম। সঙ্গে নিয়ে গেলাম উপ-প্রধানমন্ত্রী এবং মহাসচিব হতে পদত্যাগের একটি পত্র।

প্রেসিডেন্টের সচিবালয়ে পৌঁছতেই দেখলাম আজ ব্যতিক্রমী ব্যবস্থায় তাঁর সামরিক সচিব অপেক্ষা করছে অভ্যর্থনা করে প্রেসিডন্টের ঘরে নিয়ে যাওয়ার জন্য।

তাঁর ঘরে প্রবেশ করে সৌজন্যমূলক সম্ভাষণ সমাপ্ত হতেই তিনি উদ্বেগের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন, কি হয়েছে মোয়াজ্জেম? আপনাকে আজ অন্যরকম লাগছে, মনে হচ্ছে আপনি বেশ উত্তেজিত!

নিজেকে যতটা সম্ভব সংযত করেই বললাম, স্যার, আজ আমি আপনার নিকট থেকে বিদায় নিতে এসেছি। আমি মনস্থির করেই পদত্যাগপত্র নিয়ে এসেছি। দীর্ঘদিন আপনার সঙ্গে ছিলাম, অনেক স্নেহ করেছেন। আমিও যতটুকু পেরেছি আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করার চেষ্টা করেছি। ভুল-ভ্রান্তি নিশ্চয়ই হয়েছে। ক্ষমা করে দেবেন। এতদিন আপনার যে সাহায্য-সহযোগিতা পেয়েছি তার জন্য অনেক ধন্যবাদ।

বলতে বলতে হয়ত আমার কণ্ঠ ধরে এসেছিল। তিনি অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন। পরে বললেন, আমাকে সব খুলে বলুন তো কী হয়েছে! আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না!

তখন বললাম, স্যার, খুলে বলে কী হবে! আজ নতুনও নয়। সেই যেদিন প্রথম দল করতে এসেছিলাম, স্মরণ করে দেখুন, সেদিন থেকেই আমার সঙ্গে যে ব্যবহার করা হয়েছে, বহু আগেই আমার চলে যাওয়া উচিত ছিল। কীভাবে যেন স্নেহ-মমতায় জড়িয়ে পড়লাম, আর যাওয়া হল না।

বলতে থাকলাম, শুরুতেই আপনি হাতে ধরে কথা দিয়েছিলেন দলের মহাসিচব করবেন। তা না করে একের পর এক মহাসচিব বানালেন। শেষ পর্যন্ত বিপদের মুহূর্তে আমাকে ডেকে দায়িত্ব দিলেন, আমি সে দায়িত্ব কতটুকু পালন করতে পেরেছি ভালোই জানেন। প্রথম মন্ত্রীদের তালিকায় আমার নাম ছিল, অন্যের কথায় সে নাম কেটে একজন দুর্নীতিবাজ পুলিশ কর্মকর্তাকে মন্ত্রী বানাতে দ্বিধা করেননি। আমার চাইতে বয়সে এবং যোগ্যতায় কোনক্রমেই বড় নয় এমন ব্যক্তিদের আমার উপরে বসিয়েছেন; আমাকে করেছেন তাদের অধস্তন। বারবার মন্ত্রণালয় পরিবর্তন করেছেন, একবার জিজ্ঞেস পর্যন্ত করেননি। কথা দিয়েও এবার ক্যাবিনেট গঠনের সময় আমাকে এড়িয়ে গেলেন, প্রধানমন্ত্রী বানাবেন এই কথা পরোক্ষভাবে বারবার বলেও সে কথা রাখেননি। আমার কর্মী একজন চেয়ারম্যানকে হত্যা করা হল, আপনাকে বলেও একজন সামান্য পুলিশ অফিসারকে বদলি করতে পারিনি। আজ উপজেলা নির্বাচনে আমার সব প্রার্থীদের মারধোর করে পুলিশ এলাকা থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে—এরপর সরকারের আসনে বসে থাকার কোন অর্থই হয় না। আজই এর ইতি।

বলতে বলতে সম্ভবত আমার চোখে পানি এসে গিয়েছিল। তিনি এতক্ষণ চুপ করে আমার কথা শুনছিলেন। শেষ করতেই তিনি চেয়ার থেকে উঠে ঘুরে আমার সামনে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। তাঁরও চোখ বোধহয় ভিজে উঠেছিল। বললেন, মোয়াজ্জেম, এমন তো কথা ছিল না! যখন যাব, একসাথেই যাব। এরকম কথাই হয়েছিল আপনার সঙ্গে।

তারপর আমাকে জড়িয়ে ধরেই বললেন, আজ আমি স্বীকার করছি, আপনার উপর অবিচার করা হয়েছে। আমার দোষ আমি স্বীকার করছি। আমাকে একটি সুযোগ দিন। আমি আমার সমস্ত অবিচারের প্রতিকার করতে চাই। এই মাটির উপর দাঁড়িয়ে আমি শপথ করছি, আমি আপনাকে কয়েক সপ্তাহ নয়, কয়েকদিনের মধ্যে যদি প্রধানমন্ত্রী না বানাই আমি আমার পিতার সন্তান নই। মুন্সীগঞ্জের সব কর্মীদের আমার কাছে পাঠিয়ে দিন, আমি তাদের সান্ত্বনা দেব এবং তাদের সব লোকসানের ক্ষতিপূরণের সংবাদ দেব।

প্রেসিডেন্ট সাহেবের কণ্ঠস্বর ছিল অনবদ্য। তখনও আমাকে জড়িয়ে রেখেছেন। দু'জনারই চোখে পানি। সব ভুলে গেলাম। মনে হল পিতৃনাম উচ্চারণ করে তিনি যে শপথ করলেন তা সত্য না হয়ে পারে না। তাছাড়া অস্বীকার করে লাভ নেই, প্রধানমন্ত্রী হওয়ার আশা আবার জেগে উঠল।

উঠে দাঁড়ালাম।

স্যার, তা হলে ওদের কী পাঠিয়ে দেব?

তিনি বললেন, হ্যাঁ, এক্ষুণি পাঠিয়ে দিন। আমি অপেক্ষা করে রইলাম।

সেক্রেটারিয়েটে পৌঁছে ওদেরকে বললাম, প্রেসিডেন্ট সাহেব তোমাদের ডেকেছেন, তোমরা যাও।

ওরা ফিরে এল মহা আনন্দ নিয়ে। প্রেসিডেন্ট সাহেব ওদের দেখে খুব দুঃখ প্রকাশ করেছেন এবং বলেছেন, তোমাদের উপর যত অন্যায় করা হয়েছে আমি সবকিছুর ক্ষতিপূরণ করতে চাই মুন্সীগঞ্জ থেকে পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী বানিয়ে। এক সপ্তাহের পূর্বেই আমি তোমাদের এই উপহার প্রদান করব। তোমরা সন্তুষ্ট?

ওরা ওদের শরীরের সমস্ত আঘাত ভুলে গেল, খুশিতে বাগ্ বাগ্ হয়ে ওরা প্রেসিডেন্ট সাহেবের পা ছুঁয়ে সালাম করল। তিনি সবাইকে বুকে জড়িয়ে ওদের সমস্ত দুঃখ-বেদনার অবসান করে দিলেন।

এ ছিল এরশাদ সাহেবের এক বিরল গুণ। কেউ তাঁর কাছে পৌঁছলে তাকে সহজেই জয় করে নিতে পারতেন। তাঁর সহজাত ভদ্রতা, বিনয় এবং সরল আলোচনা মানুষকে সহজেই মুগ্ধ করত। কত মানুষ যে এভাবে তাঁর জালে জড়িয়ে পড়েছে!

দিন যায়, দিন আসে, সপ্তাহ কেটে মাস, মাস কেটে বছর ফিরে এলেও শপথ-পূরণের কোন লক্ষণ দেখা যায় না। বুঝলাম, সংকট মোকাবিলায় সফল ম্যানেজার একটি পরিস্থিতির সুরাহা করেছেন মাত্র। মুখের কথা ব্যয়ে তা যদি সম্ভব, তা হলে সেটা করে না কোন বোকা!

রানা আমেরিকার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে। সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় সে ভর্তি হয়েছে। ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার পর থেকেই তার খেয়াল চেপেছে আমেরিকায় গিয়ে অ্যারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়বে। এই অ্যারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার পশ্চাতেও একটি ঘটনা রয়েছে। আমি তখন বিমান, পর্যটন ও ভূমি মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী। '৭৫ সালের কথা। সিলেট বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে রূপ দেওয়ার প্রচেষ্টায় সিলেটের অধিবাসী প্রতিমন্ত্রী দেওয়ান ফরিদ গাজীকে নিয়ে বিমানযোগে সিলেট যাব বলে ঢাকা বিমানবন্দরে ভিআইপি রুমে এসে বসেছি। রানা তখন খুবই ছোট,

ছ'-সাত বছরের ছেলে। আমাকে ছাড়তে বিমানবন্দরে এসেছে। ভিআইপি রুমের অদূরেই বাংলাদেশের একমাত্র বোয়িং বিমানটি দাঁড়িয়ে রয়েছে। রানা ছিল ফুটফুটে ছেলে, তাছাড়া বিমান মন্ত্রীর একমাত্র সন্তান। তাকে পাইলটরা আদর করে নিয়ে গিয়ে পাইলটের আসনে বসিয়েছে। তার ধারণা হয়েছে, পৃথিবীতে যদি কোন ক্ষমতার আসন বা উচ্চাসন থাকে সেটা পাইলটের আসন। সেদিনের পর থেকে তাকে যখনই জিজ্ঞেস করা হত, রানা, বড় হয়ে তুমি কি হবে?

তার একই জবাব, পাইলট।

সে বয়স থেকে তার মুখে আর অন্য কথা শোনা যায়নি। মাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়ার পর একটু পরিবর্তন করে বলত, অ্যারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। পরে সেই বিষয়েই ভর্তি হয়েছে। কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে সে ভর্তির সুযোগ পেয়েছিল। কিন্তু অপেক্ষাকৃত কম খরচে যেখানে পড়া যাবে সেখানে, ক্যানসাসের উইচিতা স্টেট ইউনিভার্সিটিতে সে ভর্তি হতে ইচ্ছুক।

বললাম, আমার বিদেশে গিয়ে পড়ার সুযোগ হয়নি। তুমি আমার একমাত্র ছেলে। আমেরিকায় গিয়ে পড়বে, খরচ দেব আমি। তোমার তা নিয়ে চিন্তার প্রয়োজন দেখছি না।

সে বলল, আব্বা, উইচিতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যারোনটিকাল বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। উইচিতাকে বলা হয় বিশ্বের 'এয়ার ক্যাপিটাল'। আমেরিকার অধিকাংশ বিমান কোম্পানির কারখানা এখানে অবস্থিত।

কয়েকবার সেখানে গিয়েও দেখেছি, অপেক্ষাকৃত ছোট শহরে প্রায় এক ডজনের মতো এয়ারপোর্ট। প্রতিটি বিমান কোম্পানির পৃথক এয়ারপোর্ট রয়েছে।

রানার সেই ছোটবেলাকার ঘটনায় গিয়ে মনে পড়ল, সেবার সিলেটে হযরত শাহ্ জালাল (রহঃ) সাহেবের মাযারের একটি ঘটনা। আমরা দুই প্রতিমন্ত্রী, সঙ্গে রয়েছে আমার দীর্ঘদিনের বন্ধু অ্যাডভোকেট আবদুল মান্নান। তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তখন সিলেটের জেলা জজ। খুব পরহেজগার মানুষ। তিনিও আছেন। আমরা সবাই হযরত শাহ্ জালালের (রহঃ) মাযার জিয়ারত করে নিচে নেমে আসছি। দেখতে পেলাম পুলিশ ও নিরাপত্তার লোকজন একজন ছালার চট পরিহিত; আপাতদৃষ্টিতে পাগল মনে হয় এমন একজন চুল-দাড়িওয়ালা লোককে ঠেকাবার চেষ্টা করছে। সে তাদের ব্যূহ ভেদ করে আমাদের সম্মুখে আসতে চাচ্ছে। পুলিশ বাধা দিচ্ছে। আমার কি মনে হওয়াতে বললাম, ওকে ছেড়ে দিন, আসুক, কী বলতে চায় শোনা যাক।

পুলিশ তাকে ছেড়ে দিতেই সে লাফ মেরে আমাদের সম্মুখে এসে দাঁড়িয়ে হাত-পা ছুঁড়ে চিৎকার করে বলে উঠল, খুব মন্ত্রী হয়েছ! যাও, ঢাকা গিয়ে দেখ গদি চলে গেছে।

দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে সিলেটি ভাষায় সে একথাগুলোই চিৎকার করে বলছিল।

অফিসাররা তাকে তাড়া করতে উদ্যত হতেই নিষেধ করলাম, বলুক, তার যা খুশি। আপনারা কিছু বলবেন না।

সে একই কথা বলতে বলতে কখন লোকজনের ভিড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল! ভাগ্যিস, তাকে বাধা দিইনি, তার গায়ে হাত দিতে পুলিশকে নিবৃত্ত করেছিলাম!

সে সময় তার কথাগুলোকে পাগলের প্রলাপ মনে হলেও সেদিন ঢাকা প্রত্যাবর্তনের পরই প্রত্যক্ষ করলাম, ক্ষমতার পটপরিবর্তন হয়েছে। খালেদ মোশাররফ ক্ষমতার দখল নিয়েছে।

পরে জজ সাহেবের মাধ্যমে সেই চট পরিহিত লোকটির সন্ধানের চেষ্টা করেছি। কিন্তু তার আর সন্ধান পাওয়া যায়নি। কার ভিতর কী থাকে বলা দুঃসাধ্য!

রানার আমেরিকা যাওয়া কেন্দ্র করে বাসায় বড় ভোজ দিলাম। মনে করলাম, ওর বিয়ে পর্যন্ত বাঁচব কিনা জানি না। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, শুভানুধ্যায়ী, সহকর্মী এবং দলের লোকজন সকলকে নৈশভোজে আপ্যায়িত করলাম। পূর্বদিন সপত্নীক প্রেসিডেন্ট সাহেব খেলেন। ভোজের রাতে তাঁর অন্যত্র প্রোগ্রাম রয়েছে। পরদিন সবাইকে একসঙ্গে আপ্যায়ন করতে পেরে আনন্দ পেলাম।

রানাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব। নিউইর্য়ক পর্যন্ত গিয়ে ওর মামাদের জিম্মায় ছেড়ে দিয়ে আমি দল গঠনে লেগে যাব।

আমেরিকায় দল করার কী প্রয়োজন প্রেসিডেন্ট সাহেবকে বুঝাতে বেশ বেগ পেতে হল। সেদিন একটি তিক্ত কথাই বলেছিলাম, দিন এরকম নাও থাকতে পারে। একদিন আমাদের যদি মন্দ সময় আসে বা আমাদের মুক্তির জন্য আন্দোলন করতে হয় সেদিন জাতিসংঘের সুমুখে একটি ছোট্ট বিক্ষোভের মূল্য অপরিসীম। বিশ্বব্যাপী তার প্রতিক্রিয়া পৌঁছে যাবে। তাছাড়া পৃথিবীর যে সমস্ত দেশে বাংলাদেশীরা অবস্থান করে সেসব দেশে সংগঠন গড়ে না তুললে আমাদের বক্তব্য, আমাদের গঠনমূলক রাজনীতির মূল কথা তাদের নিকট পৌঁছবে কীভাবে! তারাই তো বিশ্বজনমত গঠনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে।

তিনি প্রথম বুঝতেই চান না, অনেক করে তাঁকে বুঝাতে হল এবং অনেকটা অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমাকে অনুমতি দিলেন ওখানে সম্মেলনের মাধ্যমে জেলা সংগঠনের মর্যাদায় দলের শাখা গঠন করতে।

সমস্যা হচ্ছে, দল করতে গিয়ে দেখা যাবে কিছু কিছু লোক প্রথম থেকেই স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে নিজেদের উদ্যোগেই নানারকম কমিটি গঠন করে রাখে। সরকারি দলের ক্ষেত্রে এসব অধিকতর লক্ষ্য করা যায়।

মহাসচিব হওয়ার পর আমেরিকা থেকেও কয়েকজন কর্মী এল আমন্ত্রণ

নিয়ে আমেরিকায় সম্মেলন করার জন্য। সম্মত হতেই তারা প্রস্তাব করল সম্মেলন উপলক্ষে তারা একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করতে চায় এবং তাতে অংশগ্রহণের জন্য কিছু শিল্পী সেখানে নিতে চায়। ভালো কথা। বললাম, শিল্পীদের নাম-ধাম দাও, আমেরিকান দূতাবাসে লিখে দেব, তা হলে ভিসা পেতে সুবিধা হবে।

তারা যে নামের তালিকা পেশ করল, তার মধ্যে একজনকেও চিনি না। দু'বার তথ্য মন্ত্রণালয়ে ছিলাম, প্রখ্যাত শিল্পীদের কথা বলাই বাহুল্য, সামান্য পরিচিত শিল্পীদেরও চিনি।

সবই বুঝলাম। শিল্পী হিসাবে নিজেদের লোক নিয়ে যেতে চায়। কেবল নিজেদের লোকই নয়, ব্যবসা হিসাবেও বিষয়টিকে তারা গুরুত্ব দিয়েছে। তাদেরকে বললাম, সম্মেলনই হবে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্রয়োজন নেই।

তারা অনুরোধের মাত্রা বাড়াতেই তাদেরকে বুঝিয়ে দিলাম, একজন শিল্পীর নামও তোমাদের তালিকায় নেই। তোমরা যা করতে চাচ্ছ, তা হল আদম পাচার এবং বেশ ভালো অঙ্কের অর্থের বিনিময়ে।

তারা অসন্তুষ্ট হয়েই বিদায় নিল। সাধারণ কর্মীরা এসবের ধার ধারে না।

নিউইয়র্কে যখন সম্মেলন করলাম, বাংলাদেশের যে কোন প্রধান একটি জেলার সম্মেলনের মতোই জাঁকজমক হল। বাংলাদেশ থেকে শিল্পী আনয়নের প্রস্তাবের মূল হোতাকেই সভাপতি করা হল। এরা আবার নিজেদের আখের গুছাতে ভালোই জানে। মার্কিন দেশে আসার পূর্বে লন্ডনে দলের সভা করেছি, দলকে সুষ্ঠু সাংগঠনিক ভিত্তিতে দাঁড় করিয়েছি।

সেদিন সূচনাতে যে কথা বলেছিলাম, তা অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেল। '৯০ সালে আমাদের পদত্যাগের পর যখন নির্যাতন আর নিপীড়ন নেমে এল আমাদের উপর, খোদ এরশাদ সাহেবকে যখন ডজন ডজন মামলায় অভিযুক্ত করে নির্জন কারাবাসে রাখা হল; তখন বিদেশের এইসব কমিটিসমূহ অভূতপূর্ব কাজ করেছে। লন্ডন, নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন, প্যারিস সর্বত্র এরশাদ সাহেবের মুক্তির দাবিতে বিশ্বজনমত গড়ে তুলেছে। নিজেদের গাঁটের পয়সা ব্যয় করে তারা বিভিন্ন স্থানে গিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে। আজ এরশাদ সাহেব জেল থেকে মুক্তি পেয়ে বিভিন্ন দেশে যাচ্ছেন, সম্বর্ধনা নিচ্ছেন, কমিটি ভাঙছেন, গড়ছেন, এসব কিছুর মূল কিন্তু আমিই প্রোথিত করে এসেছিলাম। দেশের অভ্যন্তরে যেভাবে করেছি, ঠিক সে রকম উদ্দীপনা নিয়েই লন্ডন, বার্মিংহাম, নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন, লসএঞ্জেলেস, কানাডা, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, সৌদি আরব, জাপান প্রভৃতি স্থানে জাতীয় পার্টিকে মজবুত করে গড়ে তুলেছিলাম। কার ব্যাংক একাউন্টে কে চেক কাটছে! দলের কাজ ছাড়াও সরকারি কাজে যখনই

বিদেশ গিয়েছি, সঙ্গে দলের কাজ করে এসেছি। পার্টি ছিল আমার ধ্যান-জ্ঞান। পার্টি ছিল সবকিছুর উর্ধ্বে।

কিন্তু দেশে তখন বিরোধী দলসমূহের আন্দোলন দানা বেঁধে উঠেছে। দুটি প্রধান সুস্পষ্ট ধারা রয়েছে আমাদের রাজনৈতিক অঙ্গনে। একটি রাজনৈতিক ধারায় অধিকাংশ বামপন্থী, ভারতপন্থী, আধুনিকতার পরাকাষ্ঠায় সমাজ ও ধর্মীয় মূল্যবোধের বিপরীতপন্থী সমস্ত শক্তিসমূহ একত্রিত হয়েছে। আওয়ামী লীগ ও তার সহযোগী সংগঠনসমূহ এই ধারায় অন্তর্ভুক্ত। তাদের রয়েছে শক্তিশালী ছাত্রসংগঠন। অন্য ধারায় ভারত বিরোধীপন্থী, ডানপন্থী এবং ধর্মীয় মূল্যবোধসম্পন্ন গোষ্ঠিসমূহের প্রাধান্য অধিকতর। বিএনপি তার শক্তিশালী ছাত্রসংগঠন নিয়ে এ ধারাতেই অন্তর্ভুক্ত। তৃতীয় একটি ধারাও রয়েছে মৌলবাদী, ধর্মীয় অনুশাসনে দেশ পরিচালনার পক্ষপাতী। জমায়াতে ইসলামী এবং তার ছাত্রসংগঠন এ ধারাভুক্ত। তিনটি ধারাই মোর্চা গঠন করে সরকারবিরোধী কার্যক্রমে সক্রিয়। তিন দিক থেকে সাঁড়াশি আক্রমণে সরকারের নাভিশ্বাস। তাও যদি সময়োচিত পদক্ষেপ প্রয়োগে আমরা সক্ষম হতাম!

রাজনৈতিক আন্দোলনের মোকাবিলায় পুলিশ বা অন্য কোন শক্তি দিয়ে কার্যোদ্ধার হয় না। সম্ভব হলে তাকে রাজনৈতিকভাবেই রুখতে হয়। তা করতে সক্ষম না হলে যা অবশ্যম্ভাবী তা-ই ঘটতে বাধ্য। কেবল সময়ের টানাপোড়েনে যতটা টিকে থাকা যায়।

যেদিন সম্ভাবনাময় ছাত্রসংগঠন বিলুপ্ত করে দিয়ে 'স্বর্ণাক্ষরে ইতিহাসে নাম লিখান' হল সেদিনই মূলত সরকারি দলের হাত গুটানো শুরু হল। একথা পরিষ্কার করে বলেছিলাম, নতুন বাংলা ছাত্রসমাজ বিলুপ্ত করা, নিজেদেরকেই পক্ষান্তরে অবলুপ্ত করার শামিল। তখন কে বা শোনে কার কথা!

দেশের সংগ্রামী ছাত্রসমাজের আন্দোলনের একটি সফলতার ঐতিহ্য রয়েছে। সম্মিলিত ছাত্রআন্দোলন কোন সময়ই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়নি। দুটি মূল স্রোতাশ্রয়ী ছাত্রসংগঠন যখন ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ল, তখন খাকি পোশাক সর্বস্ব পুলিশ দিয়ে তাদের মোকাবিলা করতে গিয়ে ঘটনার চাইতে দুর্ঘটনাই বেশি ঘটতে লাগল। ওদের ট্রাকের নিচে পড়ে ছাত্র মারা গেলে তার প্রায়শ্চিত্ত রাষ্ট্রপতিকেই করতে হল। ডা. মিলনের মর্মান্তিক মৃত্যুর সুষ্ঠু তদন্ত হলেও অনেক বিষয় প্রকাশ হয়ে পড়ত।

ঘটনা যেখানে যেভাবেই ঘটুক তার জের এসে সরকারের স্কন্ধেই চাপে। পুলিশও অনেকটা আবহাওয়া বুঝে চলে। চোখের সম্মুখে সরকারি কর্মচারীদের বিবস্ত্র করছে, ওরা দেখেও দেখে না। প্রকাশ্যে অগ্নিসংযোগ করছে, ওরা বলে আমরা কি দমকলের লোক? সচিবালয়ে ওদের আস্তানায় নাকের ডগায় সচিবকে গাড়ি থেকে নামিয়ে প্রহার করছে, গাড়িতে আগুন

দিচ্ছে—সেটা ঠেকান নাকি ওদের ডিউটি নয়! এমনি ক্ষীণ-মনোবলের একটি নামসর্বস্ব বাহিনী দিয়ে একটি সর্বগ্রাসী রাজনৈতিক আন্দোলন, যার পশ্চাতে রয়েছে বেআইনী অস্ত্রের ঝংকার এবং নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডের অসংখ্য দৃষ্টান্ত, দমানো সম্ভবপর নয়।

নিজেদের ছাত্রসংগঠন শেষ করে দিয়ে আন্দোলনরত ছাত্র নেতৃবৃন্দকে 'ম্যানেজ' করার হাস্যকর প্রচেষ্টাও চালান হল। এসব বিষয়ে আমাকে বেশি জানান হত না। কেননা, আমি ছিলাম এসব হঠকারিতার সম্পূর্ণ বিরোধী। প্রথম থেকেই বলে আসছি, সবকিছু হারিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে কোন কাজ হবে না। হিতে বিপরীত হতে বাধ্য। শুনেছি ছাত্রনেতাদের একটি অংশকে হাত করতে গিয়ে তাদেরকে যে হাতখরচ দিতে হয়েছে তা শুনলে পিলে চমকে যায়।

এই বি-ক্লাশী ছাত্রনেতারা একবার আমার বাড়িতেও উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হয়ে ঢু মারল। ব্যবসায়ী এবং সিনেমা জগতের সঙ্গে জড়িত পেট-মোটা তাহের চৌধুরী একদিন এসে আমাকে নিবেদন করল, আপনি একসময় ছাত্রনেতা ছিলেন। বর্তমান আন্দোলনরত ছাত্রনেতারা আপনার সঙ্গে সমঝোতায় পৌছতে চায়। তাদের কী বক্তব্য রয়েছে শোনায় আপত্তি কী?

মনে মনে ভাবলাম, আপত্তি যতই থাক, প্রকাশ করা যাবে না। আমি ওদের মতলব টের পেয়েছি। তবুও দুর্বলতা প্রকাশ না পায় তা-ই বললাম, নিয়ে আসুন, ওদের সঙ্গে কথা বলব।

বেশ রাত করে কয়েকটি মাইক্রোবাসে ওরা এল। বসার ঘরে ওদের সকলকে বসিয়ে কেক ও চা পরিবেশন করা হল। ওদের মুখপাত্র বলল, আমরা আন্দোলন করে করে ক্লান্ত, আপনাদের সঙ্গে সমঝোতায় আসতে চাই। আমাদের সন্তুষ্ট করলে আমরা আন্দোলনকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করে দিতে সমর্থ হব।

আমার কাছে সম্পূর্ণ বিষয়টি দিবালোকের মতো স্পষ্ট প্রতিভাত হল। ওরা এসেছে আমাদেরকে বোকা বানিয়ে অর্থ আদায় করতে। একটি পয়সাও যদি ওদেরকে দেওয়া হয়, সেটিও আমাদের বিরুদ্ধেই ব্যবহৃত হবে এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই।

হেসে বললাম, তোমরা এ যুগের সব ছাত্রনেতা। একসময় আমিও ছাত্র আন্দোলন ও ছাত্রসংগঠনের সঙ্গে জড়িত ছিলাম। আমি তোমাদের গ্রাহক নই। আমার ধারণা তোমরা ধোঁকা দিয়ে বোকা বানিয়ে অর্থ আদায়ের দুরভিসন্ধিতে এ পর্যন্ত এসেছ। এখানে কোন সুবিধা হবে না। তবে আমি নিশ্চিত তোমরা ক্রেতা পাবে। অনেক আগ্রহী খরিদ্দারের পথ চৌধুরীই দেখিয়ে দেবে।

আরও বললাম, তোমরা প্রায় সকলেই পুলিশের চোখে ফেরারি। তবুও তোমরা সাহস করে একজন সরকারি মানুষের বাড়িতে এসেছ। কথা দিয়েছি, তোমাদের হয়রানি হবে না, অমর্যাদাও হবে না। কিন্তু আমার এখানে তোমাদের লাভের সম্ভাবনা নেই।

কথা শেষ করে উঠে দাঁড়ালাম। ওরা গিয়ে গাড়িতে বসল। ওদের মুখপাত্রটি ফিরে এসে আর একবার আমার সঙ্গে হাত মিলিয়ে গেল। বলল, ভাই, আপনার বিরুদ্ধে আমরা সর্বদাই সোচ্চার। আজ স্বীকার করে যাচ্ছি, আমাদের প্রতিপক্ষ দুর্বল নয়। আপনার কাছে স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, আমরা এই উদ্দেশ্যেই এসেছিলাম।

পরদিনই আমি রাষ্ট্রপতিকে বিষয়টি বুঝিয়ে বলতে চাইলাম এবং এদের সম্বন্ধে সাবধান হওয়ার পরামর্শ দিতে গিয়ে উল্টা শুনে আসলাম, এসব নিয়ে আপনাকে মাথা ঘামাতে হবে না। আমার স্ত্রী এ বিষয়টি দেখছে, তার হাতেই ছেড়ে দিয়েছি।

বুঝলাম ওরা জায়গা মতোই পৌঁছে গিয়েছে এবং অচিরেই আমাদের দেওয়া অর্থে আমাদেরকে বোমা মারবে। নিয়তি খণ্ডানো যায় না।

আন্দোলন যখন এগুতে থাকে, বিরোধীদের কর্মসূচি যখন দানা বাঁধতে থাকে, তখন তাদের ভাব-ভাষাও পাল্টে যায়। পুলিশসহ সকল স্তরের কর্মচারীরা মনে করে, 'শ্যাম রাখি, না কুল রাখি।' কর্মীদের বক্তব্যে ভাষার পরিবর্তন বোধগম্য, কিন্তু নেতা-নেত্রীদের মুখ থেকে যখন গর্ভস্রাব জাতীয় গালাগালি নির্গত হতে থাকে তখন মনে হয় রাজনীতি করাটাই এদেশে ন্যক্কারজনক।

১৭ই এপ্রিল প্রতিবছর মুজিবনগর দিবস পালিত হয়। এই দিনই মেহেরপুরের আম্রকাননে স্বাধীন বাংলাদেশের সরকার গঠিত হয়েছিল, ওখানেই তারা শপথ নিয়েছিল। দুই শত বছর পূর্বে পলাশীর এক আম্রকাননে বাংলার স্বাধীনতার সূর্য অস্ত গিয়েছিল, দুই শত বছর পরে মেহেরপুরের তেমনি একটি আম্রকাননে আবার স্বাধীনতার পতাকা উড়িয়ে দেওয়া হল। স্থানটির নামকরণ করা হল মুজিবনগর। মুজিবনগরে আমরা মুজিবকে কখনও নিয়ে যেতে সক্ষম হইনি। দিবসটির সাথে তাঁর নিজের কোন সম্পর্ক ছিল না বিধায় একটা নিস্পৃহ কণ্ঠে জবাব আসত, তোরা যা।

আমরা যেতাম এবং নেতাদেরকে বলতাম মুজিবনগরকে স্মরণে ধরে রাখার মতো করে গড়ে তোলা হোক। কিন্তু আমাদের বলা আর তাদের শোনা এ পর্যন্তই রয়ে যেত। বাস্তব ক্ষেত্রে সেখানে কিছুই করা হল না।

আমরা ক'জন মুক্তিযোদ্ধা প্রেসিডেন্ট এরশাদকে অনুরোধ করেছিলাম, মুজিবনগরে এমন কিছু করুন যাতে মুজিবনগর নামের সার্থকতা খুঁজে পাওয়া

যায়। আগামী প্রজন্ম যেন এখানটায় একবার দাঁড়িয়ে সগৌরবে ভাবতে পারে, এই স্থানটিতেই স্বাধীনতার প্রথম সূর্য উদিত হয়েছিল।

তিনি কথা দিয়েছিলেন এবং এবার ১৭ই এপ্রিল সামনে আসতে আমাকে বললেন, মোয়াজ্জেম, চলেন মুজিবনগর দেখে আসবেন।

হেলিকপ্টার থেকে নেমেই মনটা ভরে গেল। তেত্রিশ বছরের সংগ্রামের প্রতীকী তুলে ধরে অর্ধচন্দ্র আকৃতির তেত্রিশটি দেওয়াল সমৃদ্ধ এক বিরাট স্মৃতিসৌধ, সৌধ থেকে প্রবেশের তোরণ পর্যন্ত পাকা রাস্তা। সুন্দর সুগঠিত প্রবেশ তোরণ, স্কুলগৃহ, মাঠ, আধুনিক বিশ্রামাগার প্রভৃতি নির্মাণ করে মুজিবনগরকে এক নতুন রূপ দেওয়া হয়েছে।

মন খুশিতে ভরে উঠল। প্রেসিডেন্ট সাহেবকে অভিনন্দন জানিয়ে লক্ষ লোকের সমাবেশে বক্তব্য রাখলাম, এই মুজিবনগর নির্মাণের কৃতিত্ব এরশাদ সাহেবের। তিনি জাতিকে একটি মহিমান্বিত স্মৃতিসৌধ উপহার দিয়েছেন। আমরা কী তার প্রশংসা করব এই মুজিবনগর গড়ার জন্য, না তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করব?

জনতা গর্জে উঠল, প্রশংসা করব।

আরও বললাম, যার নামে এই স্থানের নাম, সেই শেখ সাহেব এই মুজিবনগরে আসেননি। এসেছেন এরশাদ সাহেব। আমরা কী এজন্য তাঁকে সাধুবাদের পরিবর্তে নিন্দাবাদ দেব?

জনগণ প্রেসিডেন্টের নামে স্লোগানে স্লোগানে মুখরিত হল।

আমার বক্তব্য যে টিভিতে ধারণ করা হয়েছে জানি না। সেদিন রাতে যখন টিভিতে সংবাদ দেখছিলাম, তখন মুজিবনগর জনসভায় আমার প্রদত্ত বক্তৃতা প্রচার করা হল। শুনে ভালোই লাগল।

একটু পর টেলিফোন বেজে উঠল। ওপার থেকে জেনে নিল, আমি বলছি কিনা।

বললাম, মোয়াজ্জেম কথা বলছি!

বলা হল, লাইনে থাকুন, মন্ত্রী সালাহউদ্দীন কাদের চৌধুরী কথা বলবে।

গলাটা চেনা মনে হল। শেখ মণির ছোট ভাই শেখ সেলিমের গলা।

সে টেলিফোন কাউকে দিতে উদ্যত হতেই শোনা গেল একজন মহিলা বলছে, দুটা গাল দিয়ে তারপর টেলিফোন আমাকে দাও।

শেখ সেলিম অকথ্য ভাষায় দুটা গালি দিয়ে টেলিফোন যাকে তুলে দিল সে এখন দেশের প্রধানমন্ত্রী। সেদিন সে প্রধানমন্ত্রী না হোক, একজন দলনেত্রী ছিল। কিন্তু টেলিফোন হাতে নিয়ে যে ভাষায় গালাগাল করতে থাকল, তা রাস্তার অতি নোংরা মেয়েমানুষও করতে পারবে না।

প্রথমটায় থতমত খেয়ে গেলাম। বিষয় কী, বঙ্গবন্ধুর কন্যা, ওয়াজেদের স্ত্রী, আওয়ামী লীগের সভানেত্রীর একী ভাষা! একী অভিরুচি!

কিন্তু এক মিনিটের বেশি লাগেনি সামলে নিতে। তারপর এদিক থেকেও বর্ষিত হল উপযুক্ত প্রতিউত্তর। আমি এভাবে গালাগাল দিয়ে কার সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলছি না জেনেও সালেহা এসে আমার মুখ চেপে ধরল! একী করছ? কাকে এভাবে গালাগাল দিচ্ছ?

ধাতস্থ হতে একটু সময় লাগল। তারপর তাকে বুঝিয়ে বললাম, দেশের একজন নেত্রীকে গালাগালির জবাব দিচ্ছিলাম। আমার দোষ? কেন আমি বক্তৃতায় বললাম, শেখ সাহেব মুজিবনগরে যাননি—এরশাদ গিয়েছেন।

আমাদের দেশের প্রথম শ্রেণীর একটি দলের নেত্রীর পরমতসহিষ্ণুতা ও ধৈর্যের নমুনা দেখে ঘৃণায় একথাই ভাবছিলাম, রাজনীতি না করে আলু-পটলের ব্যবসা করলেই ভালো করতাম। রাজনীতির উপরই ঘৃণার উদ্রেক হতে শুরু করেছে।

তারই ভগ্নিপতি নাজিউর রহমান জাতীয় পার্টির কেউকেটা, এরশাদের অতীব আস্থাভাজন। তাকে প্রথমে পার্টির কোষাধ্যক্ষ করা হল। অনেকে বলে প্রকৃষ্ট পদই তাকে দেওয়া হয়েছে। দলের নয়, দলের সভাপতিরই সে কোষাধ্যক্ষ। এমনিতে খুবই বিনয়ী এবং অমায়িক বলে মনে হলেও স্বল্প সময়ের মধ্যে আহরিত অত্যধিক অর্থের কারণেই হোক বা যে কোন কারণেই হোক তার মধ্যে একটি 'আমি কি হনু রে' ভাব সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয়। তাকে প্রথম আমার সঙ্গে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন এবং সমবায় মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী নিযুক্ত করা হল। আমার বুঝা হয়ে গেল, অচিরেই সে হবে এই মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী এবং আমাকে যথারীতি অন্য কোন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে। আমার তাতে কোন আপত্তি নেই। কোন বিশেষ মন্ত্রণালয়ের প্রতি বিশেষ কোন আকর্ষণ অনুভব করি না। সচিবালয়ে আমি সপ্তম তলায় বসতাম। নিচের তলাতেই ছিল প্রতিমন্ত্রীর অফিসকক্ষ। আমি কখনও টেলিফোনে জানতে চাইতাম, নাজিউর, তুমি কোথায়?

সে বিনয়ের অবতাররূপে জবাব দিত, ভাই, আপনার পায়ের নিচে।

উভয়ার্থে বাক্যটি ব্যবহার করে সে বিমলানন্দ ভোগ করত। ছাত্রলীগের একসময়ের কর্মী, শেখ মণির সহোদরার স্বামী। আমি ভিন্ন চোখে এবং অকৃত্রিম স্নেহের দৃষ্টিতেই দেখতাম এবং আশা করতাম সেও নিশ্চয়ই আমাকে সেভাবেই গ্রহণ করবে। তাকে দিয়ে আমার কোন অপকার হবে কল্পনাতেও আসত না। কিন্তু শোনা গেল দুই মঞ্জু মিলে আমার প্রধানমন্ত্রী হওয়াকে ঠেকিয়েছে, দু'মঞ্জুর বাড়িই বৃহত্তর বরিশালে। দু'জনেই ছাত্রলীগের সাবেক কর্মী, দু'জনাই ডানপন্থী বলে নিজেদের পরিচয় দিয়ে থাকেন। দু'জনের সঙ্গেই শুধু ব্যক্তিগতভাবে নয়, পারিবারিক সূত্রেও আমার সুসম্পর্কের কথা দু'জনাই মুখে অকপটে স্বীকার করে। সেই নাজিউর রহমান মঞ্জু এবং

'ইত্তেফাকে'র প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক মরহুম তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার কনিষ্ঠ পুত্র আনোয়ার হোসেন মঞ্জু মিলে তাদের দু'জনারই আপাতদৃষ্টিতে সুপ্রিয় বলে বিবেচিত ব্যক্তিটিকে বাতিল করে তাদের ভাষায়, কম্যুনিস্ট ও সাবেক ছাত্র ইউনিয়নের নেতা বামপন্থী কাজী জাফরকে কেন প্রধানমন্ত্রী বানানোর জন্য উঠে-পড়ে লেগেছিল কিছুতেই বুঝে আসছিল না। আনোয়ার হোসেন মঞ্জুকে আমি অন্তর থেকে ছোট ভাইয়ের মতো দেখে এসেছি। তীব্র অভিমানে তাকে কিছু জিজ্ঞেস করিনি।

কিন্তু ভোলা থেকে সভা করে প্রত্যাবর্তনের সময় নাজিউরের বিলাসবহুল লঞ্চে ওকে কথাটি জিজ্ঞেস না করে পারলাম না। সেখানে তাজুল ইসলাম চৌধুরী এবং রুহুল আমিন হাওলাদারও উপস্থিত ছিল। মঞ্জু স্বীকার করল তারা দুই মঞ্জু মিলেই কাজটি সম্পন্ন করেছে। তাদের কথার বাইরে যাওয়ার প্রশ্নই আসে না।

জিজ্ঞেস করলাম, কেন এ কাজ করলে? আমার কসুর?

সে বলল, ভাই, আপনার কোনই দোষ নেই। এটা আমরা করেছি আমাদের বালখিল্যসুলভ আচরণে। আপনি আমাদের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার আসনে আসীন। আপনার বাসায় গেলে বলবেন, আয় মঞ্জু, বস। এক কাপ কফি খা। আপনি কি রাত-বিরাত সময়ে-অসময়ে লুঙ্গি পরে আমাদের বাসায় গিয়ে বসে থাকবেন? প্রয়োজনে আমাদের পা জড়িয়ে ধরবেন?

বললাম, তোরা কী তা-ই চাস?

সে বলল, ছি-ছি! আমরা তা কল্পনাও করতে পারি না। এবং সেজন্যই আমরা এমন একজনকে প্রধানমন্ত্রী করতে চেয়েছিলাম যে আমাদের কথায় উঠবে-বসবে, আমাদের কথার অন্যথা করবে না।

তারপর সে নিজের থেকেই বলল, আমরা ভুল করেছি এবং অন্যায় করেছি। আপনাকে কথা দিচ্ছি, যদি তিন মাসের মধ্যে আপনাকে প্রধানমন্ত্রী বানাতে সক্ষম না হই তবে আমি আমার পিতার সন্তান নই।

মনে মনে হাসলাম, এ ধরনের কত কথা শুনলাম! শপথ করাই হয় ভাঙার জন্য।

কাজ আমরা তো কম করিনি। যেমন করেছি মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে তেমনি করেছি ইসলামী মূল্যবোধকে মর্যাদা দিয়ে। শুধু ইসলাম কেন, হিন্দু-বৌদ্ধ

সকল সম্প্রদায়ের মানুষের জন্যই কল্যাণকর একের পর এক কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।

টেলিভিশনে সংবাদ পাঠের পূর্বে প্রতিদিনই জাতীয় স্মৃতিসৌধের ছবি প্রদর্শিত হচ্ছে। "হৃদয়ের তন্ত্রীতে গাঁথা সবক'টি জানালা খুলে দাও, ওরা আসবে" গানটির সুরব্যঞ্জনা আমাদেরকে মুক্তিযুদ্ধের সেই রক্তঝরা দিনগুলোকে স্মরণ করিয়ে দেয়। বীরশ্রেষ্ঠ, বীরউত্তমদের জীবনী পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করা, মুক্তিযোদ্ধাদের পরিবারকে পুনর্বাসন করা, তাদের সন্তান-সন্ততির কর্মসংস্থান করা, আহতদের সুচিকিৎসা ও ভাতা প্রদান এবং সামগ্রিকভাবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা জাতীয় জীবনে মূল্যায়ন করার প্রতিটি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

ধর্ম নিশ্চয়ই মুক্তিযুদ্ধের বিমুখ নয়। দেশপ্রেমও ঈমানেরই অঙ্গ। যারা ঈমান ভঙ্গ করতে দ্বিধা করে না, তারা দেশের স্বাধীনতার প্রশ্নেও বিশ্বাসঘাতকতা করবে এটা অস্বাভাবিক নয়। ধর্মকে দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করাবার প্রয়াস ধর্মহীনদের অপছন্দের কারণ হতে পারে, কিন্তু দেশের সমগ্র জনসংখ্যার প্রায় নব্বই ভাগ মানুষ তাদের ধর্ম ইসলামকে স্বমহিমায় সমাজ ও রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির দ্বারা সম্মানিত করতে চায়। আমরা ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা দিয়ে যখন সেই ঘোষণাকে সংবিধানের অংশ হিসাবে পরিণত করলাম, তখন ধর্মহীন একটি দেশের প্রভাব-সমৃদ্ধ হাতে গোনা মুষ্টিমেয় মানুষ ব্যতিরেকে সকলেই সমর্থন জানিয়েছেন।

দুই শত বছর ইংরেজ শাসনের সময়ে তাদের খ্রিস্ট ধর্মের উপাসনার দিন রবিবার ছিল সাপ্তাহিক ছুটির দিন, যাতে তারা সেদিন তাদের গির্জায় উপাসনা করতে পারে। পাকিস্তান হলে ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য কথায় কথায় জান-কোরবান মুসলিম লীগ সরকারের সময়েও সেই গির্জায় আরাধনার দিন রবিবারই সাপ্তাহিক ছুটি অব্যাহত রইল। বাংলাদেশ হওয়ার পর শেখ সাহেবের আমলেও একই অবস্থা। ধর্ম নিরপেক্ষতার আবরণে সমাজের স্তরে স্তরে ধর্মহীনতা দানা বেঁধে উঠতে লাগল।

সে অবস্থার পরিসমাপ্তি ঘটল জাতীয় পার্টির সময়ে। আমরা শতকরা নব্বই জন মানুষকে তাদের ধর্ম পালনের সুযোগ করে দেওয়ার মানসে সাপ্তাহিক ছুটির দিন রবিবারের পরিবর্তে শুক্রবার ধার্য করলাম। এই দিন মুসলমানগণ জুমার নামাজ আদায় করে থাকে। রবিবারের পরিবর্তে শুক্রবার করার পর আমরা কি ঈমানদার মুসলমানদের প্রশংসা পেতে পারি না? তারা কী প্রশংসার পরিবর্তে আমাদেরকে গদিচ্যুত করার জন্য উঠে-পড়ে লাগবে?

কেবল জুমার নামাজ আদায় করার বিষয়ই নয়, সাপ্তাহিক কর্মদিবসগুলোতেও দ্বিপ্রহরে যোহরের নামাজ আদায় করার জন্য এক ঘণ্টা ছুটি দেওয়ার ব্যবস্থা হল। মাদ্রাসা, মকতবসমূহের শিক্ষকদের বেতন-ভাতা

অন্যান্য শিক্ষাঙ্গনের সমতুল্য করা হল এবং সরকার তাদের বেতন-ভাতার অর্ধাংশেরও বেশি বহন করার সিদ্ধান্ত নিল। মসজিদসমূহের ট্যাক্স-খাজনা মওকুফ করে দেওয়া হল এবং গ্যাস, পানি ও বিদ্যুতের খরচ সরকার বহন করার সিদ্ধান্ত নিল। রাষ্ট্রপতি দু'হাতে সকল ধর্মের উপাসনাগারগুলোকে আর্থিক অনুদান প্রদান করলেন। নতুন নতুন মাদ্রাসা, মকতব, মসজিদ, উপাসনাগার প্রতিষ্ঠিত হল রাষ্ট্রীয় অর্থানুকূল্যে। তা হলে অপরাধ কী করলাম সহজে বোধগম্য হয় না!

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নের কথাই বলা যাক, কি ইসলামী মূল্যবোধের রূপায়ণই বিবেচনায় আনা যাক, দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের কথা তো বলারই অপেক্ষা রাখে না। বাংলাদেশের মানুষ প্রথমবার উন্নয়ন কাকে বলে, প্রগতি কি জিনিস উপলব্ধি করল। বিদ্যুৎ উৎপাদনে ঊনত্রিশ শ' মেগাওয়াট রেকর্ড সীমায় পৌঁছল, উপজেলা পদ্ধতি প্রবর্তন করে ঘুমন্ত গ্রামগুলোকে জাগ্রত করা হল। বাইশটি জেলার স্থলে চৌষট্টিটি জেলা গঠন করে সাবডিভিশন হেড কোয়ার্টারসমূহকে আধুনিক শহরে রূপান্তরিত করা হল। নদীমাতৃক বাংলাদেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত গাড়িতে বসে চলাচলের পথ সুগম করা হল। তা হলে বাদ রইল কি?

বাদ রইল কিছু অসন্তুষ্ট রাজনৈতিক লোক যারা ক্ষমতার বলয় থেকে দূরে ছিল। তারা কিছুতেই একজন অরাজনৈতিক ব্যক্তির নেতৃত্বে এত ব্যাপক উন্নয়ন সহজভাবে নিতে পারছিল না। বন্যা হয়, ঘূর্ণিঝড় হয়, সরকার সেসব সাফল্যজনকভাবে সামাল দেয়। একজন মানুষও অনাহারে মৃত্যুবরণ করে না। দেশে দুর্ভিক্ষ নেই, মহামারি নেই, এ কেমন কথা! নিত্য ব্যবহার্য পণ্যের মূল্য ক্রেতা সাধারণের ক্রয়-সীমার মধ্যেই রইল। ছ' টাকা মূল্যে এক কেজি মোটা চাল পাওয়া যায় এ কেমন করে গ্রহণ করা যায়!

কর্মচারীদের বেতন কয়েকবার বৃদ্ধি করা হল, শ্রমিকরা প্রকাশ্যে ঘোষণা দেয়, এ সরকারের আমলে তারা যা পেয়েছে তা তাদের প্রত্যাশার অধিক। তা হলে এই সরকারের বিরুদ্ধে সকলেই একজোট কেন?

কৃষক তার উৎপাদন দ্বিগুণ করতে সক্ষম হয়েছে। সার, সেচ ও পাওয়ার-টিলারের বহুল প্রচলনে কৃষি ব্যবস্থায় আধুনিকতা প্রবর্তিত হতে চলল। এক ফসলের স্থলে দুই বা তিনটি ফসল উৎপাদিত হল। তা হলে এই সরকারের ব্যর্থতা কোথায়?

শিল্প, ব্যবসা, বাণিজ্য, ব্যাংক, বীমা সকল ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য প্রগতি সাধিত হল। বাংলাদেশকে আর তলাবিহীন ঝুড়ি বলা সম্ভব নয়। আমাদের বৈদেশিক অর্থের রিজার্ভও সন্তোষজনক। আমাদের সেনাবাহিনী মধ্যপ্রাচ্যসহ বিশ্বের অন্যত্রও শান্তির সপক্ষে অবস্থান নিয়ে প্রশংসা কুড়ালো। তা হলে

আমাদের ব্যর্থতা কোথায়? এ সরকারকে অবিলম্বে হটাতে হবে কার স্বার্থে বা কার প্রয়োজনে?

জিয়াউর রহমান সাহেবের বিধবা পত্নী বেগম খালেদা জিয়া কোনদিন রাজনীতি করেনি। প্রয়াত স্বামীর কারণে এবং উত্তরাধিকার সূত্রেই তার দলের প্রধান হয়ে বসা। জিয়াউর রহমান সাহেবের মর্মান্তিক মৃত্যুকে সকলেই অসমর্থন করেছে। অকুণ্ঠ নিন্দা জানিয়েছে। মানুষের সেই সহানুভূতি সম্বল করে সে একটি সংগঠিত দলের চেয়ারপার্সন হয়ে বসল। জিয়ার আসনটির প্রতি তার দৃষ্টি। সে আসনে অন্যকে আসীন হতে দেখলে তার নাখোশ হওয়ার সমূহ কারণ বিদ্যমান। সে কোন নির্বাচনেরই পক্ষপাতী নয়। প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতিই সে মানে না। স্বামীর আমলে কেন আপত্তি করেননি? ভাসুর সাত্তার সাহেবের আমলে কেন আপত্তি হল না? এখন দেবরতুল্য এরশাদের সময়ে তাতে আপত্তি কেন?

আওয়ামী লীগও মহাজনি-পন্থায় শত পরীক্ষিত নেতা থাকার পরও কেবল শেখ সাহেবের নামাঙ্কিত বলে, কোনদিন রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়, হাসিনা ওয়াজেদকে উত্তরাধিকারের সূত্রে দলের সভানেত্রী বানাল। রাজনীতির উত্তরাধিকার কর্মীর উপর বর্তায়। অর্থ সম্পদের উত্তরাধিকার সন্তানের উপর বর্তায়। দলটি পৈতৃক সম্পত্তি বলেই তারা বিবেচনা করে।

আওয়ামী লীগও প্রথমে '৮৬-র নির্বাচনে আসতে সম্মত ছিল না। তারাও আন্দোলনের শরিক ছিল। হঠাৎ সংসদের ভিতরে ও বাইরে আন্দোলন বলে নির্বাচনে অংশ নেয়। এর পশ্চাতে অবশ্য অনেক কার্যকারণ রয়ে যায়। প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ও '৮৮ নির্বাচন এরা বর্জন করল। প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতি এবং একদলীয় প্রথার প্রবর্তক এই দলটি প্রথম নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে কিছুটা আপসকামী বলে বিবেচিত হয়েছিল। এখন বিরোধী ভূমিকায় অগ্রবর্তী না হলে ভবিষ্যত অনিশ্চিত। ক্ষমতার প্রতিযোগিতায় পশ্চাতে স্থান লাভের সম্ভাবনা। তারাও আন্দোলনের পথকেই দুর্বার করে তুলল।

তাছাড়া হলও অনেকদিন। বাংলাদেশের মন-মানসিকতায় এত সুদীর্ঘ সময় কেউ পায়নি। Familiarity breeds discontent. এটা আমাদের দেশে বহুল সত্য। শেখ সাহেব সারাজীবন সংগ্রাম শেষে সাড়ে তিন বছরের বেশি সময় পাননি। জিয়াউর রহমান প্রায় তথৈবচ। অথচ এরশাদ সাহেব সুদীর্ঘ নয় বছর এই দেশের সর্বময় কর্তৃত্বে অধিষ্ঠিত আছেন। তিনিও সামরিক বাহিনীর লোক। লোহা গরম হয়েছে, এক্ষুণি তাকে পিটানোর সময়।

অবশ্য এরশাদ সাহেব এবং তাঁর সহকর্মীরা সব দোষ-ত্রুটির উর্ধ্বে ছিল একথা বাতুল ব্যতীত কেউ বলবে না। দেশের সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে

গ্রামীণ মানুষেরা এরশাদ সাহেবের উন্নয়নসমূহের প্রত্যক্ষ ফল লাভ করেছিল বলে তাঁর বিরুদ্ধে শত কথা থাকলেও তাঁর অবদানকে অস্বীকার করত না। বরং তাঁকেই যোগ্য শাসকরূপে বিবেচনা করত। শহরে এরশাদ সাহেবের কথিত নারীঘটিত কেচ্ছা-কাহিনীতে কান পাতা যেত না। এরশাদ সাহেবের, তাঁর স্ত্রী রওশন এরশাদের এবং তদীয় আত্মীয়স্বজনদের বহুবিধ আর্থিক দুর্নীতির কাহিনী শোনা যেত। সত্য-মিথ্যা জানার উপায় নেই। এরশাদ সাহেবের জনৈক বান্ধবীর খবর প্রায় সকলেই অবগত ছিল। কিন্তু সে মহিলা জনৈক সচিবের পত্নী হয়েও পরকীয়ার কারণে কতদূর ক্ষমতাবতী ছিল কল্পনাও করা যেত না। আমি তার থেকে সম্মানজনক দূরত্ব বজায় রাখতাম। উপ-রাষ্ট্রপতি মওদুদ আহমেদকে দেখি সমাজসেবিকা হিসাবে তার বুকে সোনার মেডেল পরিয়ে দিচ্ছে। সকলেই তাকে দেখলে ফার্স্ট লেডির মতোই সম্মান দেখাবার কসরত করত। তিনি খোশ তো প্রেসিডেন্ট খোশ। তিনি নাখোশ হলে আর রক্ষা নেই। চাকরি বুঝি যায়! তারপরও আমারটা রইল কী প্রকারে? ধাক্কা অনেক এসেছে। কিন্তু দল ও কর্মীদের নিকট ভিত্তি শক্ত ছিল বলে ফেলতে পারেনি। চেষ্টার ক্রটি হয়নি।

শোনা যায়, পদ-পদবি বিতরণে তার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। তার সুপারিশ বা নির্দেশ অমান্য করার ক্ষমতা খোদ কর্তারও ছিল না। তার দরবারে সে কারণেই মোসাহেবির অপ্রতুলতা লক্ষ্য করা যেত না। দল ও মন্ত্রিসভার পদাভিসিক্তগণ অন্য যেখানেই পূজা দিক না কেন, ক্ষমতার এই দেবীকে অবশ্যই তার প্রাপ্য অর্ঘ নিবেদন করতে হত।

সারা দেশের মানুষের প্রচুর সমর্থন থাকা সত্ত্বেও এই একটি বিষয়ে এরশাদ সাহেব মানুষের মনে শ্রদ্ধার আসন স্থায়ী করতে অপারগ হলেন। তাঁর পুত্রের জন্মবৃত্তান্তও কেউ স্বাভাবিকতায় নিল না। বিবাহিতা মেরী বদরুদ্দীন নামীয় জনৈক মহিলাকে প্রবাসে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করার ঘটনাও অবিদিত রইল না। যদিও তার কিছু স্বগোত্রীয় সহকর্মীর কারণে সে মহিলাকে পরিত্যাগ করে বিদেশে প্রেরণ করে দিতে হয়েছিল এবং প্রচুর অর্থের বিনিময়ে সবকিছু মিটিয়ে নেন বলে জনশ্রুতি। ঘটনা যা-ই ঘটে থাকুক, মুখে মুখে রটনার বিরাম নেই।

এতদসত্ত্বেও তাঁর কর্মপ্রতিভা এবং একজন বিদ্যুৎসাহী সমাজ সংস্কারকরূপে সাধারণ্যে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা ছিল। পল্লী বাংলাকে নবরূপে গড়ে তোলার সার্থক প্রচেষ্টার কারণে তাঁকে 'পল্লীবন্ধু' বলে উপাধি দিলাম। ভালো-মন্দ সব মিশিয়ে আমরা তাঁকে শেষ দিন পর্যন্ত আঁকড়ে থাকারই সিদ্ধান্ত নিলাম। আনোয়ার জাহিদ, সালাহউদ্দীন কাদের চৌধুরীদের মতো নিমজ্জমান জাহাজ থেকে সর্বাগ্রে জলে লাফিয়ে পড়াকে বিধেয় মনে করলাম

না। ডা. মতিনের মতো প্রার্থিত পদপ্রাপ্তিতে বিঘ্ন ঘটলে গোস্বায় পদত্যাগ করাও বাঞ্ছনীয় মনে হল না।

সুখ এবং দুঃখ, বিপদ এবং সুসময়ে যে সঙ্গে থাকে সে-ই প্রকৃত বন্ধু। সে বন্ধু মনে করুক বা না-করুক, আমরা তাঁকে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত পরিত্যাগ করিনি।

পুলিশ ব্যর্থ হলে বিডিআর এবং সর্বোপরি সেনাবাহিনীর লোকও মোতায়েন করা হল। দেশের রাজধানীতে এবং বৃহৎ শহরসমূহে আইন-শৃঙ্খলা প্রায় ভেঙে যাওয়ার উপক্রম। এক শত চুয়াল্লিশ ধারা ভঙ্গ হয়েছে। কারফিউ পর্যন্ত ভঙ্গ হতে লাগল। এরশাদ সাহেব অবশ্য শেষ রক্ষা করার অনেক চেষ্টা করেছেন, কিন্তু সকলকাম হতে পারেননি।

বেশ কিছুদিন পূর্ব থেকে ঢাকার প্রথম মেয়র ব্যারিস্টার আবুল হাসনাতকে দলে এনে ঢাকা শহরে দলকে সংগঠিত করার কথা বলে আসছিলাম। তাকে মেয়রের দায়িত্বসহ মন্ত্রী করা হবে এরশাদ সাহেব এই মর্মে আমাকে কথাও দিয়েছিলেন। কিন্তু নাজিউর রহমান ঢাকা মেট্রোপলিটান শহরের দায়িত্ব ছাড়তে নারাজ হওয়ায় বিষয়টি অহেতুক দীর্ঘ বিলম্বিত হয়ে গেল। শেষ মুহূর্তে তাকে আনা হলেও কাজে লাগান গেল না। সে এসে দায়িত্ব গ্রহণ করল এবং কাজেও ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিন্তু সময় পার হয়ে গিয়েছে। মানুষ যখন ভুল করা শুরু করে, করতেই থাকে। হাসনাতকে দলে আনায় বিলম্ব করা আর একটি ভুল।

তবুও আমরা হাল ছাড়তে চাইনি। আমি পরপর কয়েকটি প্রস্তাব দিলাম। প্রথমত, একটি শ্রমিক র‍্যালী করতে চেয়েছিলাম। আদমজীর শ্রমিক নেতা ছিদ্দিক সরদার দুটি প্রস্তাব নিয়ে এসেছিল। তার একটির সঙ্গে একমত হলাম। ঢাকার পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহ থেকে শ্রমিকদের রাজধানীতে নিয়ে এসে একটি র‍্যালী, পক্ষান্তরে আমাদের সমর্থনে একটি জঙ্গি র‍্যালীর সমস্ত আয়োজন সমাধা করেছিলাম। রাষ্ট্রপতির অনুমোদন নিয়ে র‍্যালীর জন্য লিফলেট-পোস্টার পর্যন্ত ছাপানো সারা। এটি একটি ধমকের মতো কাজ করত এবং সংশ্লিষ্ট সকলের উদ্দেশে আমাদের শক্তি প্রদর্শন করা হত। সবকিছু করার পর তিনি তাঁর গুণীজনদের পরামর্শে শ্রমিক সমাবেশ বাতিল করে দিলেন। ওরা সব ঢাকা এলে নাকি ঢাকায় আগুন জ্বলে যাবে। রোজ যেটা জ্বলছে সেটা শান্তির অগ্নি। আমরা যদি অশান্তির আগুন জ্বেলে দিই!

দ্বিতীয় প্রস্তাব ছিল ঢাকায় মহাসমাবেশ করার। সমাবেশ নয়, ঢাকায় মানুষে মানুষে সয়লাব করে দেওয়া। মফস্বলের সব নেতারা নিজেদের অস্তিত্বের কারণেই আমাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করেছে ঢাকায় একবার সকল স্তরের মানুষকে আহ্বান করার জন্য। তারা দেখিয়ে দেবে দেশের জনগণ প্রকৃতপক্ষে কোন্ দিকে।

মন্ত্রিসভার সহকর্মী বন্ধুরা অনেকেই অবস্থাদৃষ্টে চিন্তিত ছিল। তারাও

এগিয়ে এসে প্রস্তাব করল, বিভিন্ন জেলাওয়ারী তারা নিজেদের থেকেই মানুষজনের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করবে।

মফস্বলের লোকদের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তারা বলে একদিনের খাবার সকলে সাথে করে নিয়ে আসবে। প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ লোক যদি ঢাকায় এসে উপস্থিত হয় এবং প্রত্যেকের বুকে এরশাদের ছবিসহ জাতীয় পার্টির ব্যাজ থাকে, সেটা হয়ে দাঁড়াবে একটা অভূতপূর্ব ঘটনা, একটা ইতিহাস। ঢাকার মানুষ ঘর থেকে বের হয়ে দরজা খুলে দেখবে মানুষ আর মানুষ। সারা শহর একটি মিছিলে রূপান্তরিত হবে। মানুষের ঢলে সেদিন রাজধানীর সবকিছু অচল হয়ে যাবে।

সব ঠিক করলাম, প্রেসিডেন্ট সাহেব প্রথম বললেন, ঠিক আছে, করুন সব ব্যবস্থা।

সময় ঘনিয়ে আসতে আবার বিদগ্ধ গুণীজনদের পরামর্শ। আমরা নাকি একটা অঘটন ঘটাতে চাই। এটা কিছুতেই করা যাবে না, সর্বনাশ হয়ে যাবে।

বললাম, সর্বনাশ এড়াবার যদি কোন পথ থাকে, তা হলে এটাই পথ।

কিন্তু তখন আমার দিনকাল মন্দ। আমার সব চিন্তা-ভাবনা, সব পরিকল্পনা অবাস্তবায়িত থেকে যায়।

বিরোধী দল ইতিমধ্যে বুঝে গিয়েছে, তাদের জয় আসন্ন। সরকারের ভিত নড়ে গিয়েছে। আর একটু ধাক্কা দিলেই কার্য সমাধা হয়ে যাবে। সচিবালয়ের কর্মচারীরা এতদিন প্রকাশ্যে রাস্তায় নামেনি। এখন তারা ভাবল পিছিয়ে থাকা সুবিবেচনার কাজ নয়। তারাও সভা-শোভাযাত্রায় অংশ নিতে শুরু করল।

রাজধানী ঢাকা শহর রূপান্তরিত হল মিছিল আর সমাবেশের শহরে। চারদিকেই ওরা, যেদিকে তাকাই, কেবল ওদেরকেই দেখতে পাই।

ওরা কর্মসূচি দিল মন্ত্রী পাড়া ঘেরাও করবে। বেইলী রোড আর মিন্টো রোড এ দুটি ছোট সড়ক নিয়ে মন্ত্রী পাড়া। মন্ত্রীদের প্রত্যেকের বাড়িতেই নিরাপত্তার ব্যবস্থা রয়েছে। তারপর যদি কোন অঘটন ঘটাতে চায়, পরামর্শ দিলাম এলাকাটিকে সে সময়ের জন্য চতুর্দিক থেকে সীল করে দিলেই হয়। সেটাই ছিল প্রশাসনেরও সুপারিশ। কিন্তু রাষ্ট্রপতি তখন প্রধানমন্ত্রী আর সংসদের বিরোধী দলের নেতার প্রেমে মশগুল। তারা যে পরামর্শই দেয় সেটাই নির্বিবাদে গৃহীত হয়। প্রধানমন্ত্রী পরামর্শ দিল চতুর্দিকে নানা পেশাজীবীদের সমাবেশ আয়োজন করে এ ঘেরাও মোকাবিলা করতে হবে। সেটাই সাব্যস্ত হল। একদিকে থাকবে ব্যাংকের কর্মচারীগণ জামাল উদ্দীনের নেতৃত্বে। আর একদিকে থাকবে প্রাথমিক শিক্ষকদের সমাবেশ অধ্যাপক আবুল কালাম আজাদের নেতৃত্বে। শ্রমিকদেরকেও একটা দিক দেওয়া হল। আইনজীবীরাও বাদ গেল না। বহু দূরত্বে নিরাপদ এলাকা ফার্মগেট সংলগ্ন এলাকায় সমাবেশ করবে সংসদে বিরোধী দলের নেতা। আমি সবিনয়ে

জানালাম, জাতীয় পার্টি বলে একটা দল রয়েছে, তাদের কী এই উপলক্ষে কিছু করার রয়েছে?

রাষ্ট্রপতি বললেন, আপনি সবগুলো সমাবেশে গিয়ে বক্তৃতা করবেন।

বললাম, ঘেরাও কর্মসূচি সশস্ত্র হওয়ারই সম্ভাবনা। সেক্ষেত্রে খুব একটা ঘোরাফেরা করা যাবে বলে মনে হয় না।

এই প্রত্যেকটি সমাবেশের জন্য বিপুল পরিমাণের অর্থ প্রধানমন্ত্রী এবং সংশ্লিষ্টগণ গ্রহণ করেছে বলে প্রতীয়মান হল। কার্যত দেখা গেল ছোটখাটো কয়েকটি সমাবেশ। বিরোধী দলের মিছিল আসতেই কে কোথায় ছিটকে পড়ল তার হদিস নেই। ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলের সম্মুখে ছিল ব্যাংক কর্মচারীদের সমাবেশ। বিরোধী দলের মিছিল বারডেম অতিক্রম করার পূর্বেই তারা তাদের মঞ্চ গুটিয়ে উধাও।

প্রাথমিক শিক্ষকদের অধিকাংশই বয়স্ক। কেউ কেউ নানা রোগে আক্রান্ত। তারা বেতন-ভাতা বৃদ্ধির জন্য ঢাকায় অবস্থান নিতে কিছুটা অভিজ্ঞ। কিন্তু মারমুখী বিরোধী দলের মোকাবিলায় তাদের শক্তি কতটুকু! কিছু শ্রমিক আস্তানা গেড়েছিল পুলিশ বেষ্টনীর সন্নিকটে বেইলী রোডের পূর্ব পাশে। এদিকে কোন ঘেরাও আসেনি। কালো কোটের ক'জন কোনদিকে চলে গেল ওরাই জানে।

আমি কিছুটা জেদের বশে তখনও দলের কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছি। বিভিন্ন স্থানে আক্রান্ত হয়েও পাল্টা জনসভা করা বন্ধ করিনি।

প্রেসিডেন্ট সাহেব ক্যাবিনেটের সকল সদস্য এবং দলীয় নেতৃবৃন্দকে ডেকে জানালেন, তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তিন বিরোধী জোটের দাবির প্রেক্ষিতে তিনি ক্ষমতা ছেড়ে দিতে প্রস্তুত।

নানা জন নানা মত দিলেন। আমার মতামত দেওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। ছেড়েই যখন দেবেন তখন যেভাবে ভালো মনে করেন সেভাবেই তা করতে পারেন। তিনি পক্ষকাল সময় দিয়ে তিন দলকে বলে দিলেন, পদত্যাগে প্রস্তুত, তবে তার পদ্ধতি কি হবে তা নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন।

এই ঘোষণার পর আর পায় কে! মঞ্চ তৈরি করে রাত-দিন ওরা তখন গান, কবিতা, নাটিকা এবং আরও বহুবিধ উপায়ে আহা গণতন্ত্র, উঁহু গণতন্ত্র করে যাচ্ছে! এরশাদের কৃপাধন্য বহু শিল্পী, বুদ্ধিজীবী, গুণীজন আসর মাত করছেন গান গেয়ে, 'কষ্ট নেবে গো, কষ্ট!'

সব কষ্টের সমাপ্তি হল। এখন থেকে খাল-বিল, নদ-নদীতে কেবল সুখের নহর বইবে! আহ্লাদে আটখানা হয়ে ওরা উদ্বাহু-নৃত্য করছে তিন মঞ্চ থেকে।

'৯০ সালের ৪ঠা ডিসেম্বরে। সচিবালয়ে গেলাম শেষবারের মতো। সেদিন মালিবাগে এক জনসভা ছিল আমার ও হাসনাতের। অফিসে বসে ভাবছিলাম, সচিবালয়ের সহকর্মীদের নিকট থেকে আনুষ্ঠানিক বিদায় নেব—ওদের সাথে

আমার সম্পর্ক ছিল হৃদ্যতার। আনোয়ার, আখতার, সমিজ, দুলাল, বিমল, মাসুদ একযোগে অনুরোধ করল অবিলম্বে সচিবালয় ত্যাগ করার জন্য। ওরা বলল, আজ কেউ সচিবালয়ে আসেনি, আপনি একা এখানে রয়েছেন, ওরা যে কোন সময় আপনার উপর আক্রমণ করে দেখাবে যে ওরা নিশ্চুপ বসে নেই। স্বৈরাচার বিরোধী সংগ্রামে ওদেরও অবদান কম নয়!

নিচে নেমে এসে গাড়িতে উঠতেই বুঝলাম আর একটু বিলম্ব হলেই আমি আক্রান্ত হতাম।

গাড়ি প্রেসক্লাবের সম্মুখ দিয়ে আসার সময় কতিপয় ছাত্র নামধারী সন্ত্রাসী বোমা ও পিস্তল নিয়ে আক্রমণ করে বসল। লোকজনের ভিড়ে আমাদের কর্মীদের পরম সাহসিকতার দরুন এবং সঙ্গীয় নিরাপত্তা বাহিনীর লোকদের তৎপরতায় আর একবার অক্ষত দেহে ফিরে এলাম। আখতার গাড়ি থেকে পরে কোথায় গেল চিন্তিত হলাম।

মালিবাগের সভায় বললাম, আমি পদত্যাগের পক্ষে নই। কিন্তু রাষ্ট্রপতি মন স্থির করেছেন, তিনি পদত্যাগ করবেন। অচিরেই উন্নয়ন ও প্রগতির ধারা স্তব্ধ হয়ে যাবে। আমরা যতদিন ছিলাম, বিবেকের বিচারে জনকল্যাণে যা করণীয় তা-ই করেছি। এই নয়টি বছর ইতিহাসে 'উন্নয়নের নয় বছর' রূপে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

সভা থেকে প্রত্যাবর্তনের পর বিবিসি থেকে টেলিফোন এল, তারা জানতে চাইল আপনারা কখন পদত্যাগ করছেন!

সুস্পষ্ট কণ্ঠে বললাম, পদত্যাগপত্র কী প্রেসক্লাবের মোড়ে বা জিরো পয়েন্টে উড়িয়ে দেব? সিদ্ধান্ত নিয়েছি, পদত্যাগ করব। এখন তিন জোট সিদ্ধান্ত করুক কীভাবে এবং কার নিকট আমরা পদত্যাগ করব!

আমার এ বক্তব্য তারা আমার কণ্ঠেই প্রচার করেছিল। বন্ধুরা খুশি, শেষ মুহূর্তে নিজস্ব স্টাইল বজায় রাখতে পেরেছি বলে। সমালোচকরা ক্ষিপ্ত হল, বেটার স্বর নম্র হয়নি। এখনও একই তেজে বল আমাদের কোর্টে ছুঁড়ে দিচ্ছে।

সে সামান্য বক্তব্যটি এদেশে বহুল আলোচিত হয়েছে। আজও আমাদের কর্মীরা সে বক্তব্যের জন্য গর্ববোধ করে।

প্রেসিডেন্ট সাহেব পনেরো দিনের একটি প্যাকেজ ডিল ঘোষণা করেছিলেন। এর মধ্যেই একটি পথ বের করে যাতে সুষ্ঠুভাবে পদত্যাগ করা যাবে এবং

সংবিধান সমুন্নত থাকবে। তাই তখনই পরিবার স্থানান্তরের প্রয়োজন উপলব্ধি করিনি। ভেবেছি সময় আছে।

কিন্তু সময় ছিল না। এরশাদ সাহেব সময় দিলেন না। সন্ধ্যার পর সেনাভবনে জরুরি তলব পেয়ে সেখানে রওয়ানা হলাম। বাসায় বলে গেলাম ফিরে এসে রাতের খাবার খাব। সেটাই ছিল বেইলী রোড থেকে আমার শেষ যাত্রা। গাড়ি করে ফ্লাগ উড়িয়েই সেনাভবনে এলাম। সঙ্গে পুলিশের জিপ ও আমার কয়েকজন কর্মী। আনোয়ার, সমিজ, কফিল, দুলাল ওরা ছিল গাড়িতে। ওরা গেটের বাইরে অপেক্ষায় রইল। আমি এখানেও শেষবারের মতোই প্রবেশ করলাম। মওদুদ, কাজী জাফর, আনোয়ার হোসেন মঞ্জু, আনিস উপস্থিত ছিল। প্রেসিডেন্ট সাহেবের চেহারায় স্পষ্টত একটি উদ্বেগের ছাপ। তিনি অন্য কোন কথা না বলে প্রথমেই বললেন, আমি আজই পদত্যাগ করব এবং এক্ষুণি।

অন্যদের সঙ্গে আমিও বললাম, আপনার পদত্যাগের এখনও সময় আছে। যে প্যাকেজ ডিল আপনি ঘোষণা করেছেন, সে পর্যন্ত অপেক্ষা করাই শ্রেয়।

তিনি অসহিষ্ণু স্বরে বললেন, আমি আজই পদত্যাগ করব। আমি আর এ পদে থাকতে চাই না। আনিস, একটি খসড়া তৈরি করুন।

আমাদের আর কথা বলার কিছু রইল না। সেই মাহেন্দ্র-মুহূর্ত এসে গেল। আনিস একটা খসড়া প্রস্তুত করে আনল। লেখা হল, রাষ্ট্রপতি পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

রেডিও-টিভিতে ঘোষণা হয়ে গেল, প্রেসিডেন্ট এরশাদ পদত্যাগ করেছেন। ইংরেজি-বাংলায় সামান্য তারতম্যে অর্থের অনেক ব্যবধান হয়। বাস্তবতা হল, তিনি পদত্যাগ করেছেন বলে সমগ্র জাতি অবগত হল।

সংবাদ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র ঢাকা শহর রাস্তায় নেমে এল। বাংলাদেশী মানুষ একটা হুজুগ পেলে আন্তরিকভাবেই তাতে মেতে ওঠে। এর চাইতে বৃহত্তম ঘটনা আর কী হতে পারে, তাদের ভাষায় নয় বছরের স্বৈরশাসনের অবসান হয়েছে। স্বৈরাচার নিপাত গিয়েছে। উল্লাসে মত্ত অগুনিত মানুষ বেরিয়ে এল, কেবল আনন্দ মিছিলই করতে নয়, তাদের অনেকের মনের মধ্যে জেগে উঠেছে তীব্র প্রতিহিংসার অনল, অনেকদিন থেকেই মনের কন্দরে সে অনল ধিকি ধিকি জ্বলছিল—আজ সুযোগ এসেছে তা চরিতার্থ করার। ওরা বেরিয়ে পড়ল কে কোথায় আছে খুঁজে বের করতে হবে এবং তাদেরকে এই ডামাডোলে খতম করে দিতে হবে।

আমাদের দুঃখ হল, কিছুটা সময় আমাদেরকে প্রদান করে অন্তত পরিবারের সদস্যদের নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে গিয়ে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার

পর তাঁর পদত্যাগ করা উচিত ছিল। তা না করে, কী কারণে তিনি প্রকাশ করেননি, আমাদেরকে তাঁর বাসভবনে ডেকে এনে তখনই পদত্যাগ করা সুবিবেচনাপ্রসূত হয়নি। তিনি রয়েছেন ক্যান্টনমেন্টের অভ্যন্তরে, সেখানে জন-জোয়ারের উন্মত্ততা কোনদিন পৌঁছবে না। কিন্তু আমাদের সব পরিবার? অন্য মন্ত্রীদের নিরাপত্তা? কোন প্রশ্নই বিবেচনা না করে তিনি বিরাট হঠকারী কাজ করে ফেললেন। বললেন, আমি দুঃখিত। আর কিছু করার ছিল না।

তার সামরিক সচিব বিগ্রেডিয়ার মঞ্জুর রসীদ খবর পেয়ে বঙ্গভবন থেকে ছুটে এসেছে। সেও অভিযোগের সুরে বলল, স্যার, এটা কী করলেন, আমাকে পর্যন্ত জানালেন না! এখানটা না হয় ক্যান্টনমেন্ট, কিন্তু অন্য সমস্ত মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রীরা সপরিবারে বেইলী রোড, মিন্টু রোডেই থাকেন! তাদের নিরাপত্তার কী ব্যবস্থা! আমি আসতে আসতে কোনক্রমে বেঁচে গেছি। আমি আর্মির লোক বলে রেহাই পেয়েছি। কিন্তু লক্ষ লক্ষ মারমুখী জনতা এখন ঢাকা শহরের সর্বত্র অনেককেই খুঁজে বেড়াচ্ছে।

তার অনুযোগের জবাব নেই। আমরা নিয়তির কাছে আত্মসমর্পণ করে বসে থাকা ছাড়া আর গত্যন্তর দেখলাম না। পরিবারের সদস্যদের জন্য অপরিসীম উদ্বেগ অনুভব করলাম। ওরা আর যাকেই খুঁজে বেড়াক না কেন, আমাকে যে খুঁজবে এবং পেলে পরিণাম যে কী হবে আমি সুনিশ্চিত! যা হবার হবে, একটা বেপরোয়া ভাব মনকে আচ্ছন্ন করল। এমন একজনকে আঁকড়ে ধরেছিলাম, যে বিপদের মুহূর্তে আমাদের কথা একবারও চিন্তা করল না। সকলেরই বাড়ি থেকে টেলিফোন আসছিল। তিনি ধরেই যার টেলিফোন তাকে দিচ্ছেন, একবারও ও প্রান্তের মানুষদের একটি সংবাদ নেওয়ার প্রয়োজন মনে করেন না। তাঁর কেবল দুশ্চিন্তা, নাজিউর কোথায়, নাজিউরকে এখানে রাখ, ওখানে রাখ, ওর পরিবারকে নিরাপদে রাখ।

বিডিআর-এর প্রধানকে টেলিফোন করেন, যেভাবেই হোক নাজিউরকে সামলিয়ে রেখ, ওর যেন কোন অনিষ্ট না ঘটে।

সবই বুঝলাম। সকলেই বুঝল।

সালেহার উদ্বেগাকুল স্বর ভেসে আসছে টেলিফোনে, তোমরা ভালো আছ? এখানে জোর গুজব, সেনাভবনে তোমাদের সব শেষ করে দিয়েছে।

জিজ্ঞেস করলাম, তোমাদের ওদিকের কথা বল।

সে বলল, শত শত মিছিল আসছে তোমার খোঁজে। পেলে রক্ষা থাকবে না। কখনও এদিকে এস না। আসতে পারবেও না। তোমাকে আল্লাহ্‌র হাতে সোপর্দ করলাম।

তার কণ্ঠ ভেঙে এল।

আমরা যখন সেনাভবনে আসি তখন সেনাপ্রধান লে. জে. নুরুদ্দীন সাহেবকে দেখি সেনাভবন থেকে বের হতে। শুভেচ্ছা বিনিময় ব্যতীত অন্য কোন কথা হয়নি। পরস্পরবিরোধী বক্তব্য পরে শোনা গিয়েছে, এরশাদ সাহেব তাকে ক্ষমতা গ্রহণের অনুরোধ করেছিলেন বা তিনিই এরশাদ সাহেবকে সামরিক আইন জারি করে সংকট নিয়ন্ত্রণের পরামর্শ দিয়েছিলেন—জানার চেষ্টাও করিনি কোনদিন। প্রয়োজন ছিল না। যা বাস্তব, তা-ই তখন চোখের সম্মুখে ঘটছিল।

শুনেছি, ঢাকা শহরের যেখান থেকেই একটি বিজয় মিছিল বের হয়, তারা প্রেসক্লাব পর্যন্ত আসবেই—এটা তাদের বিজয় কেন্দ্র এবং তীর্থ। আমার বাসস্থান বেশি দূরে নয়। চল ওকে হালাল করে আসি।

বাসার পুলিশরা গেটে তালা মেরে সঠিকই জবাব দিয়েছে, তিনি বাসায় নেই। কাজেই বাসার ভিতরে প্রবেশ করে যদি অন্যদের উপরে হামলা হয়, আমরা গুলি চালাতে বাধ্য হব। যার খোঁজে এসেছে তাকে না পেয়ে ওরা হন্যে হয়ে তাকে খোঁজার জন্য বের হয়।

পরে শুনেছি, সেনাভবনের গেটেও দুটি মত ছিল। একটি মত ছিল, যারা মূল হোতা তারা সকলেই এখানে উপস্থিত। এদেরকে ব্যবস্থা করলে সব সমস্যা ঘুচলো। দেশের মানুষও সন্তুষ্ট হবে। অন্য মত এবং ভারি মত ছিল, না, আমরা এর পক্ষে-বিপক্ষে নই। যা করার জনগণ করবে। আমরা সম্পূর্ণরূপে নিরপেক্ষ। এদের বক্তব্যই গৃহীত হয়েছিল।

সেনাভবনে বসেই আমরা শত-সহস্র বোমা আর গোলাগুলির শব্দ পাচ্ছিলাম। টেলিফোনে শহরের অবস্থা অবগত হচ্ছিলাম। ওরা মোটর সাইকেলে স্কোয়াড বের করেছে, যাতে আমরা পালাতে না পারি।

ওখানে ক্ষুৎপিপাসায় ক্লান্ত হয়ে বসে রয়েছি। মাঝে মাঝে আরও উদ্বিগ্ন সালেহার টেলিফোন ধরা ছাড়া আর কাজ নেই। সকলেই অবস্থার চাপে বিপন্ন এবং বিষণ্ন।

গভীর রাতে বেগম রওশন এরশাদ এসে বললেন, যা হবার তা-ই হবে, আল্লাহ্‌র উপর ভরসা রাখুন। আসুন, আপনাদের খাবার দেওয়া হয়েছে।

সবাই উঠে সেই টেবিলটিতে গেলাম, যেখানে একদিন জনদল তৈরি হয়েছিল, যেখানে বসে দল, সরকার ও দেশের শত সিদ্ধান্ত আমরা গ্রহণ করেছি। আজ শেষবারের মতো সেখানে খাওয়ার জন্য একত্রিত হলাম।

বললাম, ভাবী, আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ, আমাদের কিছু খাবারের প্রয়োজন ছিল। আপনি The last supper পরিবেশন করছেন।

তিনি বললেন, শেষ খাবার কেন হবে! আপনাদের আরও খাওয়ার সুযোগ আল্লাহ্ দেবেন।

খাবার শেষ হতে রাতও শেষ হওয়ার পথে। মিছিলকারীরা এতক্ষণে

খোজাখুঁজি করে ক্লান্ত হয়ে নিশ্চয়ই ভোর রাতের দিকে নিজেদের ডেরায় ফিরেছে।

আনোয়ার হোসেন মঞ্জু এক ফাঁকে চলে গেল। আর এক গাড়িতে মওদুদ, জাফর এবং আনিস চলে গেল। আমি গেটে এসে দেখি আমার গাড়ি নেই। প্রহরীরা বলল, ওরা রাস্তার অবস্থা দেখতে গিয়েছে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিজের অদৃশ্যের কথা ভাবছি। কিছুক্ষণের মধ্যেই আনোয়াররা আমার গাড়ি নিয়ে এসে উপস্থিত। গাড়িতে উঠতে যাব, একজন সামরিক অফিসার এসে বলল, স্যার, আপনার উপরই মিছিলকারীদের ক্রোধ সর্বাধিক। আপনি এভাবে যাবেন না। আমাদেরকে বলুন কোথায় যাবেন, আমরা আপনাকে পৌঁছে দেব।

ভাবলাম, এদের সাহায্য নেওয়া ঠিক হবে কিনা। আবার ভাবলাম, শেষ মুহূর্তে এরাই হয়ত সঠিক বলেছে। সম্মত হতেই ওরা একপ্রস্থ সেনাবাহিনীর পোশাক এনে আমাকে দিল, আপনার সাফারির উপরেই পরে নিন, চিনতে পারবে না।

তা-ই করলাম। জীবনে প্রথম সামরিক পোশাক পড়লাম। গুলশানের দিকে যেতে নির্দেশ দিয়ে ওদের গাড়িতে চেপে বসলাম। আমার গাড়ি দূর থেকে আমাদের অনুসরণ করবে।

কামাল আতাতুর্ক এভিনিউ পর্যন্ত এসে দেখলাম, আপাতত সব শান্ত। জনতা ক্লান্ত হয়ে নীড়ে ফিরেছে। ওদেরকে বললাম, আমাকে এখানেই ছেড়ে দিন।

ওরা বলল, স্যার, কোন ভয় করবেন না। আমাদেরকে বলুন, কোথায় যেতে চান, সেখানে পৌঁছে দেব।

চিন্তা করলাম, আমার আস্তানার খবর কাউকে দেওয়া সঠিক হবে না।

বললাম, আমাকে এখানেই ছেড়ে দিন।

ওদের পোশাক ওদের ফেরত দিলাম। ওরা সকলে নেমে ভদ্রতা করে শেষ স্যালুট দিয়ে গাড়ি নিয়ে চলে গেল।

আমার গাড়ি আসতেই তাতে চেপে গুলশান গেলাম। এসব বিপদের মুহূর্তে বন্ধু আজিজের কথা মনে পড়ে। আজ সে নেই। পুলিশকে জানতে দিতে চাই না, কোথায় যাচ্ছি। ওদেরকে বড় রাস্তায় দাঁড়াতে বললাম। আমার গাড়ি ফিরে এসে পরবর্তী নির্দেশ দেবে।

নূরে আলম সিদ্দিকীর বাসায় গিয়ে উঠলাম। সে আমাকে প্রত্যাশা করেনি। বিস্মিত-অস্বস্তি টের পেলেও কিছু করার ছিল না। একটা টেলিফোন করেই আমাকে বিছানা নিতে হবে। ঘুমের জন্য নয়, সমস্ত দিনের উদ্বেগ এবং সারা রাতের উত্তেজনার ফলে শরীর ভেঙে আসছে। স্নায়ু প্রায় অকার্যকর।

টেলিফোনে সালেহাকে বললাম, কোন জিনিসের প্রয়োজন নেই, যে অবস্থায় আছ দিনাকে নিয়ে এক কাপড়ে আজিজের বাসায় চলে যাও, আমি পুলিশের গাড়ি পাঠাচ্ছি, ওরা পৌঁছে দেবে। আমার জন্য ভেব না।

সালেহা বলল, এখনও দিনের আলো ফোটেনি। মেয়েকে নিয়ে আমি একা যাব?

বললাম, জানো না লোকে বলে, আপনের চাইতে পর ভালো, পরের চাইতে বন!

সেও বলল, ঠিকই বলেছ, এত লোক টেলিফোন করল, এত আত্মীয়েরা, বন্ধুরা রয়েছে, কেউ একবার দেখতে এল না বা আমাদেরকে নিরাপদে অন্যত্র পৌঁছবার ব্যবস্থা করল না! ঠিক আছে, আমি দিনাকে নিয়ে পুলিশের সঙ্গেই আজিজ ভাবীর ওখানে যাচ্ছি। তুমি সাবধানে থেক।

আনোয়ারদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে আলমকে বললাম, আমাকে একটা বিছানা দিতে বল। আর দাঁড়াতে পারছি না।

সে তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করে দিল।

দুপুরের পূর্বে সে এসে আমাকে ওঠাল। নাস্তা খেতেই সে বলল, ভাই, আপনার নিরাপদে থাকার ব্যবস্থা করেছি এক বিদেশীর বাসায়। চলুন, এখানে আমার বাসায় অনেক লোক আসে। এ স্থান নিরাপদ নয়।

তার যুক্তি অনস্বীকার্য। একটি কালো কাঁচের গাড়িতে বনানীতে এক ইউরোপীয় দম্পতির গৃহে সে আমাকে রেখে এল। এই দম্পতি নব-বিবাহিতা, উভয়েই এক অফিসে কাজ করে। দ্বিতলে তাদের নিজস্ব থাকবার স্থানের পাশে এক ঘরে অতীব যত্নের সঙ্গে তারা আমার থাকার ব্যবস্থা করে দিল। নূরে আলমের তারা অত্যন্ত বিশ্বস্ত বন্ধু এবং আমার পরিচয় জেনে তারা অধিকতর যত্নবান হল। কাজের লোকদের নির্দেশ দিল, কেউ উপরে আসবে না।

বিদেশী এই দম্পতি অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে আমার সুখ-সুবিধার লক্ষ্য রাখত। তারা আমার সঙ্গে একসাথে প্রাতরাশ খেত। তারপর উপরের তলায় তালা লাগিয়ে কাজে চলে যেত। অন্য সময় তারা দুপুরে লাঞ্চ খেত ক্লাবে। এখন প্রতিদিন তারা বাসায় আমার জন্য লাঞ্চ খেতে আসে।

কাজের লোকজন অবাক হয়ে যায়, তারা নিজ হাতে খাবার উপরে নিয়ে এসে দরজা বন্ধ করে খাবার খায়। রাতেও একই পদ্ধতিতে ডিনার হয়।

এরা ভদ্রতার চরম করল। কিন্তু আমার অস্বস্তি কাটছিল না। এরা ইউরোপের মানুষ, তাছাড়া সদ্য বিবাহিত। এদের এখন প্রয়োজন নিরিবিলি একান্ত কিছু মুহূর্ত। কিন্তু আমি একটি মূর্তিমান তৃতীয় পক্ষ বিদ্যমান, তাদের স্বপ্নীল প্রেমলীলায় বাধাস্বরূপ। কোন সময় হয়ত খেয়াল থাকে না, অন্য এক ব্যক্তি রয়েছে। ওরা লীলাচ্ছলে পরস্পরকে তাড়া করে ফিরে এঘর থেকে

ওঘরে—ওদের বসন-ভূষণ সবসময় ঠিক থাকার কথা নয়। হঠাৎ আমাকে দেখতে পেয়ে ওরা লজ্জিত হয়ে ওঠে। নিজেকে অপরাধী মনে হয়।

দিন কয়েক কাটল এভাবে। ভাবলাম, অনেকদিনই হয়ত এভাবে থাকতে হতে পারে। টেলিফোন করলাম ভাতিজা শামিমকে। সে ডিআইটির ইঞ্জিনিয়ার। মাত্র বিয়ে করে নতুন সংসার পেতেছে। সে বলল, চাচা, আমার এ বাসার ঠিকানা এখনও একজন আত্মীয়স্বজনও জানে না। আপনি নিশ্চিন্তে এখানে থাকতে পারবেন। বাসাও বেশ বড়। একটি গ্রাম্য বৃদ্ধা কাজের মেয়ে আপনার বউমাকে সাহায্য করে। সে কিছুই জানে না। আমার বাসাই আপনার জন্য সবচাইতে নিরাপদ।

ওর পরামর্শই গ্রহণ করলাম। আলমকে বলে, তার বিদেশী বন্ধু দম্পতিকে অনেক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে গভীর রাতে শামিমের আনা কালো কাচের গাড়িতে ওর বাসা মগবাজার ডিআইটি কলোনীর পঞ্চম তলায় সাময়িক আস্তানা নিলাম। নতুন বউ আমার সেবা-যত্নের দায়িত্ব নিল। ফরিদপুরের মোহন মিয়ার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা লাল মিয়ার পৌত্রী মেয়েটিকে সালেহাই পছন্দ করে ঘরে এনেছে। সে প্রাণপণ সেবায় আমার মানসিক যাতনা হ্রাস করার চেষ্টারত রইল। অনেক বড় ফ্লাটের এক পাশে সবচাইতে বড় কামরাটিতে ফোন, টিভি, ভিসিআর লাগিয়ে শামিম আমার স্বাচ্ছন্দ্যের সব আয়োজন করে দিল।

ভালোই ছিলাম। এখানে এসে সালেহা, দিনার সংবাদ পাচ্ছি। সঙ্গত কারণেই কথা বলি না। শামিম বেইলী রোড থেকে একে-একে আমাদের জিনিসপত্র তার বাসায় নিয়ে এল। অনেক কিছুই ইতিমধ্যে বেহাত হয়ে গিয়েছে।

ডিসেম্বরের '৬ তারিখে কার্যত ক্ষমতা হস্তান্তর হল। শেষ পর্যন্ত আমার বক্তব্যই গ্রহণ করতে হল—পদত্যাগপত্র প্রেসক্লাবের মোড়ে বা জিরো পয়েন্টে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। তিন জোটকে পথ বের করতে হল। সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করা যায়। এরশাদ সাহেব প্রধান বিচারপতিকে উপ-রাষ্ট্রপতি পদে নিয়োগ করবেন। উপ-রাষ্ট্রপতি মওদুদ আহমেদ পূর্বাহ্নে পদত্যাগ করায়

পদটি শূন্য হল। সেখানে এরশাদ সাহেব জনাব সাহাবুদ্দিনকে উপ-রাষ্ট্রপতি হিসাবে শপথ দিলেন এবং তারপর উপ-রাষ্ট্রপতির হস্তে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব অর্পণ করলেন। সাংবিধানিক কোন জটিলতার সৃষ্টি হল না। এরশাদ সাহেব স্বেচ্ছায় পদত্যাগ না করলে অনেক প্রতিকূলতার সৃষ্টি হত এবং অহেতুক ঘাত-প্রতিঘাতে অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়ে যেত। তিন জোটের উচিত ছিল প্রতিদানে এরশাদ সাহেবের সঙ্গে সম্মানজনক ব্যবহার করা। কিন্তু তারা তা করেনি। ইতিহাসের এক নিকৃষ্ট নজির তারা স্থাপন করল প্রতিহিংসার বহুধা পদক্ষেপ নিয়ে।

এরশাদ সাহেবেরও দোষ আছে। তার উচিত ছিল একেবারে চুপচাপ থাকা। যারা বিজয় লাভ করেছে তাদের বিজয়োল্লাস স্তিমিত হোক। ওরা রঙ মেখে আনন্দ করুক, মিষ্টি খেয়ে, চাঁদা তুলে নারী-পুরুষ মিলে আনন্দ সাগরে নিমজ্জিত হোক। একসময়ে ধীরে ধীরে সব কিছুই স্বাভাবিক হয়ে আসবে। সময় সবচাইতে বড় সহায়ক। প্রচুর সময় দেওয়া অতীব প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এরশাদ সাহেব তা বুঝলেন না। টঙ্গী থেকে কোন শ্রমিক নেতা টেলিফোন করে বলেছে, আমরা আপনার সঙ্গে আছি।

কোন নেতা সৌজন্য টেলিফোনে বলেছে, জাতি আপনার অপেক্ষায় থাকবে।

তিনি পুলকিত হলেন, অধীর হলেন। সপ্তাহ পার হওয়ার পূর্বেই তিনি বিবিসিকে টেলিফোনে বললেন শীঘ্রই তিনি ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তন করবেন। দেশের মানুষ তাঁর সঙ্গে রয়েছে।

ইন্টারভিউ শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। এই লোকের কী নিত্য-সত্য জ্ঞানের অভাব! এখন এসব বলার পরিণাম একবার চিন্তা করেছেন? পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসছিল। তাকে অস্বাভাবিক করে দিলেন।

আমার আর সহ্য হল না। টেলিফোন করলাম সেনাভবনে। তারা বলল, আপনি আপনার নাম্বার দিন, আমরা পরে সংযোগ করে দেব।

বললাম, নাম্বার দেওয়া সম্ভব নয়। কেননা, আমি টেলিফোন করার জন্যই এখানে এসেছি, অনুগ্রহ করে এরশাদ সাহেবকে দিন।

ভুলে গিয়েছিলাম এরশাদ সাহেব একটি যন্ত্র এনেছিলেন যাতে যে কল করবে তার নাম্বার উঠে থাকবে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই এরশাদ সাহেবকে পেলাম। খুব রাগ করলাম। বললাম, আপনি কোনদিন আমার কথা শুনলেন না। এবার দেখবেন আপনার অবস্থা কী হয়! ওরা পারলে আপনাকে এবং সেই সঙ্গে আমাদেরকেও টুকরা টুকরা করে ফেলবে। পাগলেও নিজের ভালো-মন্দ বুঝে—আপনি তাও বুঝলেন না। কার পরামর্শে এই বিবৃতি দিলেন?

তিনি আহত হয়ে বললেন, কোনদিন আপনার পরামর্শ শুনিনি! মওদুদ সাহেবই তো আমাকে এই ইন্টারভিউ দিতে বললেন। কাজটা ভুল হল?

বললাম, নেহাত ভুল হয়ে গেছে। বাঁচার সম্ভাবনা আর রইল না।

তিনি নীরব হয়ে গেলেন, আমারও আর কথা বলতে ইচ্ছা হল না। টেলিফোন রেখে দিলাম।

মনটা বিষণ্ন হয়ে রইল। এত কড়া কথা কোনদিন তাঁর সাথে বলিনি। ভাবলাম সৌজন্যের খেলাপ করা আমার অনুচিত হয়েছে।

পরদিন আবার টেলিফোন করলাম। জানি না সেনাভবন কাদের নিয়ন্ত্রণে। আজও তারা একই কথা বলল, নাম্বার দিন, পরে লাগিয়ে দেব।

আমিও একই কথার পুনরাবৃত্তি করলাম। শেষ পর্যন্ত তাঁকে লাইনে পেলাম। বললাম, স্যার, কাল আমি খুব উত্তেজিত ছিলাম। অনেক কটু কথা বলে ফেলেছি, কিছু মনে করবেন না।

তিনি বললেন, না মোয়াজ্জেম, কোন কটু কথা নয়। আপনি কাল ঠিকই বলেছেন। ভুল হয়ে গেছে। ছাত্ররা মিছিল বের করেছে আমাকে সেনাভবন থেকে বের করে কারাগারে নিক্ষেপ করতে।

বললাম, শুনেছি। এ তো মাত্র শুরু, আরও অনেক কিছু হবে। আপনি আর কোন বিবৃতি বা ইন্টারভিউ দেবেন না। ক্ষতি যা হবার হয়েছে, আর যেন না হয়।

আমার মনে হল তাঁর সঙ্গে আর কোনদিন কথা হবে না। বিষণ্ন মনে টেলিফোন রেখে দিলাম। পরদিনই কাগজে দেখতে পাই, আমাদের সকলের নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বের হয়েছে। এরশাদ সাহেব পূর্ব থেকেই তাঁর বাসস্থানেই কার্যত আটক রয়েছেন। এখন সেটাকে আনুষ্ঠানিকতায় পর্যবসিত করবে। আমি টেলিফোন করেই ঝামেলাটা করলাম। তা না হলে এত শীঘ্র ওরা আমার খোঁজ পেত না। দুই দিন এক নাম্বার থেকে টেলিফোন গিয়েছে। নাম্বারটি কার এবং কোথায় বের করতে সময় লাগার কথা নয়। পরদিনই অতি প্রত্যুষে কয়েক গাড়ি পুলিশ শামিমের ফ্লাটের বিল্ডিং ঘেরাও করে ওর বাসায় এসে উপস্থিত হল। শামিমকে তারা আমার নাম করে বলল, তাদের কাছে নিশ্চিত খবর রয়েছে আমি সে বাসায় আছি। বিলম্ব না করে আমাকে ডেকে দিতে বলতে বলতেই তারা আমার কক্ষে চলে এল। বলল, স্যার, সবই বুঝতে পারছেন। লোকজন জানাজানি হয়ে যাবার পূর্বে আমাদের সঙ্গে চলুন। নইলে যে কোন অঘটন ঘটে যেতে পারে।

শামিম ও তার বউ আমাকে জড়িয়ে কাঁদতে থাকল।

শামিম শুধু বারবার কাঁদছিল এই বলে, আমি যদি চাচাকে নিয়ে না আসতাম, তা হলে আর সে গ্রেপ্তার হত না।

ওদেরকে বুঝিয়ে বললাম, এখন বিলাপের সময় নয়। আমার ওষুধ, জামা-কাপড় সাথে দিয়ে দাও। এরা ঠিকই বলেছে, বিলম্ব করা ঠিক হবে না।

নিচে এসে পুলিশের গাড়িতে উঠে বসলাম। তখনই বেশ কিছু সংখ্যক উৎসুক দর্শক জমে গিয়েছে। তাদের কেউ কেউ আমার গ্রেপ্তারে আনন্দ প্রকাশ করে হৈচৈ করে উঠলে গাড়ির পাদানিতে দাঁড়িয়েই বললাম, গ্রেপ্তার বহুবার হয়েছি। এটা নতুন কিছু নয়। আবার ফিরে আসব। সেদিন আপনারাই আবার জিন্দাবাদ দেবেন।

গাড়ি ছেড়ে দিল।

পশ্চাতে বসা পুলিশ কর্মকর্তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছিল, স্যারের কী ভয় বলে কোন জিনিস নেই? এই অবস্থার মধ্যেও মানুষকে কথা শুনিয়ে আসেন!

একজন পুলিশ বোধহয় ভালো করেই আমাকে চিনত। সে বলে উঠল, স্যারকে রাস্তায় নামিয়ে দিলে নিজেই হেঁটে জেল গেটে চলে যাবেন। ভয় বলে কোন জিনিস তার জানা নেই।

বললাম, না ভাই, এখন আর হেঁটে যেতে পারব না। সরকারের মেহমান, হেঁটে যাব কেন?

সকলের সম্মিলিত হাসিতে গ্রেপ্তারজনিত বিষণ্ন আবহাওয়া তিরোহিত হল। দীর্ঘ এক যুগ পর আবার আমার পুরনো আস্তানা ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে ফিরে এলাম। শামসুর রহমান সাহেব ছিলেন ডিআইজি। আমার দীর্ঘদিনের বন্ধু। দু'দিন পূর্বেও উপ-প্রধানমন্ত্রীর দফতরে গিয়েছেন কোন কাজ নিয়ে। আজ সে তারই বন্দিখানায়। সব ভুলে সে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলল। তাকে ঝাঁকুনি দিয়ে কান্না থামিয়ে বললাম, কারা-কর্তার এত আবেগ থাকলে চলে না। তিনি নিজেকে সামলে নিয়ে কর্তব্য কর্মে মনোনিবেশ করলেন।

শামসুর রহমান সাহেব ছিলেন একজন অভিজ্ঞ কারা-কর্মকর্তা। আমার ছাত্রজীবনে তাঁকে প্রথম পাই এই ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে ডেপুটি জেলার হিসাবে। আজ তিনি সিনিয়র ডিআইজি, ঢাকা সেন্ট্রাল জেলের অধিকর্তা। অচিরেই আইজি হওয়ার সম্ভাবনা। তিনি কারাভ্যন্তরের অবস্থা জানেন। বললেন, আপনাকে ভিতরে নিয়ে যাওয়া এবং নিরাপদ রাখা বেশ কষ্টসাধ্য হবে।

বিষয়টি এরকম, সর্বত্রই ওদের ভাষায় স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন হয়েছে এবং সকলেই তার সাফল্যের ভাগীদার। জেলখানায় কোন আন্দোলন হয়নি। ওরাই বা বাদ থাকে কেন! আমার আগমনকে কেন্দ্র করে ওরাও কিছুটা বিপ্লবী হবার উদ্যোগ নিতে পারে এবং আমার উপর দিয়েই ওদের সুদীর্ঘ দিনের লালিত ক্রোধের পরিসমাপ্তি হবে।

কারা-বন্দিদের খুব একটা দোষও দেওয়া যায় না। এরশাদ সাহেব সংস্কার করেননি এমন কোন বিভাগ নেই। কিন্তু জেলখানার ব্যাপারে তিনি ছিলেন অনুৎসাহী। ক্যাবিনেটে বহুবার কারা সমস্যা সমাধানের কথা তুলেছি, এর আমূল সংস্কারের জন্য অনতিবিলম্বে 'কারা কমিশন' গঠন করার প্রস্তাব রেখেছি। এও বলেছি, কমিশনের প্রধান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হওয়াই বাঞ্ছনীয়। আমি প্রটোকল ভেঙেও তাতে একজন সদস্য থাকতে সম্মত। কেননা, কারাগারের অভিজ্ঞতা আমার সবচাইতে অধিক।

তিনি প্রথমটায় মনোনিবেশ করেননি। শেষ দিকে এসে একটি ব্যাপক পরিকল্পনার ইঙ্গিত করলেন। ঢাকা শহরের দূরে জেলখানা স্থানান্তর করবেন। বিরাট এলাকা জুড়ে থাকবে কারা-কমপ্লেক্স। লেখাপড়া, খেলাধুলা, কর্মশালা প্রভৃতির মাধ্যমে জেলখানাকে করা হবে আধুনিক সংস্কারাগার। প্রতিটি কয়েদির জন্য বিদ্যুৎ চালিত পাখা ও মশারির ব্যবস্থা থাকবে। থাকবে আধুনিক স্নানাগার ও চিকিৎসা কেন্দ্র।

ভাবলাম, এবার একটা কিছু হবে। তিনি যাতে হাত দেন সাধারণত তাকে সার্থক করে তোলেন। কিন্তু কাজে হাত দেবার পূর্বেই বিদায়ের ঘণ্টা বেজে উঠল। এত বিলম্বে বিষয়টিতে মনোনিবেশ করলেন যে, সময় পাওয়া গেল না!

তাঁকেও দোষ দিয়ে লাভ নেই। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব ছিল এ বিষয়ে তাঁকে উদ্যোগ নিতে সবিশেষ উদ্বুদ্ধ করা। তা করেননি। শুধু তা-ই নয়, রাষ্ট্রপতি জেলখানা পরিদর্শনে এলে কয়েদিরা যে গতানুগতিক সুযোগ ভোগ করে থাকে তার থেকেও তাদেরকে বঞ্চিত করা হয়েছিল। শুনেছি তিনি দু'বার ঢাকা জেলে এসেছেন। কয়েদিরা অনেক প্রত্যাশায় স্লোগান মুখর হয়ে উঠেছিল। তাঁকে কারো সঙ্গে কথা বলার সুযোগ করে দেওয়া হয়নি। কয়েদিরা অনেক করে বলেও কোন সুবিধা করতে পারেনি। এমনকি প্রেসিডেন্ট এলে যে সাধারণ রেমিশন ও ক্ষমা প্রদর্শনের রেওয়াজ চালু রয়েছে তাও তাদের ভাগ্যে জোটেনি। বাচ্চাদের ওয়ার্ডে গিয়ে কয়েকজন শিশু-কিশোরকে মুক্তির নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং মহিলা ওয়ার্ড দেখেছিলেন। সাধারণ কয়েদিদের খোঁজখবরও করেননি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে জিজ্ঞেসও করেছিলেন, ওরা কি জন্য স্লোগান দিচ্ছে? ওদের বক্তব্য কি শোনা যায় না!

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছিল, স্যার, আমি পরে ওসব দেখব, আপনাকে এ নিয়ে ভাবতে হবে না।

ভাবতে হল। তবে তাঁকে নয়, সর্বাগ্রে আমাকেই ভাবতে হচ্ছে। সকলের প্রথম এ কিস্তিতে আমাকেই জেলে আসতে হয়েছে। কী তুফান আমার উপর দিয়ে যায় ভবিতব্যই জানে! ঘন্টি বাজিয়ে অসময়ে সমস্ত কয়েদিদেরকে ঘরে

আবদ্ধ করে ডিআইজি স্বয়ং আমাকে পনেরো সেলে নিয়ে এলেন। সেলের বাইরে এবং আমার কক্ষের সম্মুখে বিশেষ প্রহরার ব্যবস্থা করলেন।

সকালে খাওয়া হয়নি, দ্বিপ্রাহরিক আহারের সময়ও বহুক্ষণ অতিবাহিত। ক্ষুৎপিপাসায় কাতর ছিলাম। পাশের কক্ষের বন্দি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত মিরপুরের কন্ট্রাকটার আবদুল কাদের এগিয়ে এল। বলল, আমি কাদের কন্ট্রাকটর। আমার নাবালক ছেলের সাথে ঝগড়ায় এক সেনা-কর্মকর্তার ভাগনে নিহত হয়। সামরিক বিচারে ছেলের ফাঁসি হয়েছে, আমি ঘটনা পরে শুনেছি, তবু আমার যাবজ্জীবন হয়েছে। এরশাদ সাহেবের নিকট অনেক দরবার করেছিলাম, কাজ হয়নি। আপনার কাছেও লোক গিয়েছিল, চেষ্টাও করেছিলেন, কিন্তু কিছু হয়নি। আজ আমার কোন রাগ নেই। বিশেষ করে আপনি চেষ্টা করায় আপনার উপর রাগের প্রশ্নই আসে না। আমি ঢাকার মানুষ। আপনি ঢাকার একটি চেরাগ। আমি আছি, আপনার কোন ক্ষতি হতে দেব না।

এতগুলো কথা বলে সে দম নিল। আরও বলল, আপনার নিশ্চয়ই খাওয়া হয়নি। আমি ডিম ভেজে আনছি, ভাত রয়েছে, কিছু খেয়ে নেন।

বললাম, নিশ্চয়ই খাব, তার আগে নামাজ পড়ে নিতে চাই।

সে সব ব্যবস্থা করে দিল।

একজন সুদেহী যুবক এসে দাঁড়াল। বলল, স্যার, আমি ওসি বাহার। মুন্সীগঞ্জ শহরে আমার বাড়ি।

সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারলাম। রমনা থানার একসময়ের অফিসার-ইন-চার্জ। আওয়ামী লীগের কর্মী বলে পরিচিত একজন অভিযুক্তের মৃত্যুজনিত কারণে দীর্ঘ কারাদণ্ডে দণ্ডিত। আমার জানা মতে সে অবস্থার শিকার এবং সম্পূর্ণ নির্দোষ। এমন একজন দক্ষ তরুণ পুলিশ কর্মকর্তার এ পরিণতি অতীব করুণ।

বাহার বলল, স্যার, আপনি নিশ্চিন্তে বিশ্রাম নিন। এখানে প্রায় সকলেই আপনাদের বিরুদ্ধবাদী। তবুও, আমার বর্তমানে আপনার কোন অমর্যাদা হবে না।

পনেরো সেলে পনেরো জন ডিভিশনপ্রাপ্ত বন্দি থাকে। কক্ষগুলো খুবই ছোট এবং গুমোট। সম্মুখে জেলখানার সুউচ্চ দেয়ালের কারণে বাতাস প্রবেশ করতে পারে না। পশ্চাতেই রয়েছে নতুন জেল যেখানে ইতিহাসের নিকৃষ্টতম হত্যাকাণ্ড সংগঠিত হয়েছিল।

চার জন জাতীয় নেতাকে সেখানে সামরিক বাহিনীর লোক এসে হত্যা করে যায়। কোনদিন কী কল্পনাও করেছি, যাদের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে সেদিন মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেছিলাম, একদিন তারই কল্পিত ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তুলে আমাদেরকেই গ্রেপ্তার করা হবে! নতুন জেলের

সেই রক্তরঞ্জিত কক্ষটি গিয়ে দেখে এলাম। বক্ষ বিদীর্ণ করে একটি দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে এল। এই চার জন নেতার নেতৃত্বেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ লড়েছিলাম। স্বাধীন দেশের কারাগারে তাদেরকে কী নৃসংশভাবে হত্যা করা হল!

নতুন জেলে একটি বহুল প্রচলিত কথা রয়েছে। একসময় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী ক্যাপ্টেন মনসুর আলী। তাকে যখন গ্রেপ্তার করে এখানে আনা হয়, তিনি নাকি এই কক্ষগুলোর নির্মাণপদ্ধতি দেখে অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন, কোন মানুষ পারে এমন ডিজাইনের ঘর নির্মাণ করতে? কে এইগুলো অনুমোদন করেছিল?

সবিনয় উত্তর এসেছিল, স্যার, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে এর অনুমোদন আপনার হাত দিয়েই হয়েছিল।

তিনি আর প্রশ্ন না করে নিশ্চুপ থাকাই বাঞ্ছনীয় মনে করেন।

পনেরো সেলের বাসিন্দারা একে-একে আমার সঙ্গে পরিচয় এবং আলাপ আলোচনার পর ধীরে ধীরে ওখানকার আবহাওয়া পরিবর্তন হতে লাগল। আলাপ-পরিচয়ের পর অনেকের উপলব্ধি হল হয়ত যতটা শোনা যেত লোকটা তত মন্দ নয়। অদ্ভুত সমস্ত ধারণা এদের মধ্যে বিরাজ করছিল। একজন বলল, আচ্ছা, আপনি স্লিপ দিলেই শুনেছি একটা করে স্টেনগান পাওয়া যেত। এরকম কতগুলো স্লিপ দিয়েছিলেন?

বললাম, আমাদের বিরুদ্ধে লাগামহীন অভিযোগ শুনে বিস্মিত হয়েছি। কিন্তু এরকম দোষারোপ পূর্বে কখনও শুনিনি। আপনি তো মোটামুটি একজন লেখাপড়া জানা ব্যক্তি। আপনিও ভাবছেন আমি স্লিপ দিলেই স্টেনগান ইস্যু হয়ে যাবে! একটা পিস্তল-বন্দুকের জন্য কতটা নিয়ম-নীতি মানতে হয়, কী পরিমাণ তদন্ত অনুষ্ঠিত হয় যদি জানতেন এ কথা বলার পূর্বে শতবার চিন্তা করতেন। আমিও এখন বন্দি। কিছুই করতে পারব না। সরকার তদন্ত করে এ ধরনের কোন ঘটনা যদি পায়; আমাকে রেহাই দেবে?

অনেকেই বুঝে। কেউ কেউ বুঝতে চায় না। বিভিন্ন দণ্ডে দণ্ডিত অপরাধীরা মনে করে আমিই বুঝি তাদের দণ্ডাদেশ কার্যকর করেছি। বুঝিয়ে বলি, যে সরকারই আসুক, দেশে আইন-আদালত থাকবে, অপরাধের বিচার হবে এবং কেউ শাস্তি ভোগ করবে, কেউ খালাস পাবে। একজন মন্ত্রীর সেখানে কোন ভূমিকা থাকে না।

তারা অভিযোগ করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড আপনারা বিশ বছরের স্থলে তিরিশ বছর করেছেন।

বিষয়টি আমি সঠিক অবগত ছিলাম না। যতই বলি এ সম্বন্ধে কিছুই জানি না, তারা সে কথা গ্রহণ করতে চায় না।

তবুও পনেরো সেলের আবহাওয়ার দ্রুত পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল। জেল কর্তৃপক্ষের সজাগদৃষ্টি ছিল যাতে অনাকাঙ্ক্ষিত কেউ এখানে প্রবেশ করে আমার জন্য সমস্যার সৃষ্টি না করে। কাদের সাহেব নামাজি মানুষ। আমাকে এ সম্বন্ধে আরও ওয়াকেফহাল করার চেষ্টা করলেন। চট্টগ্রামের হাফেজ সালেহ্ আহমেদ সাহেব তখন এখানে ছিলেন। তাঁর মতো পরহেজগার, দ্বীনি একজন হাফেজ মানুষ যে কী করে সোনা চালানের মামলায় শাস্তি ভোগ করছেন বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না। তাঁকে জিজ্ঞেস করতে তিনি বললেন, প্রতি বছরই হজ্ব পালন করেন। এ বছর বিমানবন্দরে একজন লোক এসে অনুরোধ করল তার বাচ্চাদের জন্য সামান্য খেজুর পাঠাতে চান—তিনি যদি তা নিয়ে যান! এয়ারপোর্টে লোক আসবে, টেলিফোনে আপনার বর্ণনা দিয়ে দেব—কোন অসুবিধা হবে না। সরল বিশ্বাসে খেজুরের সেই বাক্সসহ ঢাকায় নামতেই পুলিশের লোক আমাকে পাকড়াও করল এবং সে বাক্সে খেজুরের পরিবর্তে সোনা পেল। আমি সব সত্য বললাম, তারপরও সাজা হল। সবই আল্লাহ্‌র ইচ্ছা।

তাঁর মতো একজন সরল, আল্লাহ্‌র রাস্তার মানুষ এবং সকল অবস্থাতেই সন্তুষ্ট-ব্যক্তি খুব কম দেখা যায়। তিনি আমাকে বললেন, স্যার, আপনি আরবি পড়তে পারেন? কোরান শরীফ পড়তে জানেন?

তাঁর কাছে স্বীকার করতে দ্বিধা হল না। বললাম, ছোটবেলায় মামা মৌলবি রেখে যত্ন করে শিক্ষা দিবার চেষ্টা করেছিলেন, কিছু কিছু শিখেছিলামও। এখন সব ভুলে বসেছি।

হাফেজ সাহেব আরবি শিক্ষার প্রাথমিক কেতাব যোগাড় করে আনলেন এবং প্রত্যহ সময় করে আমাকে শিক্ষা দিতে লাগলেন। তাঁর সযত্ন শিক্ষায় স্বল্প সময়ের মধ্যেই আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছায় পবিত্র কোরআন পড়তে সক্ষম হলাম। সেবার সেটাই ছিল আমার বড় সাফল্য।

এরই মধ্যে ঘটে গেল জেল বিদ্রোহ। কয়েদিদের অনেক সমস্যা ছিলই। তাছাড়া খাদ্য, বাসস্থান, চিকিৎসার মান পূর্বের চাইতে ক্রমাবনতি ঘটেছে। যাবজ্জীবন সাজার মেয়াদ বিশ বছর থেকে তিরিশে উন্নীত হয়েছে। জেলখানায় কোন উন্নতি দূরের কথা, সার্বিক অবনতিই দৃষ্ট হয়। '৫২ সাল

থেকে জেলখাটার অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ আমি। জেলে এত করুণ অবস্থা কখনও পূর্ব দেখিনি। প্রকারান্তে নিজেকেও পরোক্ষভাবে কিছুটা দায়ী মনে হয়। ক্ষমতার মসনদে বসলে জেলের কথা প্রায় সকলেই ভুলে যায়। শেখ সাহেবও ভুলে গিয়েছিলেন। আমিও সে দলে, যদিও বিবেকের নিকট আমি নির্দোষ। কেননা, কারা-সমস্যা নিয়ে আন্তরিক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছি।

কয়েদিরা অনেক দেন-দরবার করেছে। কিন্তু সাজাপ্রাপ্ত মানুষকে খুব কম লোকই গুরুত্ব দিয়ে থাকে। যে লোক আইনের চোখে দোষী সাব্যস্ত হয়, সমস্ত দুনিয়া তার থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়। ওদের কথায় কেউ তেমন কর্ণপাত করল না। বাধ্য হয়ে ওরা যা করল তাকে সোজা ভাষায় 'জেল-বিদ্রোহ' ব্যতীত আর কিছুই বলা চলে না। ওরা মারপিট করে কারারক্ষীদের জেলের অভ্যন্তর থেকে বের করে দিয়ে নিজেরা জেলের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করল।

সারা জীবন জেল খেটেছি কিন্তু এ অবস্থা কখনও দেখিনি। ভয়ে আমার অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল। জেলখানার তালা এক একটা দেখবার বস্তু। যেমনি প্রকাণ্ড, তেমনি মজবুত। নিমেষের মধ্যে সমস্ত তালা ভেঙে ফেলা হল। যত সেল আছে, যত ওয়ার্ড আছে সমস্ত তালা ভেঙে ওরা সদর্পে বেরিয়ে পড়ল। জেলের অভ্যন্তরে ওরা আর বাইরে কারারক্ষী ও কর্মকর্তাগণ। ফাঁসির সেল থেকে রীমা হত্যা মামলার আসামি মুনীরও বের হয়ে এসে ডাণ্ডা ঘুরাতে শুরু করেছিল। কিন্তু অন্য কয়েদিরা তাকে ধরে আবার ফাঁসির কক্ষে তালা মেরে রেখে এল। একমাত্র তার বেলাতেই আপস নেই। একটি তালাই সেদিন ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে আটকান ছিল।

মার খেয়ে কারারক্ষীরা জেলের চতুর্দিকে অবস্থান গ্রহণ করল। পার্শ্ববর্তী বাড়িসমূহের ছাদে তারা অস্ত্রসহ অবস্থান নিল। একদিকে জেলখানার নিয়ন্ত্রণ, অন্যদিকে সমস্ত কয়েদিদের আয়ত্তে রাখা, দাবিসমূহ প্রস্তুত করা, প্রয়োজনে সরকার বা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করার জন্য কয়েদিগণ কমিটি গঠন করল।

কিন্তু বিদ্রোহ মানে বিদ্রোহ এবং সে বিদ্রোহ সমাজের, অপরাধ জগতের চিহ্নিত দিকপালদের। কমিটির তারা ধার ধারে না। তাদের মস্তিষ্কে কত কি যে বিচরণ করছে! অনেকেরই আশু কর্তব্য হয়ে দাঁড়াল 'স্বৈরাচারের দোসরটা'কে অবিলম্বে খতম করে দেওয়া। সকলেই এ কাজটি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সমাধা করতে চায়। দা, বঁটি, কুড়াল, খন্তা, হাতুড়ি যে যা পেয়েছে সংগ্রহ করে ধেয়ে আসছে পনেরো সেলের দিকে আমাকে খতম করার জন্য।

সতেরো দিন স্থায়ী ছিল এই বিদ্রোহ। সতেরোটি দিন মনে হয়েছে সতেরো বছর। একটি ক্ষীণ সুতায় একটি অতি ধারাল তরবারি যদি সর্বদা

বুকের উপর ঝুলতে থাকে, সে ব্যক্তির যা অবস্থা আমারও তা-ই হল। না বলতে পারলাম না। সতেরো দিন প্রতি মুহূর্ত মৃত্যুর সাথে লড়েছি। বেঁচে গেলাম কী করে? রাখে আল্লাহ্ মারে কে!

একদল এগিয়ে আসছে, এক্ষুণি আঘাত এসে পড়বে। কেউ এসে বাঁধা দিল, এখন থাক। দিনের বেলায় প্রয়োজন নেই। পালাবে কোথায়? রাতের অন্ধকারেই সুবিধা হবে। বলে-কয়ে কেউ তাদের তখনকার মতো নিবৃত্ত করল। সবই শুনতে পাচ্ছি। গায়ের প্রতিটি লোম দাঁড়িয়ে আছে।

আর এক গ্রুপ নাচতে নাচতে এগিয়ে আসছে, বেটাকে শেষ করে দিয়ে আসি। বাধ সাধল বাইরের ছাদের উপর অবস্থিত কারা-পুলিশ। ওরা গুলি ছুঁড়লো আমার সেল বরাবর। কয়েকজন পড়ে গেল। কেউ বলে একজন নিহতও হয়েছে গুলিবর্ষণে।

অন্য এক পার্টি এগিয়ে আসছে, এবার বাছাধন যাবে কোথায়! তোমাকে বাঁচাতে কেউ নেই! দেখা গেল আছে। হাফেজ সাহেবকে সকলেই মান্য করে। অতি পাষণ্ডও তাঁকে হুজুর বলে ডাকে। সে সম্মুখে এসে দাঁড়াল। বলল, বাবারা, মানুষ মারা ঠিক নয়। তিনি একজন বড় দরের মানুষ, তাঁকে মারলে তার ধাক্কা সামলাতে পারবে না। তোমাদের সবকিছু ভেস্তে যাবে। আমার কথা শোন, তাকে মেরো না।

ওদের মনে সাময়িক রহম আসে। সে যাত্রা রেহাই পাই। কেউ আমার কামরার সামনে এসে গালি দিয়ে দাঁড়ালেই বাহার একটি মস্ত বড় দা নিয়ে ব্যাঘ্রের মতো গর্জন করে রুখে দাঁড়ায়, দেখ, আমি ওসি বাহার। স্যারকে মারার আগে আমাকে মারতে হবে। আর আমাকে মারতে গিয়ে তোদের পাঁচ-সাত জন শেষ হবে মনে রাখিস।

সেলের অন্যান্য সহবন্দিরাও সহানুভূতিশীল হয়ে উঠল। তারাও এগিয়ে এল। বাহার সকলকে নিয়ে চব্বিশ ঘণ্টা সতর্ক প্রহরার ব্যবস্থা করল। মরতে মরতে বেঁচে গেলাম।

দু'-একদিন গুদামে যা সঞ্চিত ছিল তা সাবাড় করার পর শুরু হল অনশন। ঘরে সামান্য বিস্কিট ছিল তাও শেষ হল। সকলের সঙ্গে উপবাস করা ছাড়া আর গত্যন্তর রইল না। মাঝে মাঝে দেয়ালের উপর দিয়ে দু'-এক টুকরা রুটি কেউ ছুঁড়ে দেয় বা গামছায় চিড়া-গুড় বেঁধে ছুঁড়ে দেয়। সকলে তা ভাগ করে খেয়ে জীবন বাঁচাবার চেষ্টা করি। ইটের ভাঙা টুকরোয় বাঁধা দু'-একটি কাগজও হাতে এসে যায়। তাতে লিখা রয়েছে, 'স্বৈরাচারের দোসরটাকে এখনও বাঁচিয়ে রেখেছ? ওকে শেষ করে দাও।' চিরকুট পড়ি আর শিউরে উঠি। ভিতরে-বাইরে যার এত শত্রু তাকে আল্লাহ্ ব্যতীত আর বাঁচাবে কে!

একটি ছোট ঘটনায় জেলখানায় আমার অবস্থার আমূল পরিবর্তন হয়ে গেল। ঢাকা জেলা প্রশাসন ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা কয়েদিদের সঙ্গে জেল গেটে এসে যোগাযোগ করেছে। ওরা কথা বলতে চায়। কয়েদিরাও তাদের সঙ্গে কথা বলতে সম্মত হয়েছে। অস্ত্রশস্ত্র বাইরে রেখে তারা কয়েকজন ভিতরে আসতে পারে। এমনি একটি প্রতিনিধি দল জেলের অভ্যন্তরে এসে আমাকেও দেখতে এল। আমার অবস্থা দেখে ওদেরও কষ্ট হল।

ওরা বলল, আপনি তো কয়েদিদের পর্যায়ভুক্ত নন। এদের ধর্মঘটে বা বিদ্রোহে আপনার তো কোন ভূমিকা থাকতে পারে না।

কয়েদিদের প্রতিনিধিরাও বলল, না, ওনার সাথে এ আন্দোলনের কোন সম্পর্ক নেই।

সরকারি কর্মকর্তাগণ তখন বলল, ওনাকে যদি বাইরের খাবার পাঠাই তোমরা কী আপত্তি করবে?

ওরা বলল, না, আমাদের আপত্তি নেই।

আমি তখন বললাম, আমার আপত্তি আছে। পনেরো জন মানুষ থাকে এই সেলে। আমি একা খাব আর ওরা তাকিয়ে দেখবে?

তারা বলল, স্যার, আমরা এভাবে খাবার দেব যাতে আপনি অন্যদের নিয়ে খেতে পারেন। আমরা শেরাটনের সঙ্গে বন্দোবস্ত করব।

বললাম, না, তা হয় না। এদের সকলের মতো আজ আমিও বন্দি। এরা সকলে দিনের পর দিন না খেয়ে থাকবে আর আমি ভালো ভালো খাবার খাব তা হয় না। আপনারা যদি আমার পরামর্শ নেন, তা হলে এদের সমস্যাগুলো সমাধান করুন। এদের দাবি মিটিয়ে দেন।

কে একজন বলে উঠল, স্যার, ক্ষমতায় থাকার সময় এ কথা বলেননি।

বললাম, ঠিকই বলেছেন। এ কথা বলিনি। তাই আজ আমার অবস্থান জেলখানায়। আপনাদের যেন তা না হয়। তাছাড়া এ ধরনের বিদ্রোহ কেউ কখনও দেখেনি। আপনাদের উচিত অতীতের ব্যর্থতা না ঘেঁটে ভবিষ্যতের সফলতার জন্য চেষ্টা করা।

আমার কথাগুলো বিদ্যুতের মতো সারা জেলখানায় ছড়িয়ে পড়ল। ওদের কারণে মস্ত হোটেলের খানা প্রত্যাখ্যান করেছি শুনে ওরা যারপরনাই আনন্দিত। যারা মারতে আসত, তারাই ক্ষমা ভিক্ষা করতে এল। মুহূর্তে আমি জেলখানায় সর্ববাদীসম্মত শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিতে পরিণত হলাম।

সরকারি কর্মকর্তাগণ ওদের সঙ্গে সমঝোতায় পৌঁছবার চেষ্টা করল। একসময় কথায় অমিল দেখা দেওয়ায় কয়েদিদের কয়েকজন বলে উঠল, কী, দাবি মানবেন না! দেখি কীভাবে না মেনে পারেন। এই বলে পূর্ব থেকে

সংগৃহীত কেরোসিন গায়ে ঢেলে নিজেদের শরীরে আগুন লাগিয়ে দিল। মুহূর্তে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে ওদের চার-পাঁচ জনকে অঙ্গার বানিয়ে দিল। মানুষ এভাবে স্বেচ্ছায় আত্মাহুতি দিতে পারে, না-দেখলে কেউ বিশ্বাস করবে না।

কর্মকর্তাগণ ভয়ে-বিস্ময়ে স্থান ছেড়ে পালাল। তারা ঐকান্তিক প্রচেষ্টা চালাল যাতে কারাগারের বন্দিদের দাবিগুলো মেনে নেওয়া হয়। জেলাখানায় কয়েদিদের দিকে তাকান যায় না। সব খেয়ে শেষ। গাছের পাতা, শিকড়-বাকড়, বিড়ালের মাংস সবই ওরা শেষ করেছে। জঠর-জ্বালা সহ্য করা খুবই কঠিন।

হুজুরকে কেউ বাইরে থেকে একটা পরোটা ও একটা ডিম ভাজা এনে দিয়েছে। সে তা না খেয়ে আমার জন্য নিয়ে এসেছে।

বলল, স্যার, আমি মোল্লা মানুষ, অনেক রোজায় অভ্যস্ত। আপনি এটুকু খান।

আমার দেহরক্ষীর ছোট ভাই মেট্রোপলিটান পুলিশে কাজ করত। জেলের ভিতরে আসার সুযোগে সে আন্ডারওয়ারের ভিতরে ছোট একটি রুটি লুকিয়ে এনেছে। রক্ষীরা ঢোকার সময় সার্চ করে। বলেছে তার একশিরা রোগ রয়েছে। সেই রুটি বের করে দিয়ে সে হাউ মাউ করে কেঁদে ফেলেছে। তাকে সান্ত্বনা দিয়ে সেই রুটিই এক-এক টুকরা করে ভাগ করে কয়েকজন খেয়েছি।

না খেয়ে জেল হাসপাতালের রোগীদের অবস্থা করুণ। ডাক্তারদের পরামর্শে তখন কমিটি অনুমোদন দিল, দিনে বড় চামচের এক চামচ করে নরম খিচুড়ি রোগীদের পরিবেশন করা হবে। রোগীদের তালিকায় আমাকেও রাখা হল। আমারও বরাদ্দ এক চামচ খিচুড়ি। সেটাই দু'ভাগ করে সকালে-বিকালে অমৃত মনে করে খেয়ে জীবন রক্ষা করি। সারা জেলখানার সহানুভূতি তখন আমার করায়ত্ত। সতেরো দিন অতিবাহিত হলে কর্তৃপক্ষ দাবি মেনে নিল।

বিদ্রোহের অবসান হল। কয়েদিদের বহুবিধ দাবি গৃহীত হল। মূলত দীর্ঘ মেয়াদীদের সাজা মওকুফের ব্যবস্থা হল। দলে দলে কয়েদি মুক্তি পেতে লাগল। পনেরো সেলেরও অধিকাংশই ছাড়া পেল। বাহার, কাদের ভাই ওরা সবাই মুক্তি পেয়ে গেল। জেলখানায় আবার মিয়া সাহেবদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হল।

দুঃখের বিষয় সরকার কী কারণে শামসুর রহমান সাহেবকে সাময়িক বরখাস্ত করল। আমার বিপদের দিনে সে পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল, তাকে আর দেখতে পাইনি। পরে শুনেছি অকালে-অসময়ে তার মৃত্যু হয়েছে।

এরশাদ সাহেবকে সেনাভবন থেকে স্থানান্তরিত করে গুলশানেই একটি বাড়িকে সাময়িকভাবে সাব-জেল বানিয়ে সপরিবারে সেখানে রাখা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে একটার পর একটা মামলা দায়ের হতে লাগল। তাঁর স্ত্রীর নামেও মামলা হল। অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দিন সাহেব সুবিচার করতে ব্যর্থ হলেন। সাধারণ নির্বাচন ঘনিয়ে এল। ইতিমধ্যে মওদুদ আহমেদ, জাফর ইমাম, রুহুল আমিন হাওলাদার, শেখ শহিদ, কাজী ফিরোজ, মাহমুদুল হাসান প্রমুখ সাবেক মন্ত্রীরা একে-একে এসে পনেরো সেলে জুটল। এদের মধ্যে মওদুদ, জাফর ইমাম, রুহুল আমিন ও মাহমুদুল হাসান নির্বাচনে দাঁড়িয়েছে।

আমি প্রথম মনোনয়নপত্র সই করেছিলাম। পরে তা প্রত্যাহার করে নিই। ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহেই জেলে প্রবেশ করি, কিছুই ব্যবস্থা করে আসতে পারিনি।

এরশাদ সাহেব রংপুরের পাঁচটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। তাঁর মনোনয়নপত্র ডিসি গ্রহণ করতে অসম্মত হওয়ায় রংপুরের সকল মানুষ রাস্তায় নেমে এসে তার প্রতিবাদ করেছিল। তাঁর নির্বাচনের কাজ মনোনয়ন দাখিলের দিনই জনগণ স্বতস্ফূর্তভাবে সুসম্পন্ন করে দিয়েছিল। সেদিন শরফুদ্দীন আহমেদ ঝন্টুসহ স্থানীয় জাতীয় পার্টির কর্মীদের অবদান ছিল সমধিক।

নির্বাচনের ফলাফল জাতীয় পার্টির বিপক্ষে যাবে এটাই স্বাভাবিক। তবুও এরশাদ সাহেব পাঁচটি আসনেই জয় লাভ করলেন এবং জাতীয় পার্টি পঁয়ত্রিশটি আসন লাভ করে সংসদে তৃতীয় স্থান লাভ করল। মওদুদ দুই আসনে দাঁড়িয়ে এক আসনে উত্তীর্ণ হল। মাহমুদুল হাসানও জয়ী হল। জাফর ইমাম ও রুহুল আমিন হাওলাদার অধিকতর আশাবাদী ছিল। তারা সফল হতে পারল না।

এরশাদ সাহেবসহ আমরা গ্রেপ্তার হওয়ার পর পার্টির কাজ চালাবার নেতৃত্ব স্থানীয় কর্মীরা বয়োজ্যেষ্ঠ মিজানুর রহমান চৌধুরীর নিকট গিয়ে তাঁকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করেছিল দলের নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য। কর্মীদের অনুরোধ শুনে সে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল। রাগান্বিত অভিমত ব্যক্ত করেছিল, এরশাদের

কথা বা তাঁর পার্টির নাম আমার বাড়িতে উচ্চারণ করো না। জ্বেনাকারী মিথ্যাবাদীর দল আমি আর করব না। যারা এরশাদের নাম নেবে আমার বাড়িতে তাদের প্রবেশ নিষেধ।

কর্মীরা তখন অন্য রাস্তা নিল। যে রোগের যে ওষুধ। তারা নিউইয়র্কে এরশাদ সাহেবের শ্যালক জনাব মহিউদ্দীনের সাথে যোগাযোগ করল। মহিউদ্দীন সাহেব জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি হিসাবে এতদিন কর্মরত ছিলেন। তিনি সেখান থেকে টেলিফোন করলেন মিজান সাহেবকে। বললেন, আপনি দলের দায়িত্ব গ্রহণ করুন, অর্থের অসুবিধা হবে না। যখন যা প্রয়োজন আপনার নিকট পৌঁছে যাবে।

ওষুধে কাজ হল। সে সোজা হয়ে দণ্ডায়মান হল। হাঁক-ডাক শুরু হয়ে গেল, কে কোথায় আছে, সবাইকে খবর দাও। এরশাদ বা অন্য নেতারা জেলে আছে বলে দল নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকতে পারে না!

এই হল বয়োজ্যেষ্ঠ নেতার দলের কাণ্ডারী বনার গোপন তথ্য। যেখানে অর্থের প্রলোভন রয়েছে সেখানে তিনি সরগরম। রাজনীতির প্রতিটি পদক্ষেপ তার বিবেচনায় অর্থকরী না হলে অগ্রহণীয়। নির্বাচন উপলক্ষে তার নিকট যে অর্থ পৌঁছেছিল তার সামান্যই সদ্ব্যবহার হয়েছে বলে কর্মীরা সন্দেহ করে। প্রার্থীদেরকে একটা নির্দিষ্ট অঙ্ক প্রদানের নির্দেশ ছিল। তারা অনেকেই কিছু পায়নি। যারা সামান্য পেয়েছে, তাও বহু দেন-দরবারের পর বহু কাঠখড় পুড়িয়ে নিম্নস্থ অনেককে সন্তুষ্ট করে।

এ সম্বন্ধে আমাদের বিশিষ্ট কর্মী অধ্যাপক দেলোয়ারের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। সে ছিল সমগ্র জীবন মিজান সাহেবের একজন একনিষ্ঠ কর্মী ও ব্যক্তিগত ভক্ত। তার বাড়িও চাঁদপুরে। তাকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে এবং স্বাভাবিকভাবেই সে আশা করেছিল তার জন্য বরাদ্দ অর্থ সে ঠিকভাবেই পাবে। টাকার জন্য সে নির্বাচনের কাজ চালাতে পারছিল না। সে গিয়ে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান সাহেবকে তার আর্থিক অসুবিধার কথা নিবেদন করল। সব শুনে মিজান সাহেব বললেন, তোমার নির্বাচনে আমার সহায়তা করা খুবই উচিত, কিন্তু আমার অবস্থা তোমারই মতো। টাকার অভাবে আমার নিজের নির্বাচনের ব্যয় বহন করতে পারছি না।

দেলোয়ারের আন্তরিক সহানুভূতি হল নেতার জন্য। তার মনে হল, তার নির্বাচনের যা-ই হোক না কেন, নেতার নির্বাচন অর্থের অভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে এটা কোনভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। সামর্থ্য থাকলে সে নেতার জন্য কিছু অর্থের যোগান দিত। নিজের অক্ষমতা চিন্তা করতে করতে সে মিজান সাহেবের ঘর থেকে বেরিয়ে এল। তখন মিজান সাহেবের খাস বেয়ারা তাকে জিজ্ঞেস করল, নেতা আপনাকে কত দিল?

দেলোয়ার তাকে বলল, নেতারই অবস্থা শোচনীয়, অর্থের অভাব। কোথা থেকে আমাকে দেবে?

খাস বেয়ারার বাড়িও চাঁদপুরে। দেলোয়ারকে সে ভালো জানে। বলল, আখেরাতে আপনার নেতার জায়গা কোথায় হবে জানি না! এই মুহূর্তে আমার কাছেই তার গচ্ছিত রয়েছে প্রায় তিন কোটি টাকা!

দেলোয়ার স্তম্ভিত। সেদিন সে প্রতিজ্ঞা করল, আর কোনদিন সে মিজান সাহেবের মুখ দর্শন করবে না। করেওনি।

আমাদের বহু প্রার্থীর অভিযোগ ছিল তারা অর্থ পায়নি। যা পেয়েছে তাও কয়েকবারে। ঢাকা আসা-যাওয়ায় সময় নষ্ট। যা দেওয়া হয় আসা-যাওয়ার খরচ ওঠাই ভার। তদুপরি ওখানে বিভিন্ন জনকে দর্শনী বা সালামি না দিয়ে আসা অসম্ভব। এমনকি দলীয় পোস্টার পর্যন্ত টাকা দিয়ে নিতে হয়েছে। সাকুল্যে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে একটা অপরাধী চক্র বেশ দু'পয়সা কামিয়ে নিয়েছে দলের ভবিষ্যতকে জলাঞ্জলি দিয়ে।

মিজান সাহেব নিজেকে দলের বিপদ-দিনের কাণ্ডারী ভাবেন। খোশামদকারীরা সেভাবেই তাঁর চিত্রায়ন করে থাকে। বাস্তবে তিনি পয়সা ব্যতীত অন্যকিছু বুঝেন না, কখনও বুঝেননি। তা না হলে জাতীয় পার্টি সে নির্বাচনে আরও সফলতা অর্জন করতে পারত। আমি জেল থেকে বের হয়ে এলে প্রায় প্রতিটি কর্মী এবং নেতা একই অভিযোগ করেছিল।

আমার আটকাদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে রিট করা হয়েছিল। বিকালবেলা সেলের বাইরে দাঁড়িয়ে আছি। মওদুদ হন্তদন্ত হয়ে ফিরে এল। সে গিয়েছিল তার নির্ধারিত দেখায়। সে চিৎকার করে বলল, মহাসচিব খালাস। তার মুক্তির নির্দেশ এসে গিয়েছে।

দৌড়ে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে সে আনন্দ প্রকাশ করল। অন্যরাও তাতে যোগ দিল।

শহীদ বলল, যাক, খালাসের সূত্রপাত শুরু হল।

ফিরোজ বলল, মোয়াজ্জেম ভাই ঢুকেছিল সর্বাগ্রে, বের হচ্ছেন সকলের প্রথম।

তিন মাস পার হয়নি এবার, হাইকোর্টের আদেশে মুক্তি সহসাই এসে গেল।

কিছু কর্মী হাইকোর্টে খবর পেয়েছিল, তারা এসে সগৌরবে আমাকে জেল থেকে নিয়ে গেল। সরাসরি পার্টি অফিসে গেলাম। ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বা অন্য নেতৃবৃন্দ কেউ তখন ছিল না। আমি কোথায় উঠব এটা চিন্তার বিষয়। সরকারি বাড়ি ছেড়েছি পদত্যাগের দিন। গুলশানে নিজের বাড়ি ভাড়া দেওয়া রয়েছে বিদেশীদের কাছে। শেষ পর্যন্ত মামাত ভাইদের ওখানেই

উঠতে হল। আউয়াল জেল গেট থেকে সাথে আছে। সে আমাকে তাদের বাসায় নিয়ে গেল। সালেহা এবং দিনাও সেখানে এসে পৌঁছল। মিজান সাহেবসহ প্রায় সব নেতাই সেখানে এসে আমার শারীরিক অবস্থা দেখে চিন্তিত হল।

বললাম, এবার কারাগারে 'জেল-বিদ্রোহ' আমাকে পেয়ে বসেছিল। বেঁচে যে ফিরে এসেছি, সেটাই পরম করুণাময়ের একান্ত অনুগ্রহ।

ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব এ.বি.এম. শাহ্জাহান এসে দায়িত্ব বুঝে নিতে অনুরোধ জানাল। তাকে আরও কিছুদিন কাজ চালাবার অনুরোধ করলাম। একটু গা ঝাড়া দিয়ে উঠে নিই।

সালেহার কাছে শুনলাম তারই গড়া লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল থেকে তাকে বরখাস্ত করা হয়েছে। অপরাধ সে স্বৈরাচারের দোসরের সহধর্মিণী।

আমি তো জানি কী নিষ্ঠায় সে বন্ধ হয়ে যাওয়া এই বিদ্যালয়টিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছে। তার পুত্র-কন্যা-স্বামীর চাইতেও বেশি প্রিয় ছিল এই স্কুল। জীবনের বিশটি বছর অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবায় যে বিরাট প্রতিষ্ঠান সে গড়ে তুলল, রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাকেও সেখান থেকে বিদায় নিতে হল কতকগুলো মিথ্যা, ভিত্তিহীন ও বানোয়াট অভিযোগের মুখে। যা ছিল তার স্বপ্ন ও ধ্যান, সেই বিদ্যাপীঠ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ও মানসিকভাবে ম্রিয়মাণ।

নিজের গুলশানের বাড়িতেই পাকাপাকিভাবে উঠে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। ভাড়াটেদের বুঝিয়ে বলতেই তারা বাড়ি ছেড়ে দিল। আসবাবপত্রহীন বাড়িতে ফ্লোরেই রাত্রি যাপন করে নিজ বাড়িতে থাকার সুখ অনুভব করলাম।

আমাদের সরকারের বিরুদ্ধে তিন জোটের আন্দোলনের ফলে আমাদেরকে কেবল রাজনৈতিকভাবেই মূল্য দিতে হল তা নয়, ব্যক্তিগতভাবে আমাকে মূল্য দিতে হল সর্বাধিক। প্রথমত, জেল খেটে এলাম। সেখানে এবার যেভাবে জীবন রক্ষা হয়েছে তা একমাত্র আল্লাহ্ই জানেন। দ্বিতীয়ত, আমার অনেকদিনের ইচ্ছার বাস্তবরূপ দিয়েছিলাম একটি দৈনিক খবরের কাগজ প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে। দৈনিক পত্রিকা নাম দিয়ে সেটি প্রকাশনার দায়িত্ব দিয়েছিলাম মিয়া মুসা হোসেনকে। আমার অনেক বন্ধুকে এই পত্রিকার সঙ্গে সম্পৃক্ত করে একটি উল্লেখযোগ্য অর্থের ব্যবস্থা করেছিলাম। নতুন যন্ত্রপাতি ক্রয় করে সেটিকে পূর্ণাঙ্গ করার চেষ্টা চলছিল। আমাদের পদত্যাগের পর শুনেছি পত্রিকাটির কার্যালয় আক্রান্ত হয় এবং তার সবকিছু পুড়িয়ে ভেঙে তছনছ করে দেওয়া হয়। তৃতীয়ত, আমার স্ত্রীর শিক্ষাক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদানের কারণে রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃতির কথা মানুষজন বলাবলি করছিল। কোন কোন সামাজিক, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান

তার অবদানের স্বীকৃতি দেওয়া শুরু করেছিল, ঠিক সেই সময় তাকে সম্পূর্ণ মিথ্যা অভিযোগ তুলে তার সাধনার পাদপীঠ থেকে তাকে বের করে দেওয়া হল। আমার মনে হয় না এ রকম ত্রিধারায় অন্য কোন পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

স্বাস্থ্য কিছুটা ঠিক হয়ে আসতেই মহাসচিবের দায়িত্বভাব বুঝে নিলাম। শুরু হল এক নতুন অধ্যায়।

বিএনপি সর্বাধিক আসন পেয়েও সরকার গঠনে সক্ষম হচ্ছিল না। জামায়াতে ইসলামীর উনিশ জন সদস্যের সমর্থন নিয়ে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করল। মহিলা সংরক্ষিত আসনের দুটি জামায়াতে ইসলামীকে প্রদান করে আটাশটি আসন নিয়ে তারা ক্ষমতার আসনে জাঁকিয়ে বসল। বেগম খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রী হলেন এবং প্রথম কাজটি করলেন এরশাদ সাহেবকে গুলশান সাব-জেল থেকে স্থানান্তর করে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে প্রেরণ করে।

এরশাদ সাহেবকে কেন্দ্রীয় কারাগারে স্থানান্তরের বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী এবং বিরোধী দলের নেত্রী উভয়েই একমত হলেন। বিরোধী দলের নেত্রী হাসিনা ওয়াজেদ বলল, তার হাতে ক্ষমতা থাকলে অবিলম্বে এরশাদকে জেলখানায় প্রেরণ করত। প্রধানমন্ত্রী কোমরে আঁচল জড়িয়ে সে দাবির প্রতিধ্বনি করে ঘোষণা দিলেন, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তিনি এরশাদকে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে প্রেরণ করবেন।

করলেনও তা-ই। বেগম এরশাদকে গুলশান সাব-জেলে রেখে এরশাদ সাহেবকে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে স্থানান্তর করা হল। জেলে স্থানান্তর করেই তারা ক্ষান্ত হয়নি। একটির পর একটি দুর্নীতি মামলা দায়ের হতে শুরু হল তাঁর বিরুদ্ধে। ঢাকা সেন্ট্রাল জেলের পুরনো হাজত স্থানটিকে শুধু এরশাদ সাহেবের জন্য জেলের ভিতরে আর এক জেল তৈরি করা হল।

জেলখানার পুরাতন বাসিন্দা আমি। জানি কারাগারের একাকিত্বই সর্বাপেক্ষা দুরূহ। একসঙ্গে কয়েকজন থাকলে জেলজীবন অনেকটা সহজতর হয়। এরশাদ সাহেবকে রাখা হল সম্পূর্ণরূপে একা। প্রহরীদের উপর কড়া নির্দেশ ছিল কেউ তাঁর সাথে কথা বলবে না।

তাঁর সাক্ষাৎ বিশেষ ব্যবস্থাধীনে আয়োজন করা হত। সাক্ষাৎকার সহজে

হতই না। হলেও সাক্ষাৎকারীরা একটা কাচের আবরণের এক পাশ থেকে একটি টেলিফোনের মাধ্যমে তাঁর সাথে কথা বলত। তাঁর ঘরের চারদিকে এভাবে ওয়ার্নিং সিস্টেম চালু করা হল যাতে নির্দিষ্ট রেখা পার হলেই বেল বেজে উঠত। কারাভ্যন্তরে এ ধরনের ব্যবস্থা কেউ কখনও দেখেনি। শোনা গেল এরশাদ সাহেবের ঘরে ক্লোজ সার্কিট টেলিভিশন বসানো হয়েছে। সে কী করে না-করে সবসময় মনিটর করা যায়। সে টেলিভিশন নাকি টয়লেট পর্যন্ত বিস্তৃত।

অবাক হয়ে ভাবি, একি দুরপনেয় ব্যবহার! গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আইনানুযায়ী তার সব ব্যবস্থা হবে। কিন্তু বিএনপি সরকার এরশাদের বিষয়ে নতুন কানুন তৈরি করল। তখন প্রায়ই বক্তৃতায় বলতাম, একদিন না একদিন এরশাদ সাহেব জেল থেকে বের হবেনই। ক্ষমতার আসনেও কেউ চিরস্থায়ী নয়। একদিন যদি বেগম জিয়াকেই এরশাদের স্থানে যেতে হয় এবং তখন যদি ক্যামেরা চালু হয়ে যায় তা হলে তখন কেমন হবে বল তো সজনি? কথায় আছে, পরের জন্য কুয়া খুঁড়লে সে কুয়ায় নিজেই পড়তে হয়। একটা নিকৃষ্ট নজির স্থাপন করল বিএনপি। একজন সাবেক সরকার প্রধানের সঙ্গে এ ধরনের আচরণ অত্যন্ত ন্যক্কারজনক।

বিএনপি এবং অন্যান্য সকলেই দাবি করে তারা গণতান্ত্রিক শক্তি। সকলেই গণতন্ত্র ও সংবিধানকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে আগ্রহী। কথায় তারা অতি পারদর্শী। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তারা গণতান্ত্রিক হতে পারে অন্য সমস্ত দল এবং লোকের জন্য। জাতীয় পার্টি ও তার নেতা-কর্মীদের ক্ষেত্রে তাদেরকে অগণতান্ত্রিক বললে কম বলা হয়। তারা এক্ষেত্রে মহাস্বৈরাচার। সকলে সভা-সমাবেশ করতে পারবে, কেবল জাতীয় পার্টিকে তা করতে দেওয়া হবে না। জাতীয় পার্টিকে বেআইনী ঘোষণা করা হয়নি এবং সংসদে সেটি তৃতীয় বৃহত্তম দল। কিন্তু তাকে স্বাভাবিক সভা-সমাবেশ করতে দেওয়া হবে না। ফ্যাসীবাদের কথা মুখেই শুনেছি, এবার প্রত্যক্ষ করলাম ফ্যাসীবাদ কাকে বলে! সভা করার লিখিত অনুমতি পেয়েও সভা করতে গিয়ে দেখেছি হাতে অস্ত্র নিয়ে বিএনপি'র কর্মীরা এবং পুলিশ একসঙ্গে আমাদের সভা ভেঙে দিয়েছে। পুলিশ দাঁড়িয়ে থেকে বিএনপি কর্মীদের দিয়ে বোমাবাজি, ককটেল নিক্ষেপ, রাইফেল-বন্দুকের গোলাগুলি, মঞ্চে অগ্নিসংযোগ এসব ছিল প্রায় প্রতিদিনের কাজ। ওরা সরকারিভাবে সর্বোচ্চ মহলে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল জাতীয় পার্টিকে স্বাভাবিক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড করতে দেবে না। তাদের হিসাব ছিল পরিষ্কার। ভবিষ্যতে মুসলিম জাতীয়তাবাদী ভোট বিএনপি ও জাতীয় পার্টির মধ্যে বিভক্ত হয়ে গেলে আওয়ামী লীগের সহজ জয় নিশ্চিত। তাই যে প্রকারেই হোক, জাতীয় পার্টিকে মাঠ থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে। সর্ব প্রকার নির্যাতন, নিপীড়ন

চালিয়ে, অস্ত্রবাজি করে গায়ের জোরে জাতীয় পার্টিকে ঘরে তুলে দিতে পারলে তাদের সুবিধা। সেভাবেই তারা ভবিষ্যত রাজনীতির পরিকল্পনা প্রণয়ন করে। শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে এই দলটিকে মানুষের নিকট পৌঁছতে দেওয়া হবে না।

একদিকে এরশাদ সাহেবকে সম্পূর্ণ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিতে হবে, অন্যদিকে দলটিকে আটকে দিতে হবে। জনগণের নিকট পৌঁছবার সকল পথ রুদ্ধ করে দিতে হবে। এ ধরনের অপপ্রচেষ্টা কোনদিনই শেষ পর্যন্ত সফলতায় পর্যবসিত হয় না। সরকারি সকল সতর্কতা সত্ত্বেও এরশাদ সাহেব 'চিরকুটের' মাধ্যমে জেল থেকে সবচাইতে বেশি যোগাযোগ করেছেন। অন্য কোন বিষয় বিবেচনায় না নিলেও, কেবলমাত্র জেলখানা থেকে গোপন যোগাযোগের ক্ষেত্রে এরশাদ সাহেব এক নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করেছেন। এ বিষয়ে 'গিনিস বুক' তাঁর নাম উল্লেখ করবে কিনা জানি না!

জনগণের সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিএনপি সরকার প্রাথমিকভাবে পশু-শক্তি প্রয়োগে কিছুটা সাফল্য লাভ করলেও অনেক ক্ষেত্রে বিপরীত ফল লাভ হয়েছে। একটা সভা করে যে ফসল ঘরে তোলা যেত, সে সভা পণ্ড করে দিয়ে অধিকতর প্রচারণা দলের পক্ষে এসেছে। জাতীয় পার্টির কিছু নেতৃবৃন্দের মধ্যে আপসকামিতা ছিল এবং এরশাদ বা দলের প্রতি আনুগত্য প্রশ্নাতীত ছিল না। সভা-সমিতিতে সুযোগ পেলে গরম গরম দু'কথা বলেই অধিক রাতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে টেলিফোন করতে দ্বিধা হত না। তাকে প্রচুর তেল নিষিক্ত করে নিবেদন করা হত, দলে নিজের ভাবমূর্তি বজায় রাখার জন্য গরম দু'-একটি কথা বলতে হয়, কিছু মনে করবেন না, সময়ে ঠিকই কাজে পাবেন।

এ ধরনের মনোবৃত্তিকে মনে-প্রাণে অপছন্দ করতাম। নেতা বলে যাকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে, সর্বতোভাবে তাঁর পক্ষে দাঁড়াতে হবে এবং কোন অবস্থাতেই তাঁর প্রশ্নে কোন আপস চলবে না। কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগতাম না। সরকারের ভ্রূকুটি অবহেলা করতাম এবং দল ও নেতার প্রশ্নে সর্বদা কণ্ঠ সোচ্চার রাখতাম। এ জন্যই আমার উপর ওদের ক্রোধের পরিসীমা ছিল না। জেলে দিয়েছে, স্ত্রীকে তার প্রতিষ্ঠিত শিক্ষায়তন থেকে বহিষ্কার করেছে, আমার প্রতিষ্ঠিত দৈনিক পত্রিকা অফিস লুটপাট-অগ্নিসংযোগ করে বিনাশ ঘটিয়েছে। আমার রিভলবার, বন্দুক সীজ করে নিয়েছে, আয়কর কর্মকর্তাদের লেলিয়ে যুক্তিহীন শাস্তিমূলক আয়কর নির্ধারণ করিয়েছে, আত্মীয়স্বজনদের হয়রানি করেছে, বাড়ির সম্মুখে সরকারি লোক দ্বারা প্রতিটি দর্শনার্থীকে অযাচিত জিজ্ঞাসাবাদ করে ভয়-ভীতির পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। কিন্তু কোন কিছুই আমার উপর কোন প্রভাব সৃষ্টি করতে পারেনি। কাজে ও কথায় আমি

অটল থেকেছি। এরশাদ মুক্তি আন্দোলনকে গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে দেওয়ার আশু কর্তব্যে অবহেলার প্রশ্রয় দিইনি।

অবিলম্বে নতুন করে প্রতিটি জেলা কমিটিকে কার্যকর করে তোলা প্রয়োজন। কিন্তু তখনই জেলা সম্মেলন সম্ভব নয়। সিদ্ধান্ত নেওয়া হল বিভাগসমূহে কর্মী-সম্মেলনের মাধ্যমে দলকে কর্মচঞ্চল করে তুলতে হবে। চট্টগ্রাম সম্মেলনে মিজান সাহেব, মওদুদ, আনিসসহ অনেক নেতৃবৃন্দসহকারে সেখানে উপস্থিত হলাম। সকালে কর্মী-সম্মেলন ও এরশাদের মুক্তির দাবিতে শোভাযাত্রা এবং বিকালে লালদীঘি মাঠে জনসভার কর্মসূচি ছিল।

কর্মী-সম্মেলন চলাকালীনই পুলিশের আদেশ এসে পৌঁছল।

সম্মেলন, শোভাযাত্রা এবং জনসভা সব নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পুলিশের কর্মকর্তা এসে আনিসের হাতে তাদের ফরমান জারি করে গেল। সম্মেলনে উপস্থিত সমস্ত প্রতিনিধিগণ গর্জে উঠল, এ অন্যায় আদেশ মানি না।

দ্বিপ্রহরে সম্মেলন প্যান্ডেলেই লাঞ্চের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। মাইকে গিয়ে দাঁড়ালাম, আমরা এ আদেশ মেনে সম্মেলন অর্ধসমাপ্ত রেখে, শোভাযাত্রা ও জনসভা না করে চলে যাব; না, এই অন্যায় আদেশকে অবহেলা করে এক শত চুয়াল্লিশ ধারা ভঙ্গ করব—প্রতিনিধিদের নিকট জানতে চাইলাম।

তারা একযোগে দাঁড়িয়ে চুয়াল্লিশ ধারা ভঙ্গ করে আমাদের কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়ার পক্ষে রায় দিল। তারা আরও বলল, আজ দুপুরে আমাদের খাওয়ার প্রয়োজন নেই, আমরা এক মুহূর্তও নষ্ট করতে চাই না।

সম্মেলনের কাজ সমাপ্ত করে শোভাযাত্রা নিয়ে বের হলাম। পুলিশ এসে বাঁধা দিল। তাদেরকে বললাম, আপনাদের এই অন্যায় আদেশ আমরা মানতে বাধ্য নই। যদি চান আমাকে গ্রেপ্তার করতে পারেন। আমিই এই কর্মসূচির উদ্যোক্তা।

ওরা গ্রেপ্তারের ঝামেলায় গেল না। কিন্তু সামান্য দূর পৌঁছতেই ওদের ব্যারিকেডের সম্মুখে পড়লাম। ওরা আমাদের মাঠে যেতে দেবে না।

তিন মাথার মোড়ে রাস্তার উপরই টেবিল এনে মাইক বেঁধে সভার কাজ শুরু করলাম। সভার কলেবর ক্রমেই বৃদ্ধি পেয়ে জনসভার রূপ ধারণ করল। স্থানটিকে 'এরশাদ স্কোয়ার' নামকরণ করে সেদিনের কর্মসূচি সমাপ্ত করলাম। লালদীঘিতে যেতে পারিনি ঠিকই, কিন্তু কয়েক শত পুলিশের উপস্থিতিতেই চুয়াল্লিশ ধারা ভঙ্গ করে জনসভা অনুষ্ঠিত করে এলাম।

রাজশাহী সম্মেলনের দিন বিএনপি'র লোকজন জনসভায় আক্রমণ করল। আমরা মঞ্চে আরোহণ করতেই আমাদেরকে লক্ষ্য করে বোমা নিক্ষিপ্ত হতে লাগল। জনসাধারণ দ্বিগ্বিদিক বোধশূন্য হয়ে যে যেদিকে পারল ছুটে পালাল। আমি মাইকে দাঁড়িয়ে বললাম, যারা বোমা নিক্ষেপ করছেন, তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করছি। জনসাধারণকে কষ্ট দেবেন না। লক্ষ্যবস্তু ঠিক করে

মঞ্চের দিকে তাক করে আপনারা আপনাদের বোমাগুলো নিক্ষেপ করুন। আমরা মঞ্চেই উপবিষ্ট আছি, পালাব না।

আমাদের এ ধরনের বক্তব্য শুনে সাধারণ শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে সাহসের সঞ্চার হল। বোমা নিক্ষেপকারীরাও বিস্মিত হল। এরপরও কয়েকটি লক্ষ্যভ্রষ্ট বোমা পড়েছিল। কিন্তু বেশ রাত পর্যন্ত সভা চালিয়ে যেতে আমাদেরকে ওরা নিবৃত্ত করতে পারেনি।

দেশের যেখানেই যাই না কেন, প্রচণ্ড বাধার সম্মুখীন হই। বাধা সম্পূর্ণ পার্টির বেলাতেই। তবে যেখানে আমি সম্পৃক্ত থাকি সেখানে বাধা হয়ে দাঁড়ায় বিন্ধাচলের সমান। আমি দু'কূল রক্ষার আর্ট জানি না। যা বলি স্পষ্ট করে বলি এবং সত্য কথা সুতীব্র কণ্ঠে বলার চেষ্টা করি। আমার নিক্ষিপ্ত প্রতিটি স্বরই নাকি ওদের বক্ষ বিদীর্ণ করে প্রবেশ করে। কিন্তু আমারও উপায় নেই। কাউকে না কাউকে কথাগুলো বলতে হবে। শাসকের রক্তচক্ষু ভয় না করতে সেই কৈশোরেই দীক্ষা লাভ করেছি, জীবনের এই সন্ধিক্ষণে এসে এখন আর তার বিচ্যুতি ঘটাবার অবকাশ নেই।

এরশাদ সাহেব পাঁচটি আসনে নির্বাচনে জয় লাভ করেছিলেন। তাকে একটি আসন রেখে চারটি আসন ছেড়ে দিতে হবে এবং সেসব স্থানে উপ-নির্বাচন হবে। উপ-নির্বাচন অন্যান্য স্থানেও হবে কিন্তু এই আসনসমূহ আমাদেরকে রক্ষা করতে হবে। সর্ব প্রকারে আমাদের প্রচেষ্টা নিতে হবে যাতে এই আসনসমূহে জাতীয় পার্টি পুনরায় জয়ী হতে পারে, সেভাবেই মনোনয়ন দিতে হবে।

মনোনয়ন নিয়ে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের বাসস্থানে বৈঠক হল। রংপুরের প্রায় অর্ধ শতাধিক কর্মী এবং প্রার্থীরা এসে উপস্থিত। ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বললেন, তিনি নিজে মিঠাপুকুর আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে আগ্রহী এবং তাঁর মতে অন্য একটি আসনে অর্থবান প্রার্থী করিম ভরসাকে মনোনয়ন দেওয়া বাঞ্ছনীয়।

বুঝলাম, এরই মধ্যে বিড়ি প্রস্তুতকারক ভরসা সাহেব যথাস্থানে ভরসার বাণী পৌছে দিতে সক্ষম হয়েছে। রংপুরের কর্মীরা তার স্বপক্ষে। তাই এই মনোনয়নটি নিয়ে আর দ্বিধা রইল না।

মিঠাপুকুর আসন জাতীয় পার্টির জন্য অত্যন্ত সহজ আসন। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী এখানে সাতচল্লিশ হাজারের অধিক ভোটে এরশাদ সাহেবের নিকট পরাজিত হয়েছে। এত ব্যবধান অন্যত্র নেই। অথচ পীরগঞ্জের আসনটি বেশ কঠিন। এরশাদ সাহেবই এখানে মাত্র সোয়া তিন শ' ভোট অধিক পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। সেনাপতিকে দুর্বলতম ফ্রন্টে যুদ্ধে যেতে হয়। সে হিসাবে এরশাদের অনুপস্থিতিতে মিজান সাহেবই সেনাপতি এবং তার উচিত ছিল

সবচাইতে দুর্বলতম স্থান পীরগঞ্জে নির্বাচনী-যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া। কিন্তু তা না করে সহজতম আসনটি আঁকড়ে ধরল। বলল, এই আসনকে লক্ষ্য রেখে সে কাজ করেছে এবং বারবার মিঠাপুকুরে জনসংযোগ অব্যাহত রেখেছে। বাকি দুটি আসনের মনোনয়ন চূড়ান্ত না করে সে চাঁদপুর চলে গেল। বলে গেল, মহাসচিব এই দুইটি আসনের প্রার্থী চূড়ান্ত করবে।

দু'দিন ধরে আমার বাসায় রংপুরের কর্মীদের বৈঠক চলল। অনেক আলোচনার পরও দুটি আসনের জন্য সর্বদিক বিবেচনীয় উপযুক্ত প্রার্থী পেতে বেগ পাচ্ছিলাম। রংপুরের সমস্ত কর্মীরা প্রস্তাব করল একটি আসনে মহাসচিব হিসাবে আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা উচিত। বিশেষ করে ডা. ফজলে রাব্বি, তাজুল ইসলাম চৌধুরী, কাজী ফারুক এবং শরফুদ্দিন আহমেদ ঝন্টু অত্যন্ত আগ্রহ প্রদর্শন করল।

মাত্র কিছুদিন পূর্বে জেল থেকে বের হয়েছি, স্বাস্থ্য ভালো নয়। তদুপরি অর্থনৈতিক অসুবিধার মধ্য দিনাতিপাত করছি, আমার ব্যাংক একাউন্ট বিএনপি সরকার সীজ করে রেখেছে। সামান্য যা রয়েছে তাও তুলতে অক্ষম। এমতাবস্থায় আমার পক্ষে রংপুরে গিয়ে নির্বাচন করা প্রায় অসম্ভব। কর্মীদের সব বুঝিয়ে বলেও কোন লাভ হল না। তারা এ প্রশ্নে ঐকমত্যে পৌছল, আমাকে একটি আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতেই হবে।

দু'দিন ধরে সিদ্ধান্ত হচ্ছে না। আমার স্ত্রী অসুস্থ বিধায় কর্মীদের বাইরের হোটেল থেকে প্যাকেট এনে খাওয়াতে হচ্ছে। তারাও নাছোড়বান্দা।

অগ্যতা সম্মত হতেই হল। ওদেরকে বললাম, যদি নির্বাচন করতেই হয় সবচাইতে দুর্বলতম আসনটিতেই করব। কেননা, পরবর্তী সেনাপতি হিসাবে সেটা আমার দায়িত্ব। পীরগঞ্জের প্রার্থীরা এবং অন্যান্য সমস্ত কর্মীরা সন্তোষ প্রকাশ করল। উৎসাহের আতিশয্যে করিম ভরসা বলল, সে আমার নির্বাচনের ব্যয়ভারের অর্ধেক বহন করবে। কর্মীরা জয়ধ্বনি দিয়ে উঠল। বাস্তবে দেখা গেল আমার নির্বাচনে সে একটি পয়সাও প্রদান করেনি।

সকলে মনোনয়নপত্র সামনে ধরল সই করার জন্য। ভাবলাম, এত বড় একটা সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছি, আমার সমস্ত জীবনের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডকে একটি চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় নিয়ে যাচ্ছি, সারা জীবনের সুখ-দুঃখের সাথী আমার স্ত্রীকে একবার জিজ্ঞেস করা প্রয়োজন। কর্মীদের বৈঠক থেকে উঠে দোতলায় এলাম। সঙ্গে বারী সাহেব, তার স্ত্রী ও কফিল। সালেহা বারান্দায় সোফায় শুয়ে আছে। তাকে যখন সব বুঝিয়ে বলছিলাম, লক্ষ্য করলাম, দিনা আগ্রহ ও উত্তেজনায় সামনে দিয়ে হাঁটাহাঁটি করছে। সে সাধারণত এমনটি করে না। স্বভাবত যে একটু অন্তর্মুখী, লোকজনের সম্মুখে না ডাকলে বের হয় না এবং রাজনৈতিক বিষয় থেকে দূরত্ব বজায় রাখে, আজ তাকে একটু অন্যরকম লাগছে, কী যেন বলতে চায়, সাহস পাচ্ছে না।

আমি তখন তাকেই জিজ্ঞেস করলাম, দিনা, তুমি আমার মা। বল তো রংপুরে নির্বাচনে দাঁড়াব কিনা?

সে এক মুহূর্ত চিন্তা না করে বেশ আগ্রহের সঙ্গেই বলল, হ্যাঁ আব্বা, তুমি নিশ্চয়ই দাঁড়াবে। আমি এই জন্যই পায়চারি করছি যাতে তোমরা আমাকে জিজ্ঞেস কর।

সবাই হেসে উঠলাম। সালেহা বলল, তোমার মা যেখানে সম্মতি দিয়েছে, সেখানে আর আমার অসম্মতির প্রশ্ন আসে না। আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে দাঁড়াও।

নিচে নেমে মনোনয়নপত্রে স্বাক্ষর করে দিলাম।

বিরাট একটা ঝুঁকি নেওয়া হল। সময় হাতে আছে মাত্র তিন সপ্তাহ। হাতে অর্থ নেই। নির্বাচন করতে যাচ্ছি সম্পূর্ণ অচেনা, অজানা একটি স্থানে— যেখানে এরশাদ সাহেব নিজেই জিতেছেন মাত্র শ' তিনকে ভোটের ব্যবধানে। সমস্ত খবরের কাগজ মন্তব্য করল, 'এবার শাহ্ মোয়াজ্জেম ধরা খেয়েছে, তার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী।' আওয়ামী লীগের প্রার্থী সাবেক মন্ত্রী আওয়ামী লীগের অন্যতম নেতা এবং শিল্পপতি মতিউর রহমান। সে একজন অর্থবান শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী।

এরশাদ সাহেবও নাকি মিজান সাহেবের কাছে লিখে পাঠিয়েছেন, মিজান সাহেব ছাড়া অন্য কেউ রংপুরের নির্বাচনে অংশ নিলে চরম দুর্যোগ নেমে আসবে। সরাসরি না লিখে পরোক্ষভাবে তিনি আমার মনোনয়নকে নিরুৎসাহ করলেন। কিন্তু তখন আর করার কিছু ছিল না। সময় অতিবাহিত। আমি মনোনয়নপত্র জমা দিয়ে দিয়েছি। স্বাক্ষরের দিনই কফিল এবং ডা. ফজলে রাব্বী সাহেব অন্যান্য কর্মীদেরসহ আমার মনোনয়নপত্র নিয়ে গিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে পীরগঞ্জে জমা দিয়েছে।

সেই ছাত্রজীবন থেকে শুরু করে প্রায় সারাটি জীবন চরকির মতো ঘুরে বেরিয়েছি। বাংলাদেশের সব জেলা এবং অধিকাংশ উপজেলাতেই কোন না কোন সময় যাওয়া হয়েছে। কিন্তু রংপুর জেলার এই পীরগঞ্জ উপজেলায় জীবনে কখনও পদার্পণ করিনি। কোন কর্মসূচি দূরের কথা, এই পীরগঞ্জের মাটি মাড়িয়েও অন্যত্র কোথাও যাওয়া হয়নি। পীরগঞ্জের জন্য আমি সম্পূর্ণ নবীন।

রাজশাহীতে কর্মী-সম্মেলন ছিল, সেটি সেরে পীরগঞ্জ যাব। কফিলকে সেমতে গাড়ি নিয়ে রাজশাহী পৌছতে বলেছি। সড়কপথে পলাশবাড়ি ডাকবাংলোতে ফজলে রাব্বী সাহেবের অস্থায়ী আস্তানায় বিশ্রামান্তে আনুষ্ঠানিক শোভাযাত্রা করে কর্মীরা আমাকে পীরগঞ্জে নিয়ে গেল। দেয়ালে দেয়ালে আমার আগমনকে স্বাগত জানিয়ে ওরা ভালোই চিকা মেরেছিল। পীরগঞ্জ ডাকবাংলোতে যখন পৌছলাম তখন অনেক কৌতূহলী দর্শক আমাকে দেখতে এসে খানিকটা হতাশ হল। যারা পূর্বে আমাকে দেখেনি, তাদের নিকট দর্শনধারী হিসাবে কোন কৃতিত্ব লাভ করতে পারলাম না। অনেকে হাসাহাসি করছিল এবং নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছিল, এই লোক নাকি আমাদের এলাকায় দাঁড়িয়েছে, কেউ তাকে চেনে না, জানে না, ভোট দেবে কে?

কর্মীরা একটি মাইক নিয়ে এল। কোন আনুষ্ঠানিকতায় না গিয়ে মাইক টেনে নিলাম। বললাম, আপনারা অবাক হচ্ছেন বিক্রমপুরের মানুষ রংপুরে কেন? মুন্সীগঞ্জ থেকে এই পীরগঞ্জে এসে ভোটযুদ্ধে অবতীর্ণ হলাম কোন্ সাহসে! আজ প্রথম দিন পীরগঞ্জে এসেছি। এক সপ্তাহ পর আবার দেখা হবে আপনাদের সঙ্গে। আমি বিশ্বাস করি, ইনশাল্লাহ্ সপ্তাহ কাটতেই আপনারা আমাকে সমর্থন জানাবেন। এমনকি আমার হয়ে মানুষের নিকট ভোটও চাইবেন। আজ একটু পরে বড় দরগায় আমার জনসভা রয়েছে, এখন সেখানকার উদ্দেশে রওয়ানা হব। আজকের মতো খোদা হাফেজ।

মানুষজন আমার আত্মবিশ্বাস দেখে অবাক হয়ে গেল এবং সপ্তাহান্তে কী হয় দেখার জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করে রইল। বড় দরগায় পৌছে প্রথম বাধার সম্মুখীন হলাম। আওয়ামী লীগের প্রার্থীর প্রত্যক্ষ ইশারা ছিল, প্রথম দিনই যদি সভা ভণ্ডুল করে দেওয়া যায়, তা হলে আর সুবিধা হবে না। সে সভা প্রাঙ্গণে যাওয়ার পূর্বে বড় রাস্তায় আমার নামে যে তোরণ নির্মাণ করা হয়েছে, সেখানে কিছু বখাটে যুবক একত্রিত হয়ে তাদেরকে 'ওয়াদা মতো অর্থ প্রদান করা হয়নি, সভায় যেতে দেওয়া হবে না' এসব বলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করল। আমার গাড়ি আটকে দিল। বুঝলাম প্রথম ধাক্কায় এ বাধা অতিক্রম করতে না পারলে পরে সমস্যা বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

লাফ দিয়ে গাড়ি থেকে নেমে ধাক্কা দিয়ে ওদের মাঝখান থেকে জায়গা করে কর্মীদের বললাম, শোভাযাত্রা করে সভায় যাব, স্লোগান দাও।

আমাদের দুটি গাড়ি থেকেও ঝটপট কর্মীরা নেমে স্লোগান দিয়ে এগিয়ে চলল। রংপুরের ঝন্টু অপরিসীম সাহস দেখাল। সে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করল, কোন অভিযোগ থাকলে পীরগঞ্জের সম্পাদক অধ্যাপক গোলাপকে বল অথবা আমাকে জানাও। মহাসচিবের পথ আটকাও, তোমরা বেয়াদপরা কারা!

ওদের কেউ একটা মশাল নিয়ে এসে তোরণে অগ্নিসংযোগের চেষ্টা করতেই ঢাকা থেকে আসা সেচ্ছাসেবক পার্টির নেতা আমার চির বিশ্বস্ত-কর্মী সমিজ দেওয়ান ছোঁ মেরে মশালটা কেড়ে নিয়ে নিভিয়ে ফেলল। দীর্ঘদেহী সমিজের অগ্নিমূর্তির সম্মুখে কেউ দাঁড়াতে সাহস করল না।

আমি কোনদিকে কর্ণপাত না করে মিছিলের অগ্রভাগে সভামঞ্চে গিয়ে পৌঁছলাম। চারদিক থেকে সাধারণ মানুষ ছুটে এল, এরশাদের কথা শুনতে এবং নতুন প্রার্থীটিকে দেখতে। সভা জমে যেতে বিশৃঙ্খলাকারীরা কেটে পড়ল।

সভায় বসে দেখি একজন স্বাস্থ্যবতী মহিলা সভা মঞ্চের দিকে এগিয়ে আসছে। নিকটে আসতেই বিস্মিত হয়ে দেখলাম মিতা ভাবী। সে 'জাতীয় মহিলা পার্টি'র একজন কর্মকর্তা। আমার নির্বাচন করার জন্য বাস ধরে ঢাকা থেকে চলে এসেছে। সভায় সে একটি মহিলাসুলভ আবেগ-আপ্লুত বক্তব্য রাখল। সেই উপ-নির্বাচনে মিতা ভাবী সার্বক্ষণিক কাজ করে প্রচুর অবদান রেখেছে। সকলের বক্তব্য শেষ হতে আমি উঠে দাঁড়ালাম। আগ্রহী শ্রোতা পেলে আমাকে আর পায় কে! দু'ঘণ্টা ধরে ঝাড়া একটি বক্তব্য দিয়ে তৃপ্তি লাভ করলাম। সভার কলেবর সন্ধ্যার পর আরও বৃদ্ধি পেয়েছে এবং মানুষজন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে বক্তব্য শুনেছে। রাতারাতি নানাভাবে পল্লবিত হয়ে আমার বক্তৃতার কথা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। পরদিন থেকে প্রতিটি সভাতেই জনসমাগম হতে লাগল প্রচুর থেকে প্রচুরতর। সমগ্র পীরগঞ্জের মাটি কথা বলে উঠল।

সারাদিন পাজেরো নিয়ে উপজেলার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত চষে বেড়াই। অগণিত পথসভা, খোলা বৈঠক সেরে সন্ধ্যার পর দিনের সবচাইতে বড় জনসভায় উপস্থিত হয়ে সমস্ত আবেগ ঢেলে দিয়ে কারাবন্দি এরশাদের উপাখ্যান তুলে ধরি, তাঁর সাথে আমার সম্পর্কের ব্যাখ্যা দিই। দেশের স্বাধীনতার অন্যতম স্থপতি হিসাবে বাংলাদেশের যে-কোন প্রান্তে নির্বাচন করতে পারি, মানুষকে বুঝাই। সর্বোপরি এরশাদের মুক্তি সংগ্রামকে জোরদার করার জন্য আমাকে কেন তাদের ভোট দেওয়া উচিত তা বিশদভাবে তুলে ধরি। প্রতিটি সভার পর আমার গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

অধ্যাপক গোলাপ, শাহজাহান, আবেদ, লতিফ সাহেব, মোজাম্মেল সালাম, সুলতান আহমেদ সোনা, হাবিবুর রহমান প্রমুখ পীরগঞ্জের কর্মীরা এই উপ-নির্বাচনে প্রভূত অবদান রাখে। রংপুরের মানুষের একটা স্বাভাবিক টান রয়েছে তাদের সন্তান এরশাদের প্রতি। সে কারণে সেখানে দল গঠন যেমন সহজ, সাধারণ মানুষের হৃদয় জয় করা তেমনি সহজতর।

নিজের নির্বাচনী এলাকা ছাড়াও আমাকে পাশের মিজান সাহেবের জনসভায় যেতে হয়। যেতে হয় করিম ভরসা ও অধ্যাপক পরিতোষের নির্বাচনী সভায়।

এই নির্বাচন উপলক্ষে দুটি বিষয় উপলব্ধি করলাম। প্রথমত, কর্মীদের অবদান। আর্থিক দিক থেকে আমার অসুবিধা ছিল। কিন্তু সেটা অনেকটা মিটিয়ে দিল আমাদের কর্মীরা। ঢাকার বহু কর্মী আমার উপ-নির্বাচনে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছে। আমি সকলকেই নিরুৎসাহিত করার চেষ্টা করেছি। কেননা, কর্মীরা ওখানে গিয়ে যদি তাদের থাকা-খাওয়ার জন্য এলাকার মানুষদের বোঝা হয়ে দাঁড়ায় সেটা হিতে বিপরীত হয়ে দাঁড়াবে। কর্মীদের শর্ত দিয়েছি কেউ যদি পীরগঞ্জে আসে, তাকে নিজের থাকা এবং খাওয়ার ব্যবস্থা পীরগঞ্জের বাইরে করতে হবে। সেখানকার জনসাধারণকে বিব্রত করা যাবে না। কর্মীরা তাতেই সম্মত। নিজেদের গাড়ি নিয়ে সেখানে উপস্থিত। সারাদিন গ্রামে-গঞ্জে আমার পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণা চালিয়ে অধিক রাতে পার্শ্ববর্তী কোন শহরে গিয়ে ওরা রাত্রি যাপন করত। শুধু তা-ই নয়, আমি হয়ত অনেক রাতে ফিরে এসে একটু শয্যা নিয়েছি, হঠাৎ শুনি বালিশের নিচে কেউ হাত দিয়েছে। ওখানে টাকা-কড়ি থাকে। নিদ্রাচ্ছন্নতার মধ্যেও জিজ্ঞেস করি, কে, কী চাই?

কেউ বলে ওঠে, লীডার, আপনার নির্বাচনে বিশেষ কিছু করতে পারিনি। একটা এনভেলাপ রেখে গেলাম।

সকালে উঠে দেখি টাকা ভর্তি একটি খাম। প্রায়ই এমন হত। এক রাতে একজনের হাত চেপে ধরেছিলাম। সে একটি খাম গছিয়ে দিয়ে বিদায় নিল। সকালে দেখি পঞ্চাশ হাজার টাকা। কে দিয়েছিল আজও অজ্ঞাত রয়েছে।

সভায় বক্তৃতা করছি। পাঞ্জাবির পকেটে কেউ হাত দিয়েছে, মনে হয়েছে কেউবা কিছু তুলে নিচ্ছে। বক্তৃতার মাঝেই বলে উঠেছি, কে আমার পকেটে হাত দিয়েছ? বিষয় কী?

কেউ একজন উত্তর দিয়েছে, না, পকেটে হাত দিইনি। আমরা আপনার জন্য বিশেষ কিছু করতে পারিনি। সামান্য কিছু রেখে গেলাম।

পরে দেখেছি কেউ পাঁচ হাজার, কেউ দশ হাজার বা কেউ বেশি দিয়েছে। কর্মীরা নিজেদেরটা খেয়ে নিজেদের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করে আমার জন্য কেবল কাজই করেছে তা-ই নয়, অকাতরে অর্থও যোগান দিয়েছে।

আবদুল বারী ওয়ার্সী সাহেব, তার স্ত্রী আমেনা বারী সার্বক্ষণিকভাবে এই নির্বাচনে জড়িত ছিল, মনে হয়েছে তারাই কেউ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। মিসেস বারী রংপুরের মেয়ে, বিক্রমপুরের বধূ। তার বক্তৃতা এলাকার মানুষ খুব

পছন্দ করত। আনোয়ার, সমিজ, কফিল, নজরুল ওরা সার্বক্ষণিক স্থানীয় কর্মীদের সঙ্গে সমন্বয় রক্ষা করেছে।

দ্বিতীয় বিষয় যেটি উপলব্ধিতে এল, সেটি দুঃখজনক। নির্বাচনে অংশ নেব একথা প্রকাশ করে কিছু অর্থবান বন্ধু-বান্ধবকে সহযোগিতা করার আহ্বান জানিয়েছিলাম। এরা বিভিন্ন সময় আমার দ্বারা উপকৃত। বারবার বলেছে আপনার জন্য একটা কিছু করার সুযোগ দেবেন। বলেছি প্রয়োজনে জানাব।

আজ, প্রয়োজনের মুহূর্তে দশ-বারো জনের সাথে যোগাযোগ করলাম। সকলেই বলে উঠল, এটা কোন বিষয়ই নয়। আপনার নির্বাচনে কত লাগবে?

মনে হল বুঝি একাই সম্পূর্ণ ব্যয় বহন করবে। বললাম, লাখ বিশেক টাকার যোগাড় রাখতে হবে।

ওরা জানতে চাইল কবে নাগাদ টাকার প্রয়োজন।

জানালাম এক সপ্তাহের মধ্যেই প্রয়োজন পড়বে।

ওদের সঙ্গে আলোচনা করে একটা তারিখ স্থির হল। সেদিন ঢাকা এসে আমি তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করব এবং তাদের দেওয়া অর্থ গ্রহণ করব।

ঢাকা বিভাগীয় কর্মী-সম্মেলন ছিল। সে উপলক্ষে ঢাকায় এসে ওদের সকলের সঙ্গে নির্দিষ্ট দিনে যোগাযোগ করলাম। যাকেই টেলিফোন করি তাদের সহকারী টেলিফোন ধরে আমার পরিচয় জানতে চায় এবং বলে, দেখতে হবে সাহেব আছে কিনা। কিছুক্ষণ পর ওপার থেকে উত্তর আসে সাহেব অফিসে নেই এবং কখন আসবে তারা জানে না।

প্রায় জনা দশেক 'তেমন বন্ধু'দের টেলিফোন করলাম। সর্বত্র থেকে একই জবাব এল।

শেষ দিকে টেলিফোন করে নিজেই বলতাম, আমি শাহ্ মোয়াজ্জেম টেলিফোন করছি, আপনার সাহেব নিশ্চয়ই অফিসে নেই এবং আপনি অবগত নন কখন সে আসবে!

সহকারীরা নিশ্চুপ থাকাই বাঞ্ছনীয় মনে করত।

এক বন্ধুর সঙ্গে সম্মেলনেই দেখা, সে জাতীয় পার্টি করে এবং খুব বেশি দিন হয়নি আমার নিকট থেকে একটি সুযোগ নিয়ে বেশ বড় রকমের আর্থিক উপকার পেয়েছে। তাকে বলতেই সে বলল, তা হলে আমি এক বার ব্যাংক থেকে ঘুরে আসি। আপনাকে চিন্তা করতে হবে না। টাকা নিয়ে আমি আপনার বাসায় আসছি।

সে তাড়াতাড়ি বের হয়ে গেল। আজও গেল, কালও গেল। তার সঙ্গে পুনরায় দেখা হয়েছে নির্বাচনের অনেক পরে।

সমস্ত দিন বারবার টেলিফোন করে কাউকে না পেয়ে মন বিষাদে ভরে উঠল। ক্ষমতায় থাকা আর না থাকার কি বিস্তর ব্যবধান আজ হাড়ে হাড়ে টের পেলাম। কিন্তু সকালেই ফ্লাইট। সৈয়দপুর হয়ে পীরগঞ্জ যেতে হবে।

আমার মানসিক অবস্থা বুঝতে পেরে সালেহা প্রস্তাব করল তার যে বাড়িটি রয়েছে মীরপুরে তা যে কোন মূল্যে বিক্রয় করে টাকা যোগাড় করতে।

অগত্যা তাতেই সম্মত হলাম। কিন্তু নগদ এত টাকা রাতের মধ্যে কে এনে দেবে!

বাসা ভর্তি কর্মীদের সামনে প্রস্তাব করলাম, প্রায় অর্ধেক মূল্যে বাড়িটি বিক্রয় করব, কিন্তু মূল্য আজ রাতেই পরিশোধ করতে হবে।

সকলেই নিশ্চুপ। কাদের চেয়ারম্যান বলল—তার ভাগনেরা একটি বাড়ি কেনার জন্য নগদ টাকার বন্দোবস্ত করে রেখেছিল, সে একবার দেখতে পারে।

বেশ রাতে কাদেরের ভাগ্নেরা দুটি সুটকেস ভর্তি নগদ সাড়ে তেরো লক্ষ টাকা এনে আমাকে দিয়ে বলল, মামা এই টাকা বাড়ির মূল্য হতে পারে না। কিন্তু এর বেশি একটি পয়সাও আমাদের হাতে নেই। আপনার নির্বাচনে এটা আমাদের চাঁদা। বাড়িটি আপনি ভাগ্নেদেরকে দান করুন।

দেখলাম উপায়ান্তর নেই। সে অর্থই গ্রহণ করে বাড়িটি ওদরকে দিয়ে দিলাম। সে টাকা দিয়ে পীরগঞ্জে গিয়ে নির্বাচনের ব্যয় বহন করলাম।

আওয়ামী লীগের প্রার্থী মতিউর রহমানের সঙ্গেই এরশাদ সাহেব তিনশ ভোটে কায়-ক্লেশে জয়লাভ করেছিলেন। আমি বাইরের লোক। মতিউর রহমান সাহেব প্রথমদিকে পাত্তাই দিতে চায়নি। মনে করেছে হেসে-খেলে জয়লাভ করে যাবে। কিন্তু প্রতিটি দিনের শেষে আমার জমার ঘরে যোগ হচ্ছিল আর তার হচ্ছিল বিয়োগ। বিএনপি বা জামায়াতের প্রার্থী তেমন সুবিধা করতে পারবে না। স্বতন্ত্রদের তো কোন কথাই নেই।

কয়েকদিনের মধ্যেই মাঠের অবস্থা আঁচ করতে পেরে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে অতি নোংরা বক্তব্য, কুৎসা ও অপপ্রচার শুরু করল। ওদের প্রচারণার মূল বক্তব্যই ছিল, 'শুনলে মোদের হাসি পায়, রিফিউজি নাকি ভোট চায়!'

এর শক্ত প্রতিউত্তর দিয়েছিলাম। কোন নিন্দাবাদ আমার অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করতে না পেরে শুনেছি ওরা ভাড়াটে লোক নিয়োগ করেছিল আমাকে চিরতরে শেষ করে দেওয়ার জন্য। কিন্তু আল্লাহ্ যার সহায়, তার ক্ষতি কেউ করতে পারে না। ওরা এক রাস্তায় রাতের অন্ধকারে ওৎ পেতে থাকে, আমি অন্য পথে চলে যেতাম।

আওয়ামী লীগের নেত্রী হাসিনা ওয়াজেদের জাত ক্রোধ ছিল আমার উপর। উত্তর বঙ্গের সর্বত্র থেকে শত শত মোটর সাইকেল, গাড়ি, জিপ, মাইক্রোবাস ও ট্রাক ভর্তি বিপুল কর্মী-বাহিনী নিয়ে এসে পীরগঞ্জ চষে বেড়াল।

সাধারণ মানুষ ছিল খুবই দরিদ্র। কিন্তু এত দরিদ্রতার মধ্যেও তারা জন্ম নিয়ন্ত্রণে অনাগ্রহী। যেখানেই যেতাম শত শত শিশু জন্মদিনের পোশাক পরে কিলবিল করছে। মেয়েরা শতচ্ছিন্ন বস্ত্রে শরীর ঢাকার প্রয়াস করে রাস্তার পাশে এসে দাঁড়াত। ভোটের কথা বলা ভুলে তাদেরকে জন্মশাসনের পরামর্শ দিতাম। কোন কোন মহিলা বলে উঠতেন, 'ও কথা না কন বাহে।'

স্থানীয়-কর্মীরাও বলত জন্মনিয়ন্ত্রণের কথা ওদের পছন্দনীয় নয়। ভোটের সময় এসব না বলাই ভালো।

কথামতো এক সপ্তাহ পর যখন ডাকবাংলোর সম্মুখে উপস্থিত হলাম তখন লোকে লোকারণ্য। তারা নিজেরাই বলছিল, ঠিকই বলেছিলেন, আমরা আপনার পক্ষে ভোট করব।

তাদের কথায় উৎসাহিত হয়ে উঠলাম। কর্মের পরিধি আরও বিস্তৃত করলাম। একই দিনে বেশ কয়েকটি জনসভা করে জনগণের মধ্যে একটা জোয়ার সৃষ্টি করতে সক্ষম হলাম।

পীরগঞ্জ ডাকবাংলোতে আস্তানা গেড়েছিলাম। কিন্তু আওয়ামী লীগ প্রার্থীর প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতে কর্তৃপক্ষ আমাকে ডাকবাংলোতে অবস্থান করতে দিতে অস্বীকার করল! তারা ডাকবাংলোতে তালা ঝুলিয়ে দিল। পলাশবাড়ি ডাকবাংলোতে গিয়ে রাত কাটাতাম। সারাদিন পীরগঞ্জে অবস্থান করে গভীর রাতে সেখানে ফিরে সামান্য বিশ্রাম নিয়ে পরদিন আবার নতুন উদ্যমে বের হয়ে পড়তাম। নির্বাচনের ফলাফল সম্বন্ধে ঢাকার পত্রিকাসমূহ এবং রংপুরের সংবাদপত্রসমূহ প্রায় একই সংবাদ পরিবেশন করত। তারা প্রায় সকলেই আমার পরাজয়কে অবশ্যম্ভাবী মনে করলেও আমার কিন্তু মাঠের অবস্থা দেখে সফলতার সম্ভাবনাই মনে উদয় হত।

সমস্ত নির্বাচন কালটি একভাবে কাটলেও নির্বাচনের দু'দিন পূর্ব থেকে মুষলধারে বৃষ্টিপাত শুরু হল। লালমাটির দেশ পীরগঞ্জ, এত কর্দমাক্ত হয়ে যায় যে, চলাফেরা প্রায় বন্ধ হওয়ার উপক্রম। তাছাড়া আওয়ামী লীগের একটা ভোট ব্যাংক রয়েছে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায় প্রকাশ্যে যত কথাই বলুক, ভোট দেওয়ার সময় নৌকা মার্কায় একটি নমস্কার করে সেখানেই ভোটটি দিয়ে থাকে। যদি বৃষ্টি বন্ধ না হয়, তা হলে নির্বাচনের ফলাফল অনিশ্চিত। হিন্দু সম্প্রদায়ের ভোটারগণ কোন অবস্থাতেই ভোট নষ্ট করবে না। দেখা

গিয়েছে বৃষ্টির ছাটে মাথার সিঁদুর কপাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে, সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, কিন্তু তারা ভোটের লাইনে ঠিকই দাঁড়িয়ে আছে। অন্যদিকে এই ঘোর বর্ষণের সুযোগে সাধারণ মুসলমান ভোটারগণ অনেকেই বাড়িতে আরামে বিছানা আশ্রয় করে দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে তাদের নবতম অবদান রাখার প্রয়াস পায়। সেক্ষেত্রে নির্বাচনের ফল আমার জন্য সম্পূর্ণ বিপরীত হওয়া অসম্ভব নয়। তুমুল বৃষ্টির মধ্যেও বসে থাকিনি। কিন্তু সমস্যা হল, ভোটারদের উপস্থিতি নিয়ে। এ ধরনের বৃষ্টিপাতে স্বভাবত অলস ভোটাররা বুথে আসতে চাইবে না, মহিলাদের আসার কথাই ওঠে না।

নির্বাচনের দিনও সকাল থেকে আকাশ ভেঙে বর্ষণ হচ্ছে। মন খুব বিষণ্ন হয়ে গেল। এত পরিশ্রম, এত আয়োজন সব বুঝি বিফলে গেল। সকালবেলা আবেদ ও অন্যান্য কর্মীরা এসেছে আমাকে বিভিন্ন কেন্দ্রে নিয়ে যেতে। অযু করে জায়নামাজে এসে বসলাম। নামাজ আদায় করে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে চোখের পানিতে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা জানালাম, পরম করুণাময় আল্লাহ্, তুমি যদি আমাকে এত দূরে নির্বাচনে এনে থাক এবং জয়ের আশা দেখিয়ে থাক, তা হলে আজ এই বৃষ্টি কেন? বৃষ্টি বন্ধ না হলে সব শেষ হয়ে যাবে। তুমি বৃষ্টি বন্ধ করে দাও। বৃষ্টি বন্ধ না হলে আমি এই জায়নামাজ থেকে উঠব না। নির্বাচনের যা হবার হোক!

অধীর, আবেদ এবং অন্য কর্মীরা আমাকে ডাকতে এসে আমার কাতর প্রার্থনা ও চোখের বিগলিত পানি দেখে তারাও কান্নায় ভেঙে পড়ল। চোখের জলে তারাও আমার সঙ্গে আল্লাহ্‌র দরবারে হাত তুলে একই প্রার্থনা জানাল।

আমাদের প্রার্থনার জন্য কিনা জানি না, আল্লাহ্‌র কি অপূর্ব মেহের! বৃষ্টি থেমে গেল। প্রখর সূর্যের আলোতে চারদিক উদ্ভাসিত হয়ে গেল। আল্লাহ্‌কে অজস্র শুকরিয়া জ্ঞাপন করে গাড়িতে গিয়ে বসলাম। কর্মীদের উৎসাহ দিতে হবে, বাড়ি বাড়ি থেকে ভোটার নিয়ে আসতে হবে, মেঘ কেটে গেছে, চারদিক রৌদ্রের উজ্জ্বল আলোতে স্নাত। মনে হল, আমাদের ভাগ্যাকাশের মেঘও কেটে গিয়ে আলোর দ্যুতি ছড়িয়ে পড়েছে।

কর্মীরাও বিপুল উৎসাহ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল নির্বাচনের দিনের অবশ্য করণীয় কাজগুলো আন্তরিকতার সঙ্গে সম্পন্ন করতে। সারাদিন আর বৃষ্টি হল না। রাস্তাঘাট শুকিয়ে আসায় বিকেলে মহিলা ভোট অধিকতর গণনা হল। দিনের শেষে সুসংবাদ পেলাম, প্রায় চৌদ্দ হাজার ভোটের ব্যবধানে আমরা জয়লাভ করেছি। বৃষ্টি বাদল না হলে এই ব্যবধান প্রায় বিশ-পঁচিশ সহস্রে দাঁড়াত বলে সকলের অনুমান।

রংপুরের চারটি আসনেই আমাদের প্রার্থীরা জয় লাভ করেছে।

মিঠাপুকুরে এরশাদের সঙ্গে ব্যবধান ছিল প্রায় সাতচল্লিশ হাজারের। এবার ব্যবধান কমে সাতাশ হাজারে দাঁড়িয়েছে।

সর্বমোট তিন সপ্তাহের অবিস্মরণীয় প্রচারাভিযানের ফলশ্রুতিতে পীরগঞ্জে আমরা যে ফল লাভ করলাম, তা ছিল অচিন্তনীয় এবং ঐতিহাসিক। এরশাদ সাহেবও জেল থেকে লিখে পাঠালেন, পীরগঞ্জের লোক কী আমার চাইতে আপনাকে বেশি ভালবাসে?

প্রতিলিপি গেল, না স্যার, আপনার চাইতে আমাকে বেশি ভালবাসার প্রশ্নই আসে না। আপনার প্রতি তাদের অকৃত্রিম ভালোবাসাই আমি লাঙ্গলের পক্ষে ভাঙিয়েছে। কারারুদ্ধ থাকার দরুন আপনি যে ফসল কেটে ঘরে তুলতে পারেননি, লাঙ্গলের ফলায় ফলায় যে সম্ভাবনার বীজ আপনি বপন করে গিয়েছিলেন সে ফসলই আমি গুছিয়ে ঘরে তুলেছি মাত্র।

পীরগঞ্জ বা সমগ্র রংপুরের মানুষ এরশাদ সাহেবকে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করে তার জীবনে নব দিগন্তের সূচনা করেছিল। উপ-নির্বাচনে তাঁর লাঙ্গলে দ্বিতীয়বার ভোট দিয়ে তাঁর মুক্তি আন্দোলনকে আরও বেগবান করার সুযোগ করে দিল। রংপুরবাসীর নিকট নেতা এরশাদ এবং তাঁর দল জাতীয় পার্টির কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। এক নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত তারা স্থাপন করে দিল বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে। কারারুদ্ধ কোন নেতা আজ পর্যন্ত সর্বোচ্চ পাঁচটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেনি। এরশাদ সাহেব তা করলেন এবং সবক'টিতেই গৌরবজনক বিজয় লাভ করলেন। বিএনপি নেত্রীও পাঁচটি আসনে জিতেছিলেন। তিনি মুক্ত ছিলেন, তার দল ছিল সফল সংগ্রামের পর বিজয়ীর ভূমিকায় এবং সংঘবদ্ধ। অর্থ, লোকবল, যানবাহন প্রভৃত সামগ্রীর সমন্বয়ে তার নিজস্ব উপস্থিতি যে প্রত্যাশিত ফল এনে দিয়েছে তার সঙ্গে কেবল মাত্র মার্কা পাঠিয়ে কারাগার থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বহু মামলায় অভিযুক্ত হয়ে জীবনের সংকটময় মুহূর্তে এরশাদ সাহেব তাঁর দেশবাসীর নিকট যে প্রীতি ও আস্থা লাভ করলেন তার কোন তুলনা বাংলাদেশ কেন, পৃথিবীর অন্যত্র কোথাও রয়েছে কিনা আমার জানা নেই। এ ঋণ শোধ করার নয়।

নির্বাচনের পর দু'দিন এলাকায় মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম, তাদেরকে আমার পক্ষে এবং কারারুদ্ধ নেতার পক্ষে কৃতজ্ঞতা জানালাম। কর্মীরা চাচ্ছিল আমি ক'দিন বিশ্রাম নিই। তাদের ভাষায় যে অমানবিক পরিশ্রম আমি তিন সপ্তাহ করেছি তা নাকি দেখা দূরের কথা; তারা কল্পনাও করতে পারেনি। আমি নিজেও জানি, স্বভাব আমার অনেকটা রেসের ঘোড়ার মতো। দৌড় চলছে, বেশ আছি। দৌড় থেমে গেলেই মুখ থুবড়ে পড়ে যাই। সৌজন্য

সাক্ষাৎ সমাপ্ত হতে ওরা যখন আমাকে জোর করে গাড়িতে তুলে দিল ঢাকার উদ্দেশে তখন আমার জীবনীশক্তি শূন্যের কোঠায়।

আমার পাজেরো জিপটি এই নির্বাচনে ঝড়-বৃষ্টি, কাদা, পানি ভেঙে খাল-বিল অতিক্রম করে যেভাবে ব্যবহৃত হয়েছে ভাবতে অবাক লাগে। কখনও থামেনি যার গতি, সেই গাড়িই সাক্ষাৎকার শেষ হতেই পলাশবাড়ি বাংলোয় এসে বসে গেল। বড় দার বড় ছেলে ইঞ্জিনিয়ার শামিম বগুড়া থেকে যন্ত্রপাতি ও মেকানিক নিয়ে এসে সেটি দাঁড় করাল।

এক সাথে কয়েকটি গাড়ি-ভর্তি কর্মীদের নিয়ে ঢাকা ফিরছি। আমার তখন প্রায় বেহুঁশ অবস্থা। গাড়ির মধ্যবর্তী আসনে আমাকে শুইয়ে দেওয়া হয়েছে। সমধিক ক্লান্ত মিসেস বারী, জলী রহমান, কাজী ফারুক, আনোয়ার, কফিল, সমিজ ওরা সকলে আমার শুশ্রূষা করছে। মনে পড়ে নগরবাড়ি ঘাটে কাজী ফারুক আমাকে সযত্নে চিড়া, নারকেল কোড়া খাইয়ে দিচ্ছে। বাসায় এসে যখন নামলাম, দিনা উচ্ছল আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে দৌড়ে এসে জড়িয়ে ধরতেই আমার দেহে প্রাণ ফিরে এল। ও বলল, আব্বা, বলেছিলাম না তোমাকে দাঁড়াতেই হবে?

বললাম, হ্যাঁ মা, তোমাদের দোয়া আল্লাহ্ কবুল করেছেন। আমার প্রতি তাঁর রহমত ও করুণার সীমা-পরিসীমা নেই।

ওরা গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার কথা প্রায়ই সাড়ম্বরে বক্তৃতা করে। একদিন শেষে বলেছিলাম, ওই দুটি শব্দের বানান করতে যাদের রুজ্-লিপস্টিক চর্চিত মুখ বক্র হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয় তাদের পক্ষে গণতন্ত্রের আচরণ অপ্রত্যাশিত। উপ-নির্বাচনে জয়লাভ করে প্রত্যাবর্তন করায় বিএনপি সরকার যেন আমার বিরুদ্ধে মরিয়া হয়ে লাগল।

স্ত্রীর প্রতিষ্ঠিত স্কুল থেকে তাকে অপসারণ করেছে, আত্মীয়স্বজনদের হয়রান করেছে। আমার উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত দৈনিক পত্রিকা লুটপাট, অগ্নিসংযোগে শেষ করেছে। আমার রিভলবার-বন্দুক সীজ করেছে, ব্যাংক একাউন্ট সীজ করেছে, অবাঞ্ছিত ও অহেতুক আয়করের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে—তবুও তাদের প্রতিহিংসার উপশম হয়নি। অকারণে কারারুদ্ধ করেছে, সেখান থেকেও হাইকোর্টের আদেশে মুক্তি পেয়েছি, কিন্তু ওদের ঝাল মিটছে না বরং নির্বাচিত হয়ে আসাতে ওরা হাড়ে হাড়ে চটে উঠেছে।

এবার নতুন করে মামলা দায়েরের ব্যবস্থা করছে। আমাদের পতনের পর হেন স্থান নেই যেখানে দুর্নীতির ঘটনা পাওয়া যায় কিনা সন্ধান করেনি। শ্বেতপত্র, তদন্ত কমিটি, কত কি করে ওরা আমাদের বিষয়ে তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে। কিন্তু তদন্তকারী কর্মকর্তারা বলেছে, ওনার বক্তৃতা-বিবৃতি অনেকের মনোকষ্টের কারণ হতে পারে। কিন্তু কোন দুর্নীতির অভিযোগ তার সম্বন্ধে আমরা অনুসন্ধানে পাইনি।

কিন্তু সর্বোচ্চ মহলের ঐকান্তিক ইচ্ছা আমার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে হবেই।

গত পঁচিশ দিন লিখতে পারিনি। প্রথমত, রোজা ছিলাম, জীবনের প্রথম পূর্ণাঙ্গ রোজা এবং তারাবীর নামাজ আদায়ের চেষ্টা করেছি, আল্লাহ্ জানেন। ওবায়দুর রহমান তার খন্দকার নামের মর্যাদা রেখেছে। সে তারাবী এবং অন্যান্য সমস্ত দৈনিক নামাজে ইমামতি করছে। অনেক সূরা-কালাম তার জানা, এটা আমার জানা ছিল না। দ্বিতীয়ত, আমার ডান হাতে প্রচণ্ড ব্যথা। জেলখানার ছাব্বিশ সেলে লিখতে লিখতেই ব্যথা অনুভব করি। তারপর এমন পর্যায়ে ব্যথা বৃদ্ধি পেতে থাকে যে লেখালেখি অসম্ভব হয়ে যায়। সবই আল্লাহ্র ইচ্ছা। তাঁর অপার করুণায় বিগত প্রায় ষাট বছরের বেশি সুস্থ-সবল ছিলাম। কোন পরিশ্রমকেই বড় মনে করিনি। আজ নির্দিষ্ট সময় হয়ত সমাপ্ত হতে চলেছে, তাঁর নিদর্শন পাচ্ছি এই হাত ব্যথা থেকে। বাম হাতেও অক্ষমতা numbness এসে যাচ্ছে। দুটো আঙ্গুল ক্রমাগত অসাড় হয়ে পড়ছে। পাইলসজনিত ফিস্‌চুলা আকৈশোর সাথী। ঘাড়ে অনারোগ্য চর্মরোগ Schelorderma. চোখে এখন কম দেখতে পাই। শরীর ক্রমশ শক্তিহীন হয়ে আসছে। বহুমূত্র রোগ তো রয়েছেই।

সবকিছুই আল্লাহ্ তা'আলার পূর্ব নির্ধারিত। জীবনে প্রথম শবে-কদরের ইফতারের পূর্বে পবিত্র কোরআন পড়া সমাপ্ত করলাম—তাও বঙ্গানুবাদসহ। খুব তৃপ্তি পেলাম। সেখানেই দেখেছি আল্লাহ্ বলেছেন মানুষকে একটা সামান্য শুক্রকীট থেকে তৈরি করে, বড় করে, পূর্ণাঙ্গ করে, নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তাঁর এবাদত ও বন্দেগীর জন্য প্রেরণ করেছেন। সংসার ধর্ম করবে অবশ্যই। তবে মানুষের মূল কাজ তার সৃষ্টিকর্তার নিকট আত্মসমর্পণ করা, তাঁর গুণগান করা, তাঁর সংখ্যাতীত নেয়ামতের জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন আর প্রশংসা করা। কিন্তু ভারাক্রান্ত অন্তরে স্বীকার করতে হয়, তা করিনি। ষাট বছরের উর্ধ্বে তাঁর অপার মহিমায় জীবনের প্রতিটি পদে অফুরন্ত করুণা ভোগ করেছি। কৃতজ্ঞতায় মাথা অবনত করতে অবহেলা করেছি, আজ ক্ষমা প্রার্থনার অন্ত নেই। বিদায়ের ঘন্টা বেজে উঠেছে। জীবন সায়াহ্নে দাঁড়িয়ে তাঁর কাছে বারবার কেঁদে কেঁদে ক্ষমা চাইছি। জানি, তিনি অতীব

ক্ষমাশীল। তিনিই তো আমার একমাত্র ভরসা। জীবনে এত গুনাহ্ করেছি তার সীমা নেই। আজ আমি আন্তরিক অনুতপ্ত। ভরসা এইটুক, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর পবিত্র গ্রন্থে বারবার আশ্বাসবাণী শুনিয়েছেন তিনি ক্ষমা করবেন। বান্দা যদি ক্ষমা প্রার্থনা করে, আন্তরিক অনুতপ্ত হয়ে আত্মসমর্পণ করে, আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করেন। এই ভরসায়ই অজানা পথে পা বাড়াবার প্রস্তুতি নিচ্ছি—দুর্বল পন্থায়, অজ্ঞাত নিয়ম-কানুনের অক্ষমতায় কেবল অনুতপ্ত হৃদয়ের প্রবলতম অনুশোচনার অশ্রু-জলে। আল্লাহ্ যদি ক্ষমা করেন, নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমা করবেন।

তৃতীয়ত, এ মাসেরই সতেরো তারিখ বাদ এশা ঘটে গেল আমার জীবনের পরমতম শোকাবহ ঘটনা। আমি তার পরদিন এবারের রোজার শেষ ইফতারি এবং তারাবী নামাজ শেষে জানতে পারি আমার শ্রেষ্ঠতম বান্ধব, আমার অশান্ত জীবনের সুশীতল ছায়া, একান্ত সুহৃদ ও অভিভাবক, আমাকে এখান পর্যন্ত নিয়ে আসার প্রেরণাদাতা, আমার হৃদয়ের মহানতম আসনে আসীন আমার শ্রদ্ধেয় বড় ভাই, আমার প্রিয় বড় দা শাহ্ আলম সাহেব ইহলোক ত্যাগ করে পরলোকে চলে গেছেন। ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন।

এর চাইতে বড় শোক আমার জীবনে আর আসেনি। তিনি কেবল বড় ভাই ছিলেন না, তিনি ছিলেন পিতৃতুল্য, তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ বান্ধব। এমন সচ্চরিত্র, সদাশিব, এমন পরোপকারী, সরল ও পবিত্র মানুষ আমি আমার জীবনে কম দেখেছি। সেই ছোটবেলা থেকে তাঁকে জ্বালিয়েছি। মাতৃহীন হয়েছিলাম একান্ত শৈশবে। পিতৃহীন হয়েছি ছাত্রাবস্থায়। কিন্তু মায়ের স্নেহ ও পিতার দায়িত্ব যিনি অকাতরে সারাটি জীবন পালন করে গেছেন; তিনি আমার একমাত্র অগ্রজ শাহ্ আলম।

দীর্ঘদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন। আমার উপর অত্যধিক ভরসা করতেন। প্রায়ই গিয়ে দেখে আসতাম। হঠাৎ এবার এক অলীক অভিযোগে জাতীয় চার নেতা হত্যার ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকার মিথ্যা ও বানোয়াট সম্পর্ক আবিষ্কার করে আওয়ামী লীগ বা হাসিনা ওয়াজেদ আমাদের তিন জনকে কেবলমাত্র রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার প্রয়াসে গ্রেপ্তার করলে বড় দা ভেঙে পড়েন। মাস দেড়েক পূর্বে অসুস্থ শরীরে তিনি জেলখানায় এসে আমাকে দেখে যান। সে-ই তাঁকে আমার শেষ দেখা। পায়ে হাত দিয়ে সালাম করতেই বুকে জড়িয়ে ধরে একটি দোয়ার আমল পকেটে গুঁজে দিয়েছিলেন। চোখে পানি নিয়ে সাক্ষাতের সময়টুকু পার করলেন। তারপর আর একবার বুকে জড়িয়ে অন্তরমথিত দোয়া উচ্চারণ করতে করতে জেলের গেট পাড় হয়ে গেলেন। আমি চেয়ে চেয়ে দেখলাম। সেই ছিল আমার তাঁকে শেষ দেখা।

সারাজীবন তিনি জেলখানায় আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে গেছেন। সেই জেলখানায়ই হল দু'ভাইয়ের শেষ সাক্ষাৎ। আমি কী তখন তা জানি!

পরে জানতে পারলাম কাজী জাফর সাহেব এবং আমার জামাতা অপু তার ফুপাত ভাই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রফিকুল ইসলামের নিকট এবং সচিবালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নিকট আমাকে 'প্যারোলে' নিয়ে গিয়ে বড় দার জানাজায় শরীক করানোর চেষ্টা করেছে। চেষ্টা করেছে যাতে তাঁর মরদেহ কবরে শুইয়ে দিতে অংশ নিতে পারি, দু'মুঠো মাটি তাঁর কবরে অর্পণ করতে পারি। কিন্তু প্রতিহিংসাপরায়ণা, জেদ-সর্বস্বা, কঠিন-হৃদয়া মহিলা প্রধানমন্ত্রী হাসিনার সরাসরি প্রত্যাখ্যানে তা সম্ভব হল না। প্যারোলের আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হল।

বিধান রয়েছে, দৃষ্টান্তও রয়েছে। এরশাদ সাহেবের শাশুড়ির মৃত্যু হলে তাঁকে ও তাঁর স্ত্রীকে প্যারোল দিয়েছিল বিএনপি সরকার—যে বিএনপি'র আক্রোশের অন্ত ছিল না এরশাদের উপর। আমাদের মামলারই অন্যতম আসামি খায়রুজ্জামান সাহেবকে এই আওয়ামী লীগ সরকারই দু'দিনের জন্য দু'-দু'বার ময়মনসিংহ যাওয়ার প্যারোল দেয় তার মাতৃবিয়োগে, মৃত্যুর দিন এবং কুলখানির দিন। আর মাত্র দু'ঘণ্টার জন্য এই ঢাকা শহরেই আমাকে একটিবার প্যারোল দিল না হাসিনা! রাজনৈতিক প্রতিহিংসা এবং সম্ভবত তাঁর একদার একান্ত অকথিত বেদনার রোষানলের প্রকাশ। কুটিল রমণীর জেদ, প্রতিহিংসা এবং আশাহত মনোস্কামনা ও জিঘাংসার আর একবার বহিঃপ্রকাশ ঘটল এই দাম্ভিক আচরণে। ক্ষমতার অস্বাভাবিক অপপ্রয়োগ এবং সীমা লঙ্ঘনের দুর্বিনীত, অমানবিক ও নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপিত হল। আল্লাহ্ তা'আলা নিশ্চয়ই এ অন্যায় সহ্য করবেন না। চোখের জলে বারংবার আমি সর্ব শক্তিমানের দরবারে এই প্রার্থনাই জানিয়েছি।

তিনটি মামলা দায়ের করা হল। সংবাদপত্রযোগে অবহিত হলাম খাদ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে থাকাকালীন এক লক্ষ টন চাল কেনা হয়েছিল, একটি মামলা সে সম্বন্ধে। সরকারি কর্মকর্তারা যে নোট দিয়েছে, যে মূল্য নির্ধারণ করেছে তাতেই স্বাক্ষর করে রাষ্ট্রপতির নিকট অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করেছি, তিনিও অনুমোদন করেছেন। সরকারি নিয়মে এক কোটি টাকার

উপর কোন ক্রয় থাকলে তা আন্তঃমন্ত্রণালয় ক্রয় কমিটি এবং রাষ্ট্রপতির অনুমোদন প্রয়োজন। সে কারণে যদি অভিযুক্ত হতে হয় তা হলে ক্রয় কমিটির সকল সদস্য, রাষ্ট্রপতি, সচিব এবং সংশ্লিষ্ট আমলারাও অভিযুক্ত হবে। এটাই সাধারণ নীতি। কিন্তু বিএনপি সরকারের আক্রোশ আমার উপর। তাই উল্লেখিত ব্যক্তিবর্গ কেউ আসামি হলেন না, তারা আমাকে একক অভিযুক্ত করে দুর্নীতি দমন বিভাগ থেকে মামলা দায়ের করল। দ্বিতীয় মামলা, জরুরি প্রয়োজনে টেন্ডার আহ্বান না করে চটের বস্তা ক্রয়ের অভিযোগ সংক্রান্ত। তদন্তকারী কর্মকর্তারা যখন এল তাদের পরিষ্কার দেখিয়ে দিলাম, জরুরি ক্রয়ের বিধান আছে এবং সচিব থেকে শুরু করে প্রতিটি কর্মকর্তাই সেই সুপারিশ রেখেছে। এতদ্ব্যতীত টেণ্ডার করলে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হত, সাবেক সরবরাহকারীর নিকট থেকে তার চাইতে নিম্ন মূল্যে ক্রয় করার আদেশ দিয়ে সরকারের প্রভূত অর্থ সাশ্রয় করা গিয়েছে।

কিন্তু আমার কথা অফিসাররা সবাই হৃদয়ঙ্গম করলেও এক হৃদয়হীনা মহিলার কোপানল থেকে পরিত্রাণ নেই। তৃতীয় মামলাটি কেবল বোধগম্য নয়, হাস্যকরও বটে। স্থানীয় সরকার ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে থাকাকালীন বিশিষ্ট সমবায়ী সমিজ দেওয়ানকে সভাপতি করে অটোরিকশা সমবায় সমিতি পুনর্গঠন করেছিলাম। সমিজ দেওয়ান এই সমিতিকে সুন্দর সুষ্ঠুভাবে দাঁড় করিয়েছে এবং পরবর্তী নির্বাচনে প্রত্যক্ষ ভোটে দ্বিতীয়বার সভাপতি নির্বাচিত হয়েছে। ইতিমধ্যে আমার মন্ত্রণালয় পরিবর্তন হয়েছে। আমি তখন খাদ্য মন্ত্রণালয়ে। সমিজ দেওয়ানের নেতৃত্বাধীন সমবায় সমিতি সিদ্ধান্ত নিয়ে সমবায় বিভাগের কর্মকর্তাদের সুপারিশ নিয়ে তদানীন্তন স্থানীয় সরকার ও সমবায় মন্ত্রী নাজিউর রহমানের অনুমতি নিয়ে সমিতির পক্ষ থেকে একটি অটো আমদানির ব্যবস্থা নিয়েছে। যদি কোন অপরাধ হয়েই থাকে, তা হলে সমিতির সদস্যগণ, সভাপতি, সমবায় কর্মকর্তাগণ এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী দায়ী হতে পারে। কিন্তু মামলা হল কেবল আমার বিরুদ্ধে। কেননা, সমিজ দেওয়ান আমার একজন একনিষ্ঠ-কর্মী। একসময় আমিই তাকে সভাপতি করেছিলাম—সে ঘটনার অনেক পূর্বে। কিন্তু তাতে কী আসে-যায়! উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে দিয়ে আমাকে ঘায়েল করাই ওদের একমাত্র চিন্তা।

বারবার নানাভাবে তদন্ত করার পর দুর্নীতি দমন বিভাগের কর্তারা এই তিনটি মামলাতেই আমার কোন অপরাধ বা দুর্নীতি প্রদর্শন করতে না পেরে মামলাগুলোর চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল করল। প্রধানমন্ত্রী হিসাবে বেগম খালেদা জিয়ার নিকট সেসমস্ত ফাইনাল রিপোর্ট পেশ করা হলে সে ক্ষিপ্ত হয়ে সেসব টেবিল থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিল, শাহ্ মোয়াজ্জেমের বিরুদ্ধে কোন মামলা হবে

না এটা হতেই পারে না। ফাইনাল রিপোর্ট দেওয়া চলবে না। চার্জশীট দাখিল কর। কোর্ট-কাচারিতে যা হবার হবে, আপাতত অভিযোগপত্র দায়ের করে গ্রেপ্তার কর।

দুর্নীতি দমন বিভাগের কর্মকর্তারা বিপাকে পড়ল। তারা প্রত্যক্ষ করল চাল ক্রয়ের মামলায় মন্ত্রীকে অভিযুক্ত করলে স্বয়ং রাষ্ট্রপতি, ক্রয় কমিটির সদস্যগণ, মন্ত্রণালয়ের সচিবসহ অনেক কর্মকর্তার বিরুদ্ধেই চার্জশীট দাখিল করতে হয়। সেটা সমুচিত নয় এবং সম্ভবও নয়। সে কারণে তারা প্রথম মামলাটি বাদ দিয়ে পরের দুটি মামলায় চার্জশীট দাখিল করতে বাধ্য হল। একটিতে আমার সঙ্গে সে সময়ের খাদ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী রাজশাহীর নুরুন্নবী চাঁদকেও অভিযুক্ত করা হল।

আমরা মেট্রোপলিটনে চিফ ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট উপস্থিত হয়ে জামিন প্রার্থনা করায় সরকারি বিরোধিতায় তা না-মঞ্জুর হল। আমাদেরকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হল। অবশ্য বেশিদিন থাকতে হল না। সেশন কোর্টে মামলা প্রেরণ করা হলে নিজেই জামিনের জন্য বক্তব্য রাখলাম। যুক্তি-তর্ক দিয়ে প্রমাণ করলাম কোন অপরাধ নয়, কেবল রাজনৈতিক কারণেই আমাদেরকে হয়রান করা হচ্ছে। বিজ্ঞ বিচারক সব হৃদয়ঙ্গম করলেন এবং জামিনের আদেশ প্রদান করলেন।

ছাব্বিশ সেলে বাচ্চু হালদারের তত্ত্বাবধানে এ ক'দিন আমরা জামাই আদরে ছিলাম। মুক্তির ক্ষণে সুরসিক চাঁদ বলল, স্যার, ঢাকার বাইরে আমাকে হোটেলে খেতে হয়। এত সুন্দর আয়োজন ছেড়ে আমাকে বাইরে নিয়ে যাচ্ছেন কেন?

সকলে তার বক্তব্য উপভোগ করল।

এই আমলেই দ্বিতীয়বার কারামুক্ত হয়ে আন্দোলনের পথ বেছে নেওয়া ছাড়া আর গত্যন্তর রইল না। কিন্তু যে সর্ষে দিয়ে ভূত তাড়াব সেই সর্ষেতেই ভূত রয়েছে। দলের প্রভাবশালী কয়েকজনের সঙ্গে নেপথ্যে সরকারের যোগাযোগ রয়েছে। আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপের বার্তা পূর্বাহ্ণেই তাদের নিকট পৌঁছে যায়। মিজান সাহেব তখন দলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান। সাধারণ নির্বাচন ও উপ-নির্বাচনে তার ভালোই আয়-উন্নতি হয়েছে বলে সর্বমহল পরিজ্ঞাত। দলের প্রয়োজনে অর্থ যোগানের ব্যবস্থা থাকলেও কার্যত আমরা প্রয়োজনীয় অর্থ প্রাপ্ত হচ্ছিলাম না। যে সামান্য অর্থ অনিয়মিতভাবে আমার হাতে এসে পৌঁছত তা দিয়ে এত বড় একটি দল পরিচালনা করে, সার্বিক ব্যয়ভার বহন করে একটি বৃহৎ আন্দোলন সংঘটিত করা দুঃসাধ্য। তবুও একের পর এক কর্মসূচির মাধ্যমে এরশাদ সাহেবের মুক্তি আন্দোলনকে জোরদার করার প্রয়াস পেলাম।

একটি বিষয় সুপরিলক্ষিত হল, জাতীয় পার্টির অন্যান্য নেতৃবৃন্দ যখন

বিভিন্ন স্থানে জনসভা করে বা কর্মসূচি পালন করে, সরকারের বা সরকারি দলের তেমন কোন বাধার সম্মুখীন হয় না, সর্বত্রই প্রায় নির্বিঘ্নে তারা সভা-সমাবেশ করতে পারে। কিন্তু যত উপদ্রব আমাকে নিয়ে। আমি যেখানেই যাব বা যে কর্মসূচিতেই অংশ নেব ওরা তা সহ্যই করতে পারে না। সেখানে বিঘ্ন সৃষ্টি করবেই। সরকারি অনুমতি নিয়ে সভা-সমাবেশ করতে গিয়েও পুলিশ ও বিএনপি'র কর্মী বা সন্ত্রাসীদের আক্রমণে তা বারংবার পর্যুদস্ত হয়েছে।

আমার নীতিই বোধহয় মন্দ! দিনে জাতীয় পার্টি, রাতে সরকারি মৈত্রী এটা আমার দ্বারা সম্ভব নয়। এবং এক আল্লাহ্ ছাড়া কারো কাছে মাথা নত করতেও শিখিনি বা কারো মন রক্ষা করে আপসকামী বক্তব্য রাখতেও জানি না বিধায় ওদের আক্রমণের টার্গেট আমিই চিহ্নিত হলাম। যেখানেই গিয়েছি, প্রবল বাধা, সশস্ত্র আক্রমণ, পুলিশের প্রত্যক্ষ প্রতিরোধ এবং বিএনপি কর্মী বলে পরিগণিত দুর্বৃত্তদের হামলার মুখে প্রায়ই সভাস্থল পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম হতাম না। ঢাকার সায়েদাবাদ, গাজীপুর, ময়মনসিংহ, ঈশ্বরদি, চট্টগ্রাম, বরিশাল, শ্রীনগর, সিরাজদিখান প্রভৃতি স্থানে সভাস্থলে পৌঁছতেই পারিনি। বিভিন্ন মারাত্মক অস্ত্রাদি সজ্জিত বাহিনী ও পুলিশের সম্মিলিত আক্রমণে সভাস্থলে যাওয়ারই সুযোগ ঘটেনি।

'৯২ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি লিপ-ইয়ার দিবস। সে দিনটিকেই ধার্য করলাম ঢাকায় মহাসমাবেশ অনুষ্ঠিত করার জন্য। সমগ্র দেশের দলীয় কর্মী ও শুভানুধ্যায়ীদের সংগঠিত করার উদ্যোগ নেওয়া হল। সর্বত্র ব্যক্তিগত যোগাযোগে জেলা নেতৃবৃন্দকে জানান হল মহাসমাবেশকে সর্বাত্মক সফল করে তোলার জন্য। ব্যাপক সাড়া পেলাম। পদত্যাগের পূর্বে কয়েকবার তাদের ঢাকা আনার প্রচেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছি, এবার সে সম্ভাবনা নেই, কাজেই দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকেও সমাবেশে যোগদানের আগ্রহ পরিলক্ষিত হল। সকলকে জানিয়ে দিলাম, নিজেদের ব্যয়ে এবং নিজেদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থায় তারা একদিনের জন্য ঢাকা আসবে এবং নেতার মুক্তির দাবিতে রাজধানীকে প্রকম্পিত করে তুলবে। সকলে সে শর্তেই সম্মত।

প্রথম বাধা এল সরকার থেকে মহাসমাবেশের স্থান নিয়ে। শেরে বাংলা নগরে মানিক মিয়া এভিনিউতেই এ ধরনের সম্মেলন হতে পারে। কিন্তু সরকার জাতীয় পার্টিকে সে স্থান দেবে না। বিকল্প হিসাবে বিজয় স্মরণী, পুরানা পল্টন বা পান্থপথ যে কোন স্থানে সমাবেশ করার অনুমতি প্রার্থনা করেও ব্যর্থ হলাম। ইতিমধ্যে প্রচারপত্র, পোস্টার-লিফলেট সর্বত্র চলে গিয়েছে। সরকার আমাদেরকে শেষ পর্যন্ত শহরের এক প্রান্তে সায়েদাবাদ রাস্তায় সমাবেশ করার অনুমতি প্রদান করল। উপায়ান্তর না দেখে আমরা তাতেই সম্মত হলাম, দেশের দূর-দূরান্ত থেকে যারা ছুটে আসবে তারা শহরের প্রান্তে সায়েদাবাদেও যেতে পারবে। কিন্তু বিএনপি সরকারের যে

কুমতলব ছিল তা আমরা পূর্বাহ্নে আঁচ করতে পারিনি। গণতন্ত্র গণতন্ত্র করে যাদের পেটের ভাত হজম হয় না, তারা সশস্ত্র আক্রমণের মাধ্যমে অনুমতিপ্রাপ্ত সমাবেশকে যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত করে ভণ্ডুল করে দেবে তা কোন সুস্থ চিন্তার মানুষ উপলব্ধি করতে পারে না। সায়েদাবাদে নিয়ে যাওয়ারও একটা হীন উদ্দেশ্য ছিল। দু'দিক থেকে আক্রমণ করলে পালাবার সুযোগ পাওয়া যাবে না, গণতন্ত্রের লেবাসধারীরা সেসব হিসাব-নিকাশ করেই আমাদেরকে এখানে অনুমতি দিয়েছে। কিন্তু আমাদের তো সমাবেশ করতেই হবে। বাংলাদেশের প্রায় সমস্ত জেলা থেকে মানুষের ঢল নেমে আসছিল। আগের রাতে প্যান্ডেল প্রস্তুতির ক্ষণ থেকে বিএনপি'র লোকেরা অস্ত্রাদি নিয়ে প্যান্ডেল তৈরিতে বাধা প্রদান করে। মহানগরীর জাতীয় পার্টির সভাপতি অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল মালেক এবং সাধারণ সম্পাদক আবদুস সালামের অক্লান্ত প্রচেষ্টা ও সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানে আমাদের কর্মীরা সারা রাত জেগে প্রহরা দিয়ে কোন প্রকারে প্যান্ডেল রচনায় সহায়তা করে।

সেদিন সকাল হতে সারা দেশ থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ ঢাকা ছুটে আসছিল মহাসমাবেশে যোগদানের জন্য। বিভিন্ন পথে, বিভিন্ন যানে তারা ঢাকায় এসে পৌঁছেছে পথের শত বাঁধা ও আক্রমণ প্রতিহত করে। কিন্তু সায়েদাবাদ পৌঁছার সবক'টি রাস্তা সরকারি সন্ত্রাসী ও পুলিশ সম্মিলিতভাবে আটকে দিয়েছে যাতে সমাবেশ স্থলে জনসমাগম না হয়। সর্বক্ষণ সংবাদ পাচ্ছিলাম আমাদের নেতৃবৃন্দকে কোনক্রমেই সমাবেশ স্থলে যেতে দেওয়া হবে না।

কারণ কী? বিএনপি এবং জাতীয় পার্টি একই বাড়ির, একই ঘরে, একই খাবার টেবিলে জন্ম নিয়েছে। জিয়াউর রহমান সাহেবের ঐকান্তিকতায় তাঁর রাজনৈতিক দলটির শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে। কিন্তু রাজনৈতিক দলের গুরুত্বের উপর অপেক্ষাকৃত কম নির্ভরশীল এরশাদ সাহেবের দলটি ততটা দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত নয়। তাই প্রথম থেকেই পিটিয়ে দলটিকে যদি নিঃশেষ করে দেওয়া যায়, তবে জাতীয়তাবাদী মুসলিম ভোট এককভাবে বিএনপি'ই পকেটস্থ করবে এই ধারণা থেকেই তারা অত্যাচার-নির্যাতনের স্টিমরোলার চালিয়ে জাতীয় পার্টিকে পর্যুদস্ত করে দেওয়ার নকশা প্রণয়ন করে।

তাই মহাসমাবেশ তারা অনুষ্ঠিত হতে দেবে না। প্রচুর বাজেট করে একে নস্যাৎ করার দুরভিসন্ধি নিয়ে তারা মাঠে নামে এবং অনেকটা সফলও হয়। সমাবেশ তাদের আগ্নেয়াস্ত্রের মুখে সংঘটিত হতে না পারলেও এ কথা অনস্বীকার্য যে, জাতীয় পার্টি দশটি সমাবেশ করে যে প্রচারণা অর্জন করতে পারত না—সে প্রচারণাই গায়ের জোরে অস্ত্রের মুখে পিটিয়ে জাতীয় পার্টির জমার ঘরে এনে দিল বেগম খালেদা জিয়া এবং তার দোসরগণ।

আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম একটি মাইক্রোবাসে করে আমি, মিজান সাহেব,

মওদুদ ও মালেক সাহেব একসঙ্গে সমাবেশে পৌঁছবার চেষ্টা করব। ইকবাল এগিয়ে এল তার মাইক্রোবাস নিয়ে।

সমাবেশে যাওয়ার প্রস্তুতি লগ্নে ময়মনসিংহ জেলা কমিটির সভাপতি খুররম খান চৌধুরী একটি বুলেট প্রুফ ভেস্ট আমাকে পরিয়ে দিল। তার ধারণা আমাকে লক্ষ্য করে ওরা গুলি করবেই এবং যদি ভেস্টের কারণে বেঁচে যাই। সালেহাকে ডেকে বললাম, আমার ছেলে-মেয়ে রইল। আর যা কিছু রয়েছে সব কিছুর কাগজপত্র রেখে গেলাম। ফিরে যদি না আসতে পারি তুমি সব দেখো।

সে চোখে আঁচল দিয়ে অন্য ঘরে চলে গেল। সে জানে আমাকে বাঁধা দিয়ে লাভ নেই। দিনার কপালে চুমো খেয়ে গাড়িতে গিয়ে বসলাম। সকলকে নিয়ে মালিবাগ চৌধুরী পাড়া হয়ে রওয়ানা দিতেই রেল গেটে কাজী জাফর সাহেবের গাড়ি প্রত্যাবর্তন করতে দেখলাম। সে জানাল, এ পথে ঢোকার কোন উপায় নেই। বিএনপি'র দুর্বৃত্তরা রাস্তা দখল করে গোলাগুলি করছে, এ পথে এগুবার প্রশ্নই আসে না।

ইকবাল আমাদেরকে ওর বাসায় নিয়ে গেল। আমরা অপেক্ষা করব, সে দেখে আসবে কোন পথে আমাদের নিয়ে যাওয়া যায় কিনা। ঘণ্টাখানেক পরে সে এসে আমাদেরকে ভিন্ন পথে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব করল, কিন্তু সে পথেও প্রচুর বিপদ। কিন্তু সে একবার চেষ্টা করে দেখতে পারে।

আমরা তাতেই সম্মত হয়ে আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। সায়েদাবাদ চৌরাস্তার মোড়ে বিএনপি'র সশস্ত্র ক্যাডারদের সম্মুখে পড়ে গেলাম। ইকবাল প্রাণপণ করে গাড়ি চালিয়ে এগুতে থাকল। চতুর্দিক থেকে বোমা, গুলি, ককটেল আর রামদায়ের কোপ বৃষ্টির মতো মাইক্রোবাসে পড়তে থাকল। গাড়ির দরজা-জানালা, কাঁচ সব ভেঙে চুরমার। কিন্তু ইকবালের হাতের স্টিয়ারিং ঠিক রয়েছে এবং আল্লাহ্‌র অপার করুণায় আমরা প্রায় অক্ষতই রইলাম। তিনি রক্ষা করলে মানুষে কী করতে পারে!

মঞ্চের নিকটবর্তী হতেই আমরা লাফিয়ে নেমে সেখানে উপস্থিত হওয়ার উদ্যোগ নিতেই ওরা বুঝে ফেলল নেতৃবৃন্দ সমাবেশে শেষ পর্যন্ত এসে পৌঁছে গিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চ লক্ষ্য করে ওরা বোমা চার্জ করতে থাকল। পুলিশও রাইফেল থেকে গুলি ছুঁড়তে লাগল। মঞ্চে আগুন ধরে গেল। কর্মীরা প্রাণরক্ষার জন্য দিগ্বিদিক ছুটে গেল। অসংখ্য মানুষ গুরুতর আহত হল। বিএনপি'র সন্ত্রাসীরা চতুর্দিক থেকে আমাদের মাইকগুলো পিটিয়ে ভেঙে ফেলল। চারদিকে চরম অরাজকতার মুখে আমি মঞ্চে ওঠার চেষ্টা করতে কর্মীরা জোর করে আমাকে ধরে সায়েদাবাদের এক গলির অভ্যন্তরে এক ব্যবসায়ীর বাসায় নিয়ে আটকে রাখল। তারা জানে, আমি সুযোগ পেলেই অকুস্থলে ছুটে যাব—তারা এটাকে উন্মত্ততা এবং আত্মহত্যারই শামিল মনে

করছিল। কোনভাবে খালেদুর রহমান টিটো আমার আস্তানায় এসে পড়ল। তাকে দেখে এত পরিশ্রম, এত অর্থ ব্যয় ও এত উদ্যোগের এই পরিণতি দেখে আমি হাউমাউ করে কেঁদে উঠলাম। টিটোও আমাকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়ল।

যে বাড়িতে আশ্রয় পেয়েছিলাম, ঘটনাক্রমে সে বাড়িটি ছিল মহানগরের সম্পাদক সালামের ভগ্নিপতির বাড়ি। তারা প্রচুর আদর-আপ্যায়ন করল। সালামের স্ত্রী জাতীয় পার্টির মহানগরের একজন কর্মকর্তা। সৈয়দা ফাতেমা বানুও সেখানে এসে উপস্থিত হল। ওরা স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই ছিল আমার স্নেহধন্য। সে আমাকে বুলেট প্রুফ ভেস্ট পরা দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। বলল, ওদের টার্গেট নাকি আমিই ছিলাম।

পরম করুণাময়ের অপার মহিমায় আর একবার জীবন-সংশয় থেকে উদ্ধার পেলাম। অচিরেই জানতে পারলাম অন্যান্য নেতৃবৃন্দ সায়েদাবাদের হুজুরের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে। সেখানে গিয়ে সকলকে নিয়ে একটি বাস যোগাড় করে মিজান সাহেবের গুলশানের বাসায় ফিরে এসে দেখতে পেলাম ইতিমধ্যে কাজ অনেকটা এগিয়ে রেখেছে জাফর সাহেব। সে অন্য রাস্তায় সমাবেশে পৌঁছার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসে সব জানতে পেরে তাৎক্ষণিকভাবে আমাদের জন্য সংবাদ সম্মেলনের ব্যবস্থা করে রেখেছে। নিন্দা, প্রতিবাদ আর এই নির্যাতনের বিরুদ্ধে জনসংযোগের কর্মসূচি গ্রহণ করা হল। ধর্মঘটের সপক্ষে অনেকের মত থাকলেও পার্টি যেহেতু ধর্মঘটকে স্বাগত জানায় না, সেহেতু সে কর্মসূচি নেওয়া হল না।

সিদ্ধান্ত হল, বিএনপি সরকারের এই নজিরবিহীন নির্যাতন ও সন্ত্রাসের ঘটনা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়া হবে। গণতন্ত্রের লেবাস পরা হিটলার-মুসোলিনী আর চেঙ্গিস খানের বংশধরদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে দিতে হবে। নেতার মুক্তি আন্দোলন ওরা স্তব্ধ করতে পারবে না। যে কোন মূল্যে দলের কর্মসূচিকে অধিকতর বেগবান করে তুলতে হবে।

জাতীয় পার্টির উপর বিএনপি'র এই অভিযান শত সমালোচনা বা নিন্দায়ও হ্রাস পেল না। যে কোন প্রকারেই হোক জাতীয় পার্টিকে স্তব্ধ করে দিতে হবে। এটা ওদের ক্রুসেড।

বায়তুল মোকাররমের উত্তর-গেটে আমাদের সভার অনুমতি ছিল। সভা জমে উঠতেই প্রেসক্লাবের সম্মুখ থেকে কয়েকজন মন্ত্রী এবং এমপি'র নেতৃত্বে সন্ত্রাসীরা পুলিশসহ অস্ত্রাদি নিয়ে আমাদের আক্রমণ করল। পশ্চিম প্রান্ত থেকে গুলি করতে করতে ওরা সভা ভণ্ডুল করার জন্য এগিয়ে এল। জনসাধারণ প্রাণভয়ে চতুর্দিকে ছুটে পালাল। জনতার চাপে আমাদের মঞ্চটি ভেঙে পড়ল। মওদুদ আহত হয়ে কোমরে ব্যথা পেল। সে এবং মিজান সাহেব দ্রুত বায়তুল মোকাররমের মসজিদের অভ্যন্তরে নিরাপদ আশ্রয় নিতে

বাধ্য হল। আমি পশ্চাদপসরণ করতে শিখিনি। তাই অনেকক্ষেত্রেই বিপদের সম্মুখীন হতে হয়। ভাঙা ডায়াসের একদিকে একটি টেবিলে চেপে আমি ওদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য আহ্বান রাখলাম কর্মীদের প্রতি। মাইক্রোফোন তখনও কাজ করছিল। আমাদের নিরস্ত্র-কর্মীরা অসম সাহসিকতার সঙ্গে ফোল্ডিং চেয়ার, ভাঙা ডায়াসের কাঠ, বাঁশ যা পেল তা-ই নিয়ে ওদেরকে রুখে দাঁড়াবার চেষ্টা করল। আমি যখন বক্তৃতা করছি টেবিলের উপর থেকে তখন রাস্তার উত্তর পাশের একটি ঘরের ভিতর থেকে আমাকে লক্ষ্য করে তিন রাউন্ড গুলি বর্ষিত হল। ভাগ্যক্রমে অল্প দূর থেকে বর্ষিত গুলিও আমাকে বিদ্ধ করতে পারেনি। একটি বুলেট এসে যে বাঁশটি ধরে আমি ভাঙা টেবিল থেকে বক্তৃতা করছিলাম তাতে বিদ্ধ হতেই কর্মীরা পাগলের মতো আমাকে টেনে-হিঁচড়ে নামাতে গেল। পীরগঞ্জের আবেদ এ সভায় উপস্থিত ছিল। সে আমার দু'পা জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠল, স্যার, ওরা আপনাকে মেরে ফেলবে। জীবন বাঁচান।

কয়েকজন মিলে জোর করে আমাকে নামিয়ে আনল। আমার পায়ে ভাঙা ডায়াসের একটি লোহার গজাল ঢুকে রক্তপাত হতে থাকল। মানুষ মনে করল আমার পায়ে গুলি লেগেছে, কিন্তু ওটা ছিল সামান্য দুর্ঘটনা। কর্মীরা আমাকে গাড়িতে করে বাসায় নিয়ে এসে চিকিৎসার ব্যবস্থা করল। সেদিন ছিল আমার শ্যালক আমেরিকা প্রবাসী জামালের বিয়ে। আমার বাসা থেকে সে বিয়ে করছিল। আত্মীয়স্বজনে বাড়ি ভর্তি। পায়ের আঘাতের কারণে ওর বিয়েতে যেতে পারলাম না।

দু'দিন পর শুনলাম, বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্যান্টিনে বসে বিএনপি'র আর্মক্যাডার গালিব তার বন্ধুদের বলছিল, তোমরা কেউ শাহ্ মোয়াজ্জেমকে মারার চেষ্টা করো না, পারবে না। আল্লাহ্‌র বিশেষ রহমত রয়েছে তার উপর। নতুবা আমি একজন শার্প স্যুটার, এক গুলিতেই একজন বিদ্ধ করি। তিন তিনটা গুলি করলাম মাত্র কয়েক গজ দূর থেকে এবং সে নিজেও ক্ষীণদেহী নয়। তবুও একটি গুলিও তাকে বিদ্ধ করতে পারল না। কারো দোয়া তাকে ঘিরে রেখেছে। তা না হলে আমার নিশানা ব্যর্থ হওয়ার কথা নয়!

এই ঘটনার ঠিক দু'দিন পর, বিশ্ববিদ্যালয়ে অহরহ যা ঘটছে—দু'দল সশস্ত্র ক্যাডারের মধ্যে গোলাগুলি হওয়ার সময় ক্রস ফায়ারিংয়ের শিকার হয়ে সেই গালিব নিহত হল। আল্লাহ্ আমাকে আজও বাঁচিয়ে রেখেছেন। তাঁর অপার মহিমার শেষ নেই।

গাজীপুর জনসভা করতে গেলাম। শফিকুল ইসলাম বাবুল উদ্যোগী হয়ে আমাকে নিয়ে গেল। পুলিশ আমাকে ব্যারিকেড দিয়ে সভায় যেতে দিল না। বললাম, আমি এখন সংসদ সদস্য। তোমরা আমার পথ আটকাও কী করে!

ওরা বলল, স্যার, আপনার উপর আক্রমণ হোক তা আমরা ঘটতে দিতে পারি না।

বললাম, তোমরাই প্রথম আক্রমণ করছ। আমার সাংবিধানিক অধিকার পালন করতে দিচ্ছ না। জনসভায় যেতে না দিয়ে তোমরাই সর্বাগ্রে আইন ভাঙছ।

ওরা বলে, স্যার, আমরা নিরুপায়। উপরের চাপ।

এই উপরের চাপের কথা শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে গেল। শেষে একদিন বক্তৃতায় বললাম, তোমরা কথায় কথায় বল উপরের চাপ। উপরে তো বসে আছে একজন মহিলা। তার চাপই যদি সামলাতে না পার, পুরুষ মানুষ যখন উপর থেকে চাপ দেবে তখন সামলাবে কী করে?

ঈশ্বরদী জনসভা করতে গিয়ে শহরেই ঢুকতে পারলাম না। মঞ্জুর বিশ্বাসের অক্লান্ত পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় নিষ্ফল হল। সকল মারাত্মক অস্ত্রে সজ্জিত গণতন্ত্রের সুপুত্রদের পদভারে ঈশ্বরদি প্রকম্পিত। কুষ্টিয়া জেলার বর্ডারে এসে পুলিশ আমাকে আটকাল। বলল, স্যার, ঈশ্বরদি ঢুকবেন না, আপনার জীবন সংশয়।

বললাম, সরকারি কোষাগারের অর্থ খেয়ে গায়ের চামড়া মোটা করছ, তোমরা আছ কী প্রয়োজনে?

আবার সেই এক উত্তর, আমরা নিরুপায়, উপরের চাপ।

আমি এবং মিজান সাহেব গিয়েছি নরসিংদীর মনোহরদিতে সভা করতে। মানুষ দূরদূরান্ত থেকে আমাদের বক্তব্য শুনতে এসেছে। প্রচুর জনসমাগম হয়েছে। আমার বক্তৃতার মাঝখানেই ওরা বোমা ফাটাল। মানুষ ছত্রভঙ্গ হওয়ার উপক্রম হতেই কণ্ঠস্বর বৃদ্ধি করে সকলকে শান্ত থাকার আহ্বান জানালাম। বোমা মেরে ওরা সুবিধা করতে পারল না। সভা অধিকতর জমে উঠল। বক্তৃতা করলাম জ্বালাময়ী ভাষায়। সভা নস্যাৎ করতে ব্যর্থ হয়ে মাঠ সংলগ্ন বাজারের ঝুপড়ি ঘরে ওরা ওৎ পেতে রইল। সভা শেষে আমরা যখন প্রত্যাবর্তন করছি তখন আমাদের লক্ষ্য করে গুলি বর্ষণ করতে লাগল। মিজান সাহেব এবং আমি হাঁটুর মধ্যে মাথা রেখে নিজেদের বাঁচাবার চেষ্টা করলাম। ওদের গুলি গাড়ির কাঁচ চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিলেও আল্লাহ্ তা'আলার অশেষ করুণায় আমরা অক্ষত রইলাম। ড্রাইভারের পাশে উপবিষ্ট শ্রমিক নেতা দেলোয়ার হোসেন সেদিন প্রচুর সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিল। সে তার রিভলবার থেকে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে গাড়ি অকুস্থল পেরিয়ে এল।

আমার জেলা মুন্সীগঞ্জ আমার জন্য নিষিদ্ধ হয়ে গেল। সকল নেতৃবৃন্দ নিজ নিজ এলাকায় সভা-সমাবেশ করতে পারবে, কিন্তু আমি যেন বিক্রমপুরে ঢুকতে না পারি। বিএনপি'র পাঁচটি বছর প্রায় একইভাবে কাটল। দু'বার

শ্রীনগর ও সিরাজদিখানে দলের উপজেলা সম্মেলন উপলক্ষে কর্মীরা পোস্টার-লিফলেট প্রচার করল কিন্তু আমি উপস্থিত হতে পারলাম না।

যেদিন শ্রীনগর উপজেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে সেদিন শ্রীনগর পৌঁছার সবক'টি রাস্তা ওরা আটকে আমার অপেক্ষা করতে লাগল। সে অপকর্মে পুলিশ সরাসরি তাদের সহায়তা দিল। দা, কুড়াল, স্টেনগান, রাইফেল, বন্দুক, পিস্তল নিয়ে ট্রাকে চড়ে ওরা মাওয়া থেকে কুচিয়ামারা পর্যন্ত টহল দিতে লাগল। সে টহলে পুলিশও অংশ নিল। কুচিরামারা এবং মাওয়ায় শত শত অস্ত্রধারী সমবেত হল—যে প্রকারেই হোক আমি যাতে শ্রীনগর যেতে না পারি। পূর্বাহ্নে সংবাদ পেয়ে ভাগ্নে বাশার এবং কাদের আমাকে পূর্বরাতে বিক্রমপুর নিয়ে গেল এবং কাজীর পাগলায় তাদের সুরম্য অট্টালিকায় অবস্থানের ব্যবস্থা করল। আমার বিরুদ্ধে বিএনপি'র এই অভিযানে নেতৃত্ব দান করল আমারই একসময়ের সহপাঠী এবং বন্ধু হামিদুল্লাহ। উইং কমাণ্ডার হিসাবে তার চাকরি চলে যাওয়ায় আমিই তাকে পুনর্বহালের উদ্যোগ নেই। সে সময় সস্ত্রীক মিন্টু রোডের আমার সরকারি বাসায় এসে চোখের জলে সে কী কান্না! যখন আশ্বাস দিলাম তার পুনর্বহাল হবে সে অশ্রুভেজা-কণ্ঠে আমাকে জড়িয়ে ধরে বলেছিল, সে ইউনিফর্ম ফিরে পেলে আমাকে এসে তার জীবনের Smartest salute প্রদান করবে।

বলেছিলাম, বন্ধুকে অভিবাদনের প্রয়োজন করে না, কৃতজ্ঞতা স্মরণ রাখলেই চলবে।

সে অপূর্ব কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছিল আমার বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভিযানের নেতৃত্ব দিয়ে। তাকে কেবল চাকরিই প্রত্যর্পণে সহায়তা করিনি, অবসর গ্রহণের পর যখন সে আমাদের নির্বাচনী এলাকা থেকে প্রবীণ আওয়ামী লীগ নেতা কোরবান আলী সাহেবের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করল, আমাদের দল নির্বাচন বর্জন করলেও কেবলমাত্র কোরবান সাহেবকে পরাজিত করার জন্য আমাদের সমস্ত কর্মীরা এবং আমি নিজেও নির্বাচনে তার পক্ষে অংশ নিয়ে তাকে বিজয়ী হতে সাহায্য করি। সেই কৃতজ্ঞতার ঋণ সে পরিশোধ করল কয়েকশত অস্ত্রধারী একত্র করে আমাকে প্রাণে বধ করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। শোনা গেল বদরুদ্দোজা চৌধুরী নেপথ্যে কলকাঠি নাড়লেও খোদ নেত্রী নাকি এই নির্দেশ প্রদান করেছে। বিক্রমপুরের চার জন বিএনপি এমপি'র তিন জনই মন্ত্রী। একমাত্র অপাঙক্তেয় হামিদুল্লাহ। সুতরাং আমার বিরুদ্ধে সর্বাত্মক অভিযান পরিচালনায় তার উৎসাহ অত্যধিক। এইভাবে যদি নেত্রীর সদয় সৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়!

আমি বাশারদের বাড়িতে এসে উঠেছি। সংবাদ পেয়ে হামিদুল্লাহ্ সে বাড়ির সন্নিকটে বিশ্বরোডের উপর অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীদের সমাবেশ করল বাসারদের বাড়ি আক্রমণের উদ্দেশ্য নিয়ে। বাসারের বাড়ি এবং এই

অস্ত্রধারীদের সমাবেশের মাঝখানে শ'খানেক পুলিশ অবস্থান নিল। আমরা উপজেলা সম্মেলন বাতিল করে ঢাকা প্রত্যাবর্তনের চিন্তা করছিলাম। পুলিশের অবস্থান উপেক্ষা করে বরং তাদের প্রচ্ছন্ন সহায়তায় হামিদুল্লাহর নেতৃত্বে ওরা আমার অবস্থানস্থলে আক্রমণ করতে এগিয়ে এল। সেসময় বাসার এবং কাদের এবং আমাদের স্থানীয়-কর্মীরা যে সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছে তার তুলনা হয় না। জীবনের মায়া পরিত্যাগ করে ওরাও প্রতিরোধের আয়োজনে লিপ্ত হল। ওদেরকে হাত ধরে অনুরোধ করলাম, কোনক্রমেই আমাকে বাঁচাতে গিয়ে তোমাদের হাতে যেন কোন রক্তপাত না হয়।

গ্রামের সাধারণ মানুষ, এমনকি বউ-ঝি'রা পর্যন্ত ক্ষেপে গেল। এ কেমন কথা, উনি সভা না করে ফিরে যেতে চায়! কিন্তু তাকে প্রাণে বধ না করা পর্যন্ত ওদের তৃপ্তি হবে না। তারাও যে যা পেল, খুন্তি, বঁটি, দা এবং বৈধ অস্ত্রাদি নিয়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিল। অবস্থা বেগতিক উপলব্ধি করে পুলিশ কর্মকর্তাকে ডেকে বললাম, আমি একজন সংসদ সদস্য, দেশের সাবেক উপ-প্রধানমন্ত্রী এবং সংসদে তৃতীয় বৃহত্তম দলের মহাসচিব। আমাকে প্রকাশ্যে হত্যা করার আয়োজন চলছে তোমাদের চোখের সামনে এবং তোমাদের সহযোগিতায়। তোমরা কী বাংলাদেশ পুলিশ না বিএনপি পুলিশ? একদিন এর খেসারত তোমাদের দিতে হবে!

পুলিশ পরিস্থিতি কিছুটা হৃদয়ঙ্গম করে দুই দলের মাঝখানে বাফার জোন তৈরি করে একটি বৃহৎ রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ এড়াতে সক্ষম হল।

সম্মুখ সমরের সুযোগ হারিয়ে ওরা ভিন্নপথের অন্বেষণ করল। কে জাতীয় পার্টি, কে বিএনপি শরীরে লেখা নেই। তাই ওরা এক যুবককে রিভলবারসহ আমার অবস্থানে পাঠিয়ে দিল। সে যদি আমাকে মেরে ফিরে যেতে পারে তা হলে তাকে অভাবিত পুরস্কৃত করা হবে। স্বল্প বয়সের কারণে হিতাহিত বোধশূন্য সে যুবক আমার কর্মীদের হাতে ধরা পড়ে গেল। তাকে যখন আমার তৃতলের ঘরে আনা হল জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম শ্রীনগর থানারই এক গ্রামের ছেলে সে।

তার গ্রামের নাম শুনে মনে পড়ল সে গ্রামের এক ভদ্রলোক আমার বেইলী রোডের সরকারি বাসায় এসে একবার কেঁদে পড়ল, তার ছেলে রাস্তা পার হতে গিয়ে চোখের মধ্যে বাঁশের কঞ্চিতে আঘাত প্রাপ্তির ফলে একটি চোখ নষ্ট হয়ে যাবার উপক্রম। সে গরিব মানুষ এবং সেটি তার জ্যেষ্ঠ সন্তান এবং তার ভরসার স্থল। দেশের মানুষ হিসাবে তার ছেলের চিকিৎসার যদি ব্যবস্থা না করে দিই, তবে ছেলেটির চোখ নষ্ট হয়ে যাবে।

শুনে সহানুভূতি হল। চক্ষু হাসপাতালের প্রধানকে যোগাযোগ করে ছেলের ভর্তি ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম। হাসপাতালের ব্যয়ও বহন করতে হয়েছিল। সৌভাগ্যক্রমে ছেলেটির চোখ সেরে ওঠে এবং সে সুস্থ

হয়ে বাড়ি প্রত্যাবর্তন করলে তার পিতা এসে বারবার কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেছিল, এ উপকার সে জীবনে শোধ করতে পারবে না।

আততায়ী যুবক সেই গ্রামেরই ছেলে। তার নিকট জানতে চাইলাম এ ধরনের কোন ছেলেকে সে চেনে কিনা। আমার মনে হয়েছিল, হয়ত সেই ছেলেটি ইতিমধ্যে বিদেশে চলে গিয়ে থাকবে। আমার প্রশ্ন শোনার পরই যুবকটি যেন কেমন হয়ে গেল। আমার দু'পা জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়ে সে জানাল সেই ছেলেটি আর কেউ নয়, সে নিজেই। তারই চোখ আমার কারণে সেরে উঠেছিল!

অবাক বিস্ময়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি জানতে যে তোমার চিকিৎসার ব্যবস্থা আমি করে দিয়েছিলাম?

সে বলল, জানতাম। আমার বাবা আমাকে সবই বলেছেন।

জিজ্ঞেস করলাম, কলেজে পড়?

সে বলল, হ্যাঁ, কলেজে পড়ি।

তোমাদের এই কলেজ আমার প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত এবং সরকারিকরণ করা হয়েছে, জানো?

সে বলল, স্যার, জানি।

তুমি যে রাস্তা দিয়ে কলেজে যাও সেটি কে পাকা করে দিয়েছে জানো?

জানি, আপনি।

বাড়িতে বিদ্যুৎ আছে?

আছে।

কে এনে দিয়েছে জানো?

জানি, আপনি। সবই আপনার উদ্যোগে হয়েছে।

তা হলে এখন বল, তোমার উপর এমন কী অন্যায় বা অপরাধ আমি করেছি যার জন্য আমাকে হত্যা করতে এগিয়ে এলে?

সে তখন বলল, স্যার, আপনি কোন অন্যায়ই করেননি। দলে ঢুকে আমি বিপথগামী হই। ওরা আমাকে সাহসী জেনে এই রিভলবার দিয়ে লোভ দেখায় যদি আপনাকে শেষ করতে পারি লক্ষ লক্ষ টাকা পাব। আমার হিতাহিত জ্ঞান লোপ পেয়েছিল। আপনার অত বড় উপকার বিস্মৃত হয়েছিলাম। আমাকে ক্ষমা করেন স্যার।

ক্ষমাই করলাম। মনে পড়ল ওর কৃতজ্ঞ পিতার সেই কথা, জীবনে এই উপকার শোধ করতে পারব না।

পিতা না পারলেও তার সুযোগ্য সন্তান সে দায়িত্ব পালনের চেষ্টার ত্রুটি করেনি। ভাগ্য ভালো, আল্লাহ্‌র ইচ্ছা অন্যরকম। তাই তাঁর কৃতজ্ঞতার ঋণ শোধ হয়নি।

আমাদের এলাকার অনেক মানুষের এই একটি গুণ সর্বদা পরিলক্ষিত

হয়। যদি কারো উপকার করা যায়, সে একদিন না একদিন তার প্রতিদানে উপকারীর ক্ষতি সাধন করার চেষ্টা করবেই। যাদেরকে সামান্য স্থান থেকে তুলে এনেছি, কেউ চিনত না, জানত না; ধরে এনে ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান, উপজেলা চেয়ারম্যান, সংসদ সদস্য, জেলা চেয়ারম্যান, জেলা পরিষদের সদস্য এবং অন্যান্য পদ প্রদান করা হয়েছে; লাইসেন্স-পারমিট ব্যবসা-বাণিজ্য, বাড়ি-ঘর, গাড়ি, পাসপোর্ট সব কিছুর ব্যবস্থা করায় প্রতিনিয়ত সহায়তা করেছি, দেখা গিয়েছে আখের গুছিয়ে অপর্যাপ্ত অর্থ সম্পদ লাভের পরই প্রথম সুযোগেই তারা সেসব বেমালুম ভুলে গিয়েছে। শুধু তা-ই নয়, গায়ে খেটে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে তারা আমার চরম বিরোধিতাও করেছে।

দোষ নিশ্চয়ই আমার! এত লোক তো আর মন্দ হতে পারে না। আমারই কোন অসম্পূর্ণতার কারণে এরা সরে গিয়েছে। অবশ্য যতদিন ক্ষমতার আসনে আসীন ছিলাম, একজনও অন্য কোথাও যায়নি। সকলেই ভিড় করেছিল চারপাশে।

জেলার যে সমস্ত মানুষের স্বাধীনতার পর গাড়ি হয়েছে, বাড়ি হয়েছে, দোকান, প্লট, মার্কেট, পাসপোর্ট, এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট, লাইসেন্স, বন্দুক-রিভলবার হয়েছে, চাকরি, ট্রান্সফার, বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজে ভর্তির ব্যবস্থা হয়েছে তাদের এক শ' জনের মধ্যে নব্বই জনের সেদিনের কাগজাদি পরীক্ষা করলে আমার স্বাক্ষর পাওয়া যাবে। মীরপুর, মোহাম্মদপুর, ইসলামপুর বা ঢাকার যে কোন এলাকায় এখন যারা জাঁকিয়ে বসে আছেন, তাদের সেদিনের উদ্যোগের পশ্চাতে আমারই সহযোগিতা কাজ করেছে। তখন বিক্রমপুর থেকে নির্বাচিতদের মধ্যে একমাত্র আমিই ছিলাম সরকারি ক্ষমতায়। সেসময় সুপারিশ ও টেলিফোনের কার্যকারিতা ছিল অপরিসীম।

উপকারীর উপকার বিস্মৃত হয়ে তার অপকার না করা পর্যন্ত কারো কারো তৃপ্তি হয় না। সারাজীবন এ সত্য প্রত্যক্ষ করে এসেছি। তাই ছেলেটিকে ছেড়ে দিলাম। পুলিশের হাতে তার অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্রটি তুলে দিলাম।

অপরাহ্নে বাসারদের বাড়ি সংলগ্ন কারী সাহেবের প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসার প্রাঙ্গণে এই নজিরবিহীন নির্যাতন ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা হল। কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দসহ সেখানে বক্তব্য রেখে গভীর রাতে ঢাকা ফিরে এলাম। একটি পুলিশের গাড়ি সর্বক্ষণ আমাদের গাড়িকে অনুসরণ করল। কর্মীরা মনে করেছে, ওরা হয়ত আমাকে গ্রেপ্তার করবে। এটাই তো মহাজনি পন্থা। মারপিট করে, অস্ত্রের বলে সভা-সমাবেশ বন্ধ করে ক্ষমতার দাপটে একটি বানোয়াট মামলা দায়ের করে দীর্ঘমেয়াদী হয়রানির ব্যবস্থা করা। ওদের অপকর্ম সর্বকালের সর্ব রেকর্ড ভঙ্গ করায় ওরা এবার আর তা করল না। নির্বিঘ্নেই ঢাকায় পৌঁছলাম।

সিরাজদিখান উপজেলা সম্মেলনের দিন আরও হাস্যকর ব্যবস্থা অবলম্বন

করল। উপজেলা সফরে যাতায়াতের যে কয়েকটি রাস্তা রয়েছে, ঢাকা ও মুন্সিগঞ্জ থেকে বিশেষ পুলিশ বাহিনী এনে সবক'টি সিল করে দেওয়া হল। নৌপথও বাদ গেল না। হাজার পুলিশের সমাগম করেই ওরা শান্ত হল না, সমস্ত উপজেলাব্যাপী এক শত চুয়াল্লিশ ধারা জারি করল। আমাদের একটি কর্মীকেও ওরা সিরাজদিখানে পৌঁছতে দিল না। আনোয়ার, ধীরণ, দুলাল, সালাম ওরা অনেক চেষ্টা করেও সেখানে যেতে পারল না। ওয়াকিটকি ইত্যাদি নিয়ে পুলিশ নাকি মহাব্যস্ত। জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে ওরা পাহারা দিচ্ছে জাতীয় পার্টির মহাসচিব যেন বিক্রমপুরে ঢুকতে না পারে। ওরা আমাকে প্রায় কিংবদন্তির নায়ক পর্যায়ে নিয়ে গেল। আমাকে নাকি আটকানো সম্ভব নয়, যে কোন সময়, যে কোন পথে আমি নাকি সেখানে উপস্থিত হয়ে যেতে পারি! ওদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক রূপায়ণে বিরাট বাধা সৃষ্টি হয়ে যাবে। হবুচন্দ্র রাজার গবু চন্দ্র মন্ত্রীর আমলে কত কিনা দেখলাম।

তৃতীয় বার বড় ঘটনা ঘটে গেল।

শ্রীনগর পাইলট স্কুল প্রাঙ্গণে সম্মেলন হবে, ওরা চুয়াল্লিশ ধারা জারি করল। স্টেডিয়ামে সম্মেলন স্থানান্তরিত করা হল। ওখানে বিএনপি করতে দিবে না, থানার পুলিশ বাধা দিল। হাই সাহেবের কোল্ড স্টোরেজ প্রাঙ্গণে সম্মেলন করব, সেখানেও ওদের আক্রমণ। শেষ পর্যন্ত শ্রীনগর মৌজার বাইরে বিশ্বরোডের পুলের পশ্চিম পাশে সম্মেলন করব, সেখানেও বিএনপি'র আক্রমণ। লাঠি-সোটা নিয়ে মারাত্মক সব অস্ত্রসজ্জিত ওরা সদম্ভে হামলা করল।

আর সহ্য হল না। সেবার আমরা সুসংগঠিত হাজার হাজার কর্মী নিয়ে ওদের চুয়াল্লিশ ধারা ভঙ্গ করে স্টেডিয়ামে উপজেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত করলাম। ওরা আক্রমণ করতে এসে আমাদের বিপুল কর্মী-বাহিনীর ধাওয়া খেয়ে শ্রীনগর থেকে পালাল। সেদিন বক্তৃতায় বলেছিলাম, আইন ভঙ্গ করে থাকলে আমি করেছি, আমাদের কর্মীদের যেন হয়রান করা না হয়। মামলা-মোকদ্দমা আমার নামে করারই পরামর্শ দিয়েছিলাম। কিন্তু ওরা সনাতনী পন্থা অবলম্বন করল। কফিল, নিজ ঘরের উপরের মাচায় লুকিয়ে রেখে যে বিএনপি কর্মকর্তার জীবন রক্ষা করেছে, সে নিজেই বাদী হয়ে কফিল, মোস্তফা, হারুনসহ আমাদের অধিকাংশ কর্মীদের বিরুদ্ধে গোটা তিনেক মামলা ঠুকে দিয়ে পুলিশ দিয়ে হয়রানি শুরু করল। সেসব মামলা আজ পর্যন্ত চালু রয়েছে। মাসের পর মাস, বছরের বছর এত লোকের ব্যক্তিগত হয়রানি ছাড়াও অজস্র অর্থ ব্যয়! বিএনপি'র তুলনা শুধু তারাই।

সর্বশেষ এবং মারাত্মক আক্রমণ ওরা পরিচালনা করল ময়মনসিংহে। মিজান চৌধুরীর রাজনৈতিক অসঙ্গতি রোধ করার মানসে বেশ কিছুদিন পূর্বে এরশাদ সাহেবের স্ত্রীকে সরাসরি রাজনীতিতে সক্রিয় করার ব্যবস্থা করা

হয়েছিল। বেগম রওশন এরশাদকে রাজনীতির বাইরে সশ্রদ্ধ আসনে অবস্থানেরই পক্ষপাতী ছিলাম আমি। কিন্তু তিনি যখন এসে গেলেন আপত্তির প্রশ্নই আসে না। সাধ্যমতো সহযোগিতাই দিয়ে এসেছি। তিনি একটি জনসভা করবেন তাঁর জন্মস্থান ময়মনসিংহ শহরে। আমাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেছেন যাতে সেই জনসভায় যোগদান করি। তিনি খুব প্রত্যুষেই রওয়ানা হয়ে গিয়েছেন। আমি এবং তখনকার মহাসচিব আনোয়ার হোসেন মঞ্জু দ্বিপ্রহরের আহারের পর মঞ্জুর গাড়িতে রওয়ানা হলাম সরাসরি সভায় উপস্থিত হব বলে।

মঞ্জু নিজেই তার নতুন গাড়ি চালাচ্ছিল। আমাদের সাথে দু'-তিন জন কর্মী রয়েছে। গাড়ি ময়মনসিংহ শহরে প্রবেশ করলে ট্রাফিক পুলিশের নিকট আমরা জানতে চাইলাম কোন্ রাস্তায় সহজে সার্কিট হাউস ময়দানে যাওয়া যাবে। সে আমাদেরকে সঠিক পথই দেখিয়ে দিল। গাড়ি শহরের কেন্দ্রস্থলে ঢুকতেই বিএনপি'র এক বিশাল ঠ্যাঙ্গারে বাহিনীর সম্মুখে পড়ে গেলাম। হকিস্টিক, লাঠি, বন্দুক, পিস্তল, রামদা, কুড়াল সজ্জিত এই গণতন্ত্রের কর্মীরা আমাদেরকে জনসভায় যেতে দেবে না। তারা আমাদের গাড়ি আক্রমণ করতে ছুটে এল। যখন বুঝতে পারল গাড়িতে আমি রয়েছি, মঞ্জু রয়েছে তখন তাদের উল্লাসের মাত্রা ছাড়িয়ে গেল। তারা আমাদের গাড়ির উপর আক্রমণ করল। রামদা আর কুড়ালের কোপ পড়া শুরু হতেই আমাদের কর্মী স্বপন ঘোষ গাড়ি থেকে অবতরণ করে ওদের বাধা দিতে গেলে ওরা তাকে কুপিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে ফেলল। আমাদের চোখের সম্মুখে এই হত্যাযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হল। নেমে বাধা দিলে আমাদেরও একই পথের যাত্রী হতে হত। আল্লাহ্ মঞ্জুকে বিপদমুক্তির বুদ্ধি জুগিয়ে দিল। সে প্রাণপণে গাড়ি চালিয়ে পার্শ্ববর্তী একটি গলিতে ঢুকে পড়ল। একটি গরু শুয়েছিল সেই গলিতে। সে দৌড়ে পালিয়ে যেতে ঠিক ততটুকু রাস্তা পাওয়া গেল যতটুকুতে মঞ্জুর গাড়ি ঢুকতে পারে।

মঞ্জু সিদ্ধহস্তে উল্কার বেগে গাড়ি চালাতে লাগল। আমি তার পাশে বসে পরম করুণাময়কে এক মনে ডেকে যাচ্ছি। কিছুক্ষণ পর একটি অপেক্ষাকৃত বড় রাস্তায় গাড়ি চলে এলে আমাদের স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ল। আর একবার মহান সৃষ্টিকর্তা আমাদেরকে প্রাণে বাঁচিয়ে রাখলেন। তবে এবারে মূল্য দিতে হল যুব সংহতির কর্মী ঢাকা শহরের সাহসী সন্তান স্বপন ঘোষকে। সে কেবল আমাদের বাঁচাতে গিয়েই নিজের প্রাণ দিল। স্বপনকে যখন নিষ্ঠুরভাবে কোপাচ্ছে সেই মুহূর্তের ফাঁকে মঞ্জু গাড়িটিকে গলিতে ঢুকাতে সমর্থ হয়েছিল। তা না হলে সেদিন স্বপন ঘোষের ভাগ্য আমাদের দু'জনকেও একইসঙ্গে বরণ করতে হত।

যুবক সন্তান হারিয়ে পুরনো ঢাকার পাতলা খান লেনের স্বপনের পিতা-

মাতার আহাজারি যে না শুনেছে সে উপলব্ধি করতে পারবে না, পুত্রের এই নির্মম পরিণতি মা-বাবার হৃদয়কে কীভাবে খান খান করে দেয়। সন্তানহীনা সেই বয়স্ক দম্পতির শোকাকুল কান্না নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র আরশ পর্যন্ত পৌঁছেছিল।

আমরা ঢাকায় ফিরে এসে যত প্রতিবাদই করি না কেন, যত নিন্দাবাদই জানাই না কেন, ঘাতকদের তাতে কিছু আসে-যায় না। ওদের আফসোস রয়ে গেল হাতের কাছে দু'দুটো রুই-কাতলা পেয়েও ওরা তা হালাল করতে পারল না!

বিচিত্র এই দেশ সেলুকাস! বিচিত্র তার তথাকথিত গণতন্ত্র! আর এই নিয়েই আস্ফালন করে আচেলা চেঙ্গিস খান মার্কা গণতন্ত্রের ধ্বজাধারীরা।

আমাদেরকে বলে স্বৈরাচার! এমন নজির কেউ দিতে পারবে না আমরা কোন সভা করতে দিইনি বা একটি সমাবেশ ভেঙে দিয়েছি অথবা সভায় যোগদানকারীদের গুলি করেছি কিংবা হত্যা করেছি বা চুয়াল্লিশ ধারা জারি করে বিরোধী দলের সমাবেশ বন্ধ করেছি। আমাদের দীর্ঘ নয় বছরের শাসনামলে এমন কোন ঘটনা সংঘটিত হয়নি। তবুও আমরাই স্বৈরাচার! আর সভা ভঙ্গ করে, চুয়াল্লিশ ধারা জারি করে, অস্ত্র নিয়ে হামলা করে প্রতিদিন বোমা আর ককটেলের অবিমৃষ্য ব্যবহার করে, গুলি করে, অগ্নিসংযোগে মঞ্চ জ্বালিয়ে দিয়ে, গাড়ি ভেঙে, রামদা-কুড়াল দিয়ে কুপিয়ে বিরোধী দলের কর্মী হত্যা করে ওরা হয়ে রইল গণতন্ত্রের ধারক-বাহক, হয়ে রইল শান্তির সৈনিক।

নিন্দা করতেও ঘৃণার উদ্রেক হওয়ার কথা!

"এত ভঙ্গ বঙ্গ দেশ তবুও রঙ্গ ভরা" কবির এই উক্তিকে সার্থক করে বিএনপি ও তাদের সুবিধাবাদী রূপ পাল্টাতে মুহূর্ত বিলম্ব করেনি। প্রেসিডেন্টের নির্বাচনের সময় আমাদের পঁয়ত্রিশটি সংসদ সদস্যের ভোট অতি মূল্যবান বিবেচিত হল। আমাদের অবস্থান এমন ছিল যে, আমরা বিএনপি'র পক্ষে ভোট দিলে তাদের বিজয়ের পথ সুগম হয়। কোনদিকে ভোট না দিলেও তারা জয়লাভ করে। কিন্তু বিএনপি'র অত্যাচারে জর্জরিত আমরা যদি আওয়ামী লীগ প্রার্থী বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরীকে

ভোট দিই তা হলে সরকারে থাকার পরও বিএনপি'র প্রেসিডেন্ট প্রার্থী পরাজিত হয়।

এমনি নাজুক পরিস্থিতিতে সরকারের পক্ষ থেকে আমাদের নিকট প্রস্তাব এল, আমরা যদি সরকারি দলকে সমর্থন করি তা হলে আমাদের বিষয়ে তারা তাদের অবস্থান পরিবর্তন করবে এবং আমাদের পারস্পরিক সম্পর্ক সহজ হয়ে দাঁড়াবে। আমরা নেতার সঙ্গে আলোচনা না করে কিছুই বলব না বলে জানিয়ে দিলাম। গরজ বড় বালাই, তাই ওরা আমাদের দলের চার নেতাকে এরশাদ সাহেবের সঙ্গে তাঁর জেলাখানার কক্ষে গিয়ে কথা বলার অনুমতি দিল। যে এরশাদ সাহেবের সঙ্গে তাঁর স্ত্রী বা সন্তানকে সামনাসামনি দেখা করতে দেওয়া হয় না, শত নিষেধের বেড়ি দিয়ে যার অগ্র-পশ্চাৎ বেঁধে দেওয়া হয়েছে, আজ তাঁরই অবস্থান স্থলে আমাদেরকে নিয়ে যাওয়া হল। মিজান সাহেব, মওদুদ, রিয়াজউদ্দীন আহমেদ ভোলা ভাই এবং আমি—এই চার জন এরশাদ সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। সেখানেও ঘাড়ের উপর সাদা পুলিশের সতর্ক প্রহরা। আমরা আপত্তি জানাতে কয়েক ইঞ্চি সরে দাঁড়াল মাত্র। শেষ পর্যন্ত আমরা ওদের সম্মুখেই আলোচনা করলাম। আমাদের গোপনীয়ও কিছু ছিল না। বিএনপি'কে আমরা কোন অবস্থাতেই আস্থায় নিতে পারছিলাম না। তাই তাদের ভোট দেওয়ার প্রশ্নই আসে না। পক্ষান্তরে আওয়ামী লীগের ভূমিকাও আমাদের ব্যাপারে অনুকূল ছিল না। ভোট নেবার কোন যোগ্যতা তারা আমাদের নিকট থেকে অর্জন করতে পারেনি। নীতিগতভাবেও ভিনদেশ মুখাপেক্ষী এই দলটিকে জাতীয়ভাবে প্রশ্রয় দেওয়া অবিবেচনা-প্রসূত হবে। কাজেই আমরা ভোটদানে বিরত থাকার সিদ্ধান্ত নিলাম। সে সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণরূপে বিএনপি'র পক্ষে গেলেও জেনে-শুনেই বিষ করেছি পান। এক শত্রুকে ঠেকাতে গিয়ে বৃহৎ শত্রুকে আহ্বান করা বিবেচনা-প্রসূত নয়।

স্পিকার আবদুর রহমান বিশ্বাস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হতেই বিএনপি আমাদের পরোক্ষ সহায়তার কথা ভুলে গিয়ে পূর্ববৎ নির্যাতনের পথেই অবস্থান ধরে রাখল। বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত জনমত সংগঠিত হলে আমরা যখন তাদেরই একদার দাবি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি জানালাম, তারা বেমালুম তা অস্বীকার করে বসল। আওয়ামী লীগ এবং জামায়াতসহ একই দাবিতে দেশব্যাপী আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকল। সে সময় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে প্রায় এক শত সত্তর দিন এদেশে হরতাল পালিত হয়েছে। অনেক শোভাযাত্রায় ওদের আক্রমণে সারা দেশে নেতা-কর্মীরা আহত নিহত হয়েছে। মওদুদ, মহাসচিব মঞ্জু, অ্যাডভোকেট সোহরাব, ঢাকার রাজপথেই গুলি ও বোমায় আহত হয়েছে। মঞ্জুর আঘাত ছিল গুরুতর।

ইতিপূর্বে ভিআইপি রোডের দ্বিতলের একটি ভবনে আমরা অনেক ক্লেশে একটি দলীয় কার্যালয় স্থাপন করি। কয়েকদিন পরই দেখতে পাই সরকারি লোকেরা রাতের অন্ধকারে আমাদের সাইনবোর্ড আলকাতরা দিয়ে মুছে রেখেছে। নতুন করে সাইন বোর্ড লাগাই, পুনরায় তা কালো রঙে রঞ্জিত করে দেওয়া হয়। প্রধানমন্ত্রীর যাতায়াতের পথে জাতীয় পার্টির অফিসের প্রতি তার দৃষ্টি নিপতিত হবে এটা কেমন করে হয়। মাননীয়া প্রধানমন্ত্রীর পবিত্র দৃষ্টি কী জাতীয় পার্টির কার্যালয়ের দিকে পড়তে পারে, তা হলে যে তার মনোবেদনার অন্ত থাকবে না। অচিরেই আমাদের উপর মৌখিক নির্দেশ এল অফিস বন্ধ করে দিতে হবে। কয়েক লক্ষ টাকা অগ্রিম দিয়ে ভাড়াকৃত অফিস একজনের দৃষ্টিপীড়ার কারণে বন্ধ করে দিতে হবে। ক্ষমতার অপব্যবহার আর কাকে বলে! আমি মহাসচিব থাকা পর্যন্ত কিছু করে উঠতে পারেনি। কিন্তু '৯২ সালের শেষ দিকে দলের অভ্যন্তরের বিভীষণদের ক্লান্তিহীন প্রচেষ্টার ফলে আমাকে এরশাদ সাহেবের নির্দেশে মহাসচিব থেকে অব্যাহতি দিয়ে খালেদুর রহমান টিটোকে যখন মহাসচিবের দায়িত্ব দেওয়া হল তখন একদিন গায়ের জোরে পুলিশ সে অফিস তালাবদ্ধ করে সাইনবোর্ড খুলে নিয়ে যায়। বাধা দিতে গিয়ে সেদিন সিরাজুল হোসেন খান এবং মহাসচিব দু'জনই পুলিশের বেধরক পিটুনিতে আহত হয়। এই সিরাজুল হোসেন খান এবং খালেদুর রহমান টিটোই পরবর্তীকালে বিএনপি'র কার্যকলাপে মুগ্ধ হয়ে সে দলে যোগদান করে! কী বিচিত্র এই রাজনীতি!

এখানে কার্যালয় নিষিদ্ধ হয়ে গেলে ঢাকায় অন্য কোথাও তখন জাতীয় পার্টির অফিস স্থাপনের স্থান পাওয়া দুষ্কর হয়ে পড়ে। সরকারের প্রত্যক্ষ বৈরিতার ভয়ে বাড়ির মালিকগণ জাতীয় পার্টিকে বাড়ি ভাড়া দিতে গররাজি। উপায়ান্তর না দেখে আমাদের পদত্যাগের ফলশ্রুতিতে লুণ্ঠিত এবং বর্তমানে প্রকাশনা বন্ধ দৈনিক পত্রিকার মগবাজারস্থ কার্যালয়টিকেই অস্থায়ীভাবে দলীয় কার্যালয় হিসাবে ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

'৯২ সালের শেষ প্রান্তে এসে আমাকে মহাসচিব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয় এবং প্রেসিডিয়ামের সদস্য ও অন্যতম ভাইস-চেয়ারম্যান করা হয়। আমি তখন নিউইয়র্ক থেকে ঢাকা প্রত্যাবর্তনের জন্য প্লেনে আরোহণ করেছি। একজন পরীক্ষিত বন্ধুকে কী করে হটিয়ে নিজের পায়ে কুড়াল মারা যায় তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এরশাদ সাহেব দিলেন আমাকে দলের মহাসচিবের পদ থেকে অব্যাহতি দিয়ে। তিনিই বারংবার প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়েছেন দলের জন্য আমার মতো নিবেদিত প্রাণ আর কাউকে তিনি পাননি এবং আমি তাঁর মুক্তির প্রশ্নে আপসহীন ভূমিকার এক অনবদ্য ইতিহাস সৃষ্টি করেছি। অনেকগুলো চিরকুটে তিনি বলেছেন তিনি আমার ভূমিকায় কেবল যারপরনাই সন্তুষ্টই নন,

তিনি গর্বিত। আমাকে তিনি সুহৃদ বলে সম্বোধন করেন এবং আমার চাইতে অধিকতর বান্ধব তাঁর আর লাভ হয়নি বলে জানান।

তবুও তিনি আমাকেই আঘাত করলেন বা করতে বাধ্য হলেন। কথায় বলে, দশচক্রে ভগবান ভূত। বহুদিন থেকেই অনেকেরই অসুবিধা হচ্ছিল আমি মহাসচিব থাকায়। নানা জন নানা দিক থেকে ক্লিষ্ট। রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের কথা বোধগম্য হয় কিন্তু এরশাদ সাহেবের ঘনিষ্ঠ বান্ধবী জিনাত মোশাররফের কোপানলে কেন পড়লাম আমার বোধগম্য হয়নি। আমি যখন থেকে তাদের সম্পর্ক সম্বন্ধে অবহিত হলাম, একটা অসহনীয় উষ্মা আমার অভ্যন্তরে অবশ্যই কাজ করত। প্রকাশ্য আচরণে তার সন্ধান না মিললেও আমি অন্য অনেকের মতো এই বিতর্কিত মহিলাকে কখনও সৌজন্য প্রদর্শন করতে পারিনি। আমি তার থেকে শত হস্ত দূরত্ব বজায় রাখতাম। মোশাররফ সাহেব আমার আত্মীয় বটে, তার দুই ফার্স্ট কাজিনের সঙ্গে আমার দুই শ্যালিকার বিবাহ হয়েছিল। সেদিক থেকে মোশাররফ সাহেবের স্ত্রী আত্মীয়াই হয় এবং সেসূত্রে তার তরফ থেকে সম্পর্ক স্থাপনের আগ্রহই পরিলক্ষিত হত। কিন্তু এখানেও আমি ছিলাম আপসহীন। বিয়ে দুটির সময় সালেহাকে নির্দেশ দিয়েছিলাম কোন ক্রমেই ওই মহিলার সঙ্গে যেন না মেশে। সে নির্দেশ পালিত হয়েছিল। সে কারণেই বোধহয়, এই মহিলা আমার সম্পর্কে আন্তরিক বৈরিতা অনুভব করত।

জগন্নাথ কলেজের এককালীন জিএস, আমার বিশেষ স্নেহভাজন ঢাকার এস.আর. নোমানী আমাকে নব্বই মিনিটের একটি ক্যাসেট শুনিয়ে গেল। এই মহিলা প্রেসিডেন্টের সঙ্গে টেলিফোনে আলাপচারিতা করেছে। প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তা ব্যবস্থা কতটা ভঙ্গুর ছিল তা এই ক্যাসেট থেকেই প্রমাণিত হয়। নিশ্চয়ই তাঁর টেলিফোন সংযোগের ক্ষেত্রে শিথিলতা ছিল। তা না হলে খোদ প্রেসিডেন্টের আলাপ কী প্রকারে টেপ হয়ে বাজারজাত হতে পারে! সে আলোচনায় প্রেসিডেন্ট সাহেব বারবার কাকুতি-মিনতি করতে থাকেন আলাপ ক্ষ্যান্ত করার জন্য। তাঁর প্রচুর অতীব প্রয়োজনীয় সরকারি কার্য সমাধার অপেক্ষায় রয়েছে। কিন্তু মহিলা নাছোড়বান্দা। সে প্রেসিডেন্ট সাহেবকে তুই-তোকারি করতেও দ্বিধা করে না। বলে, অন্য মেয়েমানুষের সময় তো তোর সময়ের অভাব হয় না!

প্রেসিডেন্ট সাহেব তাকে 'সোনা, লক্ষ্মী' বলে ঠাণ্ডা করতে প্রয়াস পান। বারবার অনুরোধ করে, টেলিফোন রেখে দিতে কিন্তু নিজে তা করতে সাহস পান না। প্রেম বা কোন অস্বাভাবিক দুর্বলতা বোধগম্য হওয়া দুরূহ।

সেই টেপে ধারণকৃত আলোচনায়ই জানতে পারি মহিলা কতটা আমার উপর অহেতুক ক্ষিপ্ত। বঙ্গভবনের কোনও এক সম্বর্ধনায় জনৈকা অ্যাডভোকেট সুন্দরী মহিলা কী করে নিমন্ত্রণ পেল বারবার সে উত্তেজিতভাবে তা

জানতে চাচ্ছিল এবং কয়েকবারই বলল, তোমার মহাসচিবই তাকে প্রবেশপত্র দিয়েছে।

প্রেসিডেন্ট সাহেব অবশ্য বেশ দৃঢ়তার সঙ্গেই তা অস্বীকার করলেন এবং বললেন, তুমি মহাসচিবকে জানো না। সে এসবের মধ্যে নেই। এসব বিষয়ে সে একেবারে নীরস।

অন্য প্রান্তের ধৈর্য্যহীনা আলাপচারিণীর তা শোনার মন নেই। সে নির্দেশ দিল, মহাসচিব পাল্টাও।

এরশাদ সাহেব অবশ্য এ ব্যাপারে নমনীয় হলেন না বরং প্রতিবাদ করে বললেন, মহাসচিবকে অন্যায় দোষারোপ করা হচ্ছে।

আমার গুলশানের বাসায় অফিস কক্ষে বসে যখন এই টেপ শুনছিলাম তখন অন্যান্যের মধ্যে নরসিংদী যুবসংহতির অন্যতম কর্মকর্তা শেখর দাসও সেখানে উপস্থিত ছিল। তার কোটে এরশাদ সাহেবের একটি ছবি শোভা পাচ্ছিল। টেপ অর্ধেক শোনার পরই সে সকলের অলক্ষ্যে কোট থেকে ছবিটি খুলে পকেটে রেখে দেয়। আমি ব্যাপারটা লক্ষ্য করে পরে তাকে কারণ জিজ্ঞেস করতেই সে বলল, যা শুনলাম, এরপর আর তাঁর ছবি বুকে নিয়ে গর্ব করে ঘুরে বেড়াতে মন সায় দেয় না।

মফস্বলের একজন সজাগ কর্মীর মানসিক বিপর্যয় লক্ষণীয়। আমি তাকে বুঝাতে চেষ্টা করলাম, যা ঘটেছে সেটা অতীত। তিনি কারামুক্ত হয়ে এলে এসব আর দ্রষ্টব্য হবে না।

সে চুপ করে রইল।

আমার জানামতে এই মহিলা আমার সম্বন্ধে তার মত পরিবর্তনের কোন কারণ খুঁজে পায়নি। আমাদের দলের প্রায় সকলেই এরশাদ সাহেবের এই দুর্বলতার কথা জানত এবং সেজন্য এই মহিলার কাছে তাদের তদবিরের শেষ ছিল না। আমাদের শাসনামলে তার চাইতে ক্ষমতাধর মহিলা আর ছিল না। সে ক্রমাগত আমার বিরুদ্ধে বিষোদগার করে এরশাদ সাহেবের মন বিষিয়ে দিয়ে থাকবে। যখন ক্ষমতায় ছিলেন, বাইরে ছিলেন তখন অনেক কিছুই নিজে যাচাই করে অভিযোগের অসারতা উপলব্ধি করতে পারতেন। কিন্তু কারাগারের বিষণ্ন একাকীত্বে এ ধরনের অভিযোগ যদি প্রতিনিয়ত আসতে থাকে; এক পর্যায়ে তা দূর করার প্রবণতা জাগা খুব বিশেষ দোষের নয়।

এর সঙ্গে আমাদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের নিকট থেকেও যেসব চিরকুট গেল, সেগুলোও ঘৃতাহুতির কাজ করল। ছাত্রজীবন থেকেই মিজান সাহেবের সঙ্গে আমার সুসম্পর্ক ছিল। তার জন্য বঙ্গবন্ধুর সঙ্গেও মোকাবেলা করতে পিছ-পা হইনি। দীর্ঘদিন পর একসঙ্গে রাজনীতি করতে এসে এ সম্পর্ক আরও নিবিড় হবে এটাই আশা করা গিয়েছিল। কিন্তু একজনের বিচার-

বিশ্লেষণের মানদণ্ড যদি অর্থনৈতিক সুবিধা-অসুবিধার ভিত্তিতে স্থিরীকৃত হয় তা হলে আর যা-ই আশা করা যাক, সুবিচার আশা করা যায় না। তার সময়ের প্রথম নির্বাচনে আমি কারাগারে। বাইরে এসে সে সময়ের যেসব কিচ্ছা-কাহিনী শুনেছি বিশ্বাস করতে মন চায় না। কিন্তু একই বক্তব্য বিভিন্ন স্থান থেকে সপ্রমাণ এলে তা হেসে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

বাইরে এসে যখন মহাসচিবের দায়িত্বভার পুনরায় বুঝে নিলাম তখন দেখি সকলি গড়ল ভেল্। আমার অবর্তমানে যে ছিল ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব, সেই এ.বি.এম. শাহ্জাহানও আমাকে অত্যন্ত নিরুৎসাহজনক একটি প্রতিবেদন দিল। তারও মতে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের সবকিছু নির্ধারিত হয় অর্থের মানদণ্ডে, লাভ-ক্ষতির চুলচেরা বিশ্লেষণে। দলের ব্যয়ের দায়িত্ব মহাসচিবের কিন্তু আয়ের উৎস ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের হাতে। আমি তার সঙ্গে সরাসরি কথা বললাম। বললাম, স্যার যখন বাইরে ছিলেন অর্থাৎ সরকারের সময়ে আমি কখনও নগদ অর্থ গ্রহণ করিনি। অফিস অ্যাডমিনিস্ট্রেটর একজন ছিল অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তা। এসব ছিল তার দায়িত্ব। দেখাশুনা করত দপ্তর সম্পাদক। আমি কেবল নির্দেশ দিতাম কোথায় কি প্রয়োজন এবং কোথায় কি প্রয়োজনে ব্যয় করতে হবে। এখনও সে ব্যবস্থা চলতে পারে। আপনি সব খরচ দেখবেন, আমি কেবল কর্মাধ্যক্ষ হিসাবেই সব পরিচালনা করে যাব।

সে সম্মত হল না। তার মতে হাতে টাকা না থাকলে কাজই করতে সক্ষম হব না। তার বক্তব্যেও যুক্তি রয়েছে। তাছাড়া এখন আমরা সরকারে নই। এখন অনেক কিছুই সঙ্গোপনে করার প্রয়োজন হবে। ঠিক হল সে উৎস থেকে টাকা এনে আমাকে দেবে। আমি তা দিয়ে সমস্ত অঙ্গ সংগঠন, মহানগরী এবং কেন্দ্রের খরচ সামলাব।

টাকার হিসাব নিয়ে বক্তব্য রাখা সঠিক নয়। কিন্তু আমার একটি আন্তরিক ব্যথা রয়েছে এইখানটায়। তাই সামান্য বলা প্রয়োজন। সায়েদাবাদের মহাসমাবেশের একটা বিশেষ খরচ ছিল। সেটা বাদ দিলে যতদিন মহাসচিবের দায়িত্বে ছিলাম ততদিনে মোট চার বারে আট লক্ষ টাকা বিভিন্ন সূত্রে আমার হাতে আসে। সেখানে খরচ হয় প্রায় বত্রিশ লক্ষ টাকা। আজও অনেক পাওনাদার—মাইকওয়ালা, প্রেসওয়ালা, ডেকোরেটরের পাওনা বকেয়া রয়েছে। আমাকে তাগিদ দিলে আমি কর্নেল (অবঃ) মালেকের কাছে যেতে বলতাম। তাকে বললে সে মহাসচিবকে দেখিয়ে দিত। কিন্তু কর্মীদের মধ্যে একটা ধারণা হল, অনেক টাকা আসছে, কিন্তু তারা পাচ্ছে না। তারা একটা যৌথ দরখাস্ত প্রেরণ করল জেলখানায়। এর পশ্চাতে কার হস্ত রয়েছে সহজেই অনুমেয়।

এরশাদ সাহেব জানেন অর্থ কোন সমস্যা নয়। তিনি ভুল বুঝলেন।

অর্থই সব অনর্থের মূল আর একবার প্রমাণিত হল। তিনি হয়ত মনে করলেন আমি তার অর্থের সদ্ব্যবহার করছি না। তাই তার চিরকুট পেয়ে ক্রোধান্বিত হয়ে লিখেছিলাম, আপনার মুক্তির পর হিসাবে বসব। যদি টাকা পান প্রয়োজনে আমার একমাত্র বসতবাড়ি বিক্রয় করে তা পরিশোধ করব।

অর্থ নিয়ে কেউ কোনদিন আমাকে কিছু বলতে পারে না। অঙ্গসংগঠনের কর্মকর্তাগণ যখন তাদের চিঠির অপব্যাখ্যার খবর পেল, তারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বারবার চেয়ারম্যান সাহেবকে লিখল তাদের প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব কখনও ঘটেনি। মহাসচিব তাদের সঙ্গে সর্বদা সক্রিয় সহযোগিতা করেছে। কিন্তু ততদিনে ক্ষতি যা হবার হয়ে গিয়েছিল। চেয়ারম্যান সাহেব তাঁর ভারপ্রাপ্তের প্রেরিত চিরকুটসমূহ নিয়ে চিন্তা করতে শুরু করেছেন।

ভারপ্রাপ্তের মনোবেদনার অন্ত ছিল না। বড় সভা তো দূরের কথা, ছোট বৈঠকও সহজিয়া স্বভাবের কারণে সুষ্ঠুভাবে সেসব পরিচালিত করতে সক্ষম হত না। তার সভাপতিত্বের অনুষ্ঠানটিতে একটা অব্যবস্থা পরিলক্ষিত হত। আমাকে সভায় শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে হত। বক্তাদের নিয়ন্ত্রণ করা দূরে থাক, অন্য বক্তাগণ তার বক্তৃতার সময়টুকুও নিয়ে নিত। নিষ্ফল আক্রোশে ফুঁসে ওঠা ছাড়া আর কিছু করতে পারত না। একসঙ্গে সভা-সমাবেশে যোগদান করলে স্বভাবতই আমি পূর্বাহ্নে বক্তৃতা করতাম, তারপর বক্তব্য আর তেমন জমত না। কর্মীরা তার কথাবার্তার খুব একটা তোয়াক্কা করত না। পক্ষান্তরে আমাকে তারা যতটা সমীহ করত, ঠিক ততটাই ভালোবাসত। তার ঈর্ষার অন্ত ছিল না। সিদ্ধান্তহীনতা ও দোদুল্যমানতা ছিল স্বভাবজাত। স্বতঃস্ফূর্ততা এবং প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের ছিল একান্ত অভাব।

বিছানায় অর্ধ শায়িত চৌধুরী সাহেবকে কিছু বিগত যৌবনা মহিলা ও খল-কর্মী স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজনে প্রায়শই ঘিরে তোয়াজ করত। নিজস্ব লাভ-ক্ষতির চিন্তায় বিভোর বর্ষীয়ান মানুষটি মিষ্টি মিষ্টি হেসে তাদের সান্নিধ্য উপভোগ করতেই ব্যস্ত থাকত। কয়েকটি নাতি-নাতনীও কখনও সঙ্গে থাকত। বিভিন্ন জেলা থেকে আগত কর্মীরা দলীয় প্রয়োজনেও তার নিকট গেলে তার ব্যক্তিগত সহকারীর বিশেষ সন্তুষ্টির উপর নির্ভর করতে হত। বাঁশের চাইতে কঞ্চির মূল্য সর্বদাই বেশি।

আমার সঙ্গে তার নিকট সম্পর্কের কারণে আমি এসব অব্যবস্থার প্রতিবিধান করতে বলতাম। শয্যা ত্যাগ করে মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতে বললে সে সন্তুষ্ট হওয়ার ভান করলেও অন্তরে বেশ ক্লেশ অনুভব করত।

ভিতরে ভিতরে সে একটা ব্রত গ্রহণ করল। যেমন করেই হোক আমাকে মহাসচিবের পদ থেকে সরিয়ে তার পছন্দসই এবং অপেক্ষাকৃত লঘু মাপের কাউকে মহাসচিব হিসাবে বসাতে হবে। শুরু হল চেয়ারম্যান সাহেবকে বিভ্রান্ত করার কূটকৌশল। এসব বিষয়ে সে সিদ্ধহস্ত। সাহায্যকারী হিসাবে

সাইদ তারেককে সঙ্গে নিল। কত যে চিরকুট গেল জেলখানায় বিভিন্ন নামে তার ইয়ত্তা নেই। ঘষতে ঘষতে পাথর ক্ষয় হয়ে যায় আর এটা তো মানুষের মন! তাও কারাবন্দি একজন মানুষের মন, যে সত্যাসত্য যাচাই-বাছাই করে দেখার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। এরশাদ সাহেব কিছুটা সম্মত হতেই তাঁকে কীভাবে, কাকে, কী চিঠি লিখতে হবে তাও সাইদ তারেককে দিয়ে মুসাবিদা করিয়ে খসড়া পাঠিয়ে দিত।

অপসারণের প্রথম নির্দেশ এলে প্রেসিডিয়াম যখন তা প্রত্যাখ্যান করল এবং এরশাদ সাহেবকে সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেবার ব্যবস্থা করল, সে সভাতেই কর্নেল (অবঃ) মালেকের জেরার মুখে মিজান সাহেব স্বীকার করতে বাধ্য হল যে, এরশাদ সাহেবকে বিভিন্ন চিঠি সে লিখেছে এবং তার জবাবও খসড়া আকারে জেলখানায় প্রেরণ করেছে। এরশাদ সাহেব কেবল নিজ হস্তে তা নকল করে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

মিজান সাহেব বাহ্যত জিনাত মোশাররফের বিষয়ে মনঃক্ষুণ্নতা প্রকাশ করলেও প্রয়োজনে তার সহযোগিতা প্রার্থনা করল, গোপনে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে যৌথ আক্রমণের কর্মসূচি প্রণয়ন করল, কি করে মহাসচিবকে ঘায়েল করা যায়। মহিলা এটাই চায়! সে অতি উৎসাহে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

মওদুদের সঙ্গে আমার সবসময়ই একটা সুসম্পর্ক ছিল। কলেজ জীবনে একই ক্যাবিনেটে আমি জেনারেল সেক্রেটারি, সে প্রমোদ সম্পাদক। এরশাদ সরকারে সে অধিকতর উচ্চাসনে বসলে হয়ত ছাত্রজীবনের কথা স্মরণ করে কিছুটা সহজতার অভাব অনুভব করত। তবে আমার বক্তব্য, আমার কার্যধারা সে প্রায় সর্বদাই সমর্থন করত। সভা-সমাবেশে একসঙ্গে উপস্থিত হলে আমি কিছুটা রাশ টানার প্রয়াস পেলে আরও বক্তৃতা করতে আগ্রহী মওদুদ হয়তবা কিছুটা অসন্তুষ্ট হত। খবরদারিত্ব করবে না এমন কেউ মহাসচিব হলে মন্দ কী!

কাজী জাফরের সঙ্গে সেই ছাত্রজীবন থেকেই আমার মতানৈক্য। সে ছাত্র ইউনিয়ন করত। আমি ছিলাম ছাত্রলীগ। বাম-ডানের ব্যবধান রয়েছেই। ক্যাবিনেটে বসে অনেক রাজনৈতিক প্রশ্নে আমাদের অধিকতর মিল পরিলক্ষিত হলেও সরকারের বাইরে এসে দল করতে গিয়ে আমাদের অমিলই বেশি দৃশ্যমান ছিল। দলের মধ্যে সে বাম ভাগের নেতৃত্বে ছিল এবং অত্যন্ত বোধগম্য কারণেই এসব প্রশ্নে আমাদের মতের অভিন্নতা থাকত না। আমার মহাসচিব হওয়ার লগ্নে তার অভিমত ছিল এটা হবে পার্টির কফিনের শেষ পেরেক। কাজেই আমার বিরোধিতায় তার অনান্তরিকতা থাকার কথা নয়। আমার স্থলে যদি প্রস্তাবিত খালেদুর রহমান টিটো হয় তা হলে তার জন্য ভালোই হয়। টিটো বামপন্থী রাজনীতিই চিরদিন করে এসেছে। সুতরাং

কুশলী জাফর সাহেব প্রকাশ্যে না হলেও তার স্বভাবসিদ্ধ কৌশলের মাধ্যমে দাবার ঘুঁটি ঠিকই চেলে যাচ্ছিল।

সিরাজুল হোসেন খানও একজন প্রবীণ বামপন্থী রাজনীতিক। দীর্ঘলয়ের বক্তব্য অস্পষ্ট হলেও কণ্ঠে জোরের অভাব হয় না। একসময় শেখ সাহেবের চামড়া দিয়ে ঢোল বানিয়ে হাড় দিয়ে ডুগডুগি বাজাবার কথা প্রেসক্লাবের মোড়ে দাঁড়িয়ে যে ক'জন উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা দিত; তাদের মধ্যে সে অন্যতম।

এরশাদ সাহেবের দলে যোগদান করে তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্য হিসাবে কয়েক বছর কাটিয়ে এখন তাঁরই রাজনৈতিক দল করেও প্রেসক্লাবে গিয়ে তাঁকে স্বৈরাচার বলে গাল দেওয়াটা অমার্জনীয় ধৃষ্টতা বলে প্রতীয়মান হওয়ায় তাকে কেন বহিষ্কার করা হবে না তার কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়েছিলাম মিজান সাহেবের স্বাক্ষর নিয়েই। আমি একদিনের জন্য বাগেরহাটে গেলে মিজান সাহেব তড়িঘড়ি সে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রত্যাহার করে নেয় তার পাতান মামু সিরাজুল হোসেন খানকে আমার বিরুদ্ধে ব্যবহার করার জন্য। খান সাহেবও তার করণীয় বিস্মৃত হল না।

চারদিক থেকে সাঁড়াশি আক্রমণ। মহাসচিবকে বদলাতেই হবে। দলের অন্য সমস্ত নেতৃত্ব এবং প্রায় সমস্ত কর্মী-বাহিনী একজোট হয়ে এর বিরুদ্ধাচরণ করলেও ভিতরে ভিতরে পানি অনেকটাই ঘোলা হয়েছিল। ইতিমধ্যে টিটো গ্রেপ্তার হলে এরশাদ সাহেব মন্তব্য করে পাঠালেন, তাকে মহাসচিব না করায় সে গ্রেপ্তার হল!

সবকিছু দেখে আমার নিজেরও ভালো লাগছিল না। বিশেষ করে আমার ধারণা ছিল এরশাদ সাহেব বন্ধু চিনতে ভুল করবেন না। কমপক্ষে দশ বার তাঁর জন্য আমার জীবন সংশয় হয়েছিল। তিনি সবকিছুই অবগত। নিজের ভালো-মন্দ উন্মাদেও হৃদয়ঙ্গম করে, তাকে আগুনে বা পানিতে ধাক্কা দিয়ে ফেলা যায় না। এরশাদ সাহেব নিশ্চয়ই উন্মাদের চাইতে কাণ্ডজ্ঞানহীন হবেন না যে, একজন অকৃত্রিম বন্ধুকে অপসারণের চিন্তা করবেন।

তা-ই ঘটল। এ বিষয়ে এরশাদ সাহেব মিজান সাহেবকে প্রথম যে চিঠি লিখেছিলেন মিজান সাহেব অত্যন্ত অরাজনৈতিকভাবে সাইদ তারেকের হাতে সে চিঠি আমাকে প্রেরণ করায় আমি আন্তরিক বিক্ষুব্ধ হয়েছিলাম। এরশাদ সাহেবকে লিখেছিলাম, যদি আমাকে পরিবর্তন করলে আপনার মঙ্গল হয় এবং মুক্তি ত্বরান্বিত হয়, আমাকে সঙ্গোপনে একটি লাইন লিখলেই ব্যক্তিগত অসুস্থতার অজুহাতে আমি সরে দাঁড়াতাম। আওয়ামী লীগ নাকি শর্ত দিয়েছে, কট্টর আওয়ামী লীগ বিরোধী বলে আমাকে পরিবর্তন করতে হবে, তা না হলে এরশাদ সাহেবের মুক্তি নেই। একথা জানিয়ে আমাকে লিখলেই হত! পানি

ঘোলা করার কোন প্রয়োজন ছিল না। অহেতুক নানা অজুহাত খাড়া করে অপসারণের প্রয়োজনীয়তা হয় না।

কিছুটা শ্রান্তি এবং অনেকটা নোংরামির কারণে দায়িত্ব ছেড়ে দিতেই আমি ইচ্ছুক। কিন্তু কর্মীদের অত্যধিক চাপের মুখে আমি তা করতে পারলাম না। সিদ্ধান্ত নিলাম, এ ডামাডোল থেকে কিছুদিনের জন্য দূরে গিয়ে বিশ্রাম নেব। রানা আমেরিকায় একটি এপার্টমেন্ট নিয়ে থাকে। তার পড়াশুনার শেষ পর্যায় চলছে। বারবার ফোন করছে, আব্বা, তোমাকে কতদিন দেখি না, একবার আসো।

একটিই ছেলে। মন ছুটে যায় তার কাছে।

যুগ্ম মহাসচিব এ.বি.এম. শাহ্জাহানকে দায়িত্বভার অর্পণ করে আমেরিকার উদ্দেশে রওয়ানা হলাম। পথে লন্ডন শাখা জাতীয় পার্টি আমাকে চার দিনের জন্য আটকাল। সেখানেও এরশাদের মুক্তির জন্যই সভা-সমাবেশে ব্যস্ততার মধ্যে কেটে গেল। ব্যারিস্টার আবুল হাসনাত তখন লন্ডনে ছিল। সে এ সময়টুকু সদ্ব্যবহারের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিয়েছিল।

সরকারের বাইরে দলের মহাসচিব হিসাবে যখন নিউইয়র্কের কেনেডী এয়ারপোর্টে অবতরণ করলাম তখন আমাদের কেন্দ্রীয় সদস্য আমার বিশেষ স্নেহভাজন, সাবেক এমপি লিয়াকত আলীর নেতৃত্বে যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টির নেতা, কর্মী, সমর্থক এবং বাংলাদেশী নাগরিকরা আমাকে এক বীরোচিত সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করল। তাদের অবিস্মরণীয় ঐকান্তিকতায় আবেগাপ্লুত হয়ে গেলাম। কানসাস অঙ্গরাজ্যের উইচিতা শহর থেকে রানা উড়ে এসেছিল আমাকে নিউইয়র্কে স্বাগত জানাতে। ইমিগ্রেশন পাড় হয়ে বের হয়ে সর্বাগ্রে দীর্ঘদিনের বুভুক্ষু-বুকে পুত্রকে জড়িয়ে ধরতেই দু'জনই কান্নায় ভেঙে পড়লাম। ওর মামারা রানাকে শান্ত করতেই অগণিত মানুষের প্রাণ স্পর্শ এবং ফুল মালা আর আলিঙ্গনের উষ্ণতায় মানসিক প্রশান্তি ফিরে এল।

যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টি মোটর শোভাযাত্রা করে আমাকে ম্যানহাটনের রামাদা হোটেলের স্যুটে নিয়ে ওঠাল। এত খরচ করার অপ্রয়োজনীয়তার কথা তুলতেই ওরা জানাল বাংলাদেশের এক ভদ্রমহিলা সেখানে গুরুত্বপূর্ণ পদে কাজ করে। সে জাতীয় পার্টির একজন শুভানুধ্যায়ী এবং প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ভাড়ায় স্যুটের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। আমার ভাগ্নে কয়েস, ভাগ্নী পপী এবং

ওর বর রহিম কেউ আমাকে তাদের বাসায় উঠাতে পারল না। শ্যালক মোশাররফ আমেরিকান পত্নী ও পুত্রকন্যা নিয়ে নিজস্ব বাড়িতে থাকে। সেও কোন সুবিধা করতে পারল না। তার সহোদর জামাল বাসা-ভাড়া করে থাকে। সে সদ্য বিবাহিত কিন্তু বউ এখনও এসে পৌঁছেনি। তার শূন্য বাসাই আমার মজলিশের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট। কিন্তু কর্মীরা আমাকে তাদের ব্যবস্থাপনাতেই রাখতে ইচ্ছুক। যুক্তরাষ্ট্র শাখা জাতীয় পার্টির সম্মেলন নিকটবর্তী, আমি সেখানে প্রধান অতিথি। হাসনাতকেও ওরা নিমন্ত্রণ করেছে। সে কয়েকদিনের মধ্যে এসে উপস্থিত হল।

লিয়াকত, দুলাল, মুনীর, ইকবাল, আশরাফ, চান্দু এবং অন্যান্য কর্মীদের আন্তরিকতা বর্ণনাহীন। রানাকেও আমার সাথেই ক'দিন রেখে দিলাম। সাব্যস্ত হল আমি সংগঠনের কাজ সেরে তার ওখানে যাব। দু'দিনের জন্য প্রচণ্ড শীতের মধ্যেও আমাকে কানাডা যেতে হল। সেখানেও দলীয় উদ্যোগে এরশাদ সাহেবের মুক্তির পক্ষে কয়েকটি সভা করতে হল। ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে। আমার অবস্থা তা-ই। যুক্তরাজ্য, আমেরিকা, কানাডায় মানুষ যায় আনন্দ ভ্রমণে, আমাকে সেখানে গিয়েও দলবাজি করতে হয়। এবং কপালগুণে যে আমাকে অপসারণের পদক্ষেপ নিচ্ছে তাঁর জন্যই অহোরাত্র পরিশ্রম করতে হয়। দুঃখ এবং অশ্রদ্ধা হজম করে হাসিমুখে তাঁর মুক্তির সপক্ষে বিশ্বজনমত গঠন করার প্রয়াসে লিপ্ত হতে হয়।

যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টি সম্মেলন কেন্দ্র করে দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। বিদায়ী সভাপতি গোলাম মেরাজের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ। সম্পাদক আজাদ নির্বিবাদী মানুষ। সভাপতিকেই নীরবে সমর্থন করে। বিদায়ী সহ-সভাপতি আব্বাসউদ্দীন দুলালের পাল্লা ভারি।

সম্মেলন উপলক্ষে যে ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠিত হয়েছে তার আহ্বায়ক মুনীরউদ্দীনও দুলালদের পক্ষে। সভাপতির দ্বিতীয়বার নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা তিরোহিত। উপায়ান্তর না দেখে সে ব্যবস্থাপনা কমিটি একক ঘোষণায় বাতিল করে দেয়। এয়ারপোর্টে উভয় পক্ষের কর্মীরাই উপস্থিত ছিল। দুলালরা অনেক বেশি শক্তিশালী। এরশাদ সাহেবের শ্যালক জাতিসংঘে বাংলাদেশের সাবেক স্থায়ী প্রতিনিধি মহিউদ্দীন সাহেব ব্যারিস্টার হাসনাত, লিয়াকত এবং আমাকে লাঞ্চে নিয়ে এক নিরপেক্ষ প্রতিবেদন দিল। তার মতে সভাপতিকে দ্বিতীয়বার সুযোগ দিলে দল অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হবে। নতুন কর্মকর্তা নির্বাচিত না হলে জাতীয় পার্টি যুক্তরাষ্ট্র শাখার ভবিষ্যত সম্ভাবনাহীন।

উভয় দলকে নিয়ে হোটেল স্যুটে আমরা তিন জন কেন্দ্রীয় নেতা দীর্ঘক্ষণ বৈঠক করে একক সম্মেলন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত দিলাম। ব্যবস্থাপনা কমিটি বৈধ রয়েছে বলে সকলেই মেনে নিল। সম্মেলনের দিন দেখা গেল সাবেক

সভাপতি, সম্পাদকসহ কয়েকজন অনুপস্থিত। আমাদের সিদ্ধান্ত মেনে নেবে অঙ্গীকার করে গিয়েও ওরা সম্মেলনে উপস্থিত হল না বরং সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়ে তার বিরোধিতা করল। মহাসচিব নিজে উপস্থিত। একজন প্রেসিডিয়াম সদস্য ব্যারিস্টার হাসনাত প্রধান বক্তা এবং কেন্দ্রীয় নেতা লিয়াকত আলী আয়োজকদের একজন। আমরা তিন জন একমত হয়ে ওদের ক'জনকে অনুরোধ করেও সম্মেলনে উপস্থিত করা গেল না। তাদের সংখ্যা নগণ্য বলেই তারা উপস্থিত হল না বলে প্রতীয়মান হল। সম্মেলনে প্রচুর উৎসাহ-উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হল। আব্বাসউদ্দীন দুলালকে সভাপতি ও মুনিরউদ্দীনকে সম্পাদক নির্বাচিত করে এক শক্তিশালী কমিটি গঠিত হল। সম্মেলনে উপস্থিত না হয়ে সংবাদপত্রের মাধ্যমে তার বিরোধিতা করার অপরাধে সম্মেলন সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে সাবেক সভাপতি এবং সম্পাদককে পার্টি থেকে বহিষ্কারের সুপারিশ করল। আমার ব্যক্তিগত অনুরোধে বহিষ্কারের সুপারিশ সংবাদপত্রে প্রকাশনা স্থগিত রাখা হল। আমরা নতুন কমিটিকে অনুমোদন করলাম।

ঢাকা প্রত্যাবর্তনের পর কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে যথারীতি আনুষ্ঠানিক অনুমোদন যাবার পর দেখা গেল চৌধুরী সাহেব সাবেক সভাপতিকে যুক্তরাষ্ট্র শাখার সমন্বয়কারী নিযুক্ত করেছে। কি সুন্দর ব্যবস্থা! সম্মেলন করল বহিষ্কারের সুপারিশ, ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তাকে নিয়োগ করে সমন্বয়কারী! বোঝ হে সুজন যে জান সন্ধান! যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টির অভ্যন্তরে সে হতে উপদলীয় কোন্দল ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের কল্যাণে স্থায়িত্ব লাভ করল। সমন্বয়কারীকে স্বীকৃতি না দিয়ে ওরা ওদের কমিটির মাধ্যমেই দলীয় কার্যাবলি পরিচালিত করতে সঙ্কল্পবদ্ধ হল।

এক সপ্তাহের জন্য রানার ওখানে গেলাম। উইচিতাকে বলা হয় Air capital of the world. অপেক্ষাকৃত এই ছোট শহরে প্রায় এক ডজন এয়ারপোর্ট রয়েছে। যাত্রী সাধারণের জন্য একটি বিমানবন্দর নির্ধারিত থাকলেও বিভিন্ন উড়োজাহাজ কোম্পানির এক-একটি নিজস্ব বিমানবন্দর থাকায় এবং সেসব কোম্পানির কারখানাসমূহ এ শহরে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় যুক্তরাষ্ট্রে এই শহরটি এক বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে। উড়োজাহাজ সংক্রান্ত পড়াশুনাও স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। রানা অ্যারোস্পেস এবং মেকানিক্যাল এই দুই বিষয়ে কৃতিত্বের সঙ্গে ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি লাভ করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়েই প্যারা প্রফেসর হিসাবে খণ্ডকালীন কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক বিশ্বের নেশা এমবিএ পড়ছে। এখন আর আমাকে তার পড়াশুনার ব্যয় বহন করতে হয় না। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যা পায়, তাতেই তার পড়াশুনার খরচ নির্বাহ হয়।

ছেলের সঙ্গে এক সপ্তাহ কাটিয়ে ওয়াশিংটন এলাম জাহানারার সনির্বন্ধ অনুরোধ ঠেকাতে না পেরে। আজমত আলী সাহেব ও জাহানারার অনুপম

আতিথেতায় তাদের প্রাসাদোপম বাড়িতে চার দিন অবস্থান করে নিউইয়র্ক ফিরে এসে দেশে প্রত্যাবর্তনের উদ্যোগ নিলাম। আত্মীয়স্বজন ও কর্মীরা দল বেঁধে আমাকে বিমানবন্দরে বিদায় জানাল।

আমার দেশে প্রত্যাবর্তনের সংবাদ প্রকাশিত হয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তড়িঘড়ি করে পার্টির প্রেসিডিয়ামের সভা ডেকে চেয়ারম্যানের নির্দেশের বরাত দিয়ে আমাকে অব্যাহতি দেওয়ার ব্যবস্থা নিল। আমি যখন প্লেনে প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দিচ্ছি তখন দীর্ঘদিনের ষড়যন্ত্র ও কূটকৌশল সফল করে আমাকে অব্যাহতি দিয়ে টিটোকে মহাসচিব করা হল। আমি ভেবে রেখেছিলাম দেশে প্রত্যাবর্তন করে পুনরায় আর দায়িত্বভার বুঝে নেব না। স্বাভাবিক পথেই আমার অব্যাহতি কার্যকর হয়ে যাবে। কিন্তু মিজান সাহেবের আর তর সইছিল না। আমি ঢাকায় পৌঁছে গেলে কী হয় বলা যায় না! মাটিতে পদার্পণ করার পূর্বেই তার কর্ম সমাধা করা প্রয়োজন। এ.বি.এম. শাজাহান অতিমাত্রায় ক্ষুব্ধ হয়ে দল থেকে পদত্যাগ করল। আমি ফিরে এসে অনেক বুঝিয়ে তাকে শান্ত করা গেল।

কর্মীরা সর্বদা মুখ কালো করে থাকে। আমি কিছুদিন দলীয় কর্মকাণ্ড থেকে নিজেকে বিরত রাখি। কিন্তু দীর্ঘ সময় বসে থাকা যায় না, সহকর্মী ও দলের বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনের বিপুল কর্মীদের ঐকান্তিক আগ্রহে পুনরায় দলীয় কর্মকাণ্ডে মনোনিবেশ করতে হয়। যত অন্যায়ই করে থাকুক, এরশাদ সাহেব এখনও জেলে বন্দি। এ অবস্থায় চুপ থাকা সমীচীন মনে হল না। সে বেরিয়ে এলে বুঝাপড়া হবে, আপাতত তাঁর মুক্তির পক্ষে কাজ করাই বিচেনাপ্রসূত মনে হল।

কিছুদিনের মধ্যেই টিটোর মোহ দূর হয়ে গেল। মিজান সাহেব তাকে নিয়ে সুবিধা করতে পারছিল না। আর এক দফা মহাসচিব পরিবর্তন করা হল। এ কাজটা এরশাদ সাহেব ভালোই পারেন। এবার মহাসচিব করা হল দল সম্বন্ধে যার কোনদিন মাথা ব্যথা ছিল না, দলীয় রাজনীতিকে যে অনাগ্রহে অবলোকন করত সেই আনোয়ার হোসেন মঞ্জুকে। সরকারে থাকার সময় একবার সে বলেছিল, দলের কী প্রয়োজন? ডিসি আমাদের প্রেসিডেন্ট আর এসপি আমাদের সেক্রেটারি।

দলীয় রাজনীতি সম্বন্ধে এই যার ধারণা, সেই হাসি-খেলায় মগ্ন আনন্দময় জীবন যাপনে অভ্যস্ত ব্যক্তিকে এবার মিজান সাহেবের কলকাঠি নাড়ানোর ফলে এরশাদ সাহেব মহাসচিব মনোনীত করলেন। ব্যক্তিগত পর্যায়ে তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক মধুর। মঞ্জু মিজান সাহেবকে কাকা বলে সম্বোধন করলেও অগোচরে 'কাহা' বলে ডাকে। মিজান সাহেব জানে কিনা জানি না, কিন্তু দলের সকল পর্যায়ের মানুষই জানে মঞ্জু মনে করে সামান্য কিছু নগদ নারায়ণের সুবাদে তার 'কাহা' সবকিছুই মেনে নেবে। মহাসচিব

তার পিতা মরহুম তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার 'ইত্তেফাক' গ্রুপের অন্যতম স্বত্বাধিকারী এবং প্রভূত অর্থশালী। যার কল্যাণে অচিরেই তাকে ঘিরে একদল কর্মীর আনাগোনা লক্ষ্য করা গেল। সভাসমাবেশে স্বল্পকালীন উপস্থিতি তার রেওয়াজে পরিণত হল। সর্বসমক্ষে টিনজাত পানীয় পান করা ছিল তার সহজাত অভ্যাস। ইজি গোয়িং তার কাহা'র জন্য কোন সমস্যা সৃষ্টি না করেও মঞ্জু দলের জন্য অবদান রাখতে সমর্থ হয়েছিল। বিএনপি'ওয়ালাদের নিক্ষিপ্ত বোমায় মারাত্মক আহত হয়ে তাকে বেশ কিছুদিন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকতে হয়েছিল। ময়মনসিংহে আমার সঙ্গে তারও জীবন সংশয় ঘটেছিল।

দেখতে দেখতে বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন তুমুল হয়ে উঠল। আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি এবং জামায়াতের মধ্যে একটি লিয়াজোঁ কমিটির মাধ্যমে সমন্বয় সাধন করে একের পর এক কর্মসূচি পালিত হতে থাকল। দেশের মধ্যে এক অস্থিতিশীল, নৈরাজ্যপূর্ণ ও অরাজক রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি হল। সরকার তার নির্যাতন-উৎপীড়নের মাত্রা বৃদ্ধি করে দিল। তরুণ মাসল্ম্যানদের উপর অধিকতর নির্ভরশীল বেগম খালেদা দম্ভোক্তি করল, আমার ছাত্রদলের কর্মীরাই বিরোধী দলকে শায়েস্তা করতে যথেষ্ট।

প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং এইভাবে হিংসার প্রশ্রয় দেবে ভাবা যায় না। জাতীয় পার্টির উপর তার জাতক্রোধ সর্বকালের সর্ব রেকর্ড ছাড়িয়ে গেল। সরকার গঠনকালে সংসদে তাদের একমাত্র সহযোগী জামায়াতে ইসলামীর আমির অধ্যাপক গোলাম আজমকেও কৃতজ্ঞতার ঋণ পরিশোধে গ্রেপ্তার করে কারাগারে নিক্ষেপ করা হল। তারা অবশ্য বৃহৎ দল বলেই সযত্নে আওয়ামী লীগের উপর তেমন কোন রাজনৈতিক নির্যাতন থেকে বিরত রইল। সংসদে বিরোধী দলের নেত্রী হাসিনা ওয়াজেদের নেতৃত্বে দীর্ঘদিন সংসদ অধিবেশন বর্জন করার পর এক পর্যায়ে সকল বিরোধী দলীয় সদস্য সংসদের সদস্যপদ থেকে একযোগে পদত্যাগ করল। পৃথিবীর ইতিহাসে এ ধরনের পদত্যাগের ঘটনা খুব একটা দৃষ্টিগোচর হয় না। রংপুরের পীরগঞ্জের সাংসদ হিসাবে আমারও কার্যকাল সমাধা হল। সেখানকার আপামর জনগণ অবশ্য আমাকে দ্বিতীয়বার সেখান থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার অনুরোধ করল। কিন্তু উপ-নির্বাচনে যে ঘোষণা দিয়েছিলাম, 'আমি স্থায়িভাবে এখানে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ইচ্ছা রাখি না' সে কথার অমর্যাদা করার কোন কারণ নেই। সংসদে নির্বাচিত হতে না পারলেও কথার বরখেলাপ করা বড় অন্যায়।

বিরোধী দলের সমস্ত সদস্যদের পদত্যাগের পরও সরকারের টনক নড়লো না। বাংলাদেশটাকে ওরা নিজেদের ব্যক্তিগত সম্পদে পরিণত করেছিল। বিএনপি হলেই সাত খুন মাফ। সরকারি জায়গা-জমি, সম্পত্তি, হাট-বাজার, গরুর হাট, ছাগলের হাট এমনকি পতিতালয়গুলোতেও ওরা

ওদের আধিপত্য এবং অর্থ-উপার্জন কায়েম করল। ঘুষ আর দুর্নীতি প্রকাশ্যে জাতীয়করণকৃত হল। সরকারি কর্মকর্তারাও দলীয়ভাবে জড়িয়ে পড়ল।

পুলিশ বাহিনী বিএনপি পুলিশে পর্যবসিত হল। পেশীশক্তি-নির্ভর হয়ে এককভাবে ওরা দেশ শাসন করতে থাকল। নিজেরা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ফসল হয়েও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সার্বজনীন দাবি উপেক্ষা করে চলল। এভাবেই নির্যাতনের স্টিম-রোলার চালিয়ে বিএনপি তাদের মেয়াদ উত্তীর্ণ করল এবং '৯৬ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি একটি প্রহসনের একদলীয় নির্বাচন অনুষ্ঠান করল। কোন রাজনৈতিক দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করল না। ভোটারবিহীন এক ভোট অনুষ্ঠানের আয়াজন করে তারা অধিকতর বিপর্যয় ডেকে আনল।

তাদের হাতে যে কোন নির্বাচন সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ হতে পারে না তা তারা পূর্বেই মাগুরার উপ-নির্বাচনে প্রমাণ করেছিল। সেই উপ-নির্বাচনে জাতীয় পার্টিও প্রার্থী দিয়েছিল। নির্বাচন নয়, সেটা ছিল অস্ত্রের মহড়ার স্থল। স্বয়ং প্রধান নির্বাচন কমিশনার মাগুরা সার্কিট হাউসে ঢুকে দেখে সেখানে অস্ত্রধারীরা প্রকাশ্যে তাদের অবৈধ অস্ত্রসমূহ পরিষ্কার করছে, তৈল নিসিক্ত করে ব্যবহার উপযোগী করে তুলছে। প্রধান নির্বাচন কমিশনার সেখানে অবস্থান করার জন্য একটি কক্ষও পেল না। সে সরাসরি রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করে জানিয়ে দিল এ ধরনের নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তা কোথায়!

পুলিশ এত বেড়ে গিয়েছিল যে, দিনাজপুরে তাদের নিকট আশ্রয় প্রার্থিনী কিশোরী ইয়াসমীনকে তারা ধর্ষণ করে হত্যা করতে দ্বিধা করল না। রক্ষক ভক্ষক হয়ে ওঠায় সমগ্র দেশ গর্জে উঠল এই অমার্জনীয় নৈতিকতাহীন অপরাধের বিরুদ্ধে। সে সময় পান্থপথে এক জনসভায় দাঁড়িয়ে বলেছিলাম, 'মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী, আপনার জন্য আমাদের ভয় হয়। আপনি কেবল প্রধানমন্ত্রীই নন, মরহুম জিয়াউর রহমান সাহেবের আপনি বিধবা পত্নী। এখনও দেখতে-শুনতে মাশাল্লাহ্ আপনি অনিন্দনীয়। এই পুলিশই সর্বক্ষণ আপনার সঙ্গে থাকে। একটু সাবধান থাকবেন! ইয়াসমিনের ঘটনার পর আমাদের দুর্ভাবনা বৃদ্ধি পেয়েছে।

সমাবেশের পুলিশরাও হাসছিল!

পৃথিবী জুড়ে এই একক প্রহসনমূলক নির্বাচনের নিন্দা উচ্চারিত হল। দাতা দেশসমূহ এবং আন্তর্জাতিক সাহায্যকারী সংস্থাগুলো তাদের সহযোগিতার প্রশ্নে দ্বিধান্বিত হয়ে পড়ল। সারাটা দেশ এক রাজনৈতিক অগ্নি-উৎপাতের সম্মুখীন হল। সরকার দিশেহারা হয়ে শেষ পর্যন্ত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি মেনে নিতে বাধ্য হল। সাবেক প্রধান বিচারপতি হাবিবুর রহমান সাহেবকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান নিয়োগ করা হল। একটি উপদেষ্টামণ্ডলীর মাধ্যমে সে অন্তর্বর্তীকালের জন্য সরকার পরিচালনা এবং

নতুন জাতীয় নির্বাচনের ব্যবস্থার উদ্যোগ গ্রহণ করল। সে বছরই ১২ই জুন সারা দেশে জাতীয় নির্বাচনের তারিখ নির্ধারিত হল।

আমাদের পক্ষ থেকে প্রার্থী নির্বাচনের জন্য পার্লামেন্টারি বোর্ড গঠন করে পাঠালেন চেয়ারম্যান সাহেব। তার স্ত্রী, তাঁর ভাই, তাঁর আইনজীবী সকলেই তার সদস্য। কেউ আসে, কেউ যায়। ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান এবং মহাসচিবকে দেখা যায় উদ্দেশ্যবিহীন ও উদাসীন। মওদুদ, কাজী জাফর, মিসেস এরশাদ এবং আমি গুরুত্বসহকারে বিষয়টি বিবেচনায় নিলাম এবং চার দিন পর্যন্ত দিন-রাত পরিশ্রম করে সহস্রাধিক প্রার্থীর সাক্ষাৎ গ্রহণ করে একটি সম্মত তালিকা প্রস্তুত করে চার জনের স্বাক্ষর সহকারে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ও মহাসচিবের মাধ্যমে অনুমোদনের জন্য চেয়ারম্যানের নিকট প্রেরণ করতে দিলাম। পরে জানা গেল ভারপ্রাপ্ত পাঠিয়েছে এক রকম তালিকা, মহাসচিব পাঠিয়েছে আর এক রকম। এরশাদ সাহেব এই দুই তালিকা, আমাদের মনোনীত তালিকা এবং তাঁর ব্যক্তিগত সংগৃহীত তথ্যাদি বিবেচনায় নিয়ে তাঁর অনুমোদন পাঠালেন। অধিকাংশ প্রার্থী বোর্ড কর্তৃক মনোনীত হলেও অনেক স্থানেই নতুন মুখ দেখা গেল। এদের মনোনয়নের উৎস কোথায় সঠিক জানার উপায় নেই। মনোনয়ন পর্বে তিন জন বোর্ড সদস্য কিছু কিছু প্রার্থীর নিকট থেকে উৎকোচ গ্রহণ করেছিল বলে তারা অভিযোগ করে। অন্তত পঁচিশ ব্যক্তি কাকে অর্থ প্রদান করেছে সেকথা প্রকাশ করতে প্রস্তুত। এরশাদ সাহেব মুক্তি পাবার পর তেজগাঁওস্থ এশিয়াটিক প্রেস প্রাঙ্গণে যখন তিন দিন ব্যাপী দলের বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছিল তখন এ অভিযোগ তুলে ধরেছিলাম। উপস্থিত প্রতিনিধিদের মধ্য থেকে তাৎক্ষণিকভাবে সমর্থন আসে। সভায় বললাম, মাত্র দুই দিন সময় দিলে আমি প্রার্থীদের সশরীরে উপস্থিত করে অভিযোগের প্রমাণ উপস্থাপিত করতে সক্ষম।

আমার বক্তব্য ছিল, দলের বৃহত্তর স্বার্থে দুর্নীতির এ ধরনের অভিযোগের মূলোৎপাটন প্রয়োজন। এও বলেছিলাম, যদি একজন প্রার্থীও বলতে পারে আমাকে কেউ একটি পয়সা দিয়েছে মনোনয়নের জন্য তা হলে চিরতরে রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়াব।

চেয়ারম্যান সাহেব সবকিছু সম্যক উপলব্ধি করলেও অভিযোগগুলোর নিষ্পত্তি করা থেকে বিরত রইলেন। 'ঠক বাছতে গা উজাড়' কথাটি হয়ত তাঁর মনে পড়েছিল। মঞ্চে উপবিষ্ট দু'জনের মুখ কালিমালিপ্ত হয়ে গিয়েছিল। বর্ষীয়ান ভদ্রলোক তখন বোধগম্য কারণে হাসপাতালে শয্যাশায়ী।

নির্বাচনের প্রাক্কালে নেতৃবৃন্দকে সমগ্র দেশে নির্বাচনী সভা-সমাবেশে যোগদান করতে হয়। নেতৃবৃন্দ যদি নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়ে তা হলে প্রার্থীদের পক্ষে প্রচারণা করবে কে? বিশেষত মূল নেতা যেখানে কারাবন্দি!

আমি তাই চেয়ারম্যান সাহেবকে অনুরোধ করে পাঠিয়েছিলাম আমাদের চার জন সিনিয়র সদস্য মিজান সাহেব, মওদুদ, কাজী জাফর এবং আমি যদি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করে চার বিভাগের দায়িত্ব নিই তা হলে অধিকতর ফলপ্রসূ নির্বাচন পরিচালনা সম্ভব হবে। আমরা অধিক মনোযোগ ও সময় দিয়ে এক-একটি বিভাগে সম্ভাবনাময় এলাকা চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় অর্থের যোগানসহ যদি আন্তরিকভাবে পরিশ্রম করি তা হলে আমাদের ফলাফল আশাব্যঞ্জক হওয়ার কথা। এরশাদ সাহেব পাঁচটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে আশা করা যায় পাঁচটিতেই জয় লাভ করবেন এবং স্বাভাবিক নিয়মে যে চারটি আসন ছেড়ে দেবেন সেসব স্থানে আমরা চার জন উপনির্বাচনে সহজেই আসতে সক্ষম হব। এই চার জন অভিজ্ঞ পার্লামেন্টারিয়ান এবং প্রধান রাজনীতিক যদি সংসদে এরশাদ সাহেবের পশ্চাতে দাঁড়াই তা হলে জাতীয় পার্টির সংসদে অবস্থান সুদৃঢ় হয়। কেন জানি না তাঁর নিকট এ প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য হল না। আমরা যার যার নির্বাচনী এলাকায় ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। প্রায় সর্বত্রই প্রার্থীগণ আমাকে তাদের নির্বাচনী এলাকায় যাওয়ার জন্য আবদার করেছিল। কিন্তু আমি পূর্বাহ্নেই বলে দিয়েছিলাম যদি আমাকে নিজের নির্বাচন করতে হয় তা হলে নির্বাচনের সময় অন্যত্র যাওয়া সম্ভব হবে না। বিগত পাঁচটি বছর আমার এলাকায় আমাকে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। বিএনপি আমলে নিজ জেলা আমার জন্য ছিল নিষিদ্ধ। প্রতিটি মুহূর্ত কাজে লাগিয়েও আমি এই স্বল্প সময়ে কতটা অগ্রসর হতে পারব তা অনিশ্চিত।

মনোনয়ন পর্ব শেষ করে মাত্র তিন সপ্তাহ হাতে নিয়ে এক দুর্বার নির্বাচনী প্রচারণায় আত্মনিয়োগ করলাম। এর মধ্যেও একদিনের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলাম নরসিংদীতে একটি বড় জনসভা করে দেব। নিজে প্রার্থী না হয়েও ফখরুল সনির্বন্ধ অনুরোধ করেছিল এই সভাটির জন্য। তাকে আমি সহোদরের মতো স্নেহ করি, তার অনুরোধ অগ্রাহ্য করা সম্ভব ছিল না।

মনোনয়ন পর্বের পূর্বেই যা সভা-সমাবেশ করে দিয়েছি, পরে আর অন্যত্র যাওয়া সম্ভব হয়নি। এ দায়িত্ব নিল ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের। কারণ সে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছে না। সেখানেও প্রচুর ধরাধরি করে উপযুক্ত মাশুল দিয়ে প্রার্থীদের প্রোগ্রাম নিতে হয়েছে। প্রোগ্রাম দিয়ে দুর্বোধ্য কারণে অনেক স্থানে না পৌঁছার ফলে প্রার্থীর প্রভূত ক্ষতি সাধিত হয়েছে। অর্থের যোগানও ছিল প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অপ্রতুল। এবং সেসবও বহু ধর্ণা দিয়ে, সময় ক্ষেপণ করে সংগ্রহ করতে গিয়ে মূল নির্বাচনী প্রচারণাই অতিমাত্রায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

জাতীয় পার্টিকে মনে হল পিতৃহীন এবং বা অন্যত্র বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ। অসহায় এ দল পরিচালনার দুর্বলতার কারণে, দুই বৃহৎ দলের মহিলা

নেতৃত্বের বিপরীতে, প্রচুর সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও তা ফলে পর্যবসিত করা গেল না। মাঠে ফসল ছিল, তা পরিপক্বও হয়েছিল। কিন্তু ঘরে তুলে নেওয়ার দক্ষ শ্রমের অভাব পরিলক্ষিত হল। নির্বাচনের ফলাফল আমাদের জন্য মোটেই আশাব্যঞ্জক হল না। মাত্র বত্রিশটি আসন পেলাম, পক্ষান্তরে বিএনপি আশাতীতভাবে নেতিবাচক ভোট পেয়ে এক শত পনেরোটি আসন লাভ করল। আন্দোলনের মুখে পরাজিত এই দলটির জন্য এটি ছিল একটি বৃহৎ সাফল্য।

অনেকেই মনে করেছিল মূল তিনটি দল কম-বেশি কাছাকাছি আসন পাবে। কিন্তু বিএনপি'র পাঁচ বছরের দুঃশাসন এবং জাতীয় পার্টির দুর্বল অবস্থান আওয়ামী লীগকে সাহায্য করল। উপায়ান্তর না পেয়ে মন্দের ভালো মনে করে জনগণ একটি পরিবর্তনের কামনায় তাদেরকে বেছে নিল।

নিজের এলাকায় আমার শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপি'র প্রার্থী সংসদে উপনেতা ডা. বদরুদ্দোজা চৌধুরী এবং আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে ব্যারিস্টার কে.এস.নবী। এই নবী সাহেবই পরাজিত হওয়ার পর এটর্নী জেনারেল নিয়োজিত হয়েছিল। আমি ব্যতীত দুই প্রার্থীই সংগঠনগতভাবে শক্তিশালী। তাদের প্রচুর কর্মী ও সমর্থক। আর পাঁচ বছর আমি মাঠে অনুপস্থিত, দল গঠন সম্ভব হয়নি। তবুও আমার আস্থা ছিল, আমি যদি জনগণের নিকট গিয়ে দাঁড়াতে পারি তারা আমাকে নিরাশ করবে না। যে পুলটি সে পাড় হয়, যে রাস্তাটি সে পরিভ্রমণ করে, যে বিদ্যুতের আলো তার অন্ধকার দূর করেছে, যে চিকিৎসাকেন্দ্র তাকে সেবা দেয়, যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তার সন্তানের লেখা-পড়া সংগটিত হয়, যে স্টেডিয়ামে তাদের খেলাধুলা সভা-সমিতি হয় সবই আমার উদ্যোগে গড়ে উঠেছে। জনসভায় দাঁড়িয়ে ব্যক্তিগত কার্যাবলীর উল্লেখ উহ্য রেখে যেসব স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, মসজিদ, ক্লাব, হাটবাজার, ডাকবাংলো, হাসপাতাল, এতিমখানা, উপজেলার কোর্ট-কাছারি প্রভৃতি যে সকল প্রতিষ্ঠান গড়েছি তার উল্লেখ করে অর্ধশতাধিক প্রতিষ্ঠানের নাম উচ্চারণ করে বললাম, এসব যদি আমি করে থাকি তা হলে সব ভোট আমার প্রাপ্য। আর এর একটিও যদি অন্য প্রার্থী করে থাকে তা হলে আমি একটি ভোটও দাবি করি না।

জনগণ দুই হাত তুলে সোল্লাসে প্রতিধ্বনি করল, সবকিছুই আমার সময়ে হয়েছে। সব ভোটই আমার পাওয়া উচিত।

সনাতন পদ্ধতিতে সভা, শোভাযাত্রা, জনগণের সঙ্গে গভীর রাত পর্যন্ত যোগাযোগ সবই উৎসাহব্যঞ্জক মনে হয়েছিল।

আজমল হুদা মিঠুর বিরচিত গানের ক্যাসেট, যা এরশাদ, জাতীয় পার্টি এবং আমাকে নিয়ে গীত হয়েছিল তা খুবই সমাদর পেল। বিশেষ করে তার রচিত 'আমি মোয়াজ্জেম বলে যাই' গানটি বিক্রমপুরের সর্বত্র সমাদৃত হল।

ব্যারিস্টার সাহেবের এলাকার সঙ্গে যোগাযোগ ছিল ক্ষীণ। কিন্তু চৌধুরী সাহেবের পিতা ছিলেন একজন প্রখ্যাত রাজনীতিক ও মন্ত্রী। সেই সুবাদে তার ছিল অগাধ অর্থের সুরাহা। তাছাড়া সে ছিল সাবেক উপ-প্রধানমন্ত্রী এবং একজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক। কিন্তু জনগণ প্রকাশ্যে তার সমালোচনা করত। কেননা, তাকে দিয়ে এলাকার কোন কাজ হয়নি। মানুষের কোন কল্যাণই তার দ্বারা সাধিত হয়নি। তবুও আমাদের ধারণা হল বিগত পাঁচ বছরের সরকারের আমলে তারা অনেকটা গুছিয়ে নিয়েছে। অর্থবল, লোক-বল, অস্ত্রবল, সাংগাঠনিক শক্তি কোনটাই তাদের দুর্বল ছিল না। হিন্দু ভোটারগণ প্রকাশ্যে আমার হাত স্পর্শ করে দেব-দেবীর নাম উচ্চারণ করে ভোট দেবার শপথ করলেও সকলেই বলাবলি করত ওদের অধিকাংশই শেষ পর্যন্ত নৌকাতেই একটি নমস্কারে প্রভু করবে। বিএনপি প্রার্থী সম্বন্ধেই সভা-সমাবেশে অধিকতর সমালোচনা হত। আওয়ামী লীগ প্রার্থীর সঙ্গে কোন সৌজন্যমূলক সম্পর্কই বজায় রইল না তা নয়, শ্রীনগরের শেষ জনসভা তাদের করার অনুমতি থাকলেও তারা সেদিন মাঠ আমাদের ছেড়ে দিল। দু'দিন পূর্বে বিএনপি যে সভা করেছে তার মোকাবেলা করা তাদের সম্ভব হবে না বলে তারা আমাদেরকেই সেই সুযোগ দিল।

'৯৬ সালের ১০ই জুন আমরা শ্রীনগরে যে জনসভা করেছিলাম সেটি ছিল বিক্রমপুরের মাটিতে আজ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত সকল জনসভার মধ্যে সর্ববৃহৎ। সর্বশক্তি নিয়োগ করে আমরা এই সভার আয়োজন করেছিলাম। লোক হয়েছিল ইতিহাস সৃষ্টিকারী। মানুষজন বাদ্যযন্ত্র সহকারে লাঙ্গল বানিয়ে নাচতে নাচতে মাইলের পর মাইল হেঁটে শোভাযাত্রা করে সভায় উপস্থিত হল। শেখরনগর ছিল একটি দূরবর্তী এলাকা এবং আসার ব্যবস্থা নৌ-পথে। বিএনপি'র শেষ সভায় সেখান থেকে আটটি বৃহৎ যন্ত্রচালিত কোষা নৌকায় অনেক লোক এসেছিল। আমাদের কর্মীরা ধরল, আমাদের সভায় অন্তত একটি বেশি হলেও কোষা নৌকা আনাতে হবে।

আমার বিশ্বাসভাজন কর্মী দুলাল দাস ও সমিজ দেওয়ানকে সে মর্মে দায়িত্ব দিলাম। ওরা আমাকে এবং সমগ্র বিক্রমপুরবাসীকে স্তম্ভিত করে দিয়ে আটাশটি বৃহৎ আকারের যন্ত্রচালিত কোষা একসঙ্গে আড়িয়াল বিল পাড়ি দিয়ে যখন শ্রীনগরে নিয়ে এল, তখন এলাকার সকল নর-নারী মনে করল, দেশ কী আর একবার স্বাধীন হল! সে দৃশ্য যে না দেখেছে সে কল্পনাও করতে পারবে না। এত বড় নৌ-শোভাযাত্রা দেখতে পাওয়াও সৌভাগ্যের বিষয়। কিন্তু মাঠে লোক ধরে না, ওরা নৌকাতে বসেই সভা শুনল। সভার কলেরব দেখে সকলেই আমার বিজয় অবশ্যম্ভাবী মনে করে অগ্রিম অভিনন্দন জানাল। ওদের চাইতে অনেক বেশি লোক আমাদের সভায় উপস্থিত হয়ে শপথ নিল লাঙ্গলে ভোট দেবে। আমার আশান্বিত না হওয়ার কারণ ছিল না।

অবশ্য একটা বিরাট ভুল হয়ে গেল সভায়। অত্যধিক সফলতায় উল্লসিত আবদুল কুদ্দুস ধীরণ আমার বক্তৃতার মাঝেই এসে বলল, লীডার, ঘোষণা দিয়ে দিন, আজ রাত আটটায় এরশাদ সাহেব রেডিও, টিভিতে বক্তৃতা করবেন।

এমন একটা কথা হচ্ছিল। যদি হত তা হলে সেটাও হত এক ইতিহাসের বস্তু। বন্দিদশা থেকে নেতার বক্তৃতায় আমাদের অবস্থান অধিকতর দৃঢ় হত। উল্লাসে-আবেগে যাচাই না করে আমি সে সুংবাদ জনতাকে দিতেই আনন্দে সমস্ত মাঠ নেচে উঠল। আমার বক্তৃতা তখনও শেষ হয়নি। পাঁচ মিনিট লাগল উত্তাল সভাকে শান্ত করতে। সভা শেষ হতেই লোকজন দ্রুত নিজ নিজ গৃহে ফিরে গেল বন্দি এরশাদের বক্তৃতা শুনবে বলে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর বক্তৃতা হল না। জাতীয় পার্টিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারও শেষ আঘাত হানল আওয়ামী লীগ ও বিএনপি'কে সন্তুষ্ট রাখতে গিয়ে। হাইকোর্টে আপিল করে তারা এরশাদ সাহেবের বক্তৃতার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে দিল। সমগ্র দেশবাসী হতবিহ্বল হয়ে পড়ল। অনেক স্থানেই বিজয়ের সম্ভাবনা বিদূরিত হয়ে পরাজয়ের আভাস দেখা গেল। আমাদের এলাকায় বিএনপি এই সুযোগ ছাড়ল না। সেদিন রাত বারোটা পর্যন্ত মাইক চালানো সিদ্ধ ছিল। তারা বিশটি ইউনিয়নেই মাইক ছেড়ে দিল। তাদের বক্তব্য, জাতীয় পার্টি মিথ্যা বলেছে, জনগণকে ধোঁকা দিয়েছে। এরশাদ কোনদিন জেল থেকে বের হতে পারবে না। বক্তৃতা দেওয়ার প্রশ্নই আসে না। কারাবন্দির দলকে ভোট দিয়ে ভোট পানিতে ফেলবেন না। তারা আরও প্রচার করল, আমি নির্বাচন পরিত্যাগ করে ঢাকা চলে গিয়েছি। সর্বত্র একটা সন্দেহ ও নৈরাজ্যের পরিবেশ বিরাজ করতে দেখা গেল। আমাদের শেষ জনসভার বিরাট সাফল্যে বিএনপি ঘাবড়ে গিয়ে সে রাতে এবং পরের দিন ও রাতভর প্রতিটি অঞ্চলে গাড়ি নিয়ে চষে ফেলেছে এবং জনশ্রুতি যে, সে সময় প্রায় তিন কোটি টাকা নগদ বিতরণ করে পরিস্থিতি তাদের অনুকূলে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়।

নির্বাচন অনুষ্ঠানের পূর্বদিন কোন প্রচার প্রচারণা সম্ভব নয়। মাইক চালানো বন্ধ। উপায়ান্তর না পেয়ে গাড়ি নিয়ে প্রত্যুষেই বেরিয়ে পড়লাম। যতটা সম্ভব প্রতিটি এলাকায় একবার দেখা দিয়ে মানুষকে বুঝাতে হবে আমি নির্বাচন ছেড়ে দিয়ে ঢাকা চলে যাইনি, প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রয়েছি। সম্ভাব্য সব প্রচেষ্টা নেওয়া সত্ত্বেও ভোটারদের মধ্যে একটা দ্বিধার ভাব রয়ে গেল।

দ্বিতীয়ত, আমরা কোনদিন যেটা বিবেচনা করিনি সেটা হচ্ছে পৃথকভাবে মহিলাদের সংগঠিত করার বিষয়। প্রথমে মনে করেছিলাম আমাদের এলাকার মেয়ে-বউ কয়েকজন মহিলা সংগঠক ও বক্তা দিয়ে পৃথকভাবে মহিলাদের বিশেষ সমাবেশের আয়োজন করে তাদের মাধ্যমে মহিলাদেরকে উদ্বুদ্ধ করার ব্যবস্থা করা

হবে। মিতা ভাবী, আমেনা বারী, মীরা, চঞ্চল, লিপি প্রমুখকে আমরা সহজেই কাজে লাগাতে পারতাম। কিন্তু বিষয়টি বেশ জটিল এবং এতটা সময় ও সুযোগ আমাদের ছিল না। বিগত পাঁচ বছরের সরকারে থাকাকালীন বিএনপি যে ভিতরে ভিতরে এনজিও'দের মাধ্যমে মহিলা ভোটারদের সুসংগঠিত করে রেখেছে এবং নগদ অর্থ, শাড়ি, কাপড়, গমের বিনিময়ে তাদের ভোট প্রায় নিশ্চিত করে রেখেছে তা আমরা অবগত ছিলাম না। আমাদের এলাকায় মহিলা ভোটার অর্ধেকেরও বেশি। কাজেই যে তাদের সিংহভাগ ভোট আয়ত্ত করতে পারবে তার বিজয় সুনিশ্চিত। চিরদিন সভা-সমাবেশ, শোভাযাত্রা ও প্রকাশ্য জনসংযোগের মাধ্যমেই নির্বাচন পরিচালনা করে সারা দেশের মধ্যে বেশ কয়েকবার সর্বাধিক সংখ্যক ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছি। এবারও সেভাবেই কাজ করেছি। কিন্তু সময় পাল্টাবার সাথে সাথে পরিস্থিতি যে বদলেছে, তার সম্যক ধারণা আমাদের অভাব ছিল এবং আমরা অবশ্যম্ভাবী বিরূপ ফলাফলের আশঙ্কা করলাম।

এত কাণ্ডের পরও মুসলিম পুরুষ ভোট লাঙ্গলের পক্ষেই বেশি পড়েছিল। নৌকার রিজার্ভ হিন্দু ভোট রয়েছে। ধানের শীষে রিজার্ভ হয়ে গেল মুসলিম মহিলা ভোট। সেক্ষেত্রে তাদেরকে ঠেকানো প্রায় অসম্ভব।

বিষয়টি আরও উপলব্ধি করলাম নির্বাচনের দিন। প্রচারণাকালে বহু মা-বোনেরা পূর্বের মতো ঘর-বাড়ির বাইরে এসে আমাদেরকে এক নজর দেখার চেষ্টা করেছে, মনে হয়েছে অবস্থা পূর্ববৎ রয়েছে। কিন্তু তা নয়। একদিন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী স্যার জগদীশ চন্দ্র বসুর গ্রাম রাঢ়িখাল থেকে ফিরছিলাম, কর্মীরা লাঙ্গল লাঙ্গল করে আমার স্বপক্ষে আওয়াজ তুলছিল। একটি তরুণী একা হেঁটে যাচ্ছিল। মেয়েরা সাধারণত এ রকম পরিবেশে নীরবে পাশ কেটে চলে যায়। কিন্তু মেয়েটি একাই আওয়াজ করে উঠল, আমরা মহিলারা ধানের শীষের সমর্থক। কথাটি একজন তরুণীর মুখ নিঃসৃত হওয়ায় আমার মধ্যে একটা সন্দেহ জন্ম নিল। ভোটারদের বৃহদাংশের প্রতি আমাদের চিরাচরিত দূরত্ব কোন বিপর্যয় ডেকে আনবে কিনা কে জানে! যা ভেবেছিলাম তা-ই হল।

ভোটের দিন গাড়ি নিয়ে কফিল, কয়েস, বিপ্লবসহ বিভিন্ন ভোটকেন্দ্র পরিদর্শনে গিয়ে লক্ষ্য করলাম পুরুষ ভোটারদের যেখানে একটি লাইন, সেখানে মহিলাদের দুটি বা তিনটি লাইন। অন্যান্য বারের তুলনায় এবার প্রচুর মহিলা ভোটার কেন্দ্রে উপস্থিত। শুধু তা-ই নয়, এ যাবত যেখানেই ভোটের দিন উপস্থিত হয়েছি, ভোটারদের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য লক্ষ্য করেছি। তাদের অভিবাদন, হাসি, উৎসাহ এবং ইশারায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তারা আমাকে আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করছে এবং পরিস্থিতি অনুকূল। কিন্তু এবার বিপরীত অবস্থা অবলোকন করলাম। পুরুষ ভোটারদের মধ্যে পূর্ববৎ চাঞ্চল্য লক্ষ্য করা গেলেও মহিলাদের মধ্যে কোন ভাবান্তর লক্ষ্য করা গেল না। তারা যেন পবিত্র কর্তব্য সম্পাদনে দণ্ডায়মান একদল অনাসক্ত রক্ত-মাংসের পুতুল।

না আছে হাসি, না আছে কোন উষ্ণ চাহনি বা উৎসাহিত ভাব-ভঙ্গি। আমি কে এবং কেন এসেছি এ সম্বন্ধে তারা নির্বিকার। নির্বাচনের অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে আমি প্রায় বুঝে গেলাম অবস্থা প্রতিকূল। উৎসাহ-উদ্দীপনা স্তিমিত হয়ে এল। কর্মীরা আমাকে সর্বত্র নিয়ে যেতে চায়, ওদের উদ্দীপনা তখনও হ্রাস পায়নি। আমি কফিলকে বললাম, বাবা, আমাকে বাড়িতে নিয়ে চল।

পাকিস্তান আমলে আমাদের গ্রামের জমিদার পশ্চিম বঙ্গে চলে গেলে তাদের প্রাসাদোপম বাড়ি ও সম্পত্তি মামা এবং সোহরাব দা ক্রয় করে রেখেছিল। দোগাছির হাজরা বাড়ি বলে খ্যাত সেই বসতবাড়ির এক অংশ সোহরাব দা নিজ পরিবারের ব্যবহারে রেখেছে; অন্য অংশে পল্লী স্বাস্থ্য-কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। নির্বাচনের সময়ে সোহরাব দা ও মিতা ভাবীর ঐকান্তিক আতিথেয়তায় সদলবলে তাদের নতুন নাম দেওয়া বড় বাড়ির দ্বিতলেই আস্তানা গেড়েছিলাম। বাড়ি ফিরে শুনলাম, গ্রামের ছেলেরা অর্থের জন্য দরকষাকষি করেছে। সোহরাব দা এই অকৃতজ্ঞ গ্রাম্য তরুণদের তীব্র কণ্ঠে তিরস্কার করেছে, গ্রামের জন্য আমার অবদানের কথা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। কিন্তু বাতাস বদলে গেছে। অর্থের আবহাওয়ায় সর্বত্র নতুন অনর্থের সূচনা হয়েছে। আমাদের সনাতনী মানবিক মূল্যবোধ, সেবাধর্মী ধ্যান-ধারণার কাল বোধহয় শেষ হয়েছে।

আমাদের বাড়িতে প্রয়োজনে কাজকর্ম করে দেয়, আমাদের আশ্রয় এবং সাহায্যের আনুকূল্যে জীবন ধারণ করে এমন ক'জন কাজের মহিলাও আমাদের বাড়ির বৌ-ঝিদের মতো ভোট কেন্দ্রে যেতে গাড়ি দাবি করে বসল। প্রস্তাব শুনে বড় দা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতেই সোহরাব দা তার হাত চেপে ধরল, করছ কি! নির্বাচন যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবে!

বড় দা বললেন, আমাদের বাড়ির মেয়েরা শহরে থাকে, ভোট দিতে গ্রামে এসেছে, তারা পায়ে হাঁটায় অনভ্যস্ত, অবশ্যই গাড়ি করে যাবে। আর এইসব মেয়েরা সর্বদাই পায়ে হেঁটে গ্রাম-গ্রামান্তরে যায়, হাট-বাজার, কাজকর্ম করে থাকে। কেউ ঘুঁটে কুড়ানোর কাজও করে থাকে। আজ ভোটের দিন তারা সুযোগ বুঝে আমাদের বউ-ঝিদের মতো গাড়ি চড়তে চাইছে! অসহ্য!

সোহরাব দা তাকে বুঝাল, একদিনের জন্য সহ্য করে যাও। ভোটের দিন কটু উচ্চবাচ্য করা যাবে না! ওরা যতই কৃতঘ্নতার পরিচয় দিক সহ্য করে যেতে হবে।

সোহরাব দার কথায় স্বভাব-কোমল বড় দা নিজেকে শান্ত করে ওদেরকেও গাড়িতে পাঠানোর ব্যবস্থা করলেন।

আমাদের গাড়িতে চড়ে যাওয়ার সময় ওরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে, যাচ্ছি লাঙ্গলের গাড়িতে ঠিকই, কিন্তু আমরা সব মেয়েরা ভোট দেব ধানের শীষে।

পূর্ব থেকেই সব লেনদেন হয়ে আছে। ড্রাইভার ক্ষেপে গিয়ে এই

অকৃতজ্ঞ মহিলাদের রাস্তায়ই নামিয়ে দেয় এবং গাড়ি নিয়ে ফিরে এসে বড় দাকে সব বলে দেয়।

বড় দা নিষ্ফল আক্রোশে জ্বলতে থাকে। কিন্তু করার কিছুই নেই। আমাদের বাড়িঘরে বসবাস করে, আমাদের জমি-জিরাত, পুকুর-ডেঙ্গার আয়ে সংসার চালিয়ে, আমাদের পরিবারের প্রত্যক্ষ সাহায্য-সহায়তায় সন্তানদের লেখাপড়া, চিকিৎসা থেকে শুরু করে প্রতিটি স্তরে যারা নিয়মিত করুণা প্রার্থী, ভোটের দিন আজ তাদের স্বরূপ প্রকাশিত হয়ে পড়ে। সেদিন মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, আর যা-ই করি না কেন, মানুষের নিকট আর কোনদিন ভোট প্রার্থনা করব না। নগদ বিদায়ের এই সমাজে আত্মত্যাগ আর সেবাশ্রয়ী রাজনীতির মূল্য ক্রমশই লোপ পেতে বসেছে। দেশের জন্য আশৈশব সংগ্রাম করেছি। সারাটি জীবন অকথ্য অত্যাচার-নিপীড়ন সহ্য করেছি। প্রায় দেড় যুগ কারা নির্যাতন ভোগ করেছি, ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে বাঙালির প্রতিটি স্বাধীকার সংগ্রামে অগ্রবর্তী ভূমিকায় থেকে স্বাধীনতা যুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে দেশকে স্বাধীন করার পর গণমানুষের জীবনের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে শত জনমুখী উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তাবায়ন করেও যদি যাদের জন্য করা; তাদেরই মূল্যায়ন না পাওয়া যায় তা হলে সুগভীর পরিতাপে মন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। গুণের বা কর্মের কোন মূল্য নেই। বিক্রমপুরের যেখানে যে উন্নয়নের ছোঁয়া লেগেছে তার পশ্চাতে ছিল আমার নিরলস প্রচেষ্টা একথা সকলে একবাক্যে স্বীকার করেও ভোটের বেলায় ভিন্ন দৃশ্য।

শঠতা, চাকচিক্য আর বেচাকেনার রাজনীতিতে ক্রমশ নিজেকে অযোগ্য বিবেচনা করছি।

দীর্ঘদিন অপরিসীম পরিশ্রমে শরীর ক্লান্তিতে ভেঙে আসছিল। তাছাড়া নির্বাচনে প্রচারণার এক পর্যায়ে শোভাযাত্রা করার সময় একটি সুউচ্চ পুল থেকে রিকশা ছিটকে নিচে পড়ে সমস্ত শরীরে গুরুতর আঘাত পেয়েছিলাম। কিছুক্ষণ পর্যন্ত জ্ঞান ছিল না। অনেকে মনে করেছিল জ্ঞান আর ফিরে না-ও আসতে পারে। এতদিন পর আবার অর্শজনিত পীড়ার আভাস পাচ্ছি।

তবুও বাড়িতে বসে থাকতে পারলাম না। কোথায় কি হচ্ছে জানার জন্য দ্বিপ্রহরে শ্রীনগর কার্যালয়ে এসে উপস্থিত হলাম। কিছুক্ষণ অবস্থানের পর শারীরিক যন্ত্রণা বৃদ্ধি পেতে পুনরায় বাড়ির দিকে গাড়ি চালাতে নির্দেশ দিলাম। চৌরাস্তার মোড়ে আসার পর বিএনপি'র একটি উল্লাসমুখর দলের সম্মুখে পড়ে গেলাম। তারা তাদের প্রাথমিক জয়ের সংবাদে যারপরনাই উল্লসিত। কয়েজন বখাটে অতি উৎসাহে আমার গাড়িতে আঘাত করে বিদ্রূপাত্মক গালি দিতেই অসুস্থতা ভুলে ঝাঁপ দিয়ে গাড়ি থেকে নেমে ওদেরকে চ্যালেঞ্জ করলাম। বললাম, তোদের অত্যাচার অনেক সয়েছি, আর নয়। এবার তোদেরকে মোকাবিলা করব।

কফিল এবং অন্যান্যরাও গাড়ি থেকে দ্রুত নেমে পাশে দাঁড়াল। একটা ভয়ঙ্কর অঘটন ঘটে যেতে পারত। কিন্তু আমার দৃঢ়তা ওদেরকে কিছুটা অবদমিত করল। ওদের মধ্য থেকে বয়স্ক ক'জন দৌড়ে এসে ক্ষমা ভিক্ষা চেয়ে আমাকে সসম্মানে গাড়িতে উঠিয়ে দিল। সংবাদটি উল্কার বেগে ছড়িয়ে পড়তে থানার বোধোদয় হল। তারা জানে এখন কিছু ঘটলে একতরফা হবে না এবং সহ্য করার মন-মানসিকতা আমাদের লোপ পেয়েছে। থানা থেকে সঙ্গে সঙ্গে মাইক যোগে ঘোষণা করে দিল কোন শোভাযাত্রা বা বিজয় মিছিল করা যাবে না। সম্ভাব্য দুর্ঘটনা এড়াতে তারা চারদিকে ভ্রাম্যমাণ পুলিশদল প্রেরণ করল। আমি শ্রান্তদেহে বাড়িতে এসে শয্যায় আশ্রয় নিলাম। হঠকারিতার ফলশ্রুতিতে বিএনপি নীরবে-নিভৃতে তাদের বিজয়োল্লাস পালন করতে বাধ্য হল।

বড় দা আমার অসুস্থতায় চিরদিনই অতিরিক্ত কাতর হয়ে পড়েন। আমাকে অবিলম্বে ঢাকা প্রত্যাবর্তন করে চিকিৎসকদের পরামর্শ নিতে আদেশ করলেন। তাঁকে বুঝালাম, নির্বাচনে জয়ী হতে না পেরে যদি এখনই ঢাকা চলে যাই, সেটা হবে কাপুরুষতার নামান্তর। মানুষ শারীরিক অসুস্থতার কথা উপলব্ধি করবে না বরং ভুল বুঝার সম্ভাবনাই বেশি। তারপর বললাম, আরও একদিন থেকে পরশু ঢাকা ফিরে যাব। কর্মীরা আসবে, তাদেরকে সান্ত্বনা দিতে হবে। পরাজয়কে স্বাভাবিক মানসিকতায় গ্রহণ করতে প্রস্তুত হলাম, কিন্তু দীর্ঘ খাটুনির ফলে আমার দেহ চলছিল না। অসুস্থ শরীর বিশ্রাম চাচ্ছিল।

বিভিন্ন স্থান থেকে কর্মীরা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে সমবেদনা জানাতে এসে আমার অবস্থা দেখে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ল। তারাও আমাকে ঢাকা চলে যাওয়ার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাল। কিন্তু সকলের অনুরোধ-উপরোধ অগ্রাহ্য করে নির্বাচনের পরদিনও গ্রামেই অবস্থান করে তৃতীয় দিন ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করলাম।

পরদিনই দলের আশু করণীয় সম্বন্ধে প্রেসিডিয়ামের সভা বসল মিজান সাহেবের বাসায়। প্রেসিডিয়ামের অধিকাংশ সদস্য উপস্থিত। বেগম এরশাদ, মওদুদ, কাজী জাফরসহ সকলেই অভিমত রাখল যেসব আসনে নির্বাচন বন্ধ হয়ে গিয়েছে সেসব আসনের প্রশ্নে নতুন করে চিন্তাভাবনা করা প্রয়োজন।

অবস্থাটা এমন যে, সবক'টি আসনও যদি বিএনপি পায় তা হলেও তারা সরকার গঠন করতে পারবে না। আওয়ামী লীগও একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারেনি। এখন যদি বিএনপি প্রার্থীদের সঙ্গে আমরা আসন বিন্যাস করে যে যেখানে এগিয়ে রয়েছে তাকে সহায়তা করি তা হলে জাতীয় পার্টির জন্য সর্বোত্তম ব্যবস্থা হয়। আওয়ামী লীগ বা বিএনপি উভয়কেই সেক্ষেত্রে সরকার গঠন করতে হলে এরশাদ সাহেবকে মুক্তি দিয়ে জাতীয় পার্টির সাহায্য নিতে হবে। আমরা সব সদস্যরা একমত হয়ে এ বিষয়ে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায় যখন ভাবছি, স্পষ্ট দেখতে পেলাম মহাসচিব এবং ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান পরস্পরের দিকে অসহায় দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে এবং কী এক অব্যক্ত কথা চোখে-মুখে ফুটে উঠেছে। হঠাৎ মহাসচিব আমার আমেরিকান রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে সময় নির্ধারিত আছে বলে সভা থেকে কেটে পড়ল। দৃশ্যত সে পরিস্থিতি থেকে মুক্তি খুঁজছিল। ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানও হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে সভা সেখানেই শেষ করতে চাইলে আমরা বিষয় কি জানতে চাইলাম। সে তখন আমতা আমতা করে যা বলল তার অর্থ হচ্ছে, নির্বাচনের পরদিনই সে এবং মহাসচিব একত্রে গিয়ে ধানমণ্ডিতে কথিত ধর্মীয় ব্যক্তি শেরে খাজার বাড়িতে আওয়ামী লীগ নেত্রী হাসিনা ওয়াজেদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জাতীয় পার্টি সরকার গঠনে আওয়ামী লীগকে সমর্থন জানাবে লিখে দস্তখত করে দিয়ে এসেছে। একথা বলে সে উপরে উঠে শোবার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল।

আমরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম। নেতৃবৃন্দ তখনও ঢাকা ফিরে আসেনি। নেতার সঙ্গে জেলখানায় কোন যোগাযোগ নেই। প্রেসিডিয়াম বা নির্বাহী কমিটির সভা হল না। নীতি নির্ধারকদের কোন বৈঠক হল না। কোন সিদ্ধান্তই হল না, তারা দু'জন দলকে আওয়ামী লীগের নিকট বিক্রয় করে এসেছে। শর্তহীনভাবে আওয়ামী লীগকে সমর্থনদানের পশ্চাতে আনোয়ার হোসেন মঞ্জুর চাণৈক্য বুদ্ধি কাজ করেছে। হাসিনা ওয়াজেদের সঙ্গে চুক্তি করেছে তাকে যোগাযোগ মন্ত্রণালয় দিতে হবে—সেখানে যমুনা সেতুর মতো কামধেনু রয়েছে। মিজান সাহেবকে বলতে হবে তাকে রাষ্ট্রপতি করা হবে। বাস্তবে তা করার প্রয়োজন পড়বে না—'কাহা'কে নগদ বিদায় দিলেই সে সন্তুষ্ট হবে।

কী আমার্জনীয় ধৃষ্টতা। কি অপরিসীম ধোঁকাবাজি। নেতাকে জেলখানায় রেখে, তার মতামতের তোয়াক্কা না করে, অন্য নেতৃবৃন্দকে অন্ধকারে রেখে, দলের কোন পর্যায়ে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করে কেবল ব্যক্তিস্বার্থে এই দু'জন সেদিন জাতীয় পার্টিকে আওয়ামী লীগের বশংবদ করে দিয়ে এদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক চরমতম বিশ্বাসঘাতকতা ও মোনাফেকীর দৃষ্টান্ত স্থাপন করল। দলীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে এ ধরনের অবিমৃশ্যতা আর কোনদিন

কেউ প্রত্যক্ষ করেনি। সরকার গঠিত হল। মঞ্জুও চুক্তিমতো যোগাযোগ মন্ত্রী হিসাবে শপথ নিল। এরশাদ সাহেব জেল থেকে অভিমান করে জানালেন, তাঁকে একবার জিজ্ঞেস করারও কেউ প্রয়োজন মনে করল না!

শপথ নিয়ে মঞ্জু আমার বাসায় আসতে তাঁকে বলেছিলাম, জাতীয় পার্টির মহাসচিব যে কোন সময় আমার বাড়িতে আসতে পারে, কিন্তু আওয়ামী লীগ সরকারের একজন মন্ত্রী স্বাগত নয়।

সে বলল, আমি ঐকমত্যের সরকারের মন্ত্রী।

বললাম, এই অভিনব কথাটি পেলে কোথায়? তুমি যে দলের মহাসচিব সে দল কী তোমাকে মন্ত্রিত্ব গ্রহণে অনুমতি দিয়েছে? দলের সম্মতি ব্যতিরেকে তুমি যে কাজ করেছ তাতে জাতীয় পার্টি যদি সত্যিকারের রাজনৈতিক দল হয় তবে তোমার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া বাঞ্ছনীয়।

সে মুখ কালো করে উঠে গেল। উপস্থিত সকলে বলল, ব্যক্তিগত এত সুসম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও মঞ্জুকে আপনি এত কড়া কথা বললেন!

বললাম, মঞ্জুর মরহুম পিতা মানিক মিয়া বলতেন, ব্যক্তির চাইতে দল বড়, দলের চাইতে দেশ।

প্রয়াত পিতার আদর্শ বেমালুম বিস্মৃত হয়ে পুত্র দল এবং দেশ উভয়ের সঙ্গেই ছেলেখেলা খেলছে। মিজান সাহেবকে যখন গিয়ে পাকড়াও করলাম তখন সে দিশেহারা। বলে, 'আমারে এইতান জিগাইও না, মঞ্জুরে জিগাও।'

আমাদের অঞ্চলে 'উরাত' দেখিয়ে কার্যোদ্ধারের একটা আদি রসাত্মক কথা প্রচলিত রয়েছে। ভারপ্রাপ্তের কপালেও ভাতিজী আর ভাতিজার কল্যাণে অনেকটা সেরকম ঘটল। বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমেদকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করা হতেই সে মুহূর্তের মধ্যে ভোল পাল্টিয়ে আওয়ামী লীগ, হাসিনা এবং মঞ্জুকে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগাল বর্ষণ করতে শুরু করল। আমার অনমনীয় মনোভাবের বিষয় সে ভালোই জ্ঞাত ছিল। তাই আমার বাসায় এসে একান্ত অনুরোধ করল যেভাবেই হোক মঞ্জুকে মন্ত্রিসভা থেকে ছাড়িয়ে আনতে হবে, অন্যথায় তাকে দল থেকে বহিষ্কার করতে হবে।

বললাম, 'ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন।'

সে আমাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাল, ভুল করে ফেলেছি, এখন মঞ্জুর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নাও।

দলীয় সভায় আমি পরিষ্কার মত দিলাম, আওয়ামী লীগের সঙ্গে যদি জাতীয় পার্টি কোয়ালিশন গঠন করে, তার খানিকটা যৌক্তিকতা দাঁড়াতে পারে। সেক্ষেত্রে জাতীয় পার্টি সরকারের সর্বনিম্ন পর্যায় থেকে সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশের ভাগ পাবে। দলের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে কেবল মহাসচিব একাকী মন্ত্রিত্ব করবে, এটা অকল্পনীয়।

টালবাহানা চলতে লাগল। সময় ক্ষেপণের নানা বাহানা সৃষ্টি, জামিনের লোভ দেখিয়ে এরশাদ সাহেবকে নমনীয় করার প্রচেষ্টা, বিভিন্ন কূট-কৌশলের মাধ্যমে মহাসচিব সময় কিনতে লাগল এবং এক পর্যায়ে তার 'কাহা'কেও ম্যানেজ করে ফেলল।

রাষ্ট্রপতি হওয়ার স্বপ্ন বিসর্জন দিয়ে চানপুরের মানুষটি আর এক দফা ভোল পাল্টিয়ে 'মঞ্জু মন্ত্রী থাকলে ক্ষতি কি'—এই অমীয় বাণী প্রচারে ব্রতী হল।

জাতীয় পার্টির অবস্থা 'না ঘরকা না ঘাটকা।' আমরা বলি, আমরা বিরোধী দল। কিন্তু আমাদের মহাসচিব ক্যাবিনেটের সদস্য। আহা, বেশ বেশ!

সমস্ত দেশ মুখ টিপে হাসছে। এক ব্যক্তির একান্ত স্বার্থের কড়িকাঠে সমস্ত দলটিকে ফাঁসে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। মানুষের কাছে মুখ দেখাতে পারি না। আজীবন রাজনীতি করে এসে এখন এই বালখিল্য আচরণে মানুষ আমাদেরকে করুণার দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করেছে। আমাদের আচরণ এতই অসামঞ্জস্যপূর্ণ যে, মানুষ বিদ্রূপাত্মক দৃষ্টিতে আমাদেরকে বিশ্লেষণ করে।

কারাভ্যন্তর থেকে এরশাদ সাহেবও স্পষ্ট সিদ্ধান্ত দিচ্ছেন না। তার গরজ বড় বালাই। মঞ্জু তাঁর জামিনের ব্যবস্থাপনায় যদি সরকারি মনোভাব খানিকটা নমনীয় করতে পারে। সে খবর পাঠাচ্ছে অচিরেই মুক্তি পেয়ে সে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে।

মানসিক এই বৈকল্যের মাঝে ভাতিজী শিউলির জামাই উজ্জল আমাকে জোর করে বার্মা ও থাইল্যান্ড ভ্রমণে নিয়ে গেল। ব্যবসা উপলক্ষে তার সেখানে কাজ পড়েছে। তার বক্তব্য, কাকা, ক'দিন বাহির থেকে ঘুরে এলে মন ভালো হবে।

সেখান থেকে ফিরে এসে আমাকে জাপান যেতে হল। সেখানকার জাতীয় পার্টিকে কথা দিয়েছিলাম তাদের সম্মেলনে যোগদান করব। খবর পেয়ে রানা আবদার করল, আব্বা, তুমি প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দিলেই আমেরিকায় আমার কাছে পৌঁছে যাবে। তুমি আমাকে দেখা না দিয়ে যেতে পারবে না।

সাব্যস্ত করলাম জাপান ভ্রমণ শেষে লসএঞ্জেলেস হয়ে রানার ওখানে যাব।

টোকিওতে আমার প্রথম ভ্রমণ প্রায় দুই যুগ পূর্বে। এরপরও কয়েকবার আসতে হয়েছে। জাপানিদের গ্রামাঞ্চলে যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল। কিন্তু এবার

গিয়ে তাদের আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা, বৈদ্যুতিক ও কম্পিউটার ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক উন্নয়ন দেখে বিস্মিত হতে হয়। স্বভাব উদ্ভাবক জাপানিরা সর্বক্ষেত্রে আধুনিকতার নবতম সূত্রটি আবিষ্কার করে সমাজের সর্বক্ষেত্রে পরিবেশ বদলে দিয়েছে। পূর্বের দেখা জাপানের সঙ্গে আজকের জাপানের প্রভূত তারতম্য। তাদের অর্থনীতি কেবল অত্যন্ত চাঙ্গাই নয়, পৃথিবীর অন্যতম ব্যয়বহুল শহর রাজধানী টোকিও। তার পরিধিও প্রতিদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

জাপান জাতীয় পার্টি আমাকে, শাহ্ আবু জাফর ও কণ্ঠশিল্পী ফেরদৌস ওয়াহিদকে কয়েকদিন একটি ব্যয়বহুল হোটেলে রাখল। আমি তাদেরকে বললাম, এত খরচান্ত করে আমাদের হোটেলে রাখার প্রয়োজন দেখছি না।

সম্মেলন শেষ হলে আমি জাপান কমিটির সভাপতির বাসায় উঠে গেলাম। শাহ্ জাফর ও ফেরদৌস এক কর্মীর বাসায় স্থান পেল। আমাদের সভাপতি শামিম আহমেদ বাংলাদেশী হলেও তার স্ত্রী জাপানি মেয়ে। অত্যন্ত অমায়িক এই জাপানি তরুণী ছিল তার জাপান ভাষার শিক্ষিকা। তরুণ ছাত্র ও তরুণী শিক্ষিকার প্রেম অচিরেই পরিণয়ে রূপ লাভ করল। এখন তাদের একটি কন্যা সন্তানসহ নিবিড় ভালোবাসায় গড়ে উঠেছে ছোট্ট সংসার। কাষ্ঠনির্মিত তাদের জাপানি বাড়ির বেডরুম আমাকে ছেড়ে দিয়ে তারা বসবার ঘরে শোবার আয়োজন করল। আমার আপত্তি শুনল না। চার দিন এই পরিবারের আন্তরিক আতিথেয়তা এবং জাপান-বঙ্গ যৌথ মেনু উপভোগ করে আনন্দে কাটালাম।

টোকিও থেকে বিমান ধরে লসএঞ্জেলেস পৌঁছতেই এয়ারপোর্টে মীরা এবং ওর বর মন্টুকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। সংবাদ পেয়ে ওরা আমাকে নিতে এসেছে। হলিউডে ওদের বাসার অদূরবর্তী একটি হোটেলে গিয়ে উঠলাম। মীরা বলল, আপনার জন্য রান্না করে রেখেছি। আমার ওখান থেকে খেয়ে এসে বিশ্রাম নিন।

ওর ওখানে যেতেই আমাকে আটকে দিল। মীরা বলল, একা একা হোটেলে কী করে সময় কাটাবেন? মন্টুকে পাঠিয়ে দিলাম আপনার বাক্স-পেটরা নিয়ে আসার জন্য।

ওদের একান্ত আগ্রহে সেখানেই দু'দিন অবস্থান করতে হল। ওদের বাসাটি ছিমছাম, মীরা তাকে সযত্নে গুছিয়ে রেখেছে।

খবর পেয়ে এহিয়া এসে উপস্থিত। এক বিচিত্র উপাখ্যান এই তরুণ কর্মীটির জীবন। খুলনার ছেলে, যুবক অবস্থায়ই আমেরিকায় পাড়ি জমায়। জীবনে করেনি হেন কাজ নেই। দীর্ঘদিন ট্যাক্সি চালিয়েছে লসএঞ্জেলেসের পথে-ঘাটে। পরে বিমান চালানো শিখে নেয়। প্রথমবার যখন জাতীয় পার্টি গঠন করি এই এহিয়ার উদ্যোগেই লসএঞ্জেলেসে সম্মেলন হয়েছিল। তাকে যুক্তরাষ্ট্র শাখার সহ-সভাপতি নির্বাচিত করা হয়েছিল। যেমন বিনয়ী, সদা

হাস্যময় ঠিক তেমনি তার কর্মস্পৃহা এবং অধ্যবসায়। অচিরেই ঐশ্বর্যের চাবিকাঠি তার হাতে ধরা দেয়। তার ব্যবসা আইনত কোন ত্রুটিযুক্ত না হলেও সূক্ষ্ম মানবিক বিচারে কোথায় যেন ফাঁক ধরা পড়ে। সারা উত্তর আমেরিকা জুড়ে তার কর্মকাণ্ড। বৃহৎ শহরসমূহে তার কার্যালয়ের শাখা বিস্তৃত। যানবাহন দুর্ঘটনার দেশ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র। এহিয়ার কোম্পানি এই সমস্ত দুর্ঘটনা কবলিত মানুষের পাশে দাঁড়ায়, তাদের চিকিৎসা করে সুস্থ করে তোলে এবং তাদের হয়ে 'কমপেনসেশন কেস' লড়ে চিকিৎসক, আইনজীবী এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক খাতে সমস্ত খরচাদি বহন করার পর কোর্টের আদেশে যখন বড় অঙ্কের ক্ষতিপূরণ লাভ করে তখন তার বিরাট অংশ কোম্পানি পেয়ে থাকে। অনেকে বলে এর মধ্যে দু'নম্বরী বিষয় আছে। দুর্ঘটনা সংঘটিত করার ক্ষেত্রেও নাকি এদের অদৃশ্য হস্ত সক্রিয়। আমার অবশ্য তা মনে হয়নি। জিজ্ঞাসাও করিনি।

'৯২ সালে যখন এখানে এসেছিলাম, এহিয়া আমাকে লসএঞ্জেলেসের শহরতলীর বাড়িতে নিয়ে ওঠায়। ছোটখাটো স্ত্রী পুষ্পা এবং একটি শিশু কন্যা সন্তান নিয়ে তার বিলাসবহুল নিজস্ব বাড়ি শহরতলীর একটি পাহাড়ের উপর অবস্থিত। চলচ্চিত্রের তারকাদের যেমন ঐশ্বর্যমণ্ডিত কল্পলোকের বাসভবন থাকে, এহিয়ার দ্বিতল বাসাটিও তেমনি একটি। আধুনিক রুচির সঙ্গে মিলে ছিল নিখুঁত সাংস্কৃতিক সৌন্দর্যবোধের শৈল্পিক যোজনা। লন, বাগান, সুইমিং পুল প্রভৃতি মিলিয়ে সে এক স্বাপ্নিক আবাস। সেবার চার দিন ওদের পরম নিবেদিত আদর-যত্নে সে বাসায় কাটিয়ে গিয়েছি।

এহিয়ার নিজস্ব প্লেন রয়েছে। রয়েছে সমুদ্র ভ্রমণের প্রমোদতরী। প্রমোদতরীতে করে আমাকে নিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরের বিলাসী স্বাস্থ্যনিবাস ক্যাটালিনা দ্বীপে ঘুরিয়ে এনেছে। তার আশা, একদিন সে নিজস্ব বোয়িং চালিয়ে ঢাকা আসবে এবং সে প্লেনের সম্মানিত অতিথি-যাত্রী হব আমি।

সে যে কত টাকার মালিক তা অনুমান করা দুঃসাধ্য। তার অফিসে কয়েকদিন গিয়ে দেখতে পেলাম পাঁচ-ছ'টি ফোন এবং দু'জন আমেরিকান মহিলা সেক্রেটারি নিয়ে সে তার সুসজ্জিত চেম্বারে সর্বক্ষণ দূরপাল্লার আলাপচারিতায় নিমগ্ন। তার সেক্রেটারিরা আমাকে মাঝে মাঝে কফি দিচ্ছে, কিন্তু এহিয়ার কোন দিকে খেয়াল নেই। একমনে কাজ করে যাচ্ছে। যখন তাকে লাঞ্চের কথা বললাম, সে লজ্জা পেয়ে আমাকে নিয়ে তাড়াতাড়ি ছুটল লসএঞ্জেলেসের এক অত্যাধুনিক রেস্তোরাঁয়।

বলল, ভাইয়া, আপনার কল্যাণে আজ লাঞ্চ খাব। কতদিন যে দুপুরের খাবারের সময় হয় না!

ওর সেক্রেটারিরা আমাকে জানাল, দ্বিপ্রহরের খাবার দূরের কথা; সে কফির কাপ পর্যন্ত স্পর্শ করে না। এমন কাজ পাগল মানুষ কমই দেখা যায়।

এক যুবতী সেক্রেটারিকে দেখলাম দুই পুত্র সন্তানসহ এসেছে। এহিয়ার নিকট থেকে খানিকটা ছুটি নিয়ে বাচ্চাদের ডাক্তারের নিকট নিয়ে যাবে। তাদের পিতার খোঁজখবর নিতে গিয়েই হতভম্ব হয়ে গেলাম। বেশ আনন্দ ও গর্বের সঙ্গেই উত্তর দিল, ওদের তো বাবা নেই। আমি বিয়ে করিনি।

তরুণী কুমারী মাতার কোন সংস্কার বা লজ্জাবোধের চিহ্ন পর্যন্ত নেই। সে স্বাভাবিক আনন্দেই আছে মনে হল। ছেলে দুটিকে নিজেই মানুষ করছে।

এহিয়াকে দেবতা জ্ঞানে ভক্তি-শ্রদ্ধা করে। তাকে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করতেই সে বলল, ভাইয়া, এসব ওর ব্যক্তিগত বিষয়। এই সমাজে একে অন্যের ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে মাথা ঘামায় না।

আমি যাব নিউইয়র্ক, এহিয়া যাবে ওয়াশিংটন। এয়ারপোর্টে একসঙ্গেই সেবার এলাম। আমার বাক্স-পেটরা সে নিজেই বহন করছে। তার তিন জন মার্কিন কর্মচারী এসেছে প্লেনে তুলে দিতে। তারা এগিয়ে আসতেই এহিয়া বলল, আমি যেমন তোমাদের বস্, ভাইয়া তেমনি আমার বস্। তোমরা আমার ব্যাগ-স্যুটকেস নিতে পার, কিন্তু ভাইয়ারটা বহন করার দায়িত্ব আমার।

এ হল এহিয়া। এ ধরনের আর একজন আমি আজও পাইনি। দু'বছর পূর্বে যখন এসেছিলাম তখন দুর্ভাগ্যবশত এহিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের কোপানলে পড়ে বেশ কয়েকজন কর্মকর্তাসহ আমেরিকান কারাগারে। তার ব্যবসা সংক্রান্ত কী সব অবৈধ জটিলতা ধরা পড়েছে। কয়েকটি মামলায় তার জেল হয়ে যায়। তার বাড়ি, গাড়ি, প্লেন, প্রমোদতরী সমেত যাবতীয় সম্পত্তি সরকার বাজেয়াপ্ত করে। কয়েকজন বাংলাদেশী ও আমেরিকান কর্মচারী সেই সুযোগে তার নগদ অর্থও হাতিয়ে নেয়।

জেল থেকে মাত্র ক' সপ্তাহ পূর্বে সে প্যারোলে মুক্তি পেয়েছে। সে দেশের বিধি অনুসারে ভালোভাবে চললে আর তাকে জেলে যেতে হবে না। অর্থনৈতিক এত বড় বিপর্যয় গিয়েছে, শুনেছি তার স্ত্রীও কন্যাটিকে নিয়ে পিত্রালয়ে চলে গিয়েছে। কিন্তু এহিয়ার মুখের অমলিন হাসিটি আগের মতোই অক্ষুণ্ন রয়েছে। এতটুকু পরিবর্তন তার মধ্যে পরিলক্ষিত হল না।

বলল ভাইয়া, আপনি আমার জন্য দোয়া করবেন। যেদিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম পদার্পণ করেছিলাম সেদিন ছিলাম কপর্দকশূন্য। আবার শূন্য হাতে শুরু করব। আল্লাহ্ চাহে তো গুছিয়ে নেব। জীবনে টাকা এত দেখেছি যে, তার জন্য আর কোন লোভ নেই।

তার আত্মবিশ্বাস দেখে মুগ্ধ হলাম। কণামাত্র হা-হুতাশ তার মধ্যে নেই। এরই মধ্যে একটা বড় কথা সে বলে ফেলল। বলল, ভাইয়া ন্যাংটো জন্মেছি, কাফন পরে বিদায় নেব। মাঝে কি হল অথবা কি হল না, সেটাকে খুব বড় করে দেখার প্রয়োজন মনে করি না।

ওর কথায় ভীষণ আনন্দ লাভ করলাম। মীরা, মন্টুসহ আমাকে নৈশভোজে নিয়ে গেল হলিউডের সিনেমা পাড়ার এক অভিজাত রেস্তোরাঁয়। ডিনারের পর আমরা হলিউডের বিখ্যাত একটি প্রেক্ষাগৃহে একটি নবতম চলচ্চিত্র উপভোগ করলাম। মীরা তো এহিয়ার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। ঠাট্টা করে মন্টুকে বললাম, এহিয়ার বউ চলে গিয়েছে। মন্টু, তুমি তোমার বউকে সামলে রেখো।

সকলের অট্টহাস্যে হলিউডের নৈশকালীন নীরবতা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল।

মীরা কিশোরী অবস্থা থেকে আমার একজন আস্থাভাজন কর্মী। ভালোবেসে বিয়ে করেছে মন্টুকে। সেও আমার কর্মীতে রূপান্তরিত হয়েছে। ওদের অঞ্চলে যতবার গিয়েছি, দলবল নিয়ে মীরাদের বাড়িতে গিয়ে উঠেছি। সেই থেকে মীরার সঙ্গে আমাদের পারিবারিক নিবিড় সম্পর্ক। সে জানে রানা ভুনা খিচুড়ি ও চিংড়ি মাছ পছন্দ করে। আমার উইচিতা যাওয়ার দিন সে তিনটি খাবার রাখার কনটেইনার ভর্তি করে খিচুড়ি, গলদা চিংড়ির দোপিঁয়াজা এবং ইলিশ মাছ ভাজা রানার জন্য দিয়ে দিল।

রানা ও তার বন্ধু ইভানজেলিস আমাকে নিতে এয়ারপোর্টে এসেছিল। দেবদূতের মতো চেহারা বলে তাকে আমি এঞ্জেলো বলে ডাকি। ওদের বললাম, মীরা লস এঞ্জেলেস থেকে রান্না করে অনেক খাবার দিয়ে দিয়েছে। বন্ধুদের ডেকে সেগুলোর সদগতি করো।

তারা কয়েকজন বন্ধুকে ডেকে এনে সেসব বাংলাদেশী খাবার খুব তৃপ্তি করে খেল। মীরা ফুপিকে রানা টেলিফোনে ধন্যবাদ জানাতে সে অধিকতর আনন্দ লাভ করল।

এক সপ্তাহ রানার সঙ্গে কাটিয়ে নিউইয়র্কে এলাম। রানার মামা জামালের বাসায় দুটি কন্যা সন্তানের আগমন হয়েছে। একটি তার এবং অন্যটি তার বোন শেলীর। জামালের এটি প্রথম সন্তান, কিন্তু শেলীর এটি তৃতীয়। উভয় নবজাতককেই তখন হাসপাতাল থেকে বাসায় নিয়ে আসা হয়েছে। আমার কাছে লোকজন বেশি যাতায়াত করে বিধায় এবার আমি সে বাসায় থাকতে অসম্মতি জানালাম। যুক্তরাষ্ট্র শাখার সভাপতি আব্বাস উদ্দীন দুলাল সুযোগ বুঝে আমাকে তার নিজস্ব বাড়িতে নিয়ে গেল। তার ল্যাটিন-আমেরিকান স্ত্রী এবং কন্যা তখন তার শ্বশুরালয়ে। বাসা একেবারে নিরিবিলি। লিয়াকত, চান্দু সকলে মিলে আমাকে সেখানেই স্থিতি করে এল। দুলালের টিভি ভালো ছবি দিচ্ছে না বলে চান্দু গিয়ে তক্ষুনি একটি বৃহৎ টিভি সেট ক্রয় করে নিয়ে এল। সে বলল, মামা, টিভি ছাড়া টিকতে পারবে না।

কথাটি ঠিক। আমেরিকায় মানুষ খাবার ছাড়া হয়ত কিছু সময় চলতে পারে, কিন্তু টিভি ব্যতীত এক মুহূর্তও চলে না। প্রায় শতাধিক চ্যানেল বিশিষ্ট

তাদের টেলিভিশন রাত-দিন নিত্য নতুন আনন্দানুষ্ঠানে প্রাণময়। আমেরিকায় বলা হয়, বর্তমানে সে দেশে টিভি সভ্যতা চালু রয়েছে।

শীঘ্রই দেশে ফিরব। এর মধ্যে একদিন সংবাদ পেলাম দেশে আওয়ামী লীগ সরকার দুই যুগের ব্যবধানে বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলা শুরু করতে যাচ্ছে এবং সে সময়ের তথ্য প্রতিমন্ত্রী তাহেরউদ্দীন ঠাকুরকে অন্যান্য কতিপয় অভিযুক্তদের সঙ্গে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। দু'-একটি কাগজে কাঠের টাইপ ব্যবহার করে সঙ্গে এ সংবাদও পরিবেশন করা হয়েছে যে, ওবায়দুর রহমান ও আমার বিরুদ্ধেও এই মামলায় গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গেই দেশে টেলিফোন করে এ সম্বন্ধে কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য পেলাম না। সকলেই সংবাদটিতে অতীব উৎকণ্ঠায় পড়ে গেছে, কিন্তু কোন সঠিক সংবাদ তারা দিতে ব্যর্থ হল।

সালেহা একান্ত অনুরোধ জানাল কোন অবস্থাতেই যেন বর্তমান ঘোলাটে পরিস্থিতিতে দেশে প্রত্যাবর্তন না করি। তার সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করায় কিছুক্ষণের মধ্যে বড় দার টেলিফোন চলে এল। সকলেই জানে বড় দার আদেশ-নির্দেশ আমার জন্য শেষ কথা। কোনদিন তার কথার অবাধ্য হইনি। তিনি কোন যুক্তি না শুনে প্রথমেই আদেশ করলেন, আমি আসার অনুমতি না দেওয়া পর্যন্ত তুমি দেশে প্রত্যাবর্তন করবে না।

নিশ্চুপে তার আদেশ শিরোধার্য করে নিলাম।

আমি নিউইয়র্ক থেকে ঢাকায় বিভিন্ন স্থানে টেলিফোন করে বুঝলাম আমাদের দেশে যেভাবে তিলকে তাল করার প্রবণতা রয়েছে এবং যেভাবে কাল্পনিক বানোয়াট সংবাদ পরিবেশনে এক শ্রেণীর নব্য সাংবাদিকের জুড়ি নেই, সেক্ষেত্রে এ ধরনের উদ্ভট সংবাদ ছেপেও দিতে পারে। তাছাড়া হাসিনা ওয়াজেদ এখন প্রধানমন্ত্রী। তার ব্যক্তিগত ক্রোধ ও প্রতিহিংসা রয়েছে আমাদের উপর। আমরা কেন তাকে নেত্রী মেনে তার মরহুম পিতা কর্তৃক সমাহিত আওয়ামী লীগের রাজনীতি করি না। ব্যক্তিগতভাবেও রয়েছে আমার উপর ভীষণ রাগ। কাজেই হিতাহিত বিবেচনায় পরাঙ্মুখ এই মহিলার দ্বারা কিছুই অসম্ভব নয়। আনোয়ার, সমিজ, ধীরণ, দুলাল সর্বক্ষণ খবরাখবর দিচ্ছে। তারা বলল, সংবাদ সঠিক নয়। 'দৈনিক ইনকিলাব' থেকে পুলিশকে আমাদের দু'জনের গ্রেপ্তারি পরোয়ানার কথা জিজ্ঞেস করলে পুলিশ তা অস্বীকার করে।

নিউইয়র্কের গোটাকয়েক বাংলা পত্রিকায় ঢাকার সংবাদপত্রসমূহের খবরাদি হুবহু পুনর্মুদ্রণ করা হয়। ফলে নিউইয়র্কের বাংলা ভাষাভাষী সমাজে নানাবিধ গুঞ্জন চলতে থাকে। কেউ কেউ এমন মন্তব্যও করতে দ্বিধা করে না যে, গ্রেপ্তার এড়াতেই আমি আমেরিকায় আত্মগোপন করে আছি। এক সভায়

ওবায়দুর রহমানের বক্তৃতা কাগজে পরিবেশিত হওয়ায় অনেকের মধ্যে দ্বিধা-দ্বন্দ্বেরও সৃষ্টি হয়।

লিয়াকত, দুলাল এবং অন্যান্য কর্মীরা পরামর্শ দিল একটি সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে বক্তব্য স্থানীয় পত্রিকাসমূহে যাওয়া প্রয়োজন।

তা-ই করা হল। বললাম, বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের পরে কি পরিবেশে আওয়ামী লীগের মন্ত্রী পরিষদ গঠিত হয় এবং চিফ হুইপ থেকে পদাবনতি করে আমাকে একজন প্রতিমন্ত্রী করা হলেও সেই ভয়াবহ মুহূর্তে কিছুই করার ছিল না। বঙ্গবন্ধু নিহত হলেও দেশ ও জাতির স্বার্থে তখনও সরকার পরিচালনার প্রয়োজনীয়তা এবং পরবর্তীতে কেন আওয়ামী লীগের রাজনীতি থেকে সরে এসেছিলাম সবিস্তারে বর্ণনা করে একথাই সাংবাদিকদের জানালাম, বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের খবর ঘুণাক্ষরেও যদি পূর্বাহ্ণে জানতে পারতাম তা হলে দেশের ইতিহাস অন্য খাতে প্রবাহিত হত।

তারা আমাকে প্রশ্ন করল, আমরা আপনার প্রতিটি কথা বিশ্বাস করি। কেননা, বঙ্গবন্ধুর খুনীরা নিজেরাই সব কথা স্বীকার করেছে এবং কারা এর সঙ্গে জড়িত ছিল সবিস্তারে প্রকাশ করেছে। তবুও জিজ্ঞাস্য, দেশে প্রত্যাবর্তন করছেন না কেন?

বললাম, প্রত্যাবর্তন করব না একথা কবে বলেছি? এখানে বেড়াতে এসেছি। সময়মতো ঠিকই ফিরে যাব।

তাদেরকে আরও খুলে বললাম, আমার পিতৃতুল্য অগ্রজের নিষেধের কারণেই এখনও এখানে বসে আছি। তবে শীঘ্রই তিনি তাঁর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেবেন।

সাংবাদিকগণ নিউইয়র্কের কাগজে আমার বক্তব্য পরিবেশন করতে আবহাওয়া কিছুটা লঘু হলেও স্থানীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে পরামর্শ করে একটি সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা গেল। সেখানেও দলের সাংগঠনিক বিষয়াদি ব্যতীত বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড বিষয়ক বিভ্রান্তি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট বক্তব্য রাখলাম।

মন বিষণ্ন ছিল। ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কয়েকদিনের জন্য রানার ওখানে চলে এলাম। রানা বাসা পরিবর্তন করেছে। এবার শহরের এক অভিজাত এলাকায় একটি দ্বিতলের তিন রুমের এপার্টমেন্ট ভাড়া করেছে তার মার্কিন বন্ধু অ্যাডওয়ার্ডের সঙ্গে যৌথভাবে।

আমার ফেরত টিকেট ছিল লস এঞ্জেলেস ও টোকিও হয়ে, সে টিকেট নিয়ে একদিন দেশে ফেরার তারিখ ঠিক করে এলাম। বাসায় এসে বড় দার নিষেধ মনে পড়ায় সেটি নাকচ করতে হল। সেখানে কয়েকদিন অবস্থানের পর নিউইয়র্কে চলে এলাম। বড় দাকে টেলিফোনে বললাম, যা হবার হবে। আপনার নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে নিন।

তিনি দীর্ঘক্ষণ চিন্তা করে দ্বিধান্বিত কণ্ঠে অনুমতি দিলেন। বললেন, ঠিক

আছে, চলে আস। আল্লাহ্‌র যা ইচ্ছা সেটাই ঘটবে। নির্দোষীকে আল্লাহ্‌ই দেখবেন।

নিউইয়র্কে নতুন টিকেট করে আমার বন্ধুদের থেকে বিদায় নিয়ে লণ্ডন হয়ে ঢাকা ফিরে এলাম।

এয়ারপোর্টে সালেহা ও দিনা এসেছে। কর্মীরা এসেছে অনেকে। তাদের মনে মনে ভয়, যদি বিমান বন্দর থেকেই পুলিশী কর্মকাণ্ড শুরু হয়ে যায়।

আমি সবাইকে আশ্বস্ত করলাম, বিনা দুধে কেউ দই বানাতে পারে? তোমরা অহেতুক দুশ্চিন্তা করছ। আমাকে জড়াবার প্রশ্নই আসে না।

১লা জানুয়ারি, '৯৭ সাল। জাতীয় পার্টির প্রতিষ্ঠা দিবস। সকালে সিআইডি অফিসে গিয়ে তদন্তকারী কর্মকর্তা আবুল কাহার ও এসপি আবদুল হান্নানের মুখোমুখি হলাম। তারা আমার স্বেচ্ছায় দেশে প্রত্যাবর্তন ও তাদের অফিসে উপস্থিত হওয়ায় অবাক হয়ে গিয়েছে। আমি উপস্থিত থাকতে থাকতেই বার কয়েক প্রধানমন্ত্রীর টেলিফোন এল বলে মনে হল। কাহারের সন্ত্রস্ত ম্যাডাম, ম্যাডাম শুনেই বুঝেছিলাম প্রধানমন্ত্রীই হবে। তার একান্ত আগ্রহ ছিল আমাকে কোনওভাবে জড়ানো যায় কিনা। কিন্তু কাহারের মতো ব্যক্তিকেও বলতে হল, না ম্যাডাম, এখনও কিছু পাইনি, চেষ্টার ক্রটি করছি না।

অনেক চেষ্টা করেও সেবার বিনা দুধে দই বানাতে না পারলেও এবার কেবল পানি দিয়ে দই, ঘি, মাখন সবই বানিয়ে ছেড়েছে কাহার-হান্নানরা।

আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভার যোগাযোগ মন্ত্রী ও জাতীয় পার্টির মহাসচিব আনোয়ার হোসেন মঞ্জুর সঙ্গে সেদিন বিকালে দেখা হতেই সে যে কথাটি বলল তাকেই অশনি সংকেতের আভাস ছিল। সে বলল, দেশে ফিরলেন কেন?

বললাম, কেন ফিরব না? আমি কী কোন অপরাধ করেছি? আমার বিরুদ্ধে কী কোন অভিযোগ রয়েছে যে পালিয়ে বেড়াব?

মঞ্জু ব্যক্তিগতভাবে সর্বদাই আমাকে শ্রদ্ধা করে, ভালোবাসে। সে নীরব হয়ে রইল। তার নীরবতা ছিল অর্থপূর্ণ।

আজ তার সেদিনের জিজ্ঞাসার মর্মার্থ অনুধাবন করতে পারি। কিন্তু সেদিন মুক্ত মন ও উন্মুক্ত বিবেক নিয়ে কোন সন্দেহ বা দ্বিধা হৃদয়ে স্থান পায়নি।

কাজী জাফর আমাকে জিজ্ঞেস করল, আপনি হাইকোর্টে আগাম জামিনের কথা ভাবছেন?

উত্তর দিলাম, কেন ভাবব? আমাকে এ ধরনের মামলায় জড়াবার প্রশ্ন একমাত্র উন্মাদ ছাড়া আর কারো মাথায় আসতে পারে না!

এর মধ্যে ব্যারিস্টার মওদুদ জাতীয় পার্টি ত্যাগ করে বিএনপি'তে যোগ দিয়েছে। এরশাদ সাহেবের মন্ত্রিসভার অনেক ডাকসাইটে সদস্যই দল পরিত্যাগ করে হয় বিএনপি নয় আওয়ামী লীগে যোগ দিয়েছে। একই ব্যক্তি যতদিন জাতীয় পার্টিতে থাকবে ততদিন সে খুব মন্দ। সে স্বৈরাচার। তার সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক পর্যন্ত বজায় রাখা অশোভনীয়। সেই লোকটিই একগুচ্ছ ফুল নিয়ে দুই নেত্রীর যে কেউকে দেহী পদ বল্লভম করে আসলেই সে হয়ে গেল দলের শোভা, তার চরিত্র রূপান্তরিত হল দেব পর্যায়ে। তার আর কোন দোষ রইল না। আর যদি সে মুক্ত হস্তে কড়ি বিতরণে সিদ্ধহস্ত হয়ে থাকে, তা হলে তো কথাই নেই। তাকে নিয়ে ধেই ধেই নৃত্য শুরু হয়ে যাবে গণতান্ত্রিক সংগ্রামী দলদ্বয়ের রাজনীতির মধ্যে। কাল যে ছিল সর্বদোষে দোষান্বিত, আজ সে হয়ে গেল সর্বগুণে গুণান্বিত। দলবদলের এক অপার মহিমা! যে দলে ছিল সেটা নিকৃষ্ট, না কি সমস্ত নিকৃষ্ট ঝোল যে দল কোলে টেনে নিল সে নিকৃষ্ট, সেটাই বিবেচ্য। এই যখন যেমন তখন তেমন করার সুযোগ অত্যন্ত অবাঞ্ছিত। এরই কারণে অনেক রাজনৈতিক স্থিতিহীনতার জন্ম।

মওদুদের বিষয়টি বোধগম্য। সে দুই আসনে দাঁড়ায় '৯১-এর সংসদ নির্বাচনে। তারই একসময়ের কর্মী বিএনপি'র প্রার্থীর নিকট এক আসন হারিয়ে অন্যটিতে জয়লাভ করেছিল। এবার দুটোতেই বিমুখ হয়েছে। তার একান্ত সাধ এবং প্রত্যাশা ছিল এরশাদ সাহেবের ছেড়ে দেওয়া চারটি আসনের একটিতে সে উপ-নির্বাচন করবে। মিজান সাহেব তো এ ভরসাতে সাধারণ নির্বাচনে মনোনয়নপত্রই দাখিল করেনি। নিজ আসনে পরাজিত কাজী জাফরের সেই একই অভিলাষ ছিল। আমার সবচাইতে অধিকতর সুযোগ থাকা সত্ত্বেও এবং এলাকার সম্মিলিত অনুরোধ থাকা সত্ত্বেও কথার অমর্যাদা করে দ্বিতীয়বার সেখানে উপ-নির্বাচনে যাব না—এটাই ছিল অপরিবর্তনীয় সিদ্ধান্ত।

কিন্তু মহাসচিব চিন্তা করল, যাদের দেখে তার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে হয়, যারা পার্টি প্রটোকলে তার কেবল অগ্রবর্তীই নয় সকলেই তার নেতৃস্থানীয়ও বটে, তাদেরকে ঠেকাতে হবে। জাতীয় পার্টির জন্য রংপুরের অপেক্ষাকৃত সহজ উপ-নির্বাচনের সুবাদে তাদেরকে সংসদে আসা আটকাতে হবে। তারা যে সর্বদিক দিয়ে সিনিয়র। তাদের বর্তমানে মন্ত্রিসভায় তার একক অবস্থান কেবল অসম্ভবই নয়, অশোভনও বটে। কূট-কৌশলের আর এক পুড়িয়া বাজারে ছেড়ে দিল। যারা স্বআসনে নির্বাচিত হতে পারেনি তাদেরকে উপ-নির্বাচনে মনোনয়ন দেওয়া হবে না।

এরশাদ সাহেব ঢোপটি গলাধকরণ করলেন। তখন মঞ্জুই ধ্যান, মঞ্জুই জ্ঞান, মঞ্জু বিহনে দু'চোখে আঁধার। একটু অভিসন্ধিও প্রকাশিত হয়ে পড়ল, মঞ্জুর সহযোগিতায় চার হেভী ওয়েটকে ধরাশায়ী করে দেওয়া গেল। এক ভ্রাতাকে পূর্বেই সদস্য করে আনা হয়েছে। অন্য এক অরাজনৈতিক সহোদরেরও গতি করা প্রয়োজন। আওয়ামী লীগকে আসন ছেড়ে দিয়ে জামিনের হাওয়া অনুকূল করা যেতে পারে।

বেচারা মিজান সাহেবের জন্য করুণা হয়! তাকে সবচাইতে অসম্মান করা হল। সে এই উপ-নির্বাচনের উপরই ভরসা করে ছিল। এরশাদ সাহেব তাকে কথাও দিয়েছিলেন এবং মনোনয়নপত্রও জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। শেষ মুহূর্তে হেভী ওয়েট হটাও ফর্মূলায় তাকেও বাদ দিলেন। তার উপ-নির্বাচনে অংশগ্রহণের আগ্রহের কথা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। দলের পার্লামেন্টারি বোর্ডে মনোনয়ন চেয়ে দরখাস্তও দাখিল করেছিল। তার আঘাতই ছিল গুরুতর। তবে সে সঙ্গে সঙ্গে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করল না। সময় ও সুযোগের অপেক্ষায় ওৎ পেতে রইল। উপযুক্ত ক্ষণে ইটটির বদলে পাটকেলটি মেরে দেবে।

মওদুদ কোন সুযোগ ছাড়তে রাজি নয়। জাতীয় পার্টি তাকে উপ-নির্বাচনে মনোনয়ন দেবে না, তাতে কি হয়েছে? বিএনপি রয়েছে। এরশাদ সাহেবের দু'নম্বর ব্যক্তি অতি সহজে বিএনপি'তে যোগ দিয়ে মনোনয়ন পেয়ে গেল এবং অতি সহজে পুনরায় পরাজিত হল। আমাদের চার নেতার ক্ষেত্রে ফর্মূলা বহাল রইলেও অপেক্ষাকৃত লাইট ওয়েট ফেনীর জাফর ইমামের ক্ষেত্রে তা বহাল রইল না। সে ফেনীতে একাধিক আসনে পরাজিত হয়েও নোয়াখালীর উপ-নির্বাচনে মনোনয়ন পেল এবং পুনরায় শোচনীয়ভাবে পরাজিত হল। শোনা গেল সে দলের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। পার্টির প্রদত্ত অর্থ গুছিয়ে নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীর নিকট থেকে ভালো অঙ্ক হাতিয়ে নির্বাচন ছেড়ে দিয়ে ঢাকা চলে এসেছে। ফলে তাকে দল থেকে বহিষ্কার করা হল। আমি তখন বিদেশে। থাইল্যান্ডের পাটায়াতে উজ্জলের পরিচিত দু'জন বাংলাদেশী পাইলটের মুখে বিস্তারিত জ্ঞাত হলাম। বছরখানেক পরে জাফর ইমামের বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়।

আমাদের অনুমান সঠিক ছিল। রংপুরে জাতীয় পার্টির দুটি সহজ আসন আওয়ামী লীগ নিয়ে নিল বা তাদেরকে দিয়ে দেওয়া হল। রংপুরে অদৃশ্য কারণ ব্যতিরেকে লাঙ্গলের পরাজয় অভাবনীয়।

এরশাদ সাহেবকে আগাম হিসাবে, সংসদ চত্বরের একটি বাড়িকে সাব-জেল বানিয়ে সংসদের অধিবেশনে যোগদানের ব্যবস্থা করা হল। সকলেই সেখানে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দহরম-মহরম করছে, হাতি-ঘোড়া মারছে। আমার সবকিছুর উপর একটা বিতৃষ্ণা কাজ করছিল। তিনি জেলে যাওয়ার পর থেকে

মানুষের কথা শুনে শুনে যেসব পদক্ষেপ নিয়েছেন সবই ভুল। '৯২ সালে আমাকে মহাসচিব পদ থেকে অপসারণ দিয়ে তাঁর শুরু। তারপর ভুলের পর ভুল। একটি সিদ্ধান্তও সঠিক হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়নি। দল ভেঙে খান খান। অধিকাংশ সাবেক মন্ত্রী এবং সুবিধাভোগীরা আজ আওয়ামী লীগ বা বিএনপি'র সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছে। কিছুটা রাগ, কিছুটা অভিমান বশে আমি এরশাদ সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে যাই না। অনেক খবর পাঠিয়েছেন। শেষে একদিন সকলের সামনে বললেন, আমাকে মোয়াজ্জেমের দেখার ইচ্ছা না হলেও মোয়াজ্জেমকে আমার দেখতে ইচ্ছা করে। আমি তো সংসদের বাইরে যেতে পারি না। সে কী একবার আসবে না!

তখন আর না গিয়ে পারলাম না। ভালো-মন্দ মিশানো মানুষটিকে আমি অনেকটাই ভালোবাসি। দেখা হল, জড়াজড়ি হল, মঞ্জুর ঘরে দু'ঘণ্টায় অনেক অশ্রুবিসর্জনও হল। তিনি বারবার বললেন, আমি ভুল করেছি। আমাকে ক্ষমা করে দিন। দলে আপনার চাইতে বড় সুহৃদ আমার আর নেই।

জিনাত মোশাররফকে ডেকে এনে আমাদের মধ্যে একটা আপস-রফার চেষ্টা করলেন। মহিলা আমার সঙ্গে সহজ হতে পারে না। সে ভালো করেই জানে, আমি তাদের এই সম্পর্কের বিরোধী। সে বলল, আমি তো আপনার কোন ক্ষতি করিনি। আপনি আমাকে সহ্য করতে পারেন না কেন?

বললাম, রাগ করবেন না। আর করলেও কিছু করার নেই। ক্ষতি আপনি অনেকটাই করেছেন এবং সেটা ভালো অবগত আছেন। কিন্তু আমার সে অভিযোগ এখন নেই। সম্পর্ক যদি বৈধ করে নেন—আমার কিছু বলার থাকবে না। দলও মানুষের অযাচিত প্রশ্নের সম্মুখীন হবে না।

মহিলার বয়স হয়েছে। তবুও ভাঙা নৌকায় চুনকামের অভাব নেই। তার মধ্যেই একটু রক্তিম হয়ে উঠল।

স্যার বললেন, মুক্তির পর অচিরেই আমি এ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেব। আজ আপনি পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, আমি অনেক শক্তি পাচ্ছি। আল্লাহ্‌কে অনেক শোকর।

সেদিনের মতো বিদায় নিয়ে চলে এলাম।

প্রায় দেড় ডজন মামলায় এরশাদ সাহেব অভিযুক্ত রয়েছেন। এক-একটি করে জামিন লাভ করে তাঁর মুক্তির পথ সুগম হচ্ছে।

সালেহার সর্বকনিষ্ঠ ভাই স্বপন গ্রামে বিয়ে করছে। ওদের পরিবারে

এটাই শেষ বিবাহানুষ্ঠান। স্বপন এতদিন আমার বাসাতেই থাকত। সকলের অনুরোধে কুষ্টিয়ার ওদের গ্রামের বাড়িতে যেতে হল। '৯৭ সালের ৯ই জানুয়ারি সেখান থেকে ফিরছি। সংসদ ভবনের নিকট পৌঁছতেই অনেক জনসমাগম দেখতে পেয়ে বুঝলাম আজ এরশাদ সাহেব মুক্তি পাচ্ছেন। সরাসরি ওখানে পৌঁছে গেলাম। প্রায় সকলেই উপস্থিত। কর্নেল (অবঃ) মালেকের সদ্য কেনা দামি গাড়িতে অপেক্ষা করছেন বেগম রওশন এরশাদ, মিজান সাহেব, কাজী জাফর এবং মালেক সাহেব। আমি গিয়ে যোগ দিলাম। ঠিক হল এই গাড়িতেই নেতাকে নিয়ে যাওয়া হবে। ড্রাইভারকে সরিয়ে আমিই তার আসন নিলাম। মালেক পেছনের সিটে গেল যাতে এরশাদ সাহেব সামনে বসতে পারেন।

অচিরেই এরশাদ সাহেব বের হয়ে এসে গাড়িতে আমার পাশে আসন গ্রহণ করলেন। অভিনন্দন ও মালার পর্ব চলছিল। সাংবাদিকরা আমাকে প্রশ্ন করল, আপনি কী দলের ড্রাইভিং সিটে বসতে যাচ্ছেন?

বললাম, গাড়ি চালিয়ে নেতাকে তাঁর বাড়িতে পৌঁছে দিচ্ছি।

একটি খোলা ট্রাকে দুই মঞ্জু—আনোয়ার হোসেন ও নাজিউর রহমান চাইছিল এরশাদ সাহেবকে সেটাতে করে নিয়ে যেতে। মাইক নিয়ে নাজিউর রহমান বারবার এরশাদ সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছিল, আমি নাজিউর বলছি, এরশাদ সাহেবকে এই গাড়িতে যেতে হবে। এরশাদ সাহেব সেদিকে কর্ণপাত না করে দলের সিনিয়র নেতৃবৃন্দের সমভিব্যাহারে যাওয়াই পছন্দ করলেন। আমাকে বললেন, মোয়াজ্জেম আস্তে চালাবেন, ভিড়ের কারণে কেউ আপনার গাড়িতে চাপা পড়লে কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে।

বললাম, স্যার, আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় আজ পর্যন্ত কেউ চাপা পড়েনি। আজ আপনার মুক্তির দিনে আমি অধিকতর সাবধানে গাড়ি চালাব। ইনশাআল্লাহ্ কোন দুর্ঘটনা ঘটবে না।

সারা পথেই অজস্র লোক ছিল। তবুও মনে হল কয়েকটা মাইক লাগিয়ে এরশাদ সাহেবের মুক্তির সংবাদ প্রচার করলে ঢাকা শহরে হুলস্থূল কাণ্ড ঘটিয়ে দেওয়া যেত। নেতারা কেন যে তা করল না! মনে হল সরকারি তরফ থেকে 'টোন ডাউন' রাখতে বলা হয়েছে।

গাড়ি চালাতে চালাতে নেতাকে দু'-একটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করলাম। বললাম, দলের বড় নেতাদের বাড়িতে প্রথম সুযোগে নিশ্চয়ই যাবেন। তবে অধ্যাপক দেলোয়ার হোসেন ও আবদুল লতিফ মুন্সীর মতো কর্মীদের ঋণ আপনি শোধ করতে পারবেন না—অবশ্যই ওদেরকে দেখতে যাবেন।

তিনি ভালো করেই জানেন, দেলোয়ারকে পুলিশ কেবল পাঁচ-ছ' বার গ্রেপ্তারই করেনি, ওদের বুটের আঘাতে তার পাঁজর ভেঙেছে। লতিফ মুন্সী

সারা জীবনের জন্য পঙ্গু হয়ে গিয়েছে পুলিশের প্রহারে। ভেবেছিলাম নেতা ওদের সম্বন্ধে জানতে চাইবেন, দু'-একটি সময়োচিত সাধুবাদ দিয়ে ওদের বাসায় যাওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করবেন। তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ বলে উঠলেন, আবুও অনেক কাজ করেছে!

আমি অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইলাম, পরে ইচ্ছাকৃতভাবে জানতে চাইলাম, আবু কে?

যদিও ভালো করেই জানি সে পুরাতন ঢাকার একজন কর্মী এবং জিনাতের ন্যাওটা। দেলোয়ার ও লতিফের প্রসঙ্গে তার নাম টেনে আনার প্রশ্নই আসতে পারে না। এরশাদ সাহেব এমনিতে অত্যন্ত বুদ্ধিমান। তিনি বুঝলেন তাঁর মন্তব্য মাঠে মারা গিয়েছে। আমার মনঃপুত হয়নি। তখন বললেন, হ্যাঁ দেলোয়ার ও লতিফ মুন্সী অনেক নির্যাতিত হয়েছে। ওদেরকে অবশ্যই দেখতে যাব।

আমি আর অন্য কোন প্রসঙ্গ তুলতে ভরসা পেলাম না।

কর্মী ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রগাঢ় আনন্দ ও উচ্ছ্বাসের মধ্যে সমস্ত পথ জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দনের মধ্যদিয়ে এরশাদ সাহেবকে নিয়ে তাঁর গুলশানস্থ বাসভবনে উপস্থিত হলাম। সম্পূর্ণ বাসভবন সয়লাব হয়ে গেল সাংবাদিক, আলোকচিত্র শিল্পী ও উৎসাহী নেতা-কর্মীদের সানন্দ উপস্থিতিতে। এরশাদ সাহেবের অবর্তমানে তাঁর বাড়িটি এতদিন ঘুমিয়ে ছিল, আজ মনে হচ্ছে ঘুম ভেঙে জেগে উঠেছে। বড় হলঘরের মাঝখানে চেয়ারের উপর দাঁড়িয়ে তিনি সাংবাদিকদের উদ্দেশে মুক্তিপরবর্তী কয়েকটি কথা বললেন। ক্ষমতা হস্তান্তরের পর এটাই বোধহয় তাঁর প্রথম প্রকাশ্য বক্তব্য। অনেক ছবি তোলা হল। পথে অনেকটা সময় লেগেছিল। তাঁকে দ্বিতলে শোবার ঘরে তুলে দিয়ে সেদিনের মতো বিদায় নিয়ে চলে এলাম।

পরদিন ১০ই জানুয়ারি। আমাদের কিছু ঘনিষ্ঠ কর্মী দিনটিকে চিহ্নিত করেছে আমার জন্মদিন হিসাবে পালন করে। যদিও আমার ঘোরতর আপত্তি রয়েছে। কেননা, ওটা আমার সার্টিফিকেট-ভুক্ত জন্ম তারিখ। স্কুলে ভর্তি করাবার সময় বড় দা দু'-এক বছর নির্ঘাত কমিয়ে দিয়েছেন। তবুও কর্মীদের উৎসাহের অন্ত নেই। সকালবেলা ওরা কোন এক স্থানে একত্রিত হয়ে ফুল, মালা, কেক, শার্ট, পাজামা-পাঞ্জাবি, টাই এবং আরও কত কি নিয়ে আমার বাসায় উপস্থিত হয় এবং ঘোষণা দেয়, আজ আমরা আপনার জন্মদিন পালন করব।

সমস্ত খরচ ওদের। সারাদিন খাবারের ওদের মেনু করা থাকে। আমার কাজ হচ্ছে ওদেরকে সঙ্গ দেওয়া। অনেক প্রেজেন্টেশন পেয়ে ভালো লাগে। অন্যান্য বছর এই দিনে সালেহা এবং দিনার উৎসাহই বেশি থাকে। এবার

তারা স্বপনের বিয়ে উপলক্ষে কুষ্টিয়াতে রয়েছে। আনোয়ার, সমিজ, দুলাল, ধীরণ, মাসুদ, রতন এরা হচ্ছে এ দলের পাণ্ডা।

সেদিন আর এরশাদ সাহেবের সঙ্গে দেখা করা গেল না। পরদিন প্রথম রোজা। সকালেই এরশাদ সাহেবের বাসায় উপস্থিত হলাম। সঙ্গে আনোয়ার। তিনি প্রস্তুত হয়ে বসার ঘরে এসে ঢুকলেন। আর এক দফা বুক মেলাবার পর বললাম, স্যার, গতকাল আসতে পারিনি, ব্যস্ত ছিলাম। কিছু মনে করবেন না।

আরও বললাম, স্যার, যখনই প্রয়োজন পড়বে আপনার লোকদের বলবেন একটা টেলিফোন করে দিতে; আমি সঙ্গে সঙ্গে চলে আসব। যখনই প্রয়োজন হবে, যতবার প্রয়োজন হবে ডাকবেন, আমার বাসাও গুলশানের মধ্যেই, কোন সমস্যা নেই। কিন্তু না ডাকলেও প্রতিদিন এসে আপনার ও আমার সময় নষ্ট করব, অনর্থক হে হে করে খোশামোদ করব, এটা আমার ধাতে সইবে না। কাজে ডাকবেন, এক পায়ে দণ্ডায়মান।

তিনি হেসে বললেন, আপনাকে আমার জানতে বাকি নেই। ঠিক আছে, তা-ই হবে।

জিজ্ঞেস করলাম, ছ' বছর পর মুক্ত পরিবেশে আজ প্রথম রোজার দিন আপনার প্রোগ্রাম কী? ইফতার করবেন কোথায়?

তিনি বললেন, বলুন তো আজ কোথায় ইফতার করা যায়!

বললাম, স্যার, কয়েকটা বিকল্প রয়েছে। আজ কেবলমাত্র পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে ইফতার করলেও বেমানান হবে না। বরং ঠিকই হবে।

দ্বিতীয় বিকল্প, দলের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ যারা ঢাকায় উপস্থিত রয়েছেন তাদের সকলকে ডেকেও শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যমে প্রথম ইফতার করতে পারেন। আপনার তরফ থেকে আমরাই টেলিফোনে সকলকে ডেকে আনতে পারি। অথবা আজকের ইফতার আপনি আপনার প্রিয় পথকলিদের নিয়ে করতে পারেন, বা কোন এতিমখানায় গিয়ে আল্লাহ্ তা'আলার শোকর আদায়ের লক্ষ্যে এতিমদের সঙ্গে ইফতার করতে পারেন। বাসায় একটি শোকরানা মিলাদ মাহফিলের মাধ্যমেও প্রথম রোজার দিনটি পালন করা যায়।

তিনি তখন বললেন, আমি ইতিমধ্যেই দাওয়াত গ্রহণ করে ফেলেছি, মাওলানা মান্নানের সঙ্গে গাওসুল আজম মসজিদে ইফতার করব।

মাওলানা মান্নান এই মসজিদটির নির্মাণে উদ্যোগ গ্রহণ করে নিঃসন্দেহে একটি অত্যন্ত প্রশংসনীয় কাজ করেছেন এবং এর পশ্চাতে সে সময় এরশাদ সাহেবেরও প্রভূত অবদান ছিল একথা অনস্বীকার্য। তবুও দীর্ঘদিন কারাগারে কাটিয়ে এসে ছয় বছর পর মুক্তজীবনের প্রথম রোজাটি অত্যন্ত বিতর্কিত চরিত্রের অধিকারী কোন ব্যক্তির আমন্ত্রণে তিনি যাবেন কথাটি শোনা অবধি ভালো লাগছিল না।

আমার বড় দোষ, অন্তরে কোন কথার উদয় হলে তা অচিরেই বের হয়ে আসে; বেশিক্ষণ চেপে রাখতে পারি না, চেপে রাখা উচিতও মনে করি না। এজন্য বহু সময় বেশ সংকটে পড়তে হয়।

বললাম, স্যার, প্রথম দাওয়াতটি মাওলানা মান্নানের নিকট থেকে গ্রহণ করাটা কী যুক্তিসঙ্গত হবে?

তিনি বললেন, আপনি তাকে কোনদিনই সহ্য করতে পারেন না।

বললাম, বিষয়টি ব্যক্তিগত পর্যায়ভুক্ত নয়। মুক্তিযুদ্ধকালীন তার ভূমিকার কারণে আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা হয়ে তা কখনওই বিস্মৃত হতে পারি না।

আর কতকাল বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক করবেন?

মনে হয় আমাদের প্রজন্ম এই ইতিহাসটি আমৃত্যু স্মরণ রাখবে!

তিনি তখন বললেন, মসজিদটি বড় পীর হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রাঃ)-এর স্মরণে নির্মিত হয়েছে এবং এর জমি প্রদান থেকে শুরু করে অনেক বিষয়েই আমার কতটা অবদান রয়েছে, আপনি জানেন। তবুও সেখানে যাওয়া ঠিক হবে না?

বললাম, সেখানে যাওয়া বেঠিক হবে একথা কখনও বলি না। মসজিদটির কথা উচ্চারিত হলেই এক ব্যক্তির নাম উচ্চারিত হয় এবং দাওয়াতও সেই ব্যক্তিই দিয়েছে। সে কারণে আপনার দাওয়াতটি গ্রহণের বিরোধিতা করছি। কিন্তু আমন্ত্রণ যদি গ্রহণ করে থাকেন তা হলে না যাওয়া উচিত হবে না।

তিনি বললেন, হ্যাঁ, গ্রহণ করেছি। কাজেই যেতে হবে। আপনিও চলুন না আমার সঙ্গে!

বললাম, মাফ করবেন স্যার। আমি আজ ওখানে যাব না। প্রথম ইফতারটি আমি তার সঙ্গে খেতে চাই না। আপনি কথা দিয়েছেন, আপনি যান।

সেদিনের মতো বিদায় নিয়ে এলাম। একটা কাঁটা বিঁধে রইল। তিনি এ বিষয়ে কারো সঙ্গেই আলাপ করেননি। আগামীতে অন্যান্য সমস্যা সমাধানে কি একই পন্থা অনুসরণ করবেন? আমরা যে অনেক বিষয় নিয়ে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছি তাঁর নির্দেশনার জন্য। পরামর্শ করা অপ্রয়োজনীয় বিবেচিত হলে অতীতের মতো আরও ব্যাপক জটিলতার সৃষ্টি হবে বলে সন্দিহান হলাম। বড় কথা, এখন তিনি ক্ষমতাবান নন। রাজনীতির মূল কথাই হল—পরামর্শ, আলোচনা ও পরমতসহিষ্ণুতা। এসবের অভাব অনেক ক্ষেত্রেই বিপর্যয় ডেকে আনে। ভবিষ্যত নিয়ে দুর্ভাবনার সূচনা হল।

ফেরার পথে মিজান সাহেবের বাসায় গিয়ে দেখি সেও মুখ ভার করে আছে। আমার উপরে সে কিছুটা ক্ষিপ্ত। কারণ জিজ্ঞেস করতে বলল, সাব্যস্ত হয়েছিল এরশাদ সাহেব মুক্ত হয়ে জেল থেকে সরাসরি আমার বাসায়

আসবেন এবং এখানে চা পানান্তে নিজ গৃহে ফিরবেন। আমি সেমতে চা-চক্রের আয়োজনও করে রেখেছিলাম। তুমি গাড়ি চালিয়ে তাঁকে সোজা বাসায় নিয়ে গেলে!

বললাম, আমি গাড়ি চালাচ্ছিলাম ঠিকই, কিন্তু কেউ কি আমাকে বলেছে আপনার বাসায় যেতে হবে? আপনিও কী একটি বার বলেছেন? আমি তো হাত গুনতে জানি না! আমি কুষ্টিয়া থেকে ফেরার পথে সরাসরি সাব-জেলের গেটে গিয়েছি আপনি তা জানেন। আপনাদের প্রোগ্রামের কথা না জানালে কী করে জানব?

সে বিষয়টি উপলব্ধি করল। বলল, হ্যাঁ, তুমি অবশ্য জানো না। তোমাকে বলাও হয়নি। কিন্তু এরশাদ সাহেবকে তো জানানো হয়েছিল! সে কেন আমার বাসায় আসার কথা বলল না?

বললাম, সে কথা তাঁর সঙ্গেই হতে পারে। আমাকে যথারীতি অহেতুক দায়ী করছেন কেন?

সে হেসে বলল, যথারীতি বলছ কেন? আমার ভুল হয়েছে। এক্ষেত্রে তোমার কোন দোষ নেই।

বললাম, একটু খতিয়ে দেখলেই দেখতে পাবেন, কোন ক্ষেত্রেই এই অভাগার কোন দোষ নেই।

সে তার প্রথানুযায়ী নিশ্চুপ থাকাই যুক্তিযুক্ত মনে করল। এরশাদ সাহেব অবশ্য পরদিন তার বাসায় গিয়েছিলেন। দু'দিন পর তিনি আমার বাসায়ও এসে উপস্থিত। আমার গায়ে জ্বর ছিল। এরশাদ সাহেব সালেহাকে টেলিফোনে বলেছেন, ইফতার তৈরি করুন, আসছি।

সালেহা আমার ঘুম না ভাঙিয়ে ইফতারির আয়োজনে লেগে গিয়েছে। সাড়া-শব্দে ঘুম ভেঙে গেলে তাঁকে দেখে খুশি হয়ে উঠি। কিন্তু পশ্চাতের উঁকি-ঝুঁকি মারা মুখটি দেখে সন্তুষ্ট হতে পারলাম না। জিনাতকে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। মনে হয় স্বামী-স্ত্রী একত্রে বেড়াতে বের হয়েছেন।

বললেন, এসে শুনলাম, জ্বর বাঁধিয়ে বসে আছেন। জানলে আজ আসতাম না।

বললাম, সামান্য জ্বর। কোন অসুবিধা নেই। আপনি আসাতে আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি, জ্বর ছেড়ে যাচ্ছে।

তাদেরকে নিচে বসবার ঘরে নিয়ে যেতে দেখি তাজুল ইসলাম চৌধুরী এবং বাগেরহাটের সাবেক জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান আবদুল হাই বাচ্চুও রয়েছে। জিনাত মোশাররফ এই প্রথমবার খাবার ঘরে ঢুকে ইফতারের আয়োজনে ব্যস্ত সালেহার সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিল। বাড়ি আসা মেহমানকে অবহেলা করা যায় না। তবুও আমি স্যারকে বললাম, ওনাকে নিয়ে এইভাবে আপনার ঘোরাফেরা অনুচিত হচ্ছে।

তিনি হেসে প্রতিউত্তর করলেন, আপনি কী চিরকালই বেরসিক থাকবেন?

বললাম, স্যার, পূর্বেও বলেছি, আজও বলছি, যদি তাকে ছাড়া না চলে তা হলে তার ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু এভাবে প্রকাশ্য মেলামেশায় ক্ষতিকর অবস্থার সৃষ্টি হবে।

বললেন, দেখা যাক কী করা যায়!

বললাম, স্যার, আপনি ভালো করেই জানেন, আমি তাকে সহজ-স্বাভাবিকতায় গ্রহণ করতে পারি না, তবুও আমার বাসায় তাকে নিয়ে এলেন!

যাতে গ্রহণ করতে পারেন সেজন্য এনেছি!

নিজের বাসায় এর চাইতে আর বেশি বলা অসঙ্গত মনে হল। অন্যান্য কথা বলতে বলতেই ইফতারির সময় ঘনিয়ে এল। সকলে মিলে অনেকদিন পর আনন্দের সঙ্গে ইফতারি করলাম।

আমাদের পরামর্শ ছিল ঢাকা মহানগরীতে একটি বৃহৎ জনসমাবেশে তাঁকে নাগরিক সম্বর্ধনা দেওয়া হোক। সেটাই জনসভায় পরিণত হয়ে এক কাজে দু'কাজ হয়ে যাবে। তাঁর সম্বন্ধে বিষোদ্গারের অভাব নেই, ক্লান্তিহীন অপপ্রচারে কেউ শ্রান্ত হয় না, হেন অভিযোগ নেই যা তার উপর আরোপ হয়নি। তবুও সাধারণ মানুষের কাছে, বিশেষত গ্রামীণ জনগোষ্ঠির নিকট এরশাদের আবেদন নিষ্প্রভ হয়নি।

দেশের দুটি বৃহৎ দলে দু'জন মহিলা নেত্রীর বিদ্যমানে এরশাদের সম্ভাবনা ছিল আশাব্যঞ্জক। দলটিকে গুছিয়ে নিয়ে, যারা এখনও রয়েছে সেই পরীক্ষিত নেতা-কর্মীদের সংগঠিত করে তিনি যদি বাইরের খেলাধুলা পরিত্যাগ করে গণমুখী রাজনীতি নিয়ে বাংলাদেশের মানুষের নিকট গিয়ে দাঁড়ান, তা হলে জনগণের সিংহভাগই সাড়া দেবে। তাঁকে কথাটি বারবার বুঝাবারও প্রচেষ্টা করেছি, কিন্তু খুব যে একটা প্রতিক্রিয়া হয়েছে মনে হল না।

সাধারণ মানুষ উন্নয়ন বলতে এরশাদ আমলের উন্নয়নই বুঝে। তারপর আর তেমন কিছু তাদের দৃষ্টিগোচরও হয়নি। দু'-এক স্থানে ফিতা কেটে উদ্বোধনের ঘটা যা করা হয়েছে সেটাও এরশাদ আমলেরই শুরু করা কাজের পরিসমাপ্তি। সরকারি কর্মচারী ও শ্রমিক সমাজ সে আমলের অবদান ভুলবে না। শিক্ষা, বিদ্যুৎ এবং যোগাযোগ ক্ষেত্রের উন্নয়নসমূহকে বিপ্লব বললে অত্যুক্তি হবে না। উপজেলা পদ্ধতি ও বন্যা-ত্রাণের নজিরবিহীন সাফল্যের কথা মানুষের মুখে মুখে। এসবকে কাজে লাগাতে হবে। এখন নিবিষ্ট মনে পরিশ্রম করলে আগামীতে ফল পাওয়া যাবে। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ এরশাদ সাহেব ও তাঁর দলকে গ্রহণ করার জন্য উন্মুখ হয়ে রয়েছে। বারবার একই কথা আমি নিবেদন করেছি, মাঠে সুপরিপক্ব ফসল রয়েছে, তাকে সময় মতো ঘরে তুলতে না পারলে মাঠ বা ফসলের ত্রুটি নয়, ত্রুটি সেই কৃষকের যে শস্য কর্তন করে গোলা ভরতে জানে না।

এরশাদ সাহেব বললেন, সর্বাগ্রে আমাকে রংপুর যেতে হবে। সেখানকার মানুষ জীবনপণ করে আমার জীবন বাঁচিয়েছে, তারা আমার বেঁচে থাকা ও মুক্তির লক্ষ্যে দু'-দু'বার অকুণ্ঠ সমর্থন দান করে নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। তাদের ঋণ শোধ করার নয়। তাদেরকে কৃতজ্ঞতা জানাবার উদ্দেশে আমাকে সেখানে যেতে হবে। আমার বাবা-মায়ের কবরও আমি জিয়ারত করতে চাই।

ঠিক হল সমস্ত কর্মসূচির মধ্যে সর্ব প্রথম রংপুর সফর। সেখানে দু'দিন অবস্থান করে রংপুরবাসীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক সৃষ্টি করা। ঢাকা থেকে সমস্ত নেতৃবৃন্দ ও কর্মীরা স্বাভাবিকভাবেই এই সফরে তাঁর সঙ্গী হল।

সৈয়দপুরের প্লেনে সেদিন কেবল আমরাই ছিলাম। জীবনে অনেক সম্বর্ধনা দেখেছি এবং পেয়েছি। কিন্তু বৃহত্তর রংপুর বা উত্তরবঙ্গবাসীরা সেদিন তাদের সন্তানকে যে সম্বর্ধনা দিয়েছিল তার কোন তুলনা হয় না। সৈয়দপুর খুব বড় শহর নয়। সহস্রাধিক গাড়ি, জিপ, মাইক্রো, বাস, ট্রাক প্রভৃতি যানে সেদিনের সৈয়দপুরে তিল ধারণের স্থান ছিল না। এয়ারপোর্টে নেমে একটা ভয়ঙ্কর অবস্থার মধ্যে নিপতিত হলাম। মালা, রজনীগন্ধা, ফুলের তোড়া আর সম্বর্ধনা তোরণের ব্যাপকতা সব রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। সকলেই ব্যস্ত কে কার আগে এরশাদ সাহেবকে মালা দেবে।

আয়োজকদের বিলি-ব্যবস্থার অভাব ছিল। এই ধরনের বৃহৎ ব্যাপার পূর্বাহ্নে কমিটির মাধ্যমে গাড়িতে নম্বর বসিয়ে কে কোন্ গাড়িতে যাবে নির্দিষ্ট করে দিতে হয়। সে ধরনের কোন ব্যবস্থা ছিল না। অব্যবস্থার একটা ধারণা আমার পূর্বেই মনে জেগেছিল। ক'বছর এই এলাকার প্রতিনিধিত্ব করেছি। আজ ওদের আবেগের কোন সীমারেখা থাকবে না। কোন সুব্যবস্থা আশা করা নিরর্থক। সে কারণে ঢাকা থেকে যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টির সমাজকল্যাণ সম্পাদক ইকবালকে বলেছিলাম, তোমার যখন রংপুরের সম্বর্ধনা দেখার শখ তা হলে একটা গাড়ি নিয়ে আগেই চলে যাও। সেখানে আমি তোমার গাড়ি ব্যবহার করব।

সে তখন নিউইয়র্ক থেকে ক'দিনের জন্য ঢাকা এসেছে, সানন্দে তার গাড়ি নিয়ে চলে এসেছে এবং বিমানবন্দরে ঠিকই ঠাঁই করে নিয়েছে। আমার গাড়ির ব্যবস্থা রয়েছে দেখে কাজী জাফর ধরল তাকেও সঙ্গে নিতে হবে। অন্যান্য নেতৃবৃন্দ কে, কোন্ গাড়িতে গিয়েছে জানি না। দেখি এক পাশে ভাবী অর্থাৎ মিসেস এরশাদ দাঁড়িয়ে আছেন। এত গাড়ি, কিন্তু তাঁর স্থান নেই। কেউ এদিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না। তাঁকেও তুলে নিলাম। ইকবালের গাড়ি না হলে আমাদের অসুবিধায় পড়তে হত। কেননা, যত গাড়ি এসেছে, প্রত্যেকটি সাধ্যাতীত যাত্রী বহন করছে, কোথাও ঠাঁই নেই। পথে পথে সম্বর্ধনায় এক ঘণ্টার রাস্তা পাঁচ ঘণ্টায় রংপুর পৌঁছলাম।

রোজার মাসে ইফতারির সময় পার হয়ে গেল। ইকবাল কীসব যোগাড় করে রেখেছিল তা-ই দিয়ে রোজা ভঙ্গ করলাম।

সৈয়দপুর বিমান বন্দর থেকে রংপুর এই সমস্ত পথে সেখানকার জনগণ এরশাদ সাহেবকে এক ঐতিহাসিক অভ্যর্থনা জানাল। আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা কেউ বোধহয় বাড়িতে বসে ছিল না, সকলেই রাস্তায় নেমে এসেছিল। চারদিকে যেন ঈদের খুশি বিরাজ করছিল। এরশাদ সাহেব এই দীর্ঘপথ একটা খোলা গাড়িতে সর্বক্ষণ দাঁড়িয়ে হাসিমুখে হাত নেড়ে মানুষের অকৃত্রিম ভালোবাসার প্রতিউত্তর দিচ্ছিলেন। সৈনিকের ট্রেনিং ছিল বলে এত ধকল সহ্য করতে সক্ষম হলেন।

সার্কিট হাউসে এসেও প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণহীনতা ও অব্যবস্থাপনা লক্ষ্য করা গেল। একসঙ্গে এত অতিথির ব্যবস্থাপনা এরা ইতিপূর্বে করেছে কিনা জানি না। কার রুমে কে উঠে যাচ্ছে, কার খাবার কে খেয়ে নিচ্ছে, কোন নিয়ম-নীতি পরিলক্ষিত হল না। ইকবালের বোনের বাসা সার্কিট হাউসের সন্নিকটে হওয়ায় আমরা সেখানেই আমাদের আহারাদি সারতে লাগলাম।

পরদিন রংপুরে যে জনসভা হল সেটি ছিল সে অঞ্চলের সর্ববৃহৎ সমাবেশ। দুপুর থেকে মানুষের ঢল নেমে আসছিল আশেপাশের সমস্ত প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে। আমি ও কাজী জাফর একটি খোলা জিপে করে এরশাদ সাহেবকে নিয়ে অতিকষ্টে মঞ্চে পৌছলাম। মিজান সাহেব ও আমি বললাম, রংপুরবাসী একদিন আমাদেরকে প্রতিনিধি নির্বাচিত করেছিল এরশাদের কারণে। আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলাম এরশাদকে মুক্ত করে রংপুরবাসীর নিকট পৌছে দেব। আমরা পরম করুণাময়ের শোকরিয়া আদায় করলাম; বিলম্বে হলেও তাঁকে আমরা নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছি।

দু'দিন এবং রাত ঠাসা প্রোগ্রাম। সার্কিট হাউস লোকে লোকারণ্য। তাঁর বাড়ি স্কাইভিউতে যাওয়ার তিনি সময় পান না। তিনি আবার রংপুর শহরের প্রতিনিধিও বটে। কাজেই অতি ব্যস্ততার মধ্যদিয়ে সময় কাটে। এটা পরিষ্কার হয়ে গেল এই অঞ্চলের মানুষ তাঁকে হৃদয়ের সিংহাসনে স্থায়ী আসন দিয়েছে। বেগম খালেদা বা হাসিনা ওয়াজেদ তাদের শাগরেদগণসহ যতই ধোঁয়া তোলেন না কেন, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় আসীন হৃদয়ের মানুষটিকে তারা সেখান থেকে টলাতে পারবে না। এই একই অবস্থা বাংলাদেশের সর্বত্র না হলেও অধিকাংশ স্থানে সম্ভব। তার জন্য তাঁকে এখন থেকে জনগণের মন-অভিমুখী হতে হবে। নিজের লোভ-লালসা, কামনা-বাসনা বিসর্জন দিয়ে কেবল মানুষের কল্যাণেই প্রতিটি মুহূর্ত ব্যয় করতে হবে। তা হলে অচিরেই দেশ থেকে অধর্মের প্রমীলা রাজ্যের অবসান সম্ভব।

দ্বিতীয় দিন সকালে পীরগঞ্জের কর্মীদের কথা দিয়েছিলাম, সেখানে একবার দেখা দেব। সকালবেলাতেই আমার নির্মিত এরশাদ ভবনে একটি

ছোট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। এরা সকলেই রংপুরের বৃহৎ সভায় উপস্থিত হয়ে আমাদের বক্তব্য শুনেছে। তবুও পীরগঞ্জের মানুষের কাছে আমার ব্যক্তিগত কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। তাদের অবদানের কথা আমৃত্যু ভুলব না। ভালোবাসার ঋণ শোধ করতে পারব না ঠিকই কিন্তু তা অস্বীকারও করব না কোনদিন। সুখে-দুঃখে পীরগঞ্জের একটি মানুষ আমার দ্বারে এসে দাঁড়ালে তার জন্য আমার বাড়ি এবং অন্তরের দরজা চিরদিন উন্মুক্ত থাকবে। মানুষজনের সাথে শেষবারের মতো বুক মিলিয়ে ফিরে এলাম। জানি না আবার কবে সেখানে যাওয়ার সৌভাগ্য হবে।

রংপুরে কাজের ফাঁকে ফাঁকে যতটা সময় পেরেছি, স্যারকে বৃহত্তর রাজনীতির পরিমণ্ডলের কথা নিবেদন করেছি। বলার চেষ্টা করেছি, আল্লাহ্ সবাইকে সব সুযোগ দেন না, আপনার প্রতি তাঁর অনুগ্রহ অসীম। শত দোষ-ত্রুটি সত্ত্বেও এদেশের মানুষ আপনাকে বিকল্প ভাবতে শুরু করেছে। এই সুযোগ হেলায় নষ্ট করলে আজীবন পস্তাতে হবে। নিজেদের ভুলে আমরা যেন জনগণের আস্থাকে নষ্ট করে না দিই। প্রতিটি পদক্ষেপ আমাদেরকে গুনে গুনে দিতে হবে। আর ভুল করার অবকাশ আমাদের নেই।

যত কথাই বলি না কেন, যত আকার-ইঙ্গিতে এবং কখনও প্রকাশ্যেই নিষেধ করি না কেন, এরশাদ সাহেব জিনাতের মোহ থেকে পরিত্রাণ পাচ্ছেন না। কী আছে জিনাতের মধ্যে বুঝে উঠতে পারি না। কিন্তু তিনি আকণ্ঠ মজেছেন। সমালোচনা বা নিন্দায় ভ্রূক্ষেপ করেন না, বন্ধু হিসাবে অভিমত দিলে হেসে উড়িয়ে দেন। পরিবারের সদস্যদের স্পষ্ট বিমুখতার মধ্যে তিনি যেন আকণ্ঠ ডুবে আছেন এই মহিলার দুর্বার আকর্ষণে। সর্বত্র কানা-ঘুষা, স্যারের অত্যন্ত ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে। তাঁর ক্ষতি মানেই দলের ক্ষতি। তাঁকে থামানো প্রয়োজন। কিন্তু কেউ সাহস করে বলতে পারে না। আমি কিছু কিছু চেষ্টা করে কেবল তাঁর অপ্রিয় হচ্ছি, আর জিনাতের হচ্ছি দু'চোখের বিষ।

কথা না থাকলেও আমাদেরকে সুনামগঞ্জে নাসির চৌধুরীর এলাকায় জনসভা করতে যেতে হল। দু'দিনের কর্মসূচি। তাঁকে পাশে বসিয়ে সমস্ত রাস্তা নিজেই গাড়ি চালালাম। কথায় কথায় যতটা সম্ভব তাঁকে মহিলার দুর্বার আকর্ষণ থেকে দূরে রাখার প্রয়াস চালাই। কিন্তু দেখতে পাই, সময় পেলেই তিনি ঢাকায় টেলিফোন নিয়ে ব্যস্ত এবং অপর প্রান্তে কে রয়েছে বুঝতে অসুবিধা হয় না।

কুমিল্লায় মনিরুল হক চৌধুরীও তার সুয়াগঞ্জে এক বিরাট সমাবেশের আয়োজন করে। সেখানেও তাঁর সঙ্গে যেতে যেতে যতটা পারি তাঁকে সৎ-পথের সন্ধান দেওয়ার চেষ্টা করি। সিলেট, সুনামগঞ্জ এবং কুমিল্লার পথে পথে প্রায় রংপুরেরই প্রতিচ্ছবি দেখতে পেয়ে আশান্বিত হয়ে উঠি। এরশাদের এই ভাবমূর্তি কাজে লাগিয়ে রাজনীতি ক্ষেত্রে অনেক কিছু করা সম্ভব।

আবার কলাবাগানে অফিসে ত্রিতলে উঠতে গিয়ে কর্মীদের মন্তব্য শুনে হতাশ হয়ে যাই। আমি সিঁড়ি বেয়ে উঠছি, ওরা খেয়াল করেনি। আমাকে যতটা সমীহ করে, দেখলে একথা বলত না। একজন আর একজনকে জিজ্ঞেস করছে, কী রে, উপরে যাওয়া যাবে? কাজ-কর্ম শেষ হয়েছে?

অন্যজন উত্তর দেয়, এতক্ষণে নিশ্চয়ই শেষ হয়েছে। অনেকক্ষণ হয়ে গেল।

সমস্বরে হাসির আওয়াজে ওদের আড়ালেই চুপিসারে উপরে উঠে যাই। গিয়ে জানতে পারি, চেয়ারম্যান সাহেব তাঁর অফিস রুমে আছেন এবং অবিচ্ছেদ্যভাবে সেই মহিলা সেখানে রয়েছে। আমি ভিতরে যাওয়ার উদ্যোগ নিতেই পিয়ন বাধা দেয়। কিন্তু ওরা আমাকে আটকাতে পারবে কেন? সাড়াশব্দ করে আমি ভিতরে প্রবেশ করি।

বলি, স্যার, আপনারা দু'জন হয়ত ভিতরে বসে দলীয় কথাবার্তা বলছেন। কিন্তু দুনিয়ার মানুষ তা বিশ্বাস করবে না। এই মহিলাকে জড়িয়ে আপনার সম্বন্ধে সমাজে যা রটনা রয়েছে, তাকে যদি আপনি অধিকতর বৃদ্ধির প্রয়াস পান, তা হলে আপনার সঙ্গে আর রাজনীতি করা যাবে না।

স্পষ্টত তিনি আহত হলেন। তবুও হেসে আমাকে ঠাণ্ডা করার চেষ্টায় বললেন, বসুন, মাথা গরম করে লাভ নেই। সব ঠিক হয়ে যাবে।

বললাম, কিছুই ঠিক হবে না। বরং অচিরেই সব বেঠিক হয়ে যাবে।

আজ বাঙালি জাতির জীবনে সবচাইতে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত দিন। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন দিন বারবার আসেনি। ভাষা ও সংস্কৃতিকে রক্ষার জন্য জাতির তরুণ সমাজ সেদিন প্রথম রক্ত দেওয়া শিখল। '৫২-এর সেই শহীদ দিবসে ইংরেজি স্কুল সেন্ট গ্রেগরীজের নবম শ্রেণীর ছাত্র আমি প্রথম রাজনীতির পাদপীঠে দীক্ষা নিই। রাজনীতি, সমাজনীতি বা শিক্ষানীতি কিছুই তখন বোধে ছিল না। সার বুঝেছিলাম একটি কথা, এদেশের অধিকাংশ মানুষের মুখের ভাষা স্বাধীন দেশে কেন রাষ্ট্রের ভাষা হবে না? ইংরেজি স্কুলের ছাত্র হয়েও সেদিন সবকিছু ভুলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম সেই সংগ্রামে।

একুশের প্রথম লগ্নে যারা আহত হয়েছিল, যারা কারাবরণ করেছিল আমি ছিলাম তাদেরই এক অগ্রসৈনিক। রক্তাক্ত আহত অবস্থায় জীবনের প্রথম

কারাবরণ। সেদিন জীবনের ভিত্তিমূলে যে আঘাত লেগেছিল তা পরবর্তীকালে সমগ্র জীবনধারাকেই বদলে দিয়েছিল। জেলখাটা সেই থেকে শুরু। যার স্বপ্ন ছিল ব্যারিস্টার হবার সে হয়ে গেল একজন সার্বক্ষণিক রাজনীতিক। সারাটা জীবন কাটল সংগ্রাম-আন্দোলন আর যুদ্ধ পরিচালনায়। কখনও ভাষার জন্য যুদ্ধ, কখনও সংস্কৃতিকে বিজাতীয় আগ্রাসন থেকে বাঁচাবার যুদ্ধ, কখনও ডাল-ভাতের যুদ্ধ, কখনও স্বাধিকার আদায়ের যুদ্ধ, কখনও ন্যায্য হিস্‌সা আদায়ের যুদ্ধ এবং সর্বশেষ যুদ্ধ স্বাধীনতার যুদ্ধ। এই দেশে আমার চাইতে বেশি কারা-নির্যাতিত আর কেউ নেই। শুরুও করেছিলাম কৈশোরের মাথায়, আজ ষাটোত্তীর্ণ বয়সে কারাগারের অভ্যন্তরে জীবনের সংগ্রামমুখর স্মৃতি রোমন্থন করছি।

অন্যত্র লিখেছি, কেন প্রাণের সমস্ত ভালোবাসায় উৎসর্গীকৃত ঐ শহীদ মিনারে আর যাই না। একজন ভাষা সৈনিকের সে মর্মপীড়া হৃদয়ঙ্গম করার মন কোথায়! '৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি যাদের নিজেদের জন্মের প্রশ্নই আসে না, এমনকি তাদের বাবা-মায়ের বিয়েও হয়নি, সেই সব নব্য বিপ্লবীরা কেবল মতাদর্শের ভিন্নতার কারণে একুশের রাতে আমার মতো প্রবীণ ভাষা-সৈনিকের উপর দা, কুড়াল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। পুলিশ দাঁড়িয়ে সে দৃশ্য উপভোগ করে!

এই দিনে যেখানে রাষ্ট্রীয় সম্মানে ভূষিত হওয়ার কথা, যেখানে বর্তমান প্রজন্ম সগৌরবে তাদের অতীতের যোদ্ধাকে জাতীয় সম্মানে বরণ করার কথা সেখানে জগন্নাথ হলের গলি থেকে ওরা কারা লাঠি-সোটা নিয়ে বের হয়! ওরা আর কেউ নয়, আজ যে দাম্ভিক মহিলা, ভারতে গিয়ে পরপুরুষের হাতে মাথায় তিলক-চন্দন লাগিয়ে প্রভুভক্ত দেশী-কোত্তম উপাধি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী হয়েও মুখ্যমন্ত্রী সম্বোধনে আনন্দে বিগলিত; তারই পথ ও মতের স্রোতধারায় উজ্জীবিত বিভীষণদেরই নব্য সংস্করণ। ভাষা সংগ্রামের ইতিহাসে অলি আহাদ, গাজীউল হক এমনি দু'-একটি নামের পরই যে নামটি চলে আসে, সেই চির সংগ্রামী বাংলার মানুষের কল্যাণে সর্ব নিবেদিত মানুষটিকেই আজ রাজনৈতিক প্রতিহিংসার যূপকাষ্ঠে সবচাইতে বেশি নিগৃহীত হতে হচ্ছে। উন্মাদও যা চিন্তা করতে পারবে না, তেমনি মামলা, জেল হত্যা মামলায় এই বৃদ্ধ বয়সে কারাগারের নির্জন প্রকোষ্ঠে ধুঁকে ধুঁকে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। অভিযোগ, তারা নাকি হত্যার ষড়যন্ত্রকারীর সঙ্গে কানে কানে কি কথা বলেছে!

আল্লাহ্ আছেন, তিনি অন্তর্যামী এবং সর্বশ্রোতা। ওখানে ফাঁকি চলবে না। সেই বিশ্বাসেই আশ্বস্ত হয়ে আছি। ক্ষমতার সীমাহীন অপব্যবহার আর দম্ভের আত্মম্ভরিতার সুবিচার একদিন হবেই। একুশের বেদনা বিধৌত ও শত

শপথে উজ্জীবিত এই দিনটিতে এই রইল এই ভাষা-সৈনিকের মরমের একমাত্র প্রার্থনা।

কয়েকটি বৈঠক ও সভা করলাম তাঁর সঙ্গে। মূল যে বিভেদ লক্ষ্য করলাম সেটি হল, সবকিছুতে অতিরিক্ত 'আমি' ভাব। রাজনীতি অনেককে নিয়ে করার বিষয়। আমিত্ব সঙ্কুচিত করে বহুবচনের বিষয়। কিন্তু তিনি মনে করেন, তিনি এখনও রাষ্ট্রের কর্ণধার এবং দলের একমাত্র স্বত্বাধিকারী। সবকিছুতেই আমার আমার ভাব। দল আমার, টাকা আমার, কর্মীরাও আমার। আমার কথাই সর্বত্র চলবে। 'আমাদের' কোন সুযোগ নেই।

প্রেসিডিয়ামের এক সভায় সকলকে চাঁদা ধরলেন। প্রতিমাসে নির্দিষ্ট অঙ্ক চাঁদা দিতে হবে। জানি কেউ দেবে না। তবুও দ্বিমত আসছে না। শেষ পর্যন্ত এই হতভাগ্যকেই মুখ খুলতে হল। বললাম, স্যার, সরকার চালাবার সময় যে বলতেন ভবিষ্যতে দল চালাবার জন্য ফান্ড প্রয়োজন হবে, সে ব্যবস্থা করছি। তার কী হল?

তিনি দৃশ্যতই রাগান্বিত হলেন। এ ধরনের কথা শুনতে তিনি অভ্যস্ত নন। বললেন, এভাবে বলা ঠিক হচ্ছে কী? দলের জন্য যে অর্থ রক্ষিত ছিল, তা জব্দ হয়েছে, মামলা হয়েছে—সবই জানেন।

বললাম, কেবল জানিই না, সে মামলায় আপনার হয়ে তাজুল, মিজান সাহেব এবং আমি সাক্ষ্যও দিয়ে এসেছি। এ টাকা যে সেই টাকা নয় আপনি তা ভালো করেই জানেন।

কয়েকজন সহকর্মীর ইচ্ছাকে সম্মান দিতে গিয়ে সেদিন আর কথা বাড়ালাম না। কিন্তু মনের অভ্যন্তরে একটা অস্বস্তি পোষণ করছিলাম। অজস্র অর্থের কথা কেবল শুনেছি বললে কম বলা হবে। প্রত্যক্ষ করেছি অর্থের আনাগোনার উত্তাপ। নাজিউরকে সকলে মনে করত জাতীয় পার্টির ব্যাংক। চেয়ারম্যান সাহেবও বলতেন দল চালাবার জন্য তার অর্থের কোনদিন সমস্যা হবে না।

আর একদিন জনসভায় কারা বক্তৃতা দেবে আলোচনা উঠতে তিনি বললেন, যারা পাঁচ হাজার করে চাঁদা দেবে তারাই কেবল বক্তৃতা করবে।

কথাটা হয়ত রহস্য করে বলে থাকবেন। আমি বললাম, স্যার, সেক্ষেত্রে বক্তাদের তালিকা থেকে আমার নাম কেটে দিন। টাকা দিয়ে আমি বক্তৃতা

করি না। টাকার বিনিময়ে যারা ওয়াজ করে বরং তাদের মতো ভেবে দেখতে হবে এখন থেকে সম্মানী গ্রহণ করে বক্তৃতা করব কিনা।

তিনি হেসে বললেন, তা হলে সভার জন্য টাকার আয়োজন হবে কোথা থেকে?

হালকা উত্তর দিলাম, বক্তৃতার জন্য যদি পাঁচ হাজার করে ধরেন, চকবাজার, মৌলবীবাজারে অনেক টাকাওয়ালা ব্যবসায়ী পাবেন, যারা আপনার সভায় বক্তৃতা করার জন্য আরও অধিক অর্থ দিতে প্রস্তুত।

তিনি হেসে উঠলেও কিছুটা বিব্রত বোধ করে বিষয়টি চাপা দিলেন। এভাবে বিভিন্ন সভা বা বৈঠকে আমার সঙ্গে ছোটখাটো বিষয়ে লেগে গেলেও তিনি ঐকান্তিকভাবেই চাইতেন, আমি উপস্থিত থাকলে যেন অবশ্যই বক্তব্য রাখি।

রমজান মাসে হোটেল শেরাটনে চিকিৎসকদের একটি সমিতি এরশাদ সাহেবের সম্বর্ধনার্থে ইফতার ও নৈশভোজের আয়োজন করেছে। তাদের একান্ত অনুরোধে আমাকেও যেতে হল। স্যারের সঙ্গে ডায়াসেও বসতে হল এবং তাঁরই ইচ্ছাকে সম্মান দিতে গিয়ে একটি মিঠে-কড়া বক্তৃতা দিতে হল। স্যার তাঁর বক্তব্যের মাঝে অহেতুক আমার অনেক প্রশংসা করলেন এবং বললেন, মোয়াজ্জেম এমন একজন ব্যক্তি যে আমার মুক্তির প্রশ্নে কারো সঙ্গে এক ইঞ্চিও আপস করতে সম্মত হয়নি। সেজন্যই তার উপর নির্যাতন, নিপীড়ন নেমে এসেছিল সর্বাধিক।

এমনি করে সুনামগঞ্জের বিশাল জনসভায় একটি বক্তৃতা শেষ করে উঠতেই তিনি আমাকে মাইকসহ বুকে জড়িয়ে গভীর উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছিলেন। জনতা তা সানন্দে উপভোগ করেছিল।

দলের বর্ধিত সভায় কয়েকটি বিষয় তুলে ধরার প্রয়াস পেলাম। প্রথমত, এটাকে রাজনৈতিক দলে রূপান্তরিত করতে হবে। এটা আর প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি রূপে চলতে পারে না। দলের সর্বস্তরে গণতান্ত্রিক কাঠামো তৈরি করতে হবে, কেবল মুখে নয়, বাস্তবে তার কার্যকারিতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

মনে পড়ল, শেখ শহীদ একবার প্রেসিডিয়ামের সভায় দলের গঠনতন্ত্র গণতন্ত্রায়নের দাবি জানালে এখান থেকে রিপোর্ট গেল এবং পরদিনই জেল থেকে চিরকুট এসে উপস্থিত, শেখ শহীদ যদি গণতন্ত্র আনতে চায়, সঙ্গে দল চালাবার অর্থও আনতে হবে।

এমনি মনোভাব নিয়ে একটি রাজনৈতিক দল চালান দুরূহ।

দ্বিতীয়ত, আত্মীয় তোষণ বন্ধ করতে হবে। স্ত্রী, বান্ধবী, বান্ধবীর বান্ধবী, ভাই-বোন, ভগ্নিপতির জন্যই যদি পার্টি হয় তা হলে সাধারণ কর্মীদের সুযোগ

কোথায়? এ বক্তব্যে তিনি হয়ত সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। কিন্তু সভা করতালিমুখর হল।

তৃতীয়ত, দলের সদস্য-সদস্যা কর্মকর্তাদের স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার দিতে হবে। তাদের কাজের যেমনি স্বাধীনতা দিতে হবে, তেমনি তাদেরকেও জবাবদিহিতার বন্ধনে আবদ্ধ করতে হবে।

চতুর্থত, দলের অভ্যন্তরে দুর্নীতি বন্ধ করতে হবে। দুটি নির্বাচনে আসা অর্থের বিলি-বণ্টনের হিসাব নিতে হবে এবং মনোনয়ন ঘাপলার অনুসন্ধান করে দোষীর শাস্তি বিধান করতে হবে। দলকে নিয়ে যার যা খুশি করার প্রবণতার অবসান ঘটাতে হবে।

পঞ্চমত এবং সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ—পার্টির রাজনীতি সঠিক পন্থায় নিতে হবে। নির্ধারিত করতে হবে আমরা ঘরের না ঘাটের! চেয়ারম্যান সাহেব বলেন, তিনি বিরোধী দল করেন। পক্ষান্তরে মহাসচিব সরকারের নীতি নির্ধারকদের একজন। ক্যাবিনেট মন্ত্রী। এই গোঁজামিলে দল ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে। এ অবস্থা অবিলম্বে নিস্পত্তি করতে হবে। সরকারের দুই নম্বর হয়ে থাকলে অচিরেই দলের অস্তিত্ব লোপ পাবে। দলের অন্যতম প্রধান ও বিজ্ঞ নেতা সাবেক স্পিকার শামসুল হুদা চৌধুরী যখন আওয়ামী লীগে যোগ দিলেন তাঁকে অনুযোগ করতেই বললেন, একই জিনিস। আমি মিজানেরটা না করে হাসিনারটা করছি। আওয়ামী রাজনীতিই যদি করতে হয়, হাসিনারটাই শ্রেয় নয় কী?

কথাটা অর্থবহ।

তিনি সব শুনলেন, চেহারা দেখে মনে হল সব কথা উপলব্ধি করলেন এবং সমাধান সময় সাপেক্ষ।

উপসংহারের বক্তব্যে অনেকগুলো বিষয়ই এড়িয়ে গেলেন। কেবল আমাকে দলীয় সাংগঠনিক কাজে জড়িয়ে ফেলার জন্য নিজেই প্রস্তাব করলেন, একটি সাংগঠনিক কমিটি দলকে নতুন করে গড়ে তুলবে এবং সেই কমিটির আহ্বায়ক হবেন শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেন।

সকলের তুমুল আনন্দ ধ্বনির মধ্যে আমি সরাসরি অস্বীকৃতি জানালাম। দলের সবচাইতে প্রয়োজনীয় নীতি নির্ধারণ ঝুলিয়ে রেখে, মূল সমস্যাসমূহ ধামা-চাপা দিয়ে আমাকে এক কমিটির আহ্বায়ক করে দিলেই দল সঠিক গতি পাবে, এটা ভাবা নিরর্থক। দলের প্রয়োজনে পরিশ্রমে দ্বিধা নেই, কিন্তু সমস্যার গভীরে প্রবেশ না করে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে না। তিনি অনেক অনুরোধ করেও আমাকে সম্মত করাতে পারলেন না।

বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছিল এশিয়াটিক প্রিন্টিং প্রেসের আঙ্গিনায়। এখান থেকেই 'দৈনিক জনতা' প্রকাশিত হয়। দু'দিনের সম্মেলন তৃতীয় দিন পর্যন্ত গড়াল। সেখানেই দ্বিতীয় আর একটি প্যান্ডেলে খাবারের আয়োজন। একই

টেবিলে জিনাত ও রওশনকে দু'পাশে বসিয়ে এরশাদ সাহেব যখন হাসিমুখে আহার গ্রহণ করছিলেন তখন দৃশ্যটি অনেকেরই সুখকর মনে হচ্ছিল না। বেগম রওশন এরশাদ মুখ ভার করেই আহার সমাধা করতেন।

পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল আকার ধারণ করছে বলে প্রতীয়মান হল। বরিশালের মনু আমাদের পুরনো বন্ধু। এরশাদের একজন ভক্ত। চিত্রনায়িকা সুচন্দা তার সহধর্মিণী। সে জানাল তার গাড়িটি চেয়ে নিয়ে নেতা জিনাতকে প্রদান করেছে। সবকিছু মিলিয়ে মনে হচ্ছিল শীঘ্রই কোন অঘটন ঘটতে যাচ্ছে।

এশিয়াটিক প্রেস বিল্ডিংয়ে এরশাদ সাহেবের একটি বসার ঘর রয়েছে। একদিন জিজ্ঞেস করলাম, স্যার, এই প্রেসটি কার?

তিনি আন্তরিকতার সঙ্গে বললেন, সত্যিই যদি জানতে চান, এটি আমার।

নাজিউরকে একই কথা জিজ্ঞেস করাতে সে স্পষ্ট উত্তর দিল, এটি আমার নিজস্ব।

বললাম, এরশাদ সাহেব তো বললেন এটি তাঁর। তুমি কী করে মালিকানা দাবি করছ?

বলল, তিনি বললেই তো হবে না, এটি আমার নিজস্ব সম্পত্তি।

এ নিয়ে আর বাদানুবাদে উৎসাহ পাচ্ছিলাম না। তবে মনে হল, অর্থ ও স্বার্থের সংঘাতে বন্ধুত্বের সুদৃঢ় প্রাচীরেও ফাটল ধরে!

ঢাকা মহানগরীতে একটি বৃহৎ সমাবেশ করার প্রয়োজনীয়তা সকলেই উপলব্ধি করছিল। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হল সমাবেশ করা হবে এবং বাংলাদেশের প্রতিটি অঞ্চল থেকে মানুষজনকে আহ্বান করে সেটিকে একটি মহাসমাবেশে রূপ দেওয়া হবে। মানুষের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনাও প্রচুর।

আমরা সমাবেশকে সফল করে তুলবার জন্য নিরলসভাবে কাজে ব্যাপৃত হলাম। পোস্টার-লিফলেট সর্বত্র প্রেরণের ব্যবস্থা নেওয়া হল। নানা রঙের পোস্টার-ফেস্টুনে এরশাদ সাহেবের ছবি সম্বলিত করে চারদিক ছেয়ে ফেললাম। আয়োজন এবং সাড়া যা প্রত্যক্ষ করলাম, মনে হল সর্ববৃহৎ সমাবেশ সেদিন ঢাকার মানিক মিয়া এভিনিউতে অনুষ্ঠিত হবে।

হলও তা-ই। সমাবেশের দিন প্রায় প্রতিটি অঞ্চল থেকে সব রকম

যানবাহন অবলম্বন করে লক্ষ লক্ষ মানুষ ঢাকার এই মহাসম্মেলনে এসে উপস্থিত হল। আমাদের মন আনন্দে নেচে উঠল। আমরা জনগণের এই সমর্থন ও ভালোবাসাকে মূলধন করে যদি কার্যক্ষেত্রে এগিয়ে যেতে পারি, সম্মুখে অবশ্যম্ভাবী সুদিন।

দুটি বৃহৎ দলের নেতৃত্বে দু'জন মহিলার অবস্থানজনিত কারণে দেশের এক বৃহৎ অংশ উন্মুখ হয়ে তাকিয়ে ছিল এরশাদের দিকে এবং তাঁর সমাবেশের সফলতার প্রতি। যদি একে আমরা সর্বতাভাবে সফলতায় পর্যবসিত করতে সক্ষম হই, তা হলে দু'দল থেকেই প্রচুর মানুষ আমাদের দলে চলে এসে এদিকের পাল্লা ভারি করবে। জাতীয়তাবাদী মুসলিম মনোভাবাপন্ন মানুষ মহিলা নেতৃত্ব পরিহার করে জাতীয় পার্টির পতাকাতলে সন্নিবেশিত হবে। বিএনপি'র একটি বিরাট অংশ, এমনকি আওয়ামী লীগেরও একটি অংশ যারা দলে উপেক্ষিত হচ্ছিল, মহিলা অনুশাসনে যাদের বিরূপতা নীরবে ব্যাপকতা লাভ করেছিল, তারা সকলেই এই সমাবেশের সফলতার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রেখেছিল। সবকিছু সুন্দরভাবে শেষ করতে পারলে সেই দিন থেকেই বাংলাদেশের রাজনীতির গতিধারা ভিন্নখাতে প্রবাহিত হত। কিন্তু কপাল মন্দ! 'সকলি গরল ভেল!' মানুষের মন্দসময় যখন ঘনিয়ে আসে তখন একটার পর একটা ভুল পথে পরিচালিত হয়।

সেদিনের মহাসমাবেশ ছিল ঐতিহাসিক। এত জনসমাগম আজ পর্যন্ত কোন দল সংগঠিত করতে সক্ষম হয়নি। মানিক মিয়া এভিনিউ ছাড়িয়ে পার্শ্ববর্তী সমস্ত এলাকা উপচে পড়ছে, লোকে-লোকারণ্য। তিল ধারণের স্থান নেই। কর্মীদের মধ্যে যারপরনাই আনন্দ উল্লাস। জাতীয় পার্টি আজ শুভক্ষণে এক নব যাত্রা শুরু করতে যাচ্ছে। কত যে মহিলারা সভায় এসেছে তার হিসাব নেই। সুবৃহৎ মঞ্চে দাঁড়িয়ে গর্বে-আনন্দে বুক ভরে উঠল। সকলেই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে নেতার আগমনের প্রত্যাশায়।

আমরা বলেছিলাম, পার্টির সকল সিনিয়ার নেতৃবৃন্দ একত্রে এরশাদ সাহেবকে নিয়ে মঞ্চে আসবে। কর্মীদেরও সেরকম ইচ্ছাই ছিল। কিন্তু এরশাদ সাহেব অন্য সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি বললেন, আপনারা সবাই পূর্বেই চলে যাবেন। আমি পৃথকভাবে যাব।

আমরা আর কথা বাড়ালাম না। সময় মতো আমরা সকলে এসে পড়লেও নেতার আসতে বিলম্ব হচ্ছে। সভাস্থল কানায় কানায় পূর্ণ। অঙ্গসংগঠনের প্রতিনিধিরা বক্তৃতা করবে তাই সভা শুরু করে দিলাম। অন্যতম সহ-সভাপতি আবদুল বারী ওয়ার্সীকে আপাতত সভাপতি নির্বাচিত করে সভা শুরু করা গেল। অঙ্গসংগঠনসমূহের প্রতিনিধিদের বক্তৃতা যখন মধ্য পথে, মহিলা পার্টির প্রতিনিধি যখন বক্তৃতা করছে তখন এরশাদ সাহেব তাঁর প্রিয় বান্ধবী সমভিব্যাহারে জনসভায় এসে উপস্থিত। পৃথক আসতে চাওয়ার মাজেজা

এতক্ষণে বোধগম্য হল। গগনবিদারী স্লোগানের মাঝে প্রেমিক জুটি মঞ্চে উঠে এল। বেগম রওশন এরশাদ পূর্বাহ্নেই এসে গেছেন। তাঁর মুখ কালো হয়ে গেল। এদের কোন বোধোদয় নেই। জনতার দিকে ঘুরে ঘুরে অভিনন্দন গ্রহণ করে তাঁরা মঞ্চের মাঝখানে জোড়-আসন গ্রহণ করলেন। জিনাত তাঁর গা ঘেঁষে বসল।

কত না তাঁদের আলাপ, কত না তাঁদের খুনসুটি! বেগম এরশাদ নীরবে উঠে এক পাশে দূরে চলে গেলেন। এরশাদ সাহেবের ডান পাশে আমি বসা। বাম পাশে তিনি। ডান পাশ মঞ্চের সম্মুখভাগ থেকে এক গাদা আলোক-চিত্রশিল্পী ওৎ পেতে আছে কী করে একটা জুৎসই ছবি তোলা যায়! সেদিকে তাদের দু'জনের একজনেরও খেয়াল নেই। লক্ষ লক্ষ লোকের সমাবেশ বেমালুম বিস্মৃত হয়ে তাঁরা কানে কানে একান্তে কত কী আলাপে ব্যস্ত। বিষয়টি বিসদৃশ ঠেকছিল। এক পাশ থেকে দেখলে এরশাদ সাহেব তাঁর বান্ধবীকে চুম্বন করছেন বলে ভ্রম হওয়া স্বাভাবিক। মঞ্চের নিচে ডান দিকে চেয়ারে আমাদের বিশিষ্ট নেতা-কর্মীরা বসা। তারা এসে বারবার নিবেদন করছিল, ভাই, মানুষ যা নয় তা-ই বলছে, ঐ মহিলাকে মঞ্চ থেকে হটিয়ে দিন।

অপারগতা প্রকাশ করে চুপ করে বসে রইলাম। কিন্তু যখন পত্রিকার ফটোগ্রাফাররা একটা কাঙ্ক্ষিত পোজের ছবি তুলতে পেরে আনন্দিত হয়ে উঠছিল তখন আর সহ্য হল না। জানি তিনি বিরক্ত হবেন কিন্তু উপায় কী, আমি তাঁর সুহৃদ, তাঁর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। শক্ত কথাটা আমাকেই বলতে হবে। কানের কাছে মুখ নিয়ে বললাম, স্যার, কথা বলার কী আপনার স্থানের অভাব? সময় কী পালিয়ে যাচ্ছে, না সে পালিয়ে যাচ্ছে? এখন দয়া করে কথা বন্ধ করুন। দেখছেন না ওরা ক্যামেরা নিয়ে হুমড়ি খেয়ে আছে!

তিনি বললেন, আপনি বড্ড বেরসিক!

দয়া করে কথা বন্ধ করুন। আর আমি আপনাদের দু'জনার মাঝখানে এখন বসতে চাই। একজন মাঝে থাকলে ছবির অপব্যাখ্যা হতে পারবে না।

তিনি বেশ রাগান্বিত হলেন বলে মনে হল। আমাকে মুখে কিছু বললেন না। অন্য পন্থা খুঁজে বের করলেন। মহাসচিবকে ডেকে এনে বললেন, মঞ্জু, আপনি আমার ডান পাশে বসুন।

ইঙ্গিতটি অত্যন্ত পরিষ্কার। ডান পাশে আমি বসছিলাম। আমি তাঁর কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ করেছি তাই আমি যেন উঠে গিয়ে জায়গা খালি করে দিই। মঞ্জুকে ডেকে বসতে বলে তিনি সুস্পষ্ট তা-ই বুঝিয়ে দিলেন।

আমি মনে বেশ আঘাত পেলেও স্বাভাবিকভাবেই উঠে দাঁড়াতে গেলাম এবং মঞ্জুকে বললাম, তুমি এখানটায় বসো।

মঞ্জু দাঁড়িয়ে ছিল। সে উপর থেকে আমার কাঁধ চেপে ধরে বলল, মঞ্জুর

যত বড় দোষই থাক, সে বেয়াদপ না। মোয়াজ্জেম ভাই উঠে গিয়ে জায়গা করে দেবে আর আমি গিয়ে সেখানে বসব এটা হতেই পারে না। আমি তাঁর পাশে বসতে পারি।

একথা বলে সে আমার ডান পাশে বসে পড়ল। এরশাদ সাহেব সব শুনে এবং বুঝে নিশ্চুপ থাকতে বাধ্য হলেন। আমার অত্যন্ত খারাপ লাগছিল। সভার অবশিষ্ট সময় আমি সর্বক্ষণ অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে রইলাম। কিছু দেখব না, প্রতিক্রিয়াও হবে না। কিন্তু অনিষ্ট যা হবার তা ইতিমধ্যে হয়ে গিয়েছে। ছবি যথেষ্ট তোলা হয়েছে। একটি পত্রিকায় পরদিন ছবি প্রকাশিত হল নিভৃত আলাপরত কপোত-কপোতীর। দেখে মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে, একজন আরেকজনের মুখচন্দ্রিমা চুম্বন করতে যাচ্ছে।

এ তো গেল এক দিক। কর্মীরা সকলে তাদের নেতার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত থাকলেও তারা মঞ্চের এই প্রকাশ্য অবিমৃশ্যকারিতা মেনে নিতে পারছিল না। তারা বেশ শব্দ করেই তাদের প্রতিবাদ জানান দিচ্ছিল। কেউ কেউ অত্যন্ত কটু বাক্যও ব্যবহার করছিল। মঞ্চের উপর এক কর্মী এসে আমাকে বলল, ভাই, আমি ওকে জোর করে নামিয়ে দিই?

আমি কোন প্রতিউত্তর করলাম না। শেষ পর্যন্ত সব দোষ হবে আমার। যত দোষ নন্দ ঘোষ!

এসব তপ্ত বাক্য কিছু কিছু যে নেতার কর্ণকুহরে প্রবেশ করছিল না, তা নয়। আমি যতটুকু জানি, তাঁর মতো একজন বুদ্ধিমান লোকের কাছে কিছুই গোপন করা যায় না। তবুও কোন প্রতিক্রিয়া নেই। কানে দিয়েছি তুলো, পিঠ করেছি কুলো—এই অবস্থা। মানুষ বলে, একবার নাক কাটলে লোকে বনে যায় আর বারবার নাক কাটলে সে লোকালয়ে চরে বেড়ায়।

এরশাদ সাহেবের বিষয়টিও প্রায় তা-ই। প্রেম অনেকেই করে। পরকীয়াও করে। কিন্তু তা নিয়ে কেউ ঢাক-ঢোল পিটায় না। তার কি প্রয়োজন ছিল সাংবাদিকদের ডেকে বলার, ওর সাথে আমার চৌদ্দ বছরের সম্পর্ক। এ সম্পর্ক কি আর খুলে বলতে হয় না। প্রেমে বড়াই করে নাকি ভিন্ন স্বাদ পাওয়া যায়। একবার এক দীর্ঘ কবিতা লিখে ফেললেন, 'হে রমণী তোমার জন্য'। হেন কথা নেই যা তার মধ্যে নেই। কথাটি এক বিশেষ অর্থবহ। সকলে চেপে ধরতে বলে দিলেন, মাকে নিয়ে লিখেছি।

কেবল কপটাচারই নয়, অত্যন্ত গর্হিত অভিব্যক্তি। কেন যে এসব করেন! তাই সভায় বসে তিনি কি করছেন, কেন করছেন এবং এ নিয়ে জনমনে প্রতিক্রিয়া কি দাঁড়াবে সে সম্বন্ধে তিনি উদাসীন। তিনি না হয় মজে আছেন, কিন্তু আমরা যারা তাঁর দল করি, তারা চিন্তিত না হয়ে পারি না।

সভায় আরও একটা কাজ করেছেন। হয়ত ফলাফল চিন্তা না করেই তা করেছেন। কিছুক্ষণ পর পরই উঠে একবার করে মঞ্চের সম্মুখে ডাইনে ও

বাঁয়ে ঘুরে ঘুরে জনতাকে অভিবাদন জানান। তাদের অভিবাদনের জবাব দেন। ফুল, মালা যা কিছু ওরা দূর থেকে ভালোবেসে ছুঁড়ে মারে তা ধরার চেষ্টা করেন। সমস্ত শ্রোতৃমণ্ডলীর মনোযোগ সে দিকেই চলে যায়। বক্তা কি বলছে কেউ শোনেও না। সিরিয়াস বক্তারা অত্যন্ত বিরক্ত বোধ করে এবং বলে, স্যারকে বসান, বক্তৃতা করা যাচ্ছে না। এত মানুষ দেখে তাঁর ভাবাবেগের মাত্রা একটু বেশি।

একটা ঘটনা, খুবই ছোট বলে প্রতীয়মান হবে কিন্তু আর একজনের প্রভাব চিন্তা করলে ক্ষুদ্র ভাবা যায় না। মহিলা পার্টির প্রতিনিধি ছিল জিনাতের মনোনীতা। সকলের নিদারুণ অপছন্দের। মূল বক্তৃতার তালিকায় মহিলা সম্পাদিকা মিসেস আমেনা বারীর নাম ছিল। পরে জিনাত নাম পরিবর্তন করিয়েছে। স্যার এবং সে যখন মঞ্চে আসে তখন সেই মহিলা বক্তৃতা করছিল। তাদের আগমনের জন্য বক্তৃতা সংক্ষেপ করে বসে যেতে হয়। সে এক ফাঁকে জিনাতের কাছে দরবার করল, আপনারা তো শুনলেন না, আমাকে আবার সুযোগ দেন।

জিনাত তা-ই নির্দেশ করল। এরশাদ সাহেব প্রথমবার বললেন, একজন দু'বার বক্তৃতা করে কী প্রকারে?

সে বলল, সেসব জানি না। ওকে আবার সুযোগ দাও।

তা-ই করা হল। অবাক বিস্ময়ে সেই অখাদ্য বক্তৃতা দু'বার করে শুনতে হল।

আমার যখন পালা এল, তিন বার বাধা এল এরশাদ সাহেবের কারণে। তিনি অতিরিক্ত উল্লাসে বারবার ছুটে যাচ্ছেন মঞ্চের ধারে উৎসাহী জনগণের সাথে হাত মিলাতে। এরকম পরিবেশে বক্তৃতা করা কঠিন। তবুও অত্যন্ত কড়া ভাষায় সরকারের 'দাদা নমস্কার' সুলভ পররাষ্ট্র নীতির সমালোচনা করে বললাম, আমরা পিণ্ডি ছেড়ে চলে এসেছি, দিল্লী আঁকড়ে ধরার জন্য নয়। যারা রক্ত দিয়ে দেশ স্বাধীন করতে জানে তারা তা রক্ষাও করতে পারবে। প্রধানমন্ত্রী দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের অংশীদার নয়, তার পক্ষে স্বাধীনতার মর্ম বুঝা কঠিন। ভারত তোষণ নীতি আওয়ামী লীগের জন্য বুমেরাং হবে, কঠোর ভাষায় তা বলতে দ্বিধা করলাম না।

আমার বক্তৃতার বিষয়বস্তু উপলব্ধি করে নাজিউর রহমান মোটেই সন্তুষ্ট হতে পারছিল না। কিন্তু আমাকে কিছু বলার বা বাধা দেওয়ার প্রশ্নই আসে না। তেমনি পরিস্থিতির উদয় হলে সেটা হবে তার জন্য মারাত্মক পরিণতির সূচনা। সে নীরবে সব হজম করে গেল। প্রধানমন্ত্রী যদিও বলে, রেহানা ছাড়া আমার কোন আত্মীয় নেই এদেশে। তবুও অনেকেই নিজেকে তার আত্মীয় পরিচয় দিয়ে গৌরবান্বিত বোধ করে। 'আমি কি হনু রে' ভাবে। আমাদের নাজিউর, শেখ মণির ছোট বোনকে বিয়ে করার সুবাদে তার ফুপাত বোনের

স্বামী। আত্মীয় তো বটেই। কিন্তু রাজনীতি যেখানে বাপ-বেটা মানে না, সেখানে এই আত্মীয়তার রেশ ধরে সরকারি দলের তাঁবেদারী করার চাইতে হীনম্মন্যতা আর কি হতে পারে। কৃতজ্ঞতাও রয়েছে, একটি মামলায় তার শাস্তি হয়েছিল অনুপস্থিতিতে। বিচার এড়াতে সে তখন ভারতে আত্মগোপন করেছিল। তত্ত্বাবধায়ক সরকার হলে সে এসে আত্মসমর্পণ করে এবং পরে হাসিনা ক্ষমতায় বসে তার শাস্তি মওকুফ করে মুক্ত করে দেয়।

আমার পরের বক্তা কাজী জাফর। সে যথারীতি আওয়ামী লীগ সরকার ও ভারত-বিরোধী বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করলেই নাজিউর আর নিজেকে সংবরণ করতে পারে না। এতক্ষণ কিছু বলতে না পেরে সে বোধহয় গোস্বায় ফুঁসছিল। হাসিনা আপার বিরুদ্ধে কিছু বলা চলবে না, আওয়ামী লীগ এবং ভারতের বিরুদ্ধে কিছু বলা চলবে না—বলতে বলতে সে তার বিরাট দেহ নিয়ে কুংফু স্টাইলে কাজী জাফরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিল, ঘুষি, ধাক্কা মেরে কাজী জাফরকে মাইক থেকে ফেলে দিয়ে মুহূর্তের মধ্যে জাতীয় পার্টির ইতিহাসের জঘন্যতম অপরাধ করে বসল। এমন ঘটনা যে ঘটতে পারে আমাদের কল্পনার ত্রিসীমানায় তা আসেনি। কোটি টাকা ব্যয় করে যে বিরাট রাজনৈতিক সাফল্য ঘরে তোলার আয়োজন প্রায় সম্পন্ন, সে সময় এমন উন্মাদ কে আছে যে সম্পূর্ণ পরিবেশ নষ্ট করে দিয়ে দলের পৃষ্ঠে এত বড় ছুরিকাঘাত করতে পারে! দলকে যে ভালোবাসে, দলের মঙ্গল চায়, তার পক্ষে কখনওই এটা সম্ভব হবে না। আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে কথা বলায় জাতীয় পার্টির একজন নেতা আর একজন বয়োজ্যেষ্ঠ নেতাকে আক্রমণ করে বসতে পারে ভাবা যায় না। সমাবেশের মানুষজন প্রথমে কিছুই বুঝে উঠতে পারেনি। কিন্তু যখন বুঝল ভারত-বিরোধী বক্তব্যের জন্য কাজী জাফরকে মারা হচ্ছে, তারা চিৎকার করে প্রতিবাদ করে উঠল। কয়েক মুহূর্ত মঞ্চের প্রতিটি মানুষ স্তম্ভিত হয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিল। পরক্ষণেই তারা দু'জনকে দু'দিকে টেনে সরিয়ে নিয়ে গেল। আক্রমণে জাফর বিধ্বস্ত, তার পাঞ্জাবি ছিঁড়ে গেছে। সমস্ত সভা জুড়ে তখন হৈচৈ চলছে। মানুষ বুঝে বা না বুঝেই চিৎকার করছে। কর্মীরা সব শেষ হয়ে গেল বলে হায় আফসোস করতে থাকল।

পরিস্থিতি সামাল দিতে এরশাদ সাহেব মাইকে এসে দাঁড়িয়ে বক্তব্য রাখতে শুরু করলেন। এরশাদ সাহেবের একটা সময়োচিত প্রচণ্ড ধমক দেবার প্রয়োজন ছিল এবং তাঁর উপস্থিতিতে তার চোখের সম্মুখে যে ন্যক্কারজনক ঘটনা ঘটে গেল তার জন্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার ঘোষণা দেওয়ার যে জরুরি প্রয়োজনীয়তা ছিল সেসব দিকে না গিয়ে তিনি তাঁর পূর্ব প্রস্তুতকৃত বক্তৃতা করতে থাকলেন। সভার তিনিই ছিলেন প্রধানতম আকর্ষণ। তাই কিছুটা শৃঙ্খলা ফিরে এলেও সর্বত্রই জল্পনা-কল্পনা চলছিল। কি হয়েছে, মঞ্চে

কি ঘটেছে জানার জন্য সকল মানুষ উদগ্রীব। কোন প্রকারে এরশাদ সাহেব বক্তৃতা শেষ করলেন।

কী ভেবেছিলাম আর কী হয়ে গেল! রাগে-দুঃখে নিজের চুল ছিঁড়তে ইচ্ছা করছিল। প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত মানুষের সম্মুখ থেকে গরম খাবারের থালা কেউ নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলে মানুষটির যে অভিব্যক্তি হবে আমাদেরও তা-ই হচ্ছিল। কাজী জাফর প্রধানমন্ত্রী ছিল। ছাত্রজীবন, শ্রমিক অঙ্গন এবং বাম রাজনীতিতে সে অনেকদিনের পরিচিত মুখ। এই মঞ্জুরাই তাকে প্রধানমন্ত্রী বানিয়েছিল। দলের একজন সিনিয়র ভাইস-চেয়ারম্যান এবং প্রেসিডিয়াম সদস্য। তার এহেন হেনস্তা কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না। হোক না সে রাজনীতিক্ষেত্রে চিরদিন আমার বিপরীত ভাবধারার ধারক-বাহক, একজন রাজনৈতিক নেতার মর্যাদার প্রশ্নে যদি আমি দৃঢ়তার সাথে না দাঁড়াই সেটা হবে হীনম্মন্যতা। একজন রাজনীতিক হিসাবে সেটা হবে কর্তব্যের লঙ্ঘন।

নাজিউরকে রাগতস্বরে বললাম, সভামঞ্চে তুমি যে অমার্জনীয় অপরাধ করেছ তার শাস্তি তুমি অবশ্যই পাবে। কিন্তু আজ এই বিরাট সফলতার পূর্ব মুহূর্তে পার্টির যে অপূরণীয় ক্ষতি তুমি করলে তার বিচার কোথায়, কিভাবে হবে জানি না!

এরশাদ সাহেব আমার তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বরে আকৃষ্ট হয়ে সব শুনলেন। কোন কথা বললেন না। জিনাতকে বাহুলগ্ন করে মঞ্চ থেকে নেমে চলে গেলেন। কর্মীদের একাংশ সে মহিলাকে আটকে ফেলার কথা ভেবেছিল এবং নেতার সঙ্গে যেতে দেবে না মনস্থ করেছিল সেটা টের পেয়ে তিনি অগণিত মানুষের মাঝখান দিয়ে তাকে আগলে নিরাপদে গাড়িতে নিয়ে তুললেন। সকলেই তাকিয়ে দেখল।

বাসায় পৌঁছার কিছুক্ষণের মধ্যে নাজিউর এসে উপস্থিত। ভাবলাম, সে হয়ত ক্ষমা চাইতে এসেছে। বললাম, প্রথমে তুমি জাফরের ওখানে যাও। সে ক্ষমা করলে অন্য প্রশ্ন বিবেচনা করা যাবে।

কিন্তু না। সে এসেছে জাফরকে দল থেকে বহিষ্কারের প্রস্তাব নিয়ে। কোন কোন মানুষের ধৃষ্টতার সীমা থাকে না। একে তো চুরি, তার উপর সিনা জুরি একেই বলে। নিজে গর্হিত অপরাধ করে অন্যকে দণ্ড দেওয়ার মানসিকতা দুর্বিনীত এইসব মানুষের পক্ষেই সম্ভব। তাকে বললাম, শাস্তি হবে তোমার। কেননা, অপরাধ করেছ তুমি।

সে আমাকে সঠিক মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ হয়েছিল। তার ধারণা ছিল এতদিন আমি কাজী জাফরের বিরুদ্ধাচরণ করে এসেছি। কখনও তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও বলেছি। তাই আজ যদি তাকে পার্টি থেকে বহিষ্কার করে দেওয়া হয় তাতে আমার সমর্থন থাকবে।

তাকে আমার মনোভাব সুস্পষ্ট করে জানিয়ে দিলাম। বললাম, শাস্তি যদি

কারো পেতে হয়, সে পাবে তুমি। এক্ষেত্রে কাজী জাফরকে স্পর্শ করলে আমি রুখে দাঁড়াব।

সে হতাশ হয়ে চলে গেল। আমি এরশাদ সাহেবকে টেলিফোন করে নাজিউরের দুরভিসন্ধির কথা বললাম। এও বললাম, তার সম্বন্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ দলের স্বার্থে অতীব প্রয়োজন।

তিনি কেবল শুনলেন, বললেন না।

একটু পরেই মিজান সাহেবের টেলিফোন। বললেন, তুমি এতদিন যা চেয়েছ, আজ তা-ই হতে যাচ্ছে। এই তো সময়! কাজী জাফরকে দল থেকে বের করে দাও।

একজন প্রবীণ রাজনীতিকের এ ধরনের হীনমানসিকতা দেখে খুবই দুঃখ পেলাম। বললাম, আপনি এ ধরনের কথা বলতে পারলেন! আপনার চোখের উপরে তাকে অপদস্থ করল। লক্ষ লক্ষ মানুষের সম্মুখে একজন প্রবীণ নেতা ও সাবেক প্রধানমন্ত্রীকে মারপিট করল। আপনি আর একজন প্রবীণ নেতা ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী হয়ে সে অপকর্ম সমর্থন করছেন?

সে বলল, রাজনীতিতে সবই চলে। তুমি সবদিক বিবেচনা না করেই ক্ষেপে রয়েছ।

বললাম, তা-ই যদি হয়, এই ধরনের রাজনীতি আমি মানতে পারি না। আমি এই প্রশ্নে কারো কথাই শুনব না। একজন রাজনৈতিক নেতার মর্যাদা যদি অন্যজন না দেখে তার রাজনীতি করা উচিত নয়।

রাগ করে টেলিফোন রেখে দিলাম।

কিছুক্ষণ পর কাজী জাফর টেলিফোন করে বলল, ভাই, ওরা আমাকে বহিষ্কার করেছে। কিন্তু আপনি যে ভূমিকা নিয়েছেন তার জন্য গর্বে আনন্দে আমার বুক ভরে যাচ্ছে। আপনি এতটা করবেন আমি ভাবতে পারিনি।

বললাম, ধৈর্য ধরুন, ঘাবড়াবেন না। যারা বহিষ্কার করেছে তারাই অতিশীঘ্র আপনার কাছে ক্ষমা চাইবে এবং বহিষ্কার আদেশ প্রত্যাহার করে নেবে। এই যুদ্ধের দায়িত্ব আমি নিলাম।

মফস্বলের অনেক নেতা-কর্মী অনেক রাত পর্যন্ত বাসায় এসে একই কথা বলল, ভাই কী হয়ে গেল! কোথায় আমরা নতুন সম্ভাবনার উজ্জ্বল আশা নিয়ে এলাকায় ফিরে যাব, সেখানে মহাসমাবেশে এসে দলকে সমাহিত করার দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে গেলাম! একটা বিহিত করুন।

তাদেরকে যতটা পারলাম সান্ত্বনা দিয়ে বিদায় করলাম। পরদিন প্রায় সমস্তটা সময় এ নিয়েই অতিবাহিত হল। সন্ধ্যায় ফল লাভ করা গেল। কাজী জাফর পুনরায় টেলিফোন করে আনন্দিত কণ্ঠে সংবাদ দিল, স্যার ও নাজিউর এসে বহিষ্কার আদেশ প্রত্যাহার করে নিয়েছে এবং নাজিউর ক্ষমা প্রার্থনা করেছে।

আপাতদৃষ্টিতে বিষয়টির সুরাহা হলেও দলের মধ্যে যে একটা দুরপনেয় অপশক্তি গড়ে উঠেছে তা উপলব্ধি করে চিন্তাগ্রস্ত হলাম। চেয়ারম্যান ও মহাসচিব তার হাতের পুতুল। এই ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের সঙ্গে কতদিন কীভাবে যুদ্ধ করা যাবে জানি না। বিশেষ করে রাজনীতির কূটচালের সঙ্গে যেখানে মিশে আছে একান্ত ব্যক্তিস্বার্থাশ্রয়ী সহনশীলতা ও অন্যান্য কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ না করে নীরবে সয়ে যাওয়ার সুবিধাভোগী মানসিকতা।

দলের বয়োজ্যেষ্ঠ নেতারা, মাঠ-কর্মীরা, অঙ্গসংগঠনের কর্মকর্তারা সকলেই দুশ্চিন্তার ছাপ নিয়ে দেখা করতে আসে। পার্টির ভবিষ্যত নিয়ে দুর্ভাবনা প্রকাশ করে এবং একটা কিছু করার তাগিদ দিয়ে বিদায় নেয়। কেউ কেউ বলে, আপনারা দলের প্রতিষ্ঠাতা নেতৃবৃন্দ, পার্টি এক মহিলার কারণে ধীরে ধীরে নিঃশেষ হয়ে যাবে এটা কী করে বসে বসে অবলোকন করছেন? বিবেক তাড়না দেয় না?

সবই বুঝি! এরশাদ সাহেবকে ছাড়া যেমন দলের চিন্তা করা যায় না, তেমনি তাঁকে ঐ মহিলার মোহজাল ছিন্ন করে বাইরে আনা কল্পনা করা যায় না। চেষ্টা করেছি বিভিন্নভাবে। কিন্তু তাঁর সোজা উত্তর, ওকে ছাড়া আমি বাঁচব না।

বলেছি, তা হলে সম্পর্ক বৈধ করে নিন। আমরা ব্যবস্থা করছি। মোশাররফ সাহেব তাকে পরিত্যাগ করলে আপনি বিয়ে করুন। মানুষ প্রথম প্রথম উপহাস করলেও পরে বুঝবে কাজটি ভালো হয়েছে। অবৈধ সম্পর্ককে বৈধ করে নেওয়ার জন্য তারা সাধুবাদ দেবে।

তিনি বলতেন, দেখি, হয়ত তা-ই করতে হবে।

কিন্তু আর এগুতেন না। তবে কী ভিন্ন স্বাদের পরকীয়ায় অধিকতর আকর্ষণ!

একদল কর্মী মরিয়া হয়ে উঠেছে, কোন অঘটন ঘটে যেতে পারে এই ইঙ্গিত করতে তিনি জানিয়ে দিলেন, তেমন কিছু ঘটলে আমি দল পরিত্যাগ করে, রাজনীতি পরিহার করে চিরতরে দূরে সরে যাব।

কী করা যায় ভেবে কূল-কিনারা পাই না। চেয়ারম্যানের এই অবস্থা! মহাসচিব মনোযোগ দিয়ে মন্ত্রিত্ব করছে। যমুনা সেতু নিয়ে আছে। হাসিনার সন্তুষ্টিই তার ধ্যান-জ্ঞান। কর্মীরা গিয়ে হম্বিতম্বি করলে নগদ নারায়ণে তাদেরকে সন্তুষ্ট করে বিদায় দেয়। দলের মূল চাবিকাঠি দলীয় গঠনতন্ত্র বহির্ভূত পদে আসীন অতিরিক্ত মহাসচিব নাজিউরের হাতে। মিজান সাহেব এবং কাজী জাফরের নিকট লোকজন প্রতিনিয়ত একই বার্তা নিয়ে আনাগোনা করে। সময় বয়ে যায়। কিন্তু আমরা কেউ কিছু করছি না। অন্তরে তাড়না অনুভব করলেও তার বাস্তব পরিণতি নেই। তাছাড়া সম্পর্ক

এমন দাঁড়িয়েছে যে, মিজান সাহেবের সঙ্গে আমার স্বাভাবিক কথাবার্তাও প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

আমরা রাজনীতি করি। ভালো করি, মন্দ করি এর মধ্যেই আমার জীবন অতিবাহিত হয়েছে। একে উপেক্ষা করে বেঁকে থাকা সম্ভব নয়। কাজী জাফর প্রস্তাব নিয়ে এল, চলুন মিজান সাহেবের সঙ্গে দেখা করে একটা সম্মিলিত প্রচেষ্টা গ্রহণ করি।

আমার প্রভূত ক্ষোভ ছিল লোকটির উপর। বুঝতে পেরে কুশলী জাফর বলল, ব্যক্তিগত অনুভূতির অধিক মূল্য না দিয়ে সামগ্রিক স্বার্থ দেখতে হবে ভাই! সমগ্র জীবন অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করে এখন কী মুখ থুবড়ে পড়ে থাকবেন?

আত্মশ্লাঘায় আঘাত লাগল। উঠে বসলাম। বললাম, মিজান সাহেব বয়সে বড়। সে যদি সম্মত হয় একত্রে বসতে আমি তার বাসস্থানে যেতে রাজি।

ইতিমধ্যে বিভিন্ন প্রশ্নে এরশাদ সাহেবের সঙ্গে মতানৈক্য হয়ে তাঁর সঙ্গে মিজান সাহেবের যোগাযোগ ও কথাবার্তা বন্ধ। আমার বাসা থেকেই মামুকে টেলিফোন করল জাফর সাহেব। কোন্ রিশতায় তার জন্মদাতার শ্যালক হয় জানি না। কিন্তু এভাবেই সে তাকে সম্বোধন করে থাকে। মিজান সাহেব প্রস্তাবের সম্ভাবনায় উজ্জীবিত হয়ে উঠলেও বলল, শাহ্‌কে নিয়েই ভাবনা! সে কি করবে বুঝা কঠিন। এরশাদ সাহেবের সঙ্গে তার সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়।

জাফর বলল, আমি শাহ্ সাহেবকে সবসময় ভুল বুঝে এসেছি। প্রয়োজনে সে অত্যন্ত অনড় অবস্থান গ্রহণ করবে এ দৃঢ় বিশ্বাস আমার রয়েছে।

মিজান সাহেব বলল, ঠিক আছে। আজ বিকেলেই তোমরা আস। একটা হেস্ত-নেস্ত হওয়া খুবই প্রয়োজন।

সন্ধ্যায় জাফর আমাকে সঙ্গে করে তার বনানীর বাসায় নিয়ে গেল। সে স্বাভাবিক হৃদ্যতায় আমাকে গ্রহণ করতে আমিও অতীতের সব কথা ভুলে গিয়ে পুনরায় পূর্ব-সম্পর্কে প্রত্যাবর্তন করলাম। অনেক আলোচনা হল। তারা দু'জনই মত প্রকাশ করল, এরশাদ সাহেব সংশোধনের বাইরে চলে গিয়েছেন। নিজেদের রাজনীতির এবং ভবিষ্যতের স্বার্থেই আমাদেরকে এই মুহূর্তে একটি সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। এটিই সঠিক সময়।

আমি ইতস্তত করছিলাম। একদিন এরশাদ সাহেবকে নিয়েই নিজেদের রাজনৈতিক দলের বিলোপ সাধন করে তাঁর সঙ্গে একত্রে রাজনীতি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। আজ তাঁকে ছেড়ে যেতে কষ্ট হয়। মানুষ মাত্রই দোষে-গুণে সমাচ্ছন্ন। আমি প্রস্তাব করলাম, আমরা তিন জন এই পার্টির 'হেভী ওয়েট' প্রবীণ নেতা, দলের প্রতিষ্ঠাতাও বটে। চলুন আমরা তিন জন একবার একসঙ্গে এরশাদ সাহেবের নিকট যাই। গিয়ে দরজা বন্ধ করে তাঁর

মোকাবেলা করি। আপনারা কথা বলতে না চাইলে বলবেন না। কথা যা বলার আমি বলব। আপনারা তা সমর্থন করবেন।

মিজান সাহেব তখনও জায়নামাজে বসা। মাথায় টুপি, হাতে তসবিহ্। বলে উঠল, বারো কোটি লোকও যদি এরশাদের কথা বলে, এই মুখ দিয়ে আর তাঁর নাম উচ্চারণ হবে না।

সে উত্তেজিত হয়ে উঠে পবিত্র কোরান এনে শপথ করতে চায়, এরশাদের সান্নিধ্যে সে আর কোনদিন যাবে না। কাজী জাফর তার বহিস্কারজনিত কারণে পূর্ব থেকেই বিক্ষুব্ধ। সেও আমার প্রস্তাব সমর্থন করল না। বাধ্য হয়ে বললাম, ঠিক আছে, আপনারা দু'জন যখন একমত আমি আপনাদের মতেই মত দিলাম। বলুন কী করতে চান!

তখন অনেক আলোচনা করে সিদ্ধান্ত হল আমাদের বক্তব্য লিখিত আকারে আমরা তাঁর নিকট প্রেরণ করব। তিনি যদি সেসব গ্রহণ করেন তা হলে উত্তম। আর সেগুলো তাঁর নিকট গ্রহণযোগ্য না হলে আমরা কাউন্সিল অধিবেশন আহ্বান করে দলের ভবিষ্যত কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করব। স্বাক্ষরের উদ্দেশে একটি খসড়া বিবৃতি দাঁড় করান গেল। বক্তব্যের মধ্যে সুস্পষ্ট ভাষায় বলা হল, দলের রাজনীতিকে স্বচ্ছ করতে হবে। দলের সিদ্ধান্তের বহির্ভূত মহাসচিবের আওয়ামী লীগ সরকারের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ সম্পূর্ণ অবৈধ। তথাকথিত ঐকমত্যের নামে সরকারে যোগদানপূর্বক মহাসচিব পার্টিকে সরকারের লেজুড়ে পরিণত করেছে। অবিলম্বে তাকে সরকার থেকে বের হয়ে আসতে হবে নতুবা দলের মহাসচিবের পদ থেকে তাকে অব্যাহতি দিতে হবে।

দ্বিতীয়ত, পার্টি চেয়ারম্যানের নারীঘটিত বিষয়ের আশু অবসান ঘটতে হবে।

তৃতীয়ত, দলকে গণতান্ত্রিক কাঠামোয় দাঁড় করাতে হবে। গঠনতন্ত্র সংশোধন করতে হবে। দলের অভ্যন্তরে আত্মীয় তোষণ এবং নিজের স্ত্রী, ভ্রাতা, ভগ্নিপতি, বান্ধবী প্রভৃতির অনুপ্রবেশ রোধ করতে হবে।

চতুর্থত, গণমানুষের কল্যাণে দলকে একদলীয় শাসনের প্রবক্তা, চাঁদাবাজ, সন্ত্রাসী, নারী নির্যাতনকারী এবং সর্বক্ষেত্রে পরিপূর্ণ ব্যর্থ ও পরমুখাপেক্ষী এই সরকারের বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে অন্যান্য গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের সমন্বয়ে সংগ্রামের পথে পরিচালিত করতে হবে।

তিন নেতা এই অবস্থান নেওয়ার পূর্বে যথাসম্ভব প্রায় সকলের সঙ্গেই আমরা আলোচনা করেছি, প্রত্যেকেই আমাদেরকে এগিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছে এবং তারা এই বক্তব্যের সঙ্গে একাত্মতা ব্যক্ত করেছে। যেদিন বিবৃতি প্রস্তুত হল সেদিন দেখি ভিন্ন দৃশ্য। এরশাদ সাহেবের নিকট সব খবরাখবরই যথাসময়ে পৌঁছত। সে কিছু উদ্যোগ নিয়েছে, একদল কর্মী এসে আমাদের

অনুরোধ করছে আমরা যেন বিবৃতিতে স্বাক্ষর না করি। বললাম, বিবৃতি পড়ে দেখেছ? তার সঙ্গে কী তোমরা একমত নও?

বলে, সবটাই একমত, কিন্তু স্বাক্ষর করলেই দল দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে যাবে, এ কাজটি করবেন না।

বিরক্ত হয়ে বললাম, এ দল আমরা প্রতিষ্ঠা করেছি, এর ক্ষতিসাধন আমাদের উদ্দেশ্য হতে পারে না। আমাদের উত্থাপিত বিষয়সমূহ যদি গ্রহণযোগ্য হয় এবং এরশাদ সাহেব সে সমস্ত মেনে নেন, তা হলে তাঁর এবং দলের উভয়েরই মঙ্গল হবে।

কিন্তু যাদেরকে প্রেরণ করা হয়েছে তারা যুক্তির পথে যেতে চায় না। তাদের আবদার, আপনারা বিবৃতি স্বাক্ষর করবেন না।

বললাম, তা হলে এরশাদ সাহেব যা করে চলেছেন তা নির্বিবাদে চলতে দেওয়ার তোমরা পক্ষপাতী? তোমরাই না বারবার সমস্যাগুলোর সমাধান চেয়েছ?

ওদের এক কথা, সই করবেন না, তা হলেই জাতীয় পার্টি বিভক্ত হয়ে যাবে।

কয়েকজন মহিলা এসে পা চেপে ধরতে অত্যন্ত কষ্ট পেলাম। অন্যায়ের প্রতিবিধান কামনা করতেও কত না বাধা। অনেক কষ্টে পা ছাড়িয়ে সেদিন চলে এলাম। পরদিন বিবৃতি স্বাক্ষরিত হয়ে এরশাদ সাহেবের নিকট যাবে এবং সমস্ত সংবাদপত্রসমূহেও যাবে।

বিকেলে বাসায় হঠাৎ নাজিউরের টেলিফোন এল—ভাই, আমি এবং চেয়ারম্যান সাহেব আজ রাতে আপনার সঙ্গে খাব।

বললাম, তোমার ভাবী বাসায় নেই। দেখি তাকে আনানো যায় কিনা। সে যদি আসতে পারে নিশ্চয়ই আনন্দের সঙ্গে এক সাথে খাব। আমি তোমাকে কিছুক্ষণের মধ্যেই টেলিফোনে জানাচ্ছি।

সালেহা তার ভাইয়ের বাসায় গিয়েছে, তাদের ফোন নষ্ট। তাকে পেলাম না। মিজান সাহেব এবং জাফরকে টেলিফোন করে বলতেই তারা পরামর্শ দিল এক্ষুণি বাসা ছেড়ে চলে যাওয়া শ্রেয়, ওরা চলে এল বলে। কোন অবস্থাতেই এরশাদের ফাঁদে পা দেওয়া যাবে না।

এই দু'জনের সঙ্গে তখন একযোগে কাজের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাদের পরামর্শ গ্রহণ করলাম। নাজিউরকে টেলিফোনে বলে দেব, আজ হচ্ছে না, অন্য কোন সময়।

টেলিফোন করতেই ওর ব্যক্তিগত সহকারী বলল, সাহেব তো চেয়ারম্যান সাহেবকে নিয়ে আপনার বাসার উদ্দেশেই রওয়ানা হয়ে গেলেন।

লুঙ্গি-ফতুয়া পড়া অবস্থায় নিচে বসা ছিলাম। সিরাজগঞ্জ জাতীয় পার্টির

সভাপতি সৈয়দ হায়দার আলী ব্যতীত সে সময় আর কেউ ছিল না। তাকে বললাম, গাড়িতে উঠুন। পকেটে বাদাম খাবার পয়সা আছে তো?

সে কিছু না বুঝেই আমার সাথী হল। গাড়ি চালিয়ে সোজা সংসদ ভবনের উত্তর পাশে ক্রিসেন্ট লেকের পাড়ে গিয়ে গল্প-গুজব করে সময় কাটিয়ে দিলাম। পরে বাসায় এসে শুনলাম আমি বের হবার সামান্য পরেই এরশাদ সাহেব ও নাজিউর এসেছিল। আমাকে না পেয়ে তাঁরা চলে গিয়েছে। সৈয়দ সাহেবকে সব খুলে বলতেই সে অভিমত দিল, চেয়ারম্যান সাহেব মিজান চৌধুরী বা কাজী জাফরের বাসায় যায়নি বলেই তারা আপনাকে ভ্রান্ত পরামর্শ দিয়েছে। আপনার বাসা ছেড়ে চলে যাওয়া সঠিক হয়নি।

বললাম, তা না হয় হল, এরশাদ সাহেব কেন নিজে টেলিফোন করে এলেন না! নাজিউরের মুখে এরশাদ সাহেবের ঝাল চাখব কেন? তিনি এখনও আমাদের নেতা। আমার বাসায় আসবেন, এত ভণিতা কেন? রাতের খাবারের কথা বলে বিকেলে চলে এলেন কেন? তিনি যেমন ভুল করেছেন, তেমনি আমারও ভুল হয়ে গেল। একজনের ভুল আর একজনে সংক্রামিত হল। মাঝখানের দু'জনও ভুল পরামর্শ দিল। নাজিউরও টেলিফোন করেই ভুল করল। না হলে বাসায়ই থাকতাম। আমিও বাসায় না থেকে ভুল করলাম। এত ভুলের মাঝে সঠিক সিদ্ধান্ত আশা করা নিরর্থক।

সেদিনই আমাদের তিন নেতার বিবৃতি স্বাক্ষরিত হল। প্রথম স্বাক্ষর করল মিজান সাহেব, তারপর কাজী জাফর এবং পরে আমার স্বাক্ষর। কিছুদিন যাবৎ আমাদের তিন জনের ভিন্নমত পোষণ নিয়ে প্রায় সমস্ত পত্রপত্রিকায় লেখালেখি চলছিল। আমরা একটি সংবাদ সম্মেলন ডেকে বিবৃতিটি প্রকাশ করলাম। তিন নেতার মুখপাত্ররূপে আমাকে অধিকাংশ প্রশ্নের জবাব দিতে হল। আমাদের বিবৃতির রূপরেখার মধ্যেই মূলত আমরা সীমাবদ্ধ রইলাম।

রাজনৈতিক অঙ্গনে একটি বড় ধরনের চমক সৃষ্টি হল। পত্রপত্রিকায় মূল খবর তিন বিদ্রোহী নেতার বিবৃতি এবং তার পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ।। সাংবাদিকদের সে কী উৎসাহ! পার্টি দ্বিখণ্ডিত না হওয়া পর্যন্ত তারা বিশ্রাম নেবে না। প্রতিদিনই প্রতিটি কাগজে আমাদের ছবি এবং সংবাদ ছাপা হতে লাগল।

আর একবার বুঝা গেল, অধিকাংশ সংবাদপত্র জগতের মানুষ প্রকৃতই

এরশাদ বিরোধী এবং সে কারণে তারা জাতীয় পার্টিরও বন্ধু নয়। দেশের বতর্মান রাজনৈতিক আবহাওয়ায় নিরপেক্ষ সাংবাদিকতার বিষয়টি সুদূরপরাহত হয়ে পড়েছে। কেবল সংবাদিকতার ক্ষেত্রেই নয়, সমাজের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই দুটি প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী মতাদর্শ কাজ করছে। সরকারি কর্মকর্তা, চাকরিজীবী থেকে শুরু করে প্রায় সর্বত্রই কেউ আওয়ামী পন্থী, কেউ বিএনপি পন্থী। এই দুই বৃহৎ ভাগের বাইরেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভিমত বিরাজ করে। কিন্তু সেসব তেমন গুরুত্ব পায় না। এরশাদ সাহেবের দল ঐক্যবদ্ধ থাকলে এবং শক্তিশালী হলে তৃতীয় একটি ধারা সংযোজিত হবে। বৃহৎ দুই ধারার কারো নিকটই সেটি কাম্য নয়। তাই তারা কোমর বেঁধে নেমেছে যে করেই হোক তিন নেতার বিবৃতিকে মূলধন করে জাতীয় পার্টিতে একটি ধস নামিয়ে দিতে হবে। তারা বেশ উল্লসিত এবং অনেক সময় যা বলি না তাও আমাদের বক্তব্য হিসাবে ছাপিয়ে দিয়ে অনাকাঙ্ক্ষিত জটিলতার সৃষ্টি করে। সাংবাদিকগণ ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। জট খুলতে নয়, আরও কঠিন জট পাকাতে তারা সিদ্ধহস্ত।

এরশাদ সাহেব যদি তাৎক্ষণিকভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করতেন, ব্যক্তিগত মর্যাদার ভুয়া অহমিকায় না ভুগে যদি আমাদের ডাকতেন বা আমাদের বাড়িতে এসে উপস্থিত হতেন সমস্যা সমাধানের আশু ব্যবস্থা হয়ে যেত। একটি আপস হোক ব্যক্তিগতভাবে তা ছিল আমার ঐকান্তিক ইচ্ছা। কিন্তু দশচক্রে ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছা ভূলুণ্ঠিত হয়। তাছাড়া এরশাদ সাহেবের মর্যাদায় আঘাত লাগাও স্বাভাবিক।

অবশ্য নেতা হিসাবে এসব ক্ষুদ্র অহংবোধ অতিক্রম করা তাঁর উচিত ছিল। তাঁকে বিভ্রান্ত করার, উস্কে দেওয়ার লোকেরও অভাব ছিল না। মাথার উপর থেকে যদি তিন জন শীর্ষ নেতা খসে পড়ে মন্দ কি! বোঝা হালকা হয়ে যায়! তখন তারাই হবে স্থলাভিষিক্ত শীর্ষস্থানে আসীন। এরশাদ সাহেবকে আবার ভুল বুঝানো হল। চারদিকে ভুল, আর ভুল। মনে হয় জয়পুরের ভুল ভুলাইয়ায় চরকির মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

জাতীয় পার্টি থেকে কাজী জাফরকে দ্বিতীয়বার বহিষ্কার করা হল। এবার আর তার মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া নেই। বরং সে হেসে জবাব দিল, বহিষ্কার করলেই কি আর না করলেই বা কি আসে-যায়। আমরা তো চেয়ারম্যান সাহেবের কর্তৃত্বই চ্যালেঞ্জ করেছি।

সে তার বাসগৃহে একটি সংবাদ সম্মেলন ডেকে পূর্বাপর সম্পূর্ণ পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করল। কথা ছিল সে একাই সম্মেলনটি করবে। পরে মিজান সাহেব এবং আমি একমত হলাম যে তার বহিস্কারকে কেন্দ্র করে যে সম্মেলন, সেখানে একাত্মতা প্রকাশ করার জন্য হলেও আমাদেরও উপস্থিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। সম্মেলন চলাকালীন আমরা দু'জন সেখানে উপস্থিত

হওয়াতে কাজী জাফর খুবই গৌরবান্বিত বোধ করল। আমরাও কিছু কিছু প্রশ্নের জবাব দিলাম।

একজন সাংবাদিক বলল, নাজিউর এত কথা বলছে কেন?

বললাম, ওর পদটিই হচ্ছে অতিরিক্ত। অতিরিক্ত কথা সে বলবে না তো কে বলবে!

পরবর্তীতে আমরা তিন জন মিলে আরও দুটি বিবৃতি প্রদান করলাম। বিচ্ছিন্নতার আগ্রহ নিয়ে নয়, একটা সংশোধনী ও গঠনমূলক আবেদন নিয়ে আমরা পার্টির বৃহত্তর মঙ্গলের কামনায়ই এই অবস্থান নিয়েছিলাম। এরশাদ সাহেবের ক্যাম্পেও কেউ কেউ সদিচ্ছার উপর গুরুত্বারোপ করে একটা আপস মীমাংসার উদ্যোগ নেওয়ার কথা উত্থাপন করেছিল। কিন্তু কথায় বলে, ভালো করতে পারে না নবাবের ছেলে, কিন্তু মন্দ করতে পারে বাঁদীর ছেলেও।

মন্দ করার লোকের অভাব ছিল না। এরশাদ সাহেব তাদের বিভেদাত্মক পরামর্শ গ্রহণ করে নেতাসুলভ ধৈর্যের কিছুটা অভাবহীনতায় ভুগলেন। আমাদের বিরুদ্ধে কটাক্ষমূলক বক্তৃতা-বিবৃতি প্রদান করলেন। কাজটি তাঁর জন্য অসঙ্গত ছিল।

তবুও, একটি সমঝোতায় আসা অসম্ভব ছিল না। এরশাদ সাহেবের প্রতি আমার ব্যক্তিগত যে হৃদয়াবেগ ছিল, তাতে আমাকে তিনি হাত ধরলে আমি তাঁকে প্রত্যাখ্যান করতে পারতাম না। কিন্তু 'ব্যাটে-বলে' হল না।

তাঁর সঙ্গে এর মধ্যে সোনারগাঁও হোটেলে একবার দেখাও হল। সেদিন ছিল জাতীয় পার্টি ডেনমার্ক শাখার সভাপতি সোবহান চৌধুরীর বিয়ের অনুষ্ঠান। আমেরিকান বান্ধবীর সঙ্গে অনেকদিন থেকেই সে বেলজিয়ামে বসবাস করত। ধনী ও বিদুষী এই তরুণীর সহায়তায়ই সোবহান অনেকটা উন্নতি করেছে, সে আমাদের দলের ইউরোপ মহাদেশে সমন্বয়কারীও বটে। বিয়ে করতে ভাবী বধূকে নিয়ে ঢাকা এসেছে। আমার বাসায় এসে তারা সনির্বন্ধ অনুরোধ করে যায় তাদের বিয়েতে উপস্থিত থাকতে। এই ভাবি-দম্পতিকে আমি স্নেহ করি। তাই শামীম আল মামুন, আনোয়ার, সমিজ ও দুলালসহ সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলাম। মার্কিন তরুণীকে বধূবেশে বাংলাদেশী পোশাকে চমৎকার লাগছিল। তাদেরকে অনেক শুভাশিস ও অভিনন্দন জানিয়ে চলে আসছিলাম। কেননা, আমার একটি জরুরি বৈঠক ছিল। সোবহান আমাকে গাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিতে সঙ্গে এল। লিফটের সামনে এরশাদ সাহেবের সঙ্গে মুখোমুখি সাক্ষাৎ। তিনি উঠে এলেন আর আমি চলে যাচ্ছি!

আমি সালাম জানাতেই তিনি হাসিমুখে হাত মিলালেন এবং প্রত্যাভিবাদন করলেন। জিজ্ঞেস করলেন, কেমন আছেন মোয়াজ্জেম?

বললাম, স্যার, ভালো আছি। আপনি ভালো আছেন?

তিনি উত্তর করলেন, আমিও ভালোই আছি।

তখন যদি তিনি আমাকে না ছাড়তেন এবং হাত ধরা অবস্থাতেই সোবহানদের স্যুটে নিয়ে যেতেন আমার পক্ষে তাঁকে না বলা সম্ভব ছিল না। মনের দিক থেকে আমি তাঁর প্রতি দুর্বল ছিলাম। কিন্তু কেন জানি তিনি ততখানি সৎসাহস আয়ত্তে আনতে পারলেন না, যা দিয়ে অনায়াসেই আমাকে শান্ত করতে সক্ষম হতেন। এবং তা হলে সম্পূর্ণ বিষয়টিরই সুখকর নিষ্পত্তি হওয়া সম্ভব ছিল।

কিছু কিছু শুভানুধ্যায়ী সমঝোতার প্রচেষ্টা চালাতে আমি মুখপাত্র হিসাবে আলোচনার শর্তারোপ করলাম, আলোচনায় বসার পূর্বে কাজী জাফরের বহিষ্কার আদেশ প্রত্যাহার করতে হবে। পরদিন দুপুর দুটো পর্যন্ত সময় সীমা বেঁধে দিলাম। অন্য দুই নেতা এ নিয়ে কৌতুক করল, সময়সীমা বেঁধে দেওয়ার কারণ কী?

বললাম, ছাই ছাড়া ধরা যায় না এমন পিচ্ছিল জিনিসও আছে। কাজেই রশি আর বেশি প্রসারিত করতে চাই না।

আমার শর্ত পূরণ হল। পরদিন দ্বিপ্রহরের মধ্যেই দ্বিতীয়বারের বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহারপত্র আমাকে পাঠিয়ে দেওয়া হল। এবার আমি টেলিফোন করে কাজী জাফরকে সুসংবাদ দিলাম।

স্থির হল পরদিন রাতে আমরা তিন জন বারিধারাস্থ নাজিউর রহমানের বাসায় এরশাদ সাহেব, আনোয়ার হোসেন মঞ্জু এবং নাজিউর রহমান মঞ্জুর সঙ্গে আলোচনায় মিলিত হব।

যথাসময়ে আমরা নাজিউরের বাড়িতে গিয়ে পৌছলাম। এরশাদ সাহেব ও মহাসচিব পূর্ব থেকেই সেখানে উপস্থিত। নাজিউর আমাদেরকে অভ্যর্থনা করে দ্বিতলে নিয়ে গেলে সৌজন্য বিনিময়ের পর জিজ্ঞেস করলাম, স্যার, কেমন আছেন?

অভিমান ভরা কণ্ঠে তিনি জবাব দিলেন, ভালো থাকতে দিলেন কোথায়?

কথা বাড়ালাম না। আলোচনা আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হলে সবই বলা যাবে। আবহাওয়া, শারীরিক অবস্থা ইত্যাদি নিয়ে মামুলি কথাবার্তা হতে থাকল। মিজান সাহেব তার অসুস্থতার কথা জানালে এরশাদ সাহেব বলে উঠলেন, আমার আর মহাসচিবের এসব বালাই নেই।

মনে মনে ভাবলাম, বালাই যে কখন কার উপর কিভাবে উদয় হবে কেউ বলতে পারে না। এ নিয়ে আত্মতৃপ্তি স্থায়ী হয় না। চা, কোক, মিষ্টি নানা প্রকারের খাবারের প্রচুর আয়োজন। একসময় নাজিউর জাফরকে তার ছাদের সুইমিং পুল দেখাবার প্রস্তাব দিলে বললাম, জাফর সাহেব, সাবধান থাকবেন। নাজিউর আপনাকে ধাক্কা দিয়ে পানিতে ফেলেও দিতে পারে।

সকলেই হেসে উঠল। নাজিউর বলল, ভাই কোন ক্ষেত্রেই ছাড় দেবার পাত্র নন।

চায়ের পর্ব শেষ হতে বললাম, স্যার, আলোচনা শুরু করা যাক।

তিনি বললেন, অনেকদিন পর দেখা হল, আজ আলোচনা থাক। আজ কেবল খাওয়া-দাওয়া ও গল্পগুজব করব। আলোচনা অন্যদিন করলেই হবে। কী বলেন মিজান সাহেব?

মিজান সাহেব যেন প্রস্তুত হয়েই ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, সেই ভালো। আজ কেবল গল্পসল্পই করা যাক, আরেকদিন আলাপ করলেই হবে।

উভয়পক্ষের নাম্বার ওয়ান সম্মত হয়ে গেলে আর কিছু করার থাকে না। ভিতরে একটা কিছু আছে বলে সন্দেহ হল। প্রথমত, আমরা তাঁর নিকট গিয়েছি, আলোচনায় বসেছি, এটা তাঁর জন্য জমার অংক। খবরের কাগজে ছবি যাবে—সংবাদ যাবে, এরশাদ সাহেবের জন্য সেটি সুখকর বৈকি!

মিজান সাহেবের সঙ্গে কোন গোপন বুঝাপড়া হয়েছে কিনা বোধগম্য হল না। আলোচনা অন্যদিন হবে একথা এরশাদ সাহেবের মুখ থেকে নির্গত হতেই যেভাবে মিজান সাহেব তাকে লুফে নিল তাতে একটু দ্বিধার উদ্রেক বিচিত্র নয়। বিশেষ করে অন্য দু'জনের সাথে না বুঝেই আলোচনা সেদিনের মতো স্থগিত করা সঠিক হল না।

বললাম, আলোচনা যখন হচ্ছে না, তখন আর বসতে চাই না। আজ যাই। পরে আলোচনার তারিখ স্থির হলে আবার দেখা হবে।

এরশাদ সাহেব বললেন, একেবারে ঘোড়ার জ্বিন লাগিয়ে এসেছেন বলে মনে হচ্ছে। নাজিউর নৈশভোজের ব্যবস্থা করেছে, না খেয়ে যেতে পারবেন না।

নাজিউর বলল, হ্যাঁ, রাতের খাবার না খেয়ে যেতে দিচ্ছি না। আজ লঘু আলাপ-আলোচনার মধ্যেই আমরা সীমাবদ্ধ থাকি।

তা-ই হল। রাতে ডিনার সেরে যখন নামছি, হাসানউদ্দিন সরকার, ইসমাইল হোসেন বেঙ্গল প্রমুখকে দেখতে পেলাম উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। এরা সকলেই প্রথমদিকে আমাদেরকে উৎসাহিত করেছে। আজ তারা আমাদের সাথে নেই। বেঙ্গল অবশ্য ক'দিন পর আমার বাসায় গিয়ে আমার কাছে পূর্বাপর সবকিছু শুনে আমাদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে। হাসান অচিরেই ঐ ক্যাম্পের একজন প্রথম শ্রেণীর ব্যক্তি হয়ে ওঠে। অনেক পরে সে অবশ্য জাতীয় পার্টি পরিত্যাগ করে বিএনপি'তে যোগ দিয়ে তার রেকর্ড পূর্ণ করেছে।

একটা বিষয় এবার বেশ উপলব্ধি করলাম। মানুষের কথার মূল্য সবচাইতে কম। মৌখিক কথার তো কোন প্রশ্নই আসে না। লিখিত দিয়ে গেলেও তা অস্বীকার করতে বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ নেই। আমাদের এই তিন

নেতার বিদ্রোহের প্রক্রিয়া শুরু হবার পূর্বে যারা আমাদের সমর্থনের আশ্বাস দিয়েছে, যারা প্রচুর উৎসাহ-উদ্দীপনা প্রদর্শন করেছে, তাদের অধিকাংশই সময়ে কেটে পড়েছে। শুধু তা-ই নয়, বিপরীত ক্যাম্পে গিয়ে ভিড়েছে। তারা আমাদেরকে মাচায় উঠিয়ে দিয়ে মইটি নিয়ে সরে পড়েছে। মইটি নিয়ে তারা এরশাদ সাহেবের নিকট জমা দিয়েছে যাতে তাদেরকে যথাযথ পুরস্কৃত করা হয়। আমাদের তিন জনের নিকটই অনেকের একাত্মতা প্রকাশের স্বাক্ষরকৃত কাগজ রয়েছে। স্বাক্ষর বা কাগজ দিয়ে কী হবে, মানুষটিকেই যখন পেলাম না! না পাই, কিন্তু মানুষ চিনেছি এবার ঢের। এ ধরনের পরিস্থিতি না হলে মানুষের সত্যিকারের রূপটি অপ্রকাশিত থেকে যায়।

পরদিন সমস্ত পত্রপত্রিকায় সমাঝোতার সম্ভাবনার খবর ছাপা হল। এরশাদ সাহেবদের জন্য উভয়তই লাভ। সমঝোতা হলে তো কথাই নেই। না হলেও আমাদের সঙ্গে যারা আসবে চিন্তা করছিল তারা সিদ্ধান্তহীনতায় বা অনিশ্চয়তায় ভুগবে। এটা সে ক্যাম্পের জন্য সুবিধাজনক। তবুও ধৈর্য ধরা ছাড়া উপায়ান্তর দেখছি না। মিজান সাহেবকে সেদিন থেকে একটু গা-ছাড়া দেখছি। পূর্বে যেখানে অর্ধশায়িত থাকত, সেখানে এখন প্রায় তিন-চতুর্থাংশ শয্যাশায়ী। প্রভেদ শুধু এই, মহিলা পার্টির বয়স্ক সদস্যাদের নিয়মিত উপস্থিতি আর পূর্বের মতো নেই।

আমি ও জাফর কোন আলোচনায় আগ্রহী হলে জানায় শরীরটা ভালো যাচ্ছে না। পরে আলোচনা করা যাবে।

কবে?

তোমাদেরকে টেলিফোনে জানিয়ে দেব।

সে টেলিফোন আর আসে না। লোকমুখে শুনতে পাই দুই মঞ্জুর সঙ্গে নাকি গভীর রাতে আলোচনা হয়। অতিরিক্ত মঞ্জু নাকি এর মধ্যে এক রাতে একটি ব্রিফ্‌কেসসহ দেখাও করে গিয়েছে। সত্যি-মিথ্যা জানার উপায় নেই।

এদিকে এরশাদ সাহেব আদমজীতে সভায় গিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে বেশ উস্কানীমূলক বক্তব্য রেখেছেন। আমরা তার প্রতিবাদ করতেই জানালেন তিনি সেসব বলেননি। আমরা মেনে নিলাম। তিনি রংপুর গিয়ে দলীয় সভায় অত্যন্ত অশালীন ভাষায় বক্তব্য রাখলেন।

মিজান সাহেবকে বলতেই সে বলল, এরশাদ সাহেব হয়ত বলেনি। কাগজওয়ালারা এমন কত কিছু লেখে!

বললাম, আপনি যাচাই না করেই তার সাফাই গাইছেন কেন?

সে চুপ করে থাকে।

জাফর এবং আমি অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়ি। কাজী জাফর বলে, মামু বোধহয় আর একবার মহাজনি পন্থা অবলম্বন করে, দু'পয়সা হাতাবে।

বললাম, আপনার মামুর এটি আদি এবং অকৃত্রিম পন্থা। বেচারাকে করে খেতে দেবেন না!

আমাদেরকে অবাক করে দিয়ে, সারাদেশের রাজনৈতিক মহলকে বিস্মিত করে দিয়ে মিজান সাহেব আর একবার বাংলার ইতিহাসের খলনায়ক মীর জাফর আলী খাঁ'র ভূমিকা পালন করল। এরশাদের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করার বিষয়ে আমাদের উদ্বুদ্ধ করে, নিজে সবক'টি বিবৃতিতে প্রথম স্বাক্ষর রেখে, পবিত্র কোরানের শপথ উচ্চারণ করে, জায়নামাজে বসে মাথায় টুপি ও হাতে তসবিহ্ নিয়ে যে লোক শপথ করেছিল দেশের বারো কোটি মানুষও যদি এরশাদের পক্ষে যায় আমি তাঁর সঙ্গে যাব না, সেই লোকটিই বোধগম্য কারণে খুবই পরিতৃপ্ত হয়ে এরশাদ সাহেবকে তার বাসায় দাওয়াত করে নিয়ে এসে চর্বচোষ্য লেহ্য পেয় দ্বারা আপ্যায়ন করে তাঁর আনুগত্য গ্রহণ করে আমাদের সাথে আবদ্ধ চুক্তির পৃষ্ঠে ছুরিকাঘাত করল। বিশ্বাসঘাতকতার এত বড় দৃষ্টান্ত আমার জানা নেই। মিজান চৌধুরীর ছেলের বউ বলেছিল, সাক্ষাৎ পেলে সে ব্যক্তিগতভাবে এরশাদকে মুখের উপর অপমান করবে, সে পুত্রবধূই সেজেগুজে পরমানন্দে এরশাদের ভোজের সময় অন্ন-ব্যঞ্জনাদি পরিবেশন করে ধন্য হল।

মিজান সাহেবের এই আকস্মিক ভোল পাল্টানোয় আমরা কিছুটা বেকায়দায় পড়ে গেলেও অবস্থানে অনড় রইলাম। আমাদের বক্তব্য যদি ন্যায্য হয়, আমরা মাথা নত করব না এবং যত বাধা-বিপত্তিই আসুক না কেন, জাতির নিকট প্রদত্ত অঙ্গীকার আমরা পূরণ করব। দু'জনে কর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিলাম জাতীয় পার্টির কাউন্সিল অধিবেশন আহ্বান করতে হবে। পার্টির যুগ্ম-মহাসচিব শামীম আল মামুনকে আমরা দায়িত্ব অর্পণ করলাম ঢাকায় জাতীয় পার্টির প্রথম কাউন্সিল অধিবেশন আহ্বান করার জন্য। ইতিমধ্যে এরশাদ সাহেব আমাকে এবং কাজী জাফরকে দল থেকে বহিষ্কারের ঘোষণা দিলেন। আমার জন্য প্রথমবার হলেও কাজী জাফরের জন্য এটা তৃতীয় বহিষ্কার। পরিস্থিতি আমাদের বাধ্য করল একটি সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে পূর্বাপর সমস্ত অবস্থার ব্যাখ্যা দেওয়ার, কাউন্সিলের ঘোষণার পর আমাদেরকে তথাকথিত বহিষ্কারের আসারত্ব প্রমাণ করা, কাউন্সিল আহ্বানের যৌক্তিকতা তুলে ধরা, এরশাদ সাহেবের সমঝোতার নামে ছল-চাতুরির আশ্রয় নেওয়া এবং সর্বোপরি মিজান চৌধুরীর আকস্মিক ডিগবাজির অন্তর্নিহিত কারণ তুলে ধরা। ঢাকার হোটেল ঈসা খাঁ'তে কাজী জাফর এবং আমি সেই যৌথ সংবাদ সম্মেলন করলাম। সেদিন দ্বিপ্রহরে বেগম রওশন এরশাদ টেলিফোন করে বললেন, সংবাদ সম্মেলনটি স্থগিত করা যায় না! আমি একবার শেষ চেষ্টা করে দেখি।

পরক্ষণে নিজেই বললেন, অবশ্য আপনাদেরকে বহিষ্কার করার পর সংবাদ সম্মেলন না ডেকে আপনাদের কোন বিকল্পও নেই।

বললাম, ভাবী, টেলিফোন করার জন্য ধন্যবাদ। কিন্তু অনেক বিলম্ব করে ফেলেছেন, জাফর এবং আমি সর্বদাই আপনাকে যথেষ্ট মর্যাদা দিয়ে এসেছি, আপনি আপনার দায়িত্ব পালনে সমর্থ হলেন না।

বললেন, আমার অবস্থা আপনাদের চাইতে কেউ বেশি জানে না। আমার সদিচ্ছার অভাব ছিল না, কিন্তু আমি অপারগ।

সংবাদ সম্মেলন অত্যন্ত সাফল্যমণ্ডিত হল। এত জনাকীর্ণ সম্মেলন ইতিপূর্বে আর হয়নি। অর্ধশতাধিক রাজনৈতিক ব্যক্তির একটি তালিকা প্রকাশ করলাম যারা জাতীয় পার্টির বিশিষ্ট কর্মকর্তা ছিল। কিন্তু এরশাদ সাহেবের কারণে ক্রমে ক্রমে দলত্যাগ করে চলে গিয়েছে। এর মধ্যে ছিল দু'জন উপ-রাষ্ট্রপতি, দু'জন স্পিকার, অনেক ক'জন মহাসচিব, প্রধানমন্ত্রী, উপ-প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী। এরা প্রত্যেকেই বাংলাদেশের রাজনীতিতে সুপরিচিত। এরশাদ সাহেব কারাগারে থাকাকালীন এরা কেউ দলত্যাগ করেনি। যা কিছু হয়েছে তাঁর কল্যাণেই ঘটেছে। এরশাদ সাহেব অবশ্য প্রতিবারই সদম্ভ ঘোষণা দেন, এরা চলে যাওয়াতে দল অধিকতর শক্তিশালী হয়েছে।

অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় তিনি আর তাঁর 'তনুশ্রী' থাকলেই দল চলবে, অন্য কারো প্রয়োজন নেই!

মিজান সাহেবের বিষয়ে বললাম, আমাদের সুদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে এ ধরনের ডিগবাজি আমরা প্রত্যক্ষ করিনি। টাকা ধ্যান, টাকা জ্ঞান, টাকাই মম শ্যাম সম—এ মানসিকতা সপ্রমাণ করে বিশ্বাসঘাতকতার এক নতুন ইতিহাস রচিত হল। 'মীর জাফর' শব্দ দুটি যেমনি একটি ঘৃণ্য গালিতে রূপান্তরিত হয়েছে, আগামীতে কেউ এ ধরনের ডিগবাজি খেলে লোকে যদি তাকে 'মিজানী' বলে আখ্যা দেয় আমরা বিস্মিত হব না। সংবাদ সম্মেলনে শামীম আল মামুন ঘোষণা দিল ৩০শে জুন, ঢাকা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট প্রাঙ্গণে পার্টি প্রতিষ্ঠার আট বছর পর এই প্রথম জাতীয় কাউন্সিল অধিবেশন আহ্বান করা গেল।

শোনা গেল, সরকারি দলের পরোক্ষ সহায়তায় আমাদের অধিবেশন আক্রান্ত হতে পারে। রাজনীতির অঙ্গন যেভাবে দ্রুত সন্ত্রাসীদের নিয়ন্ত্রণে চলে গিয়েছে তাতে কিছুই অসম্ভব বলে বিবেচিত হয় না। আত্মশ্লাঘায় ঘা লাগল। নবম শ্রেণীর ছাত্র অবস্থায় '৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি এদেশের রাজনীতিতে আসি ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে। সেদিনই প্রথম কারাগারে নিক্ষিপ্ত হই। সেই থেকে বিরামহীন এক সুদীর্ঘ সংগ্রামমুখর রাজনৈতিক জীবন পার হয়ে এসেছি। শৈশব, কৈশোর, যৌবন কেটেছে এই রাজধানীতে। আজ

বার্ধক্যের দ্বারপ্রান্তে উপনীত। শক্তি প্রয়োগের কোনদিন প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিনি। বৃহত্তর ঢাকার বিক্রমপুর আমার জন্মস্থান, কিন্তু ঢাকা মহানগরী ছিল মূল কর্মস্থল। আজ যদি শক্তি পরীক্ষার সময় এসে থাকে তা হলে পিছোবার প্রশ্ন আসে না।

কাউন্সিলের দু'দিন পূর্বে আমার বাড়ির আঙ্গিনায় অনুষ্ঠিত ঢাকা মহানগরীর কর্মী-সমাবেশে বাধ্য হয়ে বলতে হল, কোন গোলযোগ আমাদের কাম্য নয়। গণতান্ত্রিক অধিকার রয়েছে আমাদের অধিবেশন করার। কেউ যদি আক্রমণ করার দুঃসাহস দেখায় তাকে অধিবেশন স্থল থেকে ফিরে যেতে দেওয়া হবে না।

শুধু মৌখিক সতর্কবাণী উচ্চারণ করে ক্ষান্ত হলাম না, জীবনে প্রথমবারের মতো প্রয়োজনীয় সতর্কমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করলাম। নির্দেশ রইল, কেউ আক্রমণ করলে, প্রাণে মেরো না। কিন্তু চেহারার জিয়োগ্রাফি পাল্টে দিও।

যথাসময়ে যথাস্থানে ধমকটি পৌঁছল। তারা আমাকে চেনে না এমন নয়, সম্মেলন নির্বিঘ্নেই অত্যন্ত সাফল্যজনকভাবে অনুষ্ঠিত হল।

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটের বহিঃপ্রাঙ্গণে বিশালাকার প্যাণ্ডেল স্থাপন করে অধিকাংশ জেলা থেকে আগত কম-বেশি প্রতিনিধির অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রায় দশ সহস্র কাউন্সিলার ও ডেলিগেটের দিনব্যাপী উপস্থিতিতে দুটি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিপ্রহরের আহার পরিবেশনের ব্যবস্থা করা হয়। সকালের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করে কাজী জাফর এবং বৈকালিক অধিবেশনে আমি। শামীম আল মামুন সাবলীল দক্ষতায় অধিবেশনদ্বয় পরিচালনা করে। প্রথম অধিবেশনে মনের সমস্ত ক্ষোভ, দুঃখ ও আকুতি মিশিয়ে এই দলের জন্মলগ্ন থেকে আমার অবদান, দলের পূর্বাপর কর্মের ইতিহাস বর্ণনা এবং সর্বোপরি রাষ্ট্রক্ষমতা হস্তান্তরের পর জাতীয় পার্টির বিরোধী দলের ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক অসঙ্গতি, এরশাদ মুক্তি আন্দোলনে আমাদের ভূমিকা এবং তাঁর মুক্তির পর দলের করুণ পরিণতির ছবি তুলে ধরে দু'ঘণ্টার এক সুদীর্ঘ বক্তব্য রাখলাম। সমস্ত অধিবেশন সে বক্তব্যে আবিষ্ট হয়ে গেল। কাজী জাফর উঠে এসে আমাকে এই ঐতিহাসিক বক্তব্যের জন্য অভিনন্দন জানাতে গিয়ে দীর্ঘক্ষণ আলিঙ্গনাবদ্ধ করে রাখল। সে অবস্থার ছবিই পরদিন প্রায় প্রতিটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। মাইনুদ্দীন ভূঁইয়ার উথাপিত প্রস্তাব মতে অধিবেশন সর্বসম্মতিক্রমে পার্টির শৃঙ্খলা ভঙ্গ, রাজনৈতিক অসাধুতা, অগণতান্ত্রিক ও গণতন্ত্রবিরোধী কার্যকলাপ এবং দলকে সরকারি দলের লেজুড়ে পরিণত করার অভিযোগে জনাব হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদ, মিজানুর রহমান চৌধুরী এবং নাজিউর রহমান মঞ্জুকে দল হতে বহিষ্কার করার সিদ্ধান্ত নিল। আমি মাইকে গিয়ে জানতে চাইলাম, যদি

একজন প্রতিনিধিও দ্বিমত পোষণ করে তার বক্তব্য আমরা শুনব এবং সে মতে অধিবেশনের মতামত নেব।

দু'হাত তুলে প্রতিটি সদস্য এই প্রস্তাব সর্বান্তকরণে সমর্থন জানাল। এরশাদ সাহেব একক স্বাক্ষরে আমাকে ও কাজী জাফরকে বহিষ্কার করেছিলেন। পক্ষান্তরে আমরা প্রায় দশ সহস্র প্রতিনিধির সর্বসম্মতিক্রমে দলের কাউন্সিল অধিবেশনের মাধ্যমে তাদেরকে বহিষ্কার করে তার জবাব দিলাম। তারা পরবর্তীতে প্রশ্ন তুলেছিল, মহাসচিবকে বহিষ্কার না করার গূঢ় কারণ কী?

মহাসচিব আমাদের দু'জনের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলছিল। বার দুই আমার বাসস্থানে এসে আমরা অধিবেশনের বিষয়ে কতখানি আন্তরিক তা জানতে চায়। বিষয়টি তার কাছেও গুরুত্ব লাভ করেছে। তার বক্তব্য ছিল, আপনাদের আর গত্যন্তর নেই, অধিবেশন ডাকতেই হবে।

সেও দ্বিধাহীন কণ্ঠে ঘোষণা দিল, বিভক্ত দলের আমি মহাসচিব থাকব না। তার এই বক্তব্য সংবাদপত্রেও আসে। সে এমন ইঙ্গিতও করে যে, ভবিষ্যতে সংসদ সদস্যদের একটি অংশ নিয়ে সে এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দেওয়া যায় কিনা ভেবে দেখবে। শুধু তা-ই নয়, জানতে চায় কাউন্সিলে কি পরিমাণ অর্থ ব্যয় হবে এবং তার কিছু করণীয় থাকলে সে তা করবে। টাকা-পয়সার বিষয়ে সর্বদাই দূরত্ব বজায় রাখায় অভ্যস্ত আমি তাকে জানাই, বিষয়টি কাজী সাহেবের আওতাভুক্ত। তুমি তার সঙ্গে কথা বলতে পার।

পরে কতদূর কী হয়েছে জানি না, জিজ্ঞেসও করিনি। মহাসচিবের এমন মন-মানসিকতায় আমরা তার বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিরত রইলাম। পরবর্তীতে দেখা গেল সে তার একটি কথাও রাখেনি।

অধিবেশনে আগত প্রায় দশ হাজার মানুষকে দুপুরের খাবার পরিবেশন করা এক সুকঠিন কাজ। স্বেচ্ছাসেবকরা সম্ভাব্য সকল প্রচেষ্টায় সফলতার সঙ্গে সে দায়িত্ব পালন করছিল। ডায়াসে বসে দেখছিলাম, যেন কোন বিশৃঙ্খলা না হয়। ফখরুল আলম এসে আমাকে উঠিয়ে নিয়ে গেল। সে বলল, দাদা, এখানে আপনি খেতে পারবেন না, যে বক্তৃতা করেছেন তারপর আপনার একটি ভালো আহার প্রাপ্য হয়েছে।

সে আমাকে অদূরবর্তী শেরাটন হোটেলে নিয়ে গেল। সেখানে ধীরে সুস্থে লাঞ্চ সেরে এসে দেখি তখনও প্রতিনিধিবৃন্দ গরম তেহারীর প্যাকেট নিয়ে ব্যস্ত।

বৈকালিক অধিবেশনে নুরুল ইসলাম মিলন দলের গঠনতন্ত্র ও ঘোষণা পত্রের সময়োপযোগী এবং গণতন্ত্রসম্মত সংশোধনী পেশ করল এবং অধিবেশন করতালির মাধ্যমে তা গ্রহণ করল। সর্বশেষে নতুন কমিটির প্রস্তাবনা এল। কাজী জাফর আহমেদ এবং আমি সেখানে কো-চেয়ারম্যান

এবং শামীম আল মামুন মহাসচিব হিসাবে প্রস্তাবিত হল। ফখরুল আলমকে কোষাধ্যক্ষ করে অন্যান্য নেতৃবৃন্দকে যথাযথ পদে প্রস্তাব করা হল। তুমুল হর্ষধ্বনি ও মুহুর্মুহু করতালির মাধ্যমে সে প্রস্তাব গৃহীত হল। আর একবার হাত তুলে সে প্রস্তাবে সকলের সম্মতি রয়েছে কিনা জানতে চাইলে এক অভূতপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা হল। সকল হাত ঊর্ধ্বে, কেউ হাত নামাচ্ছে না। কত যে ছবি তোলা হল তার হিসাব নেই।

গগনবিদারী জয়ধ্বনির মধ্যে সম্মেলন সমাপ্ত করে হাত ধরাধরি করে আমি এবং কাজী জাফর একত্রে প্যান্ডেলের মাঝখান দিয়ে হেঁটে বের হয়ে এলাম। প্রতিনিধিদের দৃপ্ত অভিব্যক্তি এবং উল্লসিত হর্ষধ্বনিতে দু'জনই পরিশ্রম সার্থক বিবেচনায় তৃপ্তি লাভ করলাম।

জীবনের আর একটি অধ্যায়ের সূচনা হল। পার্টি দ্বিধা-বিভক্ত হোক এটা কোনদিন কামনা করিনি। তারপরও সে কাজটি আমাকে দিয়ে সাধিত হল। এক অমোঘ শক্তি মানুষের সমস্ত কিছু নিয়ন্ত্রণ করে, তার রিমোটের ইশারায় মানবজীবনের সমস্ত কর্ম সম্পন্ন হয়। তা না হলে যা চাইতাম না, তাই দু'-দু'বার আমার দ্বারা সংঘটিত হত না। খন্দকার মোশতাকের সঙ্গে '১৫ই অগাস্টকে 'নাজাত দিবস' না 'শোক দিবস' করা হবে তা নিয়ে মতবিরোধ চরমে পৌঁছল। সে নাজাতীদের নেতৃত্ব দিল। আমি শোক দিবসের পক্ষাবলম্বী। শেষ পর্যন্ত দল দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। সেখানে একটি আদর্শের সংঘাত ছিল। দল ভাগ হয়ে গেলে অনুতাপ আসেনি। কিন্তু এবার কি নিয়ে দ্বন্দ্ব? মহাসচিব দলের মতের বিরুদ্ধে সরকারের অংশীদার। সে ক্যাবিনেট মন্ত্রী, অন্যদিকে চেয়ারম্যান দাবি করে তার দল বিরোধী দল। এই বিরোধ অনেক দূর গড়াল। চেয়ারম্যান শ্যাম রাখি না কুল রাখি বুঝে উঠতে পারে না। তদুপরি এক মোহিনীর জালে জড়িয়ে সে দিশেহারা। মিশরের বাদশা ফারুকের জীবনী নিয়ে নির্মিত চলচ্চিত্র My kingdom for a woman দেখে উপলব্ধি করা যায় কি করে এক নারীর কারণে সিংহাসন হারিয়ে যায়। এখানেও এক নারীর কারণে দল হারিয়ে যেতে বসেছে। আপাতত তা দ্বিধা-বিভক্ত।

ছাত্রজীবনে ছাত্রলীগ, কর্মজীবনে প্রবেশ করে আওয়ামী লীগ, ডেমোক্রেটিক লীগ এবং এই জাতীয় পার্টি। সারা দেশব্যাপী কত না কর্মী,

কত না ভক্ত অনুসারী তৈরি হয়েছিল। ছাত্রলীগ, আওয়ামী লীগারগণ এখন হাসিনার বালাম খাতাভুক্ত। তারা আমাদের প্রথম কাতারের বৈরী। ডেমোক্রেটিক লীগের যে বিশেষ অংশের নেতা কর্মীদেরসহ এই জাতীয় পার্টি গঠন করেছিলাম, তাদের অধিকাংশকেও আজ এরশাদ সাহেবের ঘরে রেখে এলাম। জীবনের জমার ঘরে কী রইল হিসাব করে মন হতাশ হতে চায়। মনকে আশ্বস্ত করতে প্রয়াস পাই। এখনও কিছু নিবেদিত প্রাণ কর্মী আর অনুরাগী খুঁজে পাওয়া যায়। স্বার্থান্ধ এই সমাজে অধিকাংশই কাজের বেলায় কাজী, কাজ ফুরালে পাঁজি। জাফর সাহেব এবং মামুন দলটিকে দাঁড় করাবার জন্য অন্যান্য নেতা-কর্মীদের নিয়ে বেশ শ্রম দিচ্ছে। আমাকেও কাজে লাগাতে তারা চেষ্টা করে। প্রথম প্রথম কয়েকটি সভা-সমাবেশে অংশ নিলেও উদ্দীপনা ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসে।

কিছুদিন যাবৎ শরীরও ভালো যাচ্ছে না। সারা জীবনের অনিয়ম এবং জেল-জুলুমের পরিণতি এই পরিণত বয়সে দেহকে কাবু করার উপক্রম করেছে। তাছাড়া সারা জীবন বৃহৎ সংগঠন করে অভ্যস্ত, ব্রাকেটভুক্ত অপেক্ষাকৃত ছোট দলে তেমন জুত পাই না। অনেকগুলো কারণের মধ্যে এটিও একটি কারণ ছিল ডেমোক্রেটিক লীগকে জাতীয় পার্টিতে পর্যবসিত করার।

দেশে বর্তমানে রাজনীতির আবহাওয়াও অনেকটা অসঙ্গতিপূর্ণ এবং বেশ উদ্বেগজনক। দু'-একটি দলের সম্মানজনক ব্যতিক্রম বাদ দিলে এখন দল করার অর্থই হল অজস্র অর্থ ব্যয় করে কর্মী, শুভানুধ্যায়ী, ভাড়াটে শ্রোতা সব যোগাড় করা। অর্থ ব্যতিরেকে দলের লোকরাও সেভাবে এগিয়ে আসবে না। তাদেরকেও পর্যাপ্ত অর্থের যোগান দিতে হবে। যে কোন কাজে টাকা দেওয়া হলে রাজনীতির ক্ষেত্রে সে টাকার ছ' আনা কাজ পেলে ভাগ্য মানতে হবে। অনেক সময় সবটাই পকেটস্থ হয়ে যায়। একটি সভার জন্য পত্রিকায় মোটা অঙ্ক ব্যয়ে বিজ্ঞাপন ছাড়াও পোস্টার-লিফলেট ছেপে তা দেয়ালে লাগানোর জন্য, বিলি করার জন্য পৃথক পৃথক রেটে অর্থ দিতে হবে শতকরা হিসাবে। ব্যানার এবং চিকার জন্যও বিস্তর অর্থের প্রয়োজন। মাইক খরচ বহির্ভূত ঘোষণাকারীদের রাহা খরচ, প্যান্ডেলের খরচ এবং সর্বোপরি সভা শুনবে যারা তাদেরকে লোক পাঠিয়ে, গাড়ি দিয়ে, সঙ্গে চা-নাস্তা, দূরের হলে খাবার প্যাকেট এবং অনেক ক্ষেত্রেই জনপ্রতি চুক্তিতে তাদের যোগাড় করতে হবে। সেখানেও কারচুপি। পঞ্চাশ জন এনে কমপক্ষে পাঁচ শত লোকের বিল নেবে। এত করে তাদের জনসভায় আনা হলেও তারা সেখানে বসবে না। ঘোরাঘুরি করবে। বাদাম-চানাচুর খেয়ে বাসে গিয়ে বসে থাকবে। সভার সঙ্গে খুব কমই সম্পর্ক।

অনেকেরই অভিমত সুষ্ঠুভাবে রাজনীতি আর করা যাবে না! জানা মতে

পরীক্ষিত কর্মীটিকেও প্রয়োজনীয় অর্থ দিয়ে সন্তুষ্ট করা যায় না। তারপর দেয় অর্থের কাজ ছ' আনা কেন, দু'আনাও আদায় করা কষ্টকর হয়। প্রায় প্রতিটি লোকই অর্থের সন্ধানে ওৎ পেতে থাকে। প্রচুর অর্থ প্রদানে ত্রুটি হলেই নেতৃত্বের প্রতি অনাস্থার আস্ফালন। এখন রাজনীতি করতে হলে এক একজন জগৎশেঠ হতে হবে। নতুবা একবার ক্ষমতায় গিয়ে অনেক অর্থ ভবিষ্যতের জন্য যোগাড় করে রাখতে হবে। তারপর একবার পদে উঠে গেলে বড় দলগুলোর মতো নমিনেশন বেচেই কোটি কোটি উপার্জন করা যাবে। ক্ষমতায় গেলে তো কথাই নেই!

রাজনীতির এই কালো দিকটি এড়িয়ে চলার চেষ্টা করেছি বলে সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা বেশ সুকঠিন। টাকা চাই, লোক চাই, অস্ত্র চাই, সে অস্ত্র চালাবার ক্যাডার চাই। দল বড় হলে সাত খুন মাফ। ছোট দল হলে নির্ঘাত ফুৎকারে উড়িয়ে দেবে।

চিরদিন বক্তৃতা করতে দাঁড়িয়ে দেখতে পেয়েছি, লোকজন আগ্রহ নিয়ে ছুটে আসছে শুনবে বলে। ক্ষুদ্র জমায়েত অতি অল্প সময়ে বৃহৎ কলেবর লাভ করেছে। বক্তৃতা করে তৃপ্তি পেয়েছি। এখন যেই মনে হয় বক্তৃতা শোনাবার জন্য অর্থ ব্যয় করে লোকজন যোগাড় করতে হবে, গায়ে জ্বর আসে। অর্থের পেছনে কোনদিন ছুটিনি। কাজেই সে জিনিসের একান্ত অসদ্ভাব। তারপরও যদি মনে-প্রাণে লেগে যেতাম, ভরসা করি প্রায় প্রতিটি অঞ্চলেই কিছু না কিছু কর্মী সংগ্রহ করতে পারতাম, যাদেরকে নিয়ে নতুন করে জাতীয় পার্টি গড়ে তুলতে পারতাম। কিন্তু দেহে নেই বল, মনে নেই আগ্রহ। সবকিছু দেখে-শুনে ত্যাগ-তিতিক্ষার আবহাওয়ায় প্রবৃদ্ধি পাওয়া সত্তাটি আজ ভোগ-বৈভবের উৎকট আয়োজনে উৎসাহের অভাব বোধ করছে।

সহকর্মী বন্ধুদের সনির্বন্ধ অনুরোধ স্বাস্থ্যগত কারণ দেখিয়ে এড়িয়ে যাই। নিজে কিছু করি না। মন সায় দেয় না বলে। তাই বলে অন্যদেরকে নিষেধ করি না। তারা কাজ চালিয়ে দলকে সক্রিয় রেখেছে।

আমার আপাত নিষ্ক্রিয়তায় অনেকের মধ্যে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। তা হলে কী দলকে একত্রীকরণের কথা ভাবছেন?

বলি পৃথক যখন করেছি, তখন প্রয়োজনে একত্রও করতে পারব। কিন্তু আমাদের শর্তগুলো গৃহীত হলেই কেবল সে প্রশ্ন বিবেচনায় আসতে পারে।

সালেহা খুব চিন্তিত। তার ধারণা বসে বসে বই পড়ে আর টিভি দেখে আমি অহেতুক সময় নষ্ট করছি। তার বক্তব্য সহজ, পানি ব্যতিরেকে যেমন মাছ বাঁচে না, রাজনীতি ছাড়া তুমিও বাঁচতে পার না। ঘোরদৌড়ের ঘোড়ার রেস বন্ধ হয়ে গেলে বেতো হয়ে যায়, বেশিদিন আর বাঁচে না।

আমাকে বারবার খাতা কলম এগিয়ে দিয়ে উৎসাহ দেয়, তোমার মুখ

এবং কলম একসঙ্গে চলত। এখন মুখ বন্ধ আছে, ভালো কথা। কলম চালাচ্ছ না কেন? কিছু লেখ।

তাকে বলি, লেখালেখির কাজ মনের আনন্দ এবং আগ্রহের ফলেই সম্ভব হয়। দুটিরই এই মুহূর্তে অভাব। লিখব, তুমি ভেবো না, অচিরেই শুরু করব।

সে অচিরে আর আসে না। সে আমাকে বলে, রানার ওখান থেকে ঘুরে আস। ছেলের সান্নিধ্যে মন চাঙ্গা হয়ে উঠবে।

বলি, তা হলে তুমিও চল দিনাকে নিয়ে।

কিন্তু দিনার কলেজ চলছে। পড়া-শুনার বিঘ্ন করে যাওয়া অনুচিত। সালেহা আমাকে বুঝিয়ে বলে।

অগত্যা আনোয়ার ও ধীরণকে নিয়ে ইউরোপ ভ্রমণে যাই। যাত্রা পথে আমার বহুদিনের ইচ্ছা প্রাচীন সভ্যতার অন্যতম পাদপীঠ মিশর ঘুরে আসি। রাজধানী কায়রো, ইতিহাসখ্যাত পিরামিডসমূহ এবং সুয়েজখাল পরিদর্শন করে প্রকৃত আনন্দ পাই। সেখান থেকে পশ্চিম জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্টে যাই। ধীরণের ছোট ভাই কুটু, তার স্ত্রী বিদা ও একটি শিশুপুত্র নিয়ে সেখানে বসবাস করে। কুটুর বিয়ে আমার সরকারি বাসায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ওরা আমাদেরকে না পেয়ে পেল। কোথায় রাখবে, কি খাওয়াবে, স্বামী-স্ত্রী ভেবেই অস্থির।

ফ্রাঙ্কফুর্টে বাংলাদেশীদের সভায় বক্তৃতা করতে হল। জাতীয় পার্টির শাখাও গঠন করে দিলাম। সেখান থেকে গেলাম নেদারল্যান্ড। নেদারল্যান্ড ঘুরে এসে ট্রেনযোগে ফ্রান্স যাওয়ার মনস্থ করলাম। বহুবার ইউরোপ ভ্রমণ করলেও কোনদিন সেখানকার বিখ্যাত ট্রেন ভ্রমণের অভিজ্ঞতা হয়ে ওঠেনি। আনোয়ার আমেরিকা যাচ্ছে বলে সে ফ্রান্স ভ্রমণে যেতে পারল না। সঙ্গে জুটে গেল সস্ত্রীক বাবুল। সিরাজদিখানের মিশুক প্রকৃতির বাবুল একবার স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে সিরাজদিখান লৌহজং আসনে সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। ব্যক্তিগতভাবে আমার সঙ্গে তার সুসম্পর্ক। আমাদের চার জনের মধ্যে মাত্র দু'জনের জন্য আসন রিজার্ভের ব্যবস্থা করা গিয়েছিল। সারা রাতের সফর। পাঁচ আসন বিশিষ্ট কামরায় গিয়ে দেখি তিনটি জার্মান তরুণী ইতিমধ্যে সেখানে আসন পেয়েছে। ধীরণ এবং বাবুল প্রস্তাব করল বাবুলের স্ত্রী এবং আমি সেই কামরায় আমাদের নির্ধারিত আসন দুটি গ্রহণ করে বিশ্রাম

নিই। তারা অন্যত্র কোন প্রকারে রাত কাটিয়ে দেবে। চার যুবতী মহিলার মধ্যে আমি একাকী। বাবুলের বউ বেশ সুরসিকা। সে বলল, ভাই, কৃষ্ণ এত সখি পরিবৃত্ত হয়ে থাকত, আর আপনি মাত্র চার জনে ভিরমি খাচ্ছেন!

বললাম, তুমি ছোট ভাইয়ের বউ না হলে বুঝাতাম, বাঘ বৃদ্ধ হলেও থাবা ভোলে না।

সে বলল, আমি না হয় ভাদ্দর বৌ। বাকি তিন জন তো ডবকা ছুঁড়ি। আমি চোখ বুজে থাকব। আপনি দেখুন না চেষ্টা করে। শুনেছি এরা এসবে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

একটি জার্মান মেয়ে সামান্য ইংরেজি জানে। সে জিজ্ঞেস করল, তোমরা স্বামী-স্ত্রী?

বললাম, এটি আমার ছোট ভাইয়ের বউ!

সকলে কি মনে করে নিজেদের ভাষায় হাস্যরস করল।

বললাম, আমার ভাই বৌ কি বলেছে শুনবে?

বলল, বল, বল, আমরা নিশ্চয়ই শুনব!

তারুণ্যের স্বভাবই নতুন রস আস্বাদনে আগ্রহী হওয়া।

ইংরেজি জানা মেয়েটিকে হেসে বললাম, সেকালে আমাদের উপমহাদেশে লর্ড কৃষ্ণ ছিলেন, তার অসংখ্য সহচরী ছিল। আমার মাত্র তোমরা চার জন। এই চলন্ত ট্রেন, রাতের মায়াবী স্বপ্নাবেশ এবং কামরায় তোমাদের মতো সুন্দরী যুবতীদের উষ্ণ সান্নিধ্য। মাথা ঠিক রাখা সম্ভব?

সে তার ভাষা এবং মাধুরী মিশিয়ে কথাগুলো বাকি দু'জন জার্মান বান্ধবীকে বলতে তারা হেসে কুটি কুটি। ফিসব বলাবলি করছিল। মেয়েটিও বেশ প্রাণোচ্ছল। সে হেসে বলল, আমার বান্ধবীরা বলছিল, তোমার এই ট্রেন যাত্রাকে তারা মধুময় করে দিতে সম্মত আছে, কিন্তু বাধা হচ্ছে তোমার ভাই-বৌ।

সকলে হেসে উঠলাম।

সে রাতটি আমি কোনদিন ভুলব না। ট্রেনের ঝাঁকুনিতে চোখে ঘুম জড়িয়ে আসছে। সকলেই একসময় ঘুমে কাতর হয়ে এদিক-সেদিক কাত হয়ে পড়ছে। মেয়ে তিনটি এরই মধ্যে নৈশকালীন স্বল্পবাস পরে ফেলেছে। তাদের বস্ত্র পরিবর্তনও এক দেখার জিনিস। লাজ-লজ্জার বিশেষ ধার তারা ধারে না। এতক্ষণ বাবুলের বউ বেশ কথা বললেও ট্রেনের ঢুলুনিতে তারও ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে।

সে বলল, ভাই, আজকের রাতের মতো কোন দোষঘাট নেবেন না, হাত-পা কোথাও লেগে যেতে পারে।

তাকে নিশ্চিন্ত করলাম। কিন্তু নিজে নিশ্চিন্ত হতে পারলাম কই!

ট্রেনের স্বল্প আলোতে বারবার হেলে পরা যুবতী তিনটির নিটোল দেহ-

সৌন্দর্য থেকে চোখ ফিরিয়ে রাখা দুরূহ। একসময় আমিও তাদের মতো অজান্তে এলোমেলোভাবে ঘুমিয়ে পড়ি। গভীর রাতে ইমিগ্রেশনের পুলিশ এসে আমাদের সকলের পাসপোর্ট পরীক্ষা করে। চারটি যুবতীর সঙ্গে একাকী রয়েছি দেখে ইংরেজিতে রসিকতাও করে, আশা করি তোমার রাত আনন্দে কেটেছে!

বললাম, আনন্দেই কাটবার কথা ছিল, মাঝরাতে তুমি এসে বিঘ্ন ঘটালে।

সে হেসে বিদায় নিল। বলল, রাতের এখনও অবশিষ্ট রয়েছে। ঘুমিয়ে নষ্ট করো না!

আর একদফা হাসা-হাসির পর আবার আস্তে আস্তে ঝিমুনি এসে সকলকে গ্রাস করল।

সকালে প্যারিসে এসে ট্রেন থামে। তখনও ধীরণ ও বাবুল আমাদের কামরায় আসেনি, মেয়ে তিনটি লাফঝাঁপ দিয়ে উঠে নাইটির উপরেই গাউন চাপিয়ে আমাদের সঙ্গে করমর্দন করে দ্রুত ট্রেন থেকে নেমে গেল। নিমিষে কামরাটি সাহারা মরুভূমির মতো শূন্য হয়ে গেল। বাবুলের বউ এবং আমিও নামার জন্য প্রস্তুত হয়ে রইলাম। জাতীয় পার্টির ফ্রান্স শাখার সভাপতি আশরাফকে টেলিফোনে জার্মানি থেকে পাওয়া যায়নি, একটা বার্তা রেখে দেওয়া হয়েছে। জানি না, সে তা পেয়েছে কিনা। সে না এলে হোটেল পেতে বেশ বেগ পেতে হবে। প্যারিসে সবসময়ই ভ্রমণার্থীদের ভিড় লেগে থাকে।

আশরাফ ও জাতীয় পার্টির অন্য একজন কর্মী ফরহাদ ঠিকই রেল স্টেশনে এসেছে, অত প্রত্যুষে শীতের দেশে বিছানা ছেড়ে উঠে আসা এক দুরূহ কাজ। এরা দীর্ঘদিনের নিবেদিত কর্মী। তাই রাত থাকতে বের হয়ে অত সকালে আসতে পেরেছে। ইতিপূর্বের যতবার প্যারিস এসেছি সবই আকাশপথে। এয়ারপোর্ট থেকে কিছু চিনতে পারি, কিন্তু এই রেল স্টেশন থেকে শহরের কোথায় আছি বুঝে ওঠা কঠিন। আশরাফ জানাল আমরা শহরের প্রায় কেন্দ্রবিন্দুতেই রয়েছি। সে স্টল থেকে কাগজের গ্লাসে করে গরম কফি এবং কেক এনে আমাদের খেতে দিল।

স্টেশন থেকে বেরিয়ে আশরাফের নেতৃত্বে আমরা চললাম হোটেল খুঁজতে। পূর্ব থেকে বুকিং দিয়ে না রাখলে হোটেলে স্থান পাওয়া প্রায় অসম্ভব। আশরাফ অসাধ্য সাধন করল। এক ফরাসিনী হোটেলওয়ালীকে আশরাফ তার সুন্দর ফরাসি ভাষায় পটিয়ে ফেলল। আমি তাকে বলে দিয়েছিলাম, আমাদের পূর্ব পরিচয় ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা নেই। একই ফ্লোরে দুটি রুম পেয়ে আমরা খুশি হয়ে উঠলাম। আমরা গোসল সেরে নাস্তা করে কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নিলাম। আশরাফরা পরে এসে আমাদেরকে প্যারিস দেখাতে নিয়ে গেল। আমি ছাড়া বাকি তিন জনেরই প্রথম প্যারিস ভ্রমণ। তাই একজন পর্যটকের মতো নতুন করে পুরনো দর্শনীয় স্থানসমূহ

পরিভ্রমণ করে নতুন করে আনন্দ লাভ করলাম। ঠিকই বলা হয়ে থাকে, প্যারিসের সুন্দরীরা যেমন চিরযৌবনা, প্যারিস নগরীও কোনদিন পুরনো হবে না, সে চিরনতুন।

পরের দিন আশরাফ তার স্ত্রীকে হোটেলে দেখা করাতে নিয়ে এল। বাঙালি তরুণী ডাক্তার প্যারিস শহরে তার পেশায় নিয়োজিত। একমাত্র শিশু কন্যাকে দেশে রেখে এসে সদা বিমর্ষ। মেয়েটিকে দেখলে, কথা বললে চিকিৎসক বলে মনেই হয় না, নতমুখী কমনীয় মেয়েটিকে দেখলে মনে হয় ও চারুকলার ছাত্রী। আমাকে পায়ে হাত দিয়ে সালাম করতেই একটি সত্যিকারের সহোদর-সুলভ স্নেহ ওর জন্য জেগে উঠল। মেয়েটিও আমাকে বড় ভাইয়ের মতো গ্রহণ করল। যে দু'দিন ছিলাম, কাজকর্ম ফেলে সে আমাদেরকে সার্বক্ষণিক সঙ্গ দিল এবং বিদায়ের দিন রেল স্টেশনে এসে রাজবাড়ির মেয়েদের মতোই চোখের পানি মুছতে লাগল। মেয়েরা এত মায়াবিনী হয়!

সস্ত্রীক বাবুল চলে গেল স্পেন। আমি ও ধীরণ জার্মানি ফিরে এলাম। ক'দিন পর সেবারের মতো ইউরোপ ভ্রমণ সমাপ্ত করে দেশে ফিরে এলাম।

আমার মেয়ে দিনার বিয়ের কথা ভাবছিলাম। সে এবার বিএ পরীক্ষা দিচ্ছে। দেশের যা অবস্থা, মেয়েকে বেশিদিন ঘরে রাখা কঠিন। ঢাকা শহরে কোন মেয়েকে কোথাও একা পাঠান প্রায় অসম্ভব। নারী-নির্যাতনের নতুন নতুন লোমহর্ষক কাহিনী প্রতিদিন পত্রিকায় পড়ে শিউরে উঠতে হয়। মেয়েদের পিতা-মাতারা দুশ্চিন্তায় অহরহ জর্জরিত। দু'দু'জন মহিলা এদেশের প্রধানমন্ত্রী হল পরপর। নারী-নির্যাতন পাল্লা দিয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তিন বছরের নাবালিকা ধর্ষিতা হচ্ছে, ছিনতাই, এসিড নিক্ষেপ, ধর্ষণ এখন প্রতিদিনকার ঘটনা। আওয়ামী লীগ সরকার আর কিছু করতে না পারলেও চাঁদাবাজি, সন্ত্রাস, দলীয়করণ, ধর্ষণ এসব বিষয়গুলোকে সফলতার সঙ্গে জাতীয়করণ করতে সমর্থ হয়েছে। ওরা পানি চুক্তি করে, পানি আসে না। শান্তি চুক্তি করে, শান্তি লেশমাত্র দৃষ্টিগোচর হয় না। লম্বা লম্বা বাতচিত আর যত্রতত্র বঙ্গবন্ধুর নামে সাইনবোর্ড পাল্টানো ব্যতীত এদের অন্য কোন অস্তিত্ব চোখে পড়ে না।

দলীয় ক্যাডার হলে ধর্ষণ তার অধিকার। শোনা যায়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের জনৈক কর্মকর্তা শত ধর্ষণের রেকর্ড স্থাপন করেছে। দলের সক্রিয় কর্মী, তাই তার বিচার নেই। জাহাঙ্গীরনগরকে কেউ কেউ এখন ধর্ষণ নগর নামে অভিহিত করে।

দিনাকে অবশ্য একা কোনদিন কোথাও যেতে হয়নি। এমনকি স্কুল-কলেজে সর্বত্র অধিকাংশ সে তার মা নতুবা আমার সঙ্গে গিয়েছে। এই আধুনিক সমাজে বাস করেও সে তার মাকে ছাড়া আজ পর্যন্ত কোন অনুষ্ঠান বা একটি সিনেমা দেখতেও যায়নি। আমরা ওকে স্নেহে এবং যত্নে লালন

করার চেষ্টা করেছি। ও আজ বড় হয়েছে, তাকে পরের ঘরে বিদায় দেওয়ার কথা মনে পড়তেই হৃদয়ের তন্ত্রীতে বিষাদের সুর বেজে ওঠে। তবুও মেয়ে বড় হলে তাকে পাত্রস্থ করা পিতা-মাতার দায়িত্ব। দিনা চলে যাবে, ভাবলেই আমি কাতর হয়ে উঠি। সালেহার অবস্থা আরও করুণ। চিরদিন পক্ষীশাবকের মতো বুকে করে ওকে মানুষ করেছে, সে দূরে পতিগৃহে চলে যাবে ভেবে এখন থেকেই সালেহা চোখের পানি রোধ করতে পারে না। তবুও সে আমাকে পাত্র দেখতে বলে। আমি গা করি না।

সালেহার ফুপাত ভাই সাকু একটি পাত্রের সন্ধান নিয়ে আসে। সে সেনাবাহিনীর মেজর। আর্মি অফিসার সম্বন্ধে সালেহার বেশ একটু দুর্বলতা রয়েছে। তাই আগ্রহ প্রদর্শন করলাম। ছেলের ফটো দেখে খুশি হলাম। দীর্ঘদেহী ছ' ফুট দু'ইঞ্চি উচ্চতার সুদর্শন যুবক। বললাম, প্রাথমিক খোঁজ-খবরের পর আমরা কথা বলব।

যেটুকু খবরাখবর পাওয়া গেল তা সন্তোষজনক, সাকুকে অগ্রসর হতে বললাম। একদিন সাকু সেই মেজর এবং তার অগ্রজকে নিয়ে আমার বাসায় উপস্থিত হল। বাইরে থেকে আমার সম্বন্ধে নানা কথা শুনে দ্বিধা থাকা অসম্ভব নয়। কিছুক্ষণ আলাপ করতেই ওদের সব দ্বিধা কেটে গেল। আমি দিনাকে ডেকে ওদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলাম। অনানুষ্ঠানিক সে সাক্ষাতে ওরাও দিনাকে পছন্দ করল, আমরাও পাত্রকে পছন্দ করলাম। আল্লাহ্ তা'আলার সুমহান ইচ্ছায় ওখানেই দিনার বিয়ে ঠিক হল।

'৯৭ সালের ১০ সেপ্টেম্বর দিনা ও অপুর আক্‌ত হয়ে গেল। অপুর ভালো নাম মোয়াজ্জেম হোসেন খান। শ্বশুর-জামাতা দু'জনের এক নাম নিয়ে অনেক রসিকতা হল। সে রাতেই জামাতা এবং তাদের আত্মীয়স্বজন যখন বিদায় নিতে উদ্যত, সালেহা আমাকে খুঁজছিল, মোয়াজ্জেম সাহেব গেল কোথায়? সে আমাকে রানার আব্বা বা কখনও শাহ্ সাহেব বলে ডাকে। এই নামে কখনও ডাকে না। সেদিন দৈবচক্রে সে নামে ডাকতেই পাশে দণ্ডায়মান সপ্রতিভ জামাতা উত্তর দিল, এই তো মা আমি আপনার পাশেই রয়েছি!

সালেহা তখন লজ্জা পেয়ে বলল, আমি সিনিয়রকে খুঁজছি।

একটা হাসির রোল পড়ে গেল।

নভেম্বর মাসের ১৪ তারিখে গুলশানের জাতীয় শুটিং কমপ্লেক্সে ধুমধামের সাথে আমার ঘরের আনন্দ প্রতিমাকে তার নতুন জীবনে তুলে দিলাম। সেটি ছিল আমাদের পরিচিত মহলের সবচাইতে জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান। একটি মাত্র মেয়ে, কোন দিকে কার্পণ্য করার মন ছিল না। দুঃখ রয়ে গেল বোনের বিয়েতে রানা আসতে পারল না। তার তখন পরীক্ষার সময়।

ওদের আকত্, দুটি গায়ে হলুদ, রোশামত এবং সেনাকুঞ্জের বউ-ভাত অনুষ্ঠান সব মিলিয়ে একটি ভিডিও ক্যাসেট করে রানাকে পাঠিয়ে দেওয়া

হল। ওর মামাদের টেলিফোনে জানতে পারলাম, অনুষ্ঠানের ভিডিও দেখে অশ্রুসংবরণ করতে পারবে না বলে ছেলে সে ক্যাসেট খোলেইনি। শুনে আমাদেরও মন বিষণ্নতায় ভরে উঠল।

রানাকে টেলিফোনে বললাম, দিনা চলে গিয়ে ঘর শূন্য হয়ে গিয়েছে। সে শূন্যতা পূর্ণ করার জন্য তোকে বিয়ে দিয়ে বউ আনব, শীঘ্র পড়া শেষ করে দেশে আয়।

সে টেলিফোনে হা হা করে তার প্যাটেন্ট হাসি হেসে দিল। পড়াশুনাতেই তার আনন্দ, বিয়ের কথা শোনান যায় না।

মেয়ের বিয়ে বলে কথা! খাওয়া-দাওয়া, আসা-যাওয়া, দেওয়া-নেওয়া করতেই দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হল। ওর পরীক্ষা আসন্ন বলে দিনাকে বাসায় এনে রাখলাম। জামাই ছুটি হলেই চলে আসে। সালেহার উত্তেজনাই বেশি। বহুদিন যাবৎ তার আকাঙ্ক্ষা একটি মনের মতো জামাই আসবে এবং সে জামাইকে মনের মতো করে আদর-আপ্যায়ন করবে।

আল্লাহ্ তা'আলা তার ইচ্ছা পূর্ণ করেছে। সে জামাই পেয়ে খুবই উৎফুল্ল। অপু তাকে মা এবং আমাকে বাবা ডাকে। প্রবাসী পুত্রের অভাব সে দূর করে দেয়। অনেকদিন পর সালেহা আবার রান্না ঘরে যেতে আরম্ভ করেছে, খাবার টেবিলে জামাইয়ের কারণে আবার বৈচিত্র্য ও নতুনত্ব আসতে শুরু হয়েছে।

বন্ধুবর নুরুল ইসলাম মঞ্জুর দিনার বিয়েতে অনেক সহায়তা করেছে। সে বলে, আমার সন্তানাদি বেশি, তাদের বিয়ে দিতে গিয়ে অনেক অভিজ্ঞতার সঞ্চার হয়েছে। তোমার বাড়িতে প্রথম অনুষ্ঠান, অভিজ্ঞতার একান্ত অভাব, তাই বিজ্ঞজনের পরামর্শ অবশ্য গ্রহণীয়।

বলি, তথাস্তু জনাব। দাওয়াত কার্ড বাছাই, বাবুর্চি নির্বাচন প্রভৃতি সেই করেছে। কিন্তু বিয়ের আসরে বেশিক্ষণ থাকতে পারল না। শরীর অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। অনেকদিনের হার্টের রোগী। একবার এক দফা ঢাকায় একটি হার্ট ক্লিনিকে ভর্তি হয়ে একটু সুস্থ হয়ে আমাকে বলল, চল একসঙ্গে সিঙ্গাপুর যাই, স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়ে প্রয়োজনীয় বিধান নিয়ে আসি।

সালেহাও সেই পরামর্শ দিল।

সিঙ্গাপুরের পথে আমরা প্রথম ব্যাংকক গেলাম। সেখানে জেনারেল হাসপাতালে মঞ্জুরকে একদফা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করানো গেল।

একদিন প্রায় সারাবেলা হাসপাতালে কাটিয়ে এসে আমরা ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হয়ে ইন্টার প্যালেস হোটেলে ফিরে হোটেল ডাইনিং রুমে ডিনার খেতে গেলাম।

মেনু দেখে একটি মাছের বিশেষ প্রিপারেশনের অর্ডার দিলাম। সেটিই আমাদের কাল হল। ডিনার খেয়ে ঘরে ফিরার পূর্বেই মঞ্জুর প্রকৃতির আহ্বান টের পেল। কিছুক্ষণের মধ্যে তার ক্রমাগত পাতলা পায়খানা হতে থাকল। সামান্য ব্যবধানে আমারও প্রথমে দাস্ত এবং পরে একই সঙ্গে বমিও শুরু হল। যৌথ আক্রমণে আমি অপেক্ষাকৃত অধিক কাতর হয়ে পড়লাম। দু'জনেই বুঝতে পারলাম, মাছটি খেয়েই আমাদের ফুড পয়জনিং হয়েছে।

ঘরের দুই খাটে দুই জন শুয়ে কাতরাচ্ছি, কেউ দেখবার নেই, কেউ শুশ্রূষা করার নেই। টেলিফোনে ডাক্তার ডাকতে বললাম। রিসেপশনের মেয়েগুলো কি বুঝল তারাই জানে। জানাল, ডাক্তার ব্যস্ত, তোমাদের হাসপাতালে যেতে হবে।

আমরা চলচ্ছক্তিরহিত। বিছানায় পড়ে থাকা এবং হাতড়িয়ে হাতড়িয়ে কোনক্রমে বাথরুমে যাওয়া ব্যতীত আর কিছু করতে পারি না। প্রায় পনেরো-ষোলবার দাস্ত ও বমি হল। আমার ধীরে ধীরে চৈতন্য বিভ্রান্ত হচ্ছিল। সব কিছুতেই হিসাবের গড়মিল হয়ে যাচ্ছিল। একটা অস্পষ্ট শূন্যতায় তলিয়ে যেতে যেতে মনে হচ্ছিল, পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছি। আত্মীয়-বান্ধবহীন দূর দেশের এক হোটেলে আর এক অসুস্থ বন্ধুর পাশে শুয়েই বুঝি জীবন প্রদীপ নিভে এল।

দুর্বল কণ্ঠে মঞ্জুকে বললাম, যদি চলে যাই এবং তুমি সুস্থ হয়ে ওঠ, তা হলে মরদেহ দেশে নেবার কষ্ট তোমাকেই করতে হবে। বন্ধুর শেষ কাজ বন্ধুর উপরই বর্তাবে।

সে বলল, আল্লাহ্‌র উপর ভরসা রাখ। তুমিও সুস্থ হয়ে উঠবে। আর ঘটনা যদি উল্টো ঘটে যায়, তা হলে সে কষ্টটি যে তোমাকেই করতে হবে।

আল্লাহ্ অনেক মেহেরবান। বিনা চিকিৎসায়, কেবল রুম সার্ভিসের পরিবেশিত লেমন জুস পান করতে করতে দু'বন্ধুই উঠে বসলাম। এক পর্যায়ে দাস্ত ও বমি বন্ধ হল। সে যাত্রা টিকে গেলাম, আবার সব হিসাবপত্রে মিল খুঁজে পাচ্ছিলাম। আমার গুরুতর অসুস্থতায় চিরদিনের লক্ষণ হিসাবের গড়মিল হওয়া। হিসাব পুনর্বার মিলে গেলে ক্রমান্বয়ে সুস্থতা ফিরে আসে।

প্লেনের টিকিট খুলে দেখি সিঙ্গাপুর যাবার তারিখ পার হয়ে গিয়েছে। অসুস্থ ক্লান্ত দেহ নিয়ে দু'জন বিমানবন্দরে উপস্থিত হলাম সিঙ্গাপুর যাব বলে। এত দুর্বল যে, কাউন্টারের লাইনে দাঁড়াতে পারছি না। একজন

কর্মকর্তাকে টিকিট দেখিয়ে ব্যবস্থা করার অনুরোধ জানাতে সে বলল, তোমাদের টিকিটের সময় পার হয়ে গিয়েছে, তোমরা কোন সংবাদ দাওনি, নতুন টিকেট কেটে তোমাদের যেতে হবে।

বললাম, আমরা গুরুতর অসুস্থ ছিলাম। যোগাযোগ করা অসম্ভব ছিল। আমরা আন্তর্জাতিক যাত্রী। এমতাবস্থায় আমাদের টিকেট বাতিল হতে পারে না। তোমাদের ঊর্ধ্বতন কর্তাদের সঙ্গে কথা বলতে চাই।

পরে একজন রাশভারি মহিলা কর্মকর্তা সেখানে এসে সব শুনে টিকেট দেখে বলল, এ টিকেটেই তোমাদের চলবে। এক পয়সাও লাগবে না।

সে সব ব্যবস্থা করে দিল। তাকে অনেক ধন্যবাদ দিয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে দুই বুড়ো সিঙ্গাপুরের প্লেনে চেপে বসলাম। সেখানে পৌঁছে চিকিৎসকের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে গিয়ে শুনি সংশ্লিষ্ট ডাক্তার আমেরিকায় গিয়েছে। দেড় সপ্তাহ পরে তাকে পাওয়া যাবে। ঝামেলায় পড়া গেল। ডাক্তার না দেখিয়ে ফিরে যাওয়া সঠিক হবে না। আবার এতদিন সিঙ্গাপুরে অগ্নিমূল্যের হোটেল ভাড়া গুনেও লাভ নেই। মঞ্জুর পরামর্শ দিল, যদি শুয়েই থাকতে হয় তা হলে চল প্রথম শ্রীলংকা যাই, সেখান থেকে মালদ্বীপ গিয়ে ক'দিন বিশ্রাম করে আসি।

সার্কভুক্ত এ দুটি দেশে ইতিপূর্বে যাওয়া হয়নি। সে প্রস্তাব ভালো লাগল।

দুলালের শ্যালক কৃষ্ণ সিঙ্গাপুরের ট্রাভেল এজেন্সি খুলেছে। তার কাছ থেকে টিকেট কেটে আমরা কলম্বো গেলাম। সেখানকার ইন্টারকন হোটেলে দু'দিন বিশ্রাম করে ভারত মহাসাগরের বুকে অত্যাশ্চর্য দ্বীপমালার দেশ মালদ্বীপে গিয়ে পৌঁছলাম। শ্রীলংকা এয়ার ওয়েজে মালদ্বীপের রাজধানী মালেতে পৌঁছলে ইমিগ্রেশন আমাদের হোটেল বুকিং-এর অভাবে আটকে দিল। মঞ্জুর পূর্বে মালে এসেছে। সে তর্ক জুড়ে দিল, এ ধরনের কোন শর্ত তোমাদের কোন কাগজপত্রে নেই। আমরা নেমে হোটেল ঠিক করে নেব।

ওরা নির্বিকার। বুকিং নেই তাই তোমাদের যেতে দেওয়া হবে না। আমি একবার ভাবলাম বলি, তোমাদের দেশের প্রেসিডেন্ট আবদুল গাইউম সাহেব আমার পরিচিত, তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চাই। মশা মারার জন্য আর কামান দাগাবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলাম না।

বললাম, পাসপোর্ট রাখ, আমরা হোটেল বুক করে আসি।

ওরা সম্মত হল।

হোটেল বুকিং-এ প্রতারণার শিকার হলাম। বুকিং কাউন্টারে ভাড়ার দেড়গুণ আদায় করে রিজার্ভের স্লিপ প্রদান করল। হোটেলে পৌঁছে সব টের পেলাম। হোটেল কর্তৃপক্ষও খুব দুঃখ প্রকাশ করল। কিন্তু যা হবার হয়ে গেছে, তা আর ফিরবে না। একটি দরিদ্র মুসলিম দেশে নেমেই যে অভিজ্ঞতা হল তা মোটেই সুখকর নয়।

অনেকগুলো ছোট ছোট দ্বীপের সমাহার মালদ্বীপ প্রজাতন্ত্র। শুধু বিমান নামার জন্যই একটি ছোট দ্বীপ ব্যবহৃত হয়। যন্ত্রচালিত নৌকায় কয়েক শত গজ দূরে রাজধানী মালেতে যেতে হয়। সেটিও চারদিকে মাইল খানেকের বেশি বিস্তৃত হবে না। বিদেশীদের থাকার উপযুক্ত সেখানকার একমাত্র হোটেলটিতে উঠলাম। ছোট্ট দ্বিতল বাড়ি। দ্বীপের প্রায় সকল দোকানপাট, দালান-কোঠাই একতলা বা দ্বিতলবিশিষ্ট। সামুদ্রিক মাছ আর লবণ ব্যতীত এদেরকে সবকিছুই বাইরের থেকে আমদানির উপর নির্ভর করতে হয়। যে রেস্টুরেন্টটিতে আহার করলাম তাতে যেসব ছেলে-মেয়ে কাজ করছে তারা সকলে শ্রীলঙ্কার অধিবাসী। হাতে গোনা যায় গোটাকতক গাড়ি রয়েছে মালে শহরে। সকলেই সেই স্বল্প পরিসর রাজধানীতে পায়ে হেঁটে নিত্যদিনের কাজকর্ম করে থাকে।

মালদ্বীপের সবচাইতে বড় আকর্ষণ এর অসংখ্য ছোট ছোট দ্বীপকে অবকাশ কেন্দ্রে রূপান্তরিত করে বিদেশী পর্যটকদের জন্য সর্ববিধ বিলাস ও আনন্দের আয়োজন। এসব কেন্দ্রে কর্মরত লোকজন, বিশেষ করে মহিলাগণ সকলেই ভিনদেশী এবং তাদের অধিকাংশই ইংরেজি বা সিংহলী ভাষায় কথা বলে। সর্ব প্রকারের আমোদ-আহ্লাদ, খেলাধুলা ও অবকাশ যাপনের ব্যবস্থা এই কেন্দ্রসমূহে কেন্দ্রীভূত করা হয়েছে। প্লেন থেকে নেমে যান্ত্রিক নৌকা বা মোটর বোট নিয়ে এরা প্রায় সকলেই সরাসরি এইসব অবকাশ কেন্দ্রে চলে আসে। মুসলিম দেশ হলেও এই সমস্ত আনন্দ-দ্বীপে সবরকম বিদেশী পানীয়ের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রয়েছে। প্লেন থেকে এইদ্বীপসমূহকে পানির উপর সবুজ কচ্ছপের পৃষ্ঠদেশ বলে অনুভূত হয়। আল্লাহ্ তা'আলার কী অশেষ রহমত, অসীম পানিতে ভাসমান এই দ্বীপাঞ্চলে কোনদিন ঘূর্ণিঝড় বা জলোচ্ছ্বাস হয় না। আজ পর্যন্ত কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কোন ঘটনা সংঘটিত হয়নি।

দেশের লোকগুলোকে লবণাক্ত চরিত্রের অধিকারী বলেই মনে হল। দশ রুপি যেখানে পারাপারের রেট, সেখানে একটু বাতাস বইলেই এক শত রুপি দাবি করে বসবে। বিদেশী দেখলে বুঝে ফেলে এরা বিমানবন্দরে যাবে এবং সময় নির্ধারিত। সমস্ত নৌকার চালকরা সমঝোতা করে তাদেরকে ঠকিয়ে নেয়।

দু'দিনের বেশি থাকতে ইচ্ছা হল না। কোন অবকাশ কেন্দ্রে বুকিং থাকলে অবশ্য স্বতন্ত্র কথা ছিল। মালের ছোট্ট পরিসর আর চতুর্দিকের সীমাহীন জলরাশি দেখে দেখে হাঁপিয়ে উঠি।

কলম্বোতে ফিরে এসে সমুদ্রের তীরে পাহাড়ের পাদদেশে মাউন্ট এভেলিন হোটেলে উঠলাম। এটি একটি ঐতিহাসিক প্রাসাদ। বর্তমানে হোটেলে রূপান্তরিত প্রাসাদটি ছিল সে সময়ের ইংরেজ গভর্নরের বাসভবন।

ইংরেজ গভর্নর এক দেশীয় পরিচারিকাকে ভালোবেসে ফেলে এবং দয়িতার সাথে গোপন অভিসারের জন্য গভর্নরের প্রাইভেট চেম্বারে যাতায়াতের একটি সুড়ঙ্গপথ নির্মাণ করে দেয় যা 'গভর্নরস কোভ' নামে এখনও পরিচিত এবং দর্শনার্থীদের অন্যতম আকর্ষণীয় দ্রষ্টব্য। প্রেম যুগে যুগে, দেশে দেশে কত ঘটনা, কত উপাখ্যানের জন্ম দিয়েছে এবং আগামীতেও দিবে। গভর্নর ও তার পরিচারিকার সেই অবিনশ্বর প্রেমের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে দু'দিন বিশ্রামান্তে সেখান থকে বিদায় নিলাম। দিনের বেলা কলম্বো নিরাপদ হলেও রাতের আঁধারে প্রায়ই তামিল টাইগারদের নিক্ষিপ্ত বোমার শব্দে সেখানে দীর্ঘদিন অবস্থানের আকাঙ্ক্ষা হ্রাস পায়।

সিঙ্গাপুরে ফিরে ডাক্তার দেখিয়ে ব্যবস্থাপত্র নিয়ে দেশ প্রত্যাবর্তন করলাম। ঢাকা এসে শুনতে পাই আমাদের অভিযোগের যথার্থতার কারণেই হোক বা অন্য যে কোন জাগতিক কারণেই হোক এরশাদ সাহেবের সঙ্গে সেই মহিলার সম্পর্কের অবনতি ঘটেছে। এটা ভালো লক্ষণ। শুধু তা-ই নয়, এরশাদ সাহেব তাঁর প্রেসিডিয়ামের সভা করে সেখানকার সিদ্ধান্ত মোতাবেক মহাসচিবকে অনতিবিলম্বে মন্ত্রিত্ব থেকে পদত্যাগ, অন্যথায় দলের মহাসচিবের পদ থেকে অব্যাহতি নেওয়ার উপদেশ দেন। এটিও এক ধাপ অগ্রগতি। এরশাদ সাহেবের দলের কিছু কিছু সদস্য ও নেতা-কর্মীরা এতদিন পর পুনরায় যোগাযোগ করা শুরু করল। দলের একত্রীকরণের সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে আমার মতামত যাচাই করে দেখার চেষ্টা করছিল। বললাম, আমাদের বক্তব্যের যথার্থতা প্রমাণ হতে শুরু হয়েছে, বাস্তবে তা এখনও পূরণ হয়নি। আমাদের নেতিবাচক মনোভাব অনেকটা দূর হয়েছে। ভবিষ্যতে বিষয়গুলো কি দাঁড়ায় না দেখে কিছুই বলা যায় না।

কিছুদিন পর পত্রিকায় দেখলাম, মোশাররফ হোসেন তার স্ত্রী জিনাতের সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিয়েছে। এই কাজটি বহু পূর্বেই সাধিত হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল। একজন পুরুষ কি করে যে তার স্ত্রীর প্রকাশ্য পরকীয়া অনুমোদন ও সহযোগিতা করতে পারে, এ ঘটনা প্রত্যক্ষ না করলে অবিশ্বাস্য রয়ে যেত। একেবারে না করার চাইতে বিলম্বে করাও উত্তম। ঘটনার এ পর্যায়ে হয়ত সে মহিলা আশা করেছিল, এরশাদ সাহেব এখন তার পাশে এসে দাঁড়াবেন এবং তাদের সম্পর্কের নতুন মোড় নিবে। কিন্তু দেখা গেল, এরশাদ সাহেবের

বোধোদয় হয়েছে বা তাঁর মোহ কেটে গেছে। তিনি আর সম্পর্ক উন্নয়নের কোন পদক্ষেপ নিলেন না।

বেশ কিছুদিন মহাসচিবের পক্ষ থেকে পদক্ষেপের অপেক্ষা করে যখন বিষয়টি আর অপেক্ষায় রাখা যায় না, তখন এরশাদ সাহেব তাকে মহাসচিবের পদ থেকে অব্যাহতি দিয়ে তার অতিরিক্তকে পূর্ণ মহাসচিবের পদে অধিষ্ঠিত করলেন। নতুন মহাসচিব সর্বাগ্রে অতিরিক্ত মহাসচিবের পদটি বিলুপ্ত করাল, যদিও দলের গঠনতন্ত্রে কোনদিনই এ ধরনের কোন পদের আদৌ উল্লেখ নেই। সাবেক মহাসচিব অবশ্য প্রেসিডিয়ামের সদস্য ও ভাইস-চেয়ারম্যান রয়েই গেল। তার বিষয়ে এরশাদ সাহেব কখনও না উচ্চারণ করতে পারেননি। মহাসচিব থাকার সময়ই সে ভাইস-চেয়ারম্যানের পদও দখল করে যা ছিল অশ্রুত, রাজনীতিক্ষেত্রে অদৃষ্টপূর্ব এবং হাস্যকর। একই ব্যক্তি কি করে একই দলের মহাসচিব ও ভাইস-চেয়ারম্যান হতে পারে তা কোনদিন আমাদের বুদ্ধিতে আসেনি।

মহাসচিব পরিবর্তনে আমাদের বক্তব্যের বাস্তবায়ন এক ধাপ এগিয়ে গেল। কিন্তু যে নতুন মহাসচিব হল সে বিভিন্ন কারণে দলের নেতা-কর্মীদের নিকট ততখানি গ্রহণযোগ্য ছিল না। কিন্তু সে অর্থবান এবং শক্তিধর। অচিরেই অর্থ কথা বলবে এটাই স্বাভাবিক। এরশাদ সাহেবকে অনেকখানি তার উপর নির্ভর করতে হবে, আওয়ামী লীগ বিরোধী অবস্থানে চেয়ারম্যান ও মহাসচিবের পূর্ণাঙ্গ সমঝোতা হলে ভালো। তা না হলে সম্ভাব্য সরকারবিরোধী আন্দোলনে অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা রয়ে যাবে।

বিক্রমপুর বাড়ি এমন একজন সংবাদপত্র সম্পাদক আমার সঙ্গে দেখা করতে এল। অনেকদিন প্রবাসে থাকার কারণে দেশী হয়েও অপরিচিত। পরিচয় হলে জানা গেল সে দূর সম্পর্কে আমার আত্মীয়ও বটে। যদিও সে প্রথম বলেছিল নিজ উদ্যোগেই সে এসেছে। কারণ, জাতীয় পার্টির সে একজন শুভানুধ্যায়ী। কিন্তু অচিরেই প্রকাশ পেল এরশাদ সাহেবই আগ্রহ করে তাকে এখানে পাঠিয়েছেন। দুই জাতীয় পার্টিকে একীভূত করা সম্ভব কিনা সেটাই তার জিজ্ঞাস্য।

বললাম, অন্তত অসম্ভব মনে করি না। আমরা যেসব দাবি উত্থাপন করে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যাই, সেসব দাবিসমূহের মূল দুটি বিষয়ে অনেক অগ্রগতি হয়েছে। অন্যান্য বিষয়ও এরশাদ সাহেব বিবেচনায় নেবেন কিনা সেটা জানা প্রয়োজন।

আরও বললাম, এক হলে আমরা নতুন কিছু দাবি করব না। পূর্বতন অবস্থায় তাঁরই নেতৃত্বে প্রত্যাবর্তন করব, সেক্ষেত্রে এই একত্রীকরণের উদ্যোগ তাঁকেই নিতে হবে। তিনি যদি সম্মত থাকেন, আমাকে জানালে সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করতে পারি।

সম্পাদক নিবেদন করল, আপনি কী আমার বাসায় এক কাপ চা খেতে আসবেন? সেখানে এরশাদ সাহেবও থাকবেন।

বললাম, একবার নয়, শত বার আসব এবং শুধু চা নয়, সঙ্গে টা-ও খাব। কিন্তু এরশাদ সাহেবের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের জন্য আপনার ওখানে যাব না। তিনি নেতা, তিনিই আসবেন। আমরা তাঁর ছোট। অভিমান করে দূরে সরে গিয়েছি, তিনি এসে সে অভিমান ভাঙাবেন এটাই তো স্বাভাবিক!

সম্পাদক প্রস্তাব করল, যেহেতু তিনি বড় এবং তিনিই নেতা সেহেতু আপনি যদি তাঁর কার্যালয়ে গিয়ে দেখা করেন তা হলে সঠিক হয় না কী?

পুনরায় বললাম, একবার নয়, বারবার তাঁর অফিসে যাব। ইতিপূর্বেও একবার নাজিউরের বাড়িতে গিয়েছিলাম এরশাদ সাহেবের আহ্বানে। কিন্তু এবার দল একত্রীকরণের কোন প্রক্রিয়া চললে তাঁকেই অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে। আমরা প্রথম গেলে 'হাতে-পায়ে ধরে দলে ঢুকেছি' এ রকম একটি কথার জন্ম হতে পারে। আমাদেরকে গ্রহণ করলে অমর্যাদায় কেন করবেন?

সম্পাদক ভদ্রলোক বিষয়টি সঠিক উপলব্ধি করল এবং বলল, এরশাদ সাহেবের সঙ্গে আলাপান্তে সে আবার আসবে।

পরদিনই সে এসে উপস্থিত। খুবই খুশি। বলল, এরশাদ সাহেব সম্মত হয়েছেন। তিনি বলেছেন, মোয়াজ্জেম যথার্থ কথা বলেছে, বড়রই উচিত ছোটর মান ভাঙানো। আমি অবশ্যই তার বাড়িতে যাব।

তবে হাসতে হাসতে একথাও জিজ্ঞেস করেছেন, মোয়াজ্জেমকে জিজ্ঞেস করে আসবেন সে বাড়িতে থাকবে তো?

বললাম, সে এক লজ্জার কথা! আমার দুই সহকর্মীর কথা শুনে সেদিন মস্ত ভুল করেছিলাম। আমি তার জন্য আন্তরিক দুঃখিত। আমি তাঁকে সব বুঝিয়ে বলব।

সম্পাদক বলল, আর বলতে হবে না। তিনি সবকিছুই জানেন। আপনি যে সেদিন জাফর সাহেব ও মিজান সাহেবের তাৎক্ষণিক পরামর্শে কাজটি করেছিলেন তা তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছেন এবং সেজন্য আজ আর তাঁর মনে কোন ক্ষোভ নেই।

কয়েকদিন পর এ.বি.এম. শাহ্জাহান এবং এরশাদ সাহেবের সাবেক মিলিটারি সেক্রেটারি, বর্তমানে জাতীয় পার্টি দফতর প্রধান বিগ্রেডিয়ার ইলিয়াস এসে উপস্থিত। বিগ্রেডিয়ার ইলিয়াস বলল, স্যার, আপনাকে তাঁর বারিধারার অফিসে চা খেতে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

বুঝলাম পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়ার পূর্বে বাঁ হাত পড়েছে। নিশ্চয়ই কেউ বাগড়া দিয়েছে, আপনি সেখানে সাধাসাধি করতে যাবেন কেন? প্রয়োজন হলে তারা আসুক। একটি কাগজে দেখলাম একত্রীকরণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হয়ে মহাসচিব বলেছে, তারা চেয়ারম্যান সাহেবের চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে,

তাই অনেক কিছু বিবেচ্য রয়েছে। বাধা কোথা থেকে এসেছে বুঝতে অসুবিধা হয় না। আমাদের এমন গরজ পড়েনি যে মাথা হেঁট করে যেতে হবে। সে জিনিস শিখিনি।

এ.বি.এম. শাহ্জাহান ও ইলিয়াস সাহেবকে বললাম, ইতিমধ্যে স্যারের নিকট থেকে মধ্যস্থতাকারী এসেছে এবং স্যার আমার বাসায় আসতে সম্মত হয়েছেন। তিনি অনুগ্রহ করে একবার আসুন, পরে যতবার বলবেন আমি যাব। আমরা সকলেই যাব।

তারা দু'জনেই আমার যুক্তির সারবত্তা স্বীকার করল। ডা. টি.আই.এম. ফজলে রাব্বী টেলিফোন করে জানাল সবকিছু ঠিক হয়ে গিয়েছে। শীঘ্রই আবার আমরা একসঙ্গে কাজ করার আনন্দ পাব। পীরগঞ্জের নির্বাচনে সে ছিল আমার নির্বাচনী কর্মাধ্যক্ষ, অনেক করেছে।

দু'দিন পর আমার একান্ত আপনজন, সুহৃদ এবং আমার আইনজীবী খন্দকার মাহবুব হোসেন বাসায় এসে একই প্রস্তাব দিল। সে জাতীয় পার্টির প্রেসিডিয়ামের সদস্য এবং এরশাদ সাহেবেরও আইনজীবী। তার সঙ্গে আমার যে অকৃত্রিম সহজ সম্পর্ক এটা সর্বজনবিদিত। তাই তাকেও পাঠানো হয়েছে। তাকে সব বুঝিয়ে বলতেই ধীর মস্তিষ্কের বিজ্ঞ অ্যাডভোকেটের কিছুই বুঝতে বেগ পেতে হল না। সে হাসিমুখে বলল, বুঝেছি নেতাকে খাওয়াতে চান। ভালো কথা, কিন্তু আমি যেন বাদ না যাই।

বললাম, নিজের বাড়িতে কেউ মেহমান হয় না। এটা তোমারও বাড়ি।

সে বিদায় নিল। বলে গেল, অচিরেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

আমি বিষয়টি নিয়ে কাজী জাফরের সঙ্গে আলোচনা করেছি। সেও সবকিছু জ্ঞাত রয়েছে। আমাদের মহাসচিব শামীম আল মামুন এবং অন্য নেতা-কর্মীদের সঙ্গে পরামর্শ করেছি। তারা আমাদের দু'জনের উপর সব ভার অর্পণ করেছে। এর মধ্যে কাজী জাফরের কিড্নীজনিত জটিলতা ধরা পড়েছে। বেশ কয়েকটি দেশের বিশেষজ্ঞদের অভিমত সে সংগ্রহ করেছে। দু'দিন হল অসুস্থ হয়ে একটি ক্লিনিকে চিকিৎসাধীন রয়েছে। দেখতে গিয়ে পুনর্বার সব কথা আলোচনা করলাম। আমরা একমত হলাম যে, সম্মানজনকভাবে দল একত্রীকরণ করা গেলে আমাদের সেটা করা আশু কর্তব্য। লন্ডনে তার সঙ্গে এরশাদ সাহেবের টেলিফোনে যে আলাপ হয়েছে তাও জানাল। আমরা একমত হলাম, যার সঙ্গেই দেখা হোক, কথা হোক, আমাদের বক্তব্য অভিন্ন এবং লক্ষ্যও সুস্পষ্ট।

জাফর সাহেবের উদ্যোগে আরও কয়েকটি অপেক্ষাকৃত ছোট দল নিয়ে একটি সাত দলীয় মোর্চা গঠিত হয়েছিল। এদের নিয়ে সে প্রধানত বিএনপি'র সঙ্গে একটি সমঝোতা গড়ে তোলে। বিকল্প না থাকায় আমি এ উদ্যোগে বাঁধা দিইনি। তবে উৎসাহও দেখাইনি। বিএনপি'র শাসনামলের পাঁচটি বছরের

সীমাহীন নির্যাতন বিস্মৃত হওয়া এত সহজসাধ্য নয়। তবুও, দেশের রাজনীতির স্বার্থে এবং আওয়ামী লীগ সরকারের অধিকতর ব্যর্থতা ও জুলুমবাজির বিরুদ্ধে সমস্ত প্রতিবাদী শক্তির মিলনকে যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হওয়ায় কর্মীদের নিরুৎসাহ করিনি। বেগম জিয়ার তরফ থেকে প্রভূত উৎসাহ যাতে আমার সঙ্গে তার দেখা হয় এবং আমি গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াই।

কিন্তু মন থেকে সাড়া পাচ্ছিলাম না। আমাদের জন্য সবই সমান। এক মহিলা যাবে অন্য মহিলা আসবে। উভয় দলে কিছু পুরুষ রয়েছে দুই মহিলাকে কেন্দ্র করে, তাদের কাজ হল সর্বক্ষণ নেত্রীদের মুখপানে চেয়ে থাকা আর তাঁদের প্রতিটি কথা ও কাজকে 'আহা, বেশ বেশ' করা।

এই রাজনীতি ধাতে সইবে না। তাই অপেক্ষা করি এরশাদ সাহেব কী করেন দেখার জন্য। এককভাবে এখনও তাঁর জনপ্রিয়তা সাধারণ মানুষের কাছে, গ্রামীণ জনগোষ্ঠির নিকট অন্যদের তুলনায় অধিক। শহর কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী, পত্রিকাজীবীদের কথা স্বতন্ত্র। ভুল-ভ্রান্তি মানুষের সহজাত। সেসব সংশোধন করে জনকল্যাণে তিনি যদি দলকে ঐক্যবদ্ধ করে অন্যান্য বিরোধী দলসমূহের সমন্বয়ে গণ-আন্দোলনের পথ বেছে নেন তা হলে তিনি জনবিচ্ছিন্নতা পরিহার করে মানুষের অধিকতর নৈকট্য লাভে সমর্থ হবেন এবং দেশেও গণতন্ত্রের বুলি আউড়িয়ে নব্য ফ্যাসিস্টদের নির্যাতন-নিপীড়নের কাল অচিরেই পরিসমাপ্তি লাভ করবে।

এরশাদ সাহেবও খুব একটা শান্তিতে নেই। মিজান সাহেবকে সাময়িকভাবে ম্যানেজ করলেও সে তার দম্ভ প্রদর্শনে বিলম্ব করে না। অর্ধ-শায়িত প্রবীণ ব্যক্তিটি চেয়ারম্যান সাহেবের বিরুদ্ধে ঘরে বসে বিষ ছড়াতে থাকে। কেউ তার নিকট গেলে একগাদা অশ্লীল বাক্য শুনে আসে চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে। দলের কোন ক্রিয়াকর্মে সে যোগদান করে না। অনেক সহ্য করে একসময় তাকে তার সকল পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। যে মঞ্জুকে অর্থাৎ সাবেক মহাসচিবকে নিয়ে আওয়ামী লীগের নিকট আত্মসমর্পণ করেছিল দেশের প্রেসিডেন্ট হওয়ার প্রলোভনে এবং যে তাকে কলা দেখিয়ে নিজে যোগাযোগ মন্ত্রী বনে যাওয়ায় তার বিরুদ্ধে আদাজল খেয়ে লেগেছিল, আজ বেকায়দায় পড়ে তারই শরণাপন্ন হতে সে মুহূর্ত বিলম্ব করে না। দু'জনেরই এরশাদ-বৈরিতা অভিন্ন। দু'জনই আওয়ামী লীগের ইশারার ধারক-বাহক।

আমাদের মহাখালীর বিশিষ্ট-কর্মী হাকিম বলে, মিজান সাহেব মন্তব্য করেছে, জাফর ও মোয়াজ্জেমের সঙ্গে আমি ভিড়েছিলাম ওদেরকে দিয়ে এরশাদ সাহেবকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়ে ওদের বিরুদ্ধেই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। সাময়িকভাবে সফলও হয়েছিল।

কিন্তু জানা কথা, সাপুড়ে শেষ পর্যন্ত সাপ খেলাতে গিয়ে সর্প দংশনেই

তিরোধান লাভ করে। ওস্তাদ লাঠিয়ালও স্বীয় লাঠির আঘাতেই মৃত্যুবরণ করে। এক্ষেত্রেও সে ধরনের ঘটনা ঘটতে বাধ্য। কেবল সময়ের অপেক্ষা।

এরশাদ সাহেব বিভিন্ন কারণে এবং সম্ভবত আভ্যন্তরীণ জটিলতা নিরসনে বিলম্ব হওয়ার কারণে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগে দেরি করে ফেললেন। আমরা ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছি।

আমাদের ট্রেজারার ফখরুল আলম মূলত একজন সফল ব্যবসায়ী এবং রাজনৈতিক জটিলতার উর্ধ্বে থাকার মন-মানসিকতা সম্পন্ন মানুষ। সে বলে, দাদা আমি দুটি বড় গরু ক্রয় করে রেখেছি, দল একীভূত হয়ে গেলে পরম করুণাময়ের নিকট শোকরগোজার করার জন্য যে মিলাদ দেব তাতে তেহারী পরিবেশন করব।

জাতীয় পার্টি ঐক্যবদ্ধ থাকুক এটাই তার কাম্য ছিল। কেবল আমাদের ভালোবেসেই সে দ্বিধাবিভক্তিতে অংশ নিয়েছিল।

এই প্রেক্ষাপটেই নাগিনীর বিষাক্ত ছোবল আমাদেরকে আঘাত করল। অনেক চেষ্টা করেও বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলায় জড়িত করা যায়নি। কোন দুশ্চিন্তা নেই, জেল হত্যা মামলায় ঢুকিয়ে দাও। কোর্ট যদি শাস্তি না দেয় পথিমধ্যে যতটুক হয়রানী সম্ভব করতে দ্বিধা করো না। ওরা আওয়ামী লীগ পরিত্যাগ করল কেন? ওরা আর সব বশংবদদের মতো আমার নেতৃত্ব মেনে নিল না কেন? ওদেরকে ধর, ধরে জেলে পুরে দাও। যত রকমে পার ওদের কষ্ট দাও। ওরা যে আমার মনে নিদারুণ কষ্ট দিয়েছে।

আমরা জানি এবং মানি, আল্লাহ্ অন্তর্যামী। তাঁর দৃষ্টিকে লুকিয়ে, তাঁর সৃষ্ট জীব কিছু করতে পারে না। আল্লাহ্ জানেন, যে কল্পিত অভিযোগে এবার আমাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে তার চাইতে বানোয়াট ও ষড়যন্ত্রমূলক আর কিছু হতে পারে না!

আমরা সেদিন এই জেল হত্যার সংবাদ শুনেই ক্যাবিনেটের সকল সদস্য একযোগে পদত্যাগ করি। খন্দকার মোশতাকের 'সেকেন্ড-ইন-কমান্ড' ভাইস-প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদউল্লাহ একমাত্র ব্যতিক্রম যে পদত্যাগ করেনি। ৪ঠা নভেম্বর যে শেষ ক্যাবিনেট সভা হয়েছিল সেখানেও আমরা তিন জন ছিলাম সেনাবাহিনীর সংশ্লিষ্ট অংশের কার্যকলাপের প্রতি অত্যন্ত প্রতিবাদমুখর। আমাদের বক্তব্য ছিল, ওরা বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করেছে, ওদেরই এক অংশ স্বাধীনতা যুদ্ধের মূল নায়ক চার জাতীয় নেতাকে কারা-অভ্যন্তরে নির্মমভাবে হত্যা করেছে এবং ওরাই কথিত হত্যাকারীদের নিরাপদে দেশের বাইরে প্রেরণ করেছে। এই সেনাবাহিনীকে যে কোন মূল্যে ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু থেকে দূরে রাখতে হবে এবং খুনীদের বিচার করতে হবে। সেই মুহূর্তে ক্ষমতার দণ্ড যার হাতে সেই সেনাপতি খালেদ মোশাররফ এবং তার সাঙ্গো-পাঙ্গোরা আমাদের বক্তব্যে অত্যন্ত নাখোশ

হয়। সেদিন আমরা জেল হত্যার প্রতিবাদে দ্বিতীয়বার পদত্যাগ করি যার ফলশ্রুতিতে আমাদের উপর তাৎক্ষণিক শাস্তি নেমে আসে। বিগত তেইশটি বছর আমরা প্রায় সকল সংশ্লিষ্ট সভা-সমাবেশে এই হত্যাকাণ্ডের বিচার দাবিতে সোচ্চার ছিলাম। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, আজ আমাদেরকেই সেই মামলায় অভিযুক্ত করা হয়েছে। আমরা নাকি খন্দকার মোশতাককে এ বিষয়ে লুকিয়ে পরামর্শ দিয়েছিলাম!

১লা নভেম্বরই ক্ষমতার প্রকৃত হস্তান্তর হয়ে গিয়েছিল। খালেদ মোশাররফ কর্তৃত্ব গ্রহণ করেছিল। আমাদের বঙ্গভবনে যাওয়ার প্রশ্নই আসে না, সে অবস্থায় এটা কল্পনাও করা যায় না। তবুও নেত্রী এবং কর্ত্রীকে খুশি করতে পুলিশের কাছে মিথ্যে সাক্ষ্য দিয়ে নিজে বাঁচার চেষ্টা করল সেদিনের ক্ষমতাধর দুই নম্বর ব্যক্তি মোহাম্মদ উল্লাহ্ গ্রেপ্তার এড়াবার প্রচেষ্টায় পিজি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল টাঙ্গাইলের মান্নান সাহেব, মোশতাকের দুই পা চেপে ধরে সাত দিন পর শপথ নেওয়া প্রতিমন্ত্রী মানিকগঞ্জের মোসলেহউদ্দীন হাবু মিয়া, ক্যাবিনেটে মোশতাকের সবচাইতে বিশ্বস্ত বন্ধু সিলেটের দেওয়ান ফরিদ গাজী প্রমুখ আওয়ামী লীগের আজকের ভীতসন্ত্রস্ত সদস্যগণ। সঙ্গে জুটেছে প্রতিহিংসাপরায়ণ ও ক্ষুদ্র দলীয়-দৃষ্টিভঙ্গি সর্বস্ব গুটিকয়েক স্বার্থবাদী মানুষ। তারা সরকারের ছত্রচ্ছায়ায় দিনকে রাত আর রাতকে দিন করে সাক্ষী-সাবুদ তৈরি করছে। আমরা নিশ্চিন্ত, আরশের উপরে স্থিতিমান এই বিশ্ব ভূমণ্ডলের সৃষ্টিকর্তা সবই দেখছেন, সবই শুনছেন। এবং একদিন এই নিদারুণ অপমান, লাঞ্ছনা এবং নিপীড়নের সূক্ষ্ম বিচার তিনি করবেনই করবেন। ইতিহাসই সাক্ষ্য দেয়, ইতিহাস থেকে শিক্ষা আমরা নিই না। পিতা-মাতা-ভ্রাতাসহ সকল আপনজনের করুণ পরিণতি প্রত্যক্ষ করেও হিংসায় জর্জরিত এই ক্ষমতাধরের বোধোদয় হচ্ছে না। সর্বময় ক্ষমতার দণ্ডে আত্মবিস্মৃত এই নারী একনায়কত্বের অবশিষ্ট ঋণ শোধের পরিণতিকে স্বেচ্ছায় আহ্বান করছে বলেই মনে হয়।

সমাজে এখন নিরপেক্ষ শব্দটির অর্থ খোঁজা অর্থহীন। দেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতাসীন ব্যক্তি যখন আদালতে বিচারাধীন বিষয়ে নিজস্ব রায় প্রকাশ্য জনসভায় ঘোষণা দেয় এবং অভিযুক্তদের দোষী বলে অভিহিত করে তখন বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে, সুবিচারের পথ হয়ে পড়ে বাধাগ্রস্ত। প্রতিটি মানুষ, প্রতিটি আইনজ্ঞ একবাক্যে বলে, এই মিথ্যা অভিযোগ কখনওই আদালতে টিকবে না। কিন্তু তারপরও আমাদের জামিন পর্যন্ত দেওয়া হয় না। জামিন প্রার্থনা করে আমরা হাইকোর্ট থেকে পেলাম পিজি হাসপাতালের বন্দিশালায় স্থানান্তরের নির্দেশ। কথায় বলে, তৃষ্ণার্ত হইয়া চাহিলাম এক ঘটি জল, এনে দিল আধখানা বেল।

জেলখানায় ছিলাম ছাব্বিশ সেলে। দিনের বেলা হাঁটা-চলার স্থান

রয়েছে। ডায়াবেটিসের রোগীর জন্য নিয়মিত হাঁটা-চলা একান্ত প্রয়োজন। এই পিজি হাসপাতালের প্রিজন সেলে সে প্রশ্ন আসে না। হাসপাতালটিতে যে আবার নাম বদলের পালা সমাপ্ত হয়েছে। গালভরা সাইন বোর্ড দেওয়া হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর পিতার নামে। ওষুধ-পথ্যের খবর নেই, চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই, কেবল ভাড়া বৃদ্ধি আর দলীয় চিকিৎসকদের অঘোষিত ক্লাবে রূপান্তরিত হয়েছে নতুন নামাঙ্কিত এই বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতাল। এরা সর্বসাকুল্যে আধখানা ছোট্ট লেসিক্স টেবলেট প্রদান করে একদিন অন্তর অন্তর। বোধগম্য কারণেই অনেক চিকিৎসক এড়িয়ে চলতে চায়। দু'-একজন সুচিকিৎসক মানবতার কারণে আমাদের ব্যবস্থাপত্র দিলে কারা-রক্ষীরা ছুটাছুটি করে সেসব ওষুধ সংগ্রহ করার প্রয়াসে। ঢাকা সেন্ট্রাল জেলের আমরা বন্দি, হাইকোর্টের আদেশে এখানে স্থানান্তরিত, ওষুধ পথ্যের ব্যবস্থাপত্র দেন এখানকার চিকিৎসক, সেসবের জন্য দৌড়ায় কারা-রক্ষী। বাঁ হাতে কিছু না পড়লে কাজ করতে পরাঙ্মুখ কারা-কর্মকর্তারা সবকিছুতেই দ্বিধান্বিত। ফলে আমাদের অবস্থা উত্তপ্ত কড়াই থেকে জ্বলন্ত উনুনে নিক্ষেপের শামিল। তবুও ধৈর্য ধরে আছি। তাছাড়া করারও কিছু দেখি না।

দলকে একত্রিত করার পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, কাজী জাফর উদ্যোগ নিয়ে এরশাদ সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছে। আমাকে জানিয়েছে, আমার সম্মতি নিয়ে দ্রুত কাজ সম্পন্ন করতে চায়। এই জালেম সরকারের বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলন শুরু করার জন্য বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী প্রভৃতি দলের সঙ্গে মোর্চা গঠন করে আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে হবে। আনোয়ারকে সব বলে দিয়েছি।

২৭শে জানুয়ারি, '৯৯ সাল, ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউটে একত্রীকরণ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। সেখানে আমাদের দলকে বিলুপ্ত ঘোষণা করে এরশাদ সাহেবের নেতৃত্বে দুই অংশ একীভূত হয়ে যাবে। এরশাদ সাহেব স্বয়ং উপস্থিত থেকে সে প্রক্রিয়াকে কার্যকর করবেন।

এই উদ্যোগের সুযোগে মহাসচিব এবং আরও কয়েকজন মিজান সাহেবের উপর থেকেও অপসারণ আদেশ প্রত্যাহারের পক্ষপাতী।

প্রেসিডিয়ামের সভায় আমার অনেকবারের ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব জাফর ইমাম প্রমুখ আপত্তি উথাপন করে। জেল হত্যার দায়-দায়িত্ব নেওয়া সঠিক হবে না বলে খোঁড়া যুক্তি প্রদর্শন করে। এরশাদ সাহেব পাল্টা যুক্তি দিয়ে সকলকে শান্ত করেন। তিনি বলেন, আমার বিরুদ্ধেও হত্যা মামলা রয়েছে, তা সত্ত্বেও তোমরা আমার মুক্তি আন্দোলন থেকে বিরত থাকনি। এখন, এই প্রতিহিংসার মামলার বিষয়ে জটিলতা আরোপ করা অনুচিত।

তিনি সকলের সম্মতি নিয়েই দলকে একত্র করার সিদ্ধান্ত নেন। সেই সুযোগে মিজান সাহেবের অব্যাহতি আদেশও প্রত্যাহৃত হয়।

সম্মেলনের দিন সারাটি এলাকা আমার মুক্তির দাবিতে পোস্টার-ফেস্টুনে ছেয়ে ছিল। সম্মেলনের একই দাবি ছিল—এই মিথ্যা মামলা থেকে আমাদের নিষ্কৃতি। জাফর সাহেব অত্যন্ত জোরালো ভাষায় আমার মুক্তির দাবি তুলে ধরে, এরশাদ সাহেবও সে দাবির প্রতিধ্বনি করেন। সম্মেলনে দলকে ঐক্যবদ্ধ ঘোষণা করে এরশাদ সাহেব কাজী জাফর এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দকে নিয়ে আমার বাসায় যান। আমার পরিবারের সদস্যদের ধৈর্য ধরার উপদেশ দেন এবং আমার মুক্তির আন্দোলনকে তারা সকলে একত্রে এগিয়ে নেবেন এই আশ্বাস দেন।

সেই তিনি এলেন, কিন্তু এবারও আমি থাকলাম না। সেবার নিজেই চলে গিয়েছিলাম, এবার নিয়তি আমাকে সরিয়ে রাখল।

এরশাদ সাহেব সরকারের বিরুদ্ধে বৃহত্তর ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন একত্রীকরণ সম্মেলন থেকে। প্রধানমন্ত্রীর গাত্রদাহ শুরু হয়েছে। এমনিতেই অত্যধিক কথা বলার অভ্যাসদুষ্ট এই মহিলা ক্ষমতার মদমত্ত হয়ে এরশাদ সাহেবকে হুঙ্কার দেয়, রাজপথ নয় তাকে থাকতে হবে জেলখানার লাল ঘরে।

কে, কখন, কোথায় থাকবে নির্দিষ্ট করেন সর্বক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং। এত গর্ব, এত অহমিকা কবে কি করে চূর্ণ হবে সেটাও সেই পরম ক্ষমতাবান সৃষ্টিকর্তাই জানেন।

জবাবে এরশাদ সাহেব এবার নেতার মতোই উত্তর দিয়েছেন। বলেছেন, একসঙ্গে ছ' বছরের উপর জেল খেটে এসেছি। আর কোন মানুষ এ দেশে তা করেনি। আমাকে জেলের ভয় দেখিয়ে লাভ নেই। মানুষের কল্যাণে অবশিষ্ট জীবন শেষ হোক এটাই আমার কাম্য। লালঘরে কে যাবে তা পূর্ব নির্ধারিত এবং একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই সেটা জ্ঞাত রয়েছেন।

আনোয়ার হোসেন মঞ্জুকে সেই সম্মেলন থেকে তিনি আহ্বান জানান মন্ত্রিত্ব পরিত্যাগ করে চলে আসতে, নতুবা তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মঞ্জু প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে জনসভায় গিয়ে এরশাদ সাহেবের বিরুদ্ধে তীব্র কটুক্তি করে সে আহ্বানের প্রতিউত্তর দেয়। এরশাদ সাহেবের সরকার বিরোধী ভূমিকা সম্বন্ধে অত্যন্ত অপমানজনক মন্তব্য করে। ফলশ্রুতিতে পরদিন তাকে দল থেকে পরিপূর্ণ অব্যাহতি দেওয়া হয়।

মিজান সাহেব এই সুযোগই খুঁজছিল। অর্থশালী ভাতিজা ও কাহা মিলে এবার অনেক অনর্থের সূচনা করবে। মিউনিসিপ্যাল নির্বাচনে জাতীয় পার্টিসহ চার দলের নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্তকে বিরোধিতা করে। সরকারি সিদ্ধান্তের সপক্ষে একের পর এক বিবৃতি দিয়ে পুনরায় দলের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে। তাকেও অব্যাহতি দেওয়া ব্যতীত কোন উপায় থাকে না। এখন দু'জন মিলে দলকে আর একবার আওয়ামী-করণের পথে দ্বিধা-বিভক্ত করার প্রক্রিয়া শুরু করবে। অচিরেই তা সম্পন্ন করা হয়।

এরশাদ সাহেব আমাদের পূর্বতন পদসমূহ প্রত্যর্পণ করেছেন। সকলে কাজ করে যাচ্ছে সম্মিলিতভাবে।

আমি অপেক্ষা করছি কবে নির্দিষ্টকাল শেষ হবে। কবে মুক্ত মানুষ হিসাবে মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়াব। কবে আবার সুউচ্চ কণ্ঠে কথা বলব—যেমনি করে অতীতে বলেছি, বর্তমানে বলছি এবং খোদা চাহে তো ভবিষ্যতেও বলব।

❑

শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেন বাংলাদেশের একটি সুপরিচিত নাম। তিনি ১৯৩৯ সালের ১০ই জানুয়ারি বিক্রমপুরের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৫৪ সালে ঢাকা সেন্ট গ্রেগরী হাইস্কুল হতে কৃতিত্বের সাথে এসএসসি, ঢাকা কলেজ হতে এইচএসসি, জগন্নাথ কলেজ হতে বিএ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে এমএ এবং এলএলবি ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণের কারণে নবম শ্রেণীর ছাত্রাবস্থায় তাঁর প্রথম কারাবরণ। দেশ ও মানুষের জন্য সংগ্রাম করতে গিয়ে তিনি বহু কারাবরণ করেন। বন্ধুরা তাঁকে 'কারাগারের পাখি' বলে ডাকেন। বাংলাদেশের জীবিত রাজনৈতিকদের মধ্যে তাঁর চাইতে কেউ বেশি কারাবরণ করেননি।

১৯৫৪ সালে তিনি ঢাকা কলেজ ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৫৮ সালে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক এবং ১৯৫৯ সালে উক্ত সংগঠনের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৬২ সাল পর্যন্ত তিন তিন বার তিনি সে পদে বহাল ছিলেন। ১৯৬২ সালের শিক্ষা ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের তিনি ছিলেন মহানায়ক। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে তিনি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৭১ সালে তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেন এবং মুজিবনগর হতে স্বাধীনতা যুদ্ধের অন্যতম সংগঠক হিসাবে কাজ করেন। ভারতীয় পার্লামেন্টের যৌথ অধিবেশনে বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে তাঁর ভাষণ আমাদের স্বাধীনতা ইতিহাসের এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। ১৯৭২ সালে তিনি স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম চিফ হুইপ নির্বাচিত হন। পরের বছর পুনরায় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়ে দ্বিতীয়বারের মতো দেশের চিফ হুইপ হন। ১৯৭৫ সালে তিনি মন্ত্রিসভার সদস্য নিযুক্ত হন।

দেশের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর ১৯৭৬ সালে তিনি ডেমোক্রেটিক লীগ নামে একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করে পার্টির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৮৩ সালে তিনি অন্যতম সংগঠকরূপে জনদল গঠন করেন এবং ১৯৮৪ সালে মন্ত্রিসভার সদস্য নিযুক্ত হন। ১৯৮৬ সালে জাতীয় পার্টি গঠন করে দলের ভাইস-চেয়ারম্যান ও প্রেসিডিয়ামের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৮৬ সালে তিনি পুনরায় সংসদ সদস্য এবং সেই বছরই তিনি জাতীয় পার্টির মহাসচিব নির্বাচিত হন। ১৯৮৭ সালে তিনি সরকারের উপ-প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। পরে ১৯৮৮ সালে পুনরায় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন এবং উপ-প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ উপনেতা নির্বাচিত হন। ১৯৯১ সালে রংপুরের পীরগঞ্জের উপ-নির্বাচনে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন।

শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেন দেশের বহু জনহিতকর কাজের সাথে জড়িত। স্কুল-কলেজসহ বহু প্রতিষ্ঠান নিজ উদ্যোগে গড়ে তুলেছেন। ভ্রমণ করেছেন পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ। তিনি বাংলাদেশের সুপ্রীমকোর্টের একজন আইনজীবী, সুদক্ষ রাজনৈতিক সংগঠক এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বী বক্তা হিসাবে সুপরিচিত। ব্যক্তিগত জীবনে এক পুত্র ও এক কন্যা সন্তানের জনক। সুসাহিত্যিক ও কবি সালেহা হোসেন তাঁর স্ত্রী।